

একত্রিংশত্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারী, 1978

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

প্রকাশক— বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা 700 006

ফোন : 55-0660

একমাত্র পরিবেশক : ওরিয়েণ্ট লংম্যান অ্যাণ্ড কোং লিঃ

17, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-700 072

ফোন : 23-1601

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 1, জানুয়ারী, 1978

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানতে হলে পরিষদ চলাকালীন পরিষদের অফিস-তত্ত্বাবধায়ক শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু জানতে হলে উক্ত কেন্দ্রের আহ্বায়ক শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডঃ শ্যামসুন্দর দে কিংবা শ্রীদুলালকুমার সাহার সঙ্গে ঐ কেন্দ্র চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, চিঠিপত্র কর্মসচিব বা বিভাগীয় আহ্বায়কদের নামে যথাবিধি পাঠানো যাবে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে কর্মসচিব বা বিভিন্ন আহ্বায়কদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্য/সভ্যাদের সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

1লা, অক্টোবর, 1977
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55 0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভাষায় রচিত সচিত্র বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন, জনশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে; এই তহবিলে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দেশের সহৃদয় সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই তহবিলে দান পাঠাইবার ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (ফোন: 55-0660) কলিকাতা-6। ইতি

[বিঃ দ্রঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে যে কোন দান আয়করমুক্ত।]

[Vide No. 11 (1)/703-b/v dated the 28th December 1959]

শ্রীরতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ



আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম : জানুয়ারী 1, 1894 মৃত্যু : ফেব্রুয়ারী 4, 1974

[অশীতিতম জন্মদিবসের প্রাক্কালে 'আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক অবদান'—এই সংক্রান্ত আলোচনা-চক্রের উদ্বোধনকালে (29 ডিসেম্বর, 1973) গৃহীত ফটো।]

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ জানুয়ারী, 1978 প্রথম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তা যেমন মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না তেমনি গণশিক্ষাও মাতৃভাষা ছাড়া সম্ভব হয় না। গণশিক্ষা বলতে শুধু সাক্ষর করা বুঝায় না, মানুষকে যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী করে তোলাই হল প্রকৃত গণশিক্ষা। এরূপ শিক্ষা সম্ভব ও সার্থক হবে যখন প্রতিটি মানুষ হবে বিজ্ঞানমুখী ও বিজ্ঞানানুরাগী। বাংলাভাষার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতিকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলাই ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্বপ্ন। 1লা জানুয়ারী আচার্য বসুর জন্মদিন। তিনি আমাদের মধ্যে এখন আর নেই। তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে যদি তাঁর বিভিন্ন অনুপ্রেরণা বাস্তবায়িত করা যায়। সেই অনুপ্রেরণা ও স্বপ্ন রূপায়ণে বিজ্ঞান পরিষদ ব্রতী। এই ব্রত সম্পাদনে গত ত্রিশ বছরে পরিষদ কতটা সমর্থ হয়েছে তার বিচার দেশবাসীই করবেন। পরিষদের গত ত্রিশ বছরের কাজের পর্যালোচনার চেয়ে আমরা কি করছি বা করতে চাই তার একটি চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা আমাদের আশু কর্তব্য বলে মনে করি।

পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমানে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর উপর প্রবন্ধ পরিবেশন করা এবং কিশোর মনে বিজ্ঞান অনুরাগ সঞ্চার করাই হল এই পত্রিকার আদর্শ। এই জন্যে প্রাথমিক কাজ—প্রচার ও লেখার মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-কে জনপ্রিয় করে তোলা। পরিষদের কর্মসূচী

যতই সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে নির্ধারিত হবে, উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে তা ততই সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্যে পরিষদের তত্ত্বাবধানে মৃত্তিকা পরীক্ষা, সার প্রয়োগ পদ্ধতি ও কীটনাশক ঔষধপত্র সম্পর্কে শিক্ষণ শিবির ও ভ্রাম্যমান পরীক্ষাগার স্থাপনে পরিষদ খুবই আগ্রহী এবং সরকারের অনুমোদন ও অনুদান প্রার্থী।

গত কয়েক বছর ধরে পরিষদ পরিচালিত সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের তৈরী মডেল ও চার্টের মাধ্যমে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজিত হয়ে আসছে এবং এই কেন্দ্রটি যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে—তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হাতে-কলমে কেন্দ্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মশালা (workshop) গড়ে তুলতে আমরা প্রয়াসী। এটি সফল হলে প্রয়োজনভিত্তিক ছোট-খাট যন্ত্রপাতি এবং নানা বাস্তবভিত্তিক মডেল হাতে-কলমে কেন্দ্রে তৈরি করা সহজসাধ্য হবে এবং এগুলির সাহায্যে শহরে ও গ্রামে প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছে আরও সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে। সাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এবং প্রয়োগ সহজ ও সরলভাবে পরিবেশন করার জন্যে জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশে পরিষদ সর্বদাই সচেষ্ট।

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগে বিনা খরচে ছাত্রদের লেখাপড়া করবার সুযোগ দেওয়া হয়। পরিষদের পাঠাগার ব্যক্তিগত দানে সমৃদ্ধ হলেও আদর্শ পাঠাগার হিসাবে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সংগ্রহ করে পরিষদের পাঠাগারকে আদর্শ পাঠাগার হিসাবে গড়ে তুলতে বহু সভ্যই কর্মতৎপর। স্লাইড ও মডেলসহ বিজ্ঞানের উপর জনপ্রিয় বক্তৃতা পরিষদ কক্ষের বাইরে ছড়িয়ে দিতে পরিষদ আগ্রহী ও উদ্যোগী। পরিষদের কর্মীরা পরিষদের অবিচ্ছিন্ন ও অপরিহার্য অঙ্গ। এদের কল্যাণকল্পে সবরকম ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী সমিতি উদারভাবাপন্ন।

এই সমস্ত প্রকল্প ও উদ্যোগের সুষ্ঠু রূপায়ণে আমরা চাই সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য, চাই প্রতিটি সভ্যের ও পরিষদের কর্মীদের আন্তরিকতা ও দরদী মনোভাব এবং সবার উপরে চাই দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।

লেসার

অন্নপূর্ণা সরকার*

পদার্থ-বিজ্ঞানের কতকগুলি আধুনিক অগ্রগতির ফলে লেসার উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। উক্ত অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং লেসার উদ্ভাবনে ঐসব নতুন জ্ঞান কিভাবে সাফল্য আনলো—তার বিবরণ এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

বিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিজ্ঞান-জগতে সৃষ্টি হল একটা বিরাট আলোড়ন। পদার্থ-বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক 1900 সালে আবিষ্কার করলেন একটি নতুন তত্ত্ব, নাম তার 'কোয়াণ্টাম- তত্ত্ব' এবং ক্ষুদ্র একটি সমীকরণ :

$$E = h\nu$$

যার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী।

1900 সালে সকল বিজ্ঞানী জানতেন আলো দু'রকমের—

(1) এক রকমের আলো-কে বলা হত 'দৃশ্যমান আলো', যা চোখের পদায় অনুভূতি জাগাতে পারে।

(2) আর এক রকমের আলো, যা তা পারে না। আসলে দু'রকমের আলো একই প্রকৃতির বিকিরণ; এরা উভয়েই কতকগুলি তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সমাবেশ। এদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অথবা কম্পন মাত্রার, অর্থাৎ কম্পনের হারে। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের বিস্তৃতি সীমাহীন; তার বিভিন্ন প্রস্থ জুড়ে এক একটি স্তরকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিশেষ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান কম্পনমাত্রার মান অনুসারে কয়েকটি তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের স্তরকে বিভি নাম দেওয়া হয়েছে, যথা: (i) দীর্ঘ রেডিও-তরঙ্গ, (ii) ক্ষুদ্র রেডিও-তরঙ্গ, (iii) মাইক্রোতরঙ্গ, (iv) অবলোহিত আলোক-তরঙ্গ, (v) দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ, (vi) অতি-বেগুনী আলোক-তরঙ্গ, (vii) রঞ্জেন-রশ্মি, (viii) গামা-রশ্মি, (ix) মহা-জাগতিক রশ্মি ইত্যাদি। এদের মধ্যে দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের বিস্তৃতি খুবই অল্প। অর্থাৎ সারা বিশ্বে অবিরত প্রবহমান তরঙ্গরাজির অতি ক্ষুদ্র অংশই মানুষের চোখে ধরা পড়ে।

যে কোন তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণের ক্ষুদ্রতম শক্তি-পরিবাহককে বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন 'ফোটন'। বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক বললেন: যে কোন একটি ফোটনের শক্তি ধারণের মাত্রা সীমিত—ইচ্ছামত যে কোন শক্তি সে ধারণ করতে পারে না। একটি ফোটনের শক্তি E তার কম্পনসংখ্যা ν-এর উপর নির্ভর করে; প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ নির্দিষ্ট শক্তিধারী কতকগুলি ফোটনের প্রবাহ এবং ফোটনের মোট সংখ্যার উপর নির্ভর করছে নির্দিষ্ট বিকিরণের শক্তি।

বছর পাঁচেকের মধ্যে আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার সমস্ত চিন্তাধারাকে ওলটপালট করে দিল—সেটি হল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের 'রিলেটিভিটি থিওরী' বা 'আপেক্ষিকতাবাদ'। তার সঙ্গে আর একটি ছোট্ট সমীকরণ:

*40-ই, ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-700 004

$$E = mc^2$$

যেখানে E হল শক্তি, m বস্তুর ভর, আর c আলোর গতিবেগ। জড় পদার্থ যখন কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার স্থূলত্ব হারিয়ে পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে অথবা কোন শক্তি সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হয়ে স্থুলত্ব অর্জন করে ভরে পরিণত হতে পারে, তখন শক্তি ও ভর-এর পারস্পরিক সম্পর্ক উপরের সমীকরণকে মেনে চলে। উপরের এই সমীকরণের সত্যতা অটুট তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাজাগতিক রশ্মিতে এবং গবেষণাগারে বিভিন্ন পরীক্ষায়।

ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগেছিলেন বস্তু বা পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অণু এবং পরমাণুর আসল রূপ বের করার জন্যে। পরমাণুর আকৃতি কি রকম তার প্রথম ধারণা জন্মাল লর্ড রাদারফোর্ড-এর গবেষণার ফলে 1910 সালে। 1911 সালে আবিষ্কৃত হল নীলস্ বোর-এর পারমাণবিক তত্ত্ব; বোর-এর এই আবিষ্কার আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এলো পদার্থ-বিজ্ঞানকে। তাঁর তত্ত্বানুযায়ী প্রতিটি পরমাণুর আকৃতি অনেকটা সৌরজগতের অনুরূপ; একটি কেন্দ্রীভূত পদার্থ আছে যার চারদিক ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে অবিরাম গতিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা। কেন্দ্রের ঐ অংশের নাম দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীন এবং বৃত্ত ও উপবৃত্তাকার পথে নিরত ঘূর্ণায়মান পদার্থকণিকাদের নাম দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রন। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুদের মধ্যে পার্থক্য হল কেন্দ্রীনের ভরে, ইলেকট্রনের সংখ্যায় ও উপবৃত্তের অবস্থান ও আকৃতিতে। ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধানসম্পন্ন, আর কেন্দ্রীন ধনাত্মক আধানসম্পন্ন। কোন পদার্থের কেন্দ্রীন ও তার চারপাশের এক বা একাধিক ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট পরিক্রমার কোন বিশিষ্ট সমন্বয়কে বলা হয় ঐ পদার্থের একটি বিশিষ্ট পারমাণবিক শক্তির স্তর। কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনদের মিলিত পরিবেষ্টনীর সামান্য অদলবদল হলেই পারমাণবিক শক্তির আর একটি নতুন স্তরের সৃষ্টি হয়। এরূপ অদলবদল সম্ভব হয় যদি বাইরে থেকে কোন ফোটন এসে পরমাণুর উপর ধাক্কা খায়; আর এ ব্যাপার ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন কিছু শক্তি ফোটনের কাছ থেকে শোষণ করে অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি শক্তির স্তরে উঠে পড়ে। কিন্তু এই উন্নীত পরিস্থিতি টলমল অবস্থায় থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইলেকট্রন সেই অতিরিক্ত শক্তি যা ফোটনের কাছ থেকে আহরণ করে উচ্চস্তরে উঠেছিল সেটুকু বিকিরণ করে দিয়ে আবার সেই ফেলে-আসা নিচের স্তরে ফিরে আসে। পরমাণু তখন আবার অটল অবস্থা ফিরে পায়। এইভাবে শোষণ ও বিকিরণের মাধ্যমে পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আনাগোনা চলতে থাকে। শোষণের ফলে হয় নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরে আরোহণ, আর বিকিরণ ঘটে উঁচু স্তর থেকে নিচু স্তরে অবতরণের ফলে।

গবেষণাগারে এই তথ্য যখন বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হল, তখন বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন একটি প্রশ্ন তুললেন। তা হল—যদি একটি নির্দিষ্ট কম্পনযুক্ত তরঙ্গ, অর্থাৎ ফোটনের প্রবাহ কিছুক্ষণ ধরে কোন একটি বস্তুর ভিতরে পাঠানো হয়, তবে ঐ বস্তুর উত্তেজিত বিভিন্ন পরমাণু কি ক্রমান্বয়ে একই কম্পন-সংখ্যাবিশিষ্ট তরঙ্গ, অর্থাৎ ফোটনের ধারা বিকিরিত করবে? বস্তুর ভিতরে এই নতুন ফোটনের ধারা কি আবার অন্য পরমাণুদের উত্তেজিত করতে থাকবে —যা থেকে সৃষ্টি হবে আরো নতুন ফোটনের ধারা? এইভাবে কি চলতে থাকবে অবিরাম নতুন নতুন পরমাণুদের মধ্যে উত্তেজনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ফোটন ধারার সৃষ্টি? তারই ফলে নির্দিষ্ট কম্পাংকের মাত্র অল্প কিছু ফোটন পাঠিয়েও সমান কম্পাংকের অগণিত ফোটনের ধারা কি বেরিয়ে আসবে উত্তেজিত বস্তুর ভিতর থেকে? ঠিক একই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিজ্ঞানী চার্লস

টাউনস্। এই চিন্তাধারাই রূপ নিয়েছিল একটি নতুন তথ্যে, নাম তার 'মেসার থিওরী', অর্থাৎ 'মাইক্রো-তরঙ্গের বিস্তার বর্ধন-তত্ত্ব'—যা টাউনসের একটি বিস্ময়কর অবদান।

নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে চার্লস টাউনস্ যখন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে 1951 সালের কোন এক সকালে উনি এক সভা উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটন ডি সি-তে এসে উপস্থিত হলেন। সভার আগে প্রাতরাশ সেরে নেবেন মনে করে বেশ কিছুক্ষণ আগেই তিনি একটি রেস্তোরায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু এসে দেখলেন রেস্তোরা বন্ধ। তখন রেস্তোরার উল্টো-দিকে 'ফ্রাঙ্কলিন পার্কে' ঢুকে একটি বেঞ্চিতে এসে বসলেন। বসে থাকতে থাকতে উনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গিয়ে একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। ভাবতে লাগলেন—দীর্ঘ-রেডিও-তরঙ্গকে যদি সুসংবদ্ধ (coherent) করে তার তীব্রতা বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব হয়, তবে তাদের চেয়ে কিছু কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে সুসংবদ্ধ করা কেন সম্ভবপর নয়? দীর্ঘ রেডিও-তরঙ্গের গবেষণা তখন অনেকদূর এগিয়েছিল এবং ঐ সময়ে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে সুসংবদ্ধ করে তার একগুচ্ছ রশ্মিকে কম্পনমাত্রা বজায় রেখে দূরপাল্লায় নির্দিষ্ট সরলপথে স্থানান্তরে পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল। সুসংবদ্ধ রশ্মি বলতে বুঝায় সমদশাসম্পন্ন কিংবা সমদশা-সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন তরঙ্গ—যা সমান তালে এগিয়ে যায় এবং সব সময়েই তাদের মধ্যে পারস্পরিক একই দশাসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। সাধারণ বিকিরণ যা প্রতিনিয়ত দেখা যায় অথবা উপলব্ধি করা যায়, তাদের কোনটাই সুসংবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানী টাউনস্ পার্কে বসেই কিছুক্ষণের মধ্যে মাইক্রো-তরঙ্গের ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ রশ্মি সৃষ্টি করার একটি উপায় উদ্ভাবনের কথা ভাবলেন। সভার পর নিউইয়র্কে ফিরে এসেই তাঁর নিজের গবেষণাগারে কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তখন মাইক্রো-তরঙ্গের উপর কাজ শুরু করলেন এবং তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আবিষ্কার করলেন 'মেসার'—যা বিংশ শতাব্দীর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। **Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation** শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত নামই হল **MASER.**

1957 সালে প্রফেসার টাউনসের সহকর্মী রিচার্ড গর্ডন শুদ্ধ গণিতের সাহায্যে প্রথম প্রমাণ করলেন, মাইক্রো-তরঙ্গ ছাড়া দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রেও এই কার্যকারিতা সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে তার নাম দিলেন 'লেসার'। **Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation**—এই শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত প্রকাশই হল **LASER.**

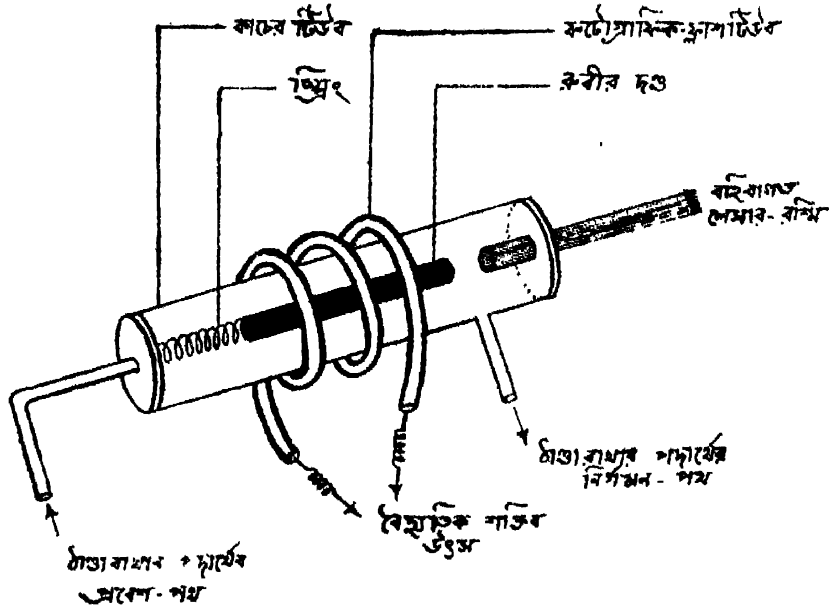
1958 সালে প্রফেসার টাউনস্ ও তাঁর ভগ্নীপতি ডঃ আর্থার স্বলো 'ফিসিক্যাল রিভিউ' পত্রিকায় 'ইনফ্রারেড ও অপটিক্যাল মেসার' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপান। এতে ওঁরা প্রস্তাব করলেন, মেসার সৃষ্টিকারী কোন পদার্থকে যদি সমান্তরাল দু'খানি দর্পণের অথবা প্রতিফলকের মাঝখানে রাখা হয় ও তার মধ্যে দৃশ্যমান আলো ক্রমাগত নিক্ষেপ করা হয়, তবে মাধ্যমের মধ্যে মেসার রীতি অনুসারে অবিন্যস্ত দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের এক তীব্র স্রোতের সৃষ্টি হবে এবং তা দু'খানি সমান্তরাল দর্পণে বারবার লম্বভাবে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে একটি সুবিন্যস্ত আলোকস্রোতে পরিণত হবে। যদি এই দু'খানি দর্পণের একখানি আবার অর্ধ-স্বচ্ছ হয়, তাহলে সেই অর্ধস্বচ্ছ দর্পণ ভেদ করে বেরিয়ে আসবে একটি নির্দিষ্ট সরল পথে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অনর্গল আলো এবং সেই অবিরাম নির্গত স্রোতই লেসার-রশ্মি।

ডঃ আর্থার স্বলো কাজ করতেন আমেরিকার বিখ্যাত বেল পরীক্ষাগারে, আর প্রফেসার প্রখরোভ ও প্রফেসার বাসোভ কাজ করতেন মস্কোর

বিখ্যাত লেবেডেভ গবেষণাকেন্দ্রে। এ দু'জায়গাতেই এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। মস্কোতে প্রখরোভ গণিতের উপর ভিত্তি করে দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রে মেসার পদ্ধতির কার্যকারিতার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে একটি প্রবন্ধ ছেপে বের করলেন। কিন্তু বেল পরীক্ষাগার অথবা লেবেডেভ গবেষণাকেন্দ্রে—এর কোন জায়গাতেই কেউ লেসার উৎপাদন করার কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পারলেন না। অবশেষে 1960 সালে আবিষ্কৃত হল প্রথম লেসার উৎপাদনকারী যন্ত্র—ক্যালিফোর্নিয়ার হিউগস্ এয়ার-ক্রাফ্ট কোম্পানির পরীক্ষাগারে। অত্যন্ত গোপনে এটি তৈরি করেছিলেন একজন তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর নাম ডক্টর থিওডোর হারল্ড মেইম্যান। তাঁর সেই প্রথম আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম রুবী-লেসার। এই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখানো হল (চিত্র 1)—

করলেন। তারপর রুবীর দর্পণ-প্রান্তের সঙ্গে একটি স্প্রীং লাগিয়ে দিলেন। সমস্ত জিনিষটি এবারে একটি কাচের নলের ভিতর ঠিক মাঝখানটিতে রাখলেন এবং কাচের নলটির গায়ে তৈরি করলেন তারের মত করে জড়ানো একটি শক্ত ফটোগ্রাফিক ফ্ল্যাস-টিউব। ফ্ল্যাস-টিউবের প্রান্ত দুটি একটি বিদ্যুৎ-উৎসের সঙ্গে সংযোগ করার ব্যবস্থা রাখলেন। সমস্ত কাচের নলটি ও তার ভিতরকার রুবীকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করলেন।

রুবী আসলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড-এর কেলাস, যার ভিতর কিছু সংখ্যক অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুকে স্থানচ্যুত করে সে জায়গায় বসানো হয় ক্রোমিয়াম পরমাণু। রুবীর অণুরা অবস্থান করতে পারে তিনটি শক্তির স্তরে। স্বাভাবিক অনুত্তেজিত অবস্থায় রুবীর নিম্নতম শক্তির স্তরে

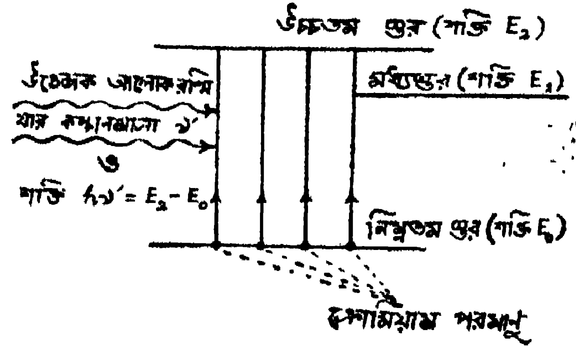


চিত্র 1 ডক্টর মেইম্যানের তৈরী প্রথম রুবী-লেসার যন্ত্রের মোটামুটি কাঠামো

ডক্টর মেইম্যান আধখানা সিগারেটের মাপের এক টুকরো রুবী নিয়ে তার প্রান্ত দুটি খুব ভালভাবে পালিশ করে নিখুঁতভাবে সমতল করে নিয়ে রূপোর প্রলেপ দিয়ে তার এক প্রান্তকে একটি দর্পণে ও অপর প্রান্তকে একটি অর্ধ-দর্পণে পরিণত

ক্রোমিয়াম পরমাণু অবস্থান করে, আর উচ্চতর বিভিন্ন স্তর থাকে প্রায় ফাঁকা। ফ্ল্যাস-টিউবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ঘটালে সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাস-টিউব থেকে জোরালো দৃশ্যমান আলো গিয়ে রুবীর অণু-পরমাণুর উপর পড়ে আর সেই জোরালো আলোর সবুজ অংশের প্রভাবে

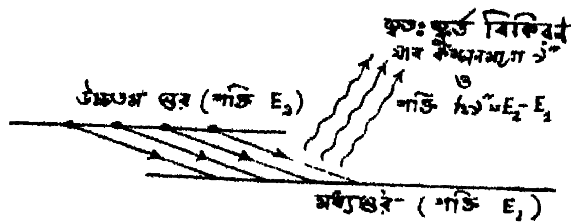
রুবীর ভিতরকার ক্রোমিয়াম পরমাণুদের মধ্যে উত্তেজনার সাড়া পড়ে যায় এবং উত্তেজিত হয়ে কিছু পরমাণু শক্তির উচ্চতম স্তরে উঠে আসে একের পর এক [চিত্র-2 (ক)]। চারটি মাত্র পরমাণু নিয়ে চিত্রে ভিতরকার প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে এবং প্রতিটি চিত্রে



চিত্র 2 (ক)

চারটি ক্রোমিয়াম পরমাণুকে চারটি 'বিন্দু' দিয়ে চিহ্নিত করা হল।

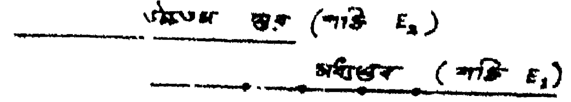
কিন্তু উচ্চতম স্তরে এক একটি পরমাণু 1 সেকেণ্ডের 10 কোটি ভাগের মাত্র 1 ভাগ সময় (প্রায়) স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারে। ফলে সেই সব পরমাণু নেমে আসে একটি মধ্যস্তরে যেখানে 1 সেকেণ্ডের কিছু বেশি সময় অবস্থান করা সম্ভব। সেই কারণে যদি আলোর নিক্ষেপণ কিছুক্ষণ চলতে থাকে তাহলে বহু ক্রোমিয়াম পরমাণু নিম্নতম স্তর থেকে উঠে এসে মধ্যস্তরে ভীড় জমায়—মনে হয় যেন ক্রোমিয়াম পরমাণুদের ঘনবসতির স্থান পাল্টানো



নিম্নতম স্তর (শক্তি E_0)

চিত্র 2 (খ)

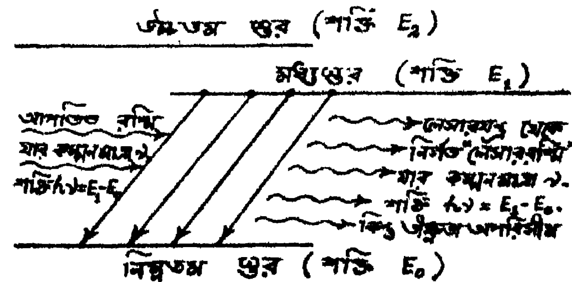
হল শক্তির নিম্নতম স্তর থেকে মধ্যস্তরে [চিত্র 2 (খ) ও 2 (গ)]।



নিম্নতম স্তর (শক্তি E_0)

চিত্র 2 (গ)

আপনা থেকে উচ্চতম স্তর থেকে মধ্যস্তরে ক্রোমিয়াম পরমাণুর নেমে আসার ফলে যেটুকু শক্তি বিকীর্ণ হয় [চিত্র 2 (খ)], তার জন্যে রুবীর উত্তাপ বেড়ে যায়। তাই রুবীকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করেছিলেন মেইম্যান। এরূপ অবস্থায় যদি ν কম্পাংকের রশ্মি এসে রুবীর ভিতর ঢোকে যার শক্তি মধ্যস্তর ও নিম্নতম স্তরের শক্তির প্রভেদের সমান, অর্থাৎ যার শক্তি $h\nu = E_1 - E_0$, তা হলে শক্তি শোষণ করে যে সংখ্যক পরমাণু উত্তেজিত হয়ে উচ্চতম স্তরে উঠবে, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি পরমাণু একের পর এক সর্বনিম্নস্তরে নেমে এসে সুস্থির হয়ে বসবে, আর সেই সঙ্গে বিকীর্ণ হবে সমান শক্তির ফোটন। ফলে ν কম্পাংকের



চিত্র 2 (ঘ)

তরঙ্গ বা ফোটনের স্রোত বেরিয়ে আসবে—যার তীব্রতা হবে আপতিত ν কম্পাংকের তরঙ্গের তীব্রতার চেয়ে অনেক গুণ বেশি; কারণ নিম্নস্তর

অপেক্ষা মধ্যস্তরে অবস্থিত পরমাণুদের সংখ্যা এখন অনেকগুণ বেশি [চিত্র '' (ঘ)]।

মেইম্যানের যন্ত্রে এই ν কম্পাংকের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল ফ্ল্যাস টিউবের আলোতেই। ফ্ল্যাস-টিউবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ঘটানোর কিছুক্ষণের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক ফোটনের স্রোত বইতে শুরু করল দু'খানা দর্পণের মাঝের জায়গাতে। এদের কম্পনমাত্রাও ν. যে সব ফোটন দর্পণের উপর লম্বভাবে এসে পড়ছিল, তারা বারে বারে প্রতিফলিত হয়ে একের পর এক পরমাণুতে ধাক্কা খেয়ে নতুন নতুন ফোটন সৃষ্টি করল, আর যে সব ফোটন বাঁকাভাবে এসে দর্পণের উপর পড়ছিল তারা ছিট্‌কে বাইরে চলে গেল। এই ভাবে দর্পণের উপর লম্বপথে ধাবমান ফোটনের সংখ্যা যখন একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছয় তখন সেই ফোটনের স্রোত অস্বচ্ছ দর্পণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে কাচের টিউবের বাইরে—যার তীব্রতা হল আপতিত আলোর তীব্রতার তুলনায় অনেক বেশি। মেইম্যান দেখতে পেলেন, রুবীর অর্ধস্বচ্ছ দর্পণ প্রান্ত থেকে খুব উজ্জ্বল ঘন লাল আলোর ধারা একটি নির্দিষ্ট সরল পথে দর্পণের লম্বপথে বেরিয়ে আসছে। এই ধারাই হল লেসার-রশ্মির ধারা। এইভাবে সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হল লেসার-রশ্মি।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজন-ভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকূট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে হাতে বা ডাকযোগে লেখা পাঠাতে হবে। পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি কর্তৃক লেখা মনোনীত হলে তা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ সময়মত প্রকাশ করা হবে।

বংশগতি

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

বংশগতি সম্পর্কে বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের মতবাদ, এবং এ সম্পর্কে আধুনিক ধারণা কি, তা-ই এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে প্রজননবিদ্যা (genetics) সংক্রান্ত মূল তথ্য ও তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়েছে, এবং মানুষের কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির বেলায় জিন (gene)-এর ভূমিকা কি, তা-ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বংশগতি সম্পর্কে মেণ্ডেলের মতবাদ—

বংশগতি (heredity) সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, একটি জীব তার নিজের মত জীবেরই সৃষ্টি করে। যেমন—কুকুর কুকুরের এবং বিড়াল বিড়ালেরই জন্ম দেয়, অন্য কিছু নয়। কিন্তু একটি কুকুরের যদি চারটি বাচ্চা হয়, সেগুলি সবই কুকুরের বাচ্চা হলেও তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য কিছু না-কিছু থাকেই। চারটি বাচ্চা কখনও সর্বতোভাবে একই রকম হতে পারে না। জীব-বিজ্ঞানের এই অধ্যায় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা শুরু করেন অস্ট্রীয়ান ধর্মযাজক মেণ্ডেল (Abbe Mendel)। 18-5 66 সালের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

অ্যাবে মেণ্ডেল বংশগতি সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন মটরগাছ নিয়ে। বিজ্ঞানী মেণ্ডেল যদিও তাঁর গবেষণার ফলাফল 1866 সালের মধ্যেই প্রচার করেন, তবু তখন পর্যন্ত এদিকে কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। কারণ, বংশগতি সম্পর্কে তখন কারও কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রায় ছত্রিশ বছর পরে, হিউগো দ্য ভ্রিস্ (Hugo de Vries), কার্ল কোরেন্স্ (Carl Correns) এবং এরিক ৎসেরম্যাক (Erich Tschermark) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন স্থানে গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যা মেণ্ডেল ইতিপূর্বেই বলেছিলেন। এঁদের গবেষণার বিবরণ 1 00 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল। তখন এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের জন্যে পুঁথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে মেণ্ডেলের গবেষণার বিষয় সব জানা গেল। তাই এই মূল্যবান আবিষ্কারের কৃতিত্ব এবং স্বীকৃতি মিলল বিশ বছর আগে লোকান্তরিত বিজ্ঞানী মেণ্ডেল-এর। আর এই নতুন তত্ত্বের নাম দেওয়া হল মেণ্ডেলবাদ (Mendelism)। এখানে মেণ্ডেলের মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

মেণ্ডেল পরীক্ষা শুরু করেন দু'জাতের মটর-গাছ নিয়ে—একটি লম্বা (tall) এবং অন্যটি বেঁটে (dwarf)। তিনি কিছু লম্বা এবং কিছু বেঁটে গাছের ফুল থেকে, কুঁড়ি অবস্থায়ই, তাদের পরাগধানীগুলি কেটে বাদ দিলেন। পরে লম্বা গাছের পরাগ (বা রেণু) বেঁটে গাছের গর্ভকেশরে, অপরদিকে বেঁটে গাছের পরাগ (বা রেণু) লম্বা গাছের গর্ভকেশরে লাগিয়ে পরাগ-সংযোগ (polli-

* আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা-700 004

nation) ঘটালেন। এর ফলে দু'রকম গাছেই মটরশুঁটি হল। এই দু'রকম গাছের মটরশুঁটি থেকে বীজ সংগ্রহ করে যখন মাটিতে বোনা হল, তখন দেখা গেল, সব গাছই লম্বা হয়েছে। মেণ্ডেল এই সব লম্বা গাছকে বললেন, প্রথম জনির (generation) বা পুরুষের গাছ (F_1)।

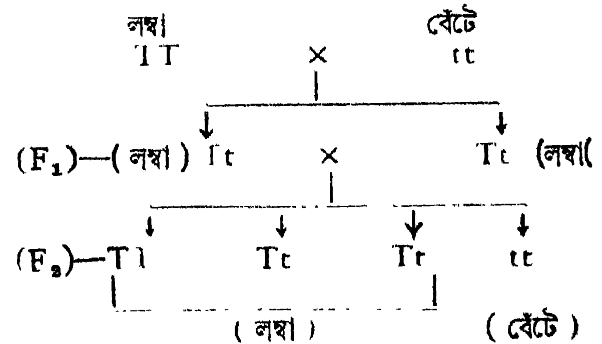
এবার প্রথম জনির (বা পুরুষের) (F_1) দুটি লম্বা গাছের মধ্যে একই উপায়ে পরাগ-সংযোগ ঘটানো হল। কিন্তু এবারে আরও আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেল। এবারের গাছকে বলা হল, দ্বিতীয় জনির (বা পুরুষের) গাছ (F_2)। মেণ্ডেল দেখলেন, দ্বিতীয় জনির (বা পুরুষের) গাছের মধ্যে লম্বা ও বেঁটে এই দু'রকম গাছই আছে। শুধু যে আছে, তাই নয়, তারা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে। বার বার পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, এই অনুপাত নিম্নরূপ—

লম্বা : বেঁটে = 3 : 1

এরূপ ফল পেয়ে তিনি প্রথম জনির (পুরুষের) (F_1) গাছকে বর্ণ-সংকর (hybrid) বললেন। তাঁর মতে, এদের মধ্যে লম্বা এবং বেঁটে উভয় প্রকার গুণ (factor)-ই আছে।* কিন্তু লম্বা হওয়ার জন্যে যে গুণটি দায়ী তা প্রকট (dominant) এবং সহজেই বেঁটের গুণকে প্রভাবাধীন করে রাখে, তাই গাছটি লম্বা হয়। এর মধ্যে যে বেঁটের গুণ আছে তা প্রচ্ছন্ন (recessive)। তবে সুযোগ পেলেই তা আবার প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে তার উত্তর পুরুষের মধ্যে।

এই তথ্যটি বোঝাবার জন্যে তিনি বলেন প্রতিটি গুণ প্রকাশ করার জন্যে জীবদেহে দুটি, করে নির্ধারক (determinant) থাকে।* তিনি লম্বা ও বেঁটে গাছের নির্ধারকের নাম দিলেন যথাক্রমে TT ও tt. জীবদেহে যে জনন-কোষ (gamete) তৈরি হয়, তাতে এই নির্ধারক পৃথক হয়ে যায় (segregation), আর প্রতিটি জনন-কোষে তখন একটিমাত্র নির্ধারক থাকে। যেমন, TT নির্ধারকধারী গাছের জনন-কোষে থাকে কেবল T, আর tt নির্ধারকধারী গাছের বেলায় থাকে শুধু t. মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফল এখন নিম্নলিখিত উপায়ে প্রকাশ করা যায়—

বংশগতির নিয়ম



উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, দ্বিতীয় জনির (পুরুষের) (F_2) গাছের মধ্যে শতকরা 75টি লম্বা এবং 25টি বেঁটে। তবে এদের মধ্যে শতকরা 25টি প্রকৃত লম্বা, 50টি লম্বা কিন্তু বর্ণ-সংকর, আর 25টি প্রকৃত বেঁটে। এই মেণ্ডেলবাদের উপর ভিত্তি করেই বর্তমানকালের বংশগতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

বংশগতি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা—প্রতিটি প্রাণী-বিজ্ঞানীই এখন একথা বিশ্বাস করেন,

* এই গুণের জন্যে যে (gene)-ই দায়ী, তা তখন কেউই জানতেন না। মেণ্ডেল এই গুণের নাম দেন 'factor'. পরবর্তীকালে জানা গেছে, এক-এক রকম জিন এক-এক রকম 'factor'-এর জন্যে দায়ী।

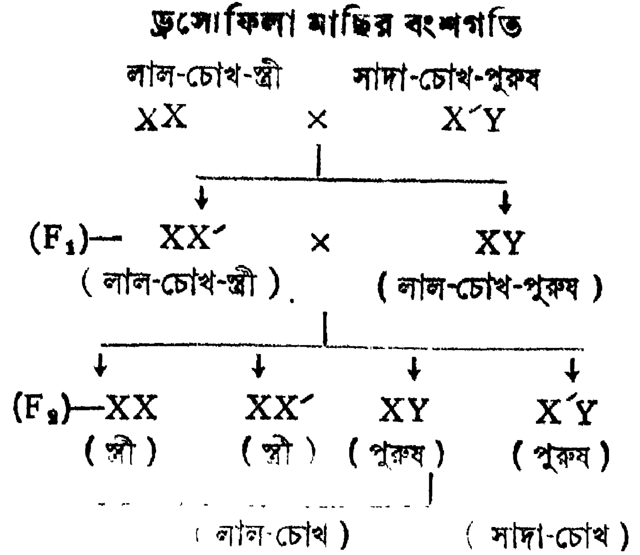
* এই নির্ধারক এখন জিন (gene) নামে পরিচিত। কতকগুলি জিন সমন্বয়ে তৈরি হয় ক্রোমাটিড (chromatid). আবার দুটি করে ক্রোমাটিড (chromatid) একত্রিত হয়ে ক্রোমোসোম (chromosome) সৃষ্টি করে। ক্রোমোসোম-ই হল বংশগতির ধারক ও বাহক এজন্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত দু'টি করে জিন বা নির্ধারক থাকে।

সন্তান তার লিঙ্গ (অর্থাৎ সে স্ত্রী বা পুরুষ—কি হবে ?) এবং অন্যান্য গুণাগুণ সবই উত্তরাধিকার সূত্রে সে পিতামাতার কাছ থেকেই অর্জন করে। এর কারণ কি ?

এ সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিজ্ঞানী—মরগ্যান, মুলার এবং ব্রিজেস, 1911 খ্রীষ্টাব্দে। এজন্যে তাঁরা ড্রসোফিলা নামক একপ্রকার মাছি বেছে নেন।

শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্ত্রী-ড্রসোফিলার কোষ-মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসে থাকে চার জোড়া ক্রোমোসোম। প্রত্যেক জোড়ার ক্রোমোসোম দুটির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু পুং ড্রসোফিলার বেলায় তা নয়। এক্ষেত্রে তিন জোড়া ক্রোমোসোম ঐরকম। কিন্তু মাঝারি আকারের দুটি ক্রোমোসোমের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট। একটি অন্যটির চেয়ে একটু লম্বা এবং মাথার দিকে একটু বাঁকানো। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এরকম পার্থক্য সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। আর বলাবাহুল্য যে, এই ক্রোমোসোমই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে নির্ধারক (determinant)-এর কাজ করে। সোজা ক্রোমোসোমটিকে X-অক্ষর দিয়ে এবং বাঁকাটিকে Y-অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে সুতরাং, যেটিতে XX-ক্রোমোসোম থাকবে, সেটি স্ত্রী হবে ; আর যেটিতে XY-ক্রোমোসোম থাকবে, সেটি পুরুষ হবে।

এখন ধরা যাক, মাতার X-ক্রোমোসোমে এমন কোন নির্ধারক (W) আছে, যা প্রকট (dominant), এবং ওই মাছির চোখের রং নির্ণয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য পিতার X-ক্রোমোসোমে এই নির্ধারকটি (w) প্রচ্ছন্ন (recessive)।



লাল-চোখ স্ত্রী এবং সাদা-চোখ পুরুষ মাছির মিলনের ফলে উদ্ভূত প্রথম জনিতে (পুরুষে) (F_1) বর্ণ-সংকর দুরকম মাছিই (স্ত্রী ও পুরুষ) লাল-চোখ হবে। কারণ প্রত্যেকেই লাল-চোখ মাতার নিকট থেকে প্রকট (w) নির্ধারক-সম্পন্ন X-ক্রোমোসোম পেয়েছে। এদের মিলনের ফলে উদ্ভূত দ্বিতীয় জনিতে (পুরুষে F_2) চার রকম মাছি পাওয়া যাবে, তাদের মধ্যে তিনটির চোখ লাল এবং একটির সাদা। এদের মধ্যে আবার দুটি স্ত্রী এবং দুটি পুরুষ হবে। আর শুধু পুরুষের মধ্যেই পাওয়া যাবে সাদা-চোখ মাছি। কারণ, কেবলমাত্র এইটিই প্রকট (w)-নির্ধারক-সম্পন্ন X-ক্রোমোসোম পায় নি।

এইভাবে মেণ্ডেলবাদ পুরোপুরি সমর্থিত হল আধুনিক প্রজনবিদ্যার (genetics) সাহায্যে। এ থেকেই আন্দাজ করা যায়, কোন জীবের মধ্যে হঠাৎ নতুন কোন বিশেষত্বের আবির্ভাব হলে, বংশগতি অনুযায়ী তা কিভাবে উত্তর জনিতে (পুরুষে) সঞ্চারিত হয়, এবং তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রভাবিত করে।

মানুষের বংশগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি—মানুষের বেলায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা 46 ; অর্থাৎ, আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের নিউ-

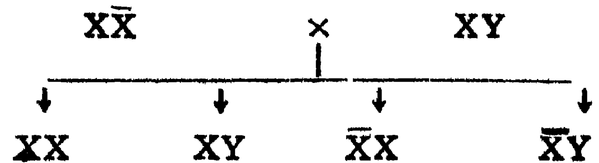
ক্লিয়াসে 23 জোড়া করে ক্রোমোসোম থাকে। এই 23 জোড়ার মধ্যে 22 জোড়ার ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষে মোটামুটি একই প্রকার। এদের বলা হয় অটোসোমস (autosomes)। স্ত্রীলোকের 23-তম জোড়ার ক্ষেত্রেও দুটি ক্রোমোসোমই একই প্রকার, কিন্তু পুরুষের বেলায় তা নয়। পুরুষের বেলায় এই জোড়ার একটি বড়, এবং অনেকটা স্ত্রীলোকের মতই, কিন্তু এর সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এজন্যে উভয় ক্ষেত্রে এই 23-তম জোড়াকেই লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম (sex chromosomes) বলা হয়। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, স্ত্রীলোকের বেলায় তা XX, এবং পুরুষের বেলায় XY.

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এক-এক রকম জিন (gene) এক-এক রকম চরিত্র বা ধর্ম নির্ধারণ করে, এবং এগুলি অটোসোমে এবং লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোমে পর পর সাজানো থাকে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, যে-কোন একটি ধর্ম এক জোড়া জিন দ্বারা (এক জোড়া ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটিতে একটি করে অবস্থিত) নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক জোড়ায় আবার একটি প্রকট (dominant) এবং অন্যটি প্রচ্ছন্ন (recessive) হওয়া সম্ভব। এরূপ এক জোড়া ক্রোমোসোমের একটি দেয় পিতা এবং অন্যটি মাতা। এজন্যে দুটি জিনই প্রকট হতে পারে, অথবা একটি প্রকট এবং অন্যটি প্রচ্ছন্ন হতে পারে, অথবা দুটিই হতে পারে। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে প্রকট জিন-ই বংশগত ধর্ম নির্ধারণ করে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন জিন-জনিত ধর্মই প্রকাশিত হয়।

স্ত্রীলোকের বেলায় দুটি X-ক্রোমোসোম থাকে। এখানে প্রকট (dominant) জিন-ই চরিত্র বা ধর্ম নির্ধারণ করে। কারণ, এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন (recessive) জিন তার নিজস্ব ধর্ম প্রকাশ করতে অক্ষম। কিন্তু পুরুষের বেলায় ব্যাপারটি অন্যরকম হয়। এক্ষেত্রে X-ক্রোমোসোমে কোনপ্রকার ত্রুটিযুক্ত জিন থাকলে, তার ক্রিয়া প্রতিরোধ করার মত জিন Y-ক্রোমোসোমে থাকে না। এজন্যে তার সবরকম ধর্মই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এর ফল কিরূপ হতে পারে, তাই এখন পরীক্ষা করে দেখা যাক।

স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই X-ক্রোমোসোমে এক-প্রকার জিন থাকে, তা এমন একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। কোন কোন সময় এই জিন পরিবর্তিত হয়ে যায় (mutation = পরিব্যক্তি)। তখন ওই প্রয়োজনীয় উপাদান (factor-VIII) উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। এরকম হলে, রক্তপাতের ফলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগের নাম হিমোফিলিয়া (haemophilia)। স্ত্রীলোকের একটি ক্রোমোসোমের জিনে কোনপ্রকার ত্রুটি থাকলেও ওই স্ত্রীলোকের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, ওই জোড়ার অপর ক্রোমোসোমে অবস্থিত ত্রুটিমুক্ত জিন এর ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। তবে এই স্ত্রীলোকটি এই ত্রুটি ($X\bar{X}$) বহন করে (carrier)।

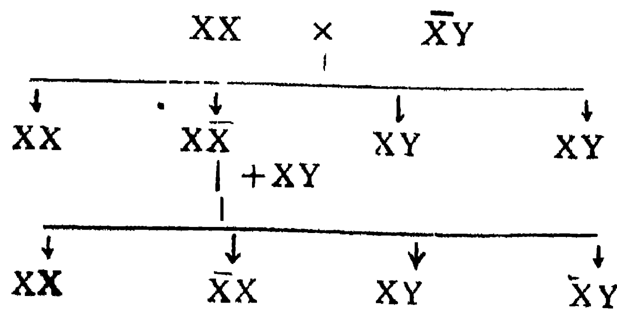
এরূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একজন স্বাভাবিক পুরুষের (XY) বিবাহ হলে, চার রকম সন্তান হতে পারে; যেমন—XX, XY, $\bar{X}X$, $\bar{X}Y$. এদের মধ্যে প্রথমটি হবে ত্রুটিমুক্ত স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়টি হবে ত্রুটিমুক্ত পুরুষ, তৃতীয়টি হবে ত্রুটিবহনকারী স্ত্রীলোক, আর চতুর্থটি হবে হিমোফিলিয়া রোগগ্রস্ত পুরুষ।



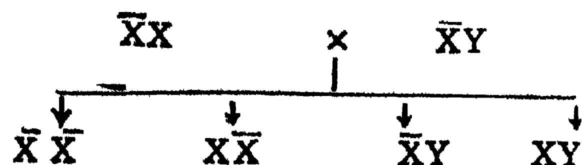
এই রোগ পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, একথা সত্যি। কিন্তু ত্রুটিবহনকারী স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তা তৃতীয় জনিতে (পুরুষে) [অর্থাৎ, নাতির (grand-son) মধ্যে] সঞ্চালিত হয়। উল্লেখ্য যে, রোগগ্রস্ত পিতার পুত্ররা এই ত্রুটি

বহন করে না। তাই তার পুত্র কন্যার এরূপ রোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কন্যারা রোগগ্রস্ত না হলেও, এই ত্রুটি বহন করতে পারে (carrier)। সুতরাং তাদের সন্তানদের মধ্যে এই রোগ দেখা দিতে পারে।

ধরা যাক, এরূপ ত্রুটি বহনকারী একটি কন্যার সঙ্গে একজন স্বাভাবিক পুরুষের বিবাহ হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের যদি দুটি পুত্র-সন্তান হয়, তাহলে তাদের একজন রোগগ্রস্ত হবে, কিন্তু অপরজন রোগমুক্ত থাকবে। আর দুটি কন্যা হলে, তাদের একজন এই ত্রুটি বহন করবে (carrier), কিন্তু অপরজন ত্রুটিমুক্ত থাকবে।



আরও অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়, যদি একজন ত্রুটি-বহনকারী (carrier) স্ত্রীলোকের সঙ্গে একজন হিমোফিলিয়া রোগগ্রস্ত পুরুষের বিবাহ হয় (যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম)। এক্ষেত্রে যদি দুটি সন্তান হয়, তাহলে তাদের একটি হবে রোগগ্রস্ত এবং অপরটি রোগমুক্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি দুটি কন্যা-সন্তান হয়, তাহলে তাদের একটি হবে রোগগ্রস্ত (homozygos) এবং অন্যটি হবে ত্রুটি-বহনকারী (carrier)।



1866 সালে সর্বপ্রথম আর এক প্রকার ত্রুটি-যুক্ত শিশুর কথা বলা হয়। এরূপ শিশুর কপাল বড়, হাঁ-করা মুখ, বর্ধিত ঠোঁট, বৃহৎ জিহ্বা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এরূপ শিশু সাধারণত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে মঙ্গোলিজ্‌ম (Mongolism, বা Down's Syndrome)। এর সঠিক কারণ জানা গেছে অল্পদিন আগে, 1959 সালে। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে, এরূপ ত্রুটিযুক্ত শিশুর কোষে 46-টির পরিবর্তে 47-টি করে ক্রোমোসোম থাকে। আর এজন্যেই শিশুটির স্বাভাবিক বুদ্ধি ব্যাহত হয়। কিন্তু এর কারণ কি?

এখন নিশ্চিতরূপে জানা যে, মাইওসিস্‌-প্রক্রিয়ায় ডিম্ব-কোষ (egg-cell) গঠিত হওয়ার সময়, কোন কোন ক্ষেত্রে একুশতম ক্রোমোসোম-জোড়া পৃথক হয়ে যেতে ব্যর্থ হয় (non-disjunction)। আর সেই কারণেই তখন ডিম্ব-কোষে থাকে 23-টির পরিবর্তে 24-টি ক্রোমোসোম। (কারণ, একুশ-তমটির বেলায় একটিমাত্র ক্রোমোসোম থাকার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে থাকে একজোড়া বা দুটি ক্রোমোসোম।)

এরূপ ডিম্ব-কোষ থেকে যে শিশুর জন্ম হয়, তার কোষে 46 টির পরিবর্তে 47-টি ক্রোমোসোম (24+23=47) থাকে। অর্থাৎ, একুশতমটির ক্ষেত্রে যেখানে এক-জোড়া ক্রোমোসোম থাকার কথা, সেখানে এরূপ শিশুর বেলায় থাকে তিনটি ক্রোমোসোম (trisomy)। আর এই কারণেই শিশুটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত বয়স্কা স্ত্রীলোকদের (35 থেকে 45 বছর বয়সের মধ্যে) এরূপ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সুতরাং বেশি বয়সে সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ববিজ্ঞানে হাইজেনবার্গ

মলয় সিকদার*



জন্ম : ডিসেম্বর 5, 1901
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারী 1, 1976

বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তকদের মধ্যে অনেক মনীষীই খ্যাত। এই সব ভাস্বর মনীষী জ্যোতিষ্কদের মধ্যে যাঁরা খুবই উজ্জ্বল বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ হলেন তাঁদের অন্যতম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ—এই যুগ সন্ধিক্ষণে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর দীপ হাতে যাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের বিজ্ঞান সাধনা যে শুধু বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার নবসম্ভাবনার সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে তা নয়; সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে ও কলায় এনেছে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন। মানবমনীষা আজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু কেন্দ্র আর ডি এন এ-এর জগৎ থেকে দূর আকাশের নীলিমায় ফুটে উঠা তারকামালার দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন—আইনস্টাইন, নীলস্ বোর, সমারফিল্ড, হাইজেনবার্গ, শ্রয়ডিঙ্গার, ডিরাক, ফের্মি, পাওলি, কুরী পরিবার, অটো হ্যান, ম্যাক্স বর্ণ, ফেইনমেন এবং আরও অনেকে।

তাঁদের মধ্যে অনেকেই, যেমন আইনস্টাইন, শ্রয়ডিঙ্গার, ডিরাক প্রমুখ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হিসাবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অনেকে আবার প্রায়োগিক বিজ্ঞানী (experimental scientist) হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর হাইজেনবার্গ পদার্থ-বিজ্ঞানের এই দুই শাখার মধ্যে কোন্ শাখায় পড়েন, তা বলা অত্যন্ত মুস্কিল।

1901 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর এক অধ্যাপক পরিবারে ভারনার হাইজেনবার্গ (Werner Heigenberg) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসেন, তখন জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার আলোকিত করে রেখেছেন তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর—আইনস্টাইন, নীলস্ বোর, সমারফিল্ড, ম্যাক্স বর্ণ, অটো হ্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। একদিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞান জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে নীলস্ বোর ও সমারফিল্ডের পারমাণবিক মতবাদ প্রাচীন ডালটনের পারমাণবিক মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে উন্মোচিত

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

করেছে বিজ্ঞানচিন্তার নব দিগন্ত। এই নতুন মতবাদ অনুসারে পরমাণু আর কোন নিরেট বস্তুকণা নয়—ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি মৌলিক কণার সমবায়ে গঠিত।

বিজ্ঞান-ভাবনার এই উত্তরণের যুগে হাইজেনবার্গ মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে এসে পরিচয় লাভ করেন তৎকালীন যুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানী সমারফিল্ডের সঙ্গে। প্রতিভাধর হাইজেনবার্গ অতি-সহজেই বিজ্ঞানী সমারফিল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একদিন জীমান প্রক্রিয়ার (Zeeman effect) বর্ণালীবিশিষ্ট একখানা ফটোগ্রাফিক প্লেট নিয়ে এসে বিজ্ঞানী সমারফিল্ড ছাত্র হাইজেনবার্গকে বলেছিলেন—"নীলস্ বোরের নতুন পারমাণবিক মতবাদ ব্যবহার করে তুমি এই বর্ণালীর বিভিন্ন রেখা তাত্ত্বিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে?" এভাবে অধ্যাপক সমারফিল্ড তরুণ ছাত্র হাইজেনবার্গের চিন্তাধারায় প্রবেশ করিয়ে দেন অতি আধুনিক কালের বিজ্ঞানচিন্তা। 1923 খ্রীষ্টাব্দে হাইজেনবার্গ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন হাইড্রোডায়নামিক্সের একটা সমস্যার (stability of laminar flow) তাত্ত্বিক সমাধান করে। সেই বছরই তিনি গয়েটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাক্স বর্নের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হলেন এবং কিছু দিন বাদেই লেকচারার পদে উন্নীত হন। তারপর তিনি কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর তিনেক অধ্যাপক নীলস্ বোরের সঙ্গে গবেষণা করেন।

1925 খ্রীষ্টাব্দে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র (Uncertainty Principle)-এর আবিষ্কার, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। এই আবিষ্কারের জন্যেই তাঁকে 1932 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করা হয়। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ঘটনা বর্ণনায় এই অনিশ্চয়তা সূত্র একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কোন্ ঘটনা কিভাবে পরিমাপ করলে অন্য ঘটনা কতখানি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তার সন্ধান এই সূত্র থেকে পাওয়া যায়। বর্ণালী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা সূত্র ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

যদি কোন বস্তুকণা তরঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে, তবে ঐ কণার তরঙ্গ সমীকরণ প্রথম আবিষ্কার করেন শ্রয়ডিঙ্গার। তরঙ্গ ও বস্তুকণার দ্বৈত অভিব্যক্তি বিশিষ্ট শ্রয়ডিঙ্গার সমীকরণকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিকাশে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে ধরা হয়। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফন্ নয়মান দেখিয়েছেন, অনিশ্চয়তাবাদের গাণিতিক প্রকাশ দু'ভাবে সম্ভব। তা হল, হাইজেনবার্গের কোয়ান্টাম গণিতের পদ্ধতি এবং শ্রয়ডিঙ্গারের গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে।

ম্যাক্স বর্ন ও হাইজেনবার্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মেট্রিক্স মেকানিক্স (matrix mechanics)। বর্ণালী বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরীক্ষালব্ধ ফলকে পরপর সুসমঞ্জস্যভাবে সাজাতে গিয়ে তিনি ম্যাক্স-বর্নের সঙ্গে যুগ্মভাবে এই অঙ্কশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) থেকে শুরু করে চুম্বকবিদ্যা পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হাইজেনবার্গ তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাকে আবিষ্কার করা এবং তাকে যথাযথ গাণিতিক সূত্রে আবদ্ধ করাই হচ্ছে বিজ্ঞানের লক্ষ্য, আর এই গাণিতিক সূত্র যখন কোন ঘটনার সঙ্গে নির্ভুলভাবে মিলে যাবে, তখনই এই গাণিতিক সূত্রের পূর্ণ সার্থকতা। এই সম্পর্কে হাইজেনবার্গ বলছেন যখন আমরা এরূপ কোন গাণিতিক সূত্রের অবতারণা করব (set up) তখন তা নির্ভরশীল হওয়া উচিত দৃশ্যমান (observable) বিভিন্ন ফলের উপর, কোন কাল্পনিক ফলের (parameter) উপর নয়।

• গত 1.2.1976 তারিখে এই আজীবন বিজ্ঞান তপস্বীর জীবনদীপ চিরকালের জন্যে নির্বাপিত হয়েছে। মৃত্যুর আগে উনি কোয়ার্কস (quarks)

মডেল নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। এই নতুন মতবাদ অনুসারে বস্তুর সরলতম কণিকা আর ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি নয়; কোয়ার্কস। কোয়ার্কসের বিভিন্ন সমবায়ে এই ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি গঠিত হয়।

24 বছর বয়সে যে বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন—সেই হাইজেনবার্গ শুধু বিজ্ঞানী হিসাবেই নন, স্বদেশ-প্রীতিতেও তুলনাহীন। সবে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—বাতাসে ভেসে আসছে বারুদের গন্ধ, শোনা যাচ্ছে হিটলারের রণ-হুঙ্কার। এদিকে আমেরিকার মানহাট্টান প্রজেক্টে গোপনে চলছে পরমাণু বোমা তৈরির তোড়জোড়। পাশ্চাত্যের নামী নামী বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই তখন আমেরিকায়, আছেন আইনস্টাইন, নীলস্ বোর, ফের্মি—আরও অনেকে। হাইজেনবার্গ আসছেন আমেরিকায় বেড়াতে। উদ্দেশ্য, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। পুরনো বন্ধুরা সকলেই তাঁকে আমেরিকায় থেকে যেতে বললেন। আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে এসেছিল অধ্যাপকের পদ নিয়ে। সেদিন তার উত্তরে হাইজেনবার্গ বলেছিলেন—আজ হউক আর কাল হউক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একদিন শেষ হবে, তাতে হিটলারের পরাজয় অনিবার্য এবং জার্মানী হবে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। আর সেদিন যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীর নবজাগরণের জন্যে আমাকে জার্মানীতে থাকতে হবে—জার্মানী আমাদের, শুধু হিটলারের নয়।

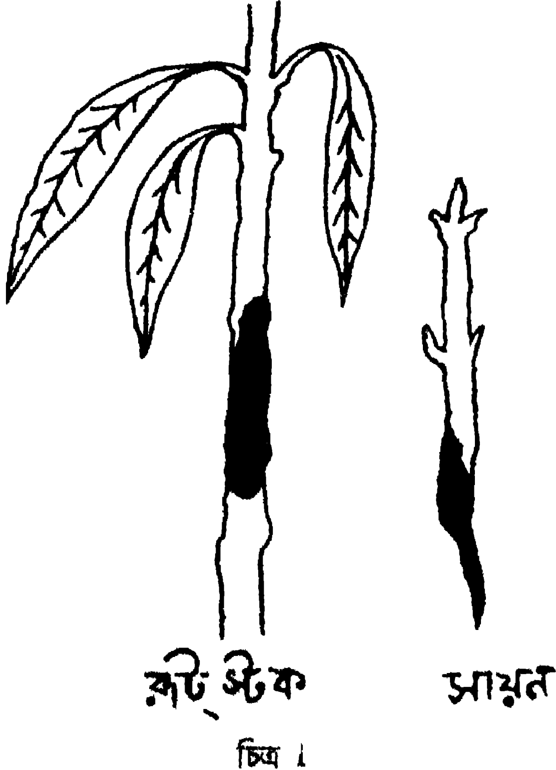
এদিকে যখন মানহাট্টান প্রজেক্টে গোপনে পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্যে চলেছে অদম্য প্রয়াস, তখন আমেরিকা সরকার এই সকল বিজ্ঞানীদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন জার্মানীতে কোন্ কোন্ বিজ্ঞানী ইচ্ছা করলে পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারবেন। তার উত্তরে বিজ্ঞানীরা প্রথমেই নাম করেছিলেন—বৃদ্ধ অটো হান এবং তরুণ হাইজেনবার্গের। কিন্তু হায় অদৃষ্টের পরিহাস! এহেন বিজ্ঞানীরা স্বদেশে থাকতেও হিটলার পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারেন নি। ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হিটলার এই সকল সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানীদের করলেন অসম্মান এবং তাঁদের বাদ দিয়ে তৈরি করলেন তাঁর যুদ্ধ চলাকালীন শক্তি কমিশন। তা না হলে এই বৃদ্ধ অটো হান এবং তরুণ হাইজেনবার্গ হয়ত জার্মানীর প্রতি মমতাবশত হিটলারের হাতে তুলে দিতেন পারমাণবিক বোমা—আর পৃথিবীর মানুষ ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখত এক বিপুল মারণ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

প্রয়োজন-ভিত্তিক বিজ্ঞান

একই গাছে বিভিন্ন আকার ও স্বাদযুক্ত আম

সাধারণত দেখা যায় কোন আম গাছে, কিংবা কোন লিচু গাছে অথবা কোন লেবু গাছে একই আকারের এবং একই স্বাদযুক্ত ফল হয়ে থাকে। কিন্তু উদ্যানবিদ্যার (horticulture) অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে একই গাছে বিভিন্ন আকার (size) ও স্বাদযুক্ত (taste) একই প্রজাতির কিন্তু বিভিন্ন গুণসম্পন্ন (variety) ফল ফলানো সম্ভব হয়েছে।

মনে করা যাক্—কারও বাড়িতে অথবা ফল বাগানে (orchard) একটি আমগাছের আম টক অথবা আমগুলি মিষ্টি হওয়া সত্ত্বেও খুব ছোট।



চিত্র 1

ঐ বাগানের মালিকের কাছে গাছটি অপ্রয়োজনীয়। কিংবা কেউ হয়তো মনে করেন—তাঁর আমগাছটিতে তিনি বিভিন্ন ধরণের (variety) আম ফলাবেন।

ধরা যাক্ মিষ্টার 'ক'-এর বাগানে যে আমগাছটি আছে তার আম খুব টক। এখন মি 'ক' ঐ গাছটিকে কেটে না ফেলে, ঐ গাছেই ল্যাংড়া, ফজলি, বোম্বাই, দশেরা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির খুব ভাল শ্রেণীর আম ফলাতে পারেন। এখন দেখা যাক্ তা কি করে সম্ভব হয়?

এই ধরণের গাছ পেতে হলে যে পদ্ধতিতে কাজটি সম্পন্ন করা হয় তাকে বলা হয় টপ ওয়ার্কিং—যাতে মূলত গ্রাফটিং (এক ধরনের কলম করা) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমে গ্রাফটিং পদ্ধতিটি আলোচনা করা যাক্।



চিত্র 2

জোড় কলম বা গ্রাফটিং পদ্ধতি—একটি বাঞ্ছিত ধরণের (desired variety) গাছের শাখার অগ্রভাগ থেকে 16-17 সে মি লম্বা এবং 1-2 সে মি. চওড়া ডাল কেটে নিয়ে অন্য যে কোন

একই প্রজাতির প্রায় সমান চওড়া একটি গাছের ডালের ছাল সামান্য ছাড়িয়ে (যাতে গাছটির অন্যান্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়) ঐ জায়গায় বসিয়ে বেঁধে দিতে হয়। তারপর কিছুদিন পর দেখা যাবে, ডাল দুটি জোড়া লেগে গেছে এবং তখন বাঞ্ছিত গাছের ডালটি রেখে মূল গাছটির ডাল কেটে দিতে হয়। এই পদ্ধতিতে বাঞ্ছিত গাছের ডালটিকে বলে সায়ন **(scion)** এবং মূল গাছটিকে



চিত্র 3

বলা হয় রুট-স্টক **(root-stock)**। রুট-স্টক মাটি থেকে রস শোষণ করে। ক্রমশ সায়নটির বৃদ্ধি ঘটে এবং যথাসময়ে বাঞ্ছিত ধরণের ফুল, ফল জন্মায়। চিত্র **1, 2, 3, 4** ও **5** লক্ষ্য করলেই পদ্ধতিটি বোঝা যাবে।

উপরিউক্ত মূল পদ্ধতিটি অনুসরণ করে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে একই গাছে বিভিন্ন ধরনের আম ফলানো যেতে পারে যাদের স্বাদ বিভিন্ন।

মনে করা যাক কোন গাছে টক আম হয়। এখন ঐ গাছে দুই-তিন ধরনের আম ফলাতে হবে। প্রথমে পছন্দমত গাছটির কয়েকটি ডাল কেটে নেওয়া হল, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে একটি ডালকে রেখে দিতেই হবে যাতে গাছের খাদ্য প্রস্তুতিতে



চিত্র 4

অসুবিধা না হয় এবং পদ্ধতিটি সফল হলে তখন ঐ ডালটিকে কেটে দিতে হয়।



এবার প্রতিটি কাটা ডালের পরিমাণ মত ছাল ছাড়ানো হল। তারপর বিভিন্ন সায়ন আলাদা আলাদা বেঁধে দেওয়া হল। অনেক সময় একই রকমের একাধিক সায়ন লাগানো হয়ে থাকে। কেননা কখন কখন বিভিন্ন কারণবশত সায়নটি মারা যেতে পারে। এভাবে সায়ন বাঁধা হয়ে গেলে কাটা ডালের উন্মুক্ত জায়গাটি একটি মিশ্রণ দিয়ে

ঢেকে দিতে হয় (মিশ্রণটিতে মোম, রজন ও নারকেল তেল থাকে) যাতে ঐ জায়গাটিতে জল পড়ে পচে না যায় অথবা কোন জীবাণু আক্রমণ না করে। 15/20 দিন পর দেখা যাবে—বিভিন্ন সায়নে দু-চারটি পাতা বেরিয়েছে এবং তখন বাঁধন খুললে দেখা যাবে, বিভিন্ন সায়ন জোড়া লেগে গেছে অর্থাৎ মূল গাছের কেম্বিয়াম, জাইলেম, ফ্লোয়েম ইত্যাদির (যার ভিতর দিয়ে খাদ্য ও খাদ্যরস চলাচল করে) সঙ্গে মিশে গেছে। যখন বিভিন্ন সায়নে ভাল বৃদ্ধি ঘটবে, তখন মূল গাছের ঐ ডালটিকে কেটে দেওয়া হয় এবং কাটা জায়গায় মিশ্রণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এখন শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে—সায়ন ছাড়া অন্য কোন শাখা-প্রশাখা যেন গাছটি থেকে বৃদ্ধি না পায়। যদি মূল গাছ থেকে অন্য কোন শাখার উৎপত্তি হয় তবে তা কেটে দিতে হবে।



চিত্র 6

খারাপ স্বাদযুক্ত আমগাছে ভাল স্বাদের আম ফলাবার সময় যে বিশেষ ধরণের কলম বাঁধা হয় (টপ ওয়ার্কিং পদ্ধতি), তখন কাণ্ডকে ঠাণ্ডা বা গরম থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেক সময় তার চারদিক চট বা খড় দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে দেওয়া হয় (চিত্র 6)। এভাবে যে গাছ তৈরি হয়, তা লম্বায় সাধারণ গাছের মত লম্বা হয় না, বরং তা ছোট ছোট অনেক ডালপালাযুক্ত ঝামড়া-ঝুমড়ি গাছ হয়ে থাকে চিত্র 7-এ এমন একটি আম গাছ দেখানো হয়েছে।



গাছটির পূর্ণ বৃদ্ধির পর তিন-চার বছর পরে দেখা যাবে—যে কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের সায়ন নেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেই ধরণের বিভিন্ন আম বিভিন্ন ডালে হচ্ছে এবং মূল গাছটির কোন ডাল না থাকায় সেখানে কোন টক্ আম ফলবে না। এখন কেউ যদি টক্ আমটিও চান তবে মূল গাছের একটি ডাল রেখে দিলে একই সঙ্গে টক্ আমও পাওয়া যাবে।

এ পদ্ধতি যে কেউ প্রয়োগ করে দেখতে পারেন।

প্রণবকুমার সাহা*

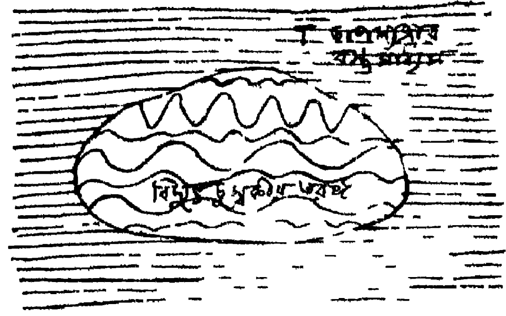
*উদ্যানবিদ্যা বিভাগ, বালীগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 019

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মরণে

সুনীলকুমার সিংহ*

1894 খৃষ্টাব্দের 1লা জানুয়ারী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন। এই জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে আমরা প্রতি বছরই তার জীবনের কোন একটি দিক বা তার কোন বৈজ্ঞানিক কাজের আলোচনা করবার সুযোগ পাই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ হয় নি, কিন্তু ছাত্র হিসাবে তার অধ্যাপনা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি আমাদের এম এস সি ক্লাসে 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' সম্পর্কে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। আপেক্ষিকতাবাদের মূল কথা তিনি অতি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেন। এ ব্যাপারে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার বিশেষত্ব ছিল, তিনি বিষয়টির ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করেই কিভাবে ধাপে ধাপে আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বটি ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠে, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আরও কিছু বক্তৃতা আমরা শুনেছিলাম। 'অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা স্মৃতি বক্তৃতা'য় তিনি বাংলা ভাষায় পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা স্মরণযোগ্য। তাছাড়া, সাহা ইনষ্টিটিউটের বক্তৃতা কক্ষে অধ্যাপক টাম-এর বক্তৃতা শেষে অধ্যাপক বসুর আলোচনা, যাঁরা সেই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে।

অধ্যাপক বসুর যে কাজটি তাঁকে আধুনিক কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিক্স্-এর ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন করে দিয়েছে, সেই কাজ সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণে শক্তি বণ্টনের যে নিয়ম বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক আবিষ্কার করেন, তার একটি চমকপ্রদ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 1924 খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বসু প্রকাশ করেন। ধরা যাক, কোন একটি আবদ্ধ স্থানে শূন্য থেকে শুরু করে অসীম কম্পাংকের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ আবদ্ধ আছে (চিত্র 1)। আবদ্ধ স্থানের বাইরে



চিত্র 1 T তাপমাত্রায় কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের বস্তুমাধ্যমের সঙ্গে সাম্যাবস্থা

বস্তুমাধ্যমের তাপমাত্রা T, এবং আবদ্ধ স্থানের সীমাতলে বস্তুটির ধর্ম এমনিই যে তা সব কম্পাংকের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকেই শোষণ এবং বিকীর্ণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ আবদ্ধ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সমাহারকে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বলে কল্পনা করা যায়। এর আগে প্লাঙ্ক এবং আইনষ্টাইন প্রমাণ করেছিলেন, কোন বস্তুরদ্বারা শোষিত কিম্বা বিকীর্ণ হবার সময় বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের কণিকারূপ প্রকাশ পায় এবং এই কণিকাদেরই আলোক কণিকা বা ফোটন নাম দেওয়া হয়। অধ্যাপক বসু কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণকে আলোক কণিকার সমাহার বলে কল্পনা করেন। ν কম্পাংকবিশিষ্ট আলোক কণিকার শক্তির পরিমাণ $h\nu$; সুতরাং ν এবং $\nu+d\nu$ কম্পাংকের মধ্যে $N_\nu d\nu$ সংখ্যক আলোক কণিকা থাকলে ঐ কৃষ্ণবস্তু

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

বিকিরণের মোট শক্তি হবে—

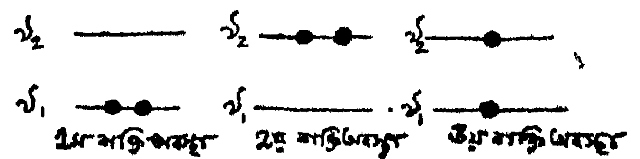
$$\Sigma h\nu \times N_{\nu} d\nu = E \qquad (1)$$

এর আগে প্ল্যাঙ্কের সূত্র বিশ্লেষণের জন্যে আলোকের তরঙ্গধর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তি যে চেষ্টা করেছিলেন, তার কোনটিই সফল হয় নি। আলোকের কণিকারূপ ব্যবহার করে প্ল্যাঙ্ক সূত্র বিশ্লেষণে অধ্যাপক বসুর প্রচেষ্টা তাই অভিনব। তাছাড়া, মোট শক্তিকে সূত্র (1) অনুযায়ী লেখার মধ্যে পরবর্তীকালের 'অক্যুপেসান নাম্বার' উপস্থাপনার (**representation**) ইঙ্গিত আছে। বর্তমানের আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে N_{ν}-কে $h\nu$ পরিমাণের ফোটনিক শক্তিস্তরের অক্যুপেসান নাম্বার বলে ধরা যায়।

আলোক কণিকা আবদ্ধ স্থানের সীমাতলে বারংবার শোষিত এবং তা থেকে বিকীর্ণ হয়ে ঐ সীমাতলের সঙ্গে T-তাপমাত্রায় একটি পরিসাংখ্যনিক সাম্যাবস্থায় এসেছে বলে ধরা যায়। বিজ্ঞানী বোল্টজ্‌মান্‌ এই ধরণের সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্যে একটি তাত্ত্বিক অনুমান প্রস্তাব করেছিলেন। সেই অনুসারে মোট শক্তি একই রেখে ফোটন সমাহারের পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতার লগারিদ্‌ম যখন সবচেয়ে বেশি হবে, তখনই ঐ সাম্যাবস্থা এসেছে বলে ধরা যাবে। ফোটন সমাহারের পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতা বলতে ঠিক কি বুঝায়, এবং কিভাবে এটি বিশ্লেষণ করা যায়, সেই প্রশ্নের সমাধান প্রথমে প্রয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু যেভাবে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করেন তার বর্ণনা দেওয়া যায় এইভাবে: $h\nu$ এবং $h(\nu+d\nu)$ শক্তির মধ্যে কতগুলি ফোটনিক শক্তিস্তর সম্ভব, প্রথমে তা স্থির করা হল। পরে $N_{\nu}d\nu$ সংখ্যক ফোটনকে ঐ সমস্ত বিভিন্ন শক্তিস্তরে বণ্টন করে দেখা হল, এই বণ্টনের ফলে $N_{\nu}d\nu$ ফোটন সমাহারের কতগুলি বিভিন্ন শক্তি অবস্থা সম্ভব। এই রকম বিভিন্ন শক্তি অবস্থার সংখ্যাই $N_{\nu}d\nu$ ফোটন সমাহারের পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতা। ν-এর মান শূন্য থেকে শুরু করে অসীম পর্যন্ত হতে পারে, এবং এই কম্পাংক বিস্তারের মধ্যে প্রত্যেক কম্পাংকের কাছাকাছি $d\nu$ বিস্তারের মধ্যে ফোটন সমাহারের পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতা অনুরূপভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। পরে, এই সব সম্ভাব্যতার গুণফলই আবদ্ধ স্থানের ফোটন সমাহারের মোট পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতা হবে। অর্থাৎ এই পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতাকে P দ্বারা সূচিত করলে,

$$P = \prod_{\nu} \qquad \cdots \qquad \cdots (2)$$

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে P_{ν} গণনা করার সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফোটন কণিকার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখেন। একটি ফোটন কণিকাকে অপর একটি ফোটন কণিকা থেকে পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় শুধু তাদের শক্তির পরিমাণ দেখে, আর কোন উপায়ে নয়। অর্থাৎ, যদি দুটি ফোটন কণিকাকে দুটি শক্তি-স্তরে বণ্টন করা যায়, তবে ঐ ফোটন সমাহারের মাত্র তিনটি বিভিন্ন শক্তি অবস্থা পাওয়া যাবে। প্রথম শক্তি অবস্থায় দুটি ফোটনই একটি শক্তি স্তরে থাকবে, দ্বিতীয় শক্তি অবস্থায় দুটি ফোটনই দ্বিতীয় শক্তি স্তরে থাকবে, এবং তৃতীয় অবস্থায় একটি করে ফোটন একটি শক্তিস্তরে থাকবে (চিত্র 2)। তৃতীয় শক্তি অবস্থায়



চিত্র 2 দুটি ফোটন দুটি শক্তিস্তরে বণ্টন হওয়ার ফলে ফোটন দুটির তিনটি বিভিন্ন শক্তি অবস্থা

ফোটন দুটিকে তাদের শক্তিস্তরে একটির স্থলে অপরটিকে পুনস্থাপিত করা হলে ফোটন সমাহারের কোন নতুন শক্তি অবস্থা পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন ফোটন উপরিউক্ত অর্থে অভিন্ন না হলে চতুর্থ একটি শক্তিঅবস্থা পাওয়া যেত যেখানে তৃতীয় শক্তি অবস্থার বিভিন্ন ফোটন শক্তিস্তরে একটির স্থলে অপরটি পুনস্থাপিত। সেক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শক্তি অবস্থায়

মোট শক্তি একই হত, কিন্তু তারা ফোটন সমাহারের দুটি বিভিন্ন শক্তি অবস্থা সূচিত করতো। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে, যদি আমরা কল্পনা করি, ফোটন দুটির মধ্যে একটির রঙ কালো, অপরটির রঙ সাদা। তাহলে, সাদা ফোটন ν_1 শক্তিস্তরে এবং কালো ফোটন ν_2 শক্তিস্তরে থেকে যে শক্তি অবস্থার সৃষ্টি করতো, কালো ফোটন ν_1 শক্তিস্তরে এবং সাদা ফোটন ν_2 শক্তিস্তর থেকে অন্য একটি শক্তি অবস্থার সৃষ্টি করতো—যদিও তাদের মোট শক্তি একই। ফোটন দুটি রঙের দ্বারা বিশেষিত হলে ঐ দুটি শক্তি অবস্থাকে একই শক্তির দুটি বিভিন্ন অবস্থা বলে সহজেই ধরা যেত। ফোটনের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়, এবং এই অর্থেই বিভিন্ন ফোটন অভিন্ন। ফোটন কণিকার এই প্রকার অভিন্নতার কথা মনে রেখে $N_\nu d\nu$ বা n_ν সংখ্যক ফোটনকে $A_\nu d\nu$ বা a_ν ফোটন শক্তিস্তরে যতভাবে সম্ভব বণ্টন করে সত্যেন্দ্রনাথ বসু P_ν-এর নিম্নোক্ত সূত্রটি পান,

$$P_\nu = \frac{(a_\nu + n_\nu - 1)!}{(a_\nu - 1)!\,(n_\nu)!} \simeq \frac{(a_\nu + n_\nu)!}{(a_\nu)!\,(n_\nu)!},\ a_\nu >> 1 \quad \cdots 3$$

উপরিউক্ত গণনার সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু একটি ফোটন শক্তিস্তরে 0 থেকে শুরু করে n_ν পর্যন্ত সকল সংখ্যার ফোটনই থাকতে পারে, সেটাও ধরে নিয়েছিলেন।

বিভিন্ন কম্পাংক ν-এর জন্যে P_ν-এর মান বিভিন্ন হবে, কারণ বিভিন্ন কম্পাংকে a_ν-এর পরিমাণ বিভিন্ন। A_ν-কে ν কম্পাংকে ফোটন শক্তিস্তরের ঘনত্ব **(density of states)** বলা যায়। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতার গণনা পদ্ধতিতে ফোটন শক্তিস্তরের ঘনত্ব গণনা অপরিহার্য। বস্তুত, পরবর্তীকালে গিব্‌স্ পদ্ধতি অনুসরণ করে যে আধুনিক কোয়াণ্টাম স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ গড়ে উঠেছে, তাতে N_ν-এর পরিসাংখ্যনিক গড় গণনায় বিভিন্ন কণিকার শক্তিস্তরের ঘনত্ব গণনা অপরিহার্য নয়। কোন কণিকা সমাহারের সাম্যাবস্থায় শক্তিবণ্টনের গণনায় উপরিউক্ত ঘনত্বের পরিমাণ জানা প্রয়োজন, কিন্তু N_ν বা অক্যুপেসান নাম্বারের পরিসাংখ্যনিক গড় ও কণিকার শক্তিস্তরের ঘনত্ব আলাদাভাবে গণনা করা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু উপরিউক্ত গণনায় ফোটন শক্তিস্তরের ঘনত্ব বিশ্লেষণেও অভিনবত্ব প্রদর্শন করেন। তখনকার দিনের কোয়াণ্টাম তত্ত্বের 'একক ফেজ্ ভ্যলুম' (যার পরিমাণ h^3) ধারণাটি ব্যবহার করে আলোকের কণিকাধর্মের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি। তৎকালীন পদার্থ-বিজ্ঞানের পটভূমিকায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ফোটনজাতীয় অভিন্ন কণিকা সমাহারের তাপ-সাম্য অবস্থায় পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিই বসু-সংখ্যায়নের বৈশিষ্ট্য। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(i) দুটি ফোটন শক্তিস্তরের মধ্যে একজোড়া ফোটনকে একের স্থলে অপরটিকে পুনস্থাপিত করলে, ঐ ফোটন সমাহারের নতুন কোন শক্তি অবস্থা পাওয়া যায় না; এবং (ii) যে কোন ফোটন শক্তিস্তরে শূন্য থেকে শুরু করে একাধিক ফোটন থাকতে পারে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে যে পরিসাংখ্যনিক সম্ভাব্যতা গণনা করা হয়, তাই-ই বসু-সংখ্যায়ন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপরিউক্ত কাজটিকে আইনস্টাইন আরও পরিবর্ধিত করেন এবং ফোটন ছাড়াও অন্য কণিকার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। এই পরিবর্ধিত বসু সংখ্যায়নকে বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন বলে অভিহিত করা হয়।

বসু-আইনস্টাইনের এই বিশ্লেষণের ফল হিসাবে উল্লেখ করা যায়, কোয়ান্টাম তত্ত্বের কতগুলি মূল ধারণা, যেমন—আলোকের কণিকাধর্ম, বস্তুমাধ্যমে আলোকের শোষণ ও বস্তুর আলোক বিকিরণের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। তাছাড়া, এই কাজটিতেই কোয়াণ্টাম্ স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিক্‌সের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয়। এর অব্যবহিত পরেই ফের্মি

ডিরাকের সংখ্যায়ন প্রবর্তিত হয়, ফলে অভিন্ন কণিকা সমাহারের কোয়ান্টাম তত্ত্ব তাৎক্ষণিক গুরুত্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। পাউলি প্রমুখ বিজ্ঞানীর এই সংক্রান্ত গবেষণার ধারা এই কাজটির দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই কাজটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্মরণ করেই যে সব কণিকা বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন মেনে চলে, তাদের 'বোসন' নামকরণ করা হয়েছে।

এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূত্র ধরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরবর্তীকালে আর কিছু কি করেছেন? না, তিনি এই সংক্রান্ত আর কোন কাজ করেন নি। এর কারণ কি? এ বিষয়ে কতকগুলি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। 1927 খৃষ্টাব্দ থেকেই আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে ভাবে গড়ে উঠতে থাকে, তাতে বিশেষ করে আইনস্টাইন কিছুটা বিরুদ্ধ সমালোচকের ভূমিকায় নেমে পড়েন। তাহলে, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতি মনোযোগ কি আইনস্টাইনের ভূমিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? অধ্যাপক বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা এবং ছাত্ররা এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন। তাছাড়া, গিব্‌সের গবেষণা (যা বহুকাল সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নি) এই সময়েই প্রচারিত হতে শুরু করে। লান্দাউ প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণা গিব্‌সের পদ্ধতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপর এই ঘটনার কি ধরণের প্রভাব পড়েছিল? বলা যায়, যখন কোন আবিষ্কার প্রথম ধাপেই আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগায়, তখন বহু দেশের বহু বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী সেই কাজের সূত্র ধরে আরও গভীরতর গবেষণায় এগিয়ে যান। সেক্ষেত্রে একজন তরুণ বিজ্ঞানীর পক্ষে সমান তালে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভবই। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মস্‌বাওয়ারের নাম উল্লেখ করা যায়।

আরও একটি কথা উল্লেখ করে এই আলোচনা আপাতত শেষ করতে চাই। কোন একটি বৈজ্ঞানিক কাজের মূল্যায়ন হয় সেটির ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব দেখে। কিন্তু কোন একজন বিজ্ঞানীর মূল্যায়ন হবে ঐ বিজ্ঞানীর সমকালীন পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে। সেই হিসাবে, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপরিউক্ত কাজের মাধ্যমে তাঁর বিজ্ঞানী মনের সংবেদনশীলতা, গাণিতিক যুক্তি-নির্ভরতা এবং বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি তীব্র আকর্ষণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী 22শে জানুয়ারী, 1978, রবিবার বৈকাল 5 ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবন'-এ পরিষদের পক্ষ থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞানাচার্যের ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণা করবেন।

পরিষদের সভ্য/সভ্যা ও বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানাই।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অধ্যাপক বসু সম্পর্কে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণা*

24শে ডিসেম্বর, 1977 সন্ধ্যা পাঁচটা কিংবা সাড়ে পাঁচটা। 41নং হরিশ নিয়োগী রোডের দু'তলা বাড়ির নিচে-তলায় একটি ঘরে লেপ-মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে আছেন প্রথিতযশা লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাদের নাম বলতেই ঘরে ঢুকে বসতে বললেন।

বয়স আশি বছর। ঘরে প্রাচুর্যের কোন ছাপ নেই। অনাড়ম্বর পরিবেশ। ঋজু দেহ বয়সের ভারে কিছুটা ন্যুব্জ ও প্রায় শয্যাশায়ী। হাঁটাচলা করতে অক্ষম। কথাও কিছুটা অস্পষ্ট।

বিগত প্রায় ষাট বছর ধরে তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানান বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও ফিচার সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করে আসছেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও তার সুষ্ঠু পরিবেশনে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য শিরোনাম। এ ব্যাপারে যেমন সর্বজনপ্রিয়, অন্যদিকে তিনি ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একজন নিরলস গবেষক। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর সহকর্মী। দেশী-বিদেশী বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভাষায় প্রকাশিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ ও ফিচারের সংখ্যা পাঁচশোর কম নয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার (1948) বহু আগে থেকেই তিনি মাতৃভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ করে আসছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সাময়িকীতে। যেকালে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ ও ফিচার লেখক হিসাবে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ, তখন আরও যাঁরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপরে লিখতেন—তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যেত; তখনও বেশির ভাগ লোকের কাছেই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা হাসির খোরাক যোগাত।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উপযোগিতা ও এ সম্পর্কীয় উপযুক্ত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় তাঁর তরুণ বয়স থেকেই উপলব্ধি করেন। এই বৈপ্লবিক চেতনা ও উপলব্ধি থেকেই তাঁরই প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা এবং নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক শিক্ষাবিদ্ ও বিজ্ঞানানুরাগীদের নিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়—1948 সালে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল—পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ। কয়েক মাস পর থেকেই এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল প্রধানত শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপর। তখন লেখকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। কাজেকাজেই সম্পাদককে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর নিয়মিত লিখে পত্রিকাটিকে সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করতে হত। প্রধানত সেই তাগিদেই পরবর্তীকালে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন নানান বিষয়বস্তুর উপর প্রবন্ধ ও ফিচার। এসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'করে-দেখ', যা পরে (1953-56) পুস্তকাকারে—'করে দেখ'—এই নামে দু'খণ্ডে পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়া পরিষদের অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গেও তিনি ছিলেন খুবই সক্রিয়ভাবে যুক্ত। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে অধ্যাপক বসুর তিরোভাবের আগে পর্যন্ত পরিষদ সম্পর্কীয় অধ্যাপক বসুর বিভিন্ন চিন্তা এবং তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

*শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে শ্রীরতনমোহন খাঁ ও শ্রীশ্যামসুন্দর দে-র এক বিশেষ সাক্ষাৎকার থেকে গ্রথিত।

অধ্যাপক বসু আজ আমাদের মধ্যে নেই। 1লা জানুয়ারী তাঁর জন্মদিন। তাই তাঁর পুণ্য জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর সম্পর্কে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণা খুবই প্রাসঙ্গিক। এরই মাধ্যমে স্বর্গত-বিজ্ঞানাচার্যকে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শারীরিক অবস্থা দেখে বোঝা গেল, নিয়মমাফিক বাক্যালাপ করবার ততটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে না। যাই হোক, নানা বিষয়ে আলোচনা হল। বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের অধ্যাপক বসু সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হয় সংক্ষেপে তা এখানে বলা হবে :

প্রশ্ন : 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার আবির্ভাবের পটভূমিকা কি? 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নামকরণের ইতিহাস একটু বলুন।

উত্তর : জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সহজ ও সরলভাবে প্রচার ও প্রসার করার জন্যে দেশ-বিদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন, লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবস্থা যে খুব কার্যকর, তা সকলেই জানেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম একটি পন্থা অর্থাৎ বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রিকা 'বিজ্ঞান-পরিচয়' ঢাকা থেকে অধ্যাপক বসুর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হচ্ছিল। উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন—সম্ভবত 1945 সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবার পর থেকে অধ্যাপক বসু বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে 'বিজ্ঞান পরিচয়' পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশের জন্যে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থির হল, শুধু বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশই নয়—দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারকল্পে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ—এই নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবে। 1947 সালের 18ই অক্টোবর বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং স্থির হয়, 1948 সালের 25শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত এবং এর মুখপত্র হিসাবে মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশিত হবে। সভায় পত্রিকার নামকরণ নিয়ে নানারকম আলোচনা হয় শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক বসুর প্রস্তাব অনুযায়ী পত্রিকার নাম দেওয়া হয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'।

প্রশ্ন : জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যান্য কর্মসূচী কি ছিল?

উত্তর : 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিষদ বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, লোকরঞ্জক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করে।

প্রশ্ন : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা কি অধ্যাপক বসুর স্বতন্ত্র চিন্তা না সামগ্রিক চিন্তার ফল?

উত্তর : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে স্থাপিত হয়েছিল আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট এবং তা খুবই বৈপ্লবিক। জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রসার ও প্রচার সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর চিন্তাধারা থাকলেও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিদেরও সামগ্রিক প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের মূলে অধ্যাপক বসুর প্রেরণা, উৎসাহ ও প্রচেষ্টাই ছিল প্রধান সহায়ক।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে পড়ে কোন্ কোন ব্যক্তি প্রথম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের উদ্যোগী হয়েছিলেন?

উত্তর : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অধ্যাপক বসু ছাড়াও শ্রীসুবোধনাথ বাগচী ছিলেন একজন উৎসাহী ব্যক্তি এবং তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম কর্মসচিব হন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের জন্যে জনসাধারণের সাহায্য ও

সহযোগিতা কামনা করে প্রথম যে আবেদনপত্রটি প্রচারিত হয় তাতে স্বাক্ষরকারী হিসাবে নাম ছিল— সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুবোধনাথ বাগচী, জগন্নাথ গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, সর্বাণীসহায় গুহসরকার, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরিমল গোস্বামী, অমিয়কুমার ঘোষ, সুধাময় মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের।

প্রশ্ন : বিজ্ঞান পরিষদ জনসাধারণের কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল ?

উত্তর : কি বিজ্ঞানী কি সাহিত্যিক, কি ঐতিহাসিক সকলের কাছেই অধ্যাপক বসু খুব প্রিয় ছিলেন, কাজে কাজেই যেখানে অধ্যাপক বসুই প্রধান প্রেরণাদাতা এবং হোতা, সেক্ষেত্রে পরিষদের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে রূপদান করবার জন্যে সমাজের সর্বস্তর থেকেই একটা ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তবে সমাজের বিভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচী সীমিত থাকায় সাধারণভাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রচারও ছিল সীমাবদ্ধ।

প্রশ্ন : পরিষদ প্রতিষ্ঠার দু-এক বছরের মধ্যে পরিষদ জনসাধারণের মধ্যে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল ?

উত্তর : একমাত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করাই ছিল তখন পরিষদের মুখ্য কাজ। এছাড়া অবশ্য মাঝে মাঝে বক্তৃতা ও আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হত। তাতে যাঁরা যোগদান করতেন তাঁরা অনেকে অধ্যাপক বসুর ছাত্র, বন্ধু এবং বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং পরিষদ সদস্য। আমাদের দেশে একটি বিজ্ঞানের সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ—তখন খুব কঠিন ছিল বলা চলে। এর আগেও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলির ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে—তা খুব নিয়মিত প্রকাশিত হত না এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নানা কারণে। যাই হোক, সেই সময় বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও ফিচার একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় যেভাবে প্রকাশিত হত তা খুবই অভিনব, এবং সমাজের একশ্রেণীর লোকের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

প্রশ্ন : মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়া লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ, জনপ্রিয় বক্তৃতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী প্রভৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর অভিমত কি ছিল এবং কোন্ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসার করা সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর বলে অধ্যাপক বসু মনে করতেন ?

উত্তর : জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে এজাতীয় সমস্ত পদ্ধতির উপরই অধ্যাপক বসু গুরুত্ব দিতেন। তবে তিনি মনে করতেন—এদেশে খুব কম লোকই শিক্ষিত তার উপর বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও কম। তাই সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে হাতে-কলমে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, প্রভৃতির উপর তিনি জোর দিতেন।

প্রশ্ন : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করতো তা কি অধ্যাপক বসুর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত না সমবেত প্রচেষ্টার ফল ?

উত্তর : বিজ্ঞানের জ্ঞান ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ কৌশল সাধারণ লোকও যাতে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারে এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হত। অধ্যাপক বসুর এসম্পর্কীয় চিন্তা বহুদিনের তবে আমার মনে হয়—এককভাবে দেখলে বেশির ভাগ কর্মসূচীই অধ্যাপক বসুর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত।

প্রশ্ন : বড় বড় মনীষীদের প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর অভিমত কি ছিল।

উত্তর : 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আবির্ভাবের পর কোন কোন সময়ে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধ খুব বেশি পাওয়া যেত না। অধ্যাপক বসু বিভিন্ন ব্যক্তিকে

তাগিদ দিয়ে প্রবন্ধ লেখাতেন। বিদেশী পত্রিকায় বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জনপ্রিয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এই সব প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, নতুন আবিষ্কার যথোপযুক্ত অনুবাদ করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে তিনি বলতেন। কিন্তু নানা অসুবিধার ফলে অনূদিত প্রবন্ধ খুব বেশি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। একবার একটি মেয়েকে অধ্যাপক বসু আইনষ্টাইনের লেখা একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন—জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে। কিন্তু সে মেয়েটি কিছুদিন যাতায়াত করে শেষ পর্যন্ত আসাই ছেড়ে দিল। অনুবাদও হল না।

প্রশ্ন: 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর অভিমত কি ছিল।

উত্তর: কিশোর মনে বিজ্ঞান মানসিকতা উন্মেষের জন্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় এই অংশটি অবশ্যই থাকা উচিত বলে তাঁর অভিমত ছিল। 1948 সালের জুন সংখ্যা থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' 'ছোটদের পাতা' নামে একটি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। 1950 সালের জানুয়ারী সংখ্যা থেকে বিভাগটির নাম হয় কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর। অধ্যাপক বসু 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ছোটদের পাতায় লেখবার জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদের প্রায়ই বলতেন।

প্রশ্ন: 'করে দেখ' ফিচার কবে থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবর্তিত হল এবং মডেল তৈরির মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর অভিমত কি ছিল?

উত্তর: 1948 সালের জুন সংখ্যা থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ছোটদের পাতায় 'করে দেখ' ফিচার প্রকাশিত হতে থাকে। মডেল তৈরির মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রতি কিশোর-কিশোরীদের আকৃষ্ট করা, বিজ্ঞান প্রচার এবং সেই মডেল যদি সাধারণ মানুষের প্রায়োগিক জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী হয়—তাহলে সেটাই হবে এদেশের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা যার মাধ্যমে পরিষদের উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপায়িত হবে।

প্রশ্ন: আপনার রচিত 'করে দেখ'—কবে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এই ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

উত্তর: আমার রচিত 'করে দেখ'—প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 1953 সালে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়—1956 এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় 1977। এই ব্যাপারে আমি সকলের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি। বিশেষ করে অধ্যাপক বসুর অনুপ্রেরণা আমার কাছে উৎসাহজনক ছিল। 'করে দেখ' নামটি অধ্যাপক বসুরই দেওয়া।

প্রশ্ন: আপনি বললেন—"আপনার তৈরি কয়েকটি মডেল দেখে অধ্যাপক বসু খুবই উৎসাহিত হতেন"। 'করে দেখ' অর্থাৎ মডেল তৈরির পিছনে অধ্যাপক বসুর প্রেরণা কি আপনার প্রধান উৎস ছিল?

উত্তর: 'করে দেখ' শিরোনামায় যেসব মডেল তৈরির কথা লিখতাম—তার কিছু কিছু আমি নিজে তৈরি করে অধ্যাপক বসুকে দেখাতাম। মডেলগুলি দেখে তিনি উৎসাহিত হতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে পত্রিকার প্রবন্ধাদি এবং 'করে দেখ' লেখা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। ওঁর কাছ থেকে প্রেরণা না পেলে 'করে দেখ' ফিচার হয়ত লেখা সম্ভব হত না। এদিক থেকে অধ্যাপক বসুর অনুপ্রেরণা আমার কাছে ছিল খুবই মূল্যবান।

প্রশ্ন: বর্তমানে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'হাতে-কলমে' বিভাগে নিয়মিতভাবে যে মডেল তৈরির অনুশীলন হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

উত্তর: এটি খুব ভাল কাজ। এই রকম 'হাতে-কলমে' বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক দিন পূর্বে অধ্যাপক বসুর পরিকল্পনা ছিল। বিস্তৃত জায়গার অভাবে তা করা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞান

পরিষদ নিজস্ব ভবনে চলে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যে 'হাতে-কলমে' বিভাগ প্রবর্তন করতে পেরেছো—এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। এখন তো বিজ্ঞানের যুগ—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'হাতে-কলমে' বিভাগে অনেক কঠিন কঠিন মডেল তৈরি করতে পারে জেনে ভাল লাগলো। তোমাদের এখানে অনেক মডেল তৈরি হচ্ছে এবং বহু শক্ত মডেল আধুনিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে—এটা খুব আশার ও আনন্দের কথা। এগুলির প্রয়োজন এখন যথেষ্ট। আরও দরকার—তোমরা যে সমস্ত মডেল তৈরি করছো এবং করবে বলে ভাবছো—সেগুলি যেন লোকের কাজে লাগে। তোমরা তো মাটি পরীক্ষার ট্রেনিং দেবার কথা ভাবছো—খুব ভাল হবে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান পরিষদকে সাধারণ লোকের প্রয়োজনে আনতে পারবে। এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যেসব প্রয়োজনভিত্তিক মডেল তৈরি করেছো—সেটাই সত্যিকারের কাজ। তবে জীবন-বিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন, বায়োকেমিষ্ট্রি প্রভৃতি বিষয়েও জোর দিও। এই বিভাগকে বড় করতে পারলে পরিষদের গৌরব বাড়বে তাড়াতাড়ি। তোমরা অনেক তরুণকে এখন সঙ্গে পেয়েছো খুব ভাল। অধ্যাপক বসুর স্বপ্নকে এভাবেই বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করো।

প্রশ্ন : 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় 'বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরে' যে নিয়মিতভাবে মডেল তৈরি প্রকাশিত হচ্ছে—তা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে বলে আপনার ধারণা?

উত্তর : মডেল তৈরি বিভাগে যা নিয়মিত ছাপা হচ্ছে—তা ভালই। আমার বয়স হয়েছে। আর তো ভাল করে লিখতে পারি না। যা হোক এখন অনেক লেখকই এই বিষয়ে লিখছে এটি আনন্দের বিষয়—আগে তো তা ছিল না। এখন মডেল তৈরির লেখাতে বিজ্ঞানের দিকটা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে—এটা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাজে আসবে বলে মনে করি। অনেক মডেলই এখন পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে—কাজেই এই বিষয়ে কারো জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল থাকলে তিনি পরিষদে এসে তা জানতে পারবেন।

প্রশ্ন : 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর অভিমত কি ছিল?

উত্তর : দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানের বিভিন্ন অগ্রগতির সংবাদ সহজ ও সরলভাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হলে অনেকেই সেই বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারবেন—তাই যাতে নিয়মিত এই সব সংবাদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে অধ্যাপক বসু খুবই আগ্রহী ছিলেন।

প্রশ্ন : লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশের উপযোগিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ খুব ভাল কাজ। সাধারণের উপযোগী করে বিশেষ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে কোন বিষয়বস্তুর উপর রচিত পুস্তক প্রকাশিত হলে অনেকেই তা পড়বার সুযোগ পাবেন এবং সে সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবেন—যা ভাষার জন্যে কিংবা উপযুক্ত ভাবে পরিবেশনের অভাবে সহজেই জানা বা আয়ত্ত করা সম্ভব হত না।

প্রশ্ন : পরিষদের গ্রন্থাগার বিভাগ কবে এবং কি উদ্দেশ্যে চালু হয় এবং কিভাবে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সংগৃহীত হত? বর্তমানে চালু পাঠ্যপুস্তক বিভাগ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : ঠিক গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায়—তা স্থানের অভাবে পরিষদের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। তবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এবং মিলন মন্দির ভবনে পরিষদের কার্যালয় থাকাকালীন কিছু কিছু পুস্তক সংগ্রহ করে ছোট একটি গ্রন্থাগার বিভাগ চালু হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে কিছু কিছু বই দান করতেন। অধ্যাপক বসুও

কিছু বই সংগ্রহ করে দিতেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমালোচনার জন্যে প্রাপ্ত পুস্তকও গ্রন্থাগারে জমা হত। বিদেশী দূতাবাস ইত্যাদি থেকে দু-একবার হয়তো কিছু বই পাওয়া গিয়েছিল। পুস্তক কেনা হত খুব কম। পরিষদের সদস্য এবং সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক পাঠের সুযোগ দানের জন্য গ্রন্থাগার বিভাগটি চালু হয়। এখন পরিষদের নিজস্ব বাড়ি হয়েছে—জায়গাও হয়েছে—সুতরাং পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু হয়ে খুব ভাল হয়েছে। যারা অর্থের জন্যে বই কিনতে পারবে না—তারা এখানে বসে পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। এটিকে আরও বড় করা দরকার। চেষ্টা করলেই সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় সঙ্গে যুক্ত হবার পূর্বে আপনি কি অন্য কোন পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন এবং যুক্ত থাকলে সেখানে কি কি বিষয় নিয়ে লিখতেন ?

উত্তর : হাঁ্যা। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটির জন্মের বহু আগে থেকেই আমি লিখতাম। কাজের লোক, সনাতন ও সংগঠনী নামক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ঐ সমস্ত পত্রিকায় সাধারণত বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতাম। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশিত হবার পূর্বে আমার বহু প্রবন্ধই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন : 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় এত প্রবন্ধ (বিভিন্ন বিষয়ে) এবং ফিচার আপনি লিখতেন—কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল ?

উত্তর : জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাল প্রকাশযোগ্য লেখা তখন বেশি পাওয়া যেত না। সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। কাজে কাজেই পত্রিকাকে নিয়মিতভাবে সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রবন্ধ ও ফিচার লিখতে হত। প্রয়োজন এবং চেষ্টা থাকলেই হয়।

প্রশ্ন : বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে যে একটি উপযুক্ত সংগঠনের প্রয়োজন এই সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর অভিমত কি ছিল এবং এই বিষয়ে আপনার নিজের অভিমত কি ?

উত্তর : জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কথা যে অধ্যাপক বসু স্বতঃই উপলব্ধি করতেন তাতো তোমাদের আগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেছি। আমিও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। একমত ছিল বলেইতো তাঁর সঙ্গে পরিষদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যুক্ত ছিলাম।

প্রশ্ন : অধ্যাপক বসু একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ইতিহাসে তিনি একজন বিরাট সংগঠক। এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর : পরিষদের বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচী তার প্রয়োজনীয়তা ও ফলাফল সম্পর্কে অধ্যাপক বসু যে মত পোষণ করতেন—এ সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাদের বললাম—তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয়—অধ্যাপক বসু ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংগঠক। প্রত্যেক বিজ্ঞানীরই একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে—যেহেতু তাঁরাও সমাজেরই অংশ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—বিজ্ঞানীরা সেদিকে নজর দেন না। অধ্যাপক বসু সেদিক থেকে ছিলেন ব্যতিক্রম। অধ্যাপক বসু ভাবতেন—সমাজ মানুষের সৃষ্টি। সমাজের কল্যাণে এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নে তথা দেশোন্নয়নের জন্যে দরকার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। বাস্তবভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা রচনায় বিজ্ঞানীদের সর্বাগ্রে অংশগ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তাই অধ্যাপক বসু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়া সত্বেও তিনি ছিলেন একজন বিরাট সংগঠক।

প্রায় দু-ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ভাবলাম আর বেশি বিরক্ত করা উচিত হবে না। তাই প্রণাম জানিয়ে উঠে পড়লাম।

অনেক কিছুই জানলাম—অধ্যাপক বসুর বিভিন্ন সাংগঠনিক চিন্তাধারা প্রসঙ্গে, যা হয়তো এত

বিশদভাবে জানা সম্ভব হত না। যে দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, তাতে স্বভাবতঃই মনে হল, আরো আলোচনা দরকার—পরিষদ সংক্রান্ত অন্যান্য বহু প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও প্রচারের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ইতিহাস জানবার তাগিদে এবং সর্বোপরি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক ইতিহাস আরও বিশদভাবে জানতে। এরই মাধ্যমে আরও পরিচয় পাওয়া যাবে—বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বৈপ্লবিক চেতনা ও বিভিন্ন চিন্তাধারার।

চিঠি-পত্র

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এর জানুয়ারী (1977) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অরুণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'কিছু স্মৃতি, কিছু শ্রুতি' নামে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। নিবন্ধটিতে লেখক আমার সঙ্গে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পত্রালাপের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণটি শ্রুতি হিসাবে চলে বটে; তবে স্মৃতি হিসাবে আমার কাছে ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখছি।

1973 সালে বিখ্যাত বাঙালীদের রস-কথা সংগ্রহ করার সময় আমার মনে হয় পরলোকগত ক্ষেত্রমোহন বসুর মুখে শোনা সত্যেন্দ্রনাথ-মেঘনাদ সম্বন্ধীয় একটি কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ধারণ করা উচিত। কাহিনীটি এইরূপ: এম্.-এস্-সি পরীক্ষার সময় একদিন গম্ভীর-মুখে হল থেকে বেরিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। একজন সহপাঠী জানতে চাইলেন, "কিরে, কেমন হল পরীক্ষা?" সত্যেন্দ্রনাথ জানালেন, অর্ধেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। এই আটটি নম্বর অত্যন্ত মূল্যবান। তাই বন্ধুবর বললেন "তাহলে কি মেঘনাদই এবার ফার্স্ট হবে?" তখন সত্যেন্দ্রনাথের মুখে হাসি ফুটলো—"ঘাবড়াস নে, যা লিখেছি মেঘনাদ বধের পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

সত্যেন্দ্রনাথ কাহিনীটি পড়ে আমাকে পোস্টকার্ডে লেখেন (18ই ডিসেম্বর 1973):

"প্রিয় রায়, আমার সম্বন্ধে নানা মিথ্যা প্রচারের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত! পরীক্ষায় প্রথম হবার পণ ছিল না কোন কালে—আর মেঘনাদ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সকলে ভুল করে ও মনে ভাবে যে প্রতিযোগিতার তীব্র ঈর্ষা আমাদের মন ভরে ছিল। পরে একসঙ্গে বহু বৎসর কাজ করেছি, দু'জনে-সংযোগিতা করেছি—এমন কি একসঙ্গে একটা প্রবন্ধও প্রকাশিত আছে!

অনুগ্রহ করে আমাকে নিয়ে আর রসকথা কি মিথ্যা প্রচার করবেন না। ইতি

সত্যেন বোস"

শ্রীধন রায়
গণিত বিভাগ,
Ahmadu University,
Zaria, Nigeria.

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন ও প্রোটিন তৈরিতে তাদের ভূমিকা

ভূমিকা—অধ্যাপক হরগোবিন্দ খোরানা 1968 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবার পর অনেকেই 'জিন' শব্দটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন। জিন কেবলমাত্র বংশগতির ধারক ও বাহক নয়, বরং জনন ও কোষের প্রতি মুহূর্তের কার্যকলাপের উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। একটি কোষের গঠন, তার মধ্যেকার উৎসেচক, এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ কখন কি পরিমাণে তৈরি হবে তা সবই নির্ধারিত হয় জিনের মাধ্যমে।

জিনের অবস্থান—নিউক্লিয়াস কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম নামে এক ধরনের সূক্ষ্ম জালিকা থাকে। কোষ বিভাজনের সময় এই নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। এই ক্রোমোজোমের মধ্যেই জিনের অবস্থান। প্রতিটি প্রজাতির ক্ষেত্রে এই ক্রমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে—যেমন মানুষের ক্ষেত্রে 46টি।

জিনের গঠন—প্রতিটি জিন ডি. এন. এ. (Deoxy Ribo Nucleic Acid) অণুর অংশবিশেষ। ডি. এন. এ. অণুর শৃঙ্খল ঘোরানো সিঁড়ির মত পরস্পরকে পাকিয়ে থাকে। ঘোরানো সিঁড়ির প্রতিটি পাকের দূরত্ব 34Å. (Å = অ্যাংষ্ট্রম)। একজন মানুষের দেহে মোটামুটি 10^{13} সংখ্যক কোষ থাকে। এই কোষের বিভিন্ন ডি. এন. এ. অণু পরপর সাজালে তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় 10^{10} মাইল। সত্যই অবাক হবার মত সংখ্যা। একটি ডি. এন. এ. অণু একাধিক নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড একটি নাইট্রোজেন বেস, একটি শর্করা ও একটি ফসফোরিক অ্যাসিডের ক্রমাসজ্জার ফলে তৈরি হয়।

ডি. এন. এ. অণুর মূল পাদা ন—(ক) নাইট্রোজেন বেস—এগুলি কার্বন ও

নাইট্রোজেনের বদ্ধ শৃঙ্খল এবং এই শৃঙ্খলের বিশেষ অবস্থানে নির্দিষ্ট সংখ্যক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের উপস্থিতির ফলে নিম্নলিখিত বেসগুলি পাওয়া যায় :

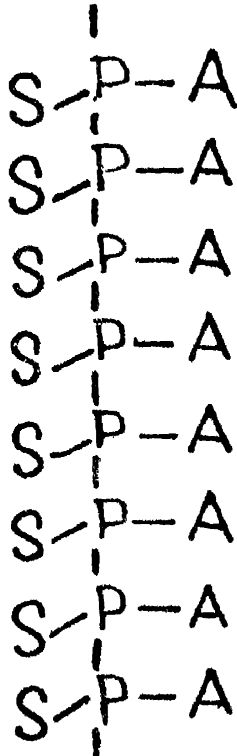
1. পিউরিন গোষ্ঠী : (i) অ্যাডেনিন (সংক্ষেপে A)
   (ii) গুয়ানিন (" G)
2. পিরিমিডিন গোষ্ঠী : (i) থায়ামিন (" T)
   (ii) সাইটোসিন (" C)

(খ) পেনটোজ সুগার (S)—এগুলি কার্বন ও অক্সিজেনের বদ্ধ শৃঙ্খল। নিউক্লিওটাইডে দু'ধরনের সুগারের ব্যবহার দেখা যায় :

(i) রাইবোজ সুগার ও (ii) ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার। ডি. এন. এ. অণুতে কেবলমাত্র ডিঅক্সিরাইবোজ সুগারটিই পাওয়া যায়।

(গ) ফসফোরিক অ্যাসিড।

ডি. এন. এ. অণু গঠনের ক্রমসজ্জা—(ক) নিউক্লিওসাইড গঠন : একটি পিউরিন অথবা পিরিমিডিন বেস একটি ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওসাইড তৈরি করে।



চিত্র 1

(খ) নিউক্লিওটাইড গঠন—উপরিলিখিত নিউক্লিওসাইডটি একটি ফসফোরিক অ্যাসিড অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মনোনিউক্লিওটাইড গঠন করে।

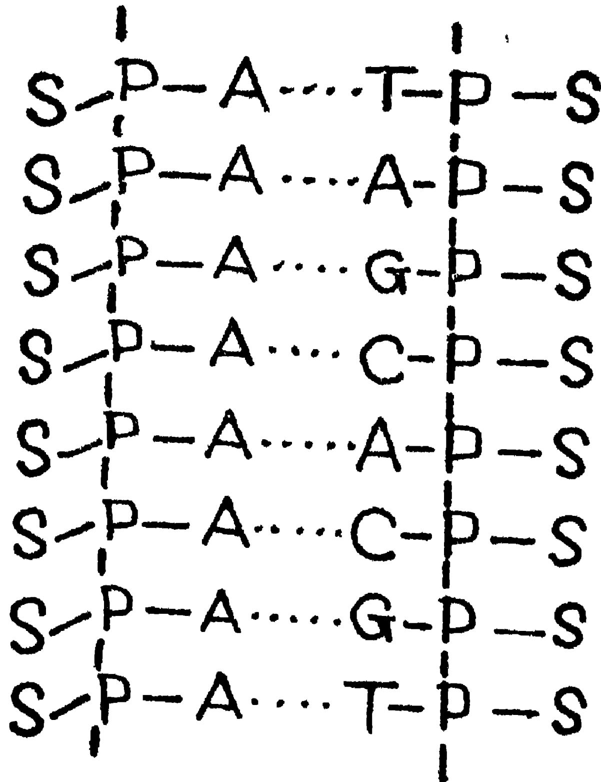
(গ) পলিনিউক্লিওটাইড—শৃঙ্খল বিভিন্ন মনোনিউক্লিওটাইড একের পর এক সজ্জিত হয়ে যে শৃঙ্খল তৈরি করে তাকেই পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল বলে।

একটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের গঠন নিম্নরূপ (চিত্র 1) :

P = ফসফোরিক অ্যাসিড
S = রাইবোজ সুগার
A = অ্যাডেনিন
G = গুয়ানিন
T = থায়ামিন
C = সাইটোসিন

ডি. এন. এ. অণুর অভ্যন্তরে—দুটি পলিনিউক্লিওটাইডের শৃঙ্খল পাশাপাশি ঘোরানো সিঁড়ির মত পরস্পরকে পাকিয়ে থাকে। একটি শৃঙ্খলের বিভিন্ন নাইট্রোজেন বেস অপর

শৃঙ্খলের বেসের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত। এই হাইড্রোজেন বন্ধনগুলি কেবলমাত্র অ্যাডেনিনকে থায়ামিনের সঙ্গে এবং গুয়ানিনকে সাইটোসিনের সঙ্গে যুক্ত করে। অর্থাৎ শৃঙ্খল জোড় দুটির মধ্যে কেবলমাত্র A-T ; T-A ; C-G ; G-C বেসগুলি থাকতে পারে। যে কোন একটি ডি. এন. এ. অণুতে A. ও T. এবং C. ও G.-র পরিমাণ সর্বদা সমান। আগেই বলা হয়েছে, শৃঙ্খল-জোড়টির একটি পূর্ণ পাকের দৈর্ঘ্য 34Å. এই দূরত্বের মধ্যে মোট 10 জোড়া বেসযুগ্ম থাকে। অর্থাৎ পর পর যে কোন দুটি বেসের দূরত্ব 3·4Å. প্রত্যেক মানুষের কোষের কেন্দ্রস্থিত ডি. এন. এ..-তে প্রায় 50 কোটি বেসযুগ্ম থাকে যা শরীরের 46 জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। একটি ডি. এন. এ. অণুর চিত্ররূপ নিচে দেওয়া হল—(চিত্র 2)



চিত্র 2

(······) = হাইড্রোজেন বন্ধন। দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র A-র সঙ্গে T এবং C-র সঙ্গে G যুক্ত হয়েছে।

S = ডি অক্সিরাইবোজ সুগার।

অ্যামিনো অ্যাসিড ও প্রোটিন—অ্যামিনো অ্যাসিডের সুসংবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট সজ্জার ফলে যে শৃঙ্খলটি পাওয়া যায় তাকেই প্রোটিন বলা হয়। প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতির জন্যে মোট 20টি অ্যামিনো অ্যাসিড লাগে। সেগুলি হল,

1) ফিনাইল অ্যালানিন
*2) লিউসিন
*3) আইসোলিউসিন
*4) মেথিওনিন
*5) ভেলিন
6) সেরিন
*7) প্রোলিন
*8) থ্রিওনিন
9) অ্যালানিন
*10) টাইরোসিন
*11) হিষ্টিডিন
12) গ্লুটামিন
13) অ্যাসপারাজিন
*14) লাইসিন
15) অ্যাসপারটিক অ্যাসিড
16) গ্লুটামিক অ্যাসিড
17) সিষ্টাইন
18) অ্যাজিনিন
20) গ্লাইসিন

* চিহ্নিত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে বলা হয় 'অতি প্রয়োজনীয়' (essential amino acids)।

অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পেপটাইড শৃঙ্খলের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে। এরা যেন এক একটি ফুল এবং প্রোটিন অণু যেন একটি মালা। ফুলগুলি (অ্যামিনো অ্যাসিড) একের পর এক বিশেষভাবে গেঁথে নিলেই তৈরি হয় মালা (প্রোটিন অণু)। ডি. এন. এ. অণুর অংশবিশেষের মধ্যে প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি সজ্জাক্রমের সংকেত থাকে—এটাই হল 'জেনেটিক কোড'। এই কোডের মাধ্যমেই কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রোটিন অণু তৈরির বার্তা প্রেরিত হয়।

প্রয়োজন অনুসারে ডি. এন. এ-র A—T ও C—G জোড়ের হাইড্রোজেন বন্ধনগুলি ভেঙ্গে যায়—যার ফলে নাইট্রোজেন বেস যুগ্মগুলি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। এগুলি থেকেই নির্দিষ্ট সংকেত বার্তা তৈরি হয় এবং সংকেত বার্তা বাহককে বলা হয় এম্-আর. এন. এ. (messenger Ribo Nucleic Acid). প্রতিটি 'সংকেত বার্তা' একাধিক বেসত্রয়ীর (triplet) সমন্বয়ে গঠিত। ডি. এন. এ. অণুর পর পর তিনটি বেসকে একত্রে বলা হয় বেসত্রয়ী (triplet)। প্রতিটি বেসত্রয়ী এক একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডকে প্রোটিন অণুর মালায় গেঁথে দেবার সংকেত বহন করে।

আর. এন. এ. অণুর গঠন—আর. এন. এ. অণু ডি. এন. এ. অণু অপেক্ষা ছোট—তবুও কোষের মধ্যে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর নাইট্রোজেন বেসগুলি যথাক্রমে—(1) অ্যাডেনিন, (2) গুয়ানিন, (3) ইউরেসিল (থায়ামিনের পরিবর্তে), (4) সাইটোসিন। এখানে ব্যবহৃত সুগারটি রাইবোজ। এছাড়া ফসফোরিক অ্যাসিড যথারীতি পাওয়া যায়। আর. এন.এ. অণুর সংকেত বার্তাবাহী একটি বেসত্রয়ীকে বলা হয় 'কোডোন'। আর. এন. এ. অণুর বেসত্রয়ীর সজ্জাপদ্ধতি দেখে কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিডের পর কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন অণুর শৃঙ্খলে যুক্ত হবে তা বুঝতে পারা যায়। একে বলা হয় 'ক্র্যাকিং' অফ দা জেনেটিক কোর্ড।

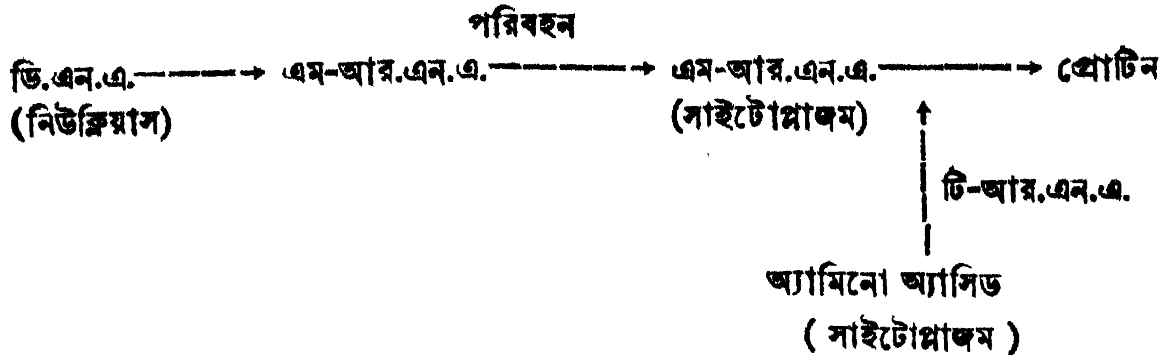
মোটামুটি ভাবে তিন ধরনের আর. এন. এ. পাওয়া যায়—

i) (মেসেঞ্জার) আর. এন. এ. বা এম.-আর. এন. এ.

ii) (ট্রানস্ফার) আর. এন. এ. বা টি-আর. এন. এ.

iii) (রিবোসোমাল) আর. এন. এ. বা আর.-আর. এন. এ.

প্রোটিন তৈরি—কোষের অভ্যন্তরে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে রাইবোজোম নামে এক প্রকার বস্তু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। রাইবোজোমেই কোষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি হয়। কোষস্থ ডি. এন.-এ. অণু থেকে তৈরি হয় এম-আর. এন. এ. এ. এই এম-আর. এন. এ. নিউক্লিয়াসের থেকে বেরিয়ে সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। টি-আর. এন. এ., এম.-আর. এন. এ-র সংকেত বার্তা অনুযায়ী এক একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডকে ধরে এনে আর.-আর. এন. এ.-র সাহায্যে পর পর গেঁথে ফেলে। এই ভাবেই তৈরি হয় একটি 'প্রোটিন অণু'।



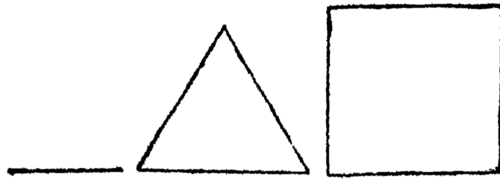
কোষের জিন যে অগণিত সংকেত বহন করে তার সামান্য অংশই প্রোটিন তৈরিতে কাজে লাগে এবং যদি এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন ভুল হয়ে যায় তবে নানা ধরনের বংশগত রোগ (genetic disease) দেখা দেয়।

বর্ণালী দাস*

*গ্রাম+পোঃ-খাটুরা, জেলা-24 পরগণা

বহুমাত্রিক সুষম বহুভুজ সম্পর্কীয় আলোচনা
মডেল তৈরি, প্রয়োগ ও সাধারণীকরণ

সম্পর্ক নির্ণয়ঃ বাস্তবে নানা আকৃতির বস্তু দেখা যায়। তাদের মাত্রার সংখ্যাও বিভিন্ন, যেমন—একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক। এছাড়া, শূন্য মাত্রিকের উদাহরণ হল বিন্দু। একমাত্রিকের উদাহরণ সরলরেখা, দ্বিমাত্রিক হল ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি [চিত্র 1(ক), (খ) ও (গ)] ত্রিমাত্রিক বস্তুর উদাহরণ হল পিরামিড, চতুস্তলক, ঘনক, গোলক ইত্যাদি।



চিত্র 1 (ক)　　(খ)　　(গ)
(ক) সরলরেখা (একমাত্রিক)
(খ) সুষমত্রিভুজ (দ্বিমাত্রিক)
(গ) সুষম চতুর্ভুজ (বর্গক্ষেত্র) (দ্বিমাত্রিক)

কিন্তু এর পর চতুর্মাত্রিকের কথা বিবেচনা করতে গেলে সেরকম কোন বস্তু দেখা যায় না। চতুর্মাত্রিক বস্তু বলতে বোঝায় যায় তিনটি মাত্রার পরে আরও একটি মাত্রা আছে। চতুর্মাত্রিক বস্তু যেহেতু নজরে পড়ে না, তাই ঐ বস্তু কল্পনা করে নিতে হয়। এখানে সেই কাল্পনিক চতুর্মাত্রিক বা তদূর্ধ্ব মাত্রিক বস্তুকে সামনে রেখে তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে। এখানে শুধু চতুর্মাত্রিক বা তদূর্ধ্ব মাত্রিক সুষম বহুভুজের কথাই বিবেচনা করা হবে।

শূন্যমাত্রিক—শূন্যমাত্রিক তাকেই বলা হয় যার মাত্রা নেই। যেমন একটি বিন্দু হল শূন্যমাত্রিক। এর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ নেই, শুধুমাত্র অবস্থান আছে।

একমাত্রিক—একমাত্রিক আকৃতির শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে। যেমন সরলরেখা। আবার সরলরেখার সীমা নির্ধারণ করে এর প্রান্তের দুটি বিন্দু এবং সে দুটি হল শূন্যমাত্রিক।

দ্বিমাত্রিক—দুটি মাত্রাযুক্ত আকৃতিকে বলা হয় দ্বিমাত্রিক। যেমন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ। এদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা হবে একমাত্রিক সরলরেখা।

দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে তার সীমা হল তিনটি একমাত্রিক সরলরেখা এবং তার শীর্ষবিন্দু হল তিনটি। এখন যদি দ্বিমাত্রিক আকৃতির (এখানে ত্রিভুজের) সীমা নির্ধারণকারী বিন্দুর সংখ্যাকে β_0 এবং দ্বিমাত্রিক বস্তুর একমাত্রিক সরলরেখার সংখ্যাকে β_1 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে—

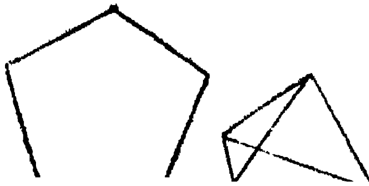
$$\beta_0-\beta_1=3-3=0.$$

অনুরূপে দ্বিমাত্রিক চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা হল চার এবং প্রান্ত বা সরলরেখার সংখ্যাও হল চার [চিত্র 1 (গ)]। অর্থাৎ—

$$\beta_0-\beta_1=4-4=0.$$

পঞ্চভুজের ক্ষেত্রে $\beta_0-\beta_1=5-5=0$ [চিত্র 2 (ক)]

এভাবে যে কোন বহুভুজের ক্ষেত্রেই $\beta_0-\beta_1=0$



চিত্র 2 (ক) (খ)
(ক) সুষম পঞ্চভুজ (দ্বিমাত্রিক)
(খ) সুষম ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজ (চতুস্তলক)

ত্রিমাত্রিক বস্তু—ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজের ক্ষেত্রে চিত্র 2(খ) থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, এর সীমা হল চারটি দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজ এবং চারটি ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা হল 4 এবং ধার বা প্রান্তকীর সংখ্যা হল 6. এখন যদি ত্রিমাত্রিক বস্তুর সীমা নির্ধারণকারী দ্বিমাত্রিক বস্তুগুলিকে β_2 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তবে দেখা যাবে—

$$\beta_0-\beta_1+\beta_2=4-6+4=2$$

ত্রিমাত্রিক সুষম ত্রিভুজকে বলা হয় চতুস্তলক।

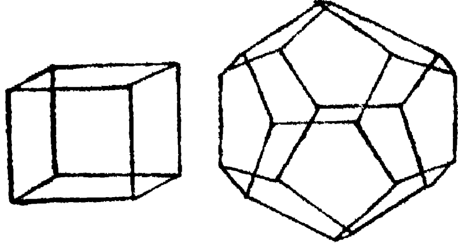
ত্রিমাত্রিক চতুর্ভুজ—ত্রিমাত্রিক চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে সীমা হবে ছয়টি দ্বিমাত্রিক চতুর্ভুজ [চিত্র 3 (ক)]। ত্রিমাত্রিক সুষম চতুর্ভুজকে বলা হয় ঘনক। এক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু হল 8টি এবং ধার বা প্রান্তকী হল 12টি। অর্থাৎ—

$$\beta_0-\beta_1+\beta_2=8-12+6=2.$$

বিজ্ঞানী অয়লারের সূত্র থেকেও উপরিউক্ত বিভিন্ন সম্পর্ক পাওয়া যায়। অয়লারের

সম্পর্ক অনুযায়ী যে কোন ত্রিমাত্রিক বহুভুজের ক্ষেত্রে V-E+F=2. এখানে V, শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা, E, প্রান্তকীর সংখ্যা এবং F, তল বা দ্বিমাত্রিক আকৃতিসংখ্যা।

ত্রিমাত্রিক পঞ্চভুজ—ত্রিমাত্রিক পঞ্চভুজের [চিত্র 3(খ)] সীমানির্ধারণ করবে কতকগুলি দ্বিমাত্রিক পঞ্চভুজ। এখানে এই দ্বিমাত্রিক পঞ্চভুজগুলির সংখ্যা নির্ধারণ করা একটু কষ্টসাধ্য। ধরা যাক্ এই সংখ্যা হল n_0। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি দ্বিমাত্রিক আকৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায়—প্রতিটি শীর্ষবিন্দু দিয়ে তিনটি সরলরেখা যায়। n-সংখ্যক পঞ্চভুজের প্রান্তকী বা একমাত্রিক সরলরেখার সংখ্যা হল $5 \times n$। অতএব শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা হল $\frac{5n}{3}$. আবার একটি বিন্দু দিয়ে যায় তিনটি সরলরেখা এবং প্রতিরেখার সীমা হল দুটি বিন্দু। অতএব প্রান্তকী বা সরলরেখার সংখ্যা



চিত্র 3 (ক) (খ)
(ক) সুষম ত্রিমাত্রিক চতুর্ভুজ
(খ) সুষম ত্রিমাত্রিক পঞ্চভুজ

$$\frac{5n}{3} \times \frac{1}{2} \times 3 = \frac{5n}{2}$$

ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে

$$\beta_0 - \beta_1 + \beta_2 = 2 \qquad \therefore \quad \frac{5n}{3} - \frac{5n}{2} + n = 2$$

অর্থাৎ $n = 12$

এই পন্থার ষড়ভুজের (ত্রিমাত্রিক) ক্ষেত্রে দেখা যায়, ত্রিমাত্রিক ষড়ভুজে যদি সীমাসংখ্যা হয় n-সংখ্যক ষড়ভুজ, তবে

$$\frac{6 \times n}{3} - \frac{6 \times n}{2} + n = 2$$

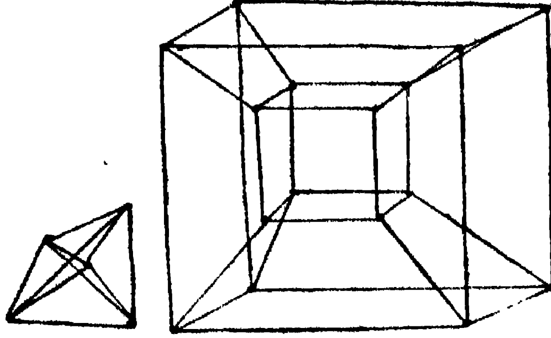
বা, $2n - 3n + n = 2$ বা, $3n - 3n = 2$

এ কখনই সম্ভব নয়। এখান থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারা যায়, ত্রিমাত্রিক ষড়ভুজ বলে কিছু হতে পারে না। এভাবে যদি সাত বা তদূর্ধ্ব বাহুবিশিষ্ট বহুভুজে ত্রিমাত্রিক অবস্থার কথা বিবেচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে বামপক্ষ ঋণাত্মক সংখ্যা হয়ে গেছে। অতএব ছয় বা তদূর্ধ বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের ত্রিমাত্রিক বস্তু হতে পারে না।

চতুর্মাত্রিক বস্তু—যদি চতুর্মাত্রিক ত্রিভুজের কথা চিন্তা করা যায় [4 (ক)], তবে দেখা যাবে তার সীমা হবে 5টি ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজ। এখানে চতুর্মাত্রিক ত্রিভুজের দ্বিমাত্রিক অভিক্ষেপ জ্যামিতির আকারে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার যদি চতুর্মাত্রিক ত্রিভুজের সীমা ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজকে β_3 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তবে [4 (ক)] থেকে বোঝা যায়।

$$\beta_0-\beta_1+\beta_2-\beta_3=5-10+10-5=0$$

অনুরূপে চতুর্মাত্রিক চতুর্ভুজকে দ্বিমাত্রিক অভিক্ষেপ দ্বারা জ্যামিতিক আকারে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে [চিত্র 4 (খ)]। চিত্র থেকেই স্পষ্টতঃই বোঝা যায়—



চিত্র 4 (ক) (খ)

(ক) সুষম চতুর্মাত্রিক চতুর্ভুজের দ্বিমাত্রিক অভিক্ষেপ

(খ) চতুর্মাত্রিক ত্রিভুজ

$$\beta_0-\beta_1+\beta_2-\beta_3=16-32+34-8=0$$

চতুর্মাত্রিক পঞ্চভুজ—ধরা যাক, চতুর্মাত্রিক পঞ্চভুজের সীমা হল n-সংখ্যক ত্রিমাত্রিক পঞ্চভুজ। এখন n-সংখ্যক ত্রিমাত্রিক পঞ্চভুজে মোট 12n সংখ্যক দ্বিমাত্রিক পঞ্চভুজ এবং প্রতিটি দ্বিমাত্রিক পঞ্চভুজই দুটি ত্রিমাত্রিক পঞ্চভুজের সাধারণ তল হিসাবে আছে। অতএব দ্বিমাত্রিক পঞ্চভুজের সংখ্যা হল $\frac{12\times n}{2}=6n=\beta_2$ (মনে করা যাক)। এখন 6n-সংখ্যক দ্বিমাত্রিক পঞ্চভুজে একমাত্রিক সরলরেখা আছে $6n\times5$টি এবং প্রতিটি রেখাই তিনটি দ্বিমাত্রিক পঞ্চভুজে সাধারণ বাহু হিসাবে আছে। অতএব একমাত্রিক সরলরেখার সংখ্যা হল

$$\frac{6n\times5}{3}=10n$$

আবার 10n-সংখ্যক সরলরেখার প্রান্তবিন্দুর সংখ্যা হল $(10n\times2)$টি এবং প্রতিটি বিন্দু দিয়ে 4টি সরলরেখা গেছে। অতএব সরলরেখা সংখ্যা $\frac{10n\times2}{4}=5n.$

এক্ষেত্রে $\beta_0-\beta_1+\beta_2-\beta_3=5n-10n+6n-n=0$

পঞ্চমাত্রিক ত্রিভুজ—এক্ষেত্রে সীমাসংখ্যা হবে 6টি চতুর্মাত্রিক ত্রিভুজ; কারণ দেখা গেছে একমাত্রিক সরলরেখার সীমা হল দুটি বিন্দু, দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজের সীমা তিনটি সরলরেখা, ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজের সীমা চারটি দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজ এবং চতুর্মাত্রিক ত্রিভুজের সীমা হল পাঁচটি ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজ। দেখা গেছে সীমাসংখ্যা বাড়ছে 2, 3, 4, 5 ক্রম অনুযায়ী। অতএব পঞ্চমাত্রিক ত্রিভুজের সীমা হবে 6টি চতুর্মাত্রিক ত্রিভুজ। এক্ষেত্রে দেখানো যায়—

$$\beta_0-\beta_1+\beta_2-\beta_3+\beta_4=6-15+20-15+6=2$$

পঞ্চমাত্রিক চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে সীমাসংখ্যা 10টি চতুর্মাত্রিক চতুর্ভুজ। সেক্ষেত্রে

$$\beta_0-\beta_1+\beta_2-\beta_3+\beta_4=32-80+80-40+10=2.$$

ষষ্ঠমাত্রিক ত্রিভুজ—এর সীমা হল 7টি পঞ্চমাত্রিক ত্রিভুজ। সুতরাং,

$$\beta^0-\beta_1+\beta_2-\beta_3+\beta_4-\beta_{\cdot}=7-21+35-35+21-7=0$$

এরূপে দেখা যায় মাত্রা যত বাড়ছে,

$\beta_0-\beta_1+\beta_2-\cdots\cdots$ইত্যাদির মান পর্যায়ক্রমে দুই বা শূন্য হচ্ছে। তাহলে n-মাত্রিক বহুভুজের ক্ষেত্রে

$$\beta_0-\beta_1+\beta_2-\beta_3+\beta_4-\beta_5+\cdots\cdots\cdots(-1)^n\,\beta_{n-1}=1-(-1)^n$$

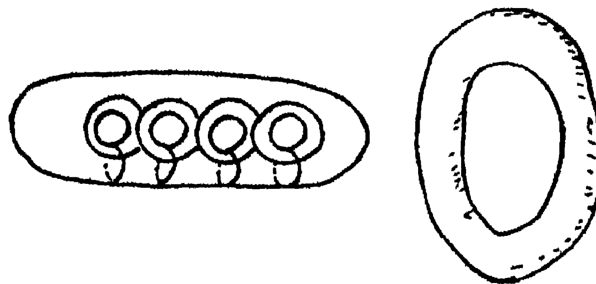
মডেল তৈরি—প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—পিচবোর্ড, আঠা, প্লাষ্টার অব্ প্যারিস, প্লাষ্টিকের বল, লোহার দণ্ড ইত্যাদি।

তৈরির পন্থা—(i) লোহার দণ্ড বা তার টুকরো গরম করে প্লাষ্টিক বলে ঢুকিয়ে বলটিকে প্রান্তবিন্দু রূপে রেখে ত্রিমাত্রিক বস্তু ও চতুর্মাত্রিক বস্তুর বিভিন্ন অভিক্ষেপ তৈরি করা যায়।

(ii) পিচবোর্ড মাপমত কেটে আঠা দ্বারা ঘনবস্তুগুলি তৈরি করা যায়।

(iii) প্লাষ্টার অব প্যারিস দ্বারাও বিভিন্ন আকারের ত্রিমাত্রিক বস্তু তৈরি করা যায়।

আলোচনা—প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের স্ফটিক পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক স্ফটিককে সমঞ্জস ও অসমঞ্জস—এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ত্রিমাত্রিক সুষম বহুভুজ আকারের বহু স্ফটিক গঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন আকৃতি ও গঠন-বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্ফটিকের সন্ধান মেলে। সুষম আকৃতিবিশিষ্ট স্ফটিকের উদাহরণ হল হীরক, গ্রাফাইট ইত্যাদি। অন্যপ্রকার আকৃতি ও গঠন-বৈশিষ্ট্য স্ফটিকের উদাহরণ হল প্রেটজেল, টোরাস, [5 (ক) ও (খ)] ইত্যাদি আকৃতির স্ফটিক। অয়লারের সূত্র এবং



5 (ক)   (খ)
(ক) প্রেটজেল   (খ) টোরাস

সংস্থিতি অনুযায়ী এ সমস্ত আকৃতিকে মোটামুটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। স্ফটিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে (রঞ্জেন রশ্মি প্রয়োগে, রামন বর্ণালী বিশ্লেষণে) স্ফটিকের গঠন নিরূপণ করা হয়ে থাকে। জ্যামিতির নিয়মে যেভাবে এদের সাধারণত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়—এ লেখাটি তারই একটি ছোটখাটো প্রচেষ্টা: এভাবে বহুতলবিশিষ্ট, এমনকি টপোলজীয় আকৃতির ব্যাখ্যার কথা ভাবা যায়। অন্যদিকে জটিল গঠন আকৃতিকেও অভিক্ষেপের সাহায্যে সরলীকরণ ও জ্যামিতির ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব।

বিশেষ অনুসিদ্ধান্ত—অয়লারের সূত্রকে লেখা যায়, $V-E+F=3-h$ (h হল সংযুক্তি)। সরলবস্তুর ক্ষেত্রে $h=1$ এবং সেক্ষেত্রে $V-E+F=3-1=2$.

এ অবস্থায় বস্তুর কৌণিক বিন্দুগুলি পরস্পর সমঞ্জস। অসরল বস্তু টৌরাস ও প্রেটজেল-এর সংযুতি অযুগ্ম। এছাড়াও বহু বস্তু আছে—যাদের সংযুতি যুগ্ম। যেমন হেক্টাহেড্রন। এরূপ বস্তুগুলির কৌণিক বিন্দুসমূহ সাধারণত পরস্পর অসমঞ্জস হয়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Hilbert, D & Cohn—Vassen, C. Geometry and Imagination
2. Khungin, Ya, Did you say Mathematics
3. Rapport, S & Wright, H.—Mathematics

[প্রবন্ধটি লেখিকার এন. এস. টি. এস. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিবেশন। পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের সহযোগিতায় এটি তৈরি হয়েছিল।]

শর্মিলা ব্যানার্জী*

* 2E, নয়নকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-700 003

ভেবে কর

প্রশ্ন 1. 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটিকে মাত্র একবার করে ব্যবহার করে 1 ও 100 সংখ্যা দুটিকে প্রকাশ কর।

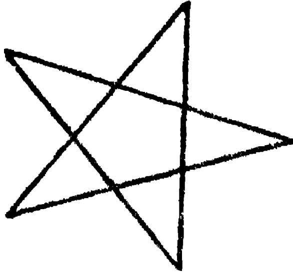
$$\left(\text{যেমন,}\quad 7=6+\frac{39}{78}+\frac{52}{104}\right)$$

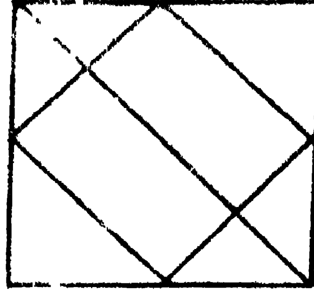
প্রশ্ন 2. ন'টি মুদ্রার মধ্যে আটটির ওজন পরস্পর সমান। কেবলমাত্র একটির ওজন ঐ আটটি মুদ্রার ওজন অপেক্ষা বেশি। মাত্র দু'বার ওজন করে কিভাবে সেটিকে সনাক্ত করা যাবে ?

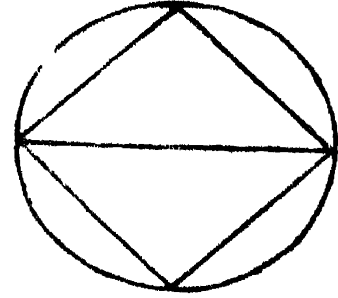
প্রশ্ন 3. আট লিটার ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি পাত্র জলপূর্ণ আছে। একটি পাঁচ লিটার ও একটি তিন লিটার ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট দুটি পাত্রের সাহায্যে কিভাবে ঐ আট লিটার জলকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা যাবে ?

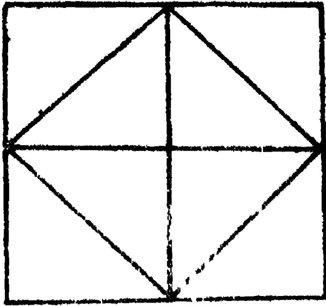
প্রশ্ন 4. কোন মুদির দাঁড়িপাল্লার দু'বাহু অসমান। কোন ক্রেতা তার কাছ থেকে কিছু পরিমাণ লবণ দু'বার ওজন করিয়ে ক্রয় করল। প্রথমবারে সে অর্ধেক লবণ ওজন করলো। দ্বিতীয়বার পাল্লা পরিবর্তন করে বাকি অর্ধেক ওজন করলো অর্থাৎ প্রথমবার ওজনের সময় যে পাল্লায় বাটখারা চাপানো হয়েছিল দ্বিতীয়বার ওজনের সময় সে পাল্লায় লবণ চাপিয়ে ওজন করা হল। এতে কার লাভ হল ?

প্রশ্ন 5. চিত্র 1 থেকে চিত্র 6-এ কয়েকটি জ্যামিতিক চিত্র দেওয়া হল। একটানে

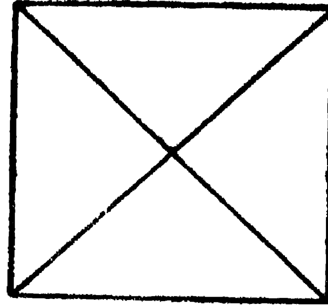




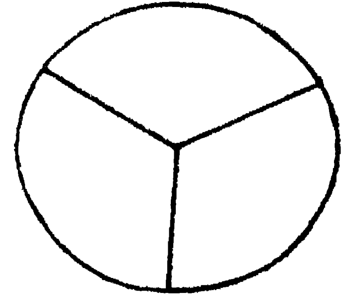




4



চিত্র 5



চিত্র 6

অর্থাৎ কাগজ থেকে কলম একবারও না তুলে এবং কোন রেখা বরাবর একবারের বেশি অতিক্রম না করে কোন্ কোন্ চিত্রটি অঙ্কন করা যায় ?

প্রদীপকুমার দত্ত*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী

(সমাধান 44 পৃষ্ঠায়)

ডিসেম্বর '77 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'এ প্রকাশিত সংখ্যাকূট-এর সমাধান

a	b	c	d
1	9	1	1
9		9	1
1	9	0	2
5	0	0	0

জেনে রাখ

ছত্রাক : অনেক সময় আচার, রুটি, বাসি তরকারি, পচা শাক-সবজি, পচা লেবু প্রভৃতির গায়ে বিভিন্ন রঙের ছাতা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে ছত্রাক বলা হয়। উদ্ভিদজাতীয় বীজ থেকে এগুলি উৎপন্ন হয়। রেণুর সাহায্যে এদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। রেণু বাতাসে উড়ে বেড়ায় এবং খাদ্যদ্রব্যে গিয়ে ছত্রাক তৈরি করে। শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্যে এরা বসবাস করে। আর্দ্র জায়গায় এদের বেশি বংশবৃদ্ধি ঘটে। 65° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় খাদ্যবস্তুকে উত্তপ্ত করলে ছত্রাক নষ্ট হয়ে যায়।

ঈষ্ট : অনেক সময় তরিতরকারি, ফল, দুধ, আচার প্রভৃতি গেঁজে যায় বা ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। ঈষ্টজাতীয় বীজের আক্রমণেই এরকম হয়। ঈষ্ট একরকম এককোষী উদ্ভিদ। এরা শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্যে বসবাস করে। সাধারণ তাপমাত্রা 20° সেন্টিগ্রেড থেকে 35° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আর্দ্র পরিবেশে এরা খুব দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। খাদ্যবস্তু পচে গেলে তার উপরিভাগে ফেনার মত আবরণ তৈরি হয়। ঈষ্টের বংশবৃদ্ধির সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ঐ গ্যাসই অখাদ্য বস্তুর উপরিভাগে এসে জমে গিয়ে ফেনার সৃষ্টি করে। তাপমাত্রা খুব কম (4° সেন্টিগ্রেডের নিচে) হলে এদের বংশবৃদ্ধি কমে যায়। 60° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় খাদ্যবস্তুকে উত্তপ্ত করলে ঈষ্ট মরে যায়।

আরতি পাল* ও রীণা ভট্টাচার্য*

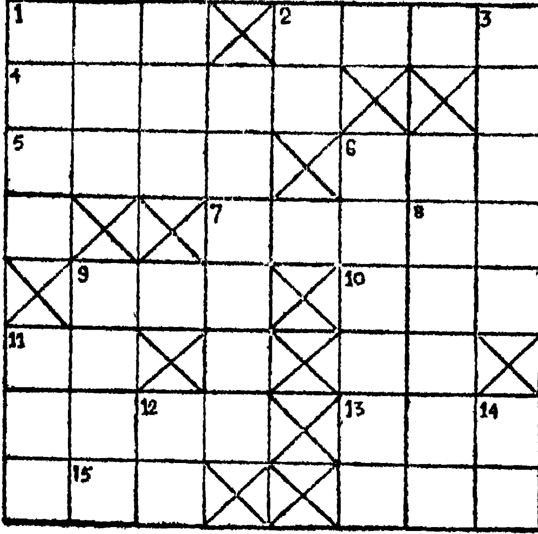
* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অনুরোধে উক্ত প্রতিযোগিতার জন্যে মডেল জমা দিবার শেষ তারিখ 15ই মার্চ 1978, তারিখের পরিবর্তে 17ই এপ্রিল, 1978, তারিখ ধার্য করা হল এবং আবেদনপত্র সংগ্রহ করবার শেষ তারিখ 31শে জানুয়ারী, 1978, তারিখের পরিবর্তে 28শে ফেব্রুয়ারী, 1978 তারিখ ধার্য করা হল।

শব্দকূট

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী শব্দকূটটি সমাধান কর :



পাশাপাশি

1—বিশ্ববিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ ;

2—যার অভাবে গলগণ্ড রোগ হয় ;

4—যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত হয় ;

5—এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক ;

6—সূর্যের একটি গ্রহ ;

7—দর্পণের মধ্যবিন্দু ও বক্রতা কেন্দ্র যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায় ;

9—তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের যেখানে আধান দেওয়া হয় ;

10—তড়িৎগ্রস্ত অণু বা পরমাণুর অপর নাম ;

11—ভরের বহুল প্রচারিত একক ;

13—যে চতুর্ভুজের বাহুগুলি সমান কিন্তু সমকোণী নয় ;

15—এফ, পি, এস, পদ্ধতিতে যার একক ফুট-পাউণ্ডাল।

উপর থেকে নিচে

1—একটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি ;

3—গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি স্পষ্টভাবে দেখবার যন্ত্র ;

7—কোন বস্তুর উপর একবর্ণের আলো পড়লে অন্য বর্ণের আলো দেবার ঘটনা ;

8—যে চৌম্বক পদার্থের ভেদ্যতা ও চৌম্বকগ্রাহিতা খুব উচ্চমানের ;

9—একটি নিশাচর প্রাণী ;

10—সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধাতুর ইংরাজি নাম ,

11—গাছের কলম তৈরি করার একটি পদ্ধতি ;

12—পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র ;

14—বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন যাতে প্রচুর পাওয়া যায়।

গুরুপদ ঘোষ*

* গ্রাম—আব্দারপুর, পোঃ—সিউরী, জেলা—বীরভূম

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান

উঃ 1. $1=\frac{35}{70}+\frac{148}{296}$, $100=50+49+\frac{1}{2}+\frac{38}{76}$

উঃ 2. মুদ্রাগুলির যে কোন তিনটি করে নিয়ে তাদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাক। ধরা যাক এই ভাগগুলি হল A, B, C. প্রথমে এর মধ্যে যে কোন দুটি ভাগকে (ধরা যাক্ A ও B) দাঁড়িপাল্লার দু'পাল্লায় রেখে ওজন করা হল। এক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে—(1) A-এর ওজন B-এর ওজন অপেক্ষা বেশি, (2) B-এর ওজন A-এর ওজন অপেক্ষা বেশি, (3) উভয়ের ওজন সমান। এর দ্বারা কোন্ ভাগে বেশি ওজনের মুদ্রাটি আছে তা জানা যাবে। প্রথম ক্ষেত্রে A ভাগে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে B ভাগে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে C ভাগে বেশি ওজনের মুদ্রাটি আছে। ধরা যাক্ বেশি ওজনের মুদ্রাটি যে ভাগে আছে, সে ভাগের মুদ্রা তিনটি x, y, z. আগের মতই এর মধ্যে যে কোন দুটিকে দাঁড়িপাল্লায় রেখে ওজন করলেই বেশি ওজনের মুদ্রা কোন্‌টি জানা যাবে।

উঃ 3. ধরা যাক্ A, B, C যথাক্রমে আট লিটার, পাঁচ লিটার ও তিন লিটার ধারণ-ক্ষমতা বিশিষ্ট পাত্র। প্রথমে A পূর্ণ, B ও C শূন্য। এই অবস্থাটি এই ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে (8,0,0). বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি ক্রমান্বয়ে A, B, C এর জলের পরিমাণের সূচক। প্রথমবার A থেকে জল ঢেলে B-কে পূর্ণ করা হল। অতএব A-তে জলের পরিমাণ এ সময় তিন লিটার। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থাটিকে এভাবে প্রকাশ করা যায় (3, 5, 0). অনুরূপভাবে পরবর্তী পর্যায়গুলি হবে (3, 2, 3), (6, 2, 0), (6, 0, 2), (1, 5, 2), (1, 4, 3), (4, 4, 0)। অর্থাৎ মোট 7 বার ঢালাঢালি করতে হবে।

উঃ 4. এতে লাভ হল ক্রেতার। ধরা যাক দাঁড়িপাল্লার এক বাহুর দৈর্ঘ্য a, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য b ও বাটখারার ওজন x. সুতরাং ক্রেতা যে পরিমাণ লবণ ক্রয় করল তার আপাত ওজন 2x. এখন লবণের প্রকৃত ওজন নির্ণয় করা যাক। ধরা যাক্ প্রথমবার যে পরিমাণ লবণ ওজন করা হল তার প্রকৃত ওজন y এবং দ্বিতীয় বারের প্রকৃত ওজন z, যখন দাঁড়ি-পাল্লা অনুভূমিক তখন দুই পাল্লার উপর প্রযুক্ত বলের ভ্রামকের মান সমান। $\therefore$ $ax=by$ এবং $bx=az$ $\therefore$ দু'বারে ওজন করা লবণের প্রকৃত ওজন $y+z=\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)x$

$\therefore$ ক্রেতা যে পরিমাণ লবণ বেশি পেল তার ওজন $=y+z-2x=\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-2\right)x$ $=\frac{(a-b)^2}{ab}x$. a ও b এর মান যাই হোক না কেন রাশিটি সব সময়ই ধনাত্মক। তাই ক্রেতা লাভবান হল।

উঃ 5. চিত্র 1, 2, 3 একটানে আঁকা যাবে। চিত্র 4, 5, 6 যাবে না। কারণ চিত্র 4-এ বিজোড় শীর্ষ বিন্দুর সংখ্যা (শীর্ষ বিন্দু জোড় কিংবা বিজোড় তা নির্ধারিত হয় ঐ শীর্ষে কতগুলি রেখা মিলিত হয়েছে তার সংখ্যা দ্বারা। ঐ সংখ্যা জোড় হলে শীর্ষবিন্দুকে জোড় ও বিজোড় হলে শীর্ষবিন্দুকে বিজোড় বলা হয়) চার। নূ্যনতম যত টানে চিত্রটিকে অঙ্কিত করা যাবে তা হল $4 \div 2 = 2$, অর্থাৎ একটানে চিত্রটি অঙ্কন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে চিত্র 5 ও 6 একটানে আঁকা যাবে না। চিত্র 2 ও 3-এ বিজোড় শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা 2 ; অতএব ও দুটি একটানে আঁকা যাবে। অবশ্য অঙ্কন শুরু করতে হবে বিজোড় কোন শীর্ষবিন্দু থেকে। কোন জোড় শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু করলে চিত্র দুটি একটানে আঁকা যাবে না। চিত্র 1-এ কোন বিজোড় শীর্ষবিন্দু নেই। অতএব যে কোন শীর্ষবিন্দু থেকেই শুরু করলে তা একটানে আঁকা যাবে।

মডেল তৈরি

(1)

সরল বেতার টেলিফোন

এই টেলিফোনের কার্যপদ্ধতি ফ্যারাডের তড়িৎ-আবেশ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মডেলটি স্বল্প পরিশ্রমে ও সহজেই তৈরি করা যায়।

মডেলটি তৈরি করতে নিচের জিনিষগুলি প্রয়োজন :

(i) 22 গেজের অন্তরিত তার প্রায় 20 মিটার ও 32 গেজের তার প্রায় 40 মিটার ;

(ii) একটি হেডফোন ও একটি মাইক্রোফোন ;

(iii) একটি 9 ভোল্টের ব্যাটারী ও একটি সুইচ ;

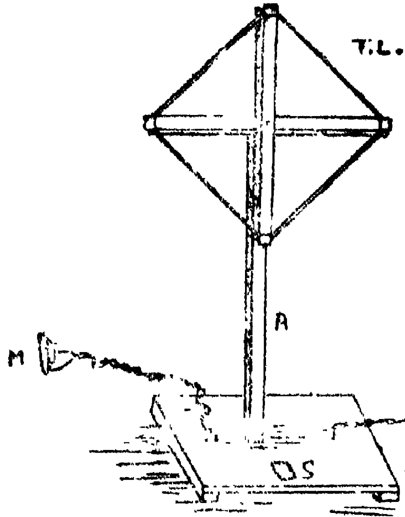
(iv) অ্যালুমিনিয়াম পাত ;

(v) মাপমত কাঠ ;

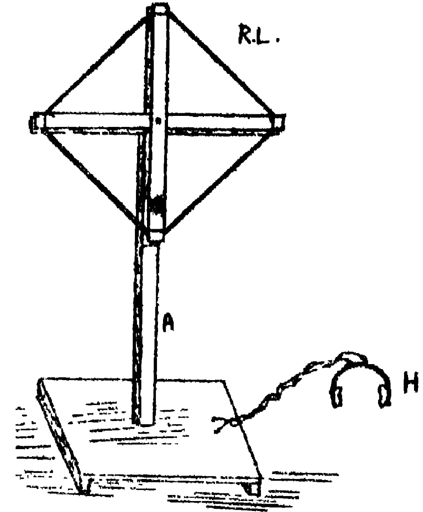
(vi) প্রয়োজনীয় তার, স্ক্রু, পেরেক ইত্যাদি।

প্রথমে 25 সে.মি.×5 সে.মি.×5 সে.মি. মাপের চারটে কাঠের ঠিক মাঝখানে ধারালো বাটালী দিয়ে একটা গর্ত তৈরি করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে—কাঠ যাতে দু'টুকরো না হয়ে যায়। এদের মধ্যে দুটিকে নিয়ে পরস্পর সমকোণে এমন ভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে কাঠামোটার আকার যোগ চিহ্নের (+) মত হয়। এরকম দুটি কাঠামো হবে। এখন 10 সে.মি.×5 সে.মি. মাপের আটটা অ্যালুমিনিয়াম পাতকে U-আকৃতিতে বাঁকিয়ে ঐ কাঠামো দুটির আট মাথায় স্ক্রু দিয়ে আটকে দিতে হবে

এবার কাঠের তক্তা দিয়ে দুটি পিঁড়ি তৈরি করে এদের প্রত্যেকটিতে 15 সে.মি.× 5 সে.মি.×5 সে.মি. মাপের কাঠ লম্বভাবে আটকে দুটি স্ট্যাণ্ড (A) তৈরি করতে হবে

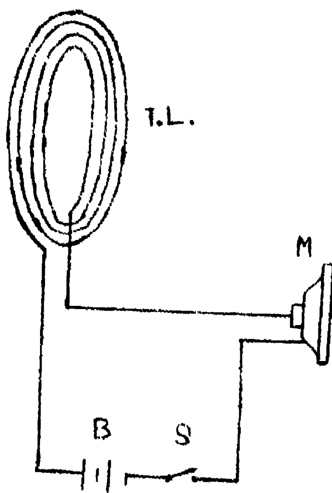


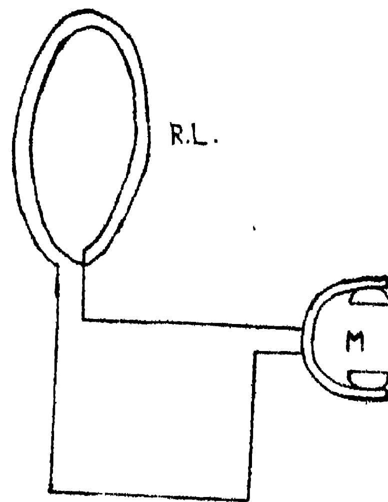
ট্রান্সমিটার লুপ
চিত্র 1



রিসিভার লুপ
চিত্র 2

এবং পূর্বোক্ত (+) চিহ্নাকৃতি কাঠামো দুটি ঐ স্ট্যাণ্ড দুটির প্রায় মাথায় স্ক্রু দিয়ে আটকে দেওয়া হবে। এদের একটিতে 22 গেজের তার 20 পাক জড়িয়ে ঐ তারের দু'প্রান্ত, হেড ফোনের (H) দু'প্রান্তে অন্য তারের সাহায্যে যুক্ত করা হবে। অপরটিতে 32 গেজের তার 40 পাক জড়াতে হবে এবং অন্য তার দিয়ে





চিত্র 3

ঐ তারের এক প্রান্ত ব্যাটারীর (B) একটি মেরুতে ও অপর প্রান্ত মাইক্রোফোন (M) ও সুইচ (S) ঘুরে ব্যাটারীর অপর মেরুতে যুক্ত হবে।

সুইচ, ব্যাটারী ও মাইক্রোফোনযুক্ত 32 গেজ তারের কুণ্ডলীকে 'ট্রান্সমিটার লুপ' (T.L.) এবং অপরটিকে 'রিসিভার লুপ' (R.L.) বলা হয় [চিত্র 1 এবং চিত্র 2]।

এখন, 'ট্রান্সমিটার লুপ'-এর সুইচ অন করে মাইক্রোফোনে কথা বললে 'রিসিভার লুপ'-এর হেডফোনে কথা শোনা যাবে—যদিও শেষোক্ত লুপ-এ কোন তড়িৎ-কোষ যুক্ত নেই বা 'ট্রান্সমিটার লুপ'-এর সঙ্গে এর সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই [চিত্র 3 চিত্র 4]। তবে কি উপায়ে এটি সম্ভব হতে পারে ?

ফ্যারাডের তড়িৎ-আবেশ নীতি থেকে জানা যায়, যদি তড়িৎ-উৎসযুক্ত মুখ্য বর্তনীর (primary) কাছে তড়িৎ-উৎসহীন সংহত একটি গৌণ বর্তনী (secondary) থাকে, তবে তড়িচ্চালক বলের (e.m.f.) জন্যে গৌণ বর্তনীতে আবিষ্ট তড়িৎ উৎপন্ন হয়।

মডেলের 'ট্রান্সমিটার লুপ'-টি মুখ্য বর্তনী ও 'রিসিভার লুপ'-টি গৌণ বর্তনী।

যখন মাইক্রোফোনে কথা বলা হয়, মাইক্রোফোনের কম্পমান ধাতব পাত কার্বন গুঁড়ায় কমবেশি চাপের ফলে ট্রান্সমিটার লুপ অর্থাৎ মুখ্য বর্তনীতে রোধের তারতম্য ঘটবে। ফ্যারাডের নীতি অনুযায়ী রিসিভার লুপে অর্থাৎ গৌণ বর্তনীতে তড়িচ্চালক বলের আবেশের জন্যে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে। এই তড়িৎ প্রবাহের ফলে হেডফোনের বিদ্যুৎ-চুম্বক ধাতব পাতকে কমবেশি আকর্ষণ করে অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করবে।

ট্রান্সমিটার ও রিসিভার লুপ পরস্পর চার-পাঁচ মিটার ব্যবধানে থাকলেও মডেলটি কার্যকরী হবে। কিন্তু দূরত্ব খুব বেশি হলে হবে না। তবে তারের পাকের সংখ্যা বাড়ালে ও বর্তনীতে অধিক বিভব প্রভেদের তড়িৎ-উৎস যুক্ত করলে আরো দূর থেকে হেডফোনে কথা শোনা যাবে।

পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহে (A. C.) এই মডেলটি কার্যকরী নয়।

প্রশান্ত মণ্ডল*
হিল্লোল দাস*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

(2)

বাষ্পচালিত নৌকা

এখানে একটি বাষ্পচালিত খেলনা নৌকা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করা হল – যা খুব কম খরচে এবং সহজে তৈরি করা যায়।

এটির তৈরির জন্যে নিচের জিনিবগুলি প্রয়োজন :

(i) 12″×6″ মাপের একটি পাতলা লোহার পাত ;

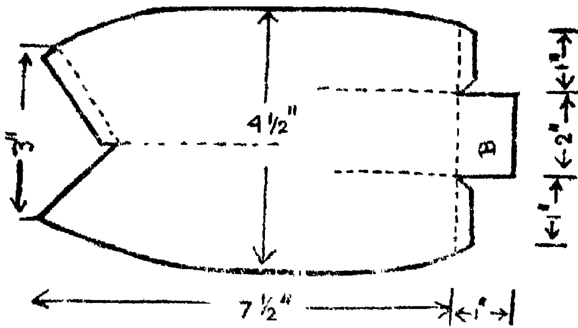
(ii) একটি ছোট ধাতব বাটি ;

(iii) 1/8″ ব্যাসযুক্ত ও 11″ লম্বা একটি পিতলের বা তামার নল ;

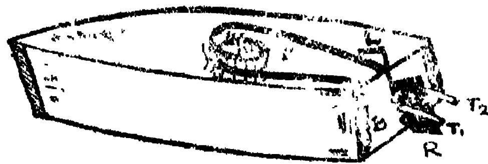
(iv) কিছুটা স্পিরিট ;

(v) কিছুটা তুলো ও টুকিটাকি জিনিষপত্র।

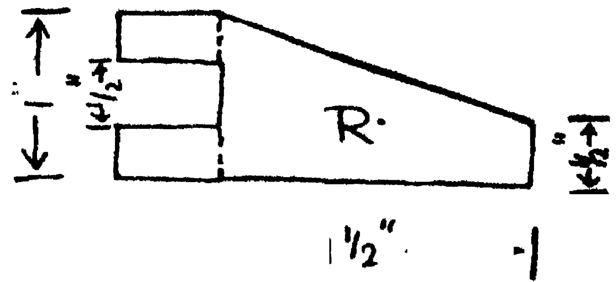
প্রথমে চিত্রানুযায়ী লোহার পাত থেকে 8"×4½" কেটে নিয়ে ভাঁজ করতে হবে (চিত্র 1)। তারপর ঐ জোড়াগুলি রাংঝাল দিয়ে জুড়ে জল-নিরুদ্ধ করতে হবে। এবার নলটিকে পেঁচিয়ে তার দুটি প্রান্তকে (T_1, T_2) বোটের পিছনের দিকে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে বের করে দিতে হবে (চিত্র 2)। চিত্র 3-এর নির্দেশিত মাপ নিয়ে ঐ অবশিষ্ট পাত থেকে ভাঁজ করে একটি হাল (R) তৈরি করে তার সঙ্গে লিভার (L) আটকে দিতে হবে (চিত্র 2)। নৌকার পিছনের দিকের পাত B-এর গায়ে হাল (R) এমন ভাবে লাগাতে হবে, যাতে সহজেই তাকে ঘোরানো যায়। পাকানো নলটির তলায় একটি ধাতব বাটিতে কিছুটা স্পিরিট ও তুলা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বোটটি কোন বড় জলের আধারের মধ্যে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, সেটি ক্রমশ সামনের দিকে চলতে থাকবে। অবশ্য আগুন জ্বালাবার আগে ঐ নলের প্রান্তে জল ঢেলে নলটি জলপূর্ণ করে নিতে হবে।



চিত্র



চিত্র 2



চিত্র 3

পাকানো নলটি বয়লারের কাজ করে। যখন ঐ নলটি গরম করা হয়, তখন তার মধ্যস্থিত জলও গরম হয় এবং ক্রমে বাষ্পে পরিণত হয়। উৎপন্ন বাষ্প ঐ নলের মধ্যে উচ্চচাপ প্রয়োগ করে; ফলে নলের একমুখ দিয়ে ঐ বাষ্প সজোরে বের হয়ে আসে। এ অবস্থায় নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল নৌকায় ক্রিয়া করে, এবং তখন তা জলের সান্দ্রতা কাটিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই বাষ্প সজোরে বের হয়ে আসার জন্যে নলে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং আশপাশের জলের চাপে নলের অপর মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা জল নলের শূন্যস্থান পূর্ণ করে। ঠাণ্ডা জলও ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে শেষে বাষ্পে পরিণত হয় এবং নৌকাটিকে সামনের দিকে চালিত করতে সাহায্য

করে। এই ভাবে যতক্ষণ আগুন জ্বলে ততক্ষণই নৌকাটি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। লিভার (L) ঘুরিয়ে অর্থাৎ হালের দিক পরিবর্তন করে বোটের গতির দিক পরিবর্তন করা সম্ভব।

এই ব্যবস্থায় জলকে উত্তপ্ত করে বাষ্প তৈরি করা হয় এবং ঐ উৎপন্ন বাষ্পের সাহায্যে নৌকাকে চালানো হয় বলে মডেলটির এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

কল্যাণ দাস*

*পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : 1. (ক) যে টবে ফুলচাষ করা হয় তার নিচে এবং অনেক সময় তার গায়ে কয়েকটি ছিদ্র থাকে—এর কারণ কি?

(খ) কোন কোন টব বালতির মত আবার কোন কোন টব গামলার মত চ্যাপ্টা হয় কেন?

(গ) টবের গাছে উইপোকা কিংবা পিঁপড়ের উপদ্রব হলে কিভাবে গাছকে রক্ষা করা যাবে?

প্রবীর রায়, মালদহ

উত্তর : 1 (ক) টবে ফুলের চাষ করার জন্যে নানান আকৃতির টব পাওয়া যায়। টবের তলদেশে একটি ছিদ্র রাখা হয়। তবে বড় টবের ক্ষেত্রে নিচের ছিদ্র ছাড়াও টবের গায়ের নিচের দিকেও কয়েকটি ছিদ্র থাকে।

কোন গাছ রোপণের জন্যে টবের ভিতরে প্রথমে কিছু টুক্‌রো ইট দিয়ে তার তলদেশকে তিন ইঞ্চির মত ভর্তি করা হয়। এবার জৈব ও অজৈব সার এবং মাটি একত্রে মিশিয়ে ইটের স্তরের উপরের অংশকে ভর্তি করা হয়। তবে বিভিন্ন গাছের ক্ষেত্রে সার ও মাটি এবং তাদের আপেক্ষিক পরিমাণ ভিন্ন হবে। মাটি ভর্তি করার পরও টবে অন্তত দু-ইঞ্চির মত জায়গা (টবের উপর থেকে) খালি রাখতে হয়। টবের গাছে জল দেওয়ার সময় বা বৃষ্টির জলে অনেক সময় অতিরিক্ত জল জমা হয়। ঐ অতিরিক্ত জল টবের নিচে এবং গায়ের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঐ অতিরিক্ত জল বের না হলে গাছের ক্ষতি করে এবং টবের মাটি ক্রমশ জমাট বেঁধে যায়; সেজন্যে মাটির জল শোষণ করবার ক্ষমতা কমে যায়।

(খ) টবে বিভিন্ন রকম ফুল ও অন্যান্য গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। কোন গাছের শিকড় মাটির খুব গভীরে প্রবেশ করে এবং কোন কোন গাছের বেলায় শিকড়

গাছের গোড়ার চারদিকের মাটিতে ছড়িয়ে থাকে; শিকড় মাটির বেশি নিচ পর্যন্ত প্রবেশ করে না। তখন দ্বিতীয় প্রকার গাছের যথাযথ পুষ্টির জন্যে চ্যাপ্টা টব ব্যবহৃত হয়। প্রথম শ্রেণীর গাছের জন্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা আকৃতির টব ব্যবহৃত হয়।

(গ) গৈরি এবং হীরমাক্ষী—এই নামে দু'প্রকারের মাটি খুবই সস্তায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এগুলি কেরোসিনে গুলে নেকড়া দিয়ে টবের গায়ে লাগিয়ে দিলে ঐ টবে উইপোকা বা পিঁপড়ে আসে না। সুতরাং গাছকেও এভাবে রক্ষা করা সম্ভব। তবে রং লাগানোর পর খুব বেশি দিন তা কার্যকরী থাকে না। তখন ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন ও রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে উইপোকা এবং পিঁপড়ের হাত থেকে গাছকে রক্ষা করা হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স এণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পুস্তক-পরিচয়

গাণিতিক বিশ্লেষণ—গ্রন্থটির লেখক—শ্রীযশোদাকান্ত রায়, প্রকাশিকা—শ্রীমতী রাধারাণী রায়, ঠিকানা—B. E. 301, লবণ হ্রদ, কলিকাতা-700 064; পৃষ্ঠা—203, মূল্য—টা. 12·50।

প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ একটি জাতীয় কর্তব্য। ভাষার মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের প্রকাশ ও প্রকাশনায় আসবে সাবলীল গতি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের যথাযথ পরিভাষা এবং পঠন-পাঠনের জন্য উপযুক্ত মানসিকতার অভাব উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের শিক্ষাদানের প্রধান অন্তরায়। এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে গাণিতিক বিশ্লেষণের দুরূহ বিষয়গুলি নিয়ে বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ সত্যই প্রশংসনীয়।

গ্রন্থটিতে সংখ্যা, সেট, ক্রম, ফাংশন, সান্তত্য ও শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে অনুচ্ছেদগুলি বেশ সুচিন্তিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রকাশ-ভঙ্গি সহজ, সরল ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাবর্জিত। আলোচনায় যথেষ্ট গভীরতা থাকার জন্যে ছাত্রছাত্রীরা আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে সমর্থ হবে। উদাহরণ ও অনুশীলনীতে বহু অংক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত হওয়ায় গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

ক্রম, হেতু, সাধ্য, বর্গ, সীমিত শ্রেণী, ফাংশন প্রভৃতি কিছু পরিভাষা ছাড়া বেশির ভাগ পরিভাষাই অর্থবহুল। অনুশীলনীতে আরো বেশি সংখ্যায় অংক ও

বিভিন্ন ধরণের অংক থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থখানি স্নাতক (সাম্মানিক) শ্রেণীর একটি পত্রের সামান্য মাত্র অংশের পরিপূরক। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ব্যাপারেও পুস্তকখানি থেকে বিশেষ লাভবান হবে বলে মনে হয় না। তবে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এটি সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়। ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি উচ্চমানের।

শ্রীরতনমোহন খাঁ*

*গণিত বিভাগ, সিটি কলেজ, রামমোহন সরণি কলিকাতা-700 009

বিশ্বভরা প্রাণ—গ্রন্থটির লেখক—শ্রীসুনির্মল রায় ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়; প্রকাশক—পাবলিশিং হাউস 13/1, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-700 012; পৃষ্ঠা 123; মূল্য—দশ টাকা। প্রকাশকাল—অক্টোবর, 1977.

গ্রন্থটিতে সৌর জগতের সৃষ্টি থেকে শুরু করে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কীয় বিভিন্ন রহস্য, প্রাণের বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, বংশধারার মধ্যে সমতা; পৃথিবীর বাইরে জীবনের সন্ধান ও তার বৈচিত্র্য, সম্ভাবনা; এবং সবশেষে জড় পদার্থ থেকে চেতনার সন্ধান ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সাবলীল ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। প্রাণসৃষ্টির পর বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং জীব ও জড়ের মধ্যে চেতনার অন্বেষণ—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। সেদিক থেকে গ্রন্থটির নামকরণ খুবই যুক্তিসঙ্গত। এর জন্যে গ্রন্থকারদ্বয় যে সমস্ত তথ্য গ্রথিত করে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন তা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অভিনব। গ্রন্থকারদ্বয়, বিশেষ করে শ্রীসুনির্মল রায় বহুদিন থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে বিভিন্নভাবে পরিবেশন করে আসছেন। তাই তাঁদের রচিত গ্রন্থ স্বভাবতই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান পরিণতিকে সুনিপুণভাবে পাশাপাশি রেখে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

গ্রন্থকারদ্বয় তাঁদের এই গ্রন্থে জটিলতা বর্জন করে সরল ও বোধগম্য ভাষায় যভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য পস্থাপিত করেছেন তা সাধারণ পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তুর জটিলতা হ্রাস করার প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নানারকম উপমার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে—তা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেননা সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যহানি ঘটিয়েছে। বেশ কিছু বানান ভুলও রয়ে গেছে।

গ্রন্থটি পাঠ করে শুধুমাত্র বিজ্ঞানানুরাগী সাধারণ পাঠকগণই নন, বিশেষজ্ঞরাও উপকৃত হবেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদপট এবং ছাপা যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স এণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পরিষদের খবর

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

শ্রীরামপুর সায়েন্স ক্লাব ও কল্পতরু ছোটদের আসরের যৌথ উদ্যোগে গত 28শে ডিসেম্বর, 1977 থেকে জানুয়ারী 1978 পর্যন্ত একটি হস্তশিল্প ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে 28 তারিখের পরিবর্তে 29 তারিখে এটির উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীটি বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্যে খোলা থাকত। হস্তশিল্প ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী ছাড়া বিজ্ঞান-বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা-চক্র, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ঐ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ছিল। উক্ত প্রদর্শনীতে পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের তৈরী কিছু মডেল প্রদর্শিত হয়। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম প্রাক্তন কর্মসচিব এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষ। স্থানীয় জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব হাওড়া 26শে ডিসেম্বর থেকে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এটি উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রদর্শনীতে পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের তৈরী কিছু মডেল প্রদর্শিত হয়। এটি প্রত্যহ বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দর্শকদের জন্যে খোলা থাকত। স্থানীয় অঞ্চলে প্রদর্শনীটি খুবই সাড়া জাগিয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য সভ্যাদের কাছে আবেদন করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন 1978 সালের জন্যে তাঁদের দেয় চাঁদা 20শে ফেব্রুয়ারী, 1978 তারিখের মধ্যে প্রদান করে পরিষদের কাজে সহযোগিতা করেন।

18ই ডিসেম্বর, 1977 — কর্মসচিব
সত্যেন্দ্র ভবন — বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কলিকাতা-700 006

ভ্রম সংশোধন : ডিসেম্বর '77 সংখ্যার বিষয়-সূচীতে প্রচ্ছদশিল্পীর নাম এবং 60 পৃষ্ঠায় 'ভেবে কর' প্রবন্ধ লেখকের নাম বাদ গেছে।

প্রচ্ছদশিল্পীর নাম—শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'ভেবে কর' লেখকের নাম শ্রীদুলালকুমার সাহা। এই ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

কার্যকরী সম্পাদক—শ্রীরতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'প্যাকেট সটিং সার্ভিস'-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক বা সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660

2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

প্রকাশক—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন : 55-0660

একমাত্র পরিবেশক : ওরিয়েন্ট লংম্যান অ্যাণ্ড কোং লিঃ

17, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-700 072

ফোন : 23-1601

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 2, ফেব্রুয়ারী, 1978

প্রধান উপদেষ্টা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কার্যকরী সম্পাদক
শ্রীরতনমোহন খাঁ

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সহায়তায়
পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ ফেব্রুয়ারী, 1978 দ্বিতীয় সংখ্যা

ধান ও ধানের প্রজনন পদ্ধতি

অসিতবরণ মণ্ডল*

প্রয়োজনের তাগিদে স্বল্প সময়ে অধিক ধান ফলানোর প্রচেষ্টা বহুকালের। আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও প্রজাতির ধান। এরই ধারাবাহিক পর্যালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

ধান পৃথিবীর একটি আদিম শস্য। এর উদ্ভিদ-বিজ্ঞানগত নাম অরিজ স্যাটাইভা (Oryza sativa)। খৃষ্টপূর্ব প্রায় 2800 বছর আগে থেকে ভারত এবং চীনে ধান চাষ শুরু হয়। তাই এই হাজার হাজার বছরের মধ্যে অনেক প্রজাতিরও আবির্ভাব হয়েছে।

নতুন ধান ওঠার পর সঙ্গে সঙ্গে অথবা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বপন করলে ধানের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বীজের এই বৈশিষ্ট্যকে সুপ্ততা (dormancy) বলে। বেশির ভাগ উদ্ভিদেই ফুলফোটা নির্ভর করে দিনের আলোর তারতম্যের উপর। যে সব উদ্ভিদে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত, তাদের আলো-উদাসীন (photoneutral) বলা হয়।

ভৌগোলিক পরিবেশ এবং গাছের অঙ্গসংস্থানের (morphological) বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ধানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—জাপোনিকা,

*বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

ইনডিকা ও জাভানিকা। জাপোনিকা প্রজাতির ধান জাপান, কোরিয়া এবং উত্তর চীনের অন্তর্গত। ইনডিকা প্রজাতির ধান ভারত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান ও জাভা এবং জাভানিকা প্রজাতিগুলি ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত। ইনডিকা শ্রেণীর ধান অধিক নাইট্রোজেন-ঘটিত সারে জন্মাতে পারে না, এদের দানার সুপ্ততা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রধান গাছটি থেকে বেশি পরিমাণ পাশকাটি জন্মায়, পাকার পর ধান সহজে ঝরে পড়ে, গাছ আলো-উদাসীন নয়। জাপোনিকা প্রজাতির ধান অধিক নাইট্রোজেন-ঘটিত সারে জন্মাতে পারে, অধিকাংশ প্রজাতিগুলিতে বীজের সুপ্ততা বৈশিষ্ট্য থাকে না, গাছগুলি আলো-উদাসীন, পাকাদানা সহজে ঝরে পড়ে না। শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের (physiological characteristics) উপর নির্ভর করে ধানকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(i) গভীর জলের ধান (deep water paddy), যেগুলি 3 থেকে 5 মিটার জলে জন্মায়; (ii) অগভীর জলের ধান (shallow water paddy), যেগুলি 1 থেকে 2 মিটার জলে জন্মায় এবং (iii) কতকগুলি প্রজাতি আছে যেগুলি আবদ্ধ জল ছাড়াই জন্মাতে পারে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে একটি প্রধান পদক্ষেপ ভাল প্রজাতি বাছাই-করণ। উচ্চফলনক্ষম প্রজাতির উৎপত্তির পূর্বে এমন কোন প্রজাতি ছিল না যা একরে 24 থেকে 27 কুইন্ট্যাল ধান উৎপাদন করতে পারতো, কিন্তু প্রজনন উপায়ে উচ্চফলনক্ষম প্রজাতির আবির্ভাবে এই উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রথম উচ্চফলনক্ষম প্রজাতির চাষ আরম্ভ হয় 1966-67 সালে এবং সেগুলি বিদেশেই উৎপত্তি লাভ করে। যথা তাইচুং নেটিভ-1, আই. আর. 8, তাইনান-3. তার পর কয়েক বছরের পর থেকে (1968-69) এদেশে বিদেশাগত বিভিন্ন ধানের সঙ্গে এখানকার দেশীয় উন্নত জাতের ধানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বেশ কতকগুলি জাতের ধান বের করা হয়েছে। ধানের প্রজনন পদ্ধতি অন্যান্য স্বপরাগ সংযোগকারী উদ্ভিদের প্রজনন পদ্ধতির অনুরূপ।

প্রচলন ও জার্মপ্লাজ্‌ম্‌ সংগ্রহণ—প্রজননকে সফল করতে হলে ভাল গুণসম্পন্ন প্রজাতির দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহের প্রয়োজন। ধানের ক্ষেত্রে পূর্বে এদেশে দেশীয় প্রজাতির উপর প্রজনন সীমিত ছিল। কিন্তু অধিক নাইট্রোজেনঘটিত সারে জন্মানো, আলো-উদাসীন, বেঁটে জাতের অধিক ফলনক্ষম বিদেশী প্রজাতিগুলির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও নতুন প্রজনন ঐ দিকে বিস্তারলাভ করে। তা সম্ভব হয় বিদেশ থেকে উচ্চফলনক্ষম প্রজাতিগুলিকে দেশে এনে। সেগুলির মধ্যে আই আর-8, তাইচুং নেটিভ-1, পঙ্কজ, তাইনান-3 অন্যতম। এগুলিকে কৃষিতে প্রথমের দিকে প্রত্যক্ষ-ভাবে কাজে লাগানো হয়। পরে অবশ্য এগুলির সঙ্গে আমাদের দেশীয় উন্নত প্রজাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অনেকগুলি প্রজাতি বের করা হয়।

সংকরণ (Hybridization)—প্রজনন সংকরণ একটি বিশেষ পদ্ধতি যার দ্বারা নতুন উদ্ভিদসংখ্যা তৈরি করা যায় এবং স্বতন্ত্রীকরণ (segregation) ও পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ক্রমশ নতুন ধরণের জেনোটাইপ তৈরি করা সম্ভব।

সংকরণ পদ্ধতি প্রয়োগের আগে গাছ বাছাই একটি প্রধান পদক্ষেপ। চাষীদের প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ভিদ প্রজননবিদ্‌রা গাছ বাছাই করেন। কোন্ ধরনের বৈশিষ্ট্যকে প্রজনন উপায়ে স্থানান্তরিত করা হবে তা আগেই পরিকল্পনা করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমের দিকে রাসায়নিক সারের প্রচলন ছিল না এবং খড়গুলিকে গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট গাছের প্রজননের উপর জোর দেওয়া হত। কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়ার দরুণ এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা অনুযায়ী অধিক ফলনক্ষম প্রজাতির প্রজননের উপর জোর দেওয়া হয়। সেই জন্যে প্রথমে জাপোনিকা×ইনডিকা প্রজনন হাতে নেওয়া হয়।

তাথেকে মোটামুটি কয়েকটি ভাল প্রজাতিও উৎপত্তি লাভ করে, যেমন—এ ডি টি.- 7। পরে অবশ্য (1966-67) বিদেশ থেকে বেশ কতকগুলি উচ্চফলনক্ষম প্রজাতি আনা হয়। সেগুলিকে আমাদের দেশীয় প্রজাতির সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে বেশ কিছু প্রজাতি বের করা হয়। এদের মধ্যে জয়া (টি এন -1 × টি-'41), পদ্মা (টি-141 × টি এন-1), রত্না (টি কে এম.-6 × আই আর -8), কাবেরী (টি. এন.-1 × টি কে. এম.-6) প্রভৃতি অন্যতম। এগুলির মধ্যে বেশ কতকগুলি নতুন ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে, যা কৃষিকার্যে সাফল্যজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন—জয়া, পদ্মা জলদি জাতের ধান 120 থেকে 135 দিনের মধ্যে পেকে যায়। রত্না সরুজাতের ধান। এও জলদি জাতের এবং প্রায় 115 দিনে পেকে যায়।

নির্বাচন (Selection)—স্বপরাগ সংযোগকারী শস্যে সংকরণের পর নির্বাচন কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। সংকরণের পর ক্রমাগত দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি প্রজন্মগুলি (generations) লাগিয়ে সেগুলি থেকে দুটি উপায়ে প্রজাতি নির্বাচন করা যেতে পারে (i) নিঃশর্ত নির্বাচন পদ্ধতি, (ii) কুলজী (pedigree) পদ্ধতি।

কুলজী পদ্ধতিটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ কয়েক প্রজন্মর পর থেকে মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রেখে ঐ গাছ নির্বাচন করা হয়, এবং এই পদ্ধতিতে সাধারণত দ্বিতীয় প্রজন্মতে নির্বাচিত গাছের প্রতিটি 'ছড়া' (ear) আলাদা করে সংগ্রহ করা হয় এবং তৃতীয় প্রজন্মর জন্যে লাগানো হয়। এই প্রজন্ম থেকে অনুরূপ ভাবে গাছ বাছাই করে 'ছড়া' সংগ্রহ করে পরবর্তী প্রজন্মতে লাগানো হয়ে থাকে। এর ফলে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির (progeny) সম্পর্ক সহজে বের করা যায়। কিন্তু নিঃশর্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে এরকম উপায় অবলম্বন করা হয় না। নির্বাচন কাজটি আবার চাষীদের জমি থেকে সম্পন্ন করা যায়। যখন কয়েকটি প্রজাতির ধান পাশাপাশি চাষ করা হয় তখন বাতাস ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা এদের পরস্পরের মধ্যে পরাগ-সংযোগ ঘটে। ফলে প্রজাতিগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কয়েক প্রজন্মর মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কোন একটি প্রজাতি কতকগুলি সমপরিণতি জেনোটাইপের (homozygous genotype) সংমিশ্রণে পরিণত হয়। তাই এগুলি থেকে আবার কয়েকটি প্রজাতিকে বেছে নেওয়া চলতে পারে—কতকগুলি বিভিন্ন গুণসম্পন্ন গাছকে একত্রিত করে কিংবা একটিমাত্র জেনোটাইপকে নিয়ে।

পশ্চাৎ প্রজনন—এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয় যখন কোন গুণ (যেমন কীট-পতঙ্গ, রোগ প্রতিরোধক্ষম গুণ বা সুপ্ততা গুণ প্রভৃতি) এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে সঞ্চার করানোর প্রয়োজন হয়। ধরা যাক A একটি ধানের ভাল প্রজাতি কিন্তু রোগ প্রতিরোধে অক্ষম। কিন্তু B অন্য একটি প্রজাতি—যার মধ্যে ঐ প্রতিরোধ গুণটি আছে। তখন A-এর সঙ্গে B-এর প্রজনন ঘটানো হয় এবং এদের থেকে উৎপন্ন প্রথম প্রজন্মটিকে (F_1) ঐ A-এর সঙ্গে কয়েকবার প্রজনন ঘটিয়ে ক্রমশ A প্রজাতিটিকে পুনরায় পৃথক করে আনা হয়। এখন এই A প্রজাতিটির মধ্যে রোগ প্রতিরোধক্ষম গুণটি সঞ্চারিত হয়ে একটি আরও ভাল গুণসম্পন্ন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটায়।

পরিব্যক্তি প্রজনন (Mutation Breeding)—অন্যান্য শস্যের মত ধানেও কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক বস্তুকে স্থায়ী বংশগত রূপান্তরের (যাকে বলা হয় পরিব্যক্তি) জন্যে কাজে লাগানো চলে। এদের মধ্যে এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি, নিউট্রন-রশ্মি, ইথাইলমিথেন সালফোমেট ও নাইট্রাস অ্যাসিড অন্যতম। এই রূপান্তরকারী বস্তুগুলি (mutagens) ধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন প্রজাতির জন্ম দিতে পারে। এগুলিকে গাছের চারা অবস্থায় (seedling stage), বর্ধিষ্ণু অবস্থায় ও বীজ অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে।

রূপান্তরকারী বস্তু প্রয়োগে বেশ কয়েকটি ভাল প্রজাতি উৎপন্ন হয়েছে। যেমন টি-141-এর উপর নিউট্রন-রশ্মি প্রয়োগ করে 'জগন্নাথ', আই-আর-8-এ এক্স-রশ্মি প্রয়োগ করে সি. এন. এম.-25, সি. এন. এম -31 প্রজাতিগুলি বের করা হয়েছে।

পলিপ্লয়ডি প্রজনন (Poliploidy Breeding)—প্রকৃতিতে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায়, সেগুলির অধিকাংশই ডিপ্লয়েড (diploid) সংখ্যক ক্রোমোজোম বহন করে। যেমন ধান উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম বহন করে (2n = 24)। কখন এই সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে নতুন ক্রোমোজোম সংখ্যা উৎপন্ন করে। এইরূপ নতুন ক্রোমোজোম সংখ্যাকে পলিপ্লয়েড বলা হয়। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে ঘটে।

এইভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্রজনন ঘটানো ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক নয়। কারণ এক্ষেত্রে পলিপ্লয়েড গাছ সাধারণ গাছের তুলনায় উচ্চতায় অনেক কম। তাছাড়া পলিপ্লয়েড বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কম।

আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রটিকে বাদ দিলে এদেশে কটক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রটি দ্বিতীয় বৃহত্তম। তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গে চুঁচুড়ার গবেষণা কেন্দ্রটিরও নাম করা যেতে পারে। এই সব বিভিন্ন ধান্য গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে আন্তর্জাতি প্রজনন ছাড়াও ইনডিকার অন্তর্গত প্রজাতিগুলির সঙ্গে জাপোনিকার অন্তর্গত প্রজাতির প্রজনন বেশ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে দুই গোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য একটি প্রজাতিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে যে প্রজাতিগুলি উৎপন্ন হবে সেগুলির বৈশিষ্ট্য ইনডিকা বা জাপোনিকার প্রজাতিগুলির সঙ্গে মিল থাকবে না; এদের বৈশিষ্ট্য ঠিক ইনডিকা এবং জাপোনিকার অন্তর্গত প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলির মাঝামাঝি আকার ধারণ করবে।

কারখানার উৎপাদনে সঙ্গীতের অবদান

প্রভাসচন্দ্র কর*

কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে পার্শ্বসঙ্গীতের কি কোন প্রভাব আছে? এ বিষয়টিই এখানে আলোচিত হয়েছে।

গান প্রায় সকলের প্রিয়। কিন্তু শুধু ভারতবাসীরাই কি সঙ্গীতের বোদ্ধা, এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল অথবা ভক্তিনম্র? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা কি সঙ্গীতপ্রিয় নয়? এর সঠিক জবাবে বলতে হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোকেদেরও গান সমান ভাবেই প্রিয় অর্থাৎ সহজ কথায় গান সকলেই ভালবাসে। তবে কথা হচ্ছে—স্বভাবতঃই গীতি-মন্ত্র ও গীতি-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে হিন্দু সুরস্রষ্টাদের কথা মনে উদিত হয়। স্যার ওয়াল্টার স্কট্-এর অমর ওয়েভার্লি নভেলস্-এ এহেন সমর্থনোক্তি পাওয়া যায়। স্কট্ মাত্র গুটিকয়েক শব্দ দ্বারা তার ব্যঞ্জনা করেছেন—'I heard.........flageblot play the little Hindu tune.' এথেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, হিন্দু সুরকারদের অমরকীর্তি সাগরপারের মনীষীবৃন্দকেও কম মুগ্ধ করে নি। স্যার ওয়াল্টার-এর উক্ত উদ্ধৃতির সাবলীল অনুবাদ করলে বিশ্বকবি ছন্দিত ভাষায়

* 7/3, শীতলামাতা লেন, কলিকাতা-700 050

বলা যায়—'বংশীর সুরে তালে বাজে ঢোল ঢাক।' এখানেই শেষ নয়। প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি **Thomas Moor (1779—1852)** তাঁর রচনায় **'Vina'** ('বীণা') শব্দটি ব্যবহার করে ভারতবর্ষের বাদ্যযন্ত্রের অমোঘ কুশলতাকে মর্যাদা দান করে গিয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্যমান নিবন্ধের শিরোনামাটি একটু বিসদৃশ ঠেকতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তুটি ব্যাপক ও সেই সঙ্গে তাৎপর্যবহুল। গান অর্থে সচরাচর কবিত্ব ও সুরসমণ্ডিত লালিত্যময় ভাবমঞ্জুষা আর কারখানার উৎপাদন অর্থে রসহীন কর্মকাণ্ড অর্থাৎ গানের বিপরীতভাব।

তবে তারই ভিতর আবার রয়েছে অন্য বিবেচ্য বিষয়। গান তো আর এক রকমের নয়। তা হয়ে থাকে অনেক রকমের—আনন্দগীতি, বিলাপ-বিষাদময় গীতি, স্বাদেশিকতামূলক ও স্বদেশ-বিষয়ক গীতি, ব্যঙ্গ-কৌতুক গীতি, আরও কত রকমের সুরের রেশের গান, চটুল-চপল মনোভাব ব্যক্তকারী সঙ্গীত ইত্যাদি। এই সেদিনও স্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকীয়তে (মে 13, 1977) লেখা হয়েছে **'Music said Congreve, has charms to soothe a savage beast'... (Congreve William** ছিলেন ইংরেজ নাট্যকার **1670—1729**। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গানের মাঝে এত যে মাধুরী তাও নানা বৈচিত্র্যেভরা। এতক্ষণ গানের স্বপক্ষে অনেক প্রশংসা করা হল। সুতরাং স্বভাবতঃই গানের মাধুর্যের জের টেনে দেখা যাক কারখানার উৎপাদনে তা কিভাবে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। প্রথমেই প্রশ্ন হচ্ছে, গানের সঙ্গে কারখানার উৎপাদনের আবার কি বা কতটা সম্পর্ক? বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে যেন একেবারে তেল-জলের সম্পর্ক। সাময়িকভাবে তেল-জল মিশে গেলেও কিছু পরে আলাদা আলাদা স্তরে ভাগ হয়ে যায়।

কারখানার উৎপাদনক্ষমতা ও সঙ্গীতের মিলনে কি সুফল লাভের আশা করা যায়? তেল-জলের মিশ্রণের মত তা আপাতমিশ্রণ হবে না তো? বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক।

গানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে বৈরীভাব আছে তা নয়। পৃথিবীর সেরা সেরা বিজ্ঞানীরাও কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত ভালবাসেন বা ভালবেসে এসেছেন। উদাহরণ দিলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হবে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার জেমস্ জীনস বই লিখেছিলেন—**Science and Music** শীর্ষক। নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত বিজ্ঞানী রামন সঙ্গীতের প্রতি কম আগ্রহী ছিলেন না।

স্যার সি ভি রামন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন **(1930)**। তার আগে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার নেবার জন্যে সুইডেনে গিয়েছিলেন, বিদগ্ধমণ্ডলীর মাঝে তখন কিছু কিছু ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করেছিলেন। **1930**-এতেও নাকি সঙ্গীতের সে সুখস্মৃতি সেখানকার বিদগ্ধ সমাজে সজীব ছিল! আর স্যার চন্দ্রশেখর যখন সুইডিশ আকাদেমীর সভাপতি ডঃ পেট্রারসনের বাড়িতে ভোজে আমন্ত্রিত হন, তখন অধ্যাপক রামন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত পরিবেশনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন **(Calcutta Municipal Gazette** জুলাই **4, 1931**)।

বিশ্ববরেণ্য যুগপ্রবর্তক আইনষ্টাইন-এর বেহালা বাদনে দক্ষতা ছিল। এর সমকক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না—খ্যাতকীর্তি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ গান ভালবাসতেন, বাজাতেন নিজের মনোজ্ঞ তারের যন্ত্র নিপুণভাবে। এ ধরণের আর দৃষ্টান্ত দিয়ে নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির অনর্থক প্রয়াস যুক্তি-সঙ্গত হবে না।

সুতরাং বিজ্ঞানী মহলে গান-বাজনা নিজগুণে যদি আসন গ্রহণ করে থাকে, তবে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদনের উপর তাদের প্রভাব থাকবে নিশ্চয়—এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতান্ত নিরর্থক বা অবান্তর হবে না। তবে এটাও ঠিক যে, জ্ঞান একদিকে

যেমন অপার্থিব জিনিষ, তেমনি অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে গান-বাজনা বিজ্ঞানভিত্তিক।

বিজ্ঞানীমহল থেকে এবার নেমে আসা যাক বিজ্ঞানভিত্তিক নিষ্প্রাণ শিল্প পর্যায়ে; আসা যাক— ব্যক্তির মূল্যায়ন বোধ থেকে কায়ক্লেশ জড়িত শিল্প-কারখানার গীতি-মূল্যায়ন বোধের ব্যাপারে।

কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের উপর নেপথ্য সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব তুলনা-মূলক ভাবে লক্ষ্য করা যাক। এ কথার দ্বিরুক্তি করে বলা যায়—ঐসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলিরই যথেষ্ট সুনাম ও পারদর্শিতা রয়েছে তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে। এই সব প্রতিষ্ঠানের আধুনিক কর্মপন্থার অনুষ্ঠান-সূচীতে রয়েছে—কারখানার মধ্যে উৎপাদন স্থলে নেপথ্য সঙ্গীত!

ছোট-বড় হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কয়টি সুপরিকল্পিত পার্শ্ব-গীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন, এটা শ্রমিকদের কল্যাণকর পরিবেশ ও উৎপাদনের উন্নতি বিধানের সহায়ক।

বার বার সমীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে জানা গিয়েছে, সযত্নে সাজানো ও রেকর্ড করা গান বাজানো বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুষ্ঠেয় শ্রমিকগোষ্ঠীর কর্মাভ্যাসের উপর ভাল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। পার্শ্বগীতি সেই সময়ে কার্যকরী হবে যখন শ্রমিকের পূর্ণ মানসিক শক্তি কাজে লাগে না। পরিবেশ অনুযায়ী গানের ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রসূ। হাল্কা ধরনের জোড়াতালি দেওয়ার কাজে, পোষাক-পরিচ্ছদের কারবারে, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনে, অফিসের কাজে—এক কথায় যেখানে যেখানে এক-ঘেঁয়েমি, ক্লান্তিজনক ঘরঘরানি, দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে থাকে, যেখানেই ভ্রান্তি ও দুর্ঘটনা— সেখানেই গান আদর্শস্থানীয়। কারখানার যন্ত্রসমাবেশের ভিতর যেখানে যেখানে নেপথ্য সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে শ্রমিকরা সাধারণভাবে তা অপছন্দ করছেন না। তাঁদের চাপা উত্তেজনা বা মানসিক চাপ কম হয়ে যাচ্ছে, কারখানায় অনুপস্থিতি হ্রাস পাচ্ছে। উৎপন্ন সামগ্রীর গুণগত মানের উন্নতি সাধিত হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে শ্রমিকগণ এই মত প্রকাশ করছেন যে, এতে তাঁদের মনে হয় যেন সময় তাড়াতাড়ি বয়ে যাচ্ছে এবং কাজকর্ম তাদের উপভোগ্য হয়। কাজে মন বসাতে বা ভাল লাগানোর ব্যাপারে সহায়তা করে চলে গান। কারখানা সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানীদের মতে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রমিকবর্গের ক্ষেত্রে এ ধরনের গানের দরুণ ফল দাঁড়াচ্ছে শুভদায়ক। উৎপাদনক্ষমতা শতকরা পাচ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বলা যায় যে, যে সমস্ত শ্রমিক স্বভাবে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তাঁদের ক্ষেত্রে গান তেমন ফলদায়ক নয়। এর আর এক সুফল হচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে অদক্ষ অবস্থার প্রতিবিধানের দ্বারা গান কারিগরি প্রতিষ্ঠানেও যথেষ্ট উৎপাদন আনুকূল্য আনছে।

এসব কথা বলা সত্বেও যদি কোন পাঠকের মনে সংশয় থাকে তবে তা নিরসনের জন্যে পূর্ব-কথিত প্রতিষ্ঠানগুলির নামোল্লেখ করা যাক। এগুলি হল ফারবেনফ্যাব্রিকেন বায়ার এজি (লিভার কুশেন, জার্মেনী), নিপ্পন ইলেকট্রিক কোম্পানী (টোকিও, জাপান), ইলকোর্ড ফিল্মস্ (লণ্ডন)। এই সব স্বনামপ্রতিষ্ঠ কারখানা ব্যবস্থাপনার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে নেপথ্য সঙ্গীতের আশ্রয় নিচ্ছেন— নীতি-নিষ্ঠার উন্নতিকল্পে, উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে এবং শ্রমিককুলের ব্যক্তিগত অবসাদ দূরীকরণে। জার্মেনীর বায়ার-এর সমীক্ষার কথাই ধরা যাক। এর শ্রমিকবর্গের 84·7% এক সাক্ষাৎকারে জানান, নেপথ্যগীতি তাঁদের কাজকে করে তুলে আরও উপভোগ্য। শ্রমিকদের শতকরা 8১·3% বলেন যে, পার্শ্বগীতি সৌহার্দ্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে অনুকূল এবং শতকরা 53·8% শ্রমিকদের মতে এটা সঙ্গী-সাথীদের অল্পই স্নায়বিক বৈকল্য এনে থাকে এবং 83·8% এর মতে শ্রমজনিত একঘেঁয়েমি হ্রাসের

ফলে পার্শ্বগীতি হয়ে থাকে অধিক সৃজনমূলক ও উৎপাদনশীল।

কারখানায় নেপথ্য সঙ্গীত নিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান আগ্রহী, তাঁরা যে সকলেই কারখানা-অফিসঘরে সঙ্গীত পরিচালনের জন্যে যন্ত্রপাতিখাড়া করে থাকেন তা নয়। এই সব কারখানার অনেকগুলিই চাঁদা দেয় এমন সব গানের প্রতিষ্ঠানকে যাঁরা টেলিফোন বা মাল্টিপ্লেক্স রেডিও দ্বারা সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

ইউরোপের মধ্যযুগের স্থাপত্য

অবনীকুমার দে*

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—এই মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন স্থাপত্য ও তার যে নানান বৈশিষ্ট্যের কথা শোনা যায়, তা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পরার পর ক্রমে ক্রমে ইউরোপে পাশ্চাত্য সভ্যতা অস্তমিত হল। ব্যবসা বাণিজ্যও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে নগরবাসীরা গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। শহরগুলি ক্রমশ আয়তনে ছোট হয়ে এল এবং ক্রমে তাদের প্রাধান্যও কমে এল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে যে সব প্রাচীন রোমান নগর টিকে ছিল সেগুলি খুবই অবহেলিত অবস্থায় ছিল। এর পর দশম ও একাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলল মধ্যযুগ। তার পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে বলা হয় রেনেশাঁস যুগ।

রোম সাম্রাজ্যের অবসানের পর কৃষ্টিহীন বিদেশী শাসকরা অনেকগুলি শহর—রাজ্য স্থাপনা করলেন। এই সব শাসক বর্ধিষ্ণু জমিদারদের মধ্যে তাঁদের রাজ্য ভাগ করে দিলেন। এই জমিদারেরা শাসকদের রাজ্য রক্ষা করার জন্যে সামরিক সাহায্য দিতেন। এই সময়কার অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান। সাধারণ লোক কৃষিকার্য করে জীবিকানির্বাহ করত। তারা তাদের জমিদার প্রভুদের ভূমিদাসে পরিণত হল। মধ্যযুগে সামরিক সাহায্য দেওয়ার পরিবর্তে এই জায়গীর প্রথার নতুন চলন হল।

এই সব প্রতিদ্বন্দ্বী জায়গীরদারদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। সেই জন্যে তাঁরা যুদ্ধের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে তাঁদের দুর্গ তৈরী করতেন। আশপাশের পল্লীঅঞ্চলের ভূমিদাসরা এই সব সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে আশ্রয় পেত। মধ্যযুগের কয়েক শতাব্দী ধরে উৎপীড়িত লোকরা সন্ন্যাসীদের মঠেও আশ্রয় লাভ করত। এই যুগে গির্জা ও ধর্মযাজকরাও ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। দুর্গ ও সন্ন্যাসীদের মঠের চারপাশে সাধারণের বসত বাড়িগুলি খুব কাছাকাছি সন্নিবেশিত থাকত এবং এই সব দুর্গ ও মঠের সুরক্ষিত প্রাচীরের মধ্যে সকলেই মিলে মিশে থাকত।

*স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর

পরে যুদ্ধের সময় পাথর ছোঁড়বার জন্যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। অবরুদ্ধ নগরীর প্রাচীর ও দ্বার ভাঙবার জন্যে কাঠের গুঁড়ির মুখে লোহা লাগান এক রকম যন্ত্র ব্যবহৃত হতে লাগল। ফলে আরও চওড়া ও মজবুত রক্ষা প্রাচীর তৈরি করা হতে লাগল। পল্লী অঞ্চলে বাস করা আর বিশেষ নিরাপদ রইল না। সেই জন্যে নাগরিক জীবনে ফিরে যাবার জন্যে সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

একাদশ শতাব্দীতে ব্যবসাবাণিজ্য পুনর্জীবন লাভ করল। জায়গীরদাররাও তাঁদের জমির থেকে আরও বেশি করে রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন। পুরনো রোমান নগরগুলির পুনরুদ্ধার করা হল। অনেক নতুন নগরও ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল। জায়গীরদাররা নাগরিক জীবনের প্রতি ঔৎসুক্য দেখাতে লাগলেন।

বণিক ও কারিগররা তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী, কসাই, তাঁতি, দর্জি প্রভৃতি সকলেই তাঁদের তৈরি জিনিষপত্রের নিম্নদাম বেঁধে, উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে ও ব্যবসা বাণিজ্য ঠিকমত চলার জন্যে নিয়মাবলী তৈরি করলেন। এইভাবে জায়গীরদারদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক বিত্তশালী বণিক শ্রেণী মাথা তুলে উঠতে লাগল।

মধ্যযুগের প্রতিষ্ঠান—এই যুগের প্রতিষ্ঠান বলতে ছিল সন্ন্যাসীদের মঠ ও কারিগরদের সঙ্ঘ। মঠে অধ্যয়ন, গভীর চিন্তা, ধ্যান ইত্যাদি কাজই হত। মঠ ও কারিগরদের সঙ্ঘ এই দুই মিলে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হল। এখানে আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, কলাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণা করা হত। বণিক সম্প্রদায় এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। গির্জার আনুকূল্যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বণিক, কারিগর, জনসাধারণ ও কৃষক সকলেই নগরের বাজার, সঙ্ঘভবন বা গির্জায় পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং প্রত্যেকেই মনে করতেন যে তিনি সমাজের একজন সক্রিয় নাগরিক।

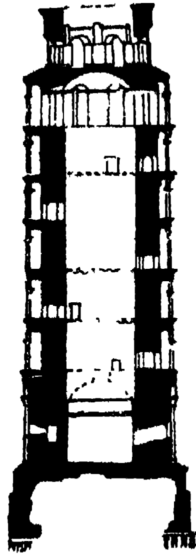
ইউরোপের রোমানেস্ক্ (Romanesque) স্থাপত্য—রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপের যে সব দেশ রোমানদের শাসনাধীনে ছিল সেই সব দেশে রোমানেস্ক্ শৈলীর স্থাপত্য গড়ে উঠল। রোমান স্থাপত্য থেকে এই স্থাপত্য শৈলী এসেছিল। রোমানদের প্রস্থানের পর থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যখন ছুচালো খিলানের ব্যবহার সুরু হল—এই দীর্ঘ সময় ধরে রোমক কলার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় স্থাপত্যের পর্যায়কে বলা হয় রোমানেস্ক্। পশ্চিম ইউরোপীয় স্থাপত্যের এক অংশ পূর্ব দেশগুলির স্থাপত্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিল। একে বলা হয় বাইজান্টাইন্ (Byzantine) স্থাপত্য। ভেনিস, রাভেনা (Ravenna), মার্সেই (Marseilles) প্রভৃতি শহর থেকে প্রধান প্রধান ব্যবসাবাণিজ্যের পথ দিয়ে বাইজানটাইন্ কলা পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত হয়েছিল। রোমানেস্ক্ শৈলীর স্থাপত্য বাইজান্টাইন্ কলার কাছেও কিছু অংশে ঋণী।

স্থাপত্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যেত। ইউরোপের উত্তরাংশে আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত বেশি ঠাণ্ডা ও মেঘলা হওয়ায় এখানকার গৃহে যথেষ্ট পরিমাণে আলো প্রবেশ করবার জন্যে বড় বড় জানলা রাখা হত। দক্ষিণাংশে প্রখর রৌদ্র কিরণ থেকে বাঁচাবার জন্যে গৃহে জানালাগুলি ছোট ছোট করা হত। উত্তরাংশে গৃহের ছাদ থেকে বৃষ্টির জল ও বরফ সহজে গড়িয়ে পড়বার জন্যে খুব ঢালু ছাদ ব্যবহার করা হত। দক্ষিণাংশের গৃহে সমতল ছাদ ব্যবহার করা হত।

ইটালীর রোমানেস্ক্ স্থাপত্য—মধ্য ইটালীর পিসার ক্যাথিড্রাল বা গির্জা (Pisa Cathedral)

ও হেলান বাড়ী ইটালীয় রোমানেস্ক্ স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 1063 থেকে 1092 খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত পিসার গির্জা এই পর্যায়ের প্রথম দিকের তৈরি অন্যান্য ব্যাসিলিকান গির্জার মত দেখতে। এটির খিলান দিয়ে যুক্ত লম্বা লম্বা থামের সারি, কাঠের ছাদ, ডিম্বাকৃতি গম্বুজ, সাধারণ সুসামঞ্জস্য, সুন্দর ও সূক্ষ্ম অলঙ্কারের কাজ ইত্যাদি সব কিছু মিলে এটিকে অপূর্ব সুন্দর করে তুলেছে।

1174 খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত পৃথিবী বিখ্যাত 'পিসার হেলানো বাড়ী' (Campanile Pisa) 52 ফুট ব্যাসের একটি গোলাকার বুরুজ (চিত্র 1)। এটি



চিত্র 1—পিসার হেলানো বাড়ি
(ইতালীয় রোমানেস্ক)

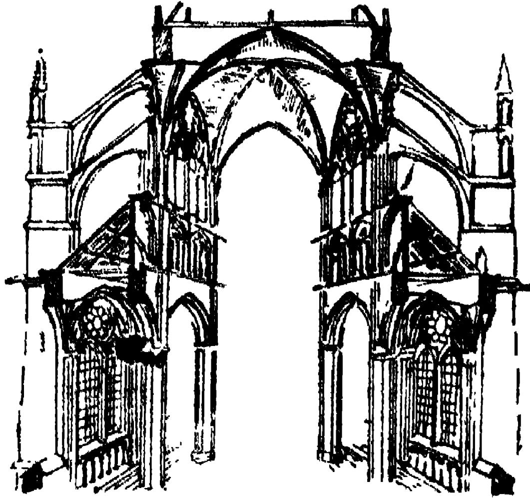
আটতলা উঁচু এবং এর চারদিকে আছে সারি সারি থামওয়ালা অর্ধগোলাকার ছাদযুক্ত বারান্দা।

ফরাসী রোমানেস্ক্ স্থাপত্য—অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হল ফরাসী রোমানেস্ক্ স্থাপত্যের যুগ। উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সে এই স্থাপত্যের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের। দক্ষিণ ফ্রান্সে এই স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল অলঙ্কারবহুল গির্জার সম্মুখভাগ ও সুন্দর খিলান দ্বারা ঢাকা ভিতরের পথ। প্রাচীন রোমান স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হত। উত্তর ফ্রান্সে রোমান স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ অল্প সংখ্যক থাকায় এখানে নতুন শৈলীর স্থাপত্য গড়ে ওঠার আরও বেশি সুবিধা হয়েছিল। এখানে, বিশেষত নর্ম্যাণ্ডিতে গির্জার পশ্চিমদিকের সম্মুখভাগের দুই পাশে থাকত দুটি বিশাল বুরুজ। অন্যান্য দিকের সম্মুখভাগে থাকত মোটা মোটা দেয়াল এবং তার মাঝে মাঝে চ্যাপ্টা ঠেকানগুলি দেয়ালকে দেখতে আরও আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলেছিল।

জার্মান রোমানেস্ক্—স্থাপত্যের যুগ হল অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়ে নির্মিত গির্জাগুলির পরিকল্পনা (plan) অদ্ভুত ধরণের। পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই ছিল 'অ্যাপ্স' (apse)। সেই জন্যে ফ্রান্সের মত এখানকার গির্জাগুলিতে পশ্চিম-দিকে বিরাটাকার প্রবেশদ্বার ছিল না। দুটি করে অ্যাপ্সের প্রচলন কেন ছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অসংখ্য বৃত্তাকার ও অষ্টভুজাকার ছোট গম্বুজ, বহুভুজাকৃতি গম্বুজ, গির্জার ভিতরে লম্বালম্বি দু'পাশে খিলানযুক্ত দীর্ঘ সংকীর্ণ পথ বা গ্যালারী, অসংখ্য অলঙ্করণে সমৃদ্ধ দরজা ইত্যাদি এই সময়কার গির্জাগুলিকে দেখতে অত্যন্ত মনোরম করে তুলেছিল।

ইউরোপের গথিক স্থাপত্য—রোমানেস্ক্ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল গোলাকৃতি খিলান আর ছুঁচালো খিলানের স্থাপত্যকে বলা হয় গথিক (চিত্র 2)। 1200 থেকে 1500 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গথিক স্থাপত্যের যুগ ধরা হয়। এখন মোটামুটিভাবে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকে এই নামে অভিহিত করা হয়। সারা ইউরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গথিক স্থাপত্য ধীরে ধীরে রোমানেস্ক্ স্থাপত্য থেকে গড়ে উঠেছিল। গথিক স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ছুঁচালো খিলানের ব্যবহার। খুব সম্ভব প্রাচীন অ্যাসিরিয়াতে প্রথম ছুঁচালো খিলানের প্রচলন হয়, কিন্তু ক্রেস্ওয়েল (Creswell) লিখেছেন যে সিরিয়াতে সর্বপ্রথম ছুঁচালো খিলানের ব্যবহার দেখা যায়।

মধ্যযুগের ক্যাথিড্রাল বা গির্জাগুলি জাতীয় জীবনে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছিল। কারিগররা পুরুষানুক্রমে বিরাট বিরাট গির্জাগুলি



চিত্র 2—গথিক ক্যাথিড্রালের আড়াআড়ি সেকশন

তৈরি করে যেত। ইমারতের দেয়ালগুলির আলম্বভাবে থাকত ছোট ছোট ঠেকান্ দেওয়া দেয়াল বা 'বাট্রেস্' (buttress)। ছাতার শিকের মত খিলানযুক্ত ছাদ থেকে সব চাপ এসে পড়ত এই বাট্রেসগুলিতে। এখান থেকে অবশেষে এই চাপ গিয়ে পৌঁছত মাটিতে। এই ধরণের বাট্রেস্‌কে 'উড়ন্ত বাট্রেস্' (flying buttress) বলা হয়। ইমারতের সমস্ত ওজন এসে পড়ত থাম ও বাট্রেস্‌গুলির উপর। দেয়ালগুলি কেবলমাত্র ইমারতকে ঘিরে রাখবার জন্যে ব্যবহৃত হত। এগুলি সারা ইমারতের ভার বহন করত না। দেয়ালে থাকত বড় বড় কাচের জানালা। সৃষ্টির আদি থেকে সুরু করে বাইবেলের ঘটনাবলী ছিল ভাস্কর্যের ও রঙীন কাচের জানালাগুলিতে কাজ করা ছবির বিষয়বস্তু। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশের গির্জাগুলির প্ল্যান সাধারণত ল্যাটিন ক্রশ আকৃতির হত। ক্রশের ছোট বাহুর দুই দিকে থাকত উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অভ্যন্তরের পার্শ্বদেশ (transept)।

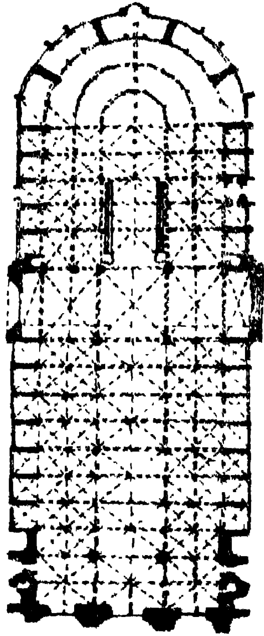
ফরাসী গথিক স্থাপত্য—ফরাসী গথিক স্থাপত্যের রীতি ইউরোপের অন্যান্য অংশের গথিক স্থাপত্যের মতই ছিল। কিন্তু এই দেশের দক্ষিণ অংশে রোমক ঐতিহ্যের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এক নতুন ধরণের স্থাপত্যশৈলী গড়ে উঠল। উত্তরাংশের ইমারতগুলির উঁচু উঁচু খিলান ও তার উপরের খাড়া ঢালের ছাদ, পশ্চিমদিকের বুরুজ, ছুঁচালো চূড়া, মিনার, দেয়ালের উড়ন্ত ঠেকান্ (flying buttress), উঁচু লম্বা লম্বা পাথরের উপর কারুকার্য করা জানালা প্রভৃতির দ্বারা এই অংশের স্থাপত্যে খাড়াই ও উচ্চতার প্রতি প্রবণতার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ফ্রান্সে 1150 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গথিক শৈলী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই শৈলীকে প্রাথমিক, মধ্যম ও তৃতীয়—এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষত্ব হল ছুঁচালো খিলান ও জ্যামিতিক আকারের কারুকার্য করা জানালা ইত্যাদির ব্যবহার। মধ্যম পর্যায়ের সময় হল ত্রয়োদশ শতাব্দী। এই পর্যায়ের বিশেষত্ব হল চাকার মত ও কারুকার্য করা বৃত্তাকার জানালার ব্যবহার এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষত্ব হল স্বচ্ছন্দগতিতে কারুকার্য করা জানালার ব্যবহার।

ইংলণ্ডে সাধারণত নির্জন পরিবেশে আলাদাভাবে ক্যাথিড্রালগুলি স্থাপনা করা হত কিন্তু ফরাসী ক্যাথিড্রালগুলি ছিল নগরবাসীদের জীবনযাত্রার অঙ্গ এবং সেই জন্যে এইগুলি তাদের বাসস্থানের সঙ্গে খুব কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে খুব কম লোকই লিখতে পড়তে জানত। এই জাতীয় গির্জাগুলির ভিতরে রঙীন কাচের দ্বারা বাইবেলের ঘটনাবলীর চিত্র আঁকা থাকত আর বাইরের দিকে অবস্থিত মূর্তিগুলিতে বাইবেলের ঘটনাবলী মূর্ত হয়ে উঠেছিল। লেখা-পড়া না জানা সাধারণ নাগরিকদের কাছে এই গির্জাগুলি ছিল সচিত্র বাইবেলের মত।

1163 থেকে 1235 খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত প্যারিসের

নোতর্ দাম্ (Notre Dame) গির্জা ফরাসী গথিক স্থাপত্যে তৈরি সবচেয়ে প্রাচীন ক্যাথিড্রালগুলির মধ্যে অন্যতম চিত্র 3)। এর চওড়া পশ্চিমদিকের সম্মুখভাগ সম্ভবত সারা ফরাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও



চিত্র 3—প্যারিসে নোতর দাম গির্জার প্ল্যান
(ফরাসী গথিক)

বৈশিষ্ট্যময়। এই বিশেষত্বগুলি পরবর্তীকালের অনেক গির্জায় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মধ্যস্থলের 42 ফুট ব্যাসবিশিষ্ট চাকার মত জানালা অপূর্ব সুন্দর। দেয়ালের সরু সরু উড়ন্ত ঠেকানগুলি এই গির্জার পূর্ব দিকের দৃশ্যকে অতীব মনোরম করে তুলেছে।

মধ্যযুগের অন্যান্য গির্জার মধ্যে রয়েছে সার্টার্স ক্যাথিড্র্যাল্ (Charters Cathedral), 1194 থেকে 126) খ্রীষ্টাব্দে তৈরি। 1190 থেকে 1275 খ্রীষ্টাব্দে তৈরি বুর্গেস্ ক্যাথিড্র্যাল্ (Bourges Cathedral) অত্যধিক ফরাসী বৈশিষ্ট্যময়। এই গির্জার ভিতরের পার্শ্বদেশ অংশ নেই এবং চওড়ার দিক অপেক্ষাকৃত কম লম্বা। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যে এই গির্জাটি বিখ্যাত। 1212 থেকে 1241 খ্রীষ্টাব্দে তৈরি রাইম্স্ ক্যাথিড্রাল (Rheims Cathedral)-এর পশ্চিমদিকের সম্মুখভাগ প্যারিস-এর নোতর্ দাম্ গির্জার চেয়েও আরও বেশি অলঙ্কার-পূর্ণ। এখানে প্রায় পঁচিশটি মূর্তি আছে। মধ্যেকার প্রবেশদ্বারের উপর আছে 40 ফুট ব্যাসের গোলাপ-ফুলের আকৃতির অতীব সুন্দর জানালা। এই গির্জা ছিল ফ্রান্সের গৌরব, ধর্মীয় পীঠস্থান ও কারুশিল্পের ঐশ্বর্যশালা। চওড়া এমিয়েন্স্ ক্যাথিড্রালও (Amiens Cathedral) একটি আদর্শ ফরাসী গির্জার নিদর্শন।

দুর্গ—ফরাসী দুর্গগুলি সাধারণত উঁচু টিবির উপর তৈরি করা হত যাতে এখান থেকে চার-পাশের নিচু উপত্যকার উপর সহজে দৃষ্টি রাখা যেত। দুর্গের দেয়াল ছিল খুব মোটা আর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে জানালাগুলি খুব ছোট করা হত। কোন কোন দুর্গের দেয়াল 20 ফুট পর্যন্ত চওড়া হত এবং জমি থেকে সোজা খাড়াভাবে উঠে যেত। দুর্গের চারদিকে থাকত পরিখা এবং প্রধান প্রবেশদ্বারকে সুরক্ষিত করে রাখার জন্যে এইখানে পরিখার উপর থাকত টানা পুল। দুর্গের ইমারতগুলি চত্বরের চারদিকে সন্নিবেশিত থাকত। দুর্গের চারদিকে থাকত বিশাল বিশাল বুরুজ। ছাদের প্রাচীরে থাকত যুদ্ধ করবার জন্যে অসংখ্য ফোকর। পরে রেনেশাঁস যুগে অনেক দুর্গ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল অথবা অদল-বদল করা হয়েছিল এবং পরিবর্তে আরও বেশি সুখ-সুবিধাজনক বাসগৃহ তৈরি করা হয়েছিল।

পল্লী-নিবাস—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারুদের ব্যবহার সুরু হওয়ায় এবং নতুন ধরণের সামাজিক ব্যবহার প্রচলন হওয়ার ফলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সুরক্ষিত দুর্গের বদলে পল্লীনিবাস বা 'শ্যাটো' (Chateaux) তৈরি করেন। দুর্গগুলিকেও তখনও বলা হত 'শ্যাটো'।

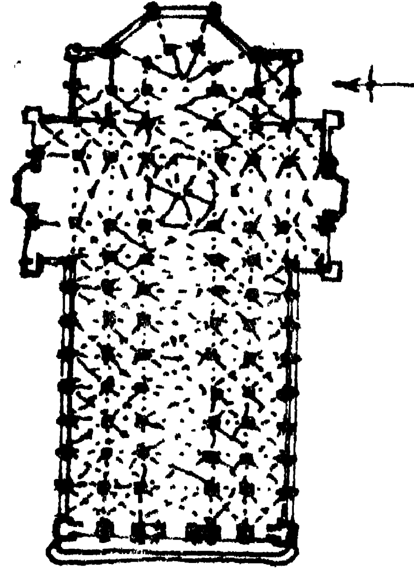
শহরের বাড়ী—ফরাসী দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রাধান্য লাভ করতে লাগলেন। তাঁরা আর কেবলমাত্র জায়গীরভোগী সামন্ত রইলেন না। সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে বাস করারও তাঁদের প্রয়োজন রইল না। তখন তাঁরা শহরে বাড়ি তৈরি করলেন। এইগুলিকে এখন বলা হয় হোটেল। পল্লীনিবাসের মত এই বাড়িগুলিও চত্বরের চারদিকে সন্নিবিষ্ট করা হত এবং রাস্তার সামনের দিকের অংশের সম্মুখভাগ খুব ভালভাবে ও শ্রমসহকারে তৈরি করা হত।

এই সময়ের তৈরি বাজার-বাড়ি, বিত্তশালী চাষীর সুরক্ষিত বাড়ি, কাঠের তৈরী বিরাট খামার বাড়ি ইত্যাদি সবই প্রাচীন ফরাসীদেশের উন্নত পল্লী-জীবনের সাক্ষ্য দেয়।

ইটালীর গথিক স্থাপত্য—ইটালীর গথিক স্থাপত্য শৈলীর সময় হল 1200 থেকে 1450 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইটালীতে রোমক ঐতিহ্যের প্রভাব এত শক্তিশালী থেকে গিয়েছিল যে, ইউরোপের উত্তরভাগের প্রচলিত গথিক স্থাপত্যের সুস্পষ্ট খাড়াইভাব (conspicuous verticality)-এর বদলে এখানে অনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত কার্নিশের (cornice) ও টানা কোবলার (string course) প্রচলন হয়েছিল। গির্জাগুলির বাইরের দিকের নির্মাণ ও পরিকল্পনার বিশেষত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত সমতল ছাদ, গির্জার পাশের (aisle) দিকের ছাদকে ঢেকে আড়াল করে রাখা গির্জার পশ্চিমদিকের সামনের দেয়াল, এই দেয়ালের মধ্যে বৃত্তাকার জানালা, দেয়ালের উড়ন্ত ঠেকান ব্যবহার না করা, মিনার এবং কারুকার্যবিহীন ছোট ছোট জানালার ব্যবহার ইত্যাদি।

উত্তর ইটালীর মিলানোর গির্জা (Milan Cathedral) 1385 খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় (চিত্র 4)।



চিত্র 4—মিলান ক্যাথিড্রাল-এর প্ল্যান
(ইতালীয় গথিক)

মধ্যযুগে তৈরি গির্জাগুলির মধ্যে একমাত্র 'সেভিলের গির্জা' (Seville Cathedral) এটির চেয়ে বড়। এই গির্জার বৈশিষ্ট্য কিছুটা জার্মান ধরনের; কারণ এটির পরিকল্পনাকারী পঞ্চাশ জন স্থপতিদের মধ্যে অনেকেই আল্পস্ পাহাড়ের উত্তর দিকের দেশগুলির অধিবাসী ছিলেন।

1296 থেকে 1462 খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মধ্য ইটালীর ফ্লোরেন্সের গির্জায় (Florence Cathedral) প্রধানত ইটালীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উত্তর ইউরোপের গির্জার খাড়াভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি এই গির্জায় নেই।

আম্‌মি মেজুস্ লিন্ঃ অমূল্য ভেষজ গুণযুক্ত একটি প্রবর্তিত গাছ

দেবযানী বসু ও রথীনকুমার চক্রবর্তী*

শ্বেতী রোগীর রোগাক্রান্ত ত্বকের স্বাভাবিক রঙ্ ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রয়োজন বিভিন্ন ফিউরানোকুমেরিন। যা থেকে তা মেলে— সেই আম্‌মি মেজুস্ লিন্ গাছ-এর উদ্ভিদগত বর্ণনা, ভেষজ অনুসন্ধান এবং অন্যান্য গুণাগুণের আলোচনাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

ভারত ঔষধি গাছের সম্পদে ধনশালী। স্মরণাতীত কাল থেকে এই সমস্ত গাছ রোগ নিরাময় ও দূরীকরণের কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। এই সমস্ত দেশীয় ভেষজ গাছ-গাছড়া ছাড়াও এমন অনেক ভিনদেশী গাছ আছে যাতে প্রচুর প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যায় ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহার হয়, সাধারণত সেই সমস্ত গাছ এদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জন্মানো এবং উদ্ভিদ সম্পদের সংখ্যা বাড়ানো হয়। আম্‌মি মেজুস্ লিন্ (**Ammi majus Linn**) এমন একটি গাছ যা দুই দশক পূর্বে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার সৌজন্যে এদেশে প্রবর্তিত হয়। তখন থেকেই ঔষধ প্রস্তুতকারীরা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা এই গাছকে ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে সরবরাহের দিকে নজর দিয়ে চাষের প্রবর্তন করেন।

এই প্রজাতিটি অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোই সম্ভব হচ্ছে তাই নয়, এদেশের চাহিদা মেটানোর পর অন্যান্য অনেক দেশে রপ্তানির বাজারেও সমাদর পাচ্ছে।

গাছটি এপিয়েসী (**Apiaceae**) গোত্রভুক্ত বা আম্বেলীফেরী গোত্র (**umbelliferae**), উপবর্গ অ্যাপিয়ডি (**Apioideae**), অ্যামিনিজাতির (**Ammineae**) অন্তর্গত এবং উপজাতি ক্যারিনি (**carinae**)-তে অবস্থিত। পাতার আকার, পুষ্পবিন্যাস এবং ফলের দ্বারা একে আ ভিস্‌নাগা (লিন্) ল্যাম্ থেকে আলাদা করা হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আ মেজুস্ লিন্‌কে মিশরীয়রা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। ইবু-এল-বিতার মেক্রাডেট-এল আদাইয়াত-তে নির্দেশ দেওয়া আছে, এই গাছের ফল শ্বেতী বা ভিটিলাগোতে ব্যবহার হয়। ফলের গুঁড়া রোগীকে খাওয়ানো হয় এবং মাঝে মাঝে যে জায়গায় কণিকার রং নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে এর প্রলেপ দিয়ে এক বা দুই ঘণ্টা তীব্র সূর্যালোক লাগানো হয়। এই পদ্ধতিতে শ্বেতীর দাগ আস্তে আস্তে কমে যায় ও ত্বকের স্বাভাবিক রং ফিরে আসে। কখন বা আ মেজুস্ লিন্‌কে আলাদাভাবে বা জিন্‌জিবার অফিশিনালী রসকো মূলের সঙ্গে ব্যবহারে সমান ফল পাওয়া গেছে।

মিশরীয় অনুসন্ধানকারীরা শ্বেতীরোগে ফলপ্রসূ সেই সমস্ত কার্যকরী উপাদান আ মেজুস্ লিন্ ফল থেকে আলাদা করেছেন। বর্তমানে আ. মেজুস্ লিন্ ফল থেকে বিভিন্ন রকমের ফিউরানোকুমেরিন আলাদা এবং প্রকারভেদ করা হয়েছে। চিত্র 1-এ একটি

* কেন্দ্রীয় উদ্ভিদ গবেষণাগার, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, হাওড়া-711 103

সপুষ্পক আম্‌মি মেজুস লিন্‌ গাছ এবং তার ফুল ও ফল দেখানো হয়েছে।

পুনরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, যা একত্রভাবে বিভিন্ন অনুসন্ধানের তথ্য গবেষকদের কাছে পৌঁছে



চিত্র 1 A, সপুষ্পক আম্‌মি মেজুস গাছ, B একটি সম্পূর্ণ পুষ্প, C একটি পরিপূর্ণ ফল

আ মেজুস্‌ লিন্‌ থেকে ফিউরানোকুমেরিন পাওয়া যায় ও অমূল্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার গাছটিকে এদেশে প্রবর্তিত করা হয়।

বর্তমান প্রবন্ধে গাছটির উপর বিভিন্ন কাজ

দেবে ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন কাজের উদ্দীপনা জাগাবে।

উদ্ভিদগত বর্ণনা ও বিস্তার—গুল্মজাতীয় নীলাভ সবুজ, বর্ষজীবী উদ্ভিদ। উচ্চতা 1 থেকে

2 মি.। মূল সাদা, শক্ত, পার্শ্বীয় শাখা-প্রশাখা যুক্ত। পাতা সমদ্বিপার্শ্বীয়, থেকে 2 পক্ষাকার বা পক্ষের ন্যায়, 1 থেকে 3·5 সে মি বিভক্ত; গোলাকার পাতা 1 থেকে 2 পক্ষাকার; আনত বা ডিম্বাকৃত কিংবা চামচাকার, কখনো বা পক্ষের ন্যায়। কান্ডীয় পাতা 2 পক্ষাকার বা পক্ষের ন্যায়, সরু লম্বাকার বা রেখাকার লম্বা, প্রায় বেশির ভাগ পাতার ধারগুলি করাতাকার, দাঁতের ন্যায় ধারগুলি শক্ত ও সূক্ষ্ম। বৃন্ত কাণ্ডবেষ্টিত। ফুল যৌগিক ছত্র-বিন্যাশ, 3 থেকে 8 সে. মি ব্যাসবিশিষ্ট, বৃন্তিকা 10 থেকে 30টি; কখন কখন 40টি অথবা আরও বেশি হয়। 1 থেকে 4 সে মি. লম্বা; মঞ্জরী বা ব্র্যাকট অনেকগুলি। 0·5 থেকে 0·7 সে মি অথবা বৃন্তিকার সঙ্গে সমান, পক্ষীয় রেখাকারে বিভক্ত থাকে। মঞ্জরীপত্র বা ব্র্যাকটগুল্ প্রায়ই পুষ্পদণ্ডের সঙ্গে সমান হয়। ফুল 3 থেকে 3·5 মি. মি. শ্বেতাভ, বহুপ্রতিসম বা এক প্রতিসম, উভলিঙ্গ, পঞ্চাংশক দ্বিকোষ্ঠবিশিষ্ট অধিগর্ভ ডিম্বাশয়; ফল নলাকার, ভেদক (ক্রিমোকারপ) 2 থেকে 2·5 মি. মি লম্বা, 1 থেকে 1·5 মি মি ব্যাসবিশিষ্ট আয়তাকার বা ডিম্বাকার, গাত্র হাল্কা সবুজাভ বাদামী বা নীলাভ বাদামী, ষ্টাইলোপেডিয়াম (উপরধানী) 0·2 থেকে 0·4 মি. মি. লম্বা, দুটি অপসারিত গর্ভদণ্ড। ফল পরিণত হলে ফলত্বক বা মেরিকারপ লম্বালম্বি দুটি খণ্ডে আলাদা হয়ে যায়।

সমগ্র ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে গাছটি আগাছার মত বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তৃত হয়ে নীলনদের বদ্বীপ অঞ্চলে, ইরাণের উত্তরে, ইথিওপিয়া, পারস্য এবং অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। 1955 সালে ভারতে দেরাদুনের বন গবেষণা বিভাগে প্রথম প্রবর্তন করা হয় ও আস্তে আস্তে এদেশের বিভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করছে।

কোষবিজ্ঞান ও ভেষজ অনুসন্ধান—কোষগত বা সাইটোলজিকাল অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই গোত্রে 2n=22টি ক্রোমোজোম বর্তমান আছে। মিয়োটিক অনুসন্ধানে সাধারণ জোড়া (normal pair) ও কাইসামা (chiasma)-র বিষয় জানা যায়। ডাইকানেসিসের (diakinesis) সময় 11টি দ্বিজোড়া (bivalent) আবির্ভাব ঘটে। প্রথম এনাফেজ দশায় কখনো বা পিছিয়ে পড়া একটি দ্বিজোড়া বা একজোড়া (univalent) নজর করা গেছে। পরের দশায় পিছিয়ে যাওয়া জোড়াটি মাতৃকোষের দেয়ালের গায়ে লেগে থাকতে দেখা যায়। দ্বিতীয় মেটাকেজ দশায় 1 টি ক্রোমোজোম পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। জোড়াগুলি সাধারণ ভাবে সাজানো থাকে; কিন্তু কয়েকটি মেটাফেজ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিন্যাস থাকে। জংলী এবং উদ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার ভেদে উভয়েতে 2n=22টি ক্রোমোজোম থাকে। জংলী গাছগুলিতে ক্রোমোজোম $A_2+B_8+C_{10}+D_2$ এবং উদ্যানে লাগানো ভ্যারাইটিতে $A_2+B_6+C_4+D_{10}$ ভাবে সজ্জিত থাকে।

কার্যকরী উপাদান ফলে থাকে, ফলগুলি এই গোত্রের আ ভিসনাগা (লিন্) ল্যাম এবং অন্যান্য ছত্রাকার বা আম্বেলীফেরাস গাছের মত দেখতে হওয়ায় এই ফলগুলির ভেষজ জ্ঞান নির্ভুলভাবে বিচার করা প্রয়োজনীয়।

ফল একটিমাত্র বহিস্ত্বক বা এপিকারপ এবং বহিরাবরণ বা কিউটিকল দিয়ে ঢাকা থাকে। মধ্যত্বক বা মেসোকারপ এবং অন্তস্ত্বক বা এণ্ডোকারপ একাধিক স্তর নিয়ে গঠিত। বীজটিতে তৈলাক্ত শস্য থাকে।

বহিস্ত্বক অর্ধআয়তাকার, বহুভূজাকৃতি এবং কিঞ্চিৎ লম্বা কোষ দিয়ে তৈরী। বহির্গাত্র বিশেষত পার্শ্বকোষগুলি উত্তল হয়। প্রতিটি কোষে ক্যাল-সিয়াম অক্সালেটের ক্লোস প্রিজ্মের আকারে পাওয়া যায়। কিউটিকল বা ত্বক পুরু এবং দাগযুক্ত হয়। কোষগুলি 3 থেকে 10 μ (মিউ) ব্যাস বিশিষ্ট হয়। মধ্যত্বকের কোষ আনতাকার, লম্বা,

পাতলা দেয়ালযুক্ত। সবচেয়ে ভিতরের গা পুরু কিন্তু কোন দাগ দেখা যায় না। ভিটি বা ফলের গায়ে দাগ থাকে। ফলের মধ্যভাগ চওড়া ও দুই-প্রান্ত সরু হয়ে গেছে। শিরাত্মক কলাতন্ত্র গোল প্রাথমিক স্তর বরাবর গেছে। কলাতন্ত্র সমদ্বিপার্শ্বীয়, সরু সর্পিলাকার বা বলয়াকার বাহিকা, ট্র্যাকিড এবং অসংখ্য স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু জাইলেমে বর্তমান। অন্তস্ত্বক সরু, লম্বা কোষ দিয়ে তৈরী ও নক্সাকৃত বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত থাকে। বীজের আবরণ একটিমাত্র স্বচ্ছ স্তর যুক্ত লম্বা হলুদাভ বাদামী কোষ দিয়ে তৈরী। শস্যটি ছোট, বহুভুজাকৃতি পুরু, সেলুলোজযুক্ত কোষ, নির্দিষ্ট তেল ও ডিম্বাকৃতি গোল অ্যালিউরোন দানা নিয়ে গঠিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বীজের গুঁড়া পরীক্ষা করলে এপিকারপের ভগ্নাংশ ক্রশাকৃত ষ্টোমা, অন্তস্ত্বকের কণা, বাদামী রংয়ের ভিটি বা বহুভুজাকৃতি নলাকার ছোট ছোট কোষ, সরু বলয়াকার বা সর্পিলাকার লিগনিনযুক্ত স্ক্লেরেনকাইমা কোষ, পুরু দেয়ালযুক্ত বহুভুজাকৃতি কোষে ডিম্বাকৃতি বা গোল অ্যালিউরোন দানা এবং অন্তস্ত্বকের কণা দেখা যায়। গুঁড়ার রং হলুদাভ বাদামী, উগ্রগন্ধ ও তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট হয়।

গবেষণার দ্বারা উৎপাদন, চাষ এবং শারীরিক অনুসন্ধান—আ. মেজুস লিন্ বীজ দ্বারা বিস্তৃত হয়। জমিতে ছড়ানোর 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে বীজের অংকুরোদগম হয়। পরীক্ষাগারে আরও কম সময় লাগে। বীজ ছড়ানোর আগে জমিকে ভালভাবে কোপানো হয়। ছিটানো সারিতে অথবা হলকর্ষণের খাতে বীজ ছড়িয়ে তারপর হাল্কাভাবে মাটি দিয়ে বীজ ঢাকা দিতে হবে। দেখা গেছে যে, হলকর্ষণের খাতে বীজ জন্মানো সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি; কারণ এতে জলসেচ, আগাছা পরিষ্কার সহজেই করা যায়। সাধারণত 80 থেকে 100 সে মি. অন্তর আলের মত উঁচু করা হয়। অক্টোবর বা নভেম্বর মাস বীজ ছড়ানোর পক্ষে ভাল সময়। 1·5 কেজি বীজ এক হেক্টর জমিতে ছড়ানো যায়। বীজ ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়, যতদিন পর্যন্ত না ফুল আসে। চারা 6 থেকে 12 সে. মি লম্বা হলে, ঘন চারাগুলি 45 সে. মি. দূরত্বে ফাঁক করে দেওয়া হয়। বীজ নার্শারীতে জন্মানোর পর জমিতে পুঁতলে চাষের খরচ বেশি পড়ে কিন্তু সে তুলনায় কাঁচামালের ফলন বেশি হয় না। গাছে সার দিলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। সাধারণত জৈব সার - যেমন, গোবর, খামার সার মাটিতে মিশিয়ে বীজ ছড়ানোর আগে বা চারা রোপণের আগে চাষের জমিতে দেওয়া হয়। সুপার ফসফেট 5 থেকে 10 কেজি প্রতি একরে প্রয়োগ করলে গাছের ও বীজের ফলনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম 2 : 2 : 1 অনুপাতে দিলে কার্যকরী উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যায়। শুধু নাইট্রোজেন দিয়েও উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। ফসফরাস মাটিতে বা পাতায় ছিটিয়ে ফলের ও ফিউরানোকুমেরিনের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়ে।

বীজ ছড়ানোর 3 থেকে 5 মাসের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফুল, ফল ও কুমেরিনের সংঘটন প্রয়োজনীয় তাপ ও সৌরশক্তির যুক্তপ্রভাবে ঘটে থাকে। গাছগুলিকে অর্ধেক করে কেটে আলগাভাবে বেঁধে স্তূপাকারে রাখা হয়। বীজ ঝরতে শুরু করলে আছড়িয়ে বা পাকিয়ে ছাড়ানো হয়ে থাকে। অনুসন্ধানকারীরা দেখেছেন, ফলের বিভিন্ন অবস্থার উপর কুমেরিনের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন পর্যায়ের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সদ্য ফোটা ফুল থেকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কাঁচা ফল থেকেই বেশি পরিমাণে তা পাওয়া সম্ভব। সবচেয়ে বেশি শতাংশ জ্যান্থোটক্সিন (xanthotoxin) পাওয়া যায় অপরিণত কাঁচা ফলে, তারপর পরিণত

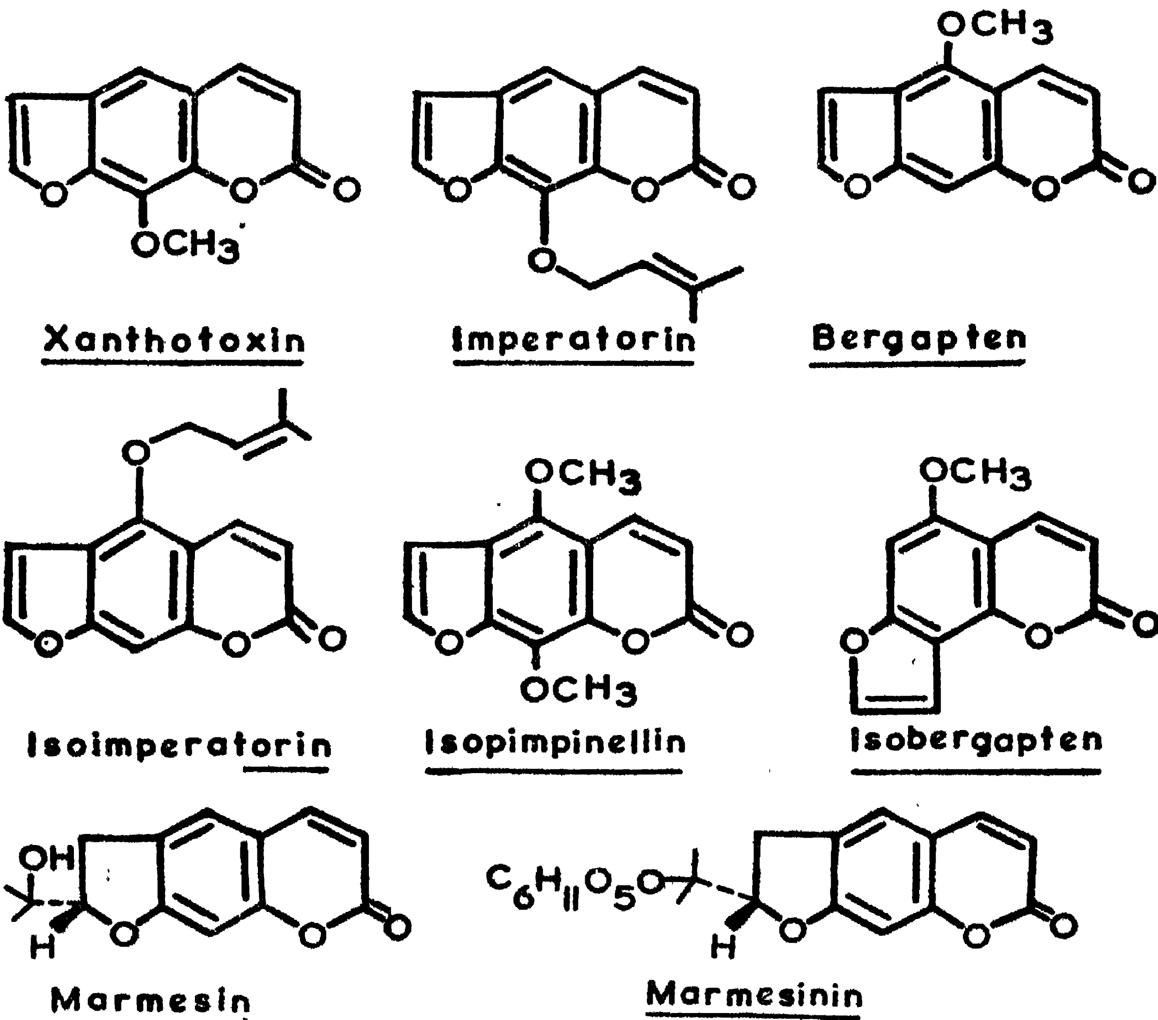
বাদামী ফলে ; একই রকম অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ফিউরানোকুমেরিন (furanocoumarin) পরিণত কাঁচা ফলে পাওয়া যায়।

কার্যকরী উপাদানের পৃথকীকরণ, চারিত্রিকরণ, ভেষজ ও অন্যান্য গুণাগুণ—প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সাধারণত সবুজ রংয়ের পাকা ফল থেকে আলাদা করা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, গাছের অন্যান্য অংশে এই সমস্ত উপাদান অল্প পরিমাণে বা একেবারে পাওয়া যায় না বললেই চলে। আ মেজুস্ লিন্ ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এ পর্যন্ত যে আটটি কুমেরিন (coumarin) পাওয়া গেছে সেগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে (চিত্র ২) :

(i) রেখাকার ফিউরানোকুমেরিন (linear furanocoumarin) : বেরগ্যাপটেন (bergapten), জ্যান্থোটক্সিন (xanthotoxin), ইম্পারেটোরিন (mperatorin), আইসোপিম্পাল্লিন (isopimpillin) ;

(ii) কোণাকার ফিউরানোকুমেরিন (angular furanocoumarin) : আইসোবেরগ্যাপটেন (isobergaptan) ;

(iii) রেখাকার-ডাই-হাইড্রো ফিউরানোকুমেরিন :



চিত্র 2 আম্‌মি মেজুস থেকে নিষ্কাশিত বিভিন্ন ফিউরানোকুমেরিনের রাসায়নিক গঠন

মারমেসিন (marmesin), মারমেসিনিন (marmesinin)।

আ. মেজুস্ লিন্ ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায় :

	প্রতি শতাংশ
অ্যাকরিড (acrid) বা তৈলাক্ত পদার্থ	3·20
উভধর্মী গ্লুকোসাইড পদার্থ	1·00
ভস্ম	7·09
সেলুলোজ	22·43
নির্দিষ্ট তেল	12·24
গ্লুকোজ	0·20
জলীয় অংশ	6·17
ওলীয় রজন (oleoresin)	4·76
প্রোটিন	13·82
ট্যানিন	4·45

আ. মেজুস্ লিন কুমেরিনের পৃথকীকরণ, চারিত্রিকরণের ইতিহাস 1947 সালে আরম্ভ হয় যখন কেলাসাকার, তিক্তধর্মী; ঠাণ্ডা জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ফুটন্ত জলে সামান্য দ্রবণীয় পদার্থ টিকে অ্যামোয়ডিন (ammoidin $C_{12}H_8O_4$) নামে সনাক্ত করা হয়। পরে আরও দুটি কেলাসাকার উপাদান পাওয়া গেছে তাদের নাম দেওয়া হয় আম্মিডিন (ammidin $C_{16}H_{14}O_4$) এবং মেজুডিন (majudin $C_{12}H_8O_4$)। পরে জানা যায়, এই দুটি উপাদান যথাক্রমে জ্যান্থোটক্সিন (8—মিথোঅক্সিসোরেলিন বা 8 methoxypsoralen), ইম্প্যারেটরিন (imperatorin) বা (8—আইসোপেন্টিনাইলঅক্সিসোরেলিন বা 8 isopentenyloxypsoralen) এবং বেরগ্যাপটেন (5 মিথোঅক্সিসোরেপলিন বা 5—methoxypsoralen) —এই তিনটি রেখাকার ফিউরানোকুমেরিন আ. মেজুস্ লিন্ ফল থেকে সনাক্ত করা করা হয়। জ্যান্থোটক্সিন এবং বেরাগ্যাপটেনকে রেখাকার হাইড্রোফিউরানোকুমেরিনের পর্যায়ে ফেলা হয়। আরও একটি রেখাকার ডাই-হাইড্রোফিউরানোকুমেরিন মারমেসিন আ. মেজুস্ লিন্ রসায়নে যুক্ত। মারমেসিনিন (marmesinin) একটি গ্লুকোসাইড ঘটিত ফিউরানোকুমেরিন যা জলের তড়িৎবিশ্লেষণে অগ্লাইকন (aglycon) মারমেসিনরূপে পরিণত হয়। আরও দুটি উপাদান ফল থেকে পাওয়া যায়—যেমন, আইসোবেরগ্যাপটেন (5—মিথোক্সিএঞ্জেলেসিন বা 5—methoxyangelicin) ও আইসোপিম্পেনেলিন (5, 8—ডাই-মিথোক্সিসোরেলিন বা 5, 8—dimethoxypsoralen)। আগেরটি কোণাকার ও পরেরটি রেখাকার ফিউরানোকুমেরিনে অবস্থিত। আইসোইম্পেরেটোরিন (সিনিডিন cinidin, 5—আইসোপেনটিনাইলঅক্সিসোরেলিন বা 5 isopentenyloxypsoralen)-কে 1968-তে নিষ্কাশন করা হয়।

গাছের শুকনো গুঁড়া থেকে কুমেরিন ক্লোরোফর্ম, পেট্রোলিয়াম ঈথার, বেনজিন অথবা ঈথার দিয়ে নিষ্কাশন করা হয়। মিথানল, ঈথানল বা ঈথানল-জল দিয়ে নিষ্কাশন করলে কুমেরিনকে শর্করার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। উপাদানগুলি পত্রবর্ণলেখীয় (paper chromatography) বিশ্লেষণ দ্বারা সনাক্ত ও ব্যাখ্যা করা হয়। পত্রবর্ণলেখীয় কাগজে বা কাগজে বোরেট অথবা ফস্‌ফেট্ বাফার পত্রে, পত্রে ইথিলিন বা প্রপেলিন গ্লাইকল দ্বারা আবৃত করে স্থায়ী দশা (stationary phase) হিসাবে এবং পেট্রোলিয়াম ঈথারকে চলমান দশায় (mobile phase) ব্যবহার করা হয়। লঘুস্তর বর্ণলেখীয় (thin layer chromatography) বিশ্লেষণে এবং বর্ণলেখীয় গ্যাস (gas chromatography) দ্বারা সনাক্তকরণ হয়ে থাকে। এই সমস্ত বর্ণলেখীয় পদ্ধতি ছাড়াও ভৌত রাসায়নিক (physico-chemical), অতিবেগুনি অবশোষণ (uv adsorption), বর্ণালী, অবলোহিত অবশোষণ (infrared) বর্ণালী, প্রোটন চৌম্বক অনুনাদ (proton magnetic resonance) বর্ণালী

এবং ভর বর্ণালী দ্বারা উপাদানগত বিশ্লেষণ, চারিত্রিকরণ ও ভগ্নাংশের গঠন জানা যায়।

এতদিন পর্যন্ত যতগুলি ফিউরানোকুমেরিন আলাদা করা হয়েছে তার মধ্যে জ্যান্থোটক্সিন, ইম্পারেটোরিন এবং বেরগ্যাপটেনে সবচেয়ে বেশি ভেষজ গুণের ক্ষমতা আছে। লঘুস্তর বর্ণলেখীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপাদান আলাদা করার পর কলোরোমিতিক (colorimetric) পদ্ধতি অনুসরণ করে উপাদান নির্ণয় ও পরিমাণ জানা যায়। দৈনন্দিন কাজের পক্ষে এটাই সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়। ফিউরানো-কুমেরিনের পৃথকীকরণের প্রয়োগ কৌশলে সিলিকা জেল প্লেট ব্যবহার করা হয়। ক্লোরফর্ম নিষ্কাশিত পদার্থকে সূক্ষ্ম পিপেট দিয়ে লঘুস্তর প্লেটে ফোঁটা দেওয়া হয় (10 থেকে 100μg) এবং বেন্‌জিন : ইথাইল অ্যাসিটেট মিশ্রণ (9 : 1) দ্বারা করা হয়। শুকনো প্লেটে অতিবেগুনি রশ্মিতে যে জায়গাগুলিতে আভা ফুটে ওঠে, উপাদান অনুসারে আলাদা আলাদাভাবে জায়গাগুলি চেঁচে নেওয়া হয় এবং পরে ইথানল দিয়ে উপাদান দ্রবীভূত করে পুনরুদ্ধার করা হয়। ডাইয়াজোট সালফা অ্যানিলিক অ্যাসিড দিয়ে যে রং ফুটে ওঠে সেই সমস্ত উপাদান 307 μ-তে জ্যান্থোটক্সিন এবং ইম্পারেটোরিন ও 315 μ-তে বেরগ্যাপটেনকে শূন্য পরীক্ষার তুলনামূলকভাবে নির্দিষ্ট উপাদানের রেখাবলী চিত্র থেকে অজানা উপাদানের পরিমাণ জানা যায়। ফিউরানো-কুমেরিনকে আরও সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা হয়। TAS চুল্লীতে উদ্বায়ী পদার্থকে ফলের থেকে তাপ দিয়ে বের করে নেওয়া হয় ও পরে লঘুস্তর বর্ণালী প্লেটের সাহায্যে মাত্র একটা ফল থেকে উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ জানা যায়।

বীজগুলি গন্ধযুক্ত টনিক হিসাবে, উদরজাত হজমী, মূত্রজনিত, কণ্ঠনালী এবং হাঁপানি রোগে ব্যবহার করা হয়। এই গুল্ম ঘোড়ার অন্ধত্ব সৃষ্টি করে পেশীকে শিথিল করে। আ মেজুস্ লিন্ থেকে যে সমস্ত ফিউরানোকুমেরিন পাওয়া যায় সেগুলি ত্বকের সঙ্গে আলোক প্রভাবে আশ্চর্য-জনকভাবে কাজ করে। ভিটিলাগো রোগে অস্বাভাবিক সাফল্যলাভ করা গেছে। যতগুলি ফিউরানোকুমেরিন আলাদা করা হয়েছে তাদের মধ্যে গুণানুসারে জ্যান্থোটক্সিন সবচেয়ে বেশি ও সোরেলিনের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি কাজ দেয়। উপাদানগুলি ভিটিলাগো দাগে প্রলেপ ও সেবন — এই দুই উপায়েই ব্যবহার করা হয়। সেবনের ফলে রোগাক্রান্ত জায়গায় মেলানিন রঞ্জক (melanin pigment) তাড়াতাড়ি ফিরে আসে; মেলানিন কণার শারীরিক এবং জৈব রাসায়নিক ঘটনা ও শ্বেতীতে তাদের গঠনের পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করেছেন।

এপিয়েসী গোত্রীয় গাছে প্রচুর পরিমাণে সাধারণ কুমেরিন পাওয়া যায়। এপিয়েসী উপবর্গের 3টি জাতি, 33টি গণের ও 161 প্রজাতির কুমেরিন আলাদা করা হয়েছে। সোরেলিন (psoralene) ছাড়াও অন্যান্য কুমেরিন ভেষজ চিকিৎসায় ব্যাক্টেরিয়ার প্রতিষেধক, ঘনীভবনের প্রতিষেধক ও মূত্র বর্ধকে ব্যবহার করা হয়, কতকগুলি আবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সক্রিয়তা বাড়ায়। কুমেরিনের সাহায্যে এপিয়েসীর রাসায়নিক শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে। কুমেরিনের বিভিন্ন গঠন উপবর্গ ছাড়াও জাতি এবং প্রজাতিতে ছড়িয়ে আছে। কুমেরিনের গঠন উপবর্গ এপিঅয়ডি (apioideae) থেকে সঠিকভাবে পাওয়া যায়। স্মিরিনি (Smyrinieae)-তে যে সরল কুমেরিন, রেখাকার ফিউ-রানো কুমেরিন ও ডাই-হাইড্রোফিউরানো কুমেরিন পাওয়া যায়, সেগুলি উপরিউক্ত উপবর্গ বা প্রজাতিতে পাওয়া যায়।

আ. ভিসনাগা (লিন্) ল্যাম্ ক্যারিনি (Carinae)-তে অবস্থিত। একমাত্র প্রজাতি যাতে তিনটি ডাই-হাইড্রোপাইরানো কুমেরিন পাওয়া যায়।

উপজাতি সেসিলিনি (seselinae)-তে বিভিন্ন পর্যায়ের কুমেরিন বর্তমান আছে। জাতি পিউসিডেনি (peucedanae)-র তিনটি প্রজাতিতে যে সমস্ত কুমেরিন আছে সেগুলির বেশির ভাগ এপিয়েসীতে পাওয়া যায়। কুমেরিনের বিভিন্ন গঠনের সাহায্যে বিভিন্ন উপবর্গকে ভাগ করা যেতে পারে।

উদ্ভিদ থেকে যে সমস্ত কুমেরিন পাওয়া যায় তাদের গঠনমূলক বিশ্লেষণ, জৈব সংশ্লেষের পথ বা বর্তমান উন্নত বিশুদ্ধীকরণ ও পৃথকীকরণ পদ্ধতি যে সূত্র দেবে তা গাছের শ্রেণীবিন্যাসের জটিল, বিরোধমূলক প্রশ্নগুলি সমাধান করতে সাহায্য করবে।

এই সমস্ত ফিউরানোকুমেরিন থাকার জন্যে আ. মেজুস লিন্‌কে নিঃসন্দেহে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধি গাছ বলে গণ্য করা যেতে পারে। ভারতে ভিটিলাগো রোগের প্রাধান্যতার দরুন এবং এই সমস্ত কুমেরিনের ভেষজ গুণের দিক বিচার করে, উদ্ভিদগত, চিকিৎসাগত, রাসায়নিক এবং ঔষধগত বিষয় যুক্তভাবে গবেষণার উপর জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন; যাতে এই ভেষজ গাছ দিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি শ্বেতী—নির্মূল করা যায়।

বাই-ভিটামিন

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

ভিটামিন তালিকায় ভিটামিন AE খুবই মূল্যবান সংযোজন তা নিয়ে এখানে আলোচিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে জাপানী-বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ভিটামিন আবিষ্কার করেছেন। এই নতুন ভিটামিনটির নাম ভিটামিন AE. এই ভিটামিন দিয়ে ভিটামিন A আর ভিটামিন E দুয়েরই কাজ একসঙ্গে হয়! যাদের ভিটামিন A ঘাটতি আছে তাদের ভিটামিন A খেলেই সেই ঘাটতি পূরণ হয়। আবার যাদের ভিটামিন E ঘাটতি আছে তারা ভিটামিন E খেয়ে থাকেন। কিন্তু ভিটামিন A কিংবা E-র ঘাটতি আলাদাভাবে না হয়ে একসঙ্গে হলে, ঘাটতি পূরণের জন্যে ভিটামিন A এবং E দুই-ই খেতে হবে; কোন একটা দিয়ে দুটির কাজ হবে না। জাপানী-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত এই নতুন ভিটামিনে দুই ভিটামিনের কাজই চলবে। বিজ্ঞানে এটি একটি নতুন অবদান। এর আগে এক ভিটামিন দিয়েই দুই ভিটামিনের যুগপৎ কাজ সম্ভব হয় নি।

ভিটামিন A—ভিটামিন A-র আরেক নাম রেটিনল (retinol)। অনেক সময় একে A_1 ও বলা হয়। প্রাকৃতিক সূত্র থেকে দ্বিতীয়টি A_2 মিলেছে। A_2 আসলে ডিহাইড্রোভিটামিন A_1 (dehydrovitamin A_1)। ভিটামিন A জীবজন্তুর পুষ্টিসাধন ঘটায়। ভিটামিন A বর্তমান থাকলে কোন রোগই সহজে শরীরকে আক্রমণ করতে পারে না। মানুষের খাদ্যে ভিটামিন A-র পরিমাণ কমে গেলে নৈশ অন্ধতা (night blindness) পর্যন্ত হতে পারে। ঘাটতি যদি

*বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700 006

খুব বেশি হয় তবে জেরোথেলমিয়াও (xerophthalmia) হতে পারে। এতে কর্নিয়া (cornea) শক্ত হয়ে যায়।

কেরার (Karrer, 1933) পারহাইড্রোভিটামিন A_1 প্রথমে কৃত্রিমভাবে (synthetically) বিটা-আয়োনোন (beta-ionone) থেকেই তৈরি করেন। সেটি আর ভিটামিন A_1 থেকে বিস্তারিত পদার্থটি এক। ইস্লার (Isler, 1947) ভিটামিন A_1 সিন্থেসিস করেন। আরও একটি সিন্থেসিস জানা আছে। ভ্যানডরপ্ (Van Dorp) রেটিয়নিক অ্যাসিড (retionic acid) প্রথমে তৈরি করেন (1946); পরে টিস্লার (Tishler) তাকে বিস্তারিত করে ভিটামিন A-তে রূপান্তরিত করেছিলেন (1949)।

ভিটামিন A_1 চর্বিতে হয় অ্যাসিড না হয় এস্টার হিসাবে বর্তমান থাকে। মাছের যকৃতে ও রক্তে এই ভিটামিন আছে। সবুজ শাকসবজী এবং লতাপাতায়, ফলে টমেটোতে, দুধে, মাখনে ভিটামিন A_1 থাকে। এই সব প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য পদার্থের অভাব যদি হয় তবেই শরীরে ভিটামিন A_1-এর ঘাটতি পড়ে—যে কারণে এসব আহার্য সপ্তাহে অন্তত তিন-চারবার করেই গ্রহণ করা উচিত। আজকাল যে বিভিন্ন মাল্টিভিটামিন বাজারে দেখা যায় তাতেও ভিটামিন A_1 রয়েছে—কডলিভার অয়েলও। ভিটামিন A_1 ঘাটতি পড়লে ঐ ভিটামিন অবশ্য খেতে হবে কিন্তু তাই বলে বেশি মাত্রায় ঐ ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত নয়। এতে ক্ষতি হয়; স্নায়বিক বিভিন্ন পীড়া, বমি এবং হাড়ের নানাবিধ অসুখ হয়ে থাকে। এক কথায় অতিরিক্ত ভিটামিন A_1 থেকে যে রোগ হয় তাকে হাইপারভিটামিনোসিস্ (hypervitaminosis) বলে। ভিটামিন A_1-এর অভাবে চোখের রোগই বেশি হয়।

ভিটামিন E—1920 সাল নাগাদ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী ঐ ভিটামিনটি আবিষ্কার করেন। ইঁদুরের জন্যে এর দরকার খুব বেশি। ইঁদুরের খাবারে ভিটামিন E না থাকলে এরা বাড়ে না। ঐ বিজ্ঞানীরা তখন ঐ নতুন ভিটামিনের নাম রেখেছিলেন টকোফেরল (tocopherol)। ভিটামিন তালিকায় পরবর্তী সময়ে এটি-ই E হিসাবে পরিগণিত হয়।

এই ভিটামিন নানাবিধ খাদ্যে বর্তমান আছে। উদ্ভিজ্জ তেল (vegetable oil), ভুষিযুক্ত আটায়, মাছে, মাংসে, ডেয়ারিপ্রডাক্টসে (dairy products), ডিমে আর বিভিন্ন রকম শাকসবজিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। টকোফেরল বলতে আটটি যৌগের কথাই বুঝায়। এর মধ্যে আলফা-ই উল্লেখযোগ্য (alpha-tocopherol)। কেরার (Karrer, 1938) (±) আলফা টকোফেরল প্রথমে কৃত্রিমভাবে তৈরি করেন। তারপর করেন স্মিথ (Smith), 1942 সালে।

শরীরের মধ্যে এই ভিটামিন E সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব। এতে কিছু যায় আসে না। এর ক্ষয় শরীর থেকে আস্তে আস্তে হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা এক নাগারে বছর তিনেক যদি ভিটামিন E নাও নেয় তবুও তাদের ক্ষতি হয় না। কোন প্রকার অসুখের চিহ্নও দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শরীরে এই ভিটামিনের ভূমিকা কি তা এখনও অজানা। হিউম্যান নিউট্রিশন অ্যাণ্ড ডায়েটেটিক্ (Human Nutrition and Dietetics) বইয়েও এই ভূমিকা অজানা বলে নতুন গবেষণার প্রয়োজন আছে— এই মন্তব্য করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও যে প্রশ্নটি অজ্ঞাত সেটি হচ্ছে, বেশি পরিমাণে ভিটামিন E নিলে তাতে কোন উপকার হয় কিনা?

ভিটামিন E-এর অভাব থেকে নানাবিধ গোলযোগ সম্ভব হতে পারে। এর অভাবে মাংসপেশীর অস্বাভাবিকতা; স্নায়ু ও হার্টের পীড়া দেখা যায়। কিন্তু গবেষণার ফল থেকে ভিটামিন E-এর অভাবেই যে এত সব রোগ জন্মায় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বহু দিনের গবেষণা থেকে বরং এটাই ধরে নেওয়া যায়, বেশি পরিমাণে ভিটামিন E নিয়ে বিশেষ কিছু

কাজ অনেক সময়েই হয় না। আগে যৌন কাজে অথবা হৃদরোগে ভিটামিন E পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হত। এই সম্পর্কে নানা মত। কেউ বিশ্বাস করছেন, ভিটামিন E এ ব্যাপারে কার্যকরী আবার কেউ তাতে প্রশ্নও করেছেন। তবে এইটুকু বলা যায়, বায়ু কলুষিত হয়ে যদি ফুসফুসের পীড়া ঘটায় সেক্ষেত্রে ভিটামিন-E উপকারী। ইঁদুরের উপর পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।

প্রাপ্তবয়স্কদের দরকার খুব কমই। অপ্রাপ্তবয়স্কদের দরকার আছে। যেসব শিশুর রক্তাল্পতা যথেষ্ট, তাদের জন্যে ভিটামিন-E অপরিহার্য। মায়ের দুধে ভিটামিন-E আছে প্রচুর। গরুর দুধে তা নেই। সেই কারণেই শিশুদের তোলা দুধের পরিবর্তে মায়ের দুধের কথাই ডাক্তাররা বলে আসছেন। আজকাল মায়েদের দুধ না পেয়ে শিশুরা নানা রোগে ভুগছে। তাদের জন্যেই ভিটামিন E. যাদের গ্যাসট্রিক আলসার অপারেশন হয়েছে, যারা লিভারের অসুখে ভুগছেন এবং যাদের জণ্ডিস হয়েছে তাদের জন্যেও ভিটামিন E প্রয়োজন আছে বলেই ডাক্তাররা বলেন।

ভিটামিন AE—দুই জাপানী বিজ্ঞানী এম মরিওকা (M. Morioka) এবং এস কিটামুরা (S. Kitamura)- এঁরাই ভিটামিন AE তৈরি করেছেন। প্রস্তুত প্রণালী সহজ। উপাদান ভিটামিন A-ই। অপরটি 2, 3, 5, ট্রাইমিথাইল হাইড্রো-কুইনোন (2,3,5—trimethylhydroquinone)। এদের বিক্রিয়া থেকে অবশেষে এই নতুন ভিটামিন তৈরি হল। রসায়ন-বিজ্ঞানে সংযোজিত হল নতুন অধ্যায়, বিশেষ ভাবে ভিটামিন তালিকায়। নতুন যৌগের ক্লিনিক্যাল (clinical) এবং বায়োলজিক্যাল (biological) দুই পরীক্ষাই হয়েছে; ফলও আশানুরূপ।

মন্তব্য—লাভের মধ্যে হল, রোগীকে ভিটামিন A আর ভিটামিন E দু'বারে নিতে হবে না। একটি ভিটামিনেই দুটি ভিটামিনের কাজ করবে। দামে সস্তা হবে। চালু হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে তা পাওয়া যাবে। প্রস্তুতিকরণ সহজ। অনায়াসেই উপাদান মিলছে।

প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান

ক্ষুধা, আহার এবং রোগ

মাধবেন্দ্রনাথ পাল*

"ক্ষুধা বা দেহের চাহিদা অনুসারে আহারের 'অযোগ' বা অভাব ঘটলে, এবং আহারের 'অতিযোগ' ঘটলে, বা দেহের চাহিদার মাত্রা অপেক্ষা বেশি আহার গ্রহণ করলে রোগের কারণ ঘটতে পারে—এটাই আয়ুর্বেদের সুচিন্তিত অভিমত।"

আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল ইত্যাদি নানারূপ ক্রিয়াকলাপ চলছে, এবং বাইরেও কথাবলা, হাঁটাচলা ইত্যাদি নানাবিধ কাজকর্মে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়—এই সমস্ত ব্যাপারের জন্যে আমাদের শক্তি খরচ করতে হয়। সেজন্যে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ভাণ্ডারের সঞ্চয় কমতে থাকে। সজীব থাকতে হলে এই শক্তি ভাণ্ডার একটা ন্যূনতম নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পূর্ণ থাকা দরকার, নচেৎ আমাদের জীবনযাপন ব্যাপারটি বিশেষ বাধা পায়, এবং কালক্রমে নানা অসুখ বা রোগের উৎপত্তি হতে পারে। আজকাল এই সমস্ত কথা প্রায় সকলের জানা হয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতে এইরূপ তথ্যও অজানা ছিল না; বরং তখনকার পণ্ডিতগণ এই সব তথ্য সাধারণ মানুষের কল্যাণে, বিশেষ স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে কত সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রয়োগ করার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তা শুনলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। আয়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক অপূর্ব নিদর্শন। আয়ুর্বেদে নানা বিষয়ের মধ্যে আহারের উপর কত গুরুত্ব দেওয়া হত, সেই বিষয়ে দু-একটি কথা উল্লেখ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বেশ কিছুকাল পূর্বে কলকাতার রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং অধুনা পরলোকগত কবিরাজ পরিমলকুমার সেনগুপ্ত, এম. বি., মহাশয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে লেখকের আলাপের সুযোগ ঘটেছিল। আহারের উপর স্বাস্থ্য কত নির্ভরশীল, তিনি এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। তিনি বলতেন, "রোগী এলেই আমি প্রথমে জানতে চাই, তিনি কয়বার ও কখন কখন আহার করেন, এবং ক্ষিধে পেলে আহার করেন কিনা।" দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ক্ষিধে না পেতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাওয়া যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কথাটি সত্য কিনা যাচাই করার জন্যে তিনি আমাকে একটি সরল পরীক্ষা ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আপনি দিনে কয়বার খান ও কোন্ কোন্ সময়ে, সাধারণভাবে তা মোটামুটি নির্দিষ্ট। ধরুন, আপনি সকাল, দুপুর, বিকাল ও রাত্রে যথাক্রমে জলখাবার, মূল খাবার, আবার একপ্রস্থ জলখাবার এবং আবার একপ্রস্থ মূল খাবার - এইভাবে মোট চারবার খাবার গ্রহণ করেন। আপনি একমাস ধরে প্রতিদিন নির্দিষ্ট

*F/7, এম, আই, জি, হাউজিং এস্টেট, 37, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-700 037

সময়ে ঐভাবে আহার গ্রহণের সময়ে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করুন, যে খাবার খাচ্ছেন তা যথাসময়ে অভ্যাসবশে খাচ্ছেন, না ক্ষিধের তাগিদে খাচ্ছেন। যা উত্তর পান আপনি অকপটে তা লিপিবদ্ধ করুন। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, মাসান্তে ঐ লিপিবদ্ধ উত্তরের অধিকাংশ ঐরূপ হতে বাধ্য নয়, নিয়ম বলে ক্ষিধে না পেলেও আহার করে গেছেন। পরিণামে, হয়ত আপনি কোন না কোন রোগে ভুগছেন বা ভুগবার আশংকা আপনার মধ্যে ক্রমশ অন্তর্নিহিত হচ্ছে। তিনি আরও বলতেন, "আমি দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি, অক্ষুধায় আহার করলে নানারোগের কারণ ঘটে। আহারের প্রতি নিছক আসক্তি বা লোভের বশবর্তী হওয়ার ব্যাপারকে অনেকে 'রসনার লাম্পট্য' বলে, এবং আমার বিশ্বাস ও ধারণা, 'রসনার লাম্পট্যই' অধিকাংশ বাঙালীর নানা রোগের কারণ।"

বলাবাহুল্য, আয়ুর্বেদজ্ঞ এই অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রাচীন ভারতীয় ধারায় চিকিৎসা করতেন, এবং আয়ুর্বেদের নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থা দিতেন। তিনি বলতেন, "পরিপাকযন্ত্রের চাহিদা বা ক্ষুধা পূরণ করাই আহারের মূল লক্ষ্য, রসনার তৃপ্তি গৌণ ব্যাপার। পরিপাকযন্ত্রেরও আহার্য ধারণের একটা সীমা, এবং পরিপাক করার ক্ষমতাও নির্দিষ্ট আছে। সেই সীমা ও ক্ষমতা অতিক্রম করা হলে, বা করার চেষ্টা হলে, সুষ্ঠু পরিপাক সম্ভব হয় না।" পরিণামে, স্বাভাবিক জীবনযাপনে নানারূপ অস্বস্তি ও অসুখ এবং কালক্রমে রোগের উৎপত্তি হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চরকসংহিতায় 'মাত্রাশীস্যাৎ' অর্থাৎ পরিমিত আহার করা উচিৎ, এই নির্দেশ আছে। রোগীর ক্ষেত্রে, উপযুক্ত ও পরিমিত আহারের চাহিদা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই কথা চরকের নিম্নোক্ত নির্দেশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে: "বিনাতু ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে। নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজনাং শতৈরপি॥" যদি রোগী যথাযথ মাত্রায় পথ্য বা আহার গ্রহণ করে, তবে ঔষধ ছাড়াই রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু, যথাযথ মাত্রায় আহার নিয়মিত গ্রহণ না করলে, শত শত ঔষধেও রোগের শান্তি নেই। এটাই চরকের এই নির্দেশের মর্মকথা।

ক্ষুধা বা দেহের চাহিদা অনুসারে আহারের অযোগ' বা অভাব ঘটলে, এবং আহারের 'অতিযোগ' ঘটলে, বা দেহের চাহিদার মাত্রা অপেক্ষা বেশি আহার গ্রহন করলে রোগের কারণ ঘটতে পারে, এটাই আয়ুর্বেদের সুচিন্তিত অভিমত। প্রসঙ্গক্রমে, ক্ষুধা কি, এবং পরিমিত আহার কি ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের উদয় হয়, সে সব বারান্তরের বক্তব্য বিষয়।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভা-সভ্যাদের কাছে আবেদন করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন 1978 সালের জন্যে তাঁদের দেয় চাঁদা 20শে ফেব্রুয়ারী 1978, তারিখের মধ্যে প্রদান করে পরিষদের কাজে সহযোগিতা করেন।

14ই ডিসেম্বর, 1977
সত্যেন্দ্র ভবন
কলিকাতা-700 006

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

গড্‌ফ্রে হ্যারল্ড হার্ডি



"Seriousness of a mathematical theorem lies not in its practical consequences but in the significance of the mathematical ideas which it contains.……there are two things a certain generality and a certain depth."

G. H. Hardy

জন্ম—7ই ফেব্রুয়ারী, 1877
মৃত্যু—1লা ডিসেম্বর, 1947

70 বছরের এক অসুস্থ বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। পাশে রেডিওতে ভারত বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী চলছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। উনি বলতেন "যদি জানি আজিই আমার মৃত্যু, তবুও ক্রিকেট খেলার কথা শুনব।" তাই হয়েছিল। রোজ রাতে ঘুমুতে যাবার আগে ওঁর বোন ক্রিকেট খেলার ইতিহাস বই থেকে কিছু পড়ে শোনাতেন। কিন্তু এক ভোরে দাদা আর সাড়া দিলেন না।

মনে হবে হয়ত কোন খেলোয়াড়ের কথা হচ্ছে। তা নয়, ইনি বিশ্ববিখ্যাত গণিতবিদ গড্‌ক্রে হ্যারল্ড হার্ডি। ওঁর দুটো নেশা, গণিত আর ক্রিকেট।

হার্ডি 1877 সালের 7ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের ক্রানলি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মা দু'জনেই শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন। তাই ছেলের লেখাপড়ায় কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ছেলে বড়ই খামখেয়ালী। 4 বছর বয়সেই জিদ ধরেছিলেন 1 থেকে 1 লক্ষ সব সংখ্যা লিখে দিতে হবে। মায়ের সঙ্গে গীর্জায় যেতে হত। কিন্তু ওই সব মন্ত্রটন্ত্র শুনবার আগ্রহ ছিল না। তার চাইতে আনন্দ পেতেন, যে নম্বরের শ্লোক পড়া হচ্ছে—মনে মনে তার উৎপাদক বের করতে। 8 বছর বয়সে সখ হল সাংবাদিক হবার। ক্ষুদে এক পত্রিকাই বের করে ফেললেন। 9 বছর বয়সেই নানান বিষয়ে তাঁর প্রতিভা দেখে অনেকেই মনে করতেন এ ছেলে যে ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে তা বোঝা দায়।

যা হোক লেখাপড়ায় হার্ডি খুবই ভাল। ক্রানলি স্কুলে প্রত্যেক বারই প্রথম হতেন। সেটাও ইচ্ছে ছিল না কারণ প্রথম হলেই হলভর্তি লোকের সামনে তাঁকে প্রাইজ নিতে হবে। বড় হয়ে এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে, তিনি ইচ্ছে করে পরীক্ষা খারাপ দিতেন যাতে ওই সভায় না যেতে হয়।

গণিতে খুব ভাল নম্বর পাওয়াতে হার্ডি উইনচেস্টারে এক বৃত্তি পেলেন। ওখানকার পড়া শেষ হলে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়তে যান। সেটাও এক খেয়ালের বশে। কোথায় পড়বেন ভাবছেন। সে সময় তাঁর হাতে এল 'A Fellow at Trinity' নামে এক উপন্যাস। এতে দুই বন্ধু ফ্লাওয়ার্স আর ব্রাউনের কথা আছে। দু'জনেই এসেছেন ফেলো হবার জন্যে। ফ্লাওয়ার্স একেবারে সুবোধ বালকের মত পড়াশুনা করে যথাসময় ফেলো হন—কিন্তু ব্রাউন দলে মিশে পড়াশুনা বাদ দিয়ে বলতে গেলে জীবনটাই নষ্ট করে ফেলেন। তবুও তাঁদের বন্ধুত্বে চির ধরে নি। নিজের আনন্দের দিনে ফ্লাওয়ার্স তাঁর বন্ধুর কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছিলেন। হার্ডির মনে হল ফ্লাওয়ার্সের মত সাধারণ ছেলেও যদি ফেলো হতে পারে—তিনি কেন পারবেন না। অতএব ট্রিনিটিতে পড়তেই হবে ফেলো হবার জন্যে। কিন্তু গণিতই যে তাঁর মুখ্য পাঠ্য বিষয় হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। সেটাও বলতে গেলে এক ঘটনা। প্রথমে যে মাস্টার মশাই পড়াতেন, বলতে গেলে তিনি একেবারে পরীক্ষায় পাশ-করানো মাস্টার ছিলেন। কঠিন কঠিন অঙ্ক কষিয়ে নিতেন—আর সেই ভি. ভি. আই. মার্কা অঙ্ক। ছেলেদের মনে গণিত সম্বন্ধে কোন কৌতূহল জাগাতে পারতেন না। হার্ডি হাঁপিয়ে উঠলেন—ভাবছেন ইতিহাস নিয়ে পড়বেন কিনা। যদি আনন্দই না পাওয়া যায় তবে শুধু শুধু পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে গণিত পড়ে লাভ কি ?

ভাগ্য ভাল। এ সময়ে গণিতজ্ঞ লভের (G. H. Love) সঙ্গে পরিচয় হয়। উনি হার্ডিকে জর্ডনের 'Cours d' Analyse' বই পড়তে দেন। এই বই পড়ে হার্ডির চোখ খুলে যায়। দেখলেন এ এক মহাসম্পদ। গণিতের সত্যিকারের সৌন্দর্য তিনি বুঝতে

পারেন। তখনই ঠিক করেন গণিতই হবে তাঁর প্রথম ও প্রধান নেশা। অবিশ্যি ক্রিকেট খেলা ত চলছেই—ওখানকার কলেজ টিমের তখন তিনিই ক্যাপ্টেন।

1900 সালে প্রথম হয়ে ট্রাইপস্ পাশ করেন এবং ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁর সহপাঠি ছিলেন আর এক বিজ্ঞানী জীনস্। দু'জনেই 1901 সালে স্মিথ পুরস্কার পান। 1906 সাল থেকে 13 বছর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করেন। 1919 থেকে 1931 সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে আবার কেমব্রিজ-এ ফিরে আসেন এবং স্থায়ীভাবে থাকেন। অবিশ্যি মাঝখানে কিছুদিন আমেরিকায়ও কাজ করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। এই গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে 1910 সালে মাত্র 33 বছর বয়সে এফ. আর. এস. হন এবং দেশে-বিদেশে নানারকম সম্মানসূচক উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে রয়াল সোসাইটি তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'Copley medal' প্রদান করেন।

এককভাবে কাজ করার চাইতে তিনি যৌথভাবে কাজ করার পক্ষপাতি। তাই বিশুদ্ধ গণিতের জগতে হার্ডি-লিটলউড ও হার্ডি-রামানুজন জুটি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। হার্ডি তাঁর প্রায় 50 বছর কর্মময় জীবনে 300'র উপর মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তার বেশির ভাগই লিটলউড ও রামানুজনের সহযোগে। বিশুদ্ধ গণিতের এমন কোন বিষয় ছিল না যাতে হার্ডির মৌলিক অবদান নেই। অপেক্ষক তত্ত্ব (Theory of functions), সংখ্যা তত্ত্ব (Theory of numbers)—সব বিভাগেই অবদান রয়েছে। বলতে গেলে সে সময় ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে বিশ্লেষণী গণিতের (analytical mathematics) ভিত্তি নতুন করে তিনিই স্থাপন করেন।

অপসারী শ্রেণীর (divergent series) যোগফল বের করার ব্যাপারে যে উপপাদ্য তিনি বের করেন, তা হার্ডি উপপাদ্য নামে পরিচিত। বৃত্তের ভিতর জাফরি বিন্দুর (lattice points in a circle) ব্যাপারে এক সূত্র বের করেন। রামানুজনের সঙ্গে সংখ্যার বিভাজন (partition of numbers) নিয়ে কাজ করেন। সংখ্যার বিভাজন মানে এক সংখ্যাকে কত ভাবে বিভিন্ন সংখ্যার যোগফল হিসেবে লেখা যায়—যেমন $5=5+0=4+1=3+2=3+1+1=2+2+1=2+1+1+1=1+1+1+1+1$, তাই P(5) যদি বলা হয়, তখন বোঝায় 5-কে কতভাবে যোগফল হিসেবে ভাগ করা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, $P(5)=7$. যে কোন সংখ্যা বিভাজন সংখ্যার P(n)-র মান নির্ণয় করতে হার্ডি যে উপায় বের করেন, তা বৃত্ত পদ্ধতি (circle method) নামে পরিচিত। যে কোন সংখ্যার কম কতগুলি মৌলিক সংখ্যা (prime number) আছে, তার একটা সূত্র বের করার ব্যাপারে গণিতজ্ঞ রীম্যান রীম্যান-জিটা অপেক্ষক (Riemann-Zeta function) সম্বন্ধে এক অনুমান করেন। হার্ডি ও লিটলউড সে অনুমানের সত্যতা প্রমাণ

করেন। সংখ্যাতত্ত্বের অনেক অপ্রমাণিত সমস্যা নিয়ে তিনি কাজ করতে গিয়ে নতুন জিনিষ বের করেন। যেমন, গোল্ডবাকের প্রকল্প (Goldbach's hypothesis) যে কোন জোড় সংখ্যা (even number) দুটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল; (24=7+17)। এ সমস্যা নিয়ে কাজ করে হার্ডি-লিটলউড প্রমাণ করেন, কোন বিজোড় সংখ্যা 3টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল। বিজ্ঞানী ওয়ারিং (Waring) একবার প্রস্তাব করেন যে, কোন সংখ্যাকে 4টে বর্গসংখ্যা, 9টা ঘনসংখ্যা (cube), 19টা চতুর্বর্গ (biquadrates) ইত্যাদি সংখ্যার যোগফল হিসেবে লেখা যায়। এর কোন প্রমাণ তিনি দিয়ে যান নি। কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে অনেক গবেষণা-পত্র বেরিয়েছে। সেখানে হার্ডির অবদান প্রচুর। তিনি আরও অনেক সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন, অসীম চক্র (orders of infinity), ডাইফণ্টাইন সমীকরণ (diphantine equations), বেসেল অপেক্ষক (Bessel's functions), অসমীকরণ (inequalities) ইত্যাদি।

তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ গণিতের ভক্ত। ফলিত গণিতের উপর বিরক্ত ছিলেন। বলতেন ওগুলি কুৎসিৎ। যদিও তাঁর এক অবদান পরবর্তীকালে হার্ডি-উইনার নিয়ম (Hardy-Weiner law) প্রজনন-বিজ্ঞানে (science of genetics) ব্যবহৃত হয়েছে, তিনি এ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। তিনি বলতেন গণিতের উপপাদ্য হবে সুন্দর, গুরুত্বপূর্ণ ও গম্ভীর। উদাহরণস্বরূপ, তিনি পিথাগোরাস-এর $\sqrt{2}$-র অমূলদ তত্ত্বের (irrationality of $\sqrt{2}$) উল্লেখ করেন। এই অমূলদ সংখ্যা গণিত জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এবং আধুনিক দর্শনের উপর এর প্রভাব পড়েছে। সংখ্যার বেড়াজাল থেকে মানুষের চিন্তা মুক্ত হয়েছে। তাই পিথাগোরাসের উপপাদ্য সুন্দর, গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা গণিতে অনেক মজার ব্যাপার আছে। যেমন, $8712=4\times2178$ বা $9801=9\times1089$ অর্থাৎ সংখ্যা দুটি উল্টে দিয়ে একটিকে 4 ও অন্যটিকে 9 দিয়ে গুণ করলে মূল্য সংখ্যাকে পাওয়া যাবে। মজার ব্যাপার হল—এরকম; আর কোনও সংখ্যা নেই। হার্ডি বলতেন, এসব সময় কাটাবার জন্যে খেলা—কিন্তু গণিতে এর কোন গুরুত্ব নেই।

তাঁর লেখা বইগুলির ভিতর 'A Course of Pure Mathematics' ও 'Theory of Numbers' (Wright সহযোগে) গণিতের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য। 'A mathematician's Apology' নামে ছোট বইখানি সাহিত্যরসে ভরপুর। এতে ইনি তাঁর জীবন-দর্শনের কথা বলেছেন। রামানুজন এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের উপরও বই লিখেছেন। গবেষণামূলক গণিত পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করেছেন।

ভারতবর্ষ হার্ডির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তিনিই রামানুজনকে বিশ্বের দরবারে হাজির করেছেন—নইলে রামানুজনকে মাদ্রাজের পোর্ট অফিসে অখ্যাত কেরাণী হিসেবেই জীবন শেষ করতে হত। রামানুজন সম্বন্ধে উনি বিশেষ গর্ব অনুভব করতেন।

উনি বলতেন "মন যদি কখনও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে বা অন্তুর বড়াই শুনে ক্লান্ত হই—তখন ভাবি আমি লিটল্‌উড্‌ ও রামানুজনের সঙ্গে একই পর্যায়ে কাজ করতে পেরেছি—তোমরা তা কেউ পার নি।"

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নাস্তিক। ভগবানকে মনে করতেন শত্রু। একবার এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। হঠাৎ ব্যাটসম্যান নালিশ করল, তার চোখে কে আলো ফেলছে। হয়ত কোনও দুষ্টু ছেলে। না তা নয়। নজরে পড়ল যে এক পাত্রীর গলায় ঝোলানো রূপোর ক্রস্‌ থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়ছে। পাত্রীকে বলা হল ওটা খুলে ফেলতে। হার্ডি এতে ভীষণ মজা পেয়েছেন। সেদিন সমস্ত বন্ধুকে চিঠিতে জানালেন, ভগবান অন্তত একবার ক্রিকেট মাঠে হার স্বীকার করল।

ক্রিকেট ছিল তার দুই নম্বর নেশা। ক্রিকেটের ভাষায় কথা বলতে ভালবাসতেন। বলতেন আর্কিমিডিস, নিউটন, গাউস হলেন ব্র্যাড্‌ম্যান শ্রেণীর। এমনকি গণিতের এক প্রবন্ধই সুরু করেছিলেন ক্রিকেটের ভাষায়—"মনে করা যাক একজন ব্যাটস-ম্যান কোন বিশেষ মরসুমে বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যক ইনিংস্‌ খেলছেন ইত্যাদি……"

তিনি বন্ধুবান্ধব বেছে নিতেন যাদের, একটু 'স্পিন' (spin) আছে অর্থাৎ পেঁচালো বলের মত যাদের ভিতর বুদ্ধির দীপ্তি রয়েছে।

এই 'স্পিন' তাঁর নিজের চরিত্রেও ছিল। মৃত্যুর তিন-চার সপ্তাহ আগে রয়াল সোসাইটি Copley medal দেবার কথা ঘোষণা করলে তিনি হেসে মন্তব্য করেন, "বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে এলো, নইলে এঁরা এত তাড়াহুড়ো করে কেন আমাকে সম্মান দেখাতে চাইবেন।"

সত্যি তাই। হার্ডি 1947 সালের 1লা ডিসেম্বর মারা যান আর ওই দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে Copley medal দেবার কথা ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Variety of Men—C. P. Snow
2. Life Sketch—E. C. Titchmarsh (Collected Papers of Hardy and Littlewood—Vol. I)
3. A Mathematician's Apology—G. H. Hardy
4. Srinivasa Ramanujan—Suresh Ram

অরুণকুমার দাশগুপ্ত*

* কমফোর্ট, 2/1/B হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-700 029

তরল-কেলাস

তরল-কেলাস নামটা দেখেই বোঝা যায়, এই জাতীয় পদার্থের মধ্যে তরলের কিছু কিছু এবং কেলাসিত কঠিন পদার্থের কিছু কিছু ধর্ম বজায় থাকে; তাই এটাকে এই দুই জাতীয় পদার্থের মাঝামাঝি অবস্থা বলতে পারা যায়। তরলের ন্যায় সচলধর্ম (mobility) এবং কেলাসের ন্যায় আলোকীয় ধর্ম (optical properties) একে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আশি বছরেরও আগে তরল-কেলাসের অস্তিত্ব রেইনত্সার (Reinitzer) নামক এক বিজ্ঞানী প্রথম জানতে পারেন। আজ পর্যন্ত অনেকগুলি তরল-কেলাসের কথা জানতে পারা গেছে। দেখা গেছে যে প্রায় প্রতি দু-শ'টি নতুন জৈব যৌগ আবিষ্কৃত হলে তার মধ্যে একটি করে জৈব যৌগ তরল-কেলাস পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে কোলেষ্টেরেইল বেঞ্জোয়েট (cholesteryl benzoate)-এর নামটাই প্রথম মনে আসে; এছাড়া সাবানের ফেনা এক ধরনের তরল-কেলাস।

তরল-কেলাস আণবিক আকৃতির অসাম্যের উপরই নির্ভর করে। আর আকৃতির এই বৈষম্যের জন্যেই আসে তড়িৎপরিবাহিতার বৈষম্য (electrical anisotropy)। ক্রমবর্ধমান ব্যবহারিক প্রয়োগের দরুন বিশ্বের সর্বত্রই আজ তরল-কেলাস নিয়ে গবেষণা চলছে। গত দশ বছরের গবেষণালব্ধ ফল হিসেবে জানতে পারা গেছে এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োগ। এদের অণুগুলি দণ্ডাকার, ভীষণ সরু ও সূচের মত দীর্ঘ হয়। যে সমস্ত তরল কেলাসকে তাপপ্রয়োগে সুষম তরলে পরিণত করা যায় (thermotropic) তাদেরকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয়— নিমেটিক (nematic), কোলেস্টারিক (cholesteric) এবং স্মেকটিক (smectic)। এছাড়া যাদের দ্রবীভূত করে সুষম তরলে পরিণত করা যায় (lyotropic) সেগুলিকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ভাগগুলি হল স্বচ্ছ দশা (neat phase), নেমাটিকের সান্দ্রদশা (viscous phase) এবং অন্তর্বর্তী দশা (middle phase)। স্মেকটিক ও নেমাটিক তরল-কেলাসের অণুগুলি দণ্ডাকার এবং পাশাপাশি সাজানো। স্মেকটিকে এই সাজানো অবস্থাটা থাকে স্তরে স্তরে; কিন্তু নেমাটিকের এই বিন্যাসে থাকে বিশৃঙ্খলা (disorder)। কোলেস্টারিক-এর অণুগুলি ঘনস্তরে গ্রাফাইটের মত সাজানো এবং এই অণুগুলি আলোকীয়-সক্রিয়তা (optically active) যুক্ত।

তাপ প্রয়োগ বা অন্য কোন ধরণের উত্তেজনা এর আকৃতির পরিবর্তন আনে এবং এক প্রকার তরল-কেলাস থেকে অন্য প্রকার তরল-কেলাসে অথবা তরল-কেলাস অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় দশায় পরিবর্তন আনে (phase transition)। তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র-

প্রতিসরণ (double refraction), আলোক বিচ্ছুরণ (scattering), অস্বচ্ছতা এবং সাধারণ তরল অপেক্ষা আলাদা ধরনের প্রবাহ প্রবণতা (flow properties)—এর অন্যান্য ধর্মাবলীর মধ্যে আকর্ষণীয়। বিশিষ্ট ধরনের আণবিক গঠনের দরুন কোলেষ্টারিক তরল কেলাস কতকগুলি অস্বাভাবিক আলোকীয় ধর্ম দেখায় এবং এই ধর্মের জন্যে কোলেষ্টারিক অবস্থার তরল-কেলাসে সুন্দর সুন্দর রঙ দেখা যায়। অল্প উত্তেজনায় (perturbation) এর অবস্থার পরিবর্তন হয় বলে এই রঙেরও হয় পরিবর্তন। যেমন—তাপপ্রয়োগে বর্ণহীন একটা কোলেষ্টারিক তরল-কেলাসের স্তর অনেকগুলি উজ্জ্বল রঙে পরিবর্তিত হয়—লাল থেকে সবুজ এবং তারপর ঘন নীলে। কি ধরনের পদার্থ নেওয়া হয়েছে তার উপর নির্ভর করবে রঙ কতটা গাঢ় হবে।

তাপমাত্রার পরিবর্তনে রঙের এই পরিবর্তন নিয়মানুগ হওয়ায় −20°C থেকে 250°C পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপবার সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করা যায় এই তরল কেলাস দিয়ে। এছাড়া তরল-কেলাসের আরো কতকগুলি আকর্ষণীয় প্রয়োগের কথা জানা গেছে। চামড়ার গরম অংশগুলিতে তরল-কেলাসের তৈরী একটা প্লেট রাখলে রঙের পরিবর্তন হয়। এই ধর্ম প্রয়োগ করে ক্যানসার টিউমার কোষের অবস্থিতি জানা এবং অন্যান্য রোগ নির্ধারণের কাজে ডাক্তাররা একে কাজে লাগিয়েছেন। বৈদ্যুতিক এবং সাধারণ যন্ত্রপাতি অত্যধিক গরম হয়েছে কিনা বোঝবার জন্যে তরল-কেলাসের প্লেট ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত থার্মোগ্রাফি পদ্ধতির সঙ্গে এই ব্যবস্থা পাল্লা দিতে পেরেছে। এছাড়া উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির উপর এই রঙের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। তাই উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থের পাত্র থেকে পদার্থ বেরিয়ে আসছে কিনা বোঝবার জন্যে একে ব্যবহার করা যায়। আধুনিকতম ব্যবহারগুলির মধ্যে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পর্দায় (electrical display screen) এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত টেলিভিসন টিউব বা নিয়নটিউব থেকে এর তফাৎ হল—এরা নিজেরা কোন আলো নির্গমন করে না; প্রতিফলিত আলোকে ইপ্সিত প্রতিবিম্ব পর্দায় দেখতে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারে, মৃদু বা তীব্র আলোকে অর্থাৎ সব অবস্থাতেই সমান তীব্রতাযুক্ত প্রতিবিম্ব পর্দায় দেখা যায়। নিয়ন-ব্যবহৃত পর্দাগুলি সাধারণভাবে এত ভাল কাজ দেয় না। তাই প্রচলিত পদার্থগুলিকে সরিয়ে টেলিভিসন পর্দায় এবং অন্যান্য প্রয়োজনে এর যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া সম্ভাব্য অন্যান্য ব্যবহারগুলির মধ্যে জানালার কাঁচে, আলোকবন্ধক (light shutter) হিসেবে, কার্যকরী বিভব (operating voltage) এবং ক্ষমতা শোষণ (power consumption) কম হওয়ার দরুণ গাড়ি ও এরোপ্লেনের নির্দেশক চাকতি (indicator dial) হিসেবে এদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গঠন-বৈষম্যের ফলে তত্ত্বগত গবেষণার কাজে এর যথেষ্ট অগ্রগতি হয় নি; তবুও

কাজ যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এরা সমস্ত ভারি এবং ক্ষমতাশোষক ইলেকট্রন টিউবকে এবং প্রতিবিম্ব দেখানোর উপযুক্ততার জন্যে বিভিন্ন জনপ্রিয় যন্ত্রের পর্দায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের স্থান করে নেবে।

অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী*

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

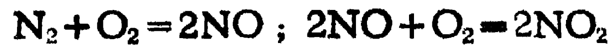
নাইট্রোজেন-চক্র

নাইট্রোজেন-চক্র বা nitrogen cycle. চক্র কথাটার বাংলা মানে হল, যে সময়ের ব্যবধানে ধারাবাহিকভাবে কোন ঘটনা ঘটে। প্রকৃতিতে এই নাইট্রোজেন-চক্রের একটা অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন মৌল বর্তমান। এই নাইট্রোজেন মৌল থেকে উৎপন্ন একটা যৌগিক পদার্থ প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। এই যৌগিক পদার্থটিকে প্রোটিন (protein) বলা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধনে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অপরিহার্য। প্রোটিন হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি মাত্র উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী বায়ুর এই মুক্ত নাইট্রোজেন প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করতে পারে না। সীমজাতীয় উদ্ভিদ, যেমন—সীম, মটর, ছোলা ইত্যাদি বায়ু থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। এই জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে একপ্রকার গুটি (nodules) তৈরি হয় যার মধ্যে ছোট ছোট জীবাণু বাস করে। ঐ জীবাণু বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য তৈরি করে। তখন উদ্ভিদ এই খাদ্য গ্রহণ করে নিজের পুষ্টি সাধন করে।

নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় মৌল। একারণে বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন যদিও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রাণীরা গ্রহণ করে, তারা কিন্তু সরাসরি জীবদেহে অন্য মৌলের সঙ্গে নাইট্রোজেনের যৌগ গঠন করতে পারে না।

প্রকৃতিতে অপর এক প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন উদ্ভিদের নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলে তড়িৎক্ষরণের ফলে বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই নাইট্রিক-অক্সাইড অতিরিক্ত অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করে নাইট্রোজেন-পার-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। পরে বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত

হয়ে তা মাটিতে পড়ে এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। মাটিতে অবস্থিত সোডিয়াম বা পটাসিয়ামঘটিত ক্ষারকের সঙ্গে ক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রেট যৌগে পরিণত হয়। উদ্ভিদ তখন শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে এই নাইট্রেট লবণ সংগ্রহ করে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে।



$$N_2+O_2=2NO\ ;\ 2NO+O_2=2NO_2$$



$$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$$

আবার প্রাণীদেহের মলমূত্রাদির সঙ্গে বহির্গত নাইট্রোজেন যৌগের পচনে এবং জীবজন্তুর মৃতদেহ ও উদ্ভিদের পচনে প্রোটিনের বিশ্লেষণে অ্যামোনিয়া (ammonia) উৎপন্ন হয়। এই অ্যামোনিয়া জমিতে অবস্থিত নাইট্রোসিফাইং (nitrosifying) জীবাণু দ্বারা নাইট্রাইট (nitrite) যৌগে পরিণত হয়। এই নাইট্রাইট যৌগ পরে নাইট্রিফাইং (nitrifying) জীবাণু দ্বারা নাইট্রেট যৌগে পরিণত হয়। সেই নাইট্রেটের কিছু অংশ উদ্ভিদেরা দেহসাৎ করে এবং কতকটা ডিনাইট্রিফাইং (denitrifying) জীবাণু দ্বারা পুনরায় মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

এই স্বতঃনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির ফলে প্রকৃতিতে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে পুনরায় মাটিতে এবং মাটি থেকে বায়ুতে ফিরে আসে। এই স্বতঃনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র (nitrogen cycle) বলে। প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন অপসারিত হয় এবং ধারাবাহিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই নাইট্রোজেন আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। সেই জন্যে এই প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন-চক্র বলা হয়।

কাঞ্চনপ্রকাশ দত্ত*

* হালদারপাড়া, পোঃ চন্দননগর, হুগলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অনুরোধে উক্ত প্রতিযোগিতার জন্যে মডেল জমা দিবার শেষ তারিখ 15ই মার্চ, 1978, তারিখের পরিবর্তে 17ই এপ্রিল, 1978, তারিখ ধার্য করা হল এবং আবেদনপত্র সংগ্রহ করবার শেষ তারিখ 31শে জানুয়ারী, 1978, তারিখের পরিবর্তে 28শে ফেব্রুয়ারী, 1978 তারিখ ধার্য করা হল।

ভেবে উত্তর দাও

1. একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের মধ্যে একটি মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলাশয়ের এক প্রান্ত থেকে একজন লোক মাছটির অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। ধরে নেওয়া যাক, বন্দুক থেকে মাছের কাছ পর্যন্ত গুলিটি যেতে যে সময় নেয় সেই সময়ের মধ্যে মাছটি তার অবস্থান পরিবর্তন করছে না। অথচ লোকটি বার বার গুলি ছুঁড়েও মাছটাকে গুলিবিদ্ধ করতে পারছে না। এটা কেমন করে সম্ভব ?

2. অমল ও বিমলের প্রত্যেককে একটি করে লোহার পাত ও একটি করে দণ্ড চুম্বক দিয়ে লোহার পাতটিকে চুম্বকে পরিণত করতে বলা হল। অমল লোহার পাতটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই অভিমুখে চুম্বকের এক মেরুকে ক্রমান্বয়ে ঘষে নিয়ে যেতে থাকল। বিমল দণ্ড চুম্বকটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই অভিমুখে লোহার পাতের এক প্রান্তকে ক্রমান্বয়ে ঘষে নিয়ে যেতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ; অমলের লোহার পাতটি চুম্বকে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বিমলেরটি চুম্বকে পরিণত হয় নি। এরকম কেন হল বলতে পার কি ?

3. যে কোন মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রীনে ধনাত্মক তড়িৎসম্পন্ন কণা প্রোটন এবং নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রন থাকে। হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যান্য সব মৌলের কেন্দ্রীনে একাধিক প্রোটন থাকে। আবার জানা আছে, যদি দুটি তড়িৎ কণার উভয়েই সমধর্মী আধান-সম্পন্ন হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে, অর্থাৎ একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায়। সুতরাং হাইড্রোজেন ছাড়া আর সব মৌলের কেন্দ্রীন অস্থায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না কেন ?

4. মনে করা যাক, একজন নভোচর একটি নভোযানের বাইরে শূন্যে বিচরণ করছে। সে নভোযানের ভিতরে প্রবেশ করতে চায়। নভোযানটি ভূপৃষ্ঠে থাকলে সে হেঁটে গিয়ে নভোযানের ভিতরে যেতে পারত। কিন্তু শূন্যে ঐ অবস্থায় সে কি করবে বলতে পার কি ?

(সমাধান 89 পৃষ্ঠায়)

তুষারকান্তি দাস*

* পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

জেনে রাখ

অধিক পরিশ্রমের ফলে আমরা ক্লান্তি অনুভব করি কেন ?

আমরা যখন বহুক্ষণ ধরে কাজকর্ম করি তখন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বেশিক্ষণ হাঁটলে বা খুব জোরে দৌড়লে পেশীগুলি অবশ হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না। এর কারণ হল পেশীগুলির সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে প্রভূত শক্তি ব্যয় হয়। শ্বাসকার্য থেকেই মূলত ঐ শক্তি আসে, এজন্যে পেশীগুলির প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। হৃৎপিণ্ড সাধ্যমত স্পন্দনের হার বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তাহলেও অনেক সময় অক্সিজেনের অভাব পূরণ হয় না। এই অবস্থায় পেশীকোষগুলির মধ্যে গ্লাইকোজেন শর্করা অক্সিজেন-বিহীন পরিবেশের মধ্যে আংশিক জারিত হয়ে প্রচুর ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করতে সুরু করে। কোষের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমতে সুরু হওয়ায় পেশীগুলির স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয় এবং আমরা ক্লান্তি বোধ করি।

কৃষ্ণেন্দু পাল*

*15 বি, শ্রীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-700 004

জানুয়ারী '78 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত 'শব্দকূট'-এর সমাধান

পাশাপাশি

1—গাউস্, 2—আয়োডিন, 4—মাইক্রোফোন, 5—রনজেন, 6—পৃথিবী, 7—প্রধান অক্ষ, 9—চাকৃতি, 10—আয়ন, 11—গ্রাম, 13—রস্বস্, 15—কার্য।

উপর থেকে নিচে

1—গামারশ্মি, 3—নভোবীক্ষণ, 7—প্রতিপ্রভা, 8—অয়শ্চৌম্বক, 9—চামচিকা, 10—আয়রন, 11—গ্রাফ্‌টিং, 12—সূর্য, 14—সজী।

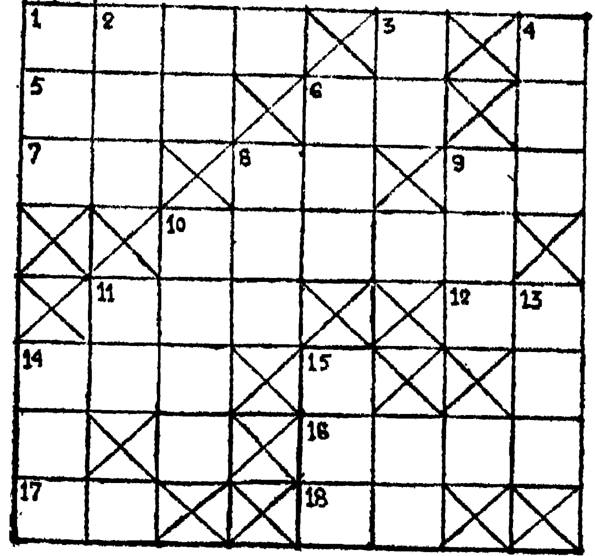
বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজন-ভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকূট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে হাতে বা ডাকযোগে লেখা পাঠাতে হবে। পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি কর্তৃক লেখা মনোনীত হলে তা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ সময়মত প্রকাশ করা হবে।

শব্দকূট

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে শব্দকূটটি সমাধান কর ঃ

পাশাপাশি



1—বিজলী বাতির আবিষ্কারক ;

5—তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্রাবলীর প্রবর্তক ;

6—টেলিফোনের আবিষ্কারক ;

7—বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কিত সূত্রের প্রবর্তক ;

8—ভারতের বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানী ;

9—চৌম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত কোন পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহের দরুন পরিবাহীর উভয় প্রান্তে যে বিভব প্রভেদ সৃষ্টি হয় তার সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা ;

10—বিবর্তনবাদের প্রবর্তক ;

11—স্থিরতড়িৎ আধান বা চুম্বক মেরুর মধ্যে বলের পরিমাণ নির্ধারক সূত্রের আবিষ্কারক ;

12—অণুর তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির শোষণ ও বিকিরণের সূত্রের আবিষ্কারক (ডেনমার্কের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী) ;

14—ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কারক ;

16—এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক ;

17—টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা ;

18—কোন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতির আবিষ্কারক ;

উপর থেকে নিচে

2—একটি বিখ্যাত পরিসংখ্যান তত্ত্বের যুগ্ম আবিষ্কারকদের একজন ;

3—তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত সূত্রের প্রবর্তক ;

4—যাঁর সূত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন গ্যাসের চাপ আয়তনের ব্যস্তানুপাতিক ;

10—মিশ্রিত গ্যাসের চাপ সম্পর্কিত সূত্রের প্রবর্তক ;

13—কোন মাধ্যমে আলোকের বিচ্ছুরণ সম্পর্কিত একটি মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কর্তা ভারতীয় বিজ্ঞানী ;

14—প্রবাহী তড়িৎ বিজ্ঞানে একটি প্রাথমিক ও অতি প্রয়োজনীয় সূত্রের প্রবক্তা ;

15—যে বিজ্ঞানীর নামে কম্পাংক নামাঙ্কিত।

গুরুপদ ঘোষ*

* গ্রাম—আব্দারপুর, পোঃ—সিউরী, জেলা—বীরভূম

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান

1. এখানে লোকটি মাছটিকে তার প্রকৃত অবস্থানে দেখছে না। তাই বার বার গুলি ছোঁড়া সত্ত্বেও মাছটি গুলিবিদ্ধ হচ্ছে না। মাছটিকে প্রকৃত অবস্থানে না দেখার কারণ হল আলোকের প্রতিসরণ। যেমন, প্রতিসরণের জন্যে কোন স্বচ্ছ জলাশয়কে অগভীর মনে হয়। এখানেও লোকটি মাছটিকে তার প্রকৃত অবস্থানের চেয়ে উঁচুতে দেখবে।

2. লোহা একটি চৌম্বক পদার্থ। এর মধ্যে যে অণুচুম্বক আছে তারা একটি বন্ধমুখ শৃংখল তৈরি করে থাকে। এই বন্ধমুখ শৃংখলকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে বাইরে থেকে একই দিকে একটি চুম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করা দরকার। অমল চুম্বকের একটি মেরুকে লোহার পাতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বারে বারে ঘষায় নির্দিষ্ট দিকে একটি চুম্বকক্ষেত্র লোহার পাতে প্রযুক্ত হচ্ছে। তার ফলে লোহার পাত চুম্বকিত হচ্ছে।

অপরপক্ষে, বিমল যা করছে তাতে লোহার পাতের একপ্রান্তে পরবর্তী চুম্বকক্ষেত্র প্রযুক্ত হচ্ছে। তার ফলে ঐ প্রান্তে কোন স্থায়ী চুম্বকত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না। লোহার পাতের অন্যপ্রান্তে কোন চুম্বকক্ষেত্র প্রযুক্তই হচ্ছে না; সুতরাং লোহার পাতের কোন স্থানেই চুম্বকত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না।

3. পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত বিভিন্ন কণিকার ভিতর যে বল ক্রিয়া করে তাকে 'নিউক্লীয় বল' (nuclear forces) বলে। দুটি প্রোটনের মধ্যে দূরত্ব যদি $1{\cdot}5 \times 10^{-13}$ সেন্টিমিটারের কম হয় তখন ওদের মধ্যে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া না করে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। ক্রিয়াশীল এই আকর্ষণ বলকে 'স্বল্প পরিসর বল' (short range force) বলে। এই বল শুধুমাত্র দুটি প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়া করে তা নয়। দুটি নিউট্রন কিংবা একটা প্রোটন ও একটা নিউট্রনের মধ্যেও এই ধরনের বলের কল্পনা করা হয়। এই কারণে পরমাণুর কেন্দ্রীন স্থায়ী হয়।

4. নভোচরটি যে অভিমুখে নভোযানে যেতে চায় তার বিপরীত অভিমুখে সে একটি বস্তুকে ছুঁড়ে দেবে। 'ভরবেগের নিত্যতা সূত্র' (Law of Conservation of Momentum) অনুসারে সে নভোযানের অভিমুখে একটি বেগ পাবে। ফলে সে নভোযানে পেঁছিতে পারবে।

মডেল তৈরি

(1)

ক্রোমাটোগ্রাফি

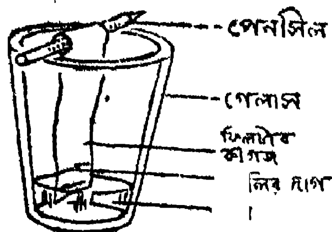
কলেজের বেলা হয়ে গেছিল, স্নান করব বলে নিচে নামছি—একতলায় বাপ্পুদের ফ্লাটের সামনে পৌঁছে শুনি ভীষণ গোলমাল, হাতাহাতি শুরু হতে বিশেষ বাকি নেই। ঘটনার নায়ক বাপ্পু আর মিন্না। দু'জনে একই ক্লাসে পড়ে, সমান ডানপিটে।

অবশ্য পড়াশোনাতে ভাল, সেজন্যে আমি ওদের ভালবাসি। ব্যাপার কি জানবার জন্যে আমি ওদের পড়ার ঘরে ঢুকলাম। দেখি, দু'জনেই 'হাতে কালি, মুখে কালি' অবস্থা। আমার প্রশ্নের উত্তরে দু'জনে একসঙ্গে হৈচৈ করে উঠল। টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে যা বুঝতে পারলাম তার সারমর্ম এই, মিন্না কি করে নাকি জানতে পেরেছে যে, কালি আসলে লাল রঙের জলে গোলা থাকে বলে নীল রঙের দেখতে হয়। কেননা, মিন্না লক্ষ্য করেছে, কালি যত শুকতে থাকে কালির রঙ তত লাল হয়ে যায়। বাপ্তু শুরুতেই কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয় আবার মিন্নার মাথার সুস্থতা সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দিয়েছে। তাই মিন্নার এত রাগ।

আমি ওদের থামিয়ে বললাম—তোমরা এখন খেয়েদেয়ে স্কুলে যাও। বিকেলে আমি তোমাদেরকে কালির সমস্ত উপাদান আলাদা করে দেখিয়ে দেব। অমনি রাগ ভুলে ওরা খুশিমনে দৌড়ে চলে গেল।

কলেজে সেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। বাপ্তু ও মিন্না এসে পড়ার আগেই সমস্ত জিনিষপত্তর হাতের কাছে জোগাড় করে রাখলাম। জিনিষপত্র খুব সাধারণ। একটা বড় কাচের গ্লাস, খানিকটা ফিল্টার কাগজ, একটা পেন্‌সিল আর কিছুটা জল (চিত্র1)। পরীক্ষাটা শক্ত কিছু নয়, যে কেউ করে দেখতে পারে। সিঁড়িতে দুড়দাড় করে পায়ের শব্দ, বুঝতে বাকি রইল না কাদের আগমন ঘটছে। ওরা দু'জনে চুপ করে বসলে আমি শুরু করলাম।

প্রথমে ফিল্টার কাগজ থেকে একটা আধ ইঞ্চি চওড়া আর বেশ খানিকটা লম্বা একটা ফিতার মত কেটে নিলাম। ঐ ফিতাটার একপ্রান্ত পেন্‌সিলটার মাঝখানে একপাক জড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলাম। এরপর পেন্‌সিলটার গেলাসের মুখে আড়াআড়িভাবে রেখে ফিতাটা গেলাসের ভিতরে ঝুলিয়ে দিলাম। ফিতাটার অন্য ধার থেকে এমনভাবে খানিকটা কেটে বাদ দিলাম যাতে ঐ ফিতার শেষ প্রান্ত গেলাসের তলা থেকে অন্তত এক সেন্টিমিটার উপরে থাকে।



ক্রোমাটোগ্রাফির সহজ পরীক্ষা
চিত্র 1

এরপর কাগজটা তুলে নিয়ে কাগজটার নিচের প্রান্ত থেকে প্রায় দু'সেন্টিমিটার উপরে একপিঠে আড়াআড়িভাবে সাধারণ নীলকালির পেন দিয়ে একটা সরু দাগ টানলাম।

গেলাসে অল্প একটু জল ঢাললাম। জলের পরিমাণ এমন হবে যাতে কাগজের ফিতাটা গ্লাসের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলে শুধুমাত্র কাগজের নিচ-প্রান্ত ঠিক জলতল স্পর্শ করে।

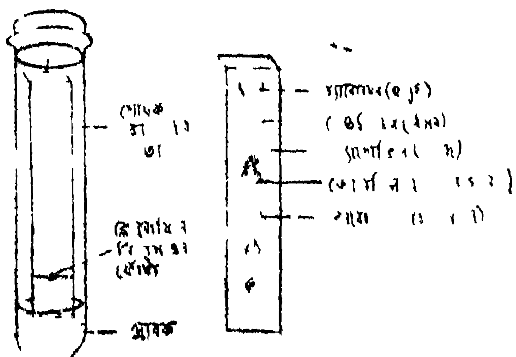
পেন দিয়ে যে দাগটা দেওয়া হয়েছিল সেটা ভালভাবে শুকিয়ে যাওয়ার পর কাগজটা সাবধানে গ্লাসের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলাম। ফিল্টার কাগজের নিচের প্রান্ত জলতল স্পর্শ করতেই ফিল্টার কাগজ জল শুষতে শুরু করলো এবং কাগজ ভিজে জল ক্রমশ উপরের

দিকে উঠতে লাগল। আস্তে আস্তে জল যেই কালির কাছে পৌঁছল, অমনি সেই কালির দাগও ক্রমশ কাগজের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কিন্তু কালির সমস্ত অংশটা জলের সঙ্গে উঠে গেল না; খুব সামান্য একটা কালির রেশ কাগজের গায়ে লেগেই রইলো। সেটার রঙ কালির আসল রঙের থেকে সামান্য আলাদা। বেশ খানিকটা ওঠার পর ঐ বিশেষ রঙটা শেষ হয়ে অন্য একটা রঙ শুরু হল। এইভাবে বেশ কিছুটা উঠে যাওয়ার পর কয়েকটা আলাদা রঙের পটি বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ভিজে অবস্থায় কাগজে রঙ যত স্পষ্ট বোঝা যায় শুকিয়ে গেলে তার চেয়ে কিছুটা ফ্যাকাসে দেখায়। রঙের পটিগুলি আরও স্পষ্ট বুঝবার জন্য লাল, নীল এবং কাল কালির একটা করে ফোঁটা নিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে ঐ মিশ্র কালির দাগ দিয়েও পরীক্ষা করতে পার। পরীক্ষাটা করতে গিয়ে প্রথমে একটুআধটু অসুবিধা হলেও কয়েক বারের চেষ্টায় বেশ ভালভাবে করা যাবে।

এইভাবে বিশেষ কোন দ্রাবকের সাহায্যে বিভিন্ন রঙিন পদার্থের মিশ্রণকে পৃথক করার নামই ক্রোমাটোগ্রাফি। এই পদ্ধতির আরও একটা বিশেষ ব্যবহার-এর কথা তোমাদের বলছি।

তোমরা সকলে নিশ্চই জান, গাছ নিজে নিজেই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উৎস যেমন সূর্য, বাতাস, জল, প্রভৃতিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য তৈরি করতে পারে। এই পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করবার জন্যে একটা বিশেষ জিনিষের প্রয়োজন হয় যার নাম ক্লোরোফিল বা সবুজ কণা। ক্লোরোফিল প্রকৃতপক্ষে তিন প্রকার রঙিন পদার্থের মিশ্রণ— কমলা রঙের ক্যারোটিন, হলদে রঙের জ্যান্থোফিল এবং সবুজ রঙের ক্লোরোফিল।



ক্লোরোফিলের ক্রোমাটোগ্রাফি
চিত্র 2

এইখানে একটা কথা বলা দরকার, যে সমস্ত রঙিন পদার্থের মিশ্রণ পৃথক করার জন্যে ব্যবহার করা হবে, তারা যে দ্রবণকে অবলম্বন করে উপরে উঠবে তাতে অবশ্যই দ্রবণীয় হওয়া চাই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পূর্বের পরীক্ষাতে কালির সমস্ত উপাদান জলে দ্রবণীয় ছিল।

ক্লোরোফিল-এর তিনটি উপাদানের কোনটিই জলের দ্রবণীয় নয়, কিন্তু এরা সকলেই পেট্রোলিয়াম ইথারে দ্রবণীয়। কখন কখন পেট্রোলিয়াম ইথারের সঙ্গে অ্যাসিটোনও ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি খুব সহজলভ্য নয়; উপরন্তু পেট্রোলিয়াম ইথার-এর ব্যবহারেও একটু সাবধানতা প্রয়োজন। প্রথমত এটি খুব বেশি উদ্বায়ী, ফলে খোলা বাতাসে রাখলে দেখতে দেখতে উবে যাবে। আবার অন্যদিকে

এটি অত্যন্ত দাহ্য, ফলে পরীক্ষার সময় কাছেপিঠে কোন আগুনের অস্তিত্ব থাকা চলবে না।

যদি পরীক্ষা করতে চাও, প্রথমে কিছু সবুজ পাতা, ঘাস জোগাড় কর। আরও সুন্দরভাবে করতে হলে খানিকটা গাজর বা বীটের ছাল তুলে আন। এবারে সমস্ত উপাদান একটা হামানদিস্তায় বা শিলনোড়ায় ভাল করে থেঁতো কর। ঐ থেঁতো-করা মণ্ডমত জিনিষটা থেকে নিংড়ে রসটা বের করে নাও। ঐ রসটার এক চামচ একটা ছোট বীকারে বা অন্য কোন ছোট কাচের পাত্রে নিয়ে তার মধ্যে প্রায় তিন চামচ পেট্রোলিয়াম ইথার মিশিয়ে ভালভাবে মিলিয়ে দাও যাতে স্থির অবস্থাতেও দ্রবণের উপরের অংশ রঙিন থাকে। এইবার ঐ রঙিন দ্রবণ ফিল্টার করে নাও। ফিল্টার করার জন্যে গোল ফিল্টার কাগজকে মুড়ে ঠোঙার মত করে তার মধ্যে আস্তে আস্তে দ্রবণ ঢালতে হয় আর পরিশ্রুত দ্রবণ নিচে ফোঁটা ফোঁটা করে একটা পরিষ্কার পাত্রে জমা হয়।

ঐ পরিশ্রুত দ্রবণ কয়েক মিনিট খোলা অবস্থায় রেখে দিলে পেট্রোলিয়াম ইথার ক্রমশ বাষ্পীভূত হয়ে আয়তন কমবে আর দ্রবণ ঘন হবে। যখন দ্রবণের আয়তন প্রায় আধ চামচের মত হবে তখন ঐ দ্রবণ দিয়ে ফিল্টার কাগজে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে একটা দাগ বা ফোঁটা দাও। এইভাবে ঐ একই দ্রবণ দিয়ে আরও কয়েকটি ফিল্টার কাগজে দাগ দিয়ে রাখ। দাগগুলি ভাল করে শুকিয়ে নাও।

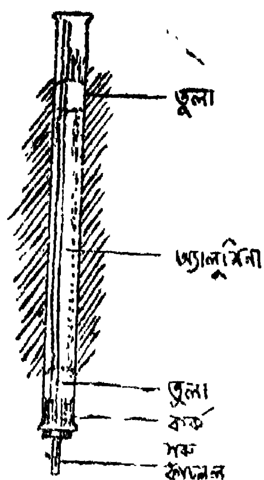
এবারে কাচের পরিষ্কার বীকারে বা অন্য কোন পাত্রে পেট্রোলিয়াম ইথার রেখে পূর্বের পরীক্ষার মত ফিল্টার কাগজগুলি ঝুলিয়ে পরীক্ষা করলে বিভিন্ন রঙের পদার্থ পৃথক হবে।

লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পেট্রোলিয়াম ইথার বাষ্পীভূত হয়ে গিয়ে দ্রবণের তল নেমে গিয়ে পরীক্ষায় বিঘ্ন না ঘটায়। দ্রুত বাষ্পীভবন রোধ করার জন্যে সমস্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা একটা বড় কাচের বেলজার বা অন্য কিছু দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখা যায়। অল্প উপাদান নিয়ে দ্রুত পরীক্ষা করার জন্যে একটি পাত্রে দ্রাবক নিয়ে অনেকগুলি কাগজের ফিতা একসঙ্গে ব্যবহার করা যায় (চিত্র 2)। বেশ কয়েকটা কাগজে পরীক্ষাটা করবে। কারণ প্রত্যেক বারেই মনোমত সুন্দর পটি পাওয়া যায় না, তাছাড়া বিভিন্ন পরিমাণে বা বিভিন্ন প্রকারের উপাদান ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। এতক্ষণ যে দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হল তাদের পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি বলে।

এ তো গেল সহজে বাড়িতে বা স্কুলের ল্যাবরেটারীতে করার পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন জটিল ও বড় বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিপুল ব্যবহার দেখা যায়।

বড় ল্যাবরেটরীতে যেভাবে পরীক্ষা করা হয় তাও সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। একটা প্রায় এক সেন্টিমিটার ব্যাসের কাচের নল যার দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমত নেওয়া হয়; সাধারণত এক ফুট পর্যন্ত হয়। সমস্ত নলটা ভরা থাকে জলসিক্ত অ্যালুমিনা দ্বারা। অ্যালুমিনা হল অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর অক্সাইড যৌগ।

প্রথমে একটা 100 মি.লি. বিকারে 15 গ্রাম ক্রোমাটোগ্রাফির উপযোগী অ্যাসিডে পরিশ্রুত অ্যালুমিনা নিয়ে তাতে 60 মি.লি. জল ঢালা হয়। অ্যালুমিনাকে জলের সঙ্গে খুব ভালভাবে নেড়ে দেওয়া হয়। অ্যালুমিনা জলে দ্রবণীয় নয়। পূর্বোক্ত কাচনলের নিচের মুখে একটা সরু কাচনলযুক্ত কর্ক যুক্ত করা হয় এবং তার উপরে খানিকটা তুলো দিয়ে অ্যালুমিনা-জল মিশ্রণ ঢেলে দেওয়া হয়। অ্যালুমিনা থিতিয়ে যায়, ফলে জল উপরে আলাদা হয়ে যায়। পরে নিচের তুলো চুঁইয়ে জল-এর তল নামতে থাকে। জলের উপরি তল যখন অ্যালুমিনার কাছাকাছি আসে, তখন শুরু হবে পরবর্তী কাজ।



অ্যালুমিনা ক্রোমাটোগ্রাফি
চিত্র 3

পূর্বেই এক শতাংশ মাত্রার মিথাইল ব্লু নামক রঙের তিন ফোটা এবং এক শতাংশ মাত্রার ফুচসিন (fuchsin) রঙের পাঁচ ফোঁটা 2 মি.লি. জলে দিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। অতঃপর ঐ কাচনলে অ্যালুমিনা স্তরের উপরে খুব সাবধানে এই রঙ মিশ্রের দ্রবণের 1 মি.লি. ঢেলে দেওয়া হল এবং তার উপর সাবধানে আরও 5 মি.লি. জল ঢালা হল। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে অ্যালুমিনা ঘেঁটে না যায়। জলতল নামতে নামতে আবার অ্যালুমিনার কাছে এলে পুনরায় 5 মি.লি. জল দিতে হবে। ক্রমাগত জল দিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না রঙের রেশ প্রায় তলা পর্যন্ত পৌঁছয়। তারপর জল দেওয়া বন্ধ রেখে অ্যালুমিনা শুকিয়ে নিতে হয়। পরে তুলো কর্ক সমস্ত খুলে নিয়ে একটা মোটা কাঠির ঠেলা দিয়ে অ্যালুমিনার দণ্ডটা বের করে নিয়ে রঙের পৃথক স্তরকে আলাদা করে নিলেই পরীক্ষা সম্পন্ন হবে। এই পদ্ধতিকে বলে অ্যালুমিনা ক্রোমাটোগ্রাফি (চিত্র 3)।

এখন কিভাবে এই পৃথকীকরণ সম্ভব হয় তার কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এই পরীক্ষার মূল নীতি হল নির্বাচনমূলক শোষণ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কোন কঠিন পদার্থের গায়ে অন্য কোন পদার্থ লেগে থাকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। বিভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণ বিভিন্ন।

সক্রিয় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, সক্রিয় সিলিকা জেল, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সেলুলোজ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ দ্রবণ থেকে দ্রাব শোষণ করতে পারে।

এই শোষণ প্রক্রিয়ার ভৌত কারণ হল কঠিন পদার্থের গঠন বৈশিষ্ট্য। কঠিন

পদার্থের মধ্যে সাধারণত অণুগুলি অসম্পৃক্ত যোজ্যতায় থাকে। ফলে পারস্পরিক বিনিময় পদ্ধতিতে পাশাপাশি অণুগুলি বিপরীত তড়িদাবিষ্ট হয় এবং পারস্পরিক স্থিত তড়িতাকর্ষণে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিনের একেবারে উপরের তলের অণুগুলির সবগুলিই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না, ফলে অন্য কোন পদার্থের অণুর সংস্পর্শে এলে তাকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বল দুটি অণুরই গঠনের উপর নির্ভর করে এবং কার্যত দেখা যায় বেশি যোজন ক্ষমতাসম্পন্ন অণু আগে আকর্ষিত হয় এবং দুর্বল অণুগুলি পরে। ফলে জল বা অন্য কোন দ্রাবকের সাহায্যে কোন পদার্থকে কোন কঠিনের গা বরাবর বয়ে নিয়ে গেলে ঐ কঠিন পদার্থ প্রথমে অধিক যোজ্যতাসম্পন্ন অণুকে ধরে রাখবে, পরে ঐ অণু শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে ঠিক তার চেয়ে কম যোজ্যতাসম্পন্ন অণুকে আকর্ষণ করবে। এখন পদার্থগুলির যদি বিভিন্ন রঙ থাকে তাহলে তাদের সহজেই চেনা যায়।

নিজেরা হাতেনাতে যে কোন একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

বিকাশরঞ্জন রায়*

* ডাকঘর-নতুনচটি, জেলা—বীরভূম

[2]

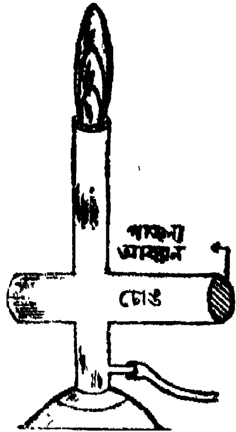
সুবেদী শিখা

শিখার উপর শব্দ-তরঙ্গের প্রভাব এই মডেলের সাহায্যে অনুধাবন করা যায়।

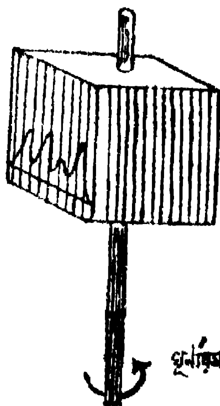
গ্যাসের কোন দীপ জ্বলবার সময় দীপের রন্ধ্রপথে গ্যাস সাধারণত ধারারেখ (stream line) পথে প্রবাহিত হয়। প্রবাহকালীন গ্যাসের চাপ এবং রন্ধ্রপথের আকৃতির পরিবর্তন করে গ্যাসের প্রবাহ অশান্ত করা যায় এবং তখন তা ধারারেখ না হয়ে অবিন্যস্ত (turbulent) হয়ে যায়। যখন এই সংকট অবস্থায় আসে অর্থাৎ নির্দিষ্ট রন্ধ্রপথে গ্যাসের চাপ ইচ্ছামত পরিবর্তন করে যখন প্রবাহের ধর্ম ধারারেখ থেকে অবিন্যস্ত হওয়ার অবস্থায় এসে পৌঁছবে, তখন পাশ থেকে শব্দ করলে বা কোন শব্দ-তরঙ্গ শিখার কাছে তৈরি হলে, শিখার আকৃতি বদলে যায়। শব্দের কম্পাংক বিভিন্ন হলে শিখাও নানান আকৃতিতে প্রতীয়মান হয়। নিচের পরীক্ষা থেকে তা বোঝা যাবে।

একটা বুনসেন দীপের উপরের অংশ একটা ধাতুর তৈরী চোঙাকৃতি পাত্রের সঙ্গে যুক্ত (চিত্র 1)। চোঙটি লম্বায় 10—15 সে.মি. এবং এর ব্যাসার্ধ প্রায় 3 সে.মি.। চোঙটির একপ্রান্ত বন্ধ এবং অপর প্রান্ত পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা। সাধারণ

পাতলা পলিথিন বা ব্লাডারের রবার দিয়ে এই আবরণ তৈরি করা যায়। এই বুনসেন দীপে গ্যাসের প্রবাহ সংকট অবস্থায় রেখে দীপটি প্রজ্বলিত করে আবরণে ধাক্কা দিলে বা টোকা দিলে দীপের শিখা অশান্ত এবং অবিন্যস্ত দেখাবে। নানান আকারের চোঙ ব্যবহার করে এভাবে টোকা দিলে শিখাও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হবে। কম্পাংক বৃদ্ধি করলে শিখার উপর তরঙ্গের প্রভাব তীব্র হয় এবং তা ভালভাবেই অনুধাবন করা যায়। তবে শিখার আকৃতির পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি ঘটালে তা খালি চোখে স্পষ্টভাবে ধরা বা বোঝা যায় না। তখন একটি ঘূর্ণায়মান দর্পণ ব্যবহার করলে (চিত্র 2) ঐ দর্পণে শিখার প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। তবে এ অবস্থাতেও তরঙ্গের কম্পাংক নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে হতে হবে। শিখার আকৃতি অবিকৃত থাকলে ঘূর্ণায়মান দর্পণে শিখার প্রতিবিম্ব আলোর অবিচ্ছেদ্য রেখা হিসাবে প্রতীত হয়; আর যদি শিখার আকৃতি বদল হয় তবে তা করাতের দাঁতের মত কাটা কাটা আকৃতির প্রতিবিম্ব তৈরি করে (চিত্র 2)। বিজ্ঞানী র‍্যালে এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন এবং এটি র‍্যালের সুবেদী শিখা নামে প্রচলিত। এ জাতীয় আকৃতিগত পরিবর্তনের জন্যে এই শিখাকে সুবেদী শিখা বলে।



চিত্র 1



চিত্র 2

তরঙ্গের অবিন্যস্ত তত্ত্বের সাহায্যে উপরিউক্ত ঘটনার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে এই মডেলটি তৈরি হচ্ছে।

শ্যামসুন্দর দে*

অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : 1. গাছের উকুন কি? কিভাবে এর উৎপাত থেকে গাছকে রক্ষা করা যেতে পারে?

কাজল পাত্র, হুগলী

2. কেড়ি পোকা কি এবং কিভাবে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

মলয় দত্ত, হাওড়া

উত্তর : 1. এফিড (Aphids)-কে গাছের উকুন বলা হয়। সাধারণত গোলাপ ফুলের গাছে এই পোকার উপদ্রব বেশি। এরা গাছের ছালে ছিদ্র করে সেখান থেকে রস শোষণ করে নেয় এবং ক্রমশ গাছকে মেরে ফেলে। তবে সব রকম গাছই (বিশেষ করে ছোট ছোট গাছ) এই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এফিড কিছু ভাইরাসের বাহক হিসাবেও কাজ করে। এফিড আকারে খুবই ছোট ও লম্বাটে। এদের অগ্রভাগে শুঁড় আছে। এফিড-এর বিভিন্ন শ্রেণী আছে। কোন কোন এফিড-এর পাখ্না থাকে আবার কারোর তা থাকে না।

গাছে নিয়মিত 0·5% মিথাইল প্যারাথিয়ন স্প্রে করলে এই পোকা বিনষ্ট হয়; ফলে গাছও রক্ষা পায়।

উত্তর : 2. সাধারণত পাট কেড়ি পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এদের দেখতে অনেকটা চালের পোকার মত। মাথায় শুঁড় থাকে। গায়ের রং কালো। পাতার বোঁটার নিচে গর্ত করে সেখানে থাকে ও ডিম পাড়ে। এরা প্রধানত গাছের ছাল এবং গর্তের চারদিকের ছাল খেয়ে বেঁচে থাকে। এই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছের পাতা এলিয়ে পড়ে এবং ডগা ক্রমশ শুকিয়ে যায়।

এ-জাতীয় পোকা সাধারণ কীটনাশক ওষুধে বিনষ্ট হয় না। 'এলোসাল' নামক কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে এই পোকা মারা যায়। তবে দু'ভাগ গন্ধক ও পাঁচ ভাগ চুন একসঙ্গে মিশিয়ে গাছে ছড়িয়ে দিলে কেড়ি পোকা বিনষ্ট হয়। অনেক সময় ছড়িয়ে দেবার পূর্বে গাছে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়; ফলে ঐ মিশ্রণ পাতায় আটকে থাকে। এতে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে ঘন ঘন 'ফলিডল' স্প্রে করলেও অনেকটা সুফল পাওয়া যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

---

*ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স এণ্ড ইলেকট্রনিকস্, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পুস্তক-পরিচয়

আপনি আমি ও বিজ্ঞান

পুস্তকটির লেখক—পূর্ণেন্দু সরকার; প্রকাশক—যুব বিজ্ঞান সংস্থা, গোবরডাঙ্গা; পরিবেশক—সিটি পাবলিশার্স, 18L, টেমার লেন, কলিকাতা-700 009; পৃষ্ঠা-64, মূল্য—চার টাকা।

নামের দিক দিয়ে বইটি সার্থক। সত্যই বইটি আমার, আপনার এবং সকলের। দৈনন্দিন জীবনে সংস্কার ও অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক কাজ করি যেগুলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয় বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। পুস্তকখানিতে এরূপ কয়েকটি ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কি করা উচিত এবং তা না করা হলে তার মারাত্মক পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। লেখক পুস্তকখানিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশে বিরত থেকে সাধারণের মধ্যে বিষয়বস্তুকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। আঞ্চলিক ভাষায় এ ধরণের পুস্তক প্রায় নেই বললেই চলে। সেজন্যে লেখকের এ শুভ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

দু-চারটি বানান ভুল ও কিছু কিছু পরিভাষার জটিলতা ছাড়া পুস্তকখানির ভাষা সহজ ও সরল এবং লেখার ধরণও বেশ ভাল। এককথায় বইখানি সুখপাঠ্য। পুস্তকটির বহুল প্রচার সমাজে বিজ্ঞান-মানসিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে যে সহায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, শারীরবৃত্তিক ও ভিটামিন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পুস্তকখানিকে অধিকতর মূল্যবান করেছে।

রতনমোহন খাঁ*

* গণিত বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞান-সংবাদ

আলোচনা-চক্র

শিল্পে পরিত্যক্ত বস্তু (Industrial Wastes)— এই বিষয়ের উপর গত ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর, 1977, কলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামে ন্যাশানাল এন্‌ভাইরন-মেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও সি. এম. ডি এ-র যৌথ উদ্যোগে একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পের অব্যবহার্য দ্রব্যাদি কিভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগানো যায় তা নিয়ে বহু বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিজ্ঞান-কর্মী বিশদভাবে আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র

ইনষ্টিটিউশন অব ইনষ্ট্রুমেণ্টেশন সায়েন্টিষ্টস্ অ্যাণ্ড টেকনোলজিষ্টস্ (ইণ্ডিয়া) গত 14ই থেকে 17ই জানুয়ারী, 1978, পর্যন্ত পার্ক হোটেলে ইনষ্ট্রুমেণ্টেশন-এর উপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। এই আলোচনা-চক্রে বহু বিজ্ঞানী ও গবেষক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইনষ্ট্রুমেণ্টেশন সংক্রান্ত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান অগ্রগতি ও গবেষণা সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী ও গবেষকরা তাঁদের নিজ নিজ গবেষণার ফলাফল উপস্থাপিত করেন এবং আলোচনা করেন।

অতীতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন— তাও এই আলোচনা-চক্রে পরিবেশিত হয়।

(উপরিউক্ত আলোচনা-চক্র দুটি রিপোর্ট করেছেন পরিষদ সদস্য শ্রীমণি ঘোষ)।

পরিষদের খবর

জনপ্রিয় বক্তৃতা

৪ই জানুয়ারী '78 বিকাল সাড়ে পাচটায় 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে' শ্রীদীপংকর রায় 'নিউটনের গতিসূত্র' বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণ উক্ত বক্তৃতা সাগ্রহে শোনেন।

আচার্য বসুর জন্ম-জয়ন্তী পালন

নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী পরিষদের উদ্যোগে গত 22শে জানুয়ারী, 1978, বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 84তম জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয় সত্যেন্দ্র ভবনে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত। আচার্যদেবের স্মৃতিচারণা করেন অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীদিলীপকুমার বসু, ডঃ বলাইচাঁদ কুণ্ডু ও ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি।

সভার উদ্বোধন করে কর্মসচিব ডঃ রতনমোহন খাঁ বলেন—আচার্য বসুর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে আজ যদি আমরা এই শপথ নিতে পারি যে, সাধারণের দ্বারে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেব, জনমানসে বিজ্ঞান-মানসিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হব—তবেই আচার্যের জন্মদিন পালন করা সার্থক হবে। শ্রীদিলীপকুমার বসু বিজ্ঞান কলেজে আচার্য বসুর সঙ্গে তাঁর সহযোগী ও অনুরাগীদের প্রতিকৃতি এবং আজাদ হিন্দ বাগে নিমগাছের তলায় আড্ডার বহু জ্ঞানী-গুণীসহ আচার্যের প্রতিকৃতি (যা অধ্যাপক বসুর বাড়িতে আছে) সত্যেন্দ্র ভবনে

রাখতে কার্যকরী সমিতিকে অনুরোধ জানান। শ্রীবসু তাঁর দীর্ঘ ভাষণে তৎকালীন বৃটিশ শাসনে শিক্ষাসংক্রান্ত দমন নীতির বিরুদ্ধে আচার্যদেবের জাতীয়তাবোধের কথা উল্লেখ করেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত বেশ জোরালো ভাষায় আচার্যদেবের সম্বন্ধে নানান কটূক্তির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন তাঁরা জানেন না, আধুনিক বিজ্ঞান যে কয়টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার একটি প্রধান স্তম্ভই আচার্য বসুর মৌলিক অবদানে গঠিত। অধ্যাপক আচার্যদেবের ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী ও অনুরাগীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আচার্যদেবের জীবনী ও নানা কাজের সংকলন প্রকাশে ব্রতী হতে পরিষদ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। সভাপতি ও অন্যান্যদের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে এটাই ব্যক্ত হয় আচার্য বসুর জীবন নানা বৈচিত্র্যে ভরা। তিনি ছিলেন একাধারে গবেষক ও শিক্ষক, আবার অন্যদিকে সমাজ সেবক, বিরাট সংগঠক, মানবপ্রেমিক, ছাত্রদরদী, শিক্ষাজগতে বিপ্লবী, আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার ও উচ্চ শিক্ষাদানের অন্যতম প্রবক্তা।

ডঃ শ্যামসুন্দর দে সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ দিতে উঠে সকলের আশীর্বাদ, উপদেশ ও সহযোগিতা কামনা করেন—যাতে পরিষদের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মাধ্যমে আচার্যদেবের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলা যায়। এর পর সভার কাজ শেষ হয়।

আচার্য বসুর তিরোভাব দিবস উদযাপন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা, ভারতে জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারে প্রথম সক্রিয় সংগঠক ও পথপ্রদর্শক এবং বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকী সত্যেন্দ্র ভবনে আচার্য বসুর প্রতিকৃতির পাদদেশে 4ঠা ফেব্রুয়ারী (1978) বিকাল 5 ঘটিকায় এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয়। সভার প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব অধ্যাপক রতনমোহন খাঁ সকলকে স্বাগত জানান। সভায় আচার্য বসুর স্মৃতিচারণা করেন অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দিবাকর মুখোপাধ্যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীধীরাজ বসু, শ্রীযুগলকান্তি রায়। অধ্যাপক তপেন্দ্রচন্দ্র রায় (আচার্য বসুর অন্যতম কৃতী ছাত্র) দু-চারটি মডেল ও স্লাইড সহযোগে যখন অধ্যাপক বসুর মাত্র কয়েকটি মূল্যবান কাজের বিষয় উল্লেখ করছিলেন তখন সভায় প্রত্যেকে অবাক বিস্ময়ে এই মন্তব্যই করেন—কে বলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের যে কোন দুরূহ বিষয়কে সাধারণের বোধগম্য করে প্রকাশ করা যায় না? এই সভায় আচার্য বসুর স্বপ্নকে সফল করে তোলার জন্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পরিষদের অন্যতম সহযোগী কর্মসচিব ডঃ শ্যামসুন্দর দে।

এই প্রস্তাবে বলা হয়—"বিজ্ঞান সম্মতভাবে কৃষিকার্যে সহায়তা ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্যে বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি স্থায়ী ও অস্থায়ী শিক্ষণ শিবির খোলা হবে। এই সব শিবিরে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকা পরীক্ষা, সারপ্রয়োগ, বীজসংরক্ষণ, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রাম বাংলার মানুষদের অভিজ্ঞ করে তোলাই হবে পরিষদের উদ্দেশ্য।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ শ্যামসুন্দর দে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য / সভ্যা ও বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে—

(1) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আর্থিক, সভ্য ও পত্রিকা-বর্ষ 1লা জানুয়ারী থেকে 31শে ডিসেম্বর। অতএব পরিষদের প্রত্যেক সভ্য / সভ্যা কিংবা সভ্যপদপ্রার্থীকে তাঁদের দেয় চাঁদা অগ্রিম প্রদান করতে হবে এবং চাঁদা সম্পূর্ণ প্রদান করলে তবেই তাঁদের সভ্যের অধিকার থাকবে। প্রতি বছর 20শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে (সাধারণ ও আজীবন) দেয় চাঁদা সম্পূর্ণ প্রদান না করলে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে যোগদান ও ভোটদানের অধিকার থাকবে না। কেউ 20শে ফেব্রুয়ারীর পর চাঁদা দিলে ঐ চাঁদা প্রাপ্তির পরবর্তী মাস থেকে বর্ষ শেষ পর্যন্ত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা তিনি পাবেন এবং সেই বছরে পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যা যদি উদ্বৃত্ত থাকে তবেই তা পাবেন।

(2) কোন সভ্য / সভ্যাকে কোন বছরের জন্যে পরিষদের কার্যকরী সমিতির নির্বাচনপ্রার্থী হতে হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের ভোটাধিকার থাকতে হবে।

(3) সাধারণত প্রতি বছর 3 শে মার্চের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

(4) যাঁরা নির্বাচন বর্ষের পূর্বে পরিষদ থেকে কোনরূপ পারিশ্রমিক, সম্মানী কিংবা দক্ষিণা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা পরে নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবেন না।

(5) পরিষদের প্রত্যেক সভ্যের বয়স অন্যূন আঠারো বছর হতে হবে।

(6) পরিষদ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে পরিষদের কর্মসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কেবলমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতেই পরিষদ সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়।

নিবেদক—

রতনমোহন খাঁ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

18ই ডিসেম্বর, 1977

সত্যেন্দ্র ভবন

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন: 55-0:60

জনপ্রিয় বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে' বিজ্ঞান বিষয়ক নিম্নোক্ত জনপ্রিয় বক্তৃতাটি প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে।

বক্তা: সমরজিৎ কর **বিষয়:** আজকের কুমেরু এবং মানুষ

তারিখ: 5ই মার্চ, 1978 **সময়:** বিকেল 6টা

আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান-অনুরাগী জনসাধারণকে উক্ত বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18'00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9'00 টাকা। সাধারণত ভি: পি: যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19'00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'প্যাকেট সর্টিং সার্ভিস'-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006. ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 3, মার্চ, 1978

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ মার্চ, 1978 তৃতীয় সংখ্যা

অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

পৃথিবীর বুকে আছে অসংখ্য জীব। এদের পূর্বপুরুষদের বিকাশ কি কোন এক যুগসন্ধিক্ষণে একই সঙ্গে ঘটেছিল? যদি না ঘটে তবে এই সব নানা প্রজাতির সৃষ্টি-রহস্য কি? এই বিষয়ে ল্যামার্ক ও ডারউইন প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ (যা 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত) এবং অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রায় একই সময়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্যভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। আর যে আকৃতিতে তারা সৃষ্ট হয়েছিল, অনন্তকাল ধরেই তারা সেইরূপই আছে এবং থাকবে। কিন্তু বর্তমানে কোন জীব-বিজ্ঞানীই একথা মেনে নিতে রাজী নন। তাঁদের মতে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং ক্রমবিকাশী। যুগ যুগ ধরে এক বিরামহীন মন্থর ক্রম-পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সরল ও নিম্নস্তরের জীব থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল ও উচ্চস্তরের জীবের উৎপত্তি হয়েছে। এরই নাম অভিব্যক্তি বা ক্রম-বিকাশ (evolution)।

অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত এই ধারণা একেবারে নতুন নয়। খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বছর পূর্বেও গ্রীক দার্শনিকগণ এ বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। তাছাড়া এরিস্টটল, বুফো, ইরাস্মাস্ ডারউইন (চার্লস্ ডারউইনের পিতামহ), ল্যামার্ক প্রমুখ প্রখ্যাত নিসর্গবিদগণও (naturalists) অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক ছিলেন। তবে এই মতবাদের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশ্ববিখ্যাত নিসর্গবিদ চার্লস্ ডারউইন।

* 77/1, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, ফ্ল্যাট-2, কলিকাতা-700 037

ল্যামার্ক-এর মতবাদ—অভিব্যক্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যামার্ক, 1809 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলেন যে, প্রতিবেশের ক্রিয়াতেই জীবের পরিবর্তন হয়। তাঁর মতে, জীবনধারণের অবস্থা অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, অথবা অব্যবহার, নির্ধারিত হয়। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও পুষ্ট এবং আরও উন্নত হয়। আবার অব্যবহারের ফলে তা অপুষ্ট হতে হতে শেষে একেবারে লোপ পায়। এই-ভাবে অর্জিত পরিবর্তনটি বংশগতি অনুসারে উত্তর-পুরুষে সঞ্চালিত হয়। আর কয়েক পুরুষ ধরে এইরূপ হওয়ার পরে একটি নতুন প্রজাতির (species) উদ্ভব হয়।

উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, জিরাফের পূর্ব-পুরুষের গ্রীবা বর্তমান ঘোড়ার গ্রীবার মতই ছোট ছিল। কিন্তু আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের পরিবর্তিত অবস্থায় এ সব প্রাণীর সুউচ্চ বৃক্ষের পাতা সংগ্রহ করবার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টার ফলেই আধুনিক দীর্ঘগ্রীব জিরাফের উদ্ভব হয়েছে। তেমনি ক্রমাগত অব্যবহারের ফলেই আধুনিক নিষ্ক্রিয় ডানাবিশিষ্ট উট-পাখির উদ্ভব হয়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞানী ওয়াইজম্যান পর পর বাইশ জনন ধরে পুরুষ ও স্ত্রী-ইঁদুরের লেজ কেটে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন, এই পদ্ধতিতে কখনও লেজহীন ইঁদুর জন্মায় না। এজন্যে তিনি ল্যামার্কের সমা-লোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

যাই হোক, ল্যামার্ক তাঁর এই মতবাদের সমর্থনে বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে না পারায় তাঁর এই মতবাদ বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন নি।

ডারউইনের মতবাদ—1831 খ্রীষ্টাব্দের 27শে ডিসেম্বর। ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় নৌবহরের একটি জাহাজ বীগল্ (Beagle) ভূপ্রদক্ষিণ করে নানা-প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যুবক চার্লস্ ডারউইন এই অভিযানে যোগ দিলেন একজন নিসর্গবিদ্ হিসেবে।

ডারউইন প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকায় গেলেন। ব্রেজিলের অন্তর্গত রিও ডি জেনেরিওতে পৌঁছে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ শুরু করলেন। এখানে তিনি অনেক রকম ব্যাঙ, জোনাকী, আলোক-প্রদানকারী গুব্‌রে-পোকা, সবুজ তোতা, টুকান, বিড়াল, পিঁপড়ে, বোল্‌তা, মাকড়সা প্রভৃতির বহু নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় তিনি মোট 27 রকম ইঁদুর এবং নানা ধরণের হরিণ ও পাখির আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। বাহিয়া ব্লাঙ্কায় গিয়ে তিনি অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অসংখ্য ফসিল (fossil) বা অশ্মীভূত কঙ্কালের সন্ধান পেলেন। এই অঞ্চলের পাখি এবং সরীসৃপদের (যেমন, কচ্ছপদের) সম্পর্কেও তিনি অনেক তথ্য আহরণ করলেন।

বীগ্‌লে-করে সমুদ্র ভ্রমণের সময় তিনি জাল ফেলে সামুদ্রিক প্রাণীর বহু নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। পাটাগোনিয়ায় গিয়ে তিনি বন্য লামার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেন। এই অঞ্চলেও তিনি অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অনেক প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (বা, জীবাশ্ম) দেখতে পান। এদের মধ্যে ছিল অতিকায় শ্লথ, লুপ্ত গ্লিপ্‌টোডন (আর্মাডিলোর আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী) এবং লুপ্ত প্যাকাইডার্মাটা।

অতীতের প্রাণীগুলি সব লুপ্ত হয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নটি ডারউইনের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এবং এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পেই তিনি পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"Certainly no fact in the long history of the world is so startling as the wide and repeated exterminations of its inhabitants."

একটানা পাঁচ বছর ধরে পৃথিবী পরিক্রমণ ও

তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ করে বীগ্‌ল্ জাহাজ দেশের দিকে যাত্রা করল, এবং 1836 সালের 2রা অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ফল্‌সাউথ বন্দরে নোঙর করল।

প্রখ্যাত জীবনীকার গিব্‌সন ডারউইনের এই অভিযান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"During the voyage of the Beagle Darwin became impressed with certain facts which seemed to him difficult to reconcile with the idea that God had created each species separately. As the voyage proceeded and facts accumulated, Darwin was convinced that the old dogma could not be upheld. He saw quite clearly that all living things had been evolved through long ages from simpler form of life."

সাতাশ বছর বয়সে ডারউইন দেশে ফিরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে বিদায় নিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে এলেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আরও দু'বছর কেটে গেল। 18 9 সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ "A Naturalist's Voyage in the Beagle" প্রকাশিত হল। আর এরই উপর ভিত্তি করে তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষক জীবনের সূত্রপাত হল।

প্রায় বিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং অসীম ধৈর্য-সহকারে তিনি তৎকালীন বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং তাদেরই সাহায্যে 18 8 সালের মধ্যেই তিনি অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। কিন্তু আরও তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে প্রচার করা সমীচীন মনে করলেন না। এই সময় আল্‌ফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, তাঁর মতামতের জন্যে তাঁর কাছে একটি গবেষণাপত্র পাঠালেন। এ-থেকেই ডারউইন সর্বপ্রথম জানতে পারলেন যে, ওয়ালেস স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করে তাঁরই মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এজন্যে ডারউইন আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করলেন না।

লিনিয়ান সোসাইটির একটি সভায় ডারউইন প্রথমে ওয়ালেসের গবেষণা-পত্রটি পাঠ করলেন, তারপর এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতবাদ সকলের কাছে ব্যাখ্যা করলেন।

উভয়ের মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা যখন ওয়ালেস জানতে পারলেন, তখন ডারউইনের প্রতিভার কাছে নতি স্বীকার করে সর্বপ্রকার বাদানুবাদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মহানুভবতারই পরিচয় দিলেন। এদিকে ডারউইন আর কালবিলম্ব না করে 1 5 সালের নভেম্বর মাসে, প্রজাতির উদ্ভব (The origin of Species) নামক গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব মতবাদ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন।

ডারউইনের মতে, বিভিন্ন রকম জীবের উদ্ভব পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে হয় নি। এক বিরামহীন মন্থর ক্রম পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে তারা উদ্ভূত হয়েছে। একেই বলা হয় অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ (evolution)। এই কালপ্রবাহ কয়েক লক্ষ, কয়েক কোটি অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে শতকোটি বছর বলে হিসেব করা হয়েছে।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বুনিয়াদ হল ছয়টি।

(i) **অত্যধিক বংশ-বিস্তার** (Over Production)—যে সব উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বিরাজ করছে তাদের অনেকেরই অসংখ্য বংশধর দেখা যায়। কিন্তু সকল বংশধর শেষ পর্যন্ত বাঁচে না।

(ii) **প্রতিযোগিতা** (Competition)—এর প্রধান কারণ, যে সব সন্তান-সন্ততি জন্মায় তাদের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এর ফলে অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(iii) **জীবন-সংগ্রাম** (Struggle for exis-

tance)—জন্ম থেকেই জীব তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তাকেই বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম তিন রকমের হতে পারে।

(ক) **অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম** (Intra-specific Struggle)—খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহের জন্যে, একই প্রজাতিভুক্ত জীবের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, তাকেই অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলা হয়।

(খ) **আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম** (Inter-specific Struggle)—উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, তাকেই আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলা হয়। যেমন, বিড়াল ইঁদুর খায়; কিন্তু ইঁদুর পালিয়ে বাঁচে; কিংবা বাঘ হরিণ খায়, আর হরিণ ছুটে পালায়। এরা বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণী, কিন্তু এদের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান।

(গ) **প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম** (Environmental Struggle)—প্রখর রৌদ্র, অত্যধিক শীত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার সংঘাতকেই প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম বুঝায়। প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকাও এক কঠিন সমস্যা।

(iv) **প্রকারণ বা পরিবর্তনশীলতা** (Variation)—একই পিতামাতার সন্তান সকলে একই রকম হয় না, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, তাদের প্রজাতি যে এক—এ-কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। কেন না তাদের মধ্যে পার্থক্য যেমন আছে, সাদৃশ্যও ঠিক তেমনিই আছে। অনুকূল প্রকারণ (variation) জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকার ব্যাপারে জীবকে সহায়তা করে।

(v) **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural Selection)—প্রকৃতিতে টিঁকে থাকবার জন্যে অবিরত সংগ্রাম চলেছে (Struggle for Existence)। প্রকৃতি উপযুক্তকেই বেছে নেয়, অর্থাৎ যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটে (Survival of the Fittest)। অনুকূল প্রকারণের কল্যাণে উপযুক্তরা বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু অনুপযুক্তরা জীবন-সংগ্রামে হেরে গিয়ে মৃত্যুবরণকরে এবং অবলুপ্ত হয়।

(vi) **বংশগতি** (Heredity)—কোন একটি পরিবর্তন, বা প্রকারণ, এক পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হয়। ক্রমে তা একটি বংশগত গুণে পরিণত হয়, এবং বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়।

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হওয়ার পর থেকে (প্রায় শতকোটি বছর) আজ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে জীবনধারণের অবস্থা বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। যে-সব জীব জীবনধারণের নতুন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত (adapted) হতে পারে নি, তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। আর যারা অভিযোজিত হতে পেরেছে, তারাই টিঁকে রয়েছে। বর্তমানে জীবিত যে-সব প্রজাতি দেখা যায়; তারা সকলেই সুদূর অতীতে এই পৃথিবীতে যে-সব উদ্ভিদ বা প্রাণী ছিল, তাদেরই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত বংশধর ছাড়া কিছুই নয়।

জীবদেহে পরিবর্তন না হলে অভিব্যক্তি কখনই সম্ভব হত না। কোন একটি পরিবর্তন বংশগতি অনুসারে উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে। কিন্তু তা বলে প্রত্যেকটি পরিবর্তনই যে এইভাবে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জীবজগতে কোন প্রজাতির মধ্যে একটি পরিবর্তন বংশ-পরম্পরায় স্থায়ী হলে তবেই বলা যায় যে, অভিব্যক্তি হয়েছে। কোন পরিবর্তন, তা যত কার্যকরী বা হিতকরই হোক না কেন, যদি বংশগতি অনুসারে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত না হয়, তবে অভিব্যক্তি হয়েছে একথা বলা যায় না।

কোন্ পরিবর্তন হিতকর বলে স্থায়ী হবে, অথবা অহিতকর বলে বর্জিত হবে, তা প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুসারে নির্ধারিত হয়। কোন একটি জীবের মধ্যে তার পক্ষে অহিতকর কোন নতুন বিশেষত্ব দেখা দিলে,

জীবটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই বিশেষত্বটি যদি হিতকর হয়, তবে জীবটি পূর্ণবয়স অবধি বেঁচে থাকতে এবং বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তখন এই নতুন বিশেষত্বটি বংশগতি অনুসারে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হয়। এইভাবে নতুন বিশেষত্বটি প্রজাতিটির পরিবর্তনে এবং তার ফলে জীবের ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল, বাহ্য-পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যে-সব জীব সহজেই অভিযোজিত হয়, তাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এই ব্যাপারে অলৌকিক, রহস্যময় বা ঐশ্বরিক বলে কিছু নেই। কাজেই ডারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবের উদ্ভব-সম্পর্কিত কল্পনাশ্রিত ধর্মীয় মতগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা—ডারউইনের এই অভিব্যক্তিবাদ কি শুধুই কল্পনা-বিলাস? তা নয়। এর সমর্থনে এত ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই মতবাদ গ্রহণ করতে কারও মনে আর কোনও দ্বিধা রইল না।

তবে ল্যামার্কের মতবাদের মত ডারউইনের মতবাদেরও সবচেয়ে দুর্বল অংশ হল এই যে, এরূপ পরিবর্তন কিভাবে এবং কেন হয়, তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এ-থেকে পাওয়া যায় না। ডারউইন প্রথম দিকে বংশগতি দ্বারা অর্জিত ধর্মের প্রচলন সম্পর্কে ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করেন নি; কিন্তু পরবর্তীকালে, আর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পেয়ে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে তা গ্রহণ করেন।

হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী হিউগো দ্য ভ্রীস্ সর্বপ্রথম এ-বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার পরিবর্তন করেন। 1901 সালে 'ইভনিং প্রিম্‌রোজ' (Evning Primrose) নামক উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি পরিব্যক্তিবাদ (mutation theory) বা 'আকস্মিক-ভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব' নামক মতবাদ প্রচার করেন। দ্য ভ্রীসর মতে, যে কোন বৈশিষ্ট্যেরই পরিব্যক্তি হতে পারে, এবং এই পরিব্যক্তিই হল অভিব্যক্তির প্রধান কারণ। বর্তমানে ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জিন (gene)-স্থিত ডি এন্. এ (D. N.A)-এর সজ্জাক্রমে যে কোন আকস্মিক স্থায়ী, কিংবা অস্থায়ী, পরিবর্তনকেই পরিব্যক্তি (mutation) বলা হয়।

গত পঞ্চাশ বছরে প্রজননবিদ্যার (genetics) প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এর ফলে ডারউইনের মতবাদের এই দুর্বলতা অনেকাংশে দূর হয়েছে, এবং প্রকারণও নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে অনেক জটিল রহস্যের সমাধান এখন হয়ে গেছে বলা যায়।

এখন বিজ্ঞানীরা বলেন, আসল রহস্য লুকিয়ে আছে ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জিনের মধ্যে। বংশবিস্তারের সময় এই জিনগুলি নতুনভাবে সজ্জিত হয়, এবং তার ফলেই এরূপ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে এরূপ হতে পারে:

(i) বংশবিস্তারের সময় স্বজাতীয় ক্রোমো-সোমের কোন কোন অংশ (অর্থাৎ জিন) দলত্যাগ করে এবং অন্য জিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন দল গঠন করে (crossing over)।

(ii) মাইওসিস পদ্ধতিতে কোষ-বিভাজনের কালে অনেক সময় স্বজাতীয় ক্রোমোসোমগুলি এলোমেলোভাবে মিলিত হয়। এর ফলেও পরিবর্তন সূচিত হয়।

(iii) অনেক সময় বিভিন্ন রকম বংশগত ধর্ম-সম্পন্ন পুং ও স্ত্রী জনন-কোষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এর নাম বহিঃপ্রজনন (outbreeding)। এর ফলেও বংশগত ধর্মের পরিবর্তন হয়।

(iv) নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে (যেমন—মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ায়) হঠাৎ হয়তো ক্রোমো-

সোমের প্রকৃতি বদলে যায়। এটাই মিউটেশন (mutation) বা পরিব্যক্তির একটা প্রধান কারণ। কারণ, এরই ফলে হঠাৎ একটি নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটা খুবই স্বাভাবিক, তা সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক।

এইসব কারণে প্রত্যেক পুরুষেই কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এর ফলেই যে নতুন প্রজাতির উদ্ভব সুনিশ্চিত হবে—এমন কথা বলা যায় না। এরূপ পরিবর্তন যখন এমন অধিক সংখ্যক জীবের মধ্যে সাধিত হয় যে, প্রজননের দিক দিয়ে তারা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, একমাত্র তখনই বলা যায়, নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। অভিব্যক্তি যে একটি মাত্র জীবের মধ্যে না হয়ে বহুর মধ্যে হওয়ার দরকার, এই উপলব্ধিই হল আধুনিক মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে জীবজগতে সংগ্রাম (struggle) বলতে বোঝায় বিভিন্ন 'পরিবর্তিত রূপ' (variants) এর মধ্যে প্রতিযোগিতা, এবং 'উপযোগিতা' (fitness) বলতে বোঝায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় :

(i) **অভিযোজন** (Adaptation)—যে-সব জীব জীবনধারণের নতুন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে, তারাই পূর্ণ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, এবং বংশবিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর জীবের যে-সব গুণ বেঁচে থাকার সুযোগ বৃদ্ধি করে, সেগুলিই অভিযোজনে সহায়তা করে।

(i) **সঙ্গী নির্বাচন** (Sexual Selection)—একটি জীবকে উপযুক্ত বলা হবে তখনই যখন সে সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে সক্ষম হবে। এজন্যে জীব-জগতে সঙ্গী (অথবা, সঙ্গিনী) নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

(iii) **পিতা-মাতার যত্ন** (Parental Care)—সব রকম অভিযোজনই অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই মরে যায়। এজন্যে নিম্নশ্রেণীর অনেক প্রাণীর বেলায়ই দেখা যায়, জীব-দম্পতি শত-সহস্র সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। তাদের অধিকাংশই হয়তো মরে যায়। কিন্তু তার পরও যতগুলি বেঁচে থাকে তাই যথেষ্ট, এবং তার ফলেই ওই জীবের বংশবিস্তার সুনিশ্চিত হয়। এসব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার যত্নের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে-সব প্রাণীর অল্প কয়েকটি ডিম কিংবা সন্তান হয়, সে-সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতা সেই সব ডিম বা সন্তানের সুরক্ষার জন্যে বিশেষ যত্ন নেয়। এর ফলে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার, কিংবা বাচ্চা হলে তার বেঁচে থাকার, সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এসব ক্ষেত্রে পিতা-মাতা অনেক সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও সন্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ জীবের বেঁচে থাকার উপযোগিতা (fitness) বলতে বোঝায় এমন একটি গুণ, যা পরিবারটির অবস্থা প্রারম্ভে কিরূপ ছিল তা নির্ধারণ করে না, নির্ধারণ করে তার পরিণতি কি হল তা-ই। অর্থাৎ, অবস্থা প্রতিকূল হলেও জীবনসংগ্রামে যে টি'কে থাকতে পারে, সেই উপযুক্ত।

কিভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয় ?

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নানাপ্রকার ফিন্‌চপাখি (Finches) ডারউইনের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল, এবং এসম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি রেখে গেছেন। অভিব্যক্তি সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদের সাহায্য নিয়ে এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি, কিভাবে ঐসব নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল।

(i) ঐসব ফিন্‌চের আদি পুরুষ দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপপুঞ্জে এসেছিল। এরা ফলের বীজ খেত এবং এখানে এরা অন্য কোন প্রকার পাখির বা শত্রুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় নি।

(i) এরা ক্রমাগত বংশবিস্তার করতে থাকে, এবং কালক্রমে অনেক পরিবর্তিত-রূপের (বা প্রকারণের) ফিন্‌চ-পাখির আবির্ভাব ঘটে। কোনরূপ প্রতিযোগিতা না থাকায়, তাদের অধিকাংশই পূর্ণ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং বংশবিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাদের কতকগুলি আবার প্রয়োজনের

তাগিদে অন্যরকম খাদ্যাভাস সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে।

(iii) যেহেতু সেখানে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সেহেতু কতকগুলি পরিবর্তিত রূপ (বা প্রকারণ) পৃথক্ হয়ে যায় (isolated)। এর ফলে একই দ্বীপে বসবাসকারী নিকটবর্তী পাখিদের মধ্যেই শুধু প্রজনন হতে থাকে, এবং এরূপ অন্তঃপ্রজননের ফলে (inbreeding) বহু সংখ্যক পাখির মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধর্মের বিকাশ ঘটতে থাকে। এইভাবে মূল প্রজাতি থেকেও কিংবা অন্য দ্বীপে অবস্থিত প্রজাতি থেকে তারা পৃথক হয়ে যায়।

(iv) এরূপ দু'রকম পাখি পরস্পরের কাছাকাছি এলেও, কিংবা কাছাকাছি থাকলেও, তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় না, এবং বংশবিস্তার করে না। তার প্রধান কারণ, একে অন্যের মধ্যে যৌন-আবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না।

(v) পরিশেষে খাদ্য, আশ্রয় প্রভৃতির জন্যে প্রতিযোগিতার ফলে তাদের নানা রকম গুণ বা ধর্মের মধ্যে ক্রমশ আরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে থাকে, এবং এইভাবে কালক্রমে নানা প্রজাতির (species) ফিন্‌চের আবির্ভাব ঘটে!

অভিব্যক্তিবাদ অনুধাবন করার ব্যাপারে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নানা প্রজাতির ফিন্‌চপাখি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে পরিগণিত হয়।

নিম্নউষ্ণতা নির্ধারণের থার্মোমিটার

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

কোন ভৌত রাশিকে নির্ভুল ও সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে গেলে মূলত দুটি জিনিসের উপর নজর দেওয়া দরকার। এক, পরিমাপকালে যেন রাশিটির কোন পরিবর্তন না ঘটে; দুই, পরিমাপের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেন নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী হয়। উষ্ণতা একটি ভৌত রাশি। এর সঠিক পরিমাপের জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য। যে যন্ত্র দিয়ে কোন বস্তুর উষ্ণতা মাপা হয় তাকে তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার বলে। দুটি কিংবা তার বেশি বস্তু যদি পরস্পরের সংস্পর্শে এসে তাপীয় সাম্য প্রতিষ্ঠা করে তবে তাদের উষ্ণতা সমান হবে—এ নীতির উপর থার্মোমিটার যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

উষ্ণতার অর্থ কি?—উষ্ণতা বস্তুর এক তাপীয় অবস্থা; কোন বস্তু অন্য কোন বস্তু থেকে তাপ নেবে কিংবা ঐ বস্তু অন্য বস্তুকে তাপ দেবে তা কেবলমাত্র উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। সহজ কথায়, উষ্ণতা তাপপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। তাপীয় সাম্যাবস্থায় উষ্ণতা একক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, দুই বা ততোধিক বস্তু বা ব্যবস্থা তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকলে কেবলমাত্র তাদের উষ্ণতার মান একই হবে। কোন তাপগতীয় ব্যবস্থাকে (thermodynamical system) সঠিকভাবে জানতে গেলে সাধারণভাবে

*ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার, আই. আই. টি., খড়্গপুর-2

ব্যবস্থাটির চাপ, আয়তন ও উষ্ণতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যবস্থাকে জানার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল উষ্ণতা।

থার্মোমিটার আবিষ্কারের চেষ্টা অতীত যুগের চিকিৎসাবিদগণ প্রথম করেন। তবে প্রথম সফল থার্মোমিটার আবিষ্কারের কৃতিত্ব 1592 সালে গ্যালিলিও-র। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন 'বায়ু থার্মোমিটার'। এর অনেক পরে 1713 সালে ফারেনহাইট প্রথম পারদ থার্মোমিটার তৈরি করেন। সেই সঙ্গে ফারেনহাইট দুটি স্থিরাংক ধরে উষ্ণতার স্কেল তৈরির পদ্ধতিও নির্ধারণ করেন। বিশ্বে ফারেনহাইটই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি পূর্ণাঙ্গ তরল থার্মোমিটার ও উপযুক্ত স্কেল তৈরি ও ব্যবহার করতে বিশ্ববাসীকে শেখান।

প্রায় সমসাময়িককালে ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যামোন-টোন্স (Amontons) স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটার তৈরি করেন। তখন এই থার্মোমিটার বেশ জটিল ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ বলে এর কদর ঘটে নি। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল তাপগতীয় পরম স্কেল আদর্শ গ্যাস-স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের নানাপ্রকার প্রাকৃতিক গুণাবলী অবলম্বন করে নানাধরণের থার্মোমিটার নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন—তরল থার্মোমিটার, গ্যাস থার্মোমিটার, রোধ থার্মোমিটার, তাপতড়িৎ থার্মোমিটার ইত্যাদি। বলা বাহুল্য বিভিন্ন ধরণের থার্মোমিটারের উষ্ণতার পরিমাপের পাল্লা বিভিন্ন। ভাল থার্মোমিটারের কতকগুলি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। (i) খুব কম উষ্ণতার পরিবর্তন থার্মোমিটার দেখাবে; অর্থাৎ থার্মোমিটার সুবেদী হবে। (ii) থার্মোমিটার দ্রুত ক্রিয়াশীল হবে এবং (iii) থার্মোমিটারের ক্রমাঙ্কন নির্দিষ্ট হবে।

উষ্ণতার স্কেল—উষ্ণতা নির্ণয়ের স্কেল তৈরির জন্য দুটি স্থিরাংক নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। এই স্থিরাংকগুলি নানা পাল্লার উষ্ণতার জন্যে নানারকম। 1948 খৃঃ, 'ওয়েটস অ্যাণ্ড মেজারস'-এর আন্তর্জাতিক কমিটি আন্তর্জাতিক উষ্ণতা স্কেলের জন্যে কতকগুলি স্থিরাংক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন,—অক্সিজেন বিন্দু (−182.97°C); বরফ বিন্দু (0°C); স্টীমবিন্দু (100°C); স্বর্ণ বিন্দু (1063°C) ইত্যাদি। যে কোন স্থিরাংক দুটির মধ্যবর্তী উষ্ণতার ব্যবধানকে প্রাথমিক অন্তর বলে। প্রাথমিক অন্তরকে বিভিন্ন উপায়ে ভাগ করে বিভিন্ন থার্মোমিটার স্কেল তৈরি করা হয়—

(i) **সেলসিয়াস স্কেল**—এই স্কেল অনুসারে নিম্নস্থিরাংক—0°; ঊর্ধ্বস্থিরাংক—100° ধরা হয় এবং প্রাথমিক অন্তরকে 100 সমান ভাগে ভাগ করা হয়। সেলসিয়াস নামে সুইডেনের একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী এই স্কেল উদ্ভাবন করেন। পূর্বে এই স্কেলের নাম ছিল সেন্টিগ্রেড স্কেল। বর্তমানে উদ্ভাবকের নাম অনুসারে এই স্কেলের নামকরণ করা হয়েছে—সেলসিয়াস স্কেল। এখন উষ্ণতার একক হল—ডিগ্রী সেলসিয়াস। দুঃখের বিষয় 1948 সালে এই একক সর্বসম্মতক্রমে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এখনও প্রাত্যহিক জীবনে সেলসিয়াস কথাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

(ii) **কেলভিন স্কেল**—সাধারণভাবে উষ্ণতার স্কেল—থার্মোমিটারে ব্যবহৃত কঠিন, তরল বা গ্যাস প্রভৃতি বস্তুর উপর নির্ভর করে। সুতরাং একে পরম (absolute) স্কেল বলা যায় না। তাপগতি-বিদ্যায় তাপ ইঞ্জিনের সহায়তায় লর্ড কেলভিন একটি স্কেল উদ্ভাবন করেন। এই স্কেল থার্মোমিটারে ব্যবহৃত বস্তুর ভৌত গুণাবলীর উপর নির্ভর করে না। তাই একে তাপগতীয় পরম স্কেল বলা হয়। দেখা গেছে আদর্শ গ্যাস স্কেল এবং তাপগতির পরম স্কেল দুটি অভিন্ন। তাপগতীয় পরম স্কেলের একক হল ডিগ্রী কেলভিন। এটি জলের ত্রিদশার মিলন বিন্দু (triple point) 273.16°K—এই স্থিরাংকটির উপর প্রতিষ্ঠিত।

1972 সালে NBS (National Bureau of Standards, Washington) প্রমাণ গ্যাস থার্মো-

মিটার দিয়ে পরিমাপ করে দেখিয়েছে—ষ্টীম বিন্দুর তাপগতীয় উষ্ণতা হল 99·97°C. যদি এটাকে ঠিক ধরা হয় তাহলে পরম শূন্য −273·16°C-এর পরিবর্তে দাঁড়ায় −273·2০°C বর্তমানে এধরণের সূক্ষ্ম মান নির্ধারণ নিয়ে গবেষণা এগিয়ে চলেছে। সাধারণভাবে সেলসিয়াস স্কেলের সঙ্গে 273 যোগ করলেই ডিগ্রী কেলভিন পাওয়া যায়।

এসব স্কেল ছাড়া ফারেনহাইট ও রয়মার স্কেল ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।

নিম্ন উষ্ণতার পরিমাপ—মোটামুটিভাবে 0°C-এর কম হলে তাকে নিম্নউষ্ণতা এবং পারদের স্ফুটনাংক 357°C-র উর্ধ্বে হলে তাকে উচ্চউষ্ণতা বলে গণ্য করা হয়। 0°C থেকে 357°C পর্যন্ত উষ্ণতাকে সাধারণ উষ্ণতা বলে। বলা বাহুল্য, সর্বজনস্বীকৃত এমন কোন ভেদ রেখা নেই যার দ্বারা উষ্ণতার পাল্লাকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চ ও নিম্ন দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 10 °K-এর নিচের উষ্ণতার অঞ্চলকে 'ক্রায়োজেনিক অঞ্চল' বলে।

সাধারণ উষ্ণতা পরিমাপে তরল থার্মোমিটার, গ্যাস থার্মোমিটার, বৈদ্যুতিক রোধ থার্মোমিটার বা তাপ তড়িৎ থার্মোমিটার—এদের যে কোন একটিকে ব্যবহার করা চলে এবং তাথেকে নির্ভরযোগ্য পাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন উষ্ণতার বেলাতে থার্মোমিটারের বিশেষ ধরণের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

দিনের পর দিন অতিনিম্ন উষ্ণতা নির্ণয়ের পদ্ধতি বিজ্ঞান জগতে প্রাধান্য লাভ করছে। নানা ক্ষেত্রে তরল হিলিয়াম, তরল নাইট্রোজেন প্রভৃতির ব্যবহার এর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সংক্ষেপে নিম্নউষ্ণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলি হল—

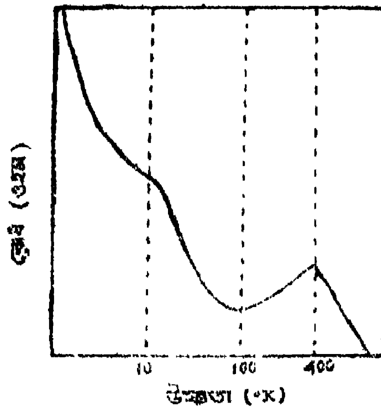
(i) **তরল থার্মোমিটার**—পারদ থার্মোমিটার দিয়ে −39°C পর্যন্ত উষ্ণতা মাপা চলে। এর নিচে পারদের পরিবর্তে অ্যালকোহল দিয়ে −112° পর্যন্ত মাপা যায়। এর চেয়ে কম উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে তরল থার্মোমিটার মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তরল পেনটেন থর্মোমিটার দিয়ে বড়জোর −190°C পর্যন্ত কম উষ্ণতা মাপা সম্ভব।

(ii) **গ্যাস থার্মোমিটার**—উষ্ণতার পরিবর্তনে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন বা চাপ পরিবর্তিত হয়—এর উপর নির্ভর করেই গ্যাস থার্মোমিটার নির্মিত। উষ্ণতা পরিমাপে স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটারকে প্রমাণ থার্মোমিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। স্থির আয়তন হাইড্রোজেন থার্মোমিটার দিয়ে প্রায় −253°C পর্যন্ত মাপা চলে। স্থির আয়তন তরল হিলিয়াম দিয়ে −268·7°C (4·3°K) পর্যন্ত নির্ভুলভাবে মাপা যায় কিন্তু এ ধরণের থার্মোমিটারের আকার বৃহৎ এবং কার্যপদ্ধতি ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। তাই এর ব্যবহার খুব প্রচলিত নয়। অন্যান্য সব থার্মোমিটারের ক্রমাঙ্কনের (calibration) বা প্রমিতকরণের (standarsation) জন্যে এই থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয়।

(iii) **রোধ থার্মোমিটার** (Resistance Thermometer—উষ্ণতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন তড়িৎ পরিবাহীর রোধ পরিবর্তিত হয়। উষ্ণতার সঙ্গে রোধের পরিবর্তন—এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে রোধ থার্মোমিটার তৈরী। প্লাটিনাম রোধ থার্মোমিটার দিয়ে −190°C পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে মাপা যায়। এর নিচে এটি আর সুবেদী (sensitive) থাকে না। অবশ্য সংকর ধাতু যেমন ফসফর-ব্রোঞ্জ দিয়ে প্রায় 1°K পর্যন্ত উষ্ণতা পরিমাপ সম্ভব। 4°K থেকে 1°K পর্যন্ত উষ্ণতা পরিমাপে বর্তমানে কার্বন-রোধ থার্মোমিটার খুব কার্যকরী বলে জানা গেছে।

অর্ধপরিবাহী (semiconductor) জার্মেনিয়ামকেও রোধ থার্মোমিটার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। থার্মোমিতির দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্ল্যাকমোর (196) n-টাইপ জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে রোধ উষ্ণতা সম্পর্কের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। চিত্র 1-এ

রোধ উষ্ণতা লেখচিত্রটি দেখানো হল। এই লেখচিত্রটিকে ক্রমাঙ্কিত লেখ (calibration graph)



চিত্র 1—...-টাইপ জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে রোধ-উষ্ণতা লেখচিত্র

হিসেবে ব্যবহার করে অজ্ঞাত উষ্ণতা নির্ধারণ করা সম্ভব। এ ধরণের থার্মোমিটারে সাধারণত দুটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এক, চৌম্বকক্ষেত্রে প্রয়োগে বিচ্যুতি ঘটে। দুই, অর্ধপরিবাহীর মধ্যে অশুদ্ধ পদার্থ (impurity) হিসেবে অতিপরিবাহী পদার্থের উপস্থিতি রোধের মানের অসংলগ্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

(iv) শব্দবেগ থার্মোমিটার (Acoustic Thermometer)—শব্দের বেগ গ্যাসের একটি তাপগতীয় ধর্ম এবং গ্যাসের ভরের উপর নির্ভর করে না। শব্দের বেগ পরিমাপ করে গ্যাসটির পরম উষ্ণতা নির্ণয় করা যায়। আবদ্ধ নয় এমন আদর্শ গ্যাসের শব্দের বেগের জন্যে সম্পর্কটি হল—

$$ - \frac{\gamma RT}{M} $$, c-শব্দের বেগ; γ-দুটি আপেক্ষিক তাপের অনুপাত; T-তাপগতীয় বা পরম উষ্ণতা; M-গ্যাসের আণবিক ওজন; R-শাশ্বত গ্যাস ধ্রুবক। বাস্তব (real) গ্যাসের বেলায় অবশ্য উপরিউক্ত সমীকরণটিকে পরিবর্তন সাধন করতে হয়। শব্দোত্তর শব্দবেগ থার্মোমিটার (1966) ও কম কম্পাঙ্কের শব্দবেগ থার্মোমিটার (1972) দিয়ে ভালভাবে 2^0K থেকে 20^0K পর্যন্ত উষ্ণতার পরিমাপ করা হয়েছে। তবে বর্তমানে (1972) গ্যাস থার্মোমিটার অনেক উন্নত মানের হয়েছে। তাই অতি নিম্নউষ্ণতা পরিমাপে অপেক্ষাকৃত জটিল শব্দবেগ থার্মোমিটার অপেক্ষা গ্যাস থার্মোমিটারকেই প্রাথমিক থার্মোমিটার হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হয়।

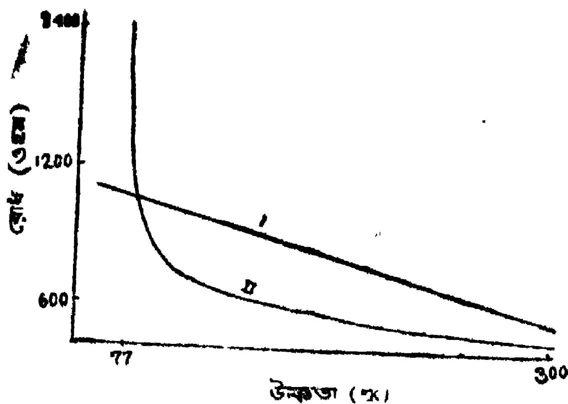
(v) তাপতড়িৎ থার্মোমিটার (Thermo-electric Thermometer)—দুটি বিভিন্ন ধাতুর দুটি প্রান্ত ঝালাই দ্বারা সংযোগ করে তাপযুগ্ম (thermo-couple) তৈরি করা হয়। এই তাপযুগ্মের সংযোগ দুটির মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য ঘটালে তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। যে বিভব পার্থক্যের জন্যে তড়িৎ প্রবাহ সম্ভব হয় তাকে তড়িচ্চালক বল বলে। উল্টোভাবে উৎপন্ন তড়িচ্চালক বল মেপে কোন সংযোগ স্থলের উষ্ণতা কত তা জানা যায়। এক্ষেত্রে অন্য সংযোগ স্থলটি একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় রাখা হয়। তামা-কনষ্ট্যানটান তাপযুগ্ম দিয়ে -255^0C (18^0K) পর্যন্ত নিম্ন উষ্ণতা মাপা যায়। এক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা বড় জোর $0{\cdot}05^0$C; 18^0K-এর নিচে মাপতে গেলে সোনা-রূপা বা প্লাটিনাম-রূপা তাপযুগ্ম অপেক্ষাকৃত সুবেদী।

(vi) বাষ্পচাপ থার্মোমিটার (Vapour Pressure Thermometer)—$4{\cdot}2^0$K (তরল হিলিয়ামের স্ফুটনাংক) উষ্ণতার নিচের উষ্ণতা নির্ভুলভাবে মাপার জন্যে বাষ্পচাপ থার্মোমিটার একটি অপরিহার্য হাতিয়ার বলে ভাবা যায়। সংপৃক্ত বাষ্পচাপ উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল এবং তা উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে বাড়ে। এ নীতির উপর নির্ভর করে বাষ্পচাপ থার্মোমিটার নির্মিত। কোন অজানা উষ্ণতায় বাষ্পচাপ পরিমাপ করে বাষ্পচাপ উষ্ণতা সম্পর্ক কিংবা ক্রমাঙ্কিত লেখ (calibrated curve) থেকে উষ্ণতা জানা হয়। 123^0K থেকে 63^0K পর্যন্ত অক্সিজেন; 27^0K থেকে 24^0K পর্যন্ত নিয়ন; 27^0K থেকে 11^0K পর্যন্ত হাইড্রোজেন এবং

5°K-র নিচে হিলিয়াম গ্যাস উপযোগী বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে।

(vii) **চৌম্বক থার্মোমিটার** (Magnetic Thermometer)—1°K-র নিচে হিলিয়াম বাষ্পচাপ থার্মোমিটার দিয়ে সঠিক উষ্ণতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই পাল্লার উষ্ণতা পরিমাপে প্রধান উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র হল চৌম্বক থার্মোমিটার। এই থার্মোমিটারের মূলনীতি—কোন পরাচৌম্বক (paramagnetic) পদার্থের চৌম্বকগ্রাহীতা* (magnetic susceptibility) তার পরম উষ্ণতার ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং, ঐ পদার্থের চৌম্বকগ্রাহীতা পরিমাপ করে তার পরম উষ্ণতা নির্ধারণ করা যায়। চৌম্বক থার্মোমিটার ব্যবহারকারীকে এই ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

p-n সংযোগ ডায়োড থার্মোমিটার—একই কেলাস এমনভাবে তৈরি করা যায়, যার অভ্যন্তরের কোন তলের একপাশের অংশ n এবং অন্যপাশের অংশ p ধরণের। এরূপ কেলাসকে p-n সংযোগ ডায়োড* বলে। সাধারণ ডায়োড ও জেনার ডায়োড-কে (zener diode) অতি নিম্নউষ্ণতা নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। ডায়োডের সমমুখী বিভবের (forward bias) দিকে নির্দিষ্ট প্রবাহমাত্রায় উষ্ণতার সঙ্গে রোধের পরিবর্তন পরিমাপ করে ক্রমাঙ্কন লেখচিত্র অংকন করা সম্ভব। চিত্র 2-এ লেখটি দেখানো হল। উষ্ণতার সঙ্গে অর্ধপরিবাহী জার্মেনিয়ামের রোধের পরিবর্তন খুবই জটিল। কিন্তু p-n সংযোগ ডায়োডের রোধের পরিবর্তন সরল এবং সহজে রোধ-উষ্ণতা সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। নিম্নউষ্ণতা পরিমাপে ডায়োডকে থার্মোমিটার হিসেবে ব্যবহার করে ইঞ্জিনিয়ারিং তথা পদার্থবিদ্যার নানা গবেষণামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান গেছে। এই থার্মোমিটারের সুবিধাগুলি হল—এটি খুব সুবেদী, সূক্ষ্মপরিমাপে উপযোগী; জটিলতা খুবই কম, সহজে ব্যবহার করা যায়, দাম কম, বাজারে সহজলভ্য, স্বল্প পরিসরে ব্যবহার করা সম্ভব, এক ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধিতে রোধের বৃদ্ধি অনেক বেশি বলে শতকরা ভুলের পরিমাণ অনেক কম ইত্যাদি।



চিত্র 2—p-n সংযোগে ডায়োডের রোধ উষ্ণতা লেখচিত্র। I—জেনার ডায়োজের ক্ষেত্রে, II—সাধারণ ডায়োডের ক্ষেত্রে।

[p-n সংযোগ ডায়োড থার্মোমিটারের ব্যাপারে অধ্যাপক সন্তোষকুমার দত্তরায়, চিত্তরঞ্জন মাইতি ও সৌম্যশংকর মিত্রের কাছে ঋণী। লেখক]

গ্রন্থপঞ্জী :

T. J. Quinn & J. P. Compton, Reports on Progr. in Phys., (1975)

L. G. Rubin, Cryogenics, (1970) 14

H. VanDijk, Progr. Cryo., (1960), 123

W. Middleton, The History of the thermometer (1966)

* চৌম্বক ক্ষেত্রে রক্ষিত কোন চৌম্বক পদার্থের আবিষ্ট চুম্বকনের মাত্রা ও আবেশকারী চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য—এ দুটির অনুপাতকে ঐ মাধ্যমের চৌম্বকগ্রাহীতা বলে। গুণগতভাবে, কোন পদার্থে কত সহজে চুম্বকত্ব আবিষ্ট করা যায়—তার পরিমাপই ঐ পদার্থের চৌম্বকগ্রাহীতা।

* p-n সংযোগ ডায়োড কি? নতুন সিলেবাসে দ্বাদশ শ্রেণীর যে কোন পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে পাওয়া যাবে।

অ্যান্টিজুভেনাইল হরমোন ও কীট নিয়ন্ত্রণ

আনিসুর রহমান খুদাবক্স*

সম্প্রতি অ্যান্টিজুভেনাইল হরমোনের (অ্যান্টি জে. এইচ.) আবিষ্কার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে একটা বিরাট আশার উদ্রেক করেছে। এই প্রবন্ধে অ্যান্টি জে এইচ.-এর আবিষ্কার এবং পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে এর প্রয়োগ বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

শস্য বিনষ্টকারী ও রোগজীবাণু বহনকারী কীট-পতঙ্গের বিনাশ বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক দিন ধরেই একটা বড় সমস্যা। নানা উপায়ে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও চলেছে। যেমন, রঞ্জেন রশ্মির ব্যবহার বা বিভিন্ন কীটনাশক এবং কীট বন্ধ্যাত্বীকরণ পদার্থের ব্যবহার। এই রকম প্রচেষ্টা যে সময়ে সময়ে আশার উদ্রেক করে নি তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আর একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন, আবহাওয়া দূষিতকরণ। তাই স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীরা জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ (biological control) করার দিকেই ঝুঁকলেন। অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতন আর কি! কিন্তু তাতেও নানারকম সমস্যা দেখা দিল। তাই যখন একদিকে জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের উপর সমীক্ষা চলল, অন্যদিকে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল কীট নিয়ন্ত্রণে—হরমোনের প্রয়োগ। এই হরমোনই বিশেষ করে জুভেনাইল হরমোন (juvenile hormone) বা সংক্ষেপে জে. এইচ — পতঙ্গের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এই হরমোনই পতঙ্গকে 'ডায়াপজ' (diapause)-এর (প্রতিকূল অবস্থাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যখন পতঙ্গ খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়, প্রজননে বা বংশবৃদ্ধিতে আগ্রহী হয় না) মুখে ঠেলে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জে. এইচ. পতঙ্গ জীবনের প্রত্যেকটা স্তরের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, পতঙ্গের শেষ স্তরে রূপান্তরিত হওয়ার সময় এই হরমোন-এর অনুপস্থিতি একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। কর্পোরা এলেটা (corpora allata) থেকে এর ক্ষরণ তখন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। আবার যেই মাত্র পতঙ্গের রূপান্তর শেষ হয় জে এইচ-এর ক্ষরণও শুরু হয়। কারণ ডিম্বকোষ পরিবর্তনের জন্যে এই হরমোনের বিশেষ প্রয়োজন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যদি কর্পোরা এলেটা অস্ত্রোপচার করে সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে ডিম্বকোষ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না এবং পতঙ্গও বন্ধ্যা হয়ে যায়। আবার এমন কিছু পতঙ্গ আছে যাদের শূককীট (larva) অবস্থাতেই জে. এইচ-এর ক্ষরণই ডায়াপজ এনে দেয়। আবার এমন পতঙ্গও বিরল নয় যেখানে জে. এইচ-এর ক্ষরণ বন্ধ হলেই ডায়াপজ শুরু হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই জে. এইচ. পতঙ্গের কৈশোর ও যৌবনে নানা শারীরবৃত্তিক প্রয়োজনে অংশ নিয়ে থাকে। তাই বিজ্ঞানীরা স্বভাবতঃই ভাবলেন, যদি কোন কৃত্রিম উপায়ে পতঙ্গের দেহের জে এইচ ক্ষরণের ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো পতঙ্গ আর

* জীববিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

স্বাভাবিকভাবে স্তরে স্তরে রূপান্তরিত হতে পারবে না। তাই তাঁরা পতঙ্গের রূপান্তরের জন্যে যখন জে. এইচ-এর অনুপস্থিতি একান্তভাবেই প্রয়োজন তখনই পতঙ্গের মধ্যে জে এইচ ঢুকিয়ে দিলেন। ফলও হল তাঁদের ধারণা অনুযায়ী। স্বাভাবিক রূপান্তর গেল বিগড়ে—পরিপূর্ণতা তো পেলই না পতঙ্গ, যারাও বা মূককীট বা গুটি (pupa) ছেড়ে বেরিয়ে এলো তাদের খাওয়া বা প্রজননের ক্ষমতা থাকল না, তাই তাদের বেঁচে থাকাও সম্ভবপর হল না। এবার বিজ্ঞানীরা আশান্বিত হলেন। শুরু হল জে এইচ. এবং তার অন্য রাসায়নিক প্রতিরূপের সন্ধান। মেথোপ্রিন (methoprene) হল এই রকমই একটা জে এইচ এর প্রতিরূপ যা মশা এবং বিভিন্ন রকমের মাছি—তার নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাল। কিন্তু এর ব্যবহারিক প্রয়োগে একটা মস্ত অসুবিধা হল যে এটা পতঙ্গের একটা রূপান্তরিত অবস্থাতে (যখন অপরিণত পতঙ্গ শেষবার খোলস ছেড়ে পরিণত পতঙ্গে রূপান্তরিত হয়) প্রয়োগের উপযোগী। কিন্তু মাঠে ঘাটে যেখানে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের বাস্তব প্রয়োজন, সেখানে তো শুধু পতঙ্গের একটাই রূপান্তরিত অবস্থা থাকে না, থাকে সমস্ত রকমের রূপান্তরিত অবস্থা। তাই এবার চললো বিকল্প চিন্তাধারা অর্থাৎ পতঙ্গের দেহ থেকে কি করে জে এইচ.-এর ক্ষরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায় বা এমন কিছু পতঙ্গের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কিনা যা নাকি জে এইচ-এর ক্ষরণকে বা জে এইচ-এর গুণাবলীকে প্রতিহত করে পতঙ্গের রূপান্তরকেও ব্যাহত করবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা হল যদি এমন কিছু 'জে এইচ প্রতিরোধক' (anti j. h. বা j. h. antagonist) খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে মুখ্যত—

(i) অপরিণত কীটকে কয়েকটা স্তর ডিঙিয়েই অকালপক্ক (precocious) পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত করা যাবে;

(ii) মূককীট অবস্থাতে যে জে এইচ.-এর ক্ষরণ যাদের ডায়াপোজের দিকে ঠেলে দেয় তাদের ডায়াপোজ ঘটানো যাবে;

(iii) পরিণত পতঙ্গ যাদের জে. এইচ ডিম্বকোষ পরিপক্কতা আনে তাদের বন্ধ্যা করা যাবে,

(iv) সেই সমস্ত কীট যারা জে এইচ-এর অনুপস্থিতিতে ডায়াপোজ করে, তাদের ডায়াপোজে ঠেলে দেওয়া যাবে,

(v) যে সমস্ত পতঙ্গ জে এইচ.-এর উপর নির্ভর করে সেক্স-ফেরোমোন (sex pheromone) তৈরি করে এবং অন্য পতঙ্গকে প্রজননে আগ্রহী করে, তা বন্ধ করা যাবে।

অর্থাৎ এক কথায় অ্যান্টি-জে এইচ পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের একটা বিরাট দ্বার উন্মুক্ত করবে। এবার শুরু হল অ্যান্টি-জে এইচ খোঁজার পালা। বিভিন্ন গাছের নির্যাস (extract) বের করে পরীক্ষা শুরু হল। প্রশ্ন উঠতে পারে—গাছের নির্যাস কেন? উত্তর—গাছের সঙ্গেই তো কীট-পতঙ্গের নিবিড় যোগাযোগ আর এই গাছের নির্যাস থেকেই আগেও আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক কীটনাশক পদার্থ। কাজটা কিন্তু অত সোজা হল না, বহু বিজ্ঞানীর অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। কিন্তু হার মানলেন না ডঃ উইলিয়াম বাওয়ারস্ এবং তাঁর দল। এরা নিউইয়র্ক রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণাগারে আবিষ্কার করলেন অ্যান্টি-জে. এইচ এবং সেটা তারা পেলেন Ageratum houstonianum নামের এক ধরণের গাছের নির্যাস থেকে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই নির্যাস অকাল রূপান্তরিতকরণ (precocious metamorphosis) এবং বন্ধ্যাত্বীকরণ ঘটায় হেমিপটেরা (Hemiptera) জাতীয় পতঙ্গের।

72 গ্রাম এই Ageratum houstonianum গাছকে di-ethyl ether ও acetone (1 : 1)-এর মধ্যে গুঁড়ো (homogenize) করলে এক গ্রাম নির্যাস পাওয়া যায়। ডঃ বাওয়ারস-এর দল রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখলেন এই নির্যাসে

থাকে ছুটি সক্রিয় অংশ: 7—methoxy-2, 2—dimethyl chromene এবং 6, 7—dimethoxy—2, 2—dimethyl chromene বা তাঁরা যথাক্রমে precocene 1 এবং precocene 2 নামে অভিহিত করলেন।

তাঁরা দেখলেন, এই precocene 1 এবং precocene 2 বিভিন্ন পতঙ্গের অকাল রূপান্তরে সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং এ ব্যাপারে precocene 2, precocene 1-এর থেকে প্রায় দশগুন বেশি সক্রিয়।

দেখা গেল, precocene-এর প্রয়োগে বহু পতঙ্গের ডিম্বকোষের পরিপক্কতা আসে না। তাছাড়া এর প্রয়োগে পতঙ্গকে ডায়াপোজের দিকেও ঠেলে দেয়। এক ধরণের পতঙ্গকে (colorado-potato beetles) precocene 2 প্রয়োগ করাতে তারা খাওয়া ছেড়ে দিল এবং মাটির নিচে গর্তে চলে গেল ডায়াপোজের প্রস্তুতি নিতে। কিন্তু যখন precocene 2 এবং জে. এইচ. একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়, তখন পতঙ্গের স্বাভাবিক রূপান্তর এবং জীবনপ্রণালী অব্যাহত থাকে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, precocene জে এইচ -এর ক্ষরণ বন্ধ করে বা কার্যক্ষমতাতে হরণ করে পতঙ্গের স্বাভাবিক রূপান্তর বা প্রজনন ক্ষমতাকে ব্যাহত করে।

বস্তুতপক্ষে অ্যান্টি-জে এইচ -এর আবিষ্কার কীট নিয়ন্ত্রণে একটা উজ্জ্বল আশার সঞ্চার করেছে। গুণগত ভাবে জে. এইচ -এর থেকে অ্যান্টি জে. এইচ.-এর প্রয়োগ অনেক বেশি উপযোগী। কারণ পতঙ্গের বিভিন্ন রূপান্তরিত অবস্থাতে এই হরমোন প্রয়োগ-যোগ্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা আগামী দিনে অ্যান্টি জে এইচ -এর উপর আরও গবেষণা নিশ্চয়ই একদিন পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের কাজকে সহজ করে তুলবে।

ইউরোপের মধ্যযুগের স্থাপত্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অবনীকুমার দে*

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—এই মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন স্থাপত্য ও তার যে নানান বৈশিষ্ট্যের কথা শোনা যায়, তা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

জার্মানী—1248 থেকে 1322 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী কোলোনের গির্জা (Cologne Cathedral) উত্তর ইউরোপে গথিক স্থাপত্যে তৈরী গির্জাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়। বিস্তৃত রাইন উপত্যকায় প্রায় 91,000 বর্গফুট জায়গা জুড়ে সমতল স্থানের উপর এই গির্জাটি নির্মিত। এর বিশাল বুরুজ দুটির প্রত্যেকটি 500 ফুট উঁচু। এটি একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কীর্তিস্তম্ভ।

বেলজিয়াম—গথিক স্থাপত্যে তৈরী বেলজিয়ামের গির্জাগুলির মধ্যে 1352 থেকে 1411 খ্রীষ্টাব্দে তৈরী অ্যান্টওয়ার্প গির্জাই (Antwerp Cathedral) সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। এর রঙীন

*স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া

কাচের বিরাট জানালাগুলি খুবই সুন্দর। 1422 থেকে 1518 খ্রীষ্টাব্দে তৈরী এই গির্জার পশ্চিম-দিকের সম্মুখভাগের একটি মাত্র বিশাল বুরুজ ও তার 400 ফুট উঁচু চূড়া দেখতে অপূর্ব সুন্দর।

স্পেন—স্পেনদেশের গথিক স্থাপত্যে তৈরী সেভিলের গির্জা (Seville Cathedral) 1401 থেকে 1520 খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়। রোমের সেন্ট পিটার গির্জার (Saint Peter, Rome) পরই এটি হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গির্জা। ইউরোপের মধ্যযুগীয় গির্জাগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। এই গির্জাটির মোট আয়তন 22,000 বর্গ গজ।

মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডের স্থাপত্য—55 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে 410 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডে রোমক যুগের স্থাপত্যরীতি সেই সময়কার ইউরোপের অন্যান্য অংশের রোমক স্থাপত্যরীতির মতই ছিল। ইংলণ্ডের সিল্‌চেষ্টার্ (Silchester), চেস্টার্ (Chester), বাথ্ (Bath) প্রভৃতি শহরে এই যুগের তৈরী বাড়ির যথেষ্ট নিদর্শন এখনও আছে।

পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হল ইংলণ্ডের অ্যাংলো স্যাক্সন্ যুগ। এই সময়ে বসত-বাড়ির নির্মাণকাজে যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ ব্যবহার করা হত। কাঠ সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বলে এই সব বাড়ির বিশেষ নিদর্শন এখন আর নেই।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী ইংলণ্ডে নরম্যান্ যুগ। নরম্যান্ বিজয়ের ফলে ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইংলণ্ডের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডে জায়গীর প্রথার প্রবর্তন হয়। নরম্যানদের আরও বেশি শক্তিশালী থাকার প্রয়োজনে সামন্ত রাজাদের জন্যে দুর্গ তৈরি করা হয়। ক্রমে এই সব দুর্গ ও সন্ন্যাসীদের মঠের চারদিক ঘিরে নগর গড়ে উঠে। এই নগরগুলি ক্রমে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রামগুলি কিন্তু কাঠের তৈরি কুঁড়েঘরের সমষ্টিমাত্রই রয়ে যায়। স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা থাকার ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়। এই রকম একটি উদাহরণ—হল রাজা দ্বিতীয় হেনরীর সময়ে তৈরী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

ইংলণ্ডের রোমানেস্ক্ বা নর্ম্যান্ শৈলীর স্থাপত্য বেশ স্পষ্ট ও বৃহদায়তন এবং এর বিশেষত্ব হল অর্ধবৃত্তাকার খিলান, খুব ভারি ও নলাকার খিলানের পিল্লা এবং চ্যাপ্টা দেয়ালের ঠেস।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীকে **'প্রারম্ভিক ইংরাজী যুগ'** বলা হয়। এই যুগের অপর নাম **'ছুরির ফলা' (lancet)** বা 'প্রথম সূচালো' (**first pointed**) যুগ। এই সময়ের স্থাপত্য নরম্যান যুগের চেয়েও কম বৃহদায়তনবিশিষ্ট। সৌধগুলির সুস্পষ্ট বাইরের রেখা, বিভিন্ন অংশের সুসমঞ্জস ও মনোরম পরিমাপ ও সরল অলঙ্করণ সহজেই মনে রেখাপাত করে। ছুরির ফলার মত সরু ও লম্বা ছিদ্রপথগুলি সৌধ-গুলিকে উঁচু দেখাতে সাহায্য করে। বাইরের দিক থেকে সৌধগুলির খাড়া ঢালের ছাদ, মিনার ও দেয়াল থেকে ঠেলে বের করা ঠেসগুলি বিশেষ লক্ষণীয়।

চতুর্দশ শতাব্দী ইংলণ্ডের স্থাপত্যের 'শোভিত কাল' (**decorated period**)। এই সময়কে জ্যামিতিক ও বক্ররেখাদ্বারা বেষ্টিত বা মধ্যবর্তী সূচাল (**middle pointed**) বা এডোয়ার্ডীয় কালও বলা হয়। এই সময়কার স্থাপত্যশৈলী প্রারম্ভিক ইংরাজি যুগের চেয়েও বেশি অলঙ্কার-বহুল ছিল। পাথরের দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে থাকত জ্যামিতিক আকারের আড়ম্বরপূর্ণ কারুকার্য। উজ্জ্বল রঙীন কাচের জানালার উপরে কখন কখন থাকত 'অগি' (ogee) খিলান। দেয়ালের উঁচু দিকে অবস্থিত জানালাগুলির আকার আরও বড় করা হত। ছাদের খিলানযুক্ত অংশগুলি সংখ্যায় আরও বেশি ও জটিল করা হয়েছিল।

এর পর পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের স্থাপত্যের পর্যায়কে বলা হয় **'আলম্ব' (perpendicular)** বা 'ঋজুরেখ' বা 'পরবর্তী সূচালো' পর্যায়। এই সময়ের তৈরী জানালাগুলি ছিল খাড়া রেখার আকারের।

জানালাগুলি প্রায়ই হত বেশ বড় এবং ফাঁকের উপর থাকত চারটি কেন্দ্রবিন্দুবিশিষ্ট খিলান। বিরাটকার এই জানালাগুলি কয়েকটি অনুভূমিক আড়কাঠ এবং প্রধান ও অপ্রধান খাড়া কাঠ দিয়ে মজবুত করা হত। এই দণ্ডগুলি জানালাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করত। এই সময়ে বহু অংশবিশিষ্ট ছাতার আকারের খিলানের ছাদ ব্যবহার করা হত।

শেষে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'টিউডর' পর্যায়ের নির্মিত ধর্মীয় সৌধগুলির স্থাপত্যশৈলি ছিল এর পূর্ববর্তী আলম্ব পর্যায়ের মত। বসতবাড়ির ক্ষেত্রে স্থাপত্যশৈলীর কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং রোমক শৈলী পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। রোমক শৈলী ইটালীতে উদ্ভূত হয়ে ফরাসীদেশে এবং পরে ইংলণ্ডে প্রসার লাভ করেছিল। ইংলণ্ডে এই শৈলী পরবর্তী গথিক বা আলম্ব পর্যায়ের সঙ্গে সুন্দরভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই পর্যায়ের বসতবাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল সমতল মাথাবিশিষ্ট ও খাড়া খাড়া কাঠ দিয়ে ভাগ করা জানালা, ঘরের মধ্যে কারুকার্য করা আগুন জ্বালাবার স্থান ও তার মাথায় চারটি কেন্দ্রবিন্দুবিশিষ্ট চওড়া খিলান।

ইংলণ্ডে মধ্যযুগের স্থাপত্যের বিভিন্ন উদাহরণ—ক্যাথিড্রাল, সন্ন্যাসীদের মঠ, দুর্গ-প্রাসাদ, কলেজ, জমিদারদের খামার বাড়ি ইত্যাদি।

ক্যাথিড্রাল—প্রধান প্রধান গির্জার মধ্যে হল ডারহাম্ ক্যাথিড্রাল (Durham Cathedral)। 1096 থেকে 1133 খ্রীষ্টাব্দের নরম্যানদের তৈরী নরউইচ ক্যাথিড্রাল (Norwich), গ্লষ্টার (Gloucester) ক্যাথিড্রাল, উইনচেষ্টার (Winchester) ক্যাথিড্রাল (ইউরোপের মধ্যযুগীয় গির্জাগুলির মধ্যে এটির মোট দৈর্ঘ্য ছিল 560 ফুট এবং সর্বাধিক), প্রারম্ভিক ইংরাজি যুগে নির্মিত সলিসবারী (Salisbury) ক্যাথিড্রাল ও ইয়র্ক (Yorke) ক্যাথিড্রাল (পরেরটি মধ্যযুগের ইংলণ্ডের প্রধান গির্জাগুলির মধ্যে আয়তনে ও চওড়ায় সবচেয়ে বড়), ক্যানটারবারী (Canterbury) ক্যাথিড্রাল এটির প্রথমদিককার নরম্যানদের তৈরী কাজ খুবই সুন্দর) ইত্যাদি।

সন্ন্যাসীদের মঠ (Monasteries)—ওয়েস্ট্-মিন্স্টার অ্যাবি প্রথমদিককার রাজারা বারবার এইটিকে ভেঙ্গে ফেলে পুনর্নির্মিত করেছিলেন এবং নতুন নতুন স্থাপত্য অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। ফলে, এটির বৈশিষ্ট্য নরম্যান বা রোমানেস্ক থেকে মধ্যযুগীয় বা গথিক স্থাপত্যে পরিবর্তিত হয়েছিল। সেইজন্যে 'র বিভিন্ন অংশে পর পর প্রারম্ভিক ইংরাজি, শোভিত, আলম্ব ও টিউডর পর্যায়ের স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অ্যাবিটি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং ইংরাজি গথিক স্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। এটি ইংলণ্ডের সবচেয়ে পবিত্র সৌধ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ধর্ম মন্দির। ইংরাজদের ধর্মীয় ভক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই অ্যাবি।

দুর্গ—জায়গীরদারদের দুর্গ যে কেবলমাত্র সুরক্ষিত স্থান ছিল তা নয়, এগুলিও ছিল জমিদারদের খামারবাড়ীর মত। এখানে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হত এবং বিচারের কাজও চলত। বসবাসের উপযোগী আরাম ও সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রেখে এই দুর্গগুলি তৈরি করা হত। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এইগুলি সুরক্ষিত দুর্গের মতই তৈরি হত। এ্যাংলো-স্যাক্সন (Anglo-Saxon) যুগে দুর্গগুলির স্থাপত্যের বিশিষ্ট ধর্ম বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। তখন এগুলি ছিল মাটিতে পোঁতা ছুঁচোলো গোঁজের বেড়া ঘেরা ও কাঠের বুরুজওয়ালা প্রধানত মাটির বাড়ি। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর নর্ম্যান যুগের জায়গীর প্রথার ফলে জায়গীরদারদের বাসের জন্যে সুরক্ষিত বাসস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যে এই যুগের দুর্গ-প্রাসাদগুলিই ছিল প্রধান সৌধ। 1081 থেকে 1090 খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত লণ্ডন টাওয়ার (Tower of London) রাজা প্রথম উইলিয়ামের

জন্যে তৈরি হয়। এই দুর্গে পর পর অবস্থিত কয়েকটি রক্ষাপ্রাচীর ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাথমিক ইংরাজি যুগে পূর্ববর্তী নরম্যান্ যুগের নির্মিত 'কীপ্' ... গুলির চার পাশে আরও বাড়ি তৈরি করে দুর্গগুলিকে সম্প্রসারিত করা হত। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর আলম্ব পর্যায়ের সময় রাজকীয় ক্ষমতা আরও প্রসারলাভ করল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও হ্রাস পেল এবং সামরিক কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটল। সেইজন্যে এই সময় দুর্গগুলির আরও পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। এই সময়কার তৈরী দুর্গে চতুষ্কোণ চত্বরের চারিদিকে বিভিন্ন ইমারতগুলি বিন্যস্ত করা হত। দুর্গের চারদিক ঘিরে থাকত উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরকে ঘিরে থাকত আত্মরক্ষার জন্যে পরিখা। পুরাতন দিনের অন্ধকার দুর্গগুলির পরিবর্তে নতুন দুর্গগুলির বৈশিষ্ট্য হল আরও প্রফুল্ল পরিবেশ। দুর্গগুলি তখনও সুরক্ষিত ভাবে তৈরি করা হত। সেই সঙ্গে আত্মরক্ষা ও বসবাসের জন্যে সুখসুবিধার দিকেও নজর রেখে এইগুলি বিন্যস্ত করা হত।

জমিদারদের বাড়ি—ইংলণ্ডে বসতবাড়ীর স্থাপত্যে রোমান অধিকারের বিশেষ কোন ছাপই পড়েনি। রাজকীয় রোমের সরকারী কর্মচারীদের বাসের বাগানবাড়িগুলির খোলা 'অ্যাট্রিয়াম' (Atrium) ইংলণ্ডের জলবায়ুর পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না। সুতরাং এখানে বিশেষ ধরণের বসতবাড়ির বিন্যাস বিকাশ লাভ করল। এই বসত-বাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রস্থলের ঢাকা 'হলঘর'। মধ্যযুগে বিভিন্ন প্রয়োজনে এই হলঘর ব্যবহার করা হত। স্যাক্সন্ যুগে এটিই ছিল একমাত্র ঘর যেখানে গৃহস্বামী, তাঁর পরিবারবর্গ, অতিথি ও ভূমিদাসদের সকলের জন্যে বাস করা, রান্না করা, খাওয়া ও শোওয়ার জন্যে ব্যবহৃত হত। খড়খড়ির বা ঝিলমিলির ছোট ছোট জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো আসত। ঘরের মধ্যে অবস্থিত অগ্নিকুণ্ডে কাঠের গুঁড়ি জালিয়ে কেবলমাত্র সেই আগুনে ঘরকে গরম রাখা হত। ছাদের গর্ত দিয়ে এই আগুনের ধোঁয়া ঘরের বাইরে বের হয়ে যেত।

নরম্যান যুগের জমিদার বাড়ি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচীর ঘেরা ও পরিখা পরিবৃত থাকত। এই বাড়িতে থাকত প্রশস্ত সাধারণ হলঘর। তার একদিকে থাকত ব্যক্তিগত ব্যবহারের ঘর 'সোলার' (solar) ও অন্যদিকে থাকত রান্নাঘর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাথমিক ইংরাজি পর্যায়ের সময় বাড়ির ঘরের সংখ্যা বাড়ানো হল। খাস খামারবাড়ি, বিশেষ করে রাজাদের বসতবাড়ির বিন্যাসরীতি অনেক উন্নতমানের করা হল। কাঠের খড়খড়ির বদলে ক্রমে ক্রমে জানালায় কাচের ব্যবহার সুরু হল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের টিউডর পর্যায়ের সময়কার জমিদার বাড়িগুলি প্রধানত এই সময়ের ধনী ব্যবসায়ী পরিবারদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। এঁরা পুরাতন কালের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের স্থান নিয়েছিলেন। টিউডর পর্যায়ের এই বাড়িগুলিতে আরও অনেক সংখ্যক ও নানা রকমের ঘর থাকত। এই ঘরগুলিও আগেকার মত চতুষ্কোণ এবং চত্বরের চারদিকে বিন্যস্ত থাকত। এই চত্বর থেকে সোজাসুজি ঘরগুলিতে প্রবেশ করা যেত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার ফলে এই সব বাড়িতে তীর নিক্ষেপের জন্যে ফোকরবিশিষ্ট ছাদের 'প্যারাপেট' দেয়াল ও সুরক্ষিত প্রবেশদ্বার-গুলির আর আত্মরক্ষামূলক কোন প্রয়োজন রইল না। শুধুমাত্র অলঙ্করণের জন্যেই এগুলি রাখা হত। এই সব বাড়িগুলিতে অসংখ্য অলঙ্কারপূর্ণ চিমনী যোগ করা হল। এই থেকে বোঝা যায়, এই সময় বাড়িতে সুখসাচ্ছন্দ্যের আরও বেশি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাড়ির ভিতরকার দেয়ালে সুরুচিসম্পন্ন ও সুশলী কারুকার্য করা থাকত। প্রচুর কারুকার্য করা দেয়ালে অবস্থিত অগ্নিকুণ্ড, ওক গাছের কাঠের প্যানেল করা

দেয়াল, কাঠের তৈরী ঘরের ছাদ, অসংখ্য আসবাবপত্র, বাড়িতে নানা প্রকারের ঘর যেমন পড়াশুনা করার ঘর, শীত ও গ্রীষ্মকালে বসবার জন্যে আলাদা আলাদা ঘর, ব্যক্তিগত ভোজন কক্ষ, আরও বেশি সংখ্যক শয়নঘর ইত্যাদি ছিল এই সব বাড়ির বৈশিষ্ট্য। এই সব বাড়ির উদ্যানগুলি বিশেষ নক্সা অনুযায়ী ও সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করা হত। বাঁধানো পথ, 'ইউ' (yew) গাছের বেড়া, পাথরের সিঁড়ি ও ছোট ছোট পিল্লের রেলিং ঘেরা খোলা বাঁধানো ছাদ থাকত এই সব বাগানে।

1515 থেকে 1530 খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনাল উল্‌স্‌লীর (Cardinal Wolsley) তৈরী 'হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদ' (Hampton Court Palace)—এই সময়কার তৈরী ইংলণ্ডের বাসগৃহের একটি বিশিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক নিদর্শন।

মধ্যযুগের ইংলণ্ডে তৈরী বাড়িগুলিতে কাঠের তৈরী বিভিন্ন প্রকারের ছাদ ছিল যথা—

(1) বাঁধা কড়ির ছাদ (tie-beamed roof),

(2) বরগার আড়া-দেওয়া ট্রাসের ছাদ (trussed rafter roof),

(3) বন্ধনীযুক্ত ছাদ (collar braced roof),

(4) স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন গির্জার পার্শ্ববর্তী অংশের উপরকার ছাদ (aisle roof),

(5) হ্যামার বীম (hammer beam) ছাদ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই রকম ট্রাসের ছাদগুলি ছিল খুবই জটিল। এই ধরনের ছাদগুলি প্রায়ই উজ্জ্বল সোনালী জল করা ও নানা রঙে রঙ করা থাকত।

মহাবিদ্যালয়—মোটামুটি 1167 খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় 1209 খ্রীষ্টাব্দে। মধ্যযুগের বাড়ির অনুকরণে মহাবিদ্যালয়গুলি পরিকল্পিত হয়েছিল। চতুষ্কোণ চত্বরের চারদিকে হলঘর ও অন্যান্য ঘরগুলি সন্নিবেশিত করা হত। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ মহাবিদ্যালয় ও লণ্ডনের আইন-শিক্ষায়তনগুলি (Inns of Court) দেখে এখনও মধ্যযুগের জমিদারদের খামারবাড়ির হলঘর, বেদী, কাঠের ছাদ, দেয়ালের বাইরের দিকে কুলুঙ্গিযুক্ত ও তিন দিক থেকে আলো-বাতাস আসতে পারে এই রকম জানালা প্রভৃতির বেশ একটা ভাল ধারণা করা যায়। ছাত্রদের আবাসগৃহ ও শিক্ষকদের বাসগৃহগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম তৈরি হয়।

সাধারণ বাসগৃহ—জায়গীর প্রথায় দুর্গের চার পাশের প্রাচীর ঘেরা জায়গার মধ্যে জমিদারদের প্রজা ও ভৃত্যদের বাসস্থান নির্দিষ্ট থাকত। সেই রকম মঠের চারপাশের ঘেরা জায়গার মধ্যে মঠের আশ্রিত ব্যক্তিরা ও শ্রমিকেরা বাস করতেন। এই ভাবে তাদের নিরাপদ স্থানে বাস করতে দেওয়া হত এবং দস্যু লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা হত। ক্রমে ক্রমে এদের জনসংখ্যা বাড়তে লাগল। পারিপার্শ্বিক অবস্থারও পরিবর্তন হল। আরও বেশি বাসস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফলে দুর্গ প্রাচীরের কাছে আরও আদিম ধরনের বাসগৃহ তৈরি করা হল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বাসগৃহের সংখ্যাও বেড়ে চলল। ক্রমে এই বসতিগুলি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-নগরীতে পরিণত হল। একইভাবে সমৃদ্ধিশালী মঠগুলির চারদিকেও নগর গড়ে উঠল। বিপদ-আপদের সময় লোকেরা এই সব মঠের মধ্যে আশ্রয় নিত।

সাধারণ নাগরিকের বাসগৃহের একতলায় রাস্তার ধারে থাকত দোকানঘর। এখানে সে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করত। এই ঘরটি কারিগরের কারখানা হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঘরের পিছন দিকে থাকত রান্নাঘর এবং দোতলায় অবস্থিত শোবার ঘরে যাবার জন্যে সিঁড়ি।

মধ্যযুগের জোতদারদের গ্রামাঞ্চলের বাসগৃহ জায়গীরদারদের খামারবাড়ির অনুরূপে তৈরি হত। সাধারণ বসবাসের ঘরের একদিকে থাকত রান্নাঘর এবং অন্যদিকে থাকত ব্যক্তিগত ব্যবহারের ঘরগুলি। সাধারণ গ্রামবাসীদের গৃহগুলি ছিল খুবই আদিম ধরণের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইসব গৃহে তাদের সব সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্যে একটি মাত্র ঘরই থাকত।

প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান

ফল ও ফলজাত আহার

শ্যামসুন্দর দে*

খাদ্যবস্তুর মধ্যে ফল ও ফলজাত আহার যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। অনেকে অবশ্য ফল আহারকে বিলাসবহুল জীবনের অঙ্গ হিসেবে ধরে থাকেন। এ ধারণাটা খুবই ভুল। সাধারণ খাদ্য (ভাত, রুটি, ইত্যাদি)—যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, শরীরের পুষ্টির জন্যে তা কখনই যথেষ্ট নয়। এজন্যেই দেশবাসীর অপুষ্টি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। দেহের উপযুক্ত পুষ্টিসাধনের জন্যে যে সমস্ত উপাদান দরকার তা হল, ভিটামিন এ, বি, সি, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চিনি, লবণ, খনিজ লৌহ, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি। এ সমস্ত উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে মেলে না। কিন্তু আঙুর, আপেল, ন্যাসপাতি, বেদানা প্রভৃতি ফলে এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। টোম্যাটো, গাজর, বীট, শশা, মটর—যা ফল ও সজীর মাঝামাঝি—এদের মধ্যেও উপযুক্ত বিভিন্ন উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে। এগুলি কাঁচা বা তরকারি করে কিংবা একসঙ্গে অর্ধসিদ্ধ করে স্যালাড আকারে খাওয়া হয়। এছাড়া, মরশুমি ফল—বিভিন্ন জাতের আম ও কলা, পেঁপে, লিচু, আতা, আনারস, কাঁঠাল, কুল, বাতাবীলেবু, কামরাঙা, আমড়া, বেল, ডাব ইত্যাদি খুবই উপাদেয় এবং বিভিন্ন উপাদানে ভরপুর। এগুলির কোনটিকে কাঁচা, কোনটিকে পাকা আবার কোনটিকে অর্ধসিদ্ধ অবস্থায় আহার করা হয়। এদের মধ্যে সবগুলি না হলেও বছরের সব মরশুমেই কিছু না কিছু ফল জন্মায়। তবে বর্তমান সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিতে সমস্ত ফলই প্রায় সারা বছর ধরেই বাজারে পাওয়া যায়। তাছাড়া মরশুমে কোন কোন ফল থেকে জ্যাম, জেলী, কাসুন্দি, আমচুর প্রভৃতি তৈরি করে সারাবছর ধরে তা আহার করা হয়ে থাকে। এভাবে তৈরি ফলজাত খাদ্যদ্রব্য খুবই সুস্বাদ হয়ে থাকে।

নিয়মিত ফল ও ফলজাত খাদ্যদ্রব্যের গ্রহণের অভাবে যকৃতে নানারকম ব্যাধি, পেটে বায়ু, চর্মরোগ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নানারকম অপুষ্টিজনিত রোগের দ্বারা দেহ আক্রান্ত হয়। কাজে কাজেই, সাধারণ খাদ্যবস্তুর সঙ্গে বিভিন্ন ফল ও ফলজাত আহার নিয়মিত গ্রহণ করা অবশ্য করণীয়। অনেকেই দুধ ঠিকমত হজম করতে পারেন না; তার বদলে দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। দুধের মধ্যে অনেক সময় নানারকম জীবাণু থাকে, যার দ্বারা জীবদেহ আক্রান্ত হয়। সে তুলনায় ফল অনেক বিশুদ্ধ অবস্থায় মেলে। দুধ খাওয়ার চেয়ে ফলাহার বেশি উপকারী। দুটি পাকা কাঁঠালী কলা কিংবা একটি সাধারণ আকারের পেয়ারা 200 মিলি-লিটার দুধের চেয়ে কম উপকারী নয়। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দুধ শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। সাধুরা তাই সন্ন্যাস জীবনযাপনে দুধের বদলে ফল আহার করে থাকেন। হিন্দু বিধবারা ফল আহার করে বহু বছরই বেঁচে থাকেন।

পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ফল সূচীভুক্ত। কিন্তু এদেশে অসুস্থ অবস্থায় কিংবা কঠিন ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হলে তবেই ফলাহার রুটিন

*ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স এণ্ড ইলেকট্রনিকস্, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

মাফিক অন্তর্ভুক্ত হয়। অনভ্যাসটাই এর অন্যতম কারণ। কেননা, খরচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিয়মিত কিছু না কিছু বাজারের সস্তা ফল আহার করা নিশ্চয়ই সম্ভব।

তাই শরীরের যথোপযুক্ত পুষ্টি ও সবল স্নায়ু গঠনের তাগিদে শিশু ও পরিণত বয়স্কদের দৈনন্দিন আহারের সঙ্গে ফল আহার-সূচী থাকা একান্ত প্রয়োজন। সকালে জলযোগের সঙ্গে, দুপুরের আহারের এক ঘণ্টা পরে এবং রাত্রে আহারের পর ফল খাওয়া উচিত। তবে টকজাতীয় ফল দুপুরের আহারের এক ঘণ্টা পরে এবং টকজাত খাদ্য দুপুরের আহারের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। শিশুদের বেলায় ফলের রস বা সিদ্ধ ফল খাওয়ানো দরকার এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

ক্ষুধা ও তার প্রকৃতি

মাধবেন্দ্রনাথ পাল*

"দেহ ধারণ ও পোষণের জন্যে আবশ্যক 'ধাতু' বা উপাদানের যোগসাধন বা চাহিদা পূরণ করার ইচ্ছাকে ক্ষুধা বলে। ধাতুক্ষয়ের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষুধার প্রকৃতি নির্ণয়, ও তদনুসারে ক্ষুধার নিরসন করা উচিৎ। ক্ষুধার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুসারে পরিমিত আহার্য বা খাদ্য গ্রহণ করলে আহার ফলপ্রসূ হয়, দেহধারণ কার্য স্বাভাবিক থাকে এবং স্বাস্থ্য যথারীতি অটুট থাকে।"

কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ও অধুনা পরলোকগত কবিরাজ শৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে লেখকের আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল। সেই প্রসঙ্গে ক্ষুধা ও আহার কি, সে বিষয়ে তিনি নিম্নোক্ত ঘটনার উল্লেখ করেন।

জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘকাল নানারূপ পেটের অসুখে ভুগছিলেন। তিনি বহু চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসা করান, কিন্তু কোন ফল পান নি। অবশেষে, তিনি একজন অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কবিরাজের চিকিৎসার অধীনে আসেন। কবিরাজ মশায় চিররোগী ব্যক্তিকে যথারীতি সবরকম প্রশ্ন করা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কী খেতে চান?" রোগী কবিরাজের প্রশ্নে অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। কবিরাজ আবারও সেই একই প্রশ্ন করলেন। রোগী এবার কবিরাজকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আমি চাইলেই কি খেতে পাব? এর আগে তো চিকিৎসকদের কাছে যা যা খেতে চেয়েছি, তা কিছুই পাই নি!" কবিরাজ মশায় দৃঢ়প্রত্যয়ে উত্তর দিলেন, "আপনি যা খেতে চাইবেন, আমি তারই ব্যবস্থা করে দেব।' রোগী আরও অবাক হলেন, এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাঁর ইচ্ছা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন, "আমি লুচি ও মাংস খেতে চাই।" কবিরাজ মশায় রোগীর বাড়ির লোকদের তখনই নির্দেশ দিলেন, "এখনই আমার সামনে গরম গরম ফুলকো লুচি ও কচি মাংসের ঝোল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করুন।" এই নির্দেশ শোনার পর রোগীর

* F/7, এম, আই, জি, হাউজিং এস্টেট; 37, বেলগাছিয়া রোড; কলিকাতা-700 037

ফ্যাকাসে চোখের কোণে যেন এক ঝিলিক আশার আলো খেলে গেল, তা অভিজ্ঞ কবিরাজ মশায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারল না। নির্দেশমত পরিমিত মশলা সহযোগে প্রস্তুত কচি মাংসের ঝোল দিয়ে গরম গরম ফুল্‌কো লুচি খাওয়ার দৃশ্য কবিরাজ মশায় নিজে বসে থেকে প্রত্যক্ষ করলেন, এবং সেই সঙ্গে রোগীর চোখে মুখে পরিতৃপ্তির উজ্জ্বল আভাও নিরীক্ষণ করলেন।

কিছুকালের মধ্যে রোগীর অসুখ সেরে যায় এবং ক্রমশ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে আসে। কবিরাজ মশায় বলেন, "রোগীর দেহে মাংস ধাতুর অবক্ষয় ঘটায় তাঁর মনে মনে সেই ধাতুক্ষয় পূরণের তাগিদ জাগ্রত হয় এবং তা মাংস ও লুচি খাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে পেট রোগা লোককে লুচি মাংস পথ্য দেবার কথা কোন চিকিৎসকেরই মনঃপূত হয় না। কিন্তু, আমার চিন্তায় আসে, রোগীর এই বিশেষ পথ্যের প্রতি নিবিড় টানই তাঁর রোগমূলের নির্দেশক ইঙ্গিত। মাংস-ধাতুর যোগসাধন একান্ত প্রয়োজন।"

আয়ুর্বেদ মতে দেহের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে হলে যথোপযুক্ত উপাদান বা দ্রব্য আহরণ করতে হয়, এবং যে প্রক্রিয়াতে তা আহরণ করা হয়, তাকে বলে 'আহার'। আহরণের উপযোগী উপকরণ বা দ্রব্যকে 'আহার্য' বলে। সাধারণভাবে, খাদ্য ও আহার্য সমপর্যায়ভুক্ত; তবে আহার্য শব্দে বিশেষ অর্থ নিহিত।

আমরা যে কোন আহার্য বা খাদ্য গ্রহণ করি না কেন সে সকল পাকাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন অংশে জীর্ণ বা দীর্ণবিদীর্ণ বা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে প্রধানত দু-ভাগে বিভক্ত হয়,—একটি সারভাগ বা আহারপ্রসাদ এবং অপরটি অসার ভাগ বা কিট্ট। আহার-প্রসাদ থেকে ক্রমশ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক দেহের আবশ্যক ও উপযোগী সাতটি উপাদান উৎপন্ন হয়; উপাদানগুলি দেহধারণ করে এজন্যে ধাতু, এবং একত্রে সপ্তধাতু নামে পরিচিত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শুক্রধাতুর মধ্যে জননসংক্রান্ত উপাদানের ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

আহার-প্রসাদ থেকে প্রথমে রস, পরে রস থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে মেদ, মেদ থেকে অস্থি, অস্থি থেকে মজ্জা এবং মজ্জা থেকে শুক্র এই সাতটি ধাতু একের পর এক উৎপন্ন হতে থাকে। স্পষ্টত সপ্তধাতুর উৎপত্তি গতিশীল প্রক্রিয়ায় ঘটে; কোন এক ধাতুর উৎপত্তি না হলে বা যথোপযুক্ত মাত্রায় উৎপন্ন না হলে পরবর্তী ধাতুর উৎপত্তিতে বাধা ঘটে, এবং দেহের চাহিদানুসারে ধাতুর উৎপত্তি হয় না। দেহধারণও আশানুরূপ সম্ভব হয় না।

অপর পক্ষে, আহারের অসারভাগ কিট্ট থেকে মল, মূত্র, ঘর্ম ইত্যাদি স্থূল মলদ্রব্য এবং সূক্ষ্ম সত্তায় বিরাজমান তিনটি দোষ যথা—বায়ু, পিত্ত ও কফের উৎপত্তি হয়, এরা একত্রে ত্রিদোষ নামে পরিচিত। দেহের অনুপযোগী ও অনাবশ্যক স্থূল মলদ্রব্য বর্জনীয়, এবং দেহ সেজন্যে তা পরিত্যাগ করে। কিন্তু বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রভাব দেহের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়ে যায়।

খাদ্য বা আহার্য জীর্ণ হওয়ার পথে একই সময়ে সপ্তধাতু ও মলদ্রব্য ও ত্রিদোষ পাশাপাশি উৎপন্ন হতে থাকে। সুতরাং সপ্তধাতু ও ত্রিদোষের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ট তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে, বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত প্রভাব সপ্তধাতুকে দূষিত করতে পারে, এজন্যে এই তিনটি প্রভাবই একত্রে ত্রিদোষ এবং সপ্তধাতু এদের প্রভাবে দুষ্ট হয় বলে দূষ্য নামে পরিচিত। সপ্তধাতু ও ত্রিদোষের সম্পর্ক রোগ ও অসুখের উৎপত্তি ও অপসারণ নিয়ন্ত্রণ করে; এই বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

উপরিউক্ত চিররোগীর চিকিৎসা এবং সপ্তধাতুসহ ত্রিদোষের উৎপত্তি প্রণালী পর্যালোচনা করলে ক্ষুধা ও তার প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। দেহধারণ ও পোষণের জন্যে আবশ্যক ধাতু বা উপাদানের যোগ-সাধন বা চাহিদা পূরণ করার ইচ্ছাকে ক্ষুধা বলে।

ধাতুক্ষয়ের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষুধার প্রকৃতি নির্ণয় ও তদনুসারে ক্ষুধার নিরসন করা উচিৎ। ক্ষুধার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুসারে পরিমিত আহার্য বা খাদ্য গ্রহণ করলে আহারের উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয়, দেহধারণকার্য স্বাভাবিক থাকে এবং স্বাস্থ্য যথারীতি অটুট থাকে। এর অন্যথা ঘটলে নানা অসুখের কারণ ঘটতে পারে। ক্ষুধা ও আহারের মাত্রা নির্ণয় বারান্তরের আলোচ্য বিষয়।

পরিষদের খবর

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

(1)

গত 1ই ফেব্রুয়ারী থেকে 15ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 24 পরগণা জেলার ইচ্ছাপুর-এর একতা ক্লাব কর্তৃক উক্ত ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীটি জনসাধারণের জন্যে বিকেল 4টে থেকে রাত 8টা পর্যন্ত খোলা থাকত। পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় ও হাতে কলমে কেন্দ্রের তৈরী অনেকগুলি মডেল উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

(2)

বরাহনগরের প্রগতি সংঘ গত 12ই ফেব্রুয়ারী থেকে 14ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একটি শিল্প ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে কলমে কেন্দ্রের তৈরী অনেকগুলি মডেল প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। জনসাধারণের জন্যে উক্ত প্রদর্শনীটি প্রত্যহ বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকত। স্থানীয় অঞ্চলে এই প্রদর্শনীটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

(3)

বালী-র সাধারণ গ্রন্থাগার-এর পক্ষ থেকে গত 12ই ফেব্রুয়ারী থেকে 14ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে তৈরী-করা কয়েকটি মডেল এই প্রদর্শনীতে দিয়ে উক্ত সংস্থাকে সহযোগিতা করা হয়। এটি প্রত্যহ বিকেল চারটে থেকে রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্যে খোলা থাকত।

আলোচনা-চক্র

26শে ফেব্রুয়ারী, বিকেল ছটায় পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের আয়োজিত বক্তৃতা সভায় পূর্বনির্ধারিত বক্তার অনুপস্থিতিতে উক্ত সময়ে একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল। তিনি আলোচনার উদ্বোধন করে "আয়ুর্বেদে ভেষজ" এই বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে ডঃ শ্যামসুন্দর দে "প্লাজ্‌মা আবদ্ধ-করণ"—বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই এই দুই বিষয়-বস্তুর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ভ্রম সংশোধন—ফেব্রুয়ারী '78 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর 76 পৃষ্ঠায় বাম স্তম্ভের 6নং লাইনে "ঐরূপ হতে বাধ্য নয়, নিয়ম বলে" বাক্যাংশে 'নয়'-এর স্থলে 'যে' এবং 'বলে'-এর স্থলে 'বশে' পড়তে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

শ্রীনিবাস রামানুজন



"He (Ramanujan) could remember the idiosyncrasies of numbers in an almost uncanny way. It was Littlewood who said that every positive integer was one of Ramanujan's personal friends."

G. H. Hardy

জন্ম—22শে ডিসেম্বর, 1887

মৃত্যু—26শে এপ্রিল, 1920

1913 সালের জানুয়ারীর এক সকালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গণিতবিদ হার্ডি ডাকের চিঠি দেখছিলেন। হাতে এলো মোটা একখাম ভারতবর্ষের ছাপ লাগান। মাদ্রাজ পোর্ট অফিসের এক অখ্যাত কেরাণী তাঁকে লিখছেন, "* * * আমার বিশেষ বিদ্যা নেই। অবসর সময় গণিত চর্চা করে কয়েকটি উপপাদ্য বের করেছি। আপনাকে সব পাঠাচ্ছি—যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে

কোথাও ছাপিয়ে দেবেন। · আমি বড়ই গরীব ··।" চিঠির সঙ্গে এক গাদা কাগজ নানা রকমের অংকে ভর্তি"। হার্ডির ভ্রূ কুচকে গেল। এ ধরনের চিঠি আজকাল হামেশাই আসছে—তাই মনে হল এ আর এক যশপ্রার্থী পাগল।

খামটা সরিয়ে রেখে দিনের কাজের জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু সারাদিন মনের মধ্যে বিঁধে রইল ওই অখ্যাত অজ্ঞাত যুবকের চিঠি আর তার পাঠান 120টি নানা রকমের সূত্র; অভেদ (identities) ও উপপাদ্য যার অনেকগুলি আগেই প্রমাণিত হয়েছে—আর কতকগুলির কোনও প্রমাণ নেই, শুধু অনুমান। হার্ডি ভাবলেন এ ছেলে চালিয়াৎ হলেও—বেশ প্রতিভাবান চালিয়াৎ।

রাতে ফিরে এসে আবার কাগজগুলি নিয়ে বসলেন। কিন্তু যতই দেখছেন, মুগ্ধ হচ্ছেন। আর ভাবছেন, যে সব সূত্রগুলির প্রমাণ নেই তাও হয়ত সত্যি—কারুর কি ক্ষমতা আছে এসব কল্পনা করবার। ডেকে পাঠালেন সহযোগী লিটলউডকে। দুজনার যখন কাগজগুলি দেখা শেষ হল তখন ভোর হতে আর দেরি নেই। ক্লান্ত কিন্তু উদ্দীপ্ত হার্ডি বলে উঠলেন, "লিটলউড একে কেমব্রিজে নিয়ে আসতেই হবে—এ আগুনকে নিভে যেতে দেয়া হবে না। হার্ডির চেষ্টায় এই ভারতীয় দরিদ্র কেরাণী 1914 সালের 17ই মার্চ যাত্রা করলেন কেমব্রিজের উদ্দেশ্যে—সুরু হল জয়যাত্রা। এই যুবকটিই বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন—আধুনিক গণিত জগতে ভারতের প্রথম দূত।

1887 সালের 22শে ডিসেম্বর রামানুজন তামিলনাড়ুর এক অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ি তানজোর জেলার কুম্ভকোনম গ্রামে। রামানুজনের মা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন এবং এঁর কাছ থেকেই রামানুজন নানারকমের শ্লোক শিখেন।

গ্রামের স্কুলেই রামানুজন পড়াশুনা সুরু করেন। 10 বছর বয়সে প্রাইমারী পরীক্ষায় জেলার ভিতর প্রথম হয়ে স্কুলে ফ্রিশীপ পাওয়াতে পড়াশুনা চালান সম্ভব হয়। অন্য বিষয়ের চাইতে অংক কষতেই ওর ভাল লাগত। ক্লাসের ছেলেরা রামানুজনকে দিয়ে কঠিন কঠিন অংক করিয়ে নিত। ছেলেরা মজা করবার জন্যে হয়ত ওর কাপড়ের খুটে পাথরের নুড়ি বেঁধে রাখত যখন রামানুজন ওদের জন্যেই অংক কষতে ব্যস্ত। যখন উঠে দাঁড়াতেন—ঝুরঝুর করে নুড়িগুলি পড়ে যেত—কিন্তু রামানুজন নির্বিকার। মাষ্টারমশাইদেরও নানারকমের প্রশ্ন করতেন আকাশের তারা কতদূরে—ওদের মাপ কি বা গণিতের চরম সত্য কি? হয়তো মাষ্টার মশাই বললেন কোনও সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে 1. সঙ্গে সঙ্গে রামানুজনের প্রশ্ন, 0-কে 0 দিয়ে ভাগ করলে কি হবে? মাষ্টারমশাইরাও বিরক্ত হতেন না। রামানুজনের প্রতিভা রয়েছে তাঁরা বুঝেছিলেন—এমনকি স্কুলের 'রুটিন' রামানুজনকে দিয়েই করিয়ে নিতেন। 1903 সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে রামানুজন কুম্ভকোনম গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু গণিতের উপরই জোর দেবার জন্যে অন্য বিষয়গুলি ভাল করে পড়তেন না। তাই F. A. পাশ করতে পারলেন না বা পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ইতি।

কলেজে পড়বার সময়ই রামানুজন লোনির ত্রিকোণমিতি এবং কার-এর অংকের বই পড়া শেষ

করেন। সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধান করতেন। নিজে নিজে সাইন (Sine), কোসাইন (Cosine) সূত্র বের করেন। অনেক সূত্র, সমস্যা বের করেন এবং তাঁ 'নোট' বইতে লিখে রাখেন। এই 'নোট' বইগুলি পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

যা হোক F. A. পরীক্ষায় পাশ করতে না পারাতে রামানুজনের বাবা বেশ অসন্তুষ্ট হন। ছেলে যে শুধু অংক নিয়েই মেতে আছে তাও তিনি একদম পছন্দ করতেন না। ছেলেকে সংসারী করবার জন্যে তার বিয়ে দেন 1909 সালে মাত্র 22 বছর বয়সে। রামানুজন প্রমাদ গুনলেন এবং কিছু একটা চাকুরীর খোঁজ করতে লাগলেন। গণিত চর্চা কিন্তু এর ভিতরই চলছে আর 'নোট' বইয়ের পাতাও ভর্তি হচ্ছে। রামানুজনের এই প্রতিভা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই সব শুভার্থীদের চেষ্টায় মাদ্রাজ পোর্ট আঁফিসে মাসিক 25 টাকা মাইনেতে কেরানীর চাকুরী পান। তাতেই খুসী।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে অংক কষে যেতেন। একদিন তো বড় সাহেবের কাছে এক ফাইলের ভিতর রামানুজনের অংক কষা কাগজ চলে গেছল—সাহেব কিন্তু সেদিন অসন্তুষ্ট হন নি। মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্যার ফ্রান্সিস স্প্রিং অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর এই খেয়ালী কর্মচারিটি এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এবং ইতিমধ্যেই 1911 সালে রামানুজনের এক প্রবন্ধ ভারতীয় গণিত সমিতির মুখপত্রে ছাপান হয়। তাই স্প্রিং সাহেবও ভাবতেন কিভাবে রামানুজনকে সাহায্য করা যায় যাতে সে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারে। এই সব শুভার্থীদের উপদেশে রামানুজন হার্ডির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ফ্রান্সিস স্প্রিং ও ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের প্রধান ডঃ গিলবার্ট ওয়াকার এফ. আর. এস.'-র চেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 75 টাকার এক মাসিক গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু মাদ্রাজে তার প্রতিভাকে ঠিকভাবে চালনা করবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। এদিকে হার্ডিও ঠিক করেছেন কেমব্রিজে রামানুজনকে নিয়ে যাবার। প্রথমে মায়ের ভীষণ আপত্তি ছিল। পরে নামাখাল দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে মা অনুমতি দিলেন ; কিন্তু এক শর্তে— যে বিদেশে মাছ-মাংস খাওয়া চলবে না। রামানুজন বিদেশে এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

সব বাধা কাটিয়ে 1914 সালের এপ্রিল মাসে রামানুজন কেমব্রিজে এসে হার্ডির সঙ্গে যোগ দেন। জীবনের 22 থেকে 26 বছর—এ সৃজনশীল সময়টা রামানুজনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে কাটে। ওঁর মৃত্যুর পরে তাই হার্ডি দুঃখ করে বলেছিলেন "রামানুজনের অকাল মৃত্যু ততটা বেদনাদায়ক না যতটা ব্যর্থতায় ভরা গুরুত্বপূর্ণ এই 5 বছর।" হার্ডির সংস্পর্শে এসে রামানুজনের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। আধুনিক গণিতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি ধরণের কাজ হচ্ছে এমন কি গণিতের সাধারণ প্রক্রিয়াগুলি যেমন প্রমাণ, বিশ্লেষণ পদ্ধতি তাঁর অজানা ছিল। তাই রামানুজনকে এ সম্বন্ধে পাঠ নিতে হয়। কিন্তু তাতে স্বাভাবিক প্রতিভার এতটুকু ক্ষতি হয় নি বরং আরও সহজভাবে ফুটতে পেরেছিল। হার্ডির ভাষায় "সে এক মজার ব্যাপার—এই প্রতিভাকে কি শেখাব—বরং আমিই লাভবান হয়েছি।"

রামানুজন কেমব্রিজে 5 বছর ছিলেন। কিন্তু গণিত নিয়ে গভীর কাজ মাত্র 3 বছরই করতে পেরেছিলেন কারণ 1917 সাল থেকেই রামানুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ অনেক বের হয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা 'নোট' বই ভর্তি হয়ে যায়। প্রতিদিন অন্তত 6/7টা নতুন উপপাদ্য হার্ডিকে দেখাতেন। এসব উপপাদ্য বা অনুমানের অনেকেরই প্রমাণ দেয়া নেই। এরকম 3/4 হাজার সমস্যা রামানুজন 'নোট' বই ভর্তি করে রেখেছেন যা এখনও দেশ বিদেশের গণিতবিদ্‌রা একের পর এক সমাধান করে যাচ্ছেন। বিশুদ্ধ গণিতের বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রতিভা কাজ করে। সংখ্যাতত্ত্ব (Theory of Numbers), অভেদ (Identities), উপবৃত্তিক অপেক্ষক (Elliptic Functions), অপসারী শ্রেণী (Divergent Series), মক-থেটা অপেক্ষক (Mock-Theta Function) প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা তাঁকে গাউস, অয়লার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্‌দের সমপর্যায়ে এনে দিয়েছে।

কোনও বিশিষ্ট সংখ্যার ছোট কতগুলি মৌলিক সংখ্যা আছে এই উপপাদ্য নিয়ে (Prime number theorem) কাজ করে রামানুজন এর এক সমাধান দেন। বিশেষ ধরণের মৌলিক সংখ্যাও কতগুলি হবে তার সূত্র বের করেন। সংখ্যার বিভাজন (partition of numbers) [যেমন $4=4+0=3+1=2+2=2+1+1=1+1+1+1, P(4)=5$] নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যে সমতা বের করেন তা রামানুজন সমতা (Ramanujan congruences) নামে পরিচিত। বৃত্ত সংখ্যা (round numbers) [অর্থাৎ যে সব সংখ্যাকে অনেকগুলি ছোট ছোট সংখ্যার গুণনীয়ক হিসাবে লেখা যায়, যেমন $1200=2^4.\ 3.\ 5^2$] নিয়ে কাজ করেন। একটা সংখ্যাকে বর্গসংখ্যার যোগফল হিসেবে কতভাবে লেখা যায় তার নির্দেশ দেন। তাঁর নামাঙ্কিত অনেক উপপাদ্য রয়েছে। যেমন রোজার্স-রামানুজন অভেদ, দ্যাগল-রামানুজন অভেদ, রামানুজন শ্রেণী, রামানুজন অপেক্ষক······ ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রতিটি সংখ্যার মজার মজার গুণগুলি তাঁর জানা ছিল। হার্ডির সঙ্গে হাসপাতালে 1729 নিয়ে মন্তব্য যে, এটি সবচাইতে ছোট সংখ্যা যা দুভাবে দুটো ঘন সংখ্যার যোগফল হিসেবে লেখা যায় [$1729=10^3+9^3=12^3+1^3$] অথবা এরকম চতুর্বর্গ সংখ্যার যোগফল কোন সংখ্যা হবে তার জবাবে বলা হয় "এই মুহূর্তে বলতে পাচ্ছি না, কিন্তু সেটা অত্যন্ত বড় সংখ্যা হবে।" এ কথা হার্ডি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। [সত্যি তাই সংখ্যাটি হল 635318657 $=158^4+59^4=134^4+135^4$]। হার্ডি ও তাঁর সহযোগী লিটলউড বলতেন "রামানুজন প্রতিটি সংখ্যার নিজস্ব রহস্যময় গুণগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিল। প্রতিটি সংখ্যা তার ব্যক্তিগত বন্ধু।" কেমব্রিজে থাকাকালীন তাঁর নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। রয়াল সোসাইটির ফেলো (F.R.S.) হন 1918 সালে এবং ঐ বছরই প্রথম ভারতীয় হিসেবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন।

কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম, ইংলন্ডের আবহাওয়া, শুধুমাত্র অনিয়মিত নিরামিষ খাওয়া সব কারণে রামানুজনের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ইংলন্ডে প্রাথমিক চিকিৎসার পর 1919 সালের 27শে ফেব্রুয়ারী তাকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। দুরারোগ্য যক্ষ্মা

রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের সজীবতা ও সৃজনীশক্তি অটুট ছিল। চিকিৎসার জন্যে যখন তাঁকে মাদ্রাজ শহরের চেট্‌পেট্‌ অংশে নিয়ে যাওয়া হয়, হেসে স্ত্রীকে বলেছিলেন "আমাকে চেট্‌পেট্‌ নিয়ে এসেছে। যেখানে সবই চেট্‌-পা" অর্থাৎ তামিল ভাষায় সবই চট্‌পট্‌ শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর মাত্র 3 মাস আগে তিনি হার্ডিকে তাঁর নতুন আবিষ্কার মক-থেটা অপেক্ষক (Mock-Theta Function) সম্বন্ধে চিঠি লেখেন।

রামানুজনের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। 1920 সালের 26শে এপ্রিল মাত্র 32 বছর বয়সে এই অসাধারণ প্রতিভার মৃত্যু হয়।

অরুণকুমার দাশগুপ্ত*

---

*কমফোর্ট, 2/1/B হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-700 029

মানুষের বন্ধু—ডলফিন

শত সহস্র জীবজন্তুর সঙ্গে আমরা বাস করি। এই শত সহস্র প্রাণীর জীবনধারাও শত সহস্র প্রকার। এই বিচিত্র প্রাণীদের মধ্যে যারা নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রাণী-জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, হিতকারী প্রবৃত্তির দ্বারা বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে, তারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হবে। সুতরাং, বোঝা যায়, কেউই ঝগড়াঝাঁটি করে বাঁচতে চায় না। সবাই চায় সুখ ও শান্তি। সেই রকম একটি প্রাণী ডলফিন নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

প্রায় 2 মিটার লম্বা এই প্রাণীটির মস্তিষ্কের আয়তন মানুষের মস্তিষ্কের 3 ভাগের 2 ভাগ। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, এই বিশাল জলচরটির বুদ্ধি নেহাৎ কম না। এমনকি বানরদের থেকেও বেশি। এত বুদ্ধিমান বলেই হয়ত 150/200টি শক্ত ও ধারাল দাঁত নিয়েও এরা মানুষের বন্ধু। ডলফিন ও মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্কে অনেক কথা-উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ডলফিনেরা অনেক জাহাজকে চোরা পাহাড়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে; জেলেদের মাছের সন্ধান দিয়েছে ইত্যাদি। সোভিয়েত রাশিয়ার জনৈক লেখকের "সাগর-মানব" গল্পে ডলফিন বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। সে যাই হোক ডলফিনরা যে মানুষের হিতকারী সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি।

ডলফিনদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি কাজে লাগানোর জন্যে আজকের বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা করছেন। ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে একটি ডলফিনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিশেষ ফললাভ করেছেন বিখ্যাত গবেষক ডঃ লিলি। তিনি তাঁর পোষা ডলফিনটিকে মানুষের মত কথা বলাতেও সমর্থ হয়েছিলেন। এই ডলফিনটি মৃত্যুর আগে তার এক সহচরীকে বলেছিল—"They deceived us". (এরা আমাদের ঠকিয়েছে।) ডলফিনটির এই কথা এখনো 'টেপ-রেকর্ড' করা আছে।

সমুদ্রের তলায় কার্যরত সি-ল্যাব. (sea-lab.)-এর সঙ্গে পাঠক মহলে অনেকেরই পরিচয় আছে। জলের নিচে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে এই 'সামুদ্রিক গবেষণাগার"। এতে যেমন বিজ্ঞানীরা থাকেন, তেমনি নাবিকেরাও থাকেন। এইরকম একটি গবেষণাগরের নাবিকেরা একটি



ডলফিন

ডলফিন পুষেছিলেন। 'টাফি' নামে এই ডলফিনটি দশ বছর বেঁচেছিল। বিশেষ ভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত (trained) এই ডলফিনটি জলের উপরে জাহাজের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করত। জলের তলায় বহুদূরে থাকলেও সংকেতের জবাব দিত। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতে পারলে এই ডলফিনরা সার্কাসে অন্য যে কোন জন্তুকে টেক্কা দিতে পারে।

ডলফিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এদের সন্তান-বাৎসল্য ও জলের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা। এরা অনায়াসে জলের এক কিলোমিটার গভীরে নেমে যেতে পারে যা কৃত্রিম ফুসফুস নিয়েও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এদের দেহে মায়োগ্লোবিন (myoglobin) নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। জলের নামার আগে এরা পেশীতে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন জমা করে নেয়। তাছাড়া জলের গভীরে এদের হৃদযন্ত্রের সংকোচন খুব কম হয়, ফলে অক্সিজেনও কম লাগে। এইভাবে ডলফিন জলের গভীরে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে।

গতিবেগের দিক দিয়েও ডলফিনদের বৈশিষ্ট লক্ষ্যণীয়। এদের গা অত্যন্ত মসৃণ। ফলে চলার পথে জলের সঙ্গে বাধা (resistance) অত্যন্ত কম হয়। ফলে এদের গতিবেগও অন্যান্য জলচর প্রাণীদের তুলনায় বেশি। এই একই কারণের জন্যে এরা চলার সময় পথে জলে কোন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় না। জলের মধ্যে চলার পথে এদের দিগ্‌নির্ণয় পদ্ধতিটিও আধুনিক নাবিকদের হার মানায়। জল প্রবাহ, জলের তাপমাত্রা, গতিবেগ, স্বাদ এবং সূর্য ও বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান থেকে এরা দিগ্‌নির্ণয় করে থাকে। এর ফলে মানুষও এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে এই ক্ষুদে বন্ধুদের কাছে বহুলাংশে ঋণী।

ডলফিনদের মানুষের কাজে ব্যাপকভাবে লাগানোর জন্যে বিশেষ আগ্রহী ও অগ্রণী ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা ডলফিনদের যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজ খুঁজে বের করতে এবং বন্দরে শত্রুপক্ষের ডুবুরিদের খুঁজে বার করতে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ ফল লাভও করেছেন। প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদকে যুদ্ধের কাজে ছাড়াও মানবকল্যাণের বহুবিধ কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে।

পরমেশ ব্যানার্জী*

* ডাকঘর—গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, জেলা-24 পরগণা।

বর্গ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি

সরাসরি গুণ না করে কোন সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করা যায় বীজগণিতের সাহায্যে। যেমন, 99, 96 ইত্যাদির বর্গ নির্ণয়ের সময়—

$$(99)^2=(100-1)^2=\{10^2-1^2\}^2=\{(10+1)(10-1)\}^2=(11\times9)^2=11^2\times9^2$$
$$=121\times81=9801,$$

$$(96)^2=(100-4)^2=\{10^2-2^2\}^2=\{(10+2)(10-2)\}^2=(12\times8)^2=12^2\times8^2$$
$$=144\times64=9216,$$

উপরিউক্ত বর্গ দুটি নির্ণয় করা হল বীজগণিতের প্রাথমিক সূত্র $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ দিয়ে। কিন্তু 97, 95, 98, 93 ইত্যাদির বর্গ উপরিউক্ত সূত্র দ্বারা অতি সহজে বের করা যায় না। এদের বর্গ বের করা যায় কিভাবে তা আলোচনা করা যাক।

যে কোন সংখ্যার বর্গ উপযুক্ত প্রমাণ (standard) সংখ্যা ধরে বের করা যায়। যেমন 50-কে প্রমাণ ধরে 52-এর বর্গ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কিভাবে? ছোট উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক 10-কে প্রমাণ ধরে 12-এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে। 12-এর বর্গ 144 আর 10-এর বর্গ 100. 10-এর সঙ্গে 12 যোগ করে যোগফলকে 2 দ্বারা গুণ করলে 44 হয়। আবার 44-এর সঙ্গে 100 যোগে করলে 144 হয়। সুতরাং 10 থেকে 12, 50 থেকে 52, 100 থেকে 102 ইত্যাদির বর্গ নির্ণয় নিম্নলিখিত ভাবে করা যায়।

$(12)^2=10^2$ (যে সংখ্যাকে প্রমাণ ধরা হয় তার বর্গ) $+[\{10$ (যে সংখ্যাকে প্রমাণ ধরা হয়) $+12$ (যে সংখ্যার বর্গ বের করতে হবে সেই সংখ্যা)$\}\times2]$

অনুরূপে,

$$(52)^2=50^2+\{(50+52)\times2\}$$
$$=2500+(102\times2)$$
$$=2500+204$$
$$=2704.$$

সমুদ্রের তলায় কার্যরত সি-ল্যাব. (sea-lab.)-এর সঙ্গে পাঠক মহলে অনেকেরই পরিচয় আছে। জলের নিচে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে এই 'সামুদ্রিক গবেষণাগার"। এতে যেমন বিজ্ঞানীরা থাকেন, তেমনি নাবিকেরাও থাকেন। এইরকম একটি গবেষণাগরের নাবিকেরা একটি



ডলফিন

ডলফিন পুষেছিলেন। 'টাফি' নামে এই ডলফিনটি দশ বছর বেঁচেছিল। বিশেষ ভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত (trained) এই ডলফিনটি জলের উপরে জাহাজের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করত। জলের তলায় বহুদূরে থাকলেও সংকেতের জবাব দিত। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতে পারলে এই ডলফিনরা সার্কাসে অন্য যে কোন জন্তুকে টেক্কা দিতে পারে।

ডলফিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এদের সন্তান-বাৎসল্য ও জলের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা। এরা অনায়াসে জলের এক কিলোমিটার গভীরে নেমে যেতে পারে যা কৃত্রিম ফুসফুস নিয়েও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এদের দেহে মায়োগ্লোবিন (myoglobin) নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। জলের নামার আগে এরা পেশীতে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন জমা করে নেয়। তাছাড়া জলের গভীরে এদের হৃদযন্ত্রের সংকোচন খুব কম হয়, ফলে অক্সিজেনও কম লাগে। এইভাবে ডলফিন জলের গভীরে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে।

গতিবেগের দিক দিয়েও ডলফিনদের বৈশিষ্ট লক্ষ্যণীয়। এদের গা অত্যন্ত মসৃণ। ফলে চলার পথে জলের সঙ্গে বাধা (resistance) অত্যন্ত কম হয়। ফলে এদের গতিবেগও অন্যান্য জলচর প্রাণীদের তুলনায় বেশি। এই একই কারণের জন্যে এরা চলার সময় পথে জলে কোন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় না। জলের মধ্যে চলার পথে এদের দিগ্‌নির্ণয় পদ্ধতিটিও আধুনিক নাবিকদের হার মানায়। জল প্রবাহ, জলের তাপমাত্রা, গতিবেগ, স্বাদ এবং সূর্য ও বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান থেকে এরা দিগ্‌নির্ণয় করে থাকে। এর ফলে মানুষও এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে এই ক্ষুদে বন্ধুদের কাছে বহুলাংশে ঋণী।

ডলফিনদের মানুষের কাজে ব্যাপকভাবে লাগানোর জন্যে বিশেষ আগ্রহী ও অগ্রণী ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা ডলফিনদের যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজ খুঁজে বের করতে এবং বন্দরে শত্রুপক্ষের ডুবুরিদের খুঁজে বার করতে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ ফল লাভও করেছেন। প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদকে যুদ্ধের কাজে ছাড়াও মানবকল্যাণের বহুবিধ কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে।

পরমেশ ব্যানার্জী*

* ডাকঘর—গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, জেলা-24 পরগণা।

বর্গ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি

সরাসরি গুণ না করে কোন সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করা যায় বীজগণিতের সাহায্যে। যেমন, 99, 96 ইত্যাদির বর্গ নির্ণয়ের সময়—

$$(99)^2=(100-1)^2=\{10^2-1^2\}^2=\{(10+1)(10-1)\}^2=(11\times 9)^2=11^2\times 9^2$$
$$=121\times 81=9801,$$

$$(96)^2=(100-4)^2=\{10^2-2^2\}^2=\{(10+2)(10-2)\}^2=(12\times 8)^2=12^2\times 8^2$$
$$=144\times 64=9216,$$

উপরিউক্ত বর্গ দুটি নির্ণয় করা হল বীজগণিতের প্রাথমিক সূত্র $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ দিয়ে। কিন্তু 97, 95, 98, 93 ইত্যাদির বর্গ উপরিউক্ত সূত্র দ্বারা অতি সহজে বের করা যায় না। এদের বর্গ বের করা যায় কিভাবে তা আলোচনা করা যাক।

যে কোন সংখ্যার বর্গ উপযুক্ত প্রমাণ (standard) সংখ্যা ধরে বের করা যায়। যেমন 50-কে প্রমাণ ধরে 52-এর বর্গ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কিভাবে? ছোট উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক 10-কে প্রমাণ ধরে 12-এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে। 12-এর বর্গ 144 আর 10-এর বর্গ 100. 10-এর সঙ্গে 12 যোগ করে যোগফলকে **2 দ্বারা গুণ** করলে 44 হয়। আবার 44-এর সঙ্গে 100 যোগে করলে 144 হয়। সুতরাং 10 থেকে 12, 50 থেকে 52, 100 থেকে 102 ইত্যাদির বর্গ নির্ণয় নিম্নলিখিত ভাবে করা যায়।

$(12)^2=10^2$ (যে সংখ্যাকে প্রমাণ ধরা হয় তার বর্গ)+[{10 (যে সংখ্যাকে প্রমাণ ধরা হয়)+12 (যে সংখ্যার বর্গ বের করতে হবে সেই সংখ্যা)}×2]

অনুরূপে,

$$(52)^2=50^2+\{(50+52)\times 2\}$$
$$=2500+(102\times 2)$$
$$=2500+204$$
$$=2704.$$

$102^2 = 100^2 + \{(102+100) \times 2\}$

$= 10000 + (202 \times 2)$

$= 10000 + 404$

$= 10404$ ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতে 10-কে প্রমাণ ধরে 11 বা 1-কে প্রমাণ ধরে 2 ইত্যাদিরও বর্গ বের করা যায়।

এবারে 10-কে প্রমাণ ধরে 13-এর বর্গ নির্ণয় করা যাক। আগের পদ্ধতিতে—

$(13)^2 = 10^2 + \{(10+13) \times 2\}$

$= 100 + 23 \times 2$

$= 146$ কিন্তু 13-এর বর্গ 169, তবে কি পদ্ধতিটি ভুল? মোটেই না। আগের ক্ষেত্রে 10-কে প্রমাণ ধরে 12-এর বর্গ বের করা হয়েছে—2 ঘর সরিয়ে। যেহেতু তাদের পার্থক্য 2 (12−10 = 2)। আর এক্ষেত্রে পার্থক্য 13 − 10 = 3. সুতরাং,

$(13)^2 = 10^2 + \{(10+13) \times 3\}$

$= 100 + (23 \times 3)$

$= 100 + 69$

$= 169$ হবে।

অনুরূপে 10-কে প্রমাণ ধরে 14, 15 ইত্যাদির বর্গ নির্ণয় করা যায়।

$(14)^2 = 10^2 + \{(10+14) \times 4\}$

$= 100 + (24 \times 4)$

$= 100 + 96$

$= 196.$

$(15)^2 = 10^2 + \{(10+15) \times 5\}$

$= 100 + (25 \times 5)$

$= 100 + 125$

$= 225$ ইত্যাদি।

10-কে প্রমাণ ধরে যেমন 11, 12, 13 ইত্যাদির বর্গ বের করা যায় তেমন 9, 8, 7-এর বর্গও বের করা সম্ভব।

$9^2 = (10)^2 - \{(10+9) \times 1\}$

$= 100 - 19$

$= 81.$

$8^2 = (10)^2 - \{(10+8) \times 2\}$

$= 100 - 36$

$= 64.$

$7^2 = (10)^2 - \{(10+7) \times 3\}$

$= 100 - 51$

$= 49$ ইত্যাদি।

সুতরাং প্রমাণ সংখ্যা এবং 1 বা 4-এর অধিক পার্থক্যবিশিষ্ট সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বর্গ নির্ণয়ে একটি সূত্র লেখা যায়।

$$(n_2)^2=(n_1)^2+\{(n_1+n_2)(n_2-n_1)\}$$
যখন $n_2>n_1$.

এখানে,
n_2, যে সংখ্যার বর্গ বের করতে হবে সেই সংখ্যা।
n_1, সুবিধামত যে সংখ্যাকে প্রমাণ ধরতে হবে সেই সংখ্যা।

যেমন, 101, 102,103 ইত্যাদির ক্ষেত্রে

$$(101)^2=100^2+\{(100+101)(101-100)\}$$
$$=10000+201\times1$$
$$=10201,$$
$$102^2=100^2+\{(100+102)(102-100)\}$$
$$=10000+202\times2$$
$$=10000+404$$
$$=10404,$$
$$103^2=100^2+\{(100+103)(103-100)\}$$
$$=10000+609$$
$$=10609$$ ইত্যাদি।

$n_2<n_1$ হলে

$$n_2{}^2=n_1{}^2-\{(n_1+n_2)(n_1-n_2)\}$$

যেমন 99, 98, 97 ইত্যাদির ক্ষেত্রে

$$99^2=100^2-\{(100+99)(100-99)\}$$
$$=10000-199\times1$$
$$=9801,$$
$$98^2=100^2-\{(100+98)(100-98)\}$$
$$=10000-198\times2$$
$$=10000-396$$
$$=9604,$$
$$97^2=100^2-\{(100+97)(100-97)\}$$
$$=10000-(197\times3)$$
$$=10000-591$$
$$=9409$$ ইত্যাদি।

এভাবে 4, 5, 6, 7, 8, ইত্যাদি অংকবিশিষ্ট যে কোন সংখ্যার বর্গ বের করতে পারা যায়। এটি আপেক্ষিক (relative) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সুবিধামত কোন সংখ্যাকে প্রমাণ ধরতে হবে।

হাফিজ আহ্‌মেদ *

* গ্রাম + পো.—ভুরিয়া, ভায়া—চাতরা, জেলা—বীরভূম

জেনে রাখ

সানগ্লাস চোখের ক্ষতি করে।

স্বভাবতঃই আমাদের চোখ এক নির্দিষ্ট ব্যবধানের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মির মধ্যে বিনা অসুবিধায় বাইরের জগতের সমস্ত জিনিস দেখতে পায়। এই নির্দিষ্ট ব্যবধানের মধ্যে যে সমস্ত বর্ণালী থাকে, সেগুলি হল, বে-নী-আ-স-হ-ক-লা (V-I-B-G Y-O-R)। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হল বেগুনীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $3{\cdot}9\times10^{-5}$ সে. মি. অর্থাৎ $3{\cdot}9\times10^{3}\mathring{A}$ এবং সবচেয়ে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হল লাল রঙের 7×10^{-5} সে. মি অর্থাৎ $7\times10^{3}\mathring{A}$. এই বেগুনি রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তলায় এবং লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপরে আমরা দু-ধরণের অসুবিধা বোধ করি—(i) তাপীয় কারণগত এবং (ii) রাসায়নিক কারণগত। যদি একটি থার্মোপাইল (thermopile) কিংবা থার্মোমিটার ক্রমাগত বেগুনি রঙের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাপমাত্রা হ্রাস পাবে, কিন্তু লাল রঙ ছাড়িয়ে কিছুটা বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অংশে দেখা যাবে যে, সেখানে তাপমাত্রা খুবই বেশি। ঐ অংশের তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 10^{-2} সে. মি এবং ঐ অংশের নাম অবলোহিত অংশ। এই খালি চোখে দেখা যায় না।

আবার যখন কিছু কিছু লবণ কম-বেশি ভাবে বর্ণালীর আলোকরশ্মি দ্বারা বিয়োজিত হয় তখন যে রাসায়নিক ফল লক্ষ্য করা যায়, তা সবচেয়ে কম হয় লাল রঙের বেলায় এবং আস্তে আস্তে বাড়ে—যতই বেগুনি রঙের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। বেগুনির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে একই দিকে কিছুটা অংশে এই ক্রিয়া প্রকট হয়। ঐ অংশের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-6} সে মি. এবং অংশের নাম অতিবেগুনি অংশ।

অতিবেগুনি রশ্মির লক্ষণীয় কতকগুলি ধর্ম হল—(i) কাচে শোষিত হওয়া, (ii) অতিরিক্ত কিরাকির করা (penetrating influence), (iii) গ্যাস আয়নিত করা; (iv) কিছু পদার্থকে প্রতিপ্রভ করা, (v) ফটোগ্রাফী-অবদ্রবের বিয়োজনের ক্ষমতাসম্পন্ন করা। অতিবেগুনিরশ্মি কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন হওয়ার ফলে চোখের নার্ভকে উত্তেজিত করতে অক্ষম।

সূর্যরশ্মির প্রখরতা থেকে চোখ রক্ষার জন্যে অনেকেই সানগ্লাস ব্যবহার করেন। সানগ্লাস ব্যবহারের সফলতা প্রমাণ করার জন্যে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী বিভিন্ন ওষুধ সংরক্ষণ ভাণ্ডার থেকে সানগ্লাস কিনে পরীক্ষা করেন। তাঁরা বলেন, চোখের পক্ষে এগুলি অসন্তোষজনক। পরীক্ষার জন্যে তাঁরা যতগুলি সানগ্লাস নির্বাচন করেছিলেন তাদের প্রায় 1/3 অংশগুলির মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর (visible) আলোকরশ্মির তুলনায় স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি পরিমাণের অতিবেগুনি রশ্মি অতিক্রম করে (অতিবেগুনি সূর্যরশ্মির এমন এক অংশ যা চোখের ক্ষতি করে)। যখন দৃষ্টিগোচর রশ্মি পরিমাণে কমে এবং অতিবেগুনি পরিমাণে বাড়ে তখন চোখের উপর চাপ পড়ে। তা থেকে কিছুদিন পরে চোখের দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ঘটে।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন, কেবলমাত্র একই কারণেই আলোকরশ্মি ব্যবহার না করাই শ্রেয়। সেই কারণটিই হল, যখন দৃষ্টিগোচর আলোকরশ্মি পরিমাপে কমে, তখন যদি বাইরের আলোকসজ্জার অধিকতর উচ্চ তীব্রতার আলোক সহ্য করতে হয় তখন চোখে অতি বেগুনি রশ্মি পরিমাণে অধিকতর বেশি পৌঁছয় এবং তখন চোখের ক্ষতিসাধন করে।

রাণারাণী মাইতি*

ভেমুয়া গার্লস স্কুল, গ্রাম-পাকুই, পো-বালিচক, জেলা-মেদিনীপুর

ঘর্ষণের প্রয়োজনীয়তা

দুটি বস্তু যখন উভয়ের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি করে বা করার চেষ্টা করে, তখন বস্তুদ্বয় স্বধর্মানুযায়ী স্পর্শবিন্দুতে এই গতিকে বিপরীতমুখী বলের দ্বারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ধরণের বলকে বলে ঘর্ষণ বল (force of friction) এবং বস্তু দুটির নিজস্ব সত্ত্বা অনুযায়ী যে ধর্মের জন্যে এরকম বল প্রযুক্ত হয় তাকে ঘর্ষণ (friction) বলে।

রাস্তার উপর একটি চাকা গড়িয়ে দিলে তবে চাকাটি কিছু দূর গিয়ে থেমে যাবে। কারণ, রাস্তাটি গতিশীল চাকাটির উপর তার গতি উল্টোদিকে একটি ঘর্ষণ-বল প্রয়োগ করে। রাস্তা যত কম অমসৃণ হবে, ঘর্ষণ-বল তত কম হবে। রাস্তা কর্তৃক প্রদত্ত ঘর্ষণ বলের মান যদি শূন্য হয়, তবে চাকাটিকে রাস্তায় উপর ঘুরিয়ে দিলেও তা অগ্রসর হবে না; জাড্যের (inertia) জন্যে একই স্থানে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু চাকাটি চলতে আরম্ভ করবার পর যদি ঘর্ষণজনিত বাধা হঠাৎ লুপ্ত হয়, তবে জাড্যের জন্যে তা চলতেই থাকবে; আর থামবে না। এখন যদি ঘর্ষণজনিত বল না থাকত তবে—(i) পাখিরা উড়তে পারত না, কারণ তাদের ডানা আর বাতাসে ঘর্ষণ বল প্রয়োগ করত না (অর্থাৎ পিচ্ছিল হয়ে যেত), (ii) কেউই হাঁটতে পারত না—পিছলে পড়ে যেত—রাস্তা যতই অমসৃণ হোক না কেন, (iii) পেরেক বা স্ক্রু দ্বারা কাঠ জোড়া যাবে না, (iv) কারখানায় পট্টি (belt) দ্বারা যন্ত্রাদি ঘুরান যাবে না, (v) সুতা বা দড়িতে গিঁট দিয়ে কোন জিনিস আটকান যাবে না, (vi) বেহালা বা এসরাজ বাজান যাবে না (ঘর্ষণ বল বৃদ্ধির জন্যে এর ছড়ে রজন ঘষে নেওয়া হয়)।

একটি রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করা যাক। বেশি দেরি হয়ে গেছে বলে এক ছাত্র খুব জোরে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে—এমন সময় ঘর্ষণ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, তখনই রাস্তা এতই পিছল হয়ে যাবে যে, সে হয় উপুড় না হয় চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। রাস্তাটি যদি

কোন কোণে আনত থাকে তবে সে মাধ্যাকর্ষণের জন্যে নিচের দিকে ভীষণ জোরে (981 সে.মি./বর্গ সে. বেগে) গড়িয়ে চলবে (কারণ, অভিকর্ষজ বলের মান 981 সে.মি./বর্গ সে. এবং এই ত্বরণকে প্রতিরোধ করবার জন্যে কোন ঘর্ষণ বল কাজ করছে না)। গড়াবার সময় হয়ত সে দেখল যে, রাস্তার উপর একটি দড়ি পড়ে আছে এবং দড়িটির অপর প্রান্ত একটি গাছে বাঁধা আছে। সে আর গড়াতে হবে না ভেবে কোনরূপে দড়িটিকে ধরে ফেলল। কিন্তু যতই শক্ত করে চেপে দড়িটি ধরুক না কেন, দড়িটি কেবলই পিছলে যাবে। দড়ির প্রান্তে যদি একটি গিঁট দেওয়া বেড় থাকে এবং সে তার ভিতর হাত গলিয়ে দেয় তবেও দড়িটির গিঁট এমনকি আঁশগুলি পর্যন্ত খুলে যাবে—সুতরাং পূর্বাবস্থার শেষ হবে না (এই গড়ানর সময় কিন্তু কোন বেদনার উদ্ভব হবে না—কারণ দেহ ও রাস্তার মধ্যে কোন ঘর্ষণ থাকবে না)। আবার হয়ত রাস্তার ধারে একটি কাঠের বেড়া দেখে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু যেসব পেরেক দিয়ে কাষ্ঠখণ্ডগুলি জোড়া ছিল—টান পড়াতে সেগুলি আপন গর্ত থেকে বের হয়ে এল। সমস্ত দিন গড়িয়ে কোন অনুভূমিক রাস্তায় আসলেও সে জাড্যের জন্যে গড়িয়ে চলবে। ক্রমে সন্ধ্যা হল। দেশলাই জ্বালবার জন্যে চেষ্টা করলে—প্রথমত পিচ্ছিল হাত দিয়ে দেশলাই বের হবে না, দ্বিতীয়ত কাঠি যত ঘষা হোক না কেন আলো জ্বলবে না।

এছাড়া আরও কত বিপদ হতে পারে। চলন্ত গাড়ী থামবে না। পিচ্ছিল হাত দিয়ে ষ্টিয়ারিং ঘুরাতে না পারায় গতির অভিমুখ পরিবর্তন করা যাবে না প্রভৃতি; অর্থাৎ সামান্যকেও অবজ্ঞা করা যায় না।

ইন্দ্রজিৎ ঘোষ*

* 10/1, গোয়ালটুলি লেন, কলিকাতা-700 013

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজন-ভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকূট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে হাতে বা ডাকযোগে লেখা পাঠাতে হবে। পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি কর্তৃক লেখা মনোনীত হলে তা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ সময়মত প্রকাশ করা হবে।

লাইকেন

শৈবাল (algae) এবং ছত্রাক (fungus) জাতীয় উদ্ভিদ পরস্পর স্থায়ীভাবে বসবাস করে যে একক উদ্ভিদ গঠন করে, সেই জাতীয় উদ্ভিদকে লাইকেন (lichen) বলে। আপাতদৃষ্টিতে একক হলেও লাইকেনজাতীয় উদ্ভিদে দু-প্রকার উদ্ভিদ থাকে—স্বভোজী ক্লোরোফিলযুক্ত শৈবাল এবং (ii) মৃতজীবী (soprophyte) বা পরজীবী (parasitic) ক্লোরোফিলবিহীন ছত্রাক। এই জাতীয় উদ্ভিদকে 'বল্গা-হরিণের মস' ও (reindeer moss) বলা হয়। উত্তরমেরুর তুন্দ্রা অঞ্চলের বল্গা-হরিণদের এটি একটি মূল্যবান খাদ্য, সেই জন্যেই এই নাম।

প্রাপ্তিস্থান—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জায়গাতেই লাইকেন পাওয়া যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদ নিম্ন-উচ্চ যে কোন তাপমাত্রাতেই জন্মাতে পারে। কখন কখন পর্বতের চূড়াতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু লাইকেন আছে যারা এমন জায়গায় জন্মায়, যেখানে অন্য কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। এই জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণত গাছের ডালে, পাতার উপরে, পাথরের উপরে, মাটিতে, জীর্ণ কাঠের উপরে এবং বরফের উপরে জন্মায়।

বসবাসের প্রকৃতি—আগেই বলেছি লাইকেনে দু-ধরনের উদ্ভিদ থাকে—শৈবাল ও ছত্রাক। এই দু-ধরণের উদ্ভিদের পরস্পরের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। মোটামুটিভাবে এদের তিন প্রকার সম্পর্কের কথা জানা গেছে। যথা—

(i) মিথোজীবী (Symbyont)—যখন দুটি ভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ পরস্পরের সাহচর্যে জীবনধারণ করে তখন তাকে মিথোজীবী বলে এবং ঐ উদ্ভিদগুলিকে মিথোজীবী উদ্ভিদ বলে। এখানে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate) ও ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প সরবরাহ করে।

(ii) হেলোটিসম (Helotism)—আগেই বলা হয়েছে ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ পরজীবী বা মৃতজীবী। সুতরাং লাইকেনে ছত্রাককে প্রভু এবং শৈবালকে ভৃত্য মনে করা যেতে পারে। স্বভাবতঃই এই ধরণের সম্পর্ক খুব জোরালো নয়।

(iii) পরজীবিত্ব (Parasitism)—ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ শৈবালজাতীয় উদ্ভিদে পরজীবী হিসেবে বাস করে একক উদ্ভিদ গঠন করে। বলাবাহুল্য, প্রথম সম্পর্কটিই সর্বাপেক্ষা জোরালো।

ব্যবহার—এই জাতীয় উদ্ভিদদের প্রচুর ব্যবহার আছে আগেই বলা হয়েছে যে, খাদ্য

হিসাবে লাইকেন বল্গা-হরিণদের একটি মূল্যবান খাদ্য। আবার লোবারিয়া (lobaria), ইভার্নিয়া (evernia) প্রভৃতি লাইকেন গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জাপানে এণ্ডোকার্পন (endocarpon) নামে একটি লাইকেন বাজারে তরকারিরূপে বিক্রি হয়। নরওয়ে ও সুইডেনের অধিবাসীরা সেট্রারিয়া (cetraria) নামে এক ধরণের লাইকেন থেকে জেলি (jelly) প্রস্তুত করে। পার্মেলিয়া (parmelia) নামে লাইকেনটি আমাদের দেশে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়।

রং ও কাগজ তৈরি করতে—কিছু কিছু লাইকেন থেকে রং প্রস্তুত করা হয়। রোসেলি (rocelle) নামক লাইকেন থেকে লিটমাস (litmaus) পেপার প্রস্তুত করা হয়।

ওষুধ প্রস্তুতিতে—জণ্ডিস(jaundis); জ্বর, চর্মরোগ, মৃগীরোগ (epilepsy) ইত্যাদি রোগের আরোগ্যের জন্যে লাইকেনের প্রচুর ব্যবহার দেখা গেছে। আইসল্যাণ্ডে (iceland) রেচক ওষুধ (laxative) হিসাবেও লাইকেনের প্রচুর ব্যবহার আছে। পার্মেলিয়া স্যাক্সাটিলিস (permelia saxatilis) বা 'খুলি লাইকেন' (skull lichen) মৃগী রোগীদের সুস্থ করতে পারে। ধারক ওষুধ (astringents) হিসাবে উসেনা (usenea) নামক লাইকেনের ব্যাপক ব্যবহার আছে। ক্ল্যাডোনিয়া পিক্সিডাটা (cladonia pyxidata) নামক লাইকেন হুপিং কাশি (whooping cough) সারাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতে—সুগন্ধি দ্রব্য (perfumary) প্রস্তুত করতে ইভার্নিয়া এবং লোবেরিয়ার খুব ব্যবহার আছে।

মৃত্তিকা উর্বর করতে—মৃত্তিকা উর্বর করতেও লাইকেনের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। মাটি বা পাথরের উপরে যে সব লাইকেন জন্মায়, তারা নিজেদের দেহ থেকে এক ধরণের অম্ল নিঃসরণ করে যা দিয়ে মাটির কাঁকর, পাথর গলে যায়। যে মাটিতে অন্য উদ্ভিদ জন্মায় না, কিন্তু লাইকেন জন্মায়, এইসব লাইকেন মরে যাবার পরে তাদের জীর্ণ দেহাবশেষ মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং এর ফলে মাটি উর্বর হয় এবং তখন ঐ মাটিতে অন্য উদ্ভিদ জন্মাতে পারে।

উপরিউক্ত ব্যবহারগুলি ছাড়াও চর্মশিল্পে লাইকেনের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। লাইকেনের কিছু কিছু অপকারও আছে—যেমন, উসেনা, ইভার্নিয়া প্রভৃতি লাইকেনের প্রভাবে কখন কখন চর্মরোগ দেখা যায়।

মৃণালকান্তি দাস*

*দ্বিতীয় বর্ষ, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

রাসায়নিক রেডার

আমরা প্রকৃতি থেকে জল অনেকভাবে সংগ্রহ করি। বৃষ্টির জল নদীর জল, ঝরণা ও কুয়ার জল, ভূনিম্নস্থ জল, সমুদ্রের জল প্রভৃতি। এর মধ্যে বৃষ্টির জলই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেনের সংযুক্তিতে জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের নিত্যব্যবহার্য জলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়া আরও অনেক মৌলিক পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ যে বৃষ্টির জল, তাতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়াও নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সালফার ডাই-অক্সাইড, ধূলিকণা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। এ সব পদার্থ মিশ্রিত থাকার ফলে একদিকে যেমন জলের উপকারিতা বেড়ে যায়, পক্ষান্তরে, জল ব্যবহারের অনুপযোগীও হতে পারে। কোন দীঘি বা জলাশয়ের জলে যদি সামান্যতম পরিমাণেও পারদ, আর্সেনিক বা সেলেনিয়াম মিশ্রিত থাকে, তবে সে জল মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রচলিত জল-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কণামাত্র পারদ বা আর্সেনিকের অস্তিত্ব প্রমাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অনেক সময় অকারণে কোন কোন জলাশয়ের জল শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে এর কারণ নির্ণয় খুবই অসম্ভব মনে হয়। উল্লেখযোগ্য যে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে যাদের উপস্থিতিতে জলাশয়ের শ্যাওলা বা আগাছার খুব বৃদ্ধি হয়, ফলে জলাশয় বুজে যায়। কিন্তু সামান্যতম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া সহজ কাজ নয়।

এ সব সমস্যা সমাধানের জন্যে একটি বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম নিউট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিস। যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভারস্থ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এর সাহায্যে জল নিয়ে অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জলের মধ্যে এমন সব বস্তুর আবিষ্কার করা যা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই পদ্ধতির দ্বারা জলে ধাতু, খনিজ পদার্থ বা কোন রাসায়নিক পদার্থের লেশমাত্রেরও সন্ধান করা যায়।

বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিকে রেডারের সঙ্গে তুলনা করেন। রেডার যেমন অন্ধকার বা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাহাড়, পর্বত কিংবা উপত্যকার সন্ধান দিয়ে বিমানকে ঠিক পথে চালিত করে, নিউট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিস জলের মধ্যে নানা রকম ক্ষতিকারক ও দূষিত পদার্থের সন্ধান দিয়ে মানুষকে বিপদমুক্ত করে। রেডার থেকে অতি উচ্চস্পন্দন যুক্ত বেতার তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, আর এই পদ্ধতিতে নিঃসৃত হয় নিউট্রনের স্রোত। এই স্রোত গিয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণার পদার্থটির নিউক্লিয়াসে আঘাত করে। আঘাতের ফলে

নিউক্লিয়াস থেকে গামারশ্মি নির্গত হয় এবং এই রশ্মির নিরিখেই বস্তুটির স্বরূপ ও অবস্থিতি নির্ণয় করা যায়। যতটা গামা রশ্মি নির্গত হয় তা থেকে বস্তুটির পরিমাণ বুঝা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভারস্থ রি-অ্যাক্টরে বেশ কয়েক বছর ধরেই নানা পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে। নিউট্রন অ্যাক্টিভেশন অ্যানালিসিস তারই অন্যতম। বর্তমানে সেখানে জল মাটি, পাথর, খনিজ পদার্থ, উল্কাপিণ্ড, চাঁদের মাটি প্রভৃতিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয়ে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ভবিষ্যতে এই রাসায়নিক রেডার অনেক সমস্যার সমাধান করবে।

নিমাইচাঁদ দে*

* P-12 গিরিশ অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-700 003

ভেবে কর

মনে কর একটি গুলির দোকানে 81টি কাচের গুলির বাক্স আছে। 1 নম্বর বাক্সে 1টি গুলি, 2 নম্বর বাক্সে 2টি গুলি, 3 নম্বর বাক্সে 3টি গুলি··· এইভাবে 81 নম্বর বাক্সে 81টি গুলি আছে। এখন সাতটি ছোট ছেলে দোকানদারকে গিয়ে বলল, "আমাদের 7 জনের মধ্যে তোমার দোকানের সমস্ত গুলি সমান ভাগে ভাগ করে দাও।" তখন দোকানদার কোন বাক্স থেকে কোন গুলি না বের করে গুলির বাক্সগুলি ঐ 7টি ছেলের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দিল যে প্রত্যেক ছেলে সমান সংখ্যক গুলি পেল। এবার তোমরা বলতো কোন্ ছেলে কোন্ কোন্ নম্বরের বাক্স পেল ?

5	54	13	62	21	70	29	78	37
46	14	63	22	71	30	79	38	6
15	55	23	72	31	80	39	7	47
56	24	64	32	81	40	8	48	16
25	65	33	73	41	9	49	17	57
66	34	74	42	1	50	18	58	26
35	75	43	2	51	10	59	27	67
76	44	3	52	11	60	19	68	36
45	4	53	12	61	20	69	28	77

নিচে দেওয়া এই তালিকায় যে কোন স্তম্ভ কিংবা যে কোন সারির সমস্ত সংখ্যাগুলি যোগ করলে দেখবে যোগফল হবে 369. এই তালিকায় 7টি স্তম্ভ এবং 7টি সারি আছে। অতএব 7টি ছেলের প্রত্যেকে যে কোন স্তম্ভ বা সারির প্রত্যেক নম্বরের গুলির বাক্সগুলি নিলে সমান সংখ্যক অর্থাৎ 369টা করে গুলি পাবে।

তোমরা বলবে—সব তো বুঝলাম কিন্তু তালিকাটা তৈরি হল কি করে বলুন। নিয়মটা নিচে দেওয়া হল।

তালিকা তৈরির নিয়ম

(i) প্রথমে একটি চৌকো ঘর কেটে নিয়ে তাকে লাইন টেনে 7টি স্তম্ভে এবং 7টি সারিতে ভাগ কর ;

(ii) এবার চৌকো ঘরটির সবচাইতে মধ্যবর্তী অংশের ঘরের ঠিক নিচের ঘরে (অর্থাৎ ষষ্ঠ সারি ও পঞ্চম স্তম্ভের সংযোগস্থলের ঘরে) 1-সংখ্যাটি লিখবে ;

(iii) তালিকা তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল কোণাকুণিভাবে বাঁদিক বরাবর ঘরগুলিতে পরপর সংখ্যা বসানো (যথা 1, 2, 3, 4 অথবা 6, 7, 8, 9 অথবা 29 থেকে 35 ইত্যাদি)। কিন্তু যখন ঘর ফুরিয়ে গিয়ে আর সংখ্যা লেখবার জায়গা থাকবে না, (যথা 4-এর পর, 5-এর পর, 12-র পর ইত্যাদি), তখন শেষ যে সংখ্যাটি লিখবে (যথা, 4, 5, 12), তার পাশাপাশি এক ঘর সরে গিয়ে যে স্তম্ভ বা সারি পাবে তার সবচেয়ে উঁচুতে পরের সংখ্যাটি লিখবে (যথা 4-এর পর 5, 5-এর পর 6, 12-র পর 13 ইত্যাদি)।

(iv) আবার যদি মাঝপথে এসে সংখ্যা লেখা থেমে যায় অর্থাৎ পরের ঘরে সংখ্যা লেখবার জায়গা না থাকে (যথা 9-এর পর, 18-র পর, 27-এর পর ইত্যাদি), তখন শেষ যে ঘরটায় সংখ্যা লিখবে (যথা 9, 18, 27 ইত্যাদি), তার সমকোণে বেঁকে যে ঘরটা পাবে তাতে পরের সংখ্যাটা লিখবে (যথা 9-এর পর 10, 18-র পর 19, 27-এর পর 28 ইত্যাদি)।

ব্যতিক্রম- ব্যতিক্রমের মধ্যে আছে 36-এর পর 37, 45-এর পর 46।

দেবাশীষ ভট্টাচার্য*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

ফেব্রুয়ারী '78 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত 'শব্দকূট'-এর সমাধান

পাশাপাশি

1—এডিসন, 5—ফ্যারাডে, 6—বেল, 7—হুক, 8—ভাবা, 9—হল, 10—ডারউইন, 11—কুলম্ব, 12—বোর, 14—ওয়াট, 16—রনজেন, 17—মর্স, 18—জলি।

উপর থেকে নিচে

2—ডিরাক, 3—জুল, 4—বয়েল, 10—ডালটন, 13—রমান, 14—ওহ্ম, 15—হার্জ।

মডেল তৈরি

(1)

বর্তনী পরীক্ষক

ট্রানজিস্টরের তৈরী রেডিও ইত্যাদি মেরামতির কাজে যে মাল্টিমিটার ব্যবহার করা হয়, তার সাহায্যে বর্তনীর কোন অংশে ছেদ আছে কিনা তা পরীক্ষা করাটাই অন্যতম কাজ। এই কাজটি নিচের মডেলটির সাহায্যেও করা সম্ভব। এটি খুবই কম খরচে তৈরি করা যায়। সব মিলে কুড়ি টাকার মধ্যে। মাল্টিমিটারের দাম অনেক বেশি। তাই এজাতীয় একটি যন্ত্র তৈরি করে তা সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

আসলে, মডেলটি হল একটি শ্রুতিপারের ইলেকট্রনিক আন্দোলক। নিচে তার একটি বর্তনী দেওয়া হয়েছে। এটি তৈরি করতে হলে নিচের জিনিসগুলি প্রয়োজন—

(i) একটি 5/8 Ω-এর স্পীকার,

(ii) একটি Ac 128 ট্রানজিস্টর,

(iii) একটি T_2 ট্রানস্ফরমার,

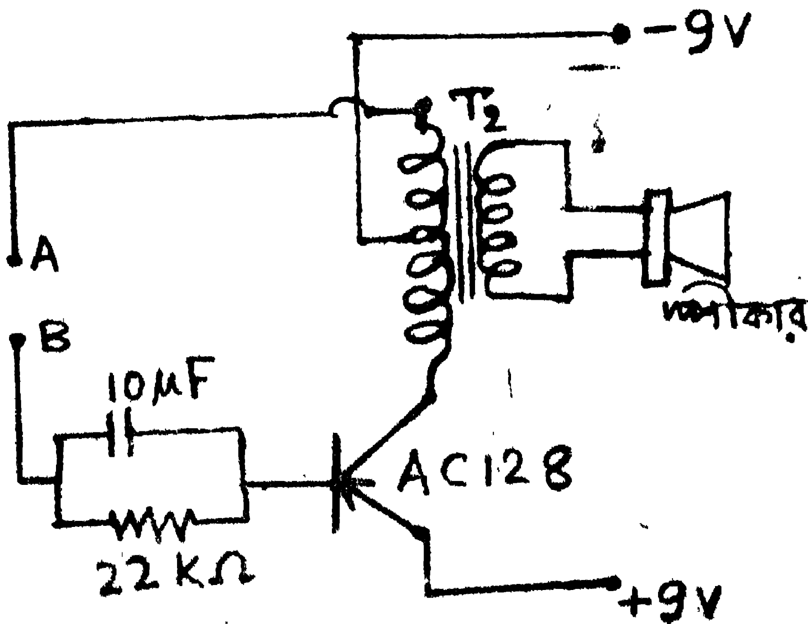
(iv) একটি 10 μF/72V কনডেনসার,

(v) একটি 22 kΩ রোধ,

(vi) কিছু 9 V সমতড়িৎ প্রবাহ।

এর সঙ্গে কিছু তার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিসপত্র লাগবে।

বর্তনী অনুযায়ী আন্দাজমত একটি সার্সি তৈরি করে বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলি পরস্পর সংযুক্ত করা হল। চিত্রে A ও B বিন্দু দুটিতে দুটি প্রোব লাগানো আছে। A ও B সংযুক্ত হলে আন্দোলকটির বর্তনী সম্পূর্ণ হবে এবং স্পীকারে তা শব্দ শোনা যাবে। মেরামতির কাজে যে যন্ত্রাংশটি পরীক্ষা করতে হবে—তার দু-প্রান্তে প্রোব দুটি লাগান হয়। এ অবস্থায় যদি স্পীকারে কোন শব্দ তৈরি হয় তখন যন্ত্রাংশটিতে কোন ছেদ নেই বলে জানতে হবে। যদি কোন শব্দ না হয়, তখন ঐ অংশে ছেদ আছে।



তবে ঐ যন্ত্রাংশের রোধের মান এমন হতে পারে যে, ঐ রোধ আন্দোলকে প্রয়োগ করলে কম্পাংকের মান শ্রুতিপারের শব্দের বাইরেও চলে যেতে পারে। তখন আর এই মডেলটি কার্যকরী হবে না। তবুও প্রাথমিক পরীক্ষার কাজে এটি যে কার্যকরী, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

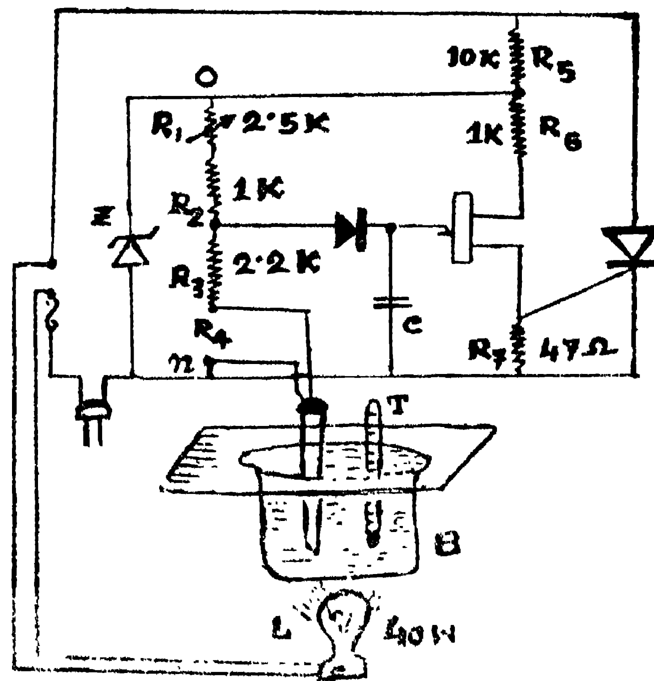
অজিত কুমার সাহা* ও অভিজিৎ বর্ধন*

* পরিষদের হাতে কলমে কেন্দ্র

(2)

স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

আমরা তারের কয়েলের মধ্যদিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে তাপ উৎপাদনের সঙ্গে পরিচিত। এই তাপ বা তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন হলে আমরা তারের কয়েলের রোধ বা ওর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ-প্রবাহকে পরিবর্তন করার কথা চিন্তা করি। কিন্তু অনেক সময় কোন বস্তুকে কোন একটি বিশেষ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হয় এবং বেশ কিছু সময় ঐ বস্তুর তাপমাত্রা একই রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বস্তুর তাপমাত্রা একই অবস্থায় ধরে রাখা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে চারপাশের তাপমাত্রার সঙ্গে বস্তুর তাপমাত্রার যখন পার্থক্য থাকে। সুতরাং কোন বস্তুকে যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন তাপ পরিবহন, পরিচলন বা বিকিরণ যে কোন পদ্ধতিতেই



বস্তু থেকে চলে যায় এবং তাপমাত্রা এক অবস্থায় থাকে না এবং প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা থেকে নিচে নেমে আসে ফলে আরও বেশি উত্তপ্ত করে ঐ তাপমাত্রায় পৌঁছতে হয়। আবার অনেক

সময় বস্তুর তাপমাত্রা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা থেকে বেশি হয়ে যায়, তখন তাপের প্রবাহ কমাতে হয়। কিন্তু তাপমাত্রা কখন কতটুকু বাড়ল বা কতটুকু কমল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাপের প্রবাহ কতটুকু বাড়ালে বা কমালে তাপমাত্রা সব সময়ই অপরিবর্তিত থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই কঠিন যদি না এই নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয় হয়। এখানে (চিত্রে) একটি বিকারে কিছুটা জল নিয়ে তার তাপমাত্রা বেশ কিছুক্ষণ ধরে একই অবস্থায় রাখার স্বয়ংনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দেখানো হল।

বিকার B-এর মধ্যে কিছুটা জল নিয়ে তার মুখ একটা কাচের প্লেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। আর কাচের প্লেটের মধ্য দিয়ে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হল একটি থার্মোমিটার এবং একটি টেম্পারেচার সেনসেটিভ্ রেজিস্টান্স্ বা সেন্সর। সেন্সরের বিশেষ চরিত্র হল এর রেজিস্টান্স বা রোধ তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়মিত ও খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়। আর জলকে উত্তপ্ত করা হয় একটি 40W ল্যাম্প দিয়ে। এই ল্যাম্প এবং সেন্সর উভয়ই একই তড়িৎ-বর্তনীতে যুক্ত।

চিত্র অনুসারে জেনার ডায়োড্ Z বর্তনীর O এবং n বিন্দুকে একটি স্থির বিভব প্রভেদে রাখে। জলের তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে সেন্সর-এর রোধেরও পরিবর্তন হয় এবং সেন্সর ও 2·2k রোধের উপর বিভব পতনেরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়। এই দুই রোধের দুই মাথায় যে বিভব প্রভেদ তা (2N2646) ট্রানজিস্টারের এমিটারের বিভবকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর পরে এই ট্রানজিস্টর আবার সিলিকন-রেকটিফায়ার (D_2)-এর শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাল্বের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বাড়ে বা কমে। সুতরাং যখন জলের তাপমাত্রা বাড়ে—বাল্বের তড়িৎ-প্রবাহ সেই ভাবেই কমে এবং জলের তাপমাত্রা যখন কমে—বাল্বের তড়িৎ প্রবাহ তখন বাড়ে। সুতরাং সব অবস্থাতেই এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অবস্থান করে। এখন কোন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার জন্যে 2·5k রিহষ্টাট্কে নিয়ন্ত্রণ করে ঐ তাপমাত্রায় পৌঁছতে হয়।

বর্তনীর প্রয়োজনীয় জিনিস

Z—জেনার ডায়োড্	D_1, D_2 ডায়োড্
A—ফিউজ	C—কনডেন্সর্ ·05mf.d., 50v.
R_1—রিহষ্টাট্ (2·5k)	L—40w. ল্যাম্প
R_2—রেজিস্টান্স (1k)	
R_3— ,, (2·2k)	
R_4—সেনসর	
R_5—রেজিস্ট্যান্স (10k)	
R_6— ,, (1k)	
R_7— ,, (47Ω)	

বিজয় বল*

* সাহা ইনষ্টিটিউট্ অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্, কলিকাতা-700 009

আর্কিমিদিসের আবিষ্কার

তেইশ-'শ বছর পূর্বে ইতালির দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপের পূর্ব উপকূলে সাইরাকিউস (Syracuse) নামে এক ধনজনশালী নগরী ছিল। নগরটি ছিল প্রায় একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। ঐ নগরীতে আর্কিমিদিস (Archimedes) নামে এক ধনবান পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি ছিলেন, সাইরাকিউস রাজের বন্ধু ও আত্মীয়। ইচ্ছা করলে তিনি সাধারণ ধনীদের মত বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বিজ্ঞানের চর্চায় ও সত্যানুসন্ধানে কাল কাটাতে লাগলেন।

প্রকৃতি রাজ্যের শৃঙ্খলা ও বিধিগুলি পর্যবেক্ষণ করে তাঁর বড় আনন্দ হত। তিনি বিশ্বাস করতেন, জগতে প্রত্যেক ঘটনাই ঘটে, কোন না কোন নিয়ম অনুসারে। সেই সূত্রটি যদি তিনি আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে এই সুবিশাল পৃথিবীটাকেই তাঁর অধীন করতে পারবেন।

আর্কিমিদিস যখন তরুণ সেই সময় সিসিলিতে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। এক পক্ষে ছিল রোমান ও গ্রীকগণ, অপরপক্ষে আফ্রিকার উত্তর উপকূলস্থিত কার্থেজবাসিগণ। সাইরাকিউস-রাজ রোমান ও গ্রীকগণের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে তাঁদেরই জয় হয়। ফলে সাইরাকিউস রাজ্যের প্রতিপত্তি বাড়ল। তার উপর রাজ্যের সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্যে রাজা কতকগুলি জাহাজ নির্মাণ করালেন। সেগুলি গ্রীস, স্পেন, ফ্রান্স ও ইতালি প্রভৃতি দেশে পণ্য নিয়ে যাওয়া আসা করতো। আর্কিমিদিস সমুদ্রোপকূলে জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় নাবিক ও কারিগরদের কাজকর্ম দেখে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনের দ্বারা তাদের সাহায্য করে অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগলেন।

নাবিকেরা দণ্ড দিয়ে বড় বড় ভার উল্টাত। আর্কিমিদিস হিসাব করে দেখলেন, সে কাজে তাদের যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে, তা যদি অন্য কাজে লাগান যায়, তা হলে প্রভূত উপকার সাধিত হয়। তারা ভারের নিচে একটি দণ্ড প্রবেশ করিয়ে দিত এবং ভারটির কাছেই একখানি পাথর রেখে দণ্ডটির ভার তার উপর ন্যস্ত করত। আর্কিমিদিস দেখলেন, দণ্ডটি যদি আরও দীর্ঘ হয় এবং ভার ও পাথরখানির দূরত্ব যদি আরও কম করা যায়, তাহলে শক্তির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। হাত ও পাথরখানির দূরত্ব যদি পাথর ও ভারের দূরত্বের পাঁচগুণ হয়, তাহলে হাতের শক্তি বৃদ্ধি পাবে পাঁচগুণ। যে ভারটি তুলতে পাঁচজন লোকের শক্তির প্রয়োজন, এভাবে তা একজন লোকে দণ্ডের সাহায্যে উল্টাতে পারবে। দণ্ড যদি খুব দীর্ঘ করা যায়, তাহলে এমন কোন ভার নেই, যা উল্‌টানো যাবে না।

আর্কিমিদিস সাইরাকিউস-রাজকে তাঁর এই নতুন আবিষ্কারের কথা জানিয়ে বললেন, "পৃথিবীর বাইরে আমাকে দাঁড়াবার মত একটা জায়গা দিন; আমি গোটা পৃথিবীটাকেই উল্‌টে দেব।" অবশ্য কাজটি যে এত সোজা নয়, তা আর্কিমিদিসও জানতেন।

যা হোক, তিনি যে-সব যন্ত্র ও উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, আমরা এখনো সে সবের অনেকগুলিই ব্যবহার করে থাকি। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে—

'অফুরন্ত প্যাঁচের স্ক্রু'। এর সাহায্যে নাকি আর্কিমিদিস মাল ও জাহাজ অবাধে ডাঙ্গায় টেনে তুলেছিলেন।

এই ঘটনার পর আর এক ব্যাপারে রাজা আর্কিমিদিসের উপর খুব খুশী হয়েছিলেন। ঘটনাটি বড়ই অদ্ভুত।

একদিন রাজা তার স্বর্ণকারকে কিছু পরিমাণ সোনা দিয়ে একটি মুকুট নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন। মুকুটটি তিনি এক দেবমন্দিরে দান করবেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে স্বর্ণকার মুকুট নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হল। রাজা মুকুটটি ওজন করে দেখলেন, তিনি স্বর্ণকারকে যে পরিমাণ সোনা দিয়েছিলেন মুকুটটির ওজন ঠিক তাই আছে। কিন্তু একজন পারিষদ রাজাকে জানালেন, স্বর্ণকার সোনার সঙ্গে রূপা মিশিয়ে অবশিষ্ট সোনা চুরি করেছে।

সাইরাকিউস-রাজ ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। দোষের প্রমাণ না পেয়ে স্বর্ণকারকে শাস্তি দিতে চাইলেন না। তিনি তখন আর্কিমিদিসকে ডেকে পাঠালেন। আর্কিমিদিস এলে, তাঁকে মুকুটটি দিয়ে তার সঙ্গে রূপা মেশানো হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করতে বললেন। অবশ্য তা করতে হবে, মুকুটটি না ভেঙ্গে।

আর্কিমিদিস মহাসমস্যায় পড়লেন। তিনি মুকুটটি ওজন করে দেখলেন, সোনার পরিমাণের সঙ্গে তার ওজন ঠিকই আছে এবং তাকে দেখাচ্ছেও খাঁটি সোনার মত। কাজেই তার সঙ্গে যদি রূপা মেশানো হয়ে থাকে, তবে সে রূপার পরিমাণ বেশি নয়। তিনি সমান আয়তনের একখানি সোনার ও রূপার টালি তৈরি করে ওজন করলেন। দেখলেন, সোনার টালিখানির ওজন রূপার টালিখানির ওজনের প্রায় দ্বিগুণ! তিনি ভাবলেন, যদি মুকুটটিকে গলিয়ে একটি টালি এবং তার মত খাঁটি সোনার আর একখানি টালি তৈরি করে দুটিকে পৃথক ওজন করি, আর ঐ দুখানি টালির ওজন যদি সমান হয়, তাহলে বোঝা যাবে, মুকুটটি খাঁটি সোনার।

কিন্তু মুকুটটির গঠন-সৌন্দর্য দেখে রাজা নিজেই মুকুটটিকে ভাঙ্গতে বারণ করেছিলেন। আর্কিমিডিস তখন ভাবলেন, মুকুটটির ঘনত্ব ঠিক কত, তা যদি বের করতে পারেন, তাহলে তা খাঁটি সোনার কিনা সহজেই নির্ণয় করতে পারবেন। এখন সমস্যা হচ্ছে—টালিতে পরিণত না করে মুকুটটির ঘনত্ব বের করা যায় কিভাবে? চিন্তা করতে লাগলেন আর্কিমিদিস। মনে কোন সমস্যার উদয় হলে তার মীমাংসা না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হতেন না।

সেকালে গ্রীকরা এক রকমের চৌবাচ্চায় স্নান করত। একদিন আর্কিমিদিস স্নান করবার জন্যে চৌবাচ্চায় নামতেই তার খানিকটা জল কানা দিয়ে উপ্‌চে বাইরে পড়ল। তিনি চৌবাচ্চায় ডুব দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন, জল কানা থেকে অনেকটা নিচে নেমেছে। এই ঘটনাটি লক্ষ্য করে এবং বহুবার পরীক্ষা করে তিনি নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—যতখানি জল উপ্‌চে পড়েছে, তা ঠিক তার দেহের আয়তনের সমান। তাঁর মনে সত্যটি নিমেষে প্রতিভাত হল। তাঁর নিজের দেহটিকে গলিয়ে টালিতে

পরিণত না করেই তিনি তার ঘনত্ব নিরূপণ করতে পেরেছেন। তবে মুকুটটির ঘনত্ব নিরূপণ করতে পারবেন না কেন?

তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, গা না মুছে, পোষাক না পরে স্নানের ঘর থেকে বাড়ির দিকে ছুটে চললেন। যেতে যেতে বলতে লাগলেন, "পেয়েছি…পেয়েছি…পেয়েছি!"

তিনি যে সূত্রটির সন্ধান পেলেন, তার সাহায্যে মুকুটটি খাঁটি সোনার কিনা; এবং খাঁটি সোনার না হলে তাতে কতখানি রূপা মেশানো আছে, তা নিরূপণ করে রাজাকে জানালেন। রাজা চোরের যথোচিত শাস্তিবিধান করলেন।

সাইরাকিউস রাজ্যে সুদীর্ঘকাল শান্তি বিরাজ করছিল। এমন সময়ে নানা কারণে রোমানগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। আর্কিমিদিস নগর রক্ষার ভার গ্রহণ করে, এমন এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করলেন, যার সাহায্যে বড় বড় পাথর ছোঁড়া যেতে পারে। এই যন্ত্র বড় বড় পাথর ছুঁড়ে শত্রুপক্ষের অনেকগুলি জাহাজ ডুবিয়ে দিল।

রোমানদের সেনাপতির নাম ছিল মারসেলাস। তিনি আর্কিমিদিসের বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না। পরিশেষে সাইরাকিউসের পতন ঘটল। মারসেলাস তাঁর সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন, আর্কিমিদিসকে যেন হত্যা করা না হয়।

আর্কিমিদিস তখন মাটিতে বালির উপর একটি কাঠি দিয়ে কোন সমস্যা সমাধানে মগ্ন ছিলেন। একজন রোমান সৈন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করল। আর্কিমিদিস বললেন, "এই সমস্যার সমাধান করে নিই; তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব—সে পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

সৈনিকটি এ কথায় অপমানিত বোধ করল। সে তৎক্ষণাৎ আর্কিমিদিসকে হত্যা করল।

এইভাবে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর জীবনের অবসান ঘটে।

স্বপনকুমার দে*

* গ্রাম—একতারপুর, ডাকঘর—ভূপতিনগর, জেলা—মেদিনীপুর

জনপ্রিয় বক্তৃতা

আগামী 16ই এপ্রিল, 1978, রবিবার বিকেল 6টায় পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে" একটি জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণকে উক্ত বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বক্তা: জগৎবন্ধু ভট্টাচার্য* **বিষয়: চলমান মহাদেশ**

তারিখ: 16ই এপ্রিল, '78 **সময়: বিকেল 6টা**

***অবসর প্রাপ্ত সহযোগী প্রধান বার্তা সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা।**

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : শস্যের খাদ্য উপাদান কি কি ? বিভিন্ন উপাদানের কাজ কি ?

উৎপল কুণ্ডু, দেবাশীষ জানা, মেদিনীপুর

উত্তর : বায়ু, জল ও মাটি—এ তিনটির মাধ্যমে গাছ খাদ্য আহরণ করে। মাটি ও বায়ু খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান জোগান দেয়। জল ঐ খাদ্য গাছের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত করে দেয়। বায়ু থেকে গাছ কার্বনডাই-অক্সাইড নেয়। যে সমস্ত খাদ্য উপাদান গাছ মাটি থেকে শিকড় দিয়ে গ্রহণ করে, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—(i) প্রধান উপাদান, (ii) প্রয়োজনীয় উপাদান এবং (iii) উপকারী উপাদান।

প্রধান উপাদানগুলি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এগুলি হল—নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল লোহা, তামা, দস্তা, কোবাল্ট, বোরন ইত্যাদি। গাছের বৃদ্ধির জন্যে এগুলির প্রয়োজন খুবই স্বল্পমাত্রায় অথচ এদের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি হলেই শস্যের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ঘটে না, শস্য ভালভাবে বাঁচতে পারে না। উপকারী উপাদানের মধ্যে সোডিয়াম, ক্লোরিন, সিলিকন ইত্যাদি। শস্যের বৃদ্ধিতে আবশ্যকীয় উপাদানের সঙ্গে এগুলি একই সঙ্গে কাজ করে থাকে।

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ শস্যের বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন শস্যে বিভিন্ন পরিমাণে অতি আবশ্যকীয় উপাদান। এই উপাদানগুলির বেশির ভাগই নানারকম অজৈব সার ব্যবহারের দ্বারা পূরণ করা হয়। এগুলির অভাবে শস্যের বৃদ্ধি কম হয়। শস্য নানা প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

মাটির গঠন, আর্দ্রতা ও বায়ুর সংস্পর্শতা শস্যের জন্ম ও বৃদ্ধির সহায়ক। সেজন্যে বিভিন্ন জৈব সার প্রয়োগ করে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি করা হয়। ভাল ফসল পেতে হলে তাই পরিমাণ মত জৈব ও অজৈব সার মাটিতে মেশাতে হবে।

নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম হলে গাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং ক্রমশ তা হলদে হয়ে যায়। এই উপাদানটি গাছের গাঢ় সবুজ রঙ, পাতা, ফল, বীজ প্রভৃতি উৎপাদন এবং কাণ্ড বৃদ্ধির সহায়ক। পটাশ শস্যকে রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা দেয়। অন্যান্য ক্ষতিকারক অবস্থার সৃষ্টি হলেও পটাশ শস্যকে প্রতিরোধ করে। তাছাড়া, পটাশ গাছে শর্করাজাতীয় পদার্থ উৎপাদনে এবং গাছকে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্রহণে সাহায্য করে। ফসফরাস ফসল ফলনের কাজে সাহায্য করে। এই উপাদানটি ফল ও পরিপক্ক বীজ উৎপাদনের সহায়ক।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পুস্তক-পরিচয়

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

পুস্তকটির লেখক—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ; প্রকাশক—জ্যোতি প্রকাশন; 2A, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-700 009; পৃষ্ঠা সংখ্যা-242; প্রকাশকাল—সেপ্টেম্বর, 1977; মূল্য—চোদ্দ টাকা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল এবং তার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ যত বৃদ্ধি পেয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ততই ত্বরান্বিত হয়েছে। সুদূর অতীত থেকে সুরু করে বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই বিজ্ঞান ও প্রয়োগ আজ সামগ্রিক অর্থে সুগঠিত এবং উন্নত খুবই। এর পিছনে রয়েছে অজস্র বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীর কঠোর শ্রম, অদম্য কর্মপ্রচেষ্টা এবং অক্লান্ত সাধনা। তাঁদের যৌথ সাফল্য নিয়েই বর্তমান সভ্যতা গঠিত হয়েছে। তবে পর্যালোচনায় পাওয়া যায়—এই সাফল্যের সিংহভাগ এসেছে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সাধনার ফল থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর বহু আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের ইতিহাস আজকের শতাব্দীর শেষেও স্মরণীয় এবং তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী—এই গ্রন্থে লেখক শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ মহাশয় বিজ্ঞানের সেই অতীত ইতিহাসের কয়েকটি বিষয়বস্তুর আবিষ্কার ও ক্রমোন্নতি পর্যালোচনা করেছেন।

দেশলাই, এঞ্জিন, সাইকেল, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, কলম, কলের গান, আকাশে ওড়া, ডুবোজাহাজ, আলোক চিত্র, চলচ্চিত্র, ডিনামাইট, রঞ্জেন-রশ্মি ইত্যাদি মোট আঠারোটি সর্বজনশ্রুত বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থকার এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি এমনই সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে প্রতিটি বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করেছেন যে, শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষার্থী বা বিজ্ঞান কর্মীই নন, যাঁরা আদৌ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত নন তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হবেন। প্রতিটি রচনার মধ্যে আবিষ্কার ও তার ধারাবাহিক উন্নতি খুবই সাবলীল ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়েছে। বহু দুষ্প্রাপ্য ও প্রামাণিক চিত্র এবং মূল্যবান তথ্যদ্বারা গ্রন্থকার গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন। সব কয়টি রচনাই অত্যন্ত জনপ্রিয়; সেজন্যে পাঠকমাত্রেরই এ জাতীয় রচনায় প্রতি কৌতূহল এবং আগ্রহ থাকবে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর নির্বাচন, বিন্যাস ও পরিবেশনা থেকে স্বভাবতঃই বোঝা যায়—গ্রন্থকার শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ রচনায় কত অভিজ্ঞ এবং তরুণ মনে নিপুণভাবে বিজ্ঞান মানসিকতা উন্মেষ করতে সক্ষম। অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও তার ধারাবাহিকতাকে লেখার মধ্যে খুবই সুষ্ঠুভাবে ধরে রেখেছেন—

যা পাঠকদের বহু চাহিদাই মেটাবে। এ জাতীয় আস্বাদ পাওয়া যায় গ্রন্থকারের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থেও যা তাঁকে এনে দিয়েছে রবীন্দ্র পুরস্কার, ইউনেস্‌কো পুরস্কার এবং শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ একটি শিরোনাম। তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতনামা লেখকের গ্রন্থ পড়ে সকলেই উপকৃত হবেন—এ সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই।

পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় (বিশেষ করে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায়) তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের কয়েকটি এখানে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যা লক্ষণীয়। কেবলমাত্র 'যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রগতি' শীর্ষক রচনাটিতে সুষ্ঠু ধারাবাহিকতার কিছু কিছু অভাব এবং অন্যান্য অংশে কয়েকটি বানান ভুল ছাড়া গ্রন্থটি সবদিক থেকেই ত্রুটিমুক্ত। গ্রন্থটি সব শ্রেণীর পাঠকের কাছে সহজেই সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই ভাল।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞপ্তি

195 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
2. প্রকাশনের কাল—মাসিক
3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
4. প্রকাশকের জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
5. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীরতমোহন খাঁ (কার্যকরী), ভারতীয়, পি-[illegible], রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক সংস্থা) পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য

'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে

1.3.78 প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'প্যাকেট সর্টিং সার্ভিস'-এর মাধ্যমে পাঠানো হয় ; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 4, এপ্রিল, 1978

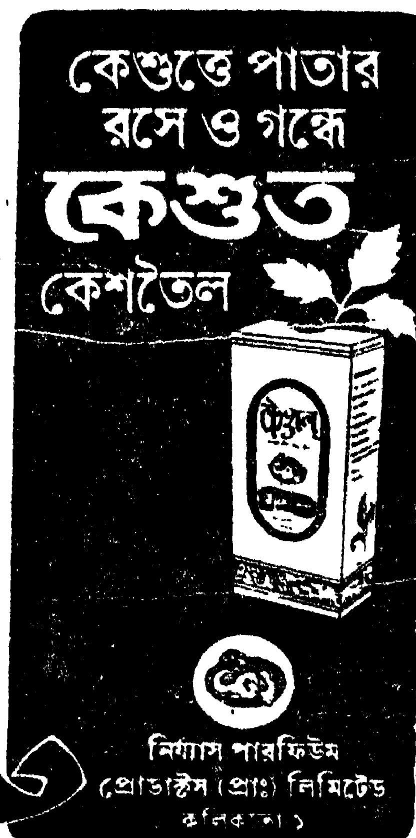
কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়




কেশুত্তে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল
নির্যাস পারফিউম
প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ | এপ্রিল, 1978 | চতুর্থ সংখ্যা

স্নায়ুতরঙ্গ

অভিজিৎ লাহিড়ী* ও উদয়ন বসু

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুতন্ত্র। এই গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রের গঠন এবং স্নায়ুমূলের উত্তেজনা বিভবক্রিয়ার মাধ্যমে তরঙ্গাকারে কিভাবে স্নায়ুতন্ত্রে প্রবাহিত হয়—তারই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ বর্ণিত আছে এই প্রবন্ধে।

আমাদের শরীরে স্নায়ুতন্ত্রের প্রচণ্ড গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেরই কমবেশি ধারণা রয়েছে। এই স্নায়ুতন্ত্রের গঠন খুবই জটিল। মনুষ্যেতর প্রাণীদের বুদ্ধিবৃত্তি বা শরীরের ভিতরকার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মানুষের মত অতটা উন্নত নয়। তাই তাদের স্নায়ুতন্ত্রের গঠনেও জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও স্নায়ুতন্ত্র সামগ্রিকভাবে কি পদ্ধতিতে কাজ করে তা অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র বহির্বিভাগীয় (peripheral) আর অন্তর্বিভাগীয় (central) বা কেন্দ্রীয়—এই দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ মোটামুটিভাবে বার্তাসংবাহকের (information carrier) কাজ করে, আর দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন তথ্য বা বার্তার সমন্বয় সাধন আর নির্দেশ গঠনের (information processing) কাজ সম্পন্ন হয়। অবশ্য এইভাবে দুই অংশের কার্যপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য টানা পুরোপুরি ঠিক নয়। তবে এটুকু বলা যেতে পারে, স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা মোটামুটি 'শ্রমবিভাজন' (job-division) রয়েছে। বিজ্ঞানীরা কোন্ কোন্ অংশে কি কি ধরণের কাজ হয় তা কিছুটা চিহ্নিত

* বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা-700 006

করতে পেরেছেন। কোন্ কোন্ পথে বিভিন্ন ধরণের বার্তা প্রবাহিত হয় তাও অনেকটা জানা গেছে। কিন্তু গোলমাল বেধেছে সামগ্রিকভাবে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ সমন্বিত হচ্ছে কিভাবে তা নিয়ে। যেমন, আমাদের চেতনা বলতে যা বোঝায়, তা স্নায়ুতন্ত্রের কোন্ বিশেষ অংশ থেকে উদ্ভূত? বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই চেতনার ব্যাপারটা প্রধানত মস্তিষ্কের দক্ষিণ অর্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন কোন স্পষ্ট গঠনগত পার্থক্য চোখে পড়ে না যার উপর ভিত্তি করে এক একটা নির্দিষ্ট ধরণের কাজকে এক একটা অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত করা চলতে পারে। মস্তিষ্কের দক্ষিণ অর্ধেও কোন স্পষ্ট আভ্যন্তরীণ গঠনবৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। ফলে চেতনা বা ঐ ধরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিজ্ঞানীরা বহুসংখ্যক স্নায়ুসমষ্টির সামগ্রিক বা সমষ্টিগত ধর্ম হিসাবে দেখতে চেষ্টা করছেন। সামগ্রিক বা সমষ্টিগত ধর্মের একটা বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন ধর্মের উপস্থিতির জন্যে স্নায়ু-সমষ্টির আভ্যন্তরীণ গঠনবৈচিত্র্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা চলে, স্মৃতিকে (memory) স্নায়ুসমষ্টির এই ধরণের সামগ্রিক ধর্ম হিসাবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চলছে অর্থাৎ মনে করা হচ্ছে এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনও নির্দিষ্ট গঠনসম্বলিত অংশের স্বতন্ত্র ধর্ম নয়।

শরীরের অন্যান্য অংশের মত স্নায়ুতন্ত্রও অসংখ্য কোষের সাহায্যে গঠিত। এই কোষগুলিকে বলা হয় স্নায়ুকোষ (neuron)। স্নায়ুকোষের গঠন শরীরের অন্যান্য কোষের তুলনায় স্বতন্ত্র ধরণের, যার ফলে এর কার্যপ্রণালীও স্বতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত আর কার্যপ্রণালীগত একক (structural and functional unit) হিসেবে স্নায়ুকোষ নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে গবেষণা করছেন। উপরে স্নায়ুসমষ্টির যে ধরণের সামগ্রিক বা সমষ্টিগত ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্নায়ুকোষের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক আর রাসায়নিক বার্তা প্রবাহের বিষয়টা আরও ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্নায়ুকোষের মধ্যে দিয়ে যে উপায়ে এই বৈদ্যুতিক আর রাসায়নিক বার্তা প্রবাহিত হয় তাকেই বলা হয় স্নায়ুতরঙ্গ (neural wave)।

স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুঝিল্লী স্নায়ুকোষে একটা পিণ্ডাকৃতির স্নায়ুমূল (soma) আর তার সঙ্গে সংযুক্ত একটা সরু স্নায়ুসূত্র (axon) থাকে। স্নায়ুসূত্র থেকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে অন্যান্য স্নায়ুকোষের সঙ্গে যুক্ত হয়। আবার স্নায়ুমূলের গায়ে বহু গ্রন্থি দেখা যায় যেখানে অন্যান্য স্নায়ুকোষ থেকে আগত শাখা-প্রশাখার সঙ্গে স্নায়ুমূলের সংযোগ ঘটে। এখন, স্নায়ুকোষের কোন অংশে, ধরা যাক স্নায়ুমূলে, কোন উত্তেজনার (stimulus) সঞ্চার হলে সাধারণত তার ফলস্বরূপ একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ তরঙ্গ আকারে স্নায়ুসূত্র বেয়ে শাখা-প্রশাখাগুলির প্রান্তে সঞ্চালিত হয়। সেখান থেকে তারপর বিশেষ এক ধরণের রাসায়নিক বার্তাবাহক (chemical transmitter) পদার্থের সাহায্যে সংযোজক গ্রন্থির মাধ্যমে উত্তেজনা অন্যান্য স্নায়ুকোষে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সেই সব স্নায়ুকোষে আবার স্নায়ুতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এইভাবে স্নায়ুতরঙ্গের মাধ্যমে শরীরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিভিন্ন ধরণের তথ্য বা বার্তার আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন উঠবে, কি পদ্ধতিতে স্নায়ুমূলের উত্তেজনা তরঙ্গরূপে স্নায়ুসূত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়? বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন, স্নায়ুতরঙ্গের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে প্রধানত স্নায়ুকোষের পর্দা বা ঝিল্লীর কিছু বিচিত্র ধর্মকে চিহ্নিত করা চলে। এই স্নায়ুঝিল্লী (nerve membrane) প্রধানত দুই সারির লিপিড বা স্নেহজাতীয় অণুর সাহায্যে গঠিত। এই দুই স্তরের লিপিড অণুর মধ্যে দিয়ে কোন আধান (charge) যুক্ত কণিকার চলাচল সম্ভব নয়। কিন্তু লিপিড অণুগুলির মধ্যে মধ্যে ইতস্তত কিছু প্রোটিনজাতীয় অণুও রয়েছে। এই

প্রোটিন জাতীয় অণুগুলির উপস্থিতির দরুণ কোন দুজ্ঞেয় কারণে স্নায়ুঝিল্লীতে এক বিশেষ ধরণের বিদ্যুৎপরিবাহিতা ধর্মের আবির্ভাব হয়। সাধারণ অবস্থায়, বাহ্য উত্তেজনার অনুপস্থিতিতে, এই স্নায়ু-ঝিল্লীর দুই পাশে (কোষের ভিতরের দিক আর বাইরের দিক) প্রায় 70 মিলিভোল্ট পরিমাণ বিভব পার্থক্য বজায় থাকে। অর্থাৎ এই ঝিল্লাকে একটা আহিত তড়িৎকোষ (charged electrical cell) হিসাবে কল্পনা করা যায়, যার ঋণাত্মক প্রান্ত থাকে ভিতরের দিকে আর ধনাত্মক প্রান্ত থাকে বাইরের দিকে। এই অবস্থায় স্নায়ুকোষের বাইরের জলীয় মাধ্যমে ভিতরের মাধ্যমের তুলনায় সোডিয়াম আয়নের পরিমাণ থাকে প্রায় সাত গুণ বেশি আর বাইরের তুলনায় ভিতর দিকে পটাশিয়াম আয়নের উপস্থিতি থাকে প্রায় তিরিশ গুণ বেশি। ঝিল্লীর দুই পাশে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম আয়নের পরিমাণের এই পার্থক্যের দরুনই উপরিউক্ত বিভব পার্থক্য বজায় থাকা সম্ভব হয়। স্বভাবতই এই অবস্থায় বাইরের দিক থেকে ভিতর দিকে সোডিয়াম আয়ন প্রবাহিত হতে থাকে, আর ভিতর থেকে বাইরের দিকে প্রবাহিত হয় পটাশিয়াম আয়ন। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবাহের দরুন ঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় কোন তড়িৎ প্রবাহ ধরা পড়ে না। কিন্তু এই দুই ধরনের প্রবাহের ফলে ঝিল্লীর দুই পাশে সোডিয়াম আর পটাশিয়ামের পার্থক্য কমে আসতে থাকে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত বিভব পার্থক্যও কমার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্নায়ুকোষ তার অভ্যন্তরস্থ ATP জাতীয় এক ধরণের রাসায়নিক যৌগ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ক্রমাগত সোডিয়াম আয়নকে বাইরের দিকে আর পটাশিয়াম আয়নকে ভিতর দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে ঐ বিভব পার্থক্য বজায় রাখে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন সক্রিয় প্রবাহ (active transport)। এই হল স্বাভাবিক বা অনুত্তেজিত অবস্থায় স্নায়ুকোষের সাম্য দশার বিবরণ।

বিভব ক্রিয়া ও বিভবচক্র—এবার মনে করা যাক, স্নায়ুকোষের কোন এক জায়গায় স্নায়ু-ঝিল্লীর বাইরের দিকে সামান্য পরিমাণ ঋণাত্মক বিভব আরোপিত হল। একেই উপরে স্নায়ু-কোষের উত্তেজনা নামে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য স্নায়ুকোষের উত্তেজনা চাপ, উত্তাপ ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। কিভাবে এই সব প্রভাব বিভব পার্থক্যে রূপান্তরিত হয় তা ঠিক জানা নেই। সে আলোচনা থাক। আরোপিত ঋণাত্মক বিভব যদি 10 মিলিভোল্ট বা তার কম হয় তা হলে দেখা যায়, উত্তেজনা দ্রুত প্রশমিত হয়ে যায়, আর তা স্নায়ুকোষ বরাবর বেশি দূরে ছড়িয়েও পড়তে পারে না। এই অবস্থায় ঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম আয়নের পরিবাহিতায় কোন চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু যদি আরোপিত বিভব একটা ন্যূনতম মানের (প্রায় 10 মিলিভোল্ট) চেয়ে বেশি হয় তবে মাত্র 2 মিলিসেকেণ্ডের মধ্যে ঐ জায়গায় এক অদ্ভুত ঘটনা-পরম্পরার আবির্ভাব হয়। স্বাভাবিক বা সাম্য দশায় ঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে পটাশিয়াম আয়নের পরিবহন মাত্রা সোডিয়াম আয়নের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। কিন্তু উপরিউক্ত পরিমাণ বিভব আরোপিত হওয়া মাত্র ঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে সোডিয়ামের পরিবহন মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে; ফলে সোডিয়াম আয়ন আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভিতরের দিকে আসতে থাকে; আর তার দরুণ বাইরের তুলনায় ভিতরের দিকের ঋণবিভব আরও কমে যায়। এই সঙ্গে সোডিয়ামের পরিবহনমাত্রা আবার আরও বেড়ে যায়। অর্থাৎ সাম্যদশায় ভিতরের দিকে যে 70 মিলিভোল্ট পরিমাণ ঋণ বিভব ছিল তা চক্রবৃদ্ধি হারে কমতে থাকে। আর মাত্র 1 মিলিসেকেণ্ডের মধ্যে তা প্রায় 100 মিলিভোল্ট কমে গিয়ে ভিতরের দিকে প্রায় 30 মিলিভোল্ট ধনাত্মক বিভবের সৃষ্টি করে। ভিতরের দিকের ঋণবিভবের এইভাবে

দ্রুত ধনবিভবে পর্যবসিত হওয়ার ঘটনাকে বলা হয় বিভব ক্রিয়া (action potential)। স্নায়ুকোষের যে জায়গায় এই বিভব ক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেই জায়গায় বাইরের দিকে সাময়িকভাবে সোডিয়াম আয়নের ঘাটতি হওয়ায় আশেপাশের অঞ্চল থেকে সোডিয়াম আয়ন ছুটে আসতে থাকে; যার ফলে ঐ সব অঞ্চলে আবার বাইরের দিককার ধনবিভব কমতে থাকে, আর এই হ্রাসের পরিমাণ 10 মিলিভোল্ট মাত্রায় পৌছলেই ঐ সব অঞ্চলেও বিভব ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এইভাবে বিভব ক্রিয়া স্নায়ুসূত্র বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। স্নায়ুকোষের যে কোনও জায়গায় বিভব ক্রিয়ার দরুন ভিতরের দিকে যখন প্রায় 50 মিলিভোল্ট ধনবিভব সৃষ্টি হয়, তখন সোডিয়ামের পরিবহন মাত্রা আর বাড়তে পারে না। এরপর অপেক্ষাকৃত শ্লথগতিতে সোডিয়ামের পরিবহনমাত্রা কমতে থাকে আর পটাশিয়ামের পরিবহনমাত্রা বাড়তে থাকে। যার ফলে প্রায় 3 মিলিসেকেণ্ডের মাথায় ভিতর দিকের বিভব কমে আবার প্রায় 70 মিলিভোল্ট ঋণবিভবে এসে দাঁড়ায়। আসলে এই ঋণবিভবের পরিমাণ 70 মিলিভোল্টের কিছু বেশিই হয়ে যায়। এর পর পটাশিয়ামের পরিবহনমাত্রা অতি ধীরে কমে গিয়ে প্রায় 5—10 মিলিসেকেণ্ডের মাথায় বিভবপার্থক্যকে আবার আগেকার অবস্থানে ফিরিয়ে আনে। আশেপাশের অংশে বিভব ক্রিয়া সঞ্চারিত হওয়ার পর সেই সব অংশেও এইভাবে এক একটা পুরো বিভব চক্রের (cycle) আবির্ভাব হয়। স্নায়ুসূত্র বরাবর এই বিভব চক্রের পর্যটনকেই বলা হয় স্নায়ুতরঙ্গ।

স্নায়ুতরঙ্গের এই ব্যাখ্যায় স্নায়ুঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম আয়নের পরিবহনমাত্রার যে পরিবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বিশেষত সোডিয়ামের পরিবহনমাত্রা যে কেন অতিক্রুত প্রায় 600 গুণ বেড়ে যায় তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। অনুমান করা হচ্ছে, এই ঘটনার পিছনে ক্যালসিয়াম আয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। স্নায়ুঝিল্লীর কিছু কিছু জায়গায় কিছু ক্যালসিয়াম আয়ন আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। বিভবক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিটাইলকোলিন (ACH) জাতীয় এক ধরণের রাসায়নিকের প্রভাবে ঐসব আয়ন তাদের বদ্ধ দশা থেকে মুক্তি পায়; আর তার দরুনই বোধ হয় ঝিল্লীর ঐসব অংশের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিক থেকে ভিতর দিকে সোডিয়াম আয়নের প্রবাহ সহজতর হয়।

স্নায়ুতরঙ্গের স্থায়িত্ব—স্নায়ুকোষের মধ্যে দিয়ে স্নায়ুতরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার সময় বলা যেতে পারে, স্নায়ুকোষ একটা পর্যায়ক্রমিক দশায় (cyclic condition) উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ আলোচনা অনুসারে স্নায়ুকোষের দুটি ভিন্ন দশা সম্ভব—সাম্য দশা আর পর্যায়ক্রমিক দশা। প্রথম দশা থেকে দ্বিতীয় দশায় উত্তরণের জন্যে প্রয়োজন স্নায়ুকোষে একটা উত্তেজনার সঞ্চার, যাকে একটা ন্যূনতম মানের চেয়ে বেশি হতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটা দশা কল্পনা করা যাক। স্নায়ুকোষ যখন ঐ দশায় রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই তার উপর সর্বদা বাইরের থেকে নানারকম ছোটখাট বিক্ষেপ বা ব্যাঘাত এসে পড়ছে। কিন্তু এই বিক্ষেপ বা ব্যাঘাতগুলি নিশ্চয়ই স্নায়ুকোষের দশার কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না; কারণ তা যদি হত তবে তো কখনই স্নায়ুকোষকে ঐ দশায় দেখা যেত না। অর্থাৎ এই দুই দশার প্রত্যেকটাই হল শান্ত বা স্থায়ী দশা (stable state)। দুটি ভিন্ন স্থায়ী দশাযুক্ত বস্তু বা বস্তুসমগ্রকে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় 'সুইচ' (switch) নামে অভিহিত করে থাকেন। তাহলে কি স্নায়ুকোষগুলি এক একটা সুইচের মত কাজ করে? বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই সুইচের মত গুণবিশিষ্ট অনেকগুলি স্নায়ুকোষের সংযোগে গঠিত স্নায়ু সমষ্টির (যাকে বলা হয়ে থাকে **neural net**)

সম্ভাব্য সামগ্রিক ধর্মগুলি কি হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তাঁরা দেখতে চাইছিলেন এই ধর্মগুলি মস্তিষ্কের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ কিনা। কিন্তু এই গবেষণার প্রথম দিকে কিছু আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেলেও পরে একটা বড় রকম সমস্যা দেখা গেল। দেখা গেল, সামগ্রিকভাবে এই স্নায়ুসমষ্টির মাত্র দুটি (অথবা পরিবর্তিত ভাষ্যে, মাত্র তিন-চারটি) দশা থাকতে পারে। অর্থাৎ হয় স্নায়ুসমষ্টির অন্তর্গত সব স্নায়ুকোষগুলিই প্রথম (সাম্য) দশায় থাকবে, আর না হয় সবগুলিই দ্বিতীয় (স্নায়ুতরঙ্গবাহী) দশায় থাকবে। স্বভাবতঃই এই পরিস্থিতিতে স্নায়ুসমষ্টির সামগ্রিক ধর্মগুলিকে মস্তিষ্কের ধর্মের সঙ্গে কোন মতেই তুলনীয় বলা যেতে পারে না।

এই সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান সংক্ষেপে আলোচনা করে এই প্রবন্ধ শেষ করা হবে। স্নায়ুকোষকে একটা সুইচের সঙ্গে তুলনা করা কি পুরোপুরি সঠিক? বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, স্নায়ুকোষের দুটি স্থায়ী দশা ছাড়াও অন্তত একটা অস্থায়ী দশা সম্ভব। এই অস্থায়ী দশায় স্নায়ুকোষের মধ্যে দিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত মৃদু স্নায়ুতরঙ্গ প্রবাহিত হয়। তবে সামান্য বিপর্যয় বা ব্যাঘাতেই এই প্রবাহ বিনষ্ট হয়। যদি আলাদাভাবে একটিমাত্র স্নায়ুকোষের কথা কল্পনা করা যায়, তবে বাস্তবে কখনই এই অস্থায়ী দশার পরিচয় পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট স্নায়ুকোষের কথা চিন্তা করা যায়, তবে এই কোষযুগ্মের সম্ভাব্য দশা কি কি হতে পারে? যদি আলাদাভাবে প্রত্যেকটা স্নায়ুকোষের ক্ষেত্রে দুটি মাত্র স্থায়ী দশা থাকে, তবে কোষযুগ্মের ক্ষেত্রেও দুটিমাত্র স্থায়ী দশা পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রত্যেক স্নায়ুকোষে যদি দুটি স্থায়ী দশা ছাড়াও আর একটা অস্থায়ী দশার উপস্থিতি থাকে, তবে কোষযুগ্মের বেলায় দুইয়ের চেয়ে বেশি সংখ্যক স্থায়ী দশা সম্ভব। স্নায়ুকোষের সাম্যদশাকে যদি '1' সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, স্থায়ী তরঙ্গবাহী দশাকে যদি '2', আর অস্থায়ী স্নায়ুতরঙ্গবাহী দশাকে যদি '3', দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তবে কোষযুগ্মের সম্ভাব্য স্থায়ী দশাগুলি হবে, যথাক্রমে—'1, 1' '2 2' আর '2, ' (বা '3, 2')। যদি স্নায়ুকোষের মধ্যে দিয়ে অস্থায়ী স্নায়ুতরঙ্গের প্রবাহ সম্ভব না হত, তাহলে কোষযুগ্মের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র '1, 1' আর '2, 2— এই দুটি স্থায়ী দশাই পাওয়া যেত। সেক্ষেত্রে অনেকগুলি স্নায়ুকোষের সমন্বয়ে গঠিত কোষসমষ্টিও মাত্র দুটিই স্থায়ী দশায় থাকতে পারত। স্নায়ুকোষকে সুইচ হিসাবে কল্পনা করে বিজ্ঞানীরা এই সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু স্নায়ুকোষের 3' চিহ্নিত অস্থায়ী দশার দরুণ কোষযুগ্মের ক্ষেত্রে '2, 3' চিহ্নিত স্থায়ী দশার সম্ভাবনার কথা এসে পড়ছে। '2, 3' চিহ্নের অর্থ হল, কোষযুগ্মের একটা কোষ 2' চিহ্নিত দশায় রয়েছে, আর দ্বিতীয় কোষটা রয়েছে 3 চিহ্নিত দশায়। যদি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় (আপাতত বর্তমান আলোচনার এই অংশ অনুমান নির্ভর) যে, '2, 3' চিহ্নিত দশা কোষযুগ্মের ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী দশা, তবে কোষ সমষ্টির ক্ষেত্রেও দুইয়ের বদলে বহুসংখ্যক স্থায়ী দশার সম্ভাবনাও স্বাভাবিকভাবেই চলে আসবে। অর্থাৎ তখন কোষসমষ্টির সামগ্রিক ধর্মগুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করা যেতে পারে।

স্নায়ুকোষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুটি স্থায়ী আর একটা অস্থায়ী দশা সম্ভব—এটাও পুরোপুরি সত্যি না হতে পারে। অধিকতর শক্তির (energy) সরবরাহ পেলে স্নায়ুকোষে হয়ত আরও নতুন নতুন স্থায়ী আর অস্থায়ী দশার সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা এখন যা ভাবছেন, কার্যপ্রণালীগতভাবে (functionally) স্নায়ুকোষ হয়ত তার চেয়ে আরও অনেক বেশি জটিল। সেক্ষেত্রে কোষসমষ্টিও যে কার্যপ্রণালীগতভাবে বহুতর বিচিত্র ধর্মের অধিকারী হবে এটা কল্পনা করতে খুব একটা কষ্ট হয় না। বিভিন্ন ধরণের সম্ভাব্য স্নায়ুতরঙ্গ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালালে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত হবে আশা করা যায়।

কোষ-সংকরায়ণ—প্রজনন-বিজ্ঞানে সম্ভাবনাপূর্ণ সংযোজন

পার্থদেব ঘোষ* ও মণ্টু দে*

সমসাময়িককালে জীব-বিজ্ঞানের আধুনিকতম সংযোজন কোষ-সংকরায়ণ বা সেল ফিউশন। কৃত্রিম পরিপোষণ মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের সাহায্যে অন্ত ও অন্তর প্রজাতিভুক্ত জীবকোষের মিলন সম্ভব হয়েছে। এই বৈপ্লবিক সাফল্য ও তার সুদূরপ্রসারী সুফল সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

ডি. এন. এ., জেনেটিক কোড, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং—এই শব্দগুলি আজ শুধুমাত্র অণুজীব-বিজ্ঞানী, কোষ-বিজ্ঞানী ও প্রাণরসায়নবিদদের অভিধানে বন্দী নয়। এরা বিগত কয়েক বছর আগেই স্বাধীনতা পেয়ে সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি চলে এসেছে। সাম্প্রতিক-কালে এরকম আরও একটি নতুন শব্দ—কোষ-সংকরায়ন বা সেল ফিউশন (cell fusion) যা একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন দিকের সূচনা করতে চলেছে। সেল ফিউশন শুধুমাত্র দুটি কোষের ফিউশন নয়। মানুষের স্বপ্ন ও বিজ্ঞানের ফিউশন। তাই সেল ফিউশনের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে হাজারদুয়ারী বিজ্ঞানের আরও একটি দ্বার। উন্নত-ধরণের ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রজাতি তৈরির ক্ষেত্রে এতকাল বিজ্ঞানীরা দুটি পরস্পর যৌনক্ষম উদ্ভিদের যৌনকোষ প্রজনন প্রথায় সংযোগের (hybridization through breeding technique) উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। যেহেতু ক্রোমোজোম বংশগতির ধারক ও বাহক, সেজন্যে পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষ দুটির মিলনজাত প্রজাতি দু'জনেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু প্রচলিত নিয়ন্ত্রিত ও নির্বাচিত প্রজনন প্রথায় যৌনকোষ মিলনের কিছু অসুবিধাও দেখা দিল। সে অসুবিধাগুলি হচ্ছে—

(i) বংশগতভাবে সম্পর্কহীন গোত্র বা প্রজাতির মধ্যে যৌন মিলনের অক্ষমতা;

(ii) বিভিন্ন গোত্র বা প্রজাতিভুক্ত কোন জীবের মধ্যে নির্দিষ্ট বংশাণু বা 'জিন' (gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিছু কিছু (যেমন নিফ্' জিন স্থানান্তরিতকরণ) নির্দিষ্ট চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটানো চিরাচরিত প্রজনন প্রথায় সম্ভব নয়;

(iii) সর্বোপরি বিশাল কৃষিভূমি, প্রচুর পরিমাণ বংশগত বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র বীজ (genetically pure) ও দীর্ঘসময়ের প্রয়োজনীয়তা।

কোষ-সংকরায়ন বা বিভিন্ন প্রজাতির জীবকোষের জৈবিক মিলন নিয়ে গবেষণার প্রথম সাফল্যজনক ফলাফল আসে 1960 সালে প্রাণীকোষ সংকরায়ণের মাধ্যমে। ফরাসি বিজ্ঞানী বারস্কী ও তাঁর সতীর্থরা (Barski et al) দুটি ভিন্ন গোত্রীয় প্রাণীকোষের সংকরায়ন করেন। এর পর চমকপ্রদ ফলাফল আসে দু'জন ইংরেজ বিজ্ঞানী হ্যারিস ও ওয়াট-কিনসের (Harris and Watkins) কাছ থেকে। তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রাণীকোষের সংকরায়ন করতেই সক্ষম হয় নি, তাছাড়াও সংকর

* কলা পরিপোষণ ও ক্রোমোজোম গবেষণাকেন্দ্র, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
* সাইটোজেনেটিক্স গবেষণাগার উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কোষটির (hybrid cell) বিভাজনও পর্যবেক্ষণ করেন। এই ধরণের অঙ্গজ কোষের (somatic cell) জৈবিক মিলন তাঁরা ঘটিয়েছিলেন ইঁদুর ও মানুষের দেহকোষের মধ্যে। শুরু হল পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে কোষ-সংকরায়ণের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কল্প-বিজ্ঞান রূপ পেল সার্থকতার মধ্যে। চমকপ্রদ সূচনা বিস্ময়কে স্পর্শ করলো 1975 সালে, প্রকাশিত হল নটিংহামের গবেষকদের লব্ধ ফল। মানুষের রক্ত থেকে সংগৃহীত লোহিত কণিকা কোষ ও ইষ্ট কোষের মিলন। জীব-বিজ্ঞানে মানুষ আর ইষ্ট শুধুমাত্র ভিন্ন গোত্রীয়ই নয়, সৌরজগতে পৃথিবী থেকে প্লুটোর দূরত্ব যত, জীবজগতে এদের অবস্থান কিছুটা সেই রকমই। হেলসিনকিতে গত অগাষ্ট মাসে ক্রোমোজোম আলোচনাচক্রে সুইডিশ বিজ্ঞানী লীমা-ডি-ফারিয়া ও তাঁর সতীর্থরা (Lima-de-Faria et al) সপুষ্পক উদ্ভিদ (Haplopapus gracilis) ও মানুষের দেহকোষ সংকরায়ণের সংবাদও দিয়েছেন

প্রাণীকোষ সংকরায়ণের কাজ যত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে, উদ্ভিদের কোষ-সংকরায়ণ তত দ্রুতগতিতে এগোতে পারছে না। কারণ উদ্ভিদকোষের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় সেলুলোজ নির্মিত নির্জীব কোষ প্রাচীর। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কোষ-সংকরায়ণের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে—কোষপ্রাচীর বাদ দিয়ে প্রচুর পরিমাণ উন্মুক্ত প্রোটোপ্লাস্ট বের করা। পরবর্তী বিশিষ্ট ধাপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(i) বিভিন্ন কোষের পারস্পরিক জৈবিক মিলন (fusion) ও মিলনের পরিসংখ্যান বাড়ানো,

(ii) কেন্দ্রীনের মিলন (nuclear fusion);

(iii) সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক পরিপোষণ মাধ্যমে রেখে সংকর কোষটির কোষপ্রাচীর পুনর্গঠন;

(iv) সংকর কোষটির ক্রমাগত বিভাজন ও বৃদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণ উদ্ভিদ পুনরুৎপাদন।

উদ্ভিদকোষের প্রোটোপ্লাস্ট পৃথকীকরণ করা যায়—বিভিন্ন কোষকে সুনির্দিষ্ট অসমোটিকাম বা প্লাজমোলাইটিকাম (osmoticum or plasmolyticum)-এ রেখে দিয়ে। সাধারণত উপযুক্ত ঘনত্বের অজৈব লবণের দ্রবণ অসমোটিকাম রূপে ব্যবহৃত হয়। অসমোটিকামে রাখার ফলে বহিঃঅভিস্রাবণ (exo-osmosis) মাধ্যমে কোষস্থিত জল বাইরে আসে ও প্রোটোপ্লাজম কোষপ্রাচীর থেকে পৃথক হয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে (plasmolysis)। পরে কোষপ্রাচীর কাটিলে প্রোটোপ্লাস্ট সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইভাবে পৃথক প্রোটোপ্লাস্টের জৈবিক লক্ষণ (viabiliy) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির আবিষ্কারক হলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী ককিং (Cocking)। তিনিই 1960 সালে রাসায়নিক উৎসেচকের সাহায্যে প্রোটোপ্লাস্ট পৃথকীকরণের সার্থক সূচনা করেন। তিনি সেলুলেজ (cellulase) নামক উৎসেচক এক বিশেষ ধরণের ছত্রাক (myrothecium verucaria) থেকে পৃথক করেন এবং টমাটো গাছের মূলাগ্রের কোষের উপর প্রয়োগ করেন। এর পর জাপানী বিজ্ঞানী টেকবিয়ে (Takebe) এই ধরণের উৎসেচক ব্যবহার করে প্রোটোপ্লাষ্ট পৃথকীকরণে কৃতকার্য হন। শুরু হয় উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে প্রোটোপ্লাস্ট পৃথকীকরণ। সাধারণভাবে উৎসেচক দ্বারা পৃথকীকরণে পেক্‌টিনেজ (pectinase) ও সেলুলেজ (cellulase) নামক প্রধান উৎসেচক দুটি পর্যায়ক্রমে কাজ করে কোষপ্রাচীর ক্রমাগত আলগা ও দ্রবীভূত করে এবং যৌথভাবে প্রোটোপ্লাষ্ট পৃথকীকরণে সাহায্য করে। কোষ-সংকরায়ণে প্রোটোপ্লাস্ট পৃথকীকরণ হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধা—প্রতিটি কোষের 'সহজাত স্বউৎপাদন সামর্থ' বা টোটিপোটেনসি (totipotency) অর্থাৎ উদ্ভিদদেহের প্রতিটি কোষই উপযুক্ত কৃত্রিম পরিপোষণ মাধ্যমে সম্পূর্ণ উদ্ভিদ পুনরুৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন, যা

প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। সুতরাং সংগৃহীত প্রোটোপ্লাস্ট উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের পুনরুৎপাদনের (regeneration) (চিত্র) কাজেও ব্যবহৃত হয়। ফলে কৃষিকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক সুবিধার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তা হল —

(i) অল্প সময়ের মধ্যে অধিক চারাগাছ উৎপাদন;

(ii) বীজ সংক্রান্ত সমস্যা এড়িয়ে বংশগতভাবে বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র উদ্ভিদ উৎপাদন;

(iii) ঋতুচক্রিক প্রতিবন্ধকতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি অনিশ্চয়তা অতিক্রম করে সুবিধামত সময়ে চারাগাছ কৃষিক্ষেত্রে স্থানান্তরোপণ (transplantation)।

চিত্র 1. পৃথকীকৃত প্রোটোপ্লাষ্ট থেকে সম্পূর্ণ উদ্ভিদ পুনরুৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়।
2. কোষ-সংকরায়ণের মাধ্যমে সঙ্কর উদ্ভিদ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়।

পৃথকীকৃত প্রোটোপ্লাস্ট থেকে এ পর্যন্ত তামাক,

গাজর ও পিটুনিয়া ইত্যাদি উদ্ভিদের পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

কোষ-সংকরায়ণের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে কেন্দ্রীনের মিলন। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন বংশগতভাবে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পর্কহীন অন্ত বা অন্তর প্রজাতি-ভুক্ত (intra or interspecific) দুটি উদ্ভিদকোষের পারস্পরিক জৈবিক মিলন ও কেন্দ্রীন মিলন সম্ভব হয় যদি সংগৃহীত সজীব প্রোটোপ্লাস্ট উপযুক্ত রাসায়নিক পরিপোষণ মাধ্যমে রাখা যায়। অধ্যাপক ককিং ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কিছু কিছু অজৈব লবণ (উদাহরণ-স্বরূপ—সোডিয়াম নাইট্রেট) ও কিছু পলিমার (যেমন পলিইথেলিন গ্লাইকল) বিশেষভাবে প্রোটোপ্লাস্ট মিলন সহায়ক (fusion inducer)। পরবর্তী পর্যায়ে সংকর প্রোটোপ্লাস্ট পুনরায় কোষ-প্রাচীর গঠন করে এবং অবশেষে সংকর কোষটি ক্রমাগত বিভাজন, বৃদ্ধি ও 'অঙ্গভিন্নতা'র (organ differentiation) দ্বারা একটি নতুন উদ্ভিদ তৈরি করে (চিত্র 2)। সমগ্র পদ্ধতিটি উপযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত আলোক, জীবাণুমুক্ত পরিবেশ ও পর্যায়-ক্রমে কতকগুলি রাসায়নিক পরিপোষণ মাধ্যমে স্থানান্তরিতকরণের দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয়। বলাবহুল্য যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত পুরুষ এবং স্ত্রী জননকোষের (reproductivecell) মিলন ঘটানো সম্ভব হলেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে দুটি বিভিন্ন প্রজাতির দেহকোষের (somatic cell) মধ্যে জৈবিক মিলন ঘটিয়ে সংকর কোষ তৈরি করে তা থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ উৎপন্ন করা খুবই কঠিন—বিশেষ করে প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি কোষের 'সহজাত স্বউৎপাদন সামর্থ্য' না থাকায়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোষ সংকরায়ণ সাফল্যে তামাক, সরিষা, সয়াবিন, গাজর ও পিটুনিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাণীদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে মানুষ ইঁদুর, মানুষ-গিনিপিগ, মানুষ-মুরগী, ও গিনিপিগ-ইঁদুর ইত্যাদির কোষ-সংকরায়ণ ভারতবর্ষে কোষ-সংকরায়ণ বিজ্ঞানে গবেষণাগারগুলির মধ্যে ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্র ও ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অন্যতম।

সফলতা সৃষ্টি করে সম্ভাবনার। কোষ-সংকরায়ণের বিস্ময়কর সাফল্য সৃষ্টি করেছে দিগন্ত বিস্তৃত সম্ভাবনা। সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হল অসীমজাতীয় উদ্ভিদে (non-leguminous plant) নিফ্$^+$ জিনের (nif$^+$ gene) অনুপ্রবেশ ঘটানো। সব উদ্ভিদেরই নাইট্রোজেন একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সাধারণত নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে বর্তমান আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে। কিন্তু এই বিরাট উদ্ভিদ জগতের মধ্যে কিছু শৈবালজাতীয় এবং সীম্বজাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া আর কেউই নাইট্রোজেন সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করতে পারে না। উপরিউক্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় অ্যাজোটোব্যাকটার (Azotobacter) নামক জীবাণু ও উদ্ভিদকোষের পারস্পরিক সাহচর্যের (symbiotic association) জন্যে। এর জন্যে জীবাণুর একটি 'জিন' মূলত কার্যকরী থাকে, যার নাম নিফ$^+$ জিন (nif$^+$ gene)। সুতরাং কোষ-সংকরায়ণ পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি অসীম্বজাতীয় উদ্ভিদ-কোষে বিশেষ করে বিভিন্ন শস্যউদ্ভিদে এই নিফ্$^+$ 'জিন অনুপ্রবেশ করানো যায়, তবে সমস্ত উদ্ভিদও সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন কাজে লাগাতে সক্ষম হবে এবং তখন নাইট্রোজেনঘটিত সার ব্যবহার করার প্রয়োজন অনুভূত হবে না। গাজরের কোষে এই ধরনের নিফ্$^+$ জিন প্রবেশ করাতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন এবং গাজরের কোষগুলি সীম্বজাতীয় উদ্ভিদের মত নিজেরাই পরিমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন কাজে লাগাতে পারছে। ধান, গম এবং অন্যান্য উদ্ভিদেও এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এগিয়ে চলছে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার উদাহরণ হচ্ছে—সব উদ্ভিদে একই ঘনত্বের শর্করা, প্রোটিন বা অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। কিন্তু

বিজ্ঞানীরা কোষ সংকরায়ণ পদ্ধতি অনুসরণ করে আশাপ্রদ ফল পেয়েছেন। ডয় (Doy) 1973 সালে প্রমাণ করেন, টমাটো কোষের জিন বা বংশাণু গ্যালাকটোজ (galactose) তৈরি করতে পারে না অর্থাৎ যখনই কোষগুলি কোন গ্যালাকটোজবিহীন পরিপোষণ মাধ্যমে বৃদ্ধি করানো হয় তখনই কোষগুলি মারা যায়। তখন তিনি জীবাণুর (E. coli) বংশাণু ঐ কোষগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ করালেন এবং দেখলেন কোষগুলি তখন গ্যালাকটোজবিহীন মাধ্যমে সুস্থভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরূপ সম্ভব হয়েছিল অনুপ্রবেশকারী বংশাণুটির কার্যকারিতার ফলে তৈরী গ্যালাকটোজে কোষগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। 1973 সালে জাপানী-বিজ্ঞানী ইয়ামাডা ও নাকামিনামি (Yamada and Nakaminami) কিছু অ্যালকালয়েড (alkaloid) উৎপাদনকারী ভেষজ উদ্ভিদে (medicinal plant) অধিক পরিমাণ অ্যালকালয়েড উৎপাদনপ্রবণতা পরীক্ষাগারে লক্ষ্য করেছেন কোষ-সংকরায়ণ পদ্ধতি অনুসৃত করে।

আগামী দিনের পৃথিবীতে কোষ-সংকরায়ণ বা সেল ফিউশান করে সৃষ্টি করা যাবে নতুন প্রজাতির ; উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যারা হবে উচ্চফলনশীল, অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ অথবা ইচ্ছামত যে কোন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত, যেমন—রোগ প্রতিরোধ, ঔষধিযুক্ত গুণাগুণসম্পন্ন ইত্যাদি। নতুন প্রজাতির প্রাণীকোষ তৈরি করে রোগগ্রস্ত শরীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে ক্যানসার, ডায়াবেটিস প্রভৃতির মত দুরারোগ্য রোগগুলির নিরাময় সম্ভব হবে। সর্বোপরি এই ধরনের গবেষণা ক্রোমোজমের মৌলিক উপাদান, প্রতিটি বংশাণু বা জিনের অবস্থান, মৌলিক চরিত্রাবলী ও শারীরবৃত্তিক কাজকর্মে তাদের ভূমিকা কতখানি—সে সম্পর্কেও নতুন আলোকপাত করবে।

বিজ্ঞানের দরজায় মানুষের হানা চিরদিনের ; অসম্ভবকে সম্ভব করে সম্ভাবনার আলো দেখা তার অদম্য কৌতূহল। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন কোষ সংকরায়ণের মাধ্যমে ডালিয়ার সৌন্দর্যে আরোপিত হবে গোলাপের সুগন্ধ ! আলু-টমাটো সংকর প্রজাতি মাটির উপরে টমাটো আর মাটির নিচে আলু নিয়ে শোভা পাবে ঠিক যেমন মূলা-সরিষা সংকর বহন করবে উপরে সরিষা ও মাটির নিচে মূলা। প্রচলিত প্রথা—নির্বাচিত প্রজনন, (selective breeding), গ্রাফটিং (grafting)—যা অধিক সাফল্য নিয়ে আসতে পারেনি, ভবিষ্যত পৃথিবীতে কোষ-সংকরায়ণ বা সেল ফিউশন সে স্বপ্নকে সার্থক করবে।

জলসম্পদ

শিশিরকুমার নিয়োগী*

জলের প্রয়োজনীয়তা যত—প্রাচুর্য তত নয়। মানবকল্যাণে প্রকৃতির জলসম্পদকে ব্যবহার করতে হবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে। এটিই এই প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়।

পৃথিবীর উপরিভাগে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। এই তিন ভাগ জলের শতকরা 97 ভাগই হল সমুদ্রের। নদী ও হ্রদের জল মিশিয়ে পৃথিবীর মোট জলসম্পদের শতকরা 1 ভাগও নয় (শতকরা 0·017)। পর্বতের চূড়ায় এবং চিরতুষারাবৃত মেরু অঞ্চলের জলের পরিমাণ প্রায় শতকরা 2·14 ভাগ। মাটির নিচে যে জল আছে, তার পরিমাণ প্রায় 40 লক্ষ ঘন কিলোমিটার। পৃথিবীর মাটির নিচে বা হ্রদে সঞ্চিত স্বপেয় জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় 0·00192 অংশ।

পৃথিবীর যেখানে যত জল আর বরফ জমে থাকুক না কেন, তার আসল উৎস ঐ লবণাক্ত মহাসাগর। পৃথিবীতে মোট যে বৃষ্টিপাত হয় তার শতকরা 85 ভাগ সোজাসুজি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। শতকরা 15 ভাগ বৃষ্টি ভূখণ্ডের উপর পড়ে। এই বৃষ্টির জল (মোট জলসম্পদের প্রায় 0·00008 শতাংশ) হ্রদে জমে, নদীতে প্রবাহিত হয় কিম্বা মাটির নিচে গিয়ে জমা হয়।

পৃথিবীর মনুষ্যসমাজের কাছে এই যে বিপুল জলসম্ভার, তাও কিন্তু দুর্লভ। পৃথিবীর শতকরা 30 শতাংশ মানুষ পরিস্রুত বা বিশুদ্ধ নলকূপের জল পান। বাকি 70 শতাংশ ইঁদারা, নদী বা পুকুরের জল পান করেন। আরও মজার ব্যাপার—পৃথিবীতে যেখানে জলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, সেখানেই চরম জলাভাব। আর এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে প্রকৃতি নিজেই জলের অপচয় করছেন উদাসীনভাবে। সমুদ্রের জল লবণাক্ততার জন্যে আর পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফের জল আমাদের কাছে টক আঙুর ফলের মতই নাগালের বাইরে। মাটির নিচে জমে থাকা জল উপরে তুলে আনা খরচসাধ্য। এছাড়াও প্রতিদিন জীবন ও জীবিকার তাগিদে নগর ও কলকারখানা গড়ে তুলে এমন সব কাজ কারবার করা হচ্ছে যে, প্রকৃতির এই জলসম্ভার—তা কলুষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। 1976 সালে হিসাব হয়েছিল, 2000 খৃষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে আমাদের জলের চাহিদা বেড়ে চারগুণ হবে।

জলের বিকল্প নেই। মানুষের জীবনে তো বটেই, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রকৃতি পরিচর্যার বেলাতেও। পেট্রোল, অ্যালকোহল, খনিজ তেল, উদ্ভিজ্জ তেল—সবই জলের মতই তরল; দেখতেও হয়ত অনেকটা একই রকম। কিন্তু কেবলমাত্র রাসায়নিক গুণাগুণের হিসাবে ও সংমিশ্রণই নয়, পদার্থগত গুণেও জল এদের থেকে আলাদা।

প্রকৃতি পরিচর্যার ব্যাপারে জল একটি অপরিহার্য উপাদান। কারণ—

(i) জলের প্রাচুর্য ও আবহাওয়ায় জলের পরিমাণ দিয়ে স্থির হয় সেখানকার প্রাণীজীবনের

* সি. এম. পি. ও., 1, গার্স্টিন প্লেস, কলিকাতা-700 001

সংরক্ষণ ব্যবস্থা। পৃথিবীকে ভৌগোলিক ভাগে ভাগ করা হয়—শৈত্য ও উষ্ণতার বিচারে। এখানে জলের প্রভাব অনেকখানি ;

(ii) শৈত্য-স্থিরতা বজায় থাকে তুষারপাত বা শিলাবৃষ্টির মাধ্যমে ;

(iii) সমুদ্রে বা হ্রদে যেখানে জলের গভীরতা বেশি, সেখানে জল তাপমাত্রা হেরফেরের সঙ্গে সঙ্গে জলতরঙ্গ সৃষ্টি করে জলের তাপমাত্রা সহনসীমার মধ্যে রাখছে। ফলে জলের মধ্যে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা বাঁচছে ;

(iv) জলস্রোতের সঙ্গে এক জায়গার বস্তু অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে সহজে।

(v) বিশাল সমুদ্রেই বিচিত্র জীবনের সমাহার সম্ভব হয়েছে ;

(vi) পৃথিবীর বহু দূষিত জিনিস নিজের মধ্যে ধারণ করে পৃথিবীকে নির্মল রাখছে বিশাল সমুদ্রগুলি ;

(vii) অনেক ক্ষতিকর সূর্যরশ্মিকে শোষণ করে নিয়ে সমুদ্র পৃথিবীর প্রাণীজগতকে বাঁচাচ্ছে ;

(viii) জলশক্তিকে ব্যবহার করা যাচ্ছে নানান কাজে।

জলের এক নাম জীবন। জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা কত তা কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দেখলেই বোঝা যাবে। এক পাউণ্ড গম উৎপাদন করতে প্রায় 60 গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়। ধানের প্রয়োজন হয় 200 থেকে 250 গ্যালন জলের। 1 পাউণ্ড দুধ তৈরি করতে (দুধ অর্থে গুঁড়া দুধ) প্রায় 650 গ্যালন জল প্রয়োজন বিভিন্ন কারিগরী ব্যবস্থাদি দিয়ে। 1 পাউণ্ড মাংস বাড়াতে গরু-মোষকে 2500 থেকে 6000 গ্যালন জল খাওয়াতে হবে। 1 পাউণ্ড ইস্পাত তৈরি করতে প্রায় 10 গ্যালন জল লাগে, 1 পাউণ্ড কাগজ তৈরিতে লাগে প্রায় 30 গ্যালন জল আর একটা অ্যামবাসাডর গাড়ি তৈরি করতে লাগে প্রায় 10,000 গ্যালন জলের।

প্রাণীদের শরীরের মোট ওজনের বেশি শতাংশই জল। জেলী ফিসের শরীরে থাকে প্রায় 95 শতাংশ জল। এই হিসাবে মুরগীতে থাকে 74 শতাংশ, ব্যাঙের ছাতায় 90 শতাংশ, ব্যাঙের 78 শতাংশ, আরশোলায় 61 শতাংশ, গমে 13 শতাংশ, চালে 12 শতাংশ, দুধে 87 শতাংশ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে 65 শতাংশ ও মানুষের শরীরে 70 শতাংশ।

মানুষকে দৈনিক কম করে দেড় গ্যালন জল খেতে হবে শরীরটা সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্যে। সংসারের বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ-প্রতি দৈনিক জলের প্রয়োজন কম করে প্রায় 1 গ্যালন। শহরে এবং বিত্তশালী সমাজে মাথাপিছু জলের ব্যবহার অনেক বেশি। শহরে এবং বিত্তশালী গৃহে মাথাপিছু প্রায় 5 গ্যালন জল দৈনিক লেগে যায় প্রস্রাবখানা ও পায়খানা পরিষ্কার রাখবার জন্যেই।

জল শুধু গড়ে না, ধ্বংসও করে। জলের মাধ্যমেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি রোগ বিস্তারলাভ করে। অনুন্নত দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। এই মৃত্যুর হার 90 শতাংশ কমিয়ে আনা যায় যদি পরিস্রুত ও বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করা যায় এবং বসবাসস্থানের নোংরাগুলিকে যথাযথভাবে জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে দেওয়া যায়। প্রতি বছর জলজ রোগে (যেমন-টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি) প্রায় 1 কোটি লোক মারা যায় পৃথিবীতে। বিলহারজিয়া (Bilharzia) নামে হুকওয়ার্ম ধরনের একটা রোগ শরীরে হতে পারে জলের মাধ্যমেই। এই রোগে ভুগছে পৃথিবীর প্রায় 71টি দেশের প্রায় 20 কোটি মানুষ। জলের মধ্যে জন্ম নেয় ম্যালেরিয়ার বাহন মশা, সেই ম্যালেরিয়া রোগে বছরে ভুগছে প্রায় 10 কোটি মানুষ, তাদের মধ্যে মারা যাচ্ছে প্রায় দশ লাখ। ফাইলেরিয়া রোগের বাহন সেই মশা। এই রোগে প্রতি বছর ভুগছে প্রায় 25 কোটি মানুষ। মশার মাধ্যমে প্রায় 80টি রোগ মানুষের দেহে আসতে পারে; তার মধ্যে 39টি রোগ তো মারাত্মকই।

জল প্রকৃতির দান হলেও সর্বত্র সহজলভ্য নয়।

পরিশুদ্ধ পানীয় জল তাই পৃথিবীর কোথাও বা নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়, আবার কোথাও পাওয়া যায় অতি উচ্চমূল্যে। আর দেশ যতই উন্নত হচ্ছে, দেশে যত শিল্প, নগর ও কৃষিকার্যের প্রসার ঘটছে, জলের চাহিদাও বাড়ছে তত হু হু করে। তার উপর জলের বিকল্প কিছুই নেই। তাই যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জলের ব্যবহার করা উচিত।

বিশিষ্ট ইন্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী ডঃ কে এল রাও হিসাব করেছেন, ভারতবর্ষে 2000 খৃষ্টাব্দে কৃষিকর্মে, জীবজন্তু পালনে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, শিল্পে ও পানীয় জল হিসাবে মোট প্রায় 1,09,200 কোটি ঘন মিটার জল লাগবে। ভারতে বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 3,00,000 কোটি ঘন মিটার। এর $\frac{1}{3}$ ভাগ জল কোন না কোন উপায়ে সংগ্রহ করা যায়। এ ছাড়া আছে প্রায় 300,00 কোটি ঘন মিটার ভূগর্ভস্থ জল। তাই এই দুটি মিলিয়ে মোট 1,300,00 কোটি ঘন মিটার যে জল হচ্ছে সেটা 2000 খৃষ্টাব্দে 1,09,200 কোটি ঘন মিটার জলের চাহিদা মেটাতে পারে। অবশ্য এটা নির্ভর করবে জল সংগ্রহের ব্যবস্থার উপর।

মাটির নিচের সঞ্চিত জল নলকূপের সাহায্যে তুলে নিলে মাটির নিচের জলস্তর বা জলতল নেবে গিয়ে প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে ভূগর্ভস্থ জল বৃষ্টির জল ছাড়া আর কিছু নয়। বৃষ্টির জলই ভূমধ্যস্থ ফাটল ও বালুস্তরের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলস্তরে গিয়ে জমা হয়। যদি নলকূপের সাহায্যে কোথাও থেকে জল তুলেও নেওয়া হয়, বৃষ্টির জলে সেটা পূরণ হয়ে যেতে পারে। আর এই পূরণ যদি নিয়মিত হয়, তবে জলতল নেবে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। সমুদ্র উপকূলে অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের স্তর থেকে খুব বেশি পরিমাণে জল তুলে নিলে সমুদ্রের লোনা জল সেই জলস্তরে ঢুকে পড়তে পারে এবং ভূগর্ভস্থ মিষ্টিজলকে নষ্ট করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে খুব সাবধানতার সঙ্গে জলের ব্যবস্থা সীমিত করতে হবে যাতে লোনা জল জলস্তরে ঢুকবার সুযোগ না পায়।

চাহিদার তুলনায় প্রকৃতির সীমিত ভাণ্ডারে জলের পরিমাণ কম। সবার চাহিদা মেটাতে প্রকৃতির যে অক্ষমতা, তা নানান কারণেই। প্রকৃতির যে জল তা সরাসরি সব কাজে ব্যবহার করা যায় না, বিশুদ্ধ করে নিতে হয় নানান প্রক্রিয়ায়। এগুলি সবই ব্যয়সাপেক্ষ। আর প্রকৃতির যে বিশালতম জলসম্পদ সমুদ্র—সে জলের লবণাক্ততা এতই বেশি যে ঐ লবণাক্ততা দূর করার মত কোন সহজ পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। ভবিষ্যতে হয়ত সমুদ্রের জল নাগালের মধ্যে আসতে পারে। মানুষের জীবনে খাদ্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তাই খাদ্যোৎপাদনের জন্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জল চাই। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের জন্যে জলের যে প্রয়োজন তাকে ছোট করে যেন দেখা না হয়। সব মিলিয়ে জল নিয়ে এই যে টানাটানি—এটা কেবল আন্তর্জাতিক সমস্যাই নয়, এটা নিতান্ত পারিবারিক সমস্যাও বটে।

জলসমস্যার দুটি প্রধান দিক। প্রথম সমস্যা হল 'পরিমাণের'। যে ভাবেই হোক নতুন নতুন জলসম্ভার সৃষ্টি করে, নতুন নতুন প্রক্রিয়ায় অবিশুদ্ধ জলকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলে, একই জলকে বারবার ব্যবহার করবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, জলের পরিমাণ সমস্যা মেটাতে হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হল 'গুণগত'। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি থাকা সত্ত্বেও তার লবণাক্ততা তার সব গুণকে নাশ করেছে ; তেমনি কোন নদী বা পুকুরের জলে যদি কোন মারাত্মক ধরণের রোগজীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় তবে সে জল একেবারেই পরিত্যাজ্য। সুতরাং জলের গুণমান যাতে বজায় থাকে তার দিকে নজর রাখতেই হবে, আর কেবল নজর রাখা নয় ব্যবস্থা করতে হবে।

জলসম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করবার সময়ে

গোটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনাগুলিকে একসঙ্গে ভাবতে হবে। একে বলে পরিকল্পনা রূপায়ণে জটিলীকরণ (complexification of planning process)। আগের দিনে পরিকল্পনা-গুলি ছিল গোষ্ঠীগত। কোন শহরে একটা কলেজ তৈরি হবে, কমিটি তৈরি হল, তাঁরা কলেজের কথাই ভাবলেন, তার জন্যে একটা জায়গা বাছলেন, কনট্রাকটর নিয়োগ করে বাড়ি তৈরি সুরু করলেন। কিন্তু সেই কলেজটা চালনার জন্যে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, যানবাহন, বাজার, জলসরবরাহ, জলনিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁরা ভাবছেন তাঁদেরকে গণ্যই করলেন না। ফলে কলেজের বাড়ি তৈরি হবার পর পরে রইল বছরের পর বছর বিদ্যুতের জন্যে, জলের জন্যে, গ্যাসের জন্যে, রাস্তাঘাটের জন্যে।

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জল ব্যাপারটা সব সময়েই অগ্রাধিকার পায়। এটা নিয়ে আগে না ভাবলে পরে পস্তাতে হয়। যেমন পস্তাতে হয়েছিল মোগল সম্রাটদের। ফতেপুর সিক্রিকে রাজধানী করা গেলনা জলের অভাবে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তৈরি প্রাসাদ ও শহরকে পরিত্যাগ করতে হল। বর্তমানে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ফারাক্কা থেকে কতটা জল পাওয়া যাবে তার উপর। দুর্গাপুর, আসানসোলের অগ্রগতি নির্ভর করছে—সেখানে বাড়তি জলের যোগান দিতে পারা যাবে কিনা তার উপর। জলের ব্যবস্থা না করতে পারলে সব সুখ-পরিকল্পনার শেষ।

তাই আজ কথা উঠেছে—স্থান ও কালের ভিত্তিতে 'জল জ্যামিতি' তৈরি করতে হবে। এটাই হবে সব পরিকল্পনার মেরুদণ্ড। এটার উপর নির্ভর করবে কোন্ অঞ্চলকে কতটা সমৃদ্ধ করে তোলা যাবে। ঠিক হবে কোথায় গড়ে উঠবে শহর, জনপদ। কোথায় হবে শিল্প উপনিবেশ, কোথায় জন্মাবে খাদ্য, কোন্ অঞ্চল পড়ে থাকবে অরণ্য সম্পদের জন্যে। পুরুলিয়ায় জনবিরল, বর্তমানে জলহীন অঞ্চলে, যদি জোর করে সব কিছু করতে হয়, সেটা যেমন বোকামি হবে, তেমনই যদি ঐ অঞ্চলে অতীতে কিছু হয় নি এই ভেবে কিছু না করার পরিকল্পনা করা যায়। চাষবাসের চাহিদার বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অনেক নতুন নতুন অঞ্চলকে জলসরবরাহ এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হচ্ছে। ফলে পুরনো দিনের মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মানচিত্র বদলাচ্ছে অন্য কারণেও। আগে যখন দেশে এত নগর গড়ে ওঠে নি বা শিল্প চালু হয় নি, তখন গঙ্গা নদীর মত ভারতের সমস্ত নদীর জল ছিল পবিত্র। কিন্তু আজ সে পবিত্রতা নদীর দেহে আর নেই, যেটুকু আছে—মানুষের মনে। কিন্তু এটাও বা থাকবে কয়দিন। একদিন যদি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন, গঙ্গার জলে স্নান করলে চর্মরোগ তো হতেই পারে, তাছাড়াও কলেরা, টাইফয়েডের মত রোগ হবার সম্ভাবনাও প্রবল, তখন কিন্তু পবিত্র গঙ্গাকে ত্যাগ করতে সময় লাগবে না। স্থান ও কালের ভিত্তিতে সারা দেশের নদীগুলির অপবিত্রতা বা কলুষতার একটা মানচিত্র তৈরি করতে হবে। এটা তৈরি করতে পারলেই এবং এই কলুষতার একটা ধারণা থাকলেই তার প্রতিবিধানের কথা চিন্তা করতে বা পরিকল্পনা করতে পারা যাবে। একটি অঞ্চলের উন্নয়নের ব্যাপারে জলসমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সঙ্গে আছে অন্যান্য বহু সমস্যা।

নদীতে প্রচুর জল থাকলেই বা জলাধারে প্রচুর জলের সম্ভাবনা থাকলেই ইচ্ছামত সে জল চাষের কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। এখন চাষ করবার জন্যে দরকার বহু রাসায়নিক দ্রব্যের, যেমন—সার আর কীটনাশক ওষুধের। চাষের জমির উপর দিয়ে যখন বাড়তি জল বয়ে গিয়ে আবার নদীতে বা পুকুরে জমে, তখন সেই জলের মধ্যে মাটির লবণাক্ততা মিশে যায়, রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ ঘটে। ফলে সেই জল, নদীর আর পুকুরের জলকে দূষিত করতেই পারে। শিল্পে এ সমস্যা তো আরও বেশি।

এমন কোন শিল্প নেই যার থেকে উদ্ভূত নোংরা জল ক্ষতিকারক নয়। আর শহরবাসীর ও জনপদের কথা তো আছেই, যে জল মানুষের ব্যবহার করবার জন্যে নেওয়া হয়, তার শতকরা প্রায় 80 ভাগ জলই নর্দমায় ফেলে দেওয় হয় ব্যবহার করে। এই জল নদীতে গিয়েই পড়ছে নোংরা জল হিসেবে। সুতরাং জল থাকলেই যে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে এটা ঠিক নয়। জলকে ব্যবহার করবার পর নোংরা জলকে কোথায় কেমন ভাবে ফেলা হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা সমস্যা। সমস্যাটা কত ব্যাপক ও গুরুতর তা বোঝাবার জন্যে আমেরিকার কথা বলা যাক। সেখানে 'পরিবেশ কলুষতা নিবারণী' নামে একটা দপ্তর গঠিত হয়েছে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। তাঁরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। 1977 জুলাই মাসের মধ্যে তাঁরা তাঁদের নদী-নালা, হ্রদ ও সমুদ্রগুলিকে 'নো পলিউশন' অর্থাৎ 'নোংরাবিহীন' অবস্থায় আনবেন। এটা করবার জন্যে শিল্পগুলিকে বহু সাহায্য দেয়া হচ্ছে। আর জনপদ ও নগরগুলির তত্ত্বাবধায়কদের বলা হচ্ছে—নোংরা জল শোধন করতে যথাবিহিত উপায়ে। তার জন্যে যে খরচ হবে তার শতকরা 75 ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান হিসেবে দেবেন, আর বাকি 25 ভাগ ধার দেবেন ভবিষ্যতে শোধ করার জন্যে। এত সব করেও ওরা দেখছেন যে 'নো পলিউশন' তো নয়ই, শতকরা 30 ভাগ 'পলিউশন' ঐ তারিখ অর্থাৎ জুলাই 1977-এর মধ্যে কমাতে পারলে যথেষ্ট করেছেন! সমস্যাটা সব সময়ে টাকার নয়, অনেক সময় সামাজিক বা রাজনৈতিক। তাই বলা হচ্ছে এটা একটা জটিল সমস্যা, আর তার সমাধান জটিলীকরণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব।

পুরনো পদ্ধতি ছাড়াও নতুন নতুন পদ্ধতিতে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। ইজরাইল এদিক দিয়ে প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে গেছে। দেশের প্রায় 95 শতাংশ জলের ব্যবহার করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা শতকরা 100 ভাগ জলকেই ব্যবহার করতে পারবেন বলে ভাবছেন। অপ্রচলিত জলসম্পদের মধ্যে রয়েছে গ্রাম, শহর আর শিল্প-উদ্ভূত নোংরা জল। বর্তমানে ইজরাইলে মোট জলের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ শহরগুলির মধ্যে। এই জলের শতকরা প্রায় 30 ভাগ জলই শহরের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে বয়ে গিয়ে খালেবিলে চলে যায়। এই জলের খানিকটা বা হয় করা যাবে চাষবাসের কাজে অল্প শোধন করেই, আর বাকি অর্ধেকটা পরিপূর্ণ শোধন করে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা চলবে শহরেই। এটা করতে পারলে জলের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে সমুদ্রের জল বহু খরচ করে লবণমুক্ত করবার প্রয়োজনটা কমবে। সমুদ্রের জল ব্যবহার করবার একটা পরিকল্পনা ইজরাইলের বরাবরই আছে। এছাড়াও ইজরাইল ভবিষ্যতে এমন সব শস্যের চাষ করবে যাতে জলের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃতভাবে কম হবে। ঐ পরিকল্পনার কাজ হল—সূর্যের তাপে জল যাতে বাষ্প হয়ে উবে না যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করবে, গাছপালার গোড়ায় জল পৌঁছে দেবার যন্ত্রপাতি বের করবে। এছাড়াও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ও কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করার ব্যাপারেও পরীক্ষা চলছে কি করে এগুলিকে নির্বিষ করা যায় মানুষের কাছে। এছাড়াও রয়েছে গভীর জলস্তরের সন্ধান। আর তাঁদের মত হল যে সব দেশে পর্বতশিখরে তুষার জমছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, সেখানে তুষারের ব্যবহারও প্রয়োজন। ডিনামাইট ফাটিয়ে কোটি কোটি গ্যালন জল পাওয়া অসম্ভব নয়। আর এই তুষার আবার জমে যাবে সারা বছরের মধ্যেই।

জল এবং খাদ্যদ্রব্য এ দুটির প্রয়োজন সবারই। আর এই প্রয়োজনের পরিমাণ এত বেশি যে, এই সব ব্যাপারে কেবলমাত্র সেই ধরনের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নই গ্রহণ করা সম্ভব, যাতে উৎপাদনের খরচ কমানো যায়। আর জলের ব্যাপারে সমস্যাটা আরও জটিল ঐ কারণে যে, জল জিনিসটা সরকারকে

দেশের দরিদ্রতম মানুষের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে; প্রয়োজন হলে বিনামূল্যেও। আমেরিকার মত বিত্তশালী দেশেও প্রতি শহরে ও গ্রামে বহু মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে জল দিতে হয়। তাই দেশের স্বার্থে, প্রতিটি মানুষের স্বার্থে জলসম্পদ নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

ভারতে অন্তর্বিবাহ

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

অন্তর্বিবাহ কি, ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্বিবাহ কিরূপ এবং অন্তর্বিবাহের ফলাফল প্রভৃতি বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে।

কোন পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর পূর্বপুরুষ যদি একই ব্যক্তি হন, তাহলে তাদের বিবাহকে অন্তর্বিবাহ অথবা আত্মীয়বিবাহ বলে। মামা-ভাগ্নী, কাকা-ভাইঝি এবং খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো, মামাতো, মাসতুতো ও পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ অন্তর্বিবাহের পর্যায়ে পড়ে। এই ধরণের বিবাহে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে রক্তের সম্পর্ক দেখা যায়, কারণ উভয়ে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু যেক্ষেত্রে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, সেক্ষেত্রে তাদের বিবাহকে অনাত্মীয় বিবাহ বলে গণ্য করা হয়।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ে যে অন্তর্বিবাহ প্রচলিত, তার প্রধান কারণ পণপ্রথা। মেয়েকে সমান অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ দিতে হলে প্রচুর টাকার পণ দিতে হয়। কিন্তু কোন আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে যদি মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায়, তাহলে পণের কড়াকড়ি অতটা থাকে না।

অন্ধ্র, কেরালা, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অন্তর্বিবাহের প্রকৃতি ও হারের কিছু তথ্য জানা থাকলেও ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে এ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা নেই। 1961 সালে লোকগণনার সময় ভারত সরকার সারা দেশে 587টি গ্রামে অন্তর্বিবাহের এক সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষার 330টি গ্রামের প্রাথমিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও উপজাতিদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের প্রকৃতি ও হার সম্বন্ধে আলোকপাত করা যেতে পারে।

অন্তর্বিবাহ দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের মধ্যে যেরকম প্রচলিত, উত্তর ভারতে সেরকম নয়। কিন্তু সারা দেশে মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়। খৃষ্টানদের মধ্যে আত্মীয়-বিবাহ সাধারণত কমই হয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের উপজাতিদের অন্তর্বিবাহের হার বেশি।

হিন্দু ও মুসলমানদের অন্তর্বিবাহের প্রকৃতি ভিন্ন। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের মধ্যে মামা-ভাগ্নী এবং মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ প্রচলন আছে;

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-700 009

পিসতুতো বোন অপেক্ষা মামাতো বোনকে বিবাহ করার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের বিবাহ সং মামাতো ও পিসতুতো বোনের সঙ্গেও হয়ে থাকে। ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের মামা-ভাগ্নী বিবাহ নিষিদ্ধ। তারা মামাতো ও পিসতুতো বোন ছাড়াও জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো ও মাসতুতো বোনকে বিবাহ করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে উপজাতিদের অন্তর্বিবাহের প্রকৃতি হিন্দুদের মত।

অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরীতে হিন্দুদের অন্তর্বিবাহের হার 28 থেকে 35 শতাংশ। এর মধ্যে মামা-ভাগ্নীর এবং মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের বিবাহের হার যথাক্রমে 4 থেকে 11 শতাংশ এবং 19 থেকে 31 শতাংশ। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও কেরালার অন্তর্বিবাহের হার 11 থেকে 16 শতাংশ; কিন্তু উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে মাত্র 3-4 শতাংশ। এই সব প্রদেশে মামা-ভাগ্নীর বিবাহ দেখা যায় না; বেশির ভাগ অন্তর্বিবাহ ঘটে মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের সঙ্গে। জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাতে হিন্দুদের আত্মীয়-বিবাহ একেবারে হয় না বললেই চলে।

অন্ধ্র, রাজস্থান, গুজরাট ও তামিলনাড়ুতে মুসলমানদের অন্তর্বিবাহের হার যথাক্রমে 46, 43, 40 ও 34 শতাংশ। এই সব প্রদেশে মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন ছাড়া জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো ও মাসতুতো ভাইবোনের সঙ্গে বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। কর্ণাটক, জম্মু-কাশ্মীর এবং কেরালাতে অন্তর্বিবাহের হার 7 থেকে 28 শতাংশ, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে মাত্র 5 থেকে 15 শতাংশ। মহারাষ্ট্রের ভীল, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশের গণ্ড, উড়িষ্যার কন্ধ এবং তামিলনাড়ুর ইরুলা উপজাতিদের অন্তর্বিবাহের হার যথাক্রমে 73, 60, 43, 52 এবং 39 শতাংশ। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহই দেখা যায়।

শিক্ষিতের হার বেশি হওয়ায় কেরালার হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদের অন্তর্বিবাহের হার তার প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক থেকে অনেক কম। খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিদের অন্তর্বিবাহের হার দক্ষিণ ভারতের উপজাতিদের তুলনায় নগণ্য।

অন্তর্বিবাহের ফলে পূর্বপুরুষের কোন বৈশিষ্ট্যের জিন (gene) মাতা-পিতার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে সন্তানে একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা কিরূপ, তা অন্তর্মিলনের মাত্রার (inbreeding coefficient) সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। মামা-ভাগ্নীর বিবাহে সন্তানের অন্তর্মিলনের মাত্রা $\frac{1}{8}$, মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো, খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাইবোনের বিবাহে $\frac{1}{16}$ এবং অনাত্মীয় বিবাহে 0. কোন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ধরণের অন্তর্বিবাহের অনুপাত জানা থাকলে, তার অন্তর্মিলনের গড়মাত্রা (mean inbreeding coefficient) নির্ণয় করা সম্ভব। যদি কোন সম্প্রদায়ে মামা-ভাগ্নী এবং মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের বিবাহ যথাক্রমে 5 ও 20 শতাংশ হয় এবং বাকি 75 শতাংশ বিবাহ অনাত্মীয়ের মধ্যে ঘটে, তাহলে সম্প্রদায়ের অন্তর্মিলনের গড়মাত্রা হবে $0{\cdot}05\times\frac{1}{8}+0{\cdot}20\times\frac{1}{16}+0{\cdot}75\times 0=0{\cdot}019$. যদি সম্প্রদায়ের প্রতিটি বিবাহ জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাইবোনের সঙ্গে ঘটে, তাহলে সম্প্রদায়ের অন্তর্মিলনের গড়মাত্রা হবে $\frac{1}{16}$ অর্থাৎ 0·0625.

অন্ধ্রপ্রদেশে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও উপজাতিদের অন্তর্মিলনের গড়মাত্রা যথাক্রমে 0·024, 0·030, 0·013 ও 0·034 এবং কেরালায় তা যথাক্রমে 0·008, 0·011, 0·0005 ও 0·040. অন্তর্বিবাহের হার বাড়লেই অন্তর্মিলনের মাত্রা যে বাড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তামিলনাড়ুর হিন্দু ও মুসলমানদের অন্তর্বিবাহের হার যথাক্রমে 32 ও 35 শতাংশ, কিন্তু তাদের অন্তর্মিলনের গড়মাত্রা যথাক্রমে 0·024 ও 0·021. মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের অন্তর্মিলনের গড়মাত্রার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ

প্রথমোক্তদের মামা-ভাগ্নীর বিবাহের হার প্রায় শূন্য কিন্তু শেষোক্তদের ক্ষেত্রে এর হার 7 শতাংশ।

যেসব বংশগত রোগ ও বৈশিষ্ট্য খুবই বিরল, তা অন্তর্বিবাহের ফলে উত্তরপুরুষের মধ্যে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কোন সম্প্রদায়ে অন্তর্মিলনের গড়মাত্রা বৃদ্ধি হলে অ্যালবিনো ও ফেনিলকেটোনুরিয়া প্রভৃতি বংশগত রোগের আধিক্য দেখা যায়। অনাত্মীয়-বিবাহ অপেক্ষা আত্মীয়-বিবাহে জন্মপঙ্গু অথবা জন্ম-বিকলাঙ্গ সন্তান হওয়ার হার সাধারণত একটু বেশি দেখা যায়। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আত্মীয় ও অনাত্মীয় বিবাহে জন্ম-বিকলাঙ্গ সন্তান হওয়ার হার যথাক্রমে 1.73 ও 1.37 শতাংশ। ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ হসপিট্যালের শিশু চিকিৎসক ডক্টর জোসুয়া 103টি মস্তিষ্ক বিকৃতিসম্পন্ন শিশুদের পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাদের মাতাপিতার 7 শতাংশ আত্মীয়-বিবাহে আবদ্ধ। এই সব কারণে প্রজননতত্ত্ববিদেরা কোন ব্যক্তিকে অন্তর্বিবাহে উৎসাহিত করেন না।

দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি অঞ্চল, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও উড়িষ্যার উপজাতিদের মধ্যে দুরারোগ্য বংশগত ব্যাধি সিকল্-সেল অ্যানিমিয়ার **(sickle-cell anaemia)** প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই সব উপজাতিদের মধ্যে কমবেশি মাত্রায় অন্তর্বিবাহ প্রচলিত। যদি তাদের আত্মীয়-বিবাহ নিবারণ করা সম্ভবপর হয়, তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য ও C সালোকসংশ্লেষ

দিবাকর মুখোপাধ্যায়*

বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে গাছপালা বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে পত্রাভ্যন্তরে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ একপ্রকার বিজারণ পদ্ধতি। বিজারণের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার আবিষ্কার করেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেলভিন কালভিন, এ. এ. বেনসন এবং তাঁদের সহযোগীরা (1946—1953)। এই সব জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংযুক্ত করার পর সম্পূর্ণ চক্রের নাম দেওয়া হয় 'কালভিন চক্র'। এটি 'কালভিন-বেনসন চক্র' অথবা 'সালোকসংশ্লেষ-জনিত কার্বন বিজারণ চক্র' নামেও খ্যাত। সুতরাং সবুজ উদ্ভিদের কার্বন সংশ্লেষণের একটি অন্যতম পদ্ধতি হল কালভিন চক্র।

কালভিন চক্রে রিবুলোস—1, 5—ডাইফসফেট (RuDP) সর্বপ্রথম কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই পদার্থে কার্বনের সংখ্যা তিন। যে সকল উদ্ভিদে এই বিধি দ্বারা কার্বন আত্তীকরণ হয়, তাদের C_3 প্রজাতি বা C_3 উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

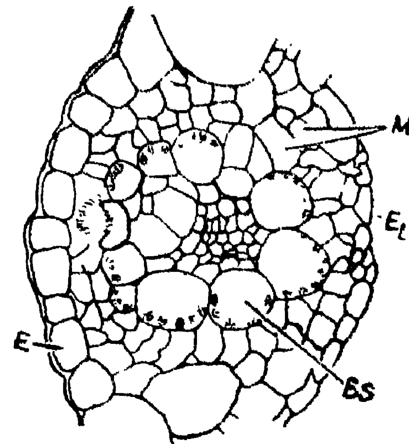
সাম্প্রতিককালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কিছু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে (যেমন—আখ, ভুট্টা, প্রভৃতি) এক নতুন ধরণের জৈবিক প্রক্রিয়ার হদিস পাওয়া গিয়েছে। এই সব উদ্ভিদের সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইডের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। এরা অন্যান্য C_3 প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ

* বনস্পতি বিজ্ঞান বিভাগ, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্র-132 119

করতে এবং পরে শর্করা প্রভৃতি পদার্থে পরিণত করতে সক্ষম। যখন তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং আলোর সম্মুখে ঐসব গাছপালাকে অনাবৃত করা হয়, তখন প্রথম স্থায়ী পদার্থরূপে ম্যালিক অ্যাসিড, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড অথবা অকজ্যালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। এদের সকলেরই কার্বন সংখ্যা চার। যে-সকল উদ্ভিদে কার্বন ডাই-অক্সাইড স্থিরীকরণ অধিকাংশ মাত্রায় এই পদ্ধতিতে হয়—তাদের C_4 প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি 'হ্যাব ও স্ল্যাক পাথওয়ে' নামেও খ্যাত। এই সব C_4 জাতি ও প্রজাতি বিভিন্ন বংশোদ্ভূত এবং উদ্ভিদ জগতের নিম্নলিখিত বংশে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে। যথা, গ্র্যামিনি, সাইপ্রেসী, অ্যামারেনটেসী, বিনোপোডিয়েসী, পোর্টুলাকেসী, ইউফরবিয়েসী, নিক্টাগাইনেসী, এজোয়েসী, জাইগোফিলেসী প্রভৃতি।

পাতার অন্তর্গঠন ও দু-রকমের সবুজকণা—C_4 উদ্ভিদের পাতার অন্তর্গঠন খুবই বৈচিত্র্যময়। সংগঠক কোষগুলির চারধারে সবুজকণা যুক্ত কোষের দুটি সমকেন্দ্রীয় স্তর মালার মত সুসজ্জিত (চিত্র 1)। এই মালার মত সাজানো স্তর ও মিজোফিল স্তরের মধ্যে কোষের দেয়ালে সুবেরিনের এক ঘন আস্তরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব উদ্ভিদে সবুজকণার বৈশিষ্ট্য হল তাদের সুনির্দিষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ পদ্ধতি। সবুজকণার আন্তরিক গঠনও বৈচিত্র্যময় এবং দু-রকমের সবুজ-কণা অনায়াসে সনাক্ত করা যায় (ক্লোরোপ্লাস্ট ডাইমরফিস্‌ম)। এই বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করার পূর্বে সবুজকণার কাঠামো সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

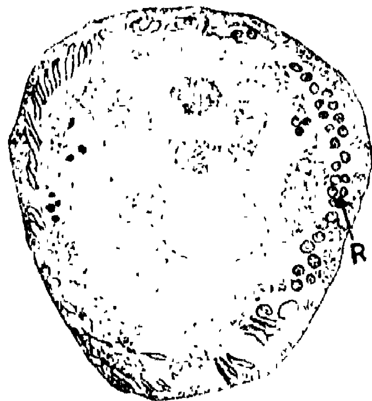
ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক সবুজকণা একটি ঝিল্লী দ্বারা বেষ্টিত। এর ভিতরে অসংখ্য লামেলী দেখতে পাওয়া যায়—অপেক্ষাকৃত কম অস্বচ্ছ স্ট্রোমার মধ্যে ইলেকট্রন অস্বচ্ছ গ্র্যানা। ছোট-ছোট আকৃতির থলের সমান অসংখ্য ল্যামেলী সমান্তরালভাবে একের পরে এক কেকের মত জমা হয়ে যা তৈরি করে তাকে বলা



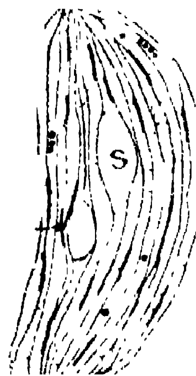
চিত্র 1 আখ গাছের পাতার অনুপ্রস্থ কাটের একাংশ। উপরের বহিস্তকের কোষ (upper epidermis, E), মিজোফিল স্তর (M), সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তর (bundle sheath layer, BS), নিম্ন বহিস্তক (lower epidermis, El) (লেট্‌চ 1971 অনুসরণে)।

হয় গ্র্যানা। এই অবিচ্ছিন্ন ঝিল্লীকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়—মেমব্রেন যা গ্র্যানার মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের বলা হয় গ্রানাল্যামেলি বা ক্ষুদ্র থাইলাকয়েড। আর ঐ সকল মেমব্রেন যা বিভিন্ন গ্র্যানাল্যামেলীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাদের বলা হয় স্টোমা ল্যামেলী বা দীর্ঘ থাইলাকয়েড। C_4 উদ্ভিদে সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরে শ্বেতসার (স্টার্চ) সংগ্রহ করার সবুজকণা দেখতে পাওয়া যায় যার গঠন মিজোফিলের সবুজকণা থেকে ভিন্ন। উদাহরণ-স্বরূপ ফ্লোয়েলিকিয়া গ্র্যাসিলিস (চিত্র 2)। ঐ চিত্রে সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরের সবুজকণায় গ্র্যানা অনুপস্থিত কিন্তু মিজোফিল কোষে সাধারণ গ্র্যানার উপস্থিতি দ্রষ্টব্য। সবুজকণার অন্তর্গঠন বৈচিত্র্যে এই তারতম্যই 'ক্লোরোপ্লাসট ডাইমরফিস্‌ম' নামে অভিহিত হয়েছে। অবশ্য এই গঠন-বৈচিত্র্য সকল C_4 উদ্ভিদে একই রকম নয়। থাইলাকয়েডের সংখ্যা এবং গ্র্যানার

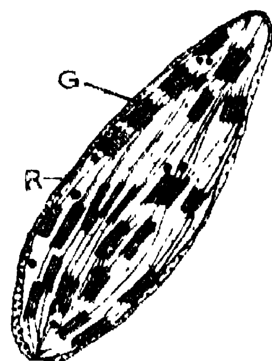
মধ্যে কতখানি আঁটসাটভাবে তারা বিদ্যমান—অনেক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই এ দুটি ব্যাপারে সাদৃশ্য খুঁজে



(i)



(ii)



(iii)

চিত্র 2 (i) পোরটুলাকা ওলিরেসিয়া—মিজোফিল কোষের সবুজকণায় 'পেরিফেরাল রেটিকুলাস' (R) (লেট্‌চ 1971 অনুসরণে)।

(ii) সংগঠক কোষের বেষ্টিত স্তরের সবুজ-কণায় শ্বেতসার কণিকা (S এবং থাইলাকয়েড (T) (ক্লোয়েলিকিয়া গ্র্যাসিলিস)।

(ii) ক্লোয়েলিকিয়া গ্র্যাসিলিস—মিজোফিল কোষের সবুজকণায় সাধারণ গ্র্যানা (G) এবং পূর্ণ বর্ধিত 'পেরিফেরাল রেটিকুলাম' (R)।

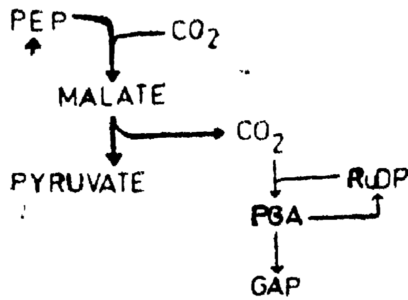
পাওয়া যায় না। আখ গাছের পাতায় সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরের মধ্যে গ্র্যানার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মিজোফিল কোষে তারা খুব ভালভাবে বেড়ে উঠে।

মুহলেনবারজিয়া রেসিমোসা, C_4 উদ্ভিদের আরেকটি উদাহরণ এর সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরের সবুজ কণায় সাধারণ গ্র্যানার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঐ উদ্ভিদের মিজোফিল সবুজ কণায়ও গ্র্যানা আছে। সবুজ কণার অন্তর্গঠনে সেজন্যে ঐ উদ্ভিদের বিভিন্ন কোষে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সবুজ কণার গঠন-বৈচিত্র্যের পরিবর্তে আকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরের সবুজ-কণা মিজোফিলের সবুজকণার চেয়ে আকারে অনেক বড়। এছাড়া বেষ্টিত স্তরের কোষে অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বর্ধিতাকারের মাইটো-কন্‌ড্রিয়ার বিকাশ লক্ষণীয়। C_4 উদ্ভিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল 'পেরিফেরাল রেটিকুলাম'-এর উপস্থিতি যা অনেকগুলি জটপাকানো নলের সমষ্টি এবং সবুজ কণার অন্তবর্তী ঝিল্লীর লাগোয়া দেখা যায়। মিজোফিলের সবুজকণায় এদের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশি। পেরিফেরাল রেটিকুলাম সবুজকণার পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়। সবুজকণার অগ্রদূত—প্রোপ্লাষ্টিডে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। C_3 ও C_4 উদ্ভিদের প্রোপ্লাষ্টিডে কোন পার্থক্য নেই। C_4 উদ্ভিদের কচি এবং অপরিপক্ক পাতায়ও 'পেরিফেরাল রেটিকুলাম'-এর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। এটি পাতার প্রসারণ ও পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়।

'আলোক' এবং 'অন্ধকার' C_4 উদ্ভিদ—যে সকল উদ্ভিদে পাতার অনুপ্রস্থকাটে সংগঠক কোষগুলি সবুজ কণাযুক্ত কোষের দুটি সমকেন্দ্রীয় স্তর দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং যাদের ভিতর C_4 সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের 'আলোক' C_4 উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে 'ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম' (ক্র্যাসুলেসিয়ান অম্ল বিপাক) গাছপালাদের 'অন্ধকার' C_4 উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; যথা, ক্র্যাসুলা, ব্রায়োফিলাম, সিডাম প্রভৃতি। এই সব গাছের পাতা বেশ মোটা ও রসালো। জৈব অম্লের পরিমাণ এই সব গাছের পাতায় খুব বেশি দেখা যায়—যেমন ম্যালিক অ্যাসিড।

রাত্রে কার্বন-আত্তীকরণের ফলে জৈব অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরদিন প্রাতে আলোকের উপস্থিতিতে জৈব অম্ল শর্করায় পরিণত হয়। এই আহ্নিক অম্লীয়করণ এবং শর্করা তৈরির পদ্ধতি 'ক্র্যাসু-লেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম' নামে অভিহিত এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড স্থিরীকরণে এর গুরুত্ব কম নয়।

'আলোক' ও 'অন্ধকার' C_4 উদ্ভিদে কার্বন স্থিরীকরণ একইভাবে সংগঠিত হয় (চিত্র 3)।



চিত্র 3 C_4 সালোকসংশ্লেষ ও ক্র্যাসু-লেসিয়ান অম্ল বিপাকের পরিকল্প—PEP, ফসফো-ইনল পাইরুভিক অ্যাসিড; RuDP—রিবুলোস—1, 5 ডাই ফসফেট; PGA—ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, GAP—গ্লিসারাল্ডিহাইড ফসফেট (টিং 1971 অনুসরণে)।

C_4 সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(i) কার্বন স্থিরীকরণ এবং C_4 ডাইকারবক্সিলিক অম্লের উৎপাদন;

(ii) ডাইকারবক্সিলিক অম্লের ভাঙন এবং কার্বন পুনঃআত্তীকরণে ফসফোগ্লিসারিক অম্লের উৎপাদন।

'অন্ধকার' C_4 উদ্ভিদে, কার্বন স্থিরীকরণে অন্ধকারে ম্যালিক অম্লের উৎপাদন এবং আলোকে ম্যালিক অ্যাসিডের ভাঙন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড আর পাইরুভিক এসিডের উৎপাদন বিভিন্ন সময়ে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 'আলোক' C_4 উদ্ভিদে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন কোষে সংগঠিত হয়। উল্লিখিত প্রথম পদ্ধতি মিজোফিল কোষে এবং দ্বিতীয়টি সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরে সংগঠিত হয়।

ফোটোরেসপিরেশন ফোটোরেসপিরেশন একটি বিপাক পদ্ধতি, যার দ্বারা আলোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশিত হয়। এই জারণ বিক্রিয়ায় শর্করার পরিবর্তে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অংশগ্রহণ করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার এক বিশেষ মুহূর্তে সালোকসংশ্লেষজনিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও ফোটোরেসপিরেশনে নিষ্কাশিত কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ একেবারে সমান দেখা যায়, অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর বিনিময় শূন্য হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের যে ঘনতায় এটি পরিলক্ষিত হয় তাকে 'CO_2 কমপেনসেশন পয়েন্ট' বলা হয়। যদি কোন উদ্ভিদে ফোটোরেসপিরেশন পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশিত না হয় তাহলে তার 'কমপেনসেশন পয়েন্ট'-এর পরিমাপ হবে শূন্য। 'কমপেনসেশন পয়েন্টকে' ভিত্তি করে উদ্ভিদ জগতকে দু ভাবে বিভাজিত করা যেতে পারে—

(ক) উচ্চ কমপেনসেশন পয়েন্টযুক্ত উদ্ভিদমণ্ডলী,

(খ) নিম্ন কমপেনসেশন পয়েন্টযুক্ত উদ্ভিদমণ্ডলী।

বেশির ভাগ উদ্ভিদ প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন—গম, তামাক প্রভৃতি। এরা ফোটোরেসপিরে-শনের সময় বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ু-মণ্ডলে নিষ্কাশন করে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত উদ্ভিদের তালিকা বেশ দীর্ঘ নয়, তাদের সংখ্যা অল্প। আখ ও ভুট্টা এই তালিকারই অন্তর্গত। এরা C_4 প্রজাতি নামেও বিশেষ পরিচিত। হ্যাচ ও স্ল্যাক পদ্ধতি দ্বারা ফোটোরেসপিরেশনে নিষ্কাশিত সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পুনঃস্থিরীকরণের বিক্রিয়া এদের মধ্যে বিদ্যমান এবং এর জন্যে পাতার আভ্যন্ত-রীণ গঠন ও 'ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমী' বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

C_4 সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব— ইদানীংকালে, C_4 অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদে কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিরীকরণের প্রণালী বিশদভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে যার দ্বারা ফোটোরেসপিরেশনে নিষ্কাশিত

কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপযুক্ত স্থিরীকরণ বর্ণনা করা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য যে, এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উৎসেচক পদার্থ (এনজাইম) পি ই পি কারবক্সিলেস (PEP carboxylase) শুধুমাত্র মিজোফিল কোষে পাওয়া যায়। এই উৎসেচক পদার্থ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কাবন ডাই-অক্সাইড স্থিরীকরণ করে এবং প্রথম অস্থায়ী পদার্থরূপে অকজ্যালোঅ্যাসিটেট তৈরি হয়, তারপর হয় ম্যালিক প্রভৃতি অন্যান্য C_4 অ্যাসিড। এই C_4 পদার্থগুলি খুব দ্রুত সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরে গমন করে যেখানে ডাইকারবক্সিলিক অম্লের ভাঙন ঘটে 'ম্যালিক এনজাইমের' উপস্থিতিতে। বলা বাহুল্য C_4 চক্র বলবৎ থাকে মিজোফিল কোষে এবং কালভিন চক্র থাকে সংগঠক কোষগুলির বেষ্টিত স্তরে।

প্রয়োজন-ভিত্তিক বিজ্ঞান

মাছ চাষের নতুন দিক

অশোক সান্যাল*

মাছ শুধু যে খেতে ভাল তাই নয়, মাছের খাদ্যগুণও যথেষ্ট। মাছে আছে প্রায় সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড যা শরীর গঠনের পক্ষে এক অপরিহার্য উপাদান। মাছের এই খাদ্যগুণের কথা কিন্তু শুধু আজকের মানুষের কাছেই সত্য নয়। মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার প্রাচীন নিদর্শনে দেখা যায়, তখনকার মানুষের খাবারের তালিকায় মাছ একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্য। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও লৌকিক আচারঅনুষ্ঠানেও মাছের এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

আজকের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার দিনে যখন পরিমিত খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগের মোকাবিলায় সবাই ব্যস্ত, তখন উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টি যোগানের জন্যে মাছের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নদী-নালা, খাল বিলের দেশ ভারতে জলের অভাব না থাকলেও বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সঙ্গে তাল রেখে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কারণ, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করার ফলে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিভাবে মাছ চাষ করে বর্তমানের অপুষ্টিজনিত সমস্যার মোকাবিলার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ মাছ উৎপাদন করা যায়, সেই চিন্তায় মৎস্য-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

খাদ্যগুণ ও দৈহিক বৃদ্ধির হার অনুযায়ী যে সমস্ত মাছ চাষ করা হয় সেই সমস্ত মাছকে জনন পদ্ধতি অনুসারে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত, যে সমস্ত মাছ পুকুর-খাল-বিল বা কোন বদ্ধ জলা জায়গায় ডিম পাড়ে; যেমন—আমেরিকান রুই সাইপ্রিনাস), তিলাপিয়া, ল্যাটা, শোল, কাঠকৈ, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত পোনাজাতীয় মাছ যেমন—রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, রূপালী রুই, ঘেসো রুই ইত্যাদি। এই সমস্ত মাছ কখন পুকুরে ডিম পাড়ে না। কেবলমাত্র বন্যাপ্লাবিত নদীতে ডিম পাড়ে। তৃতীয়ত, কিছু মাছ যারা কেবলমাত্র

* 30, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-6, কলিকাতা-700 054

সমুদ্র বা সমুদ্র সংলগ্ন নদীর জলে ডিম পাড়ে, যেমন ভেটকি, পারসে ইত্যাদি। এই তিন ধরণের মাছের মধ্যে পোনাজাতীয় মাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং এদের চাহিদাও খুব বেশি। এই কারণে মাছচাষীদের কাছে অন্যান্য মাছের তুলনায় পোনাজাতীয় মাছ চাষের প্রবণতা বেশি। কতকগুলি সমস্যা এই সমস্ত লাভজনক মাছ চাষের পথে এক বাধার সৃষ্টি করলেও মৎস্য-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নত মানের গবেষণার জন্যে মাছচাষের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে।

পোনাজাতীয় মাছ কেবলমাত্র বন্যাপ্লাবিত নদীতে ডিম পাড়ে। সুতরাং, পুকুর বা অন্যকোন কৃত্রিম জলাশয়ে এই সমস্ত মাছ চাষের জন্যে নদী থেকে মাছের ডিম, ধানিপোনা বা চারাপোনা সংগ্রহ করতে হয়। এই সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক অসুবিধা। বেশির ভাগ মাছ ডিম পাড়ে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ বর্ষাকালে। সুতরাং যে বছর অপরিমিত বর্ষা হয় কিংবা নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি হয় না, সে বছর ডিম বা চারামাছের সংকট দেখা দেয়। এই মাছেরা আবার নদীর কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে ডিম পাড়ে এবং সে সমস্ত স্থানের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত মুস্কিল। ফলে উপযুক্ত পরিমাণ ডিম সংগ্রহ করা এক সমস্যার ব্যাপার। নদী থেকে ধানিপোনা বা চারাপোনা সংগ্রহের সময় লাভজনক মাছের বাচ্চার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক মাছের বাচ্চা মেশানো থাকে এবং সেগুলি পোনাজাতীয় মাছের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। মাছের ডিম ও বাচ্চা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সমস্যার কথা চিন্তা করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মধ্যপ্রদেশের কয়েক জায়গায় এক বিশেষ ধরনের জলাশয়ে এই সমস্ত মাছকে ডিম পাড়ানো হয়। এই বিশেষ জলাশয়ে বর্ষায় প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টির জল জমা হয়। ফলে এখানে বন্যাপ্লাবিত নদীর পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও মাছ ডিম পাড়ে। এই বিশেষ পদ্ধতিতে মাছের ডিম পাড়বার ব্যাপারটাও বর্ষার উপর নির্ভরশীল।

মাছ চাষের জন্যে প্রয়োজনীয় ডিম ও বাচ্চা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে প্রথমেই প্রশ্ন জাগলো—যৌবনের দ্বারে পৌঁছেও মাছ পুকুরে ডিম পাড়ে না কেন? অনেক বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই প্রশ্নের উত্তর মিলল। তাঁরা বললেন, যৌবনের উন্মাদনায় কখনই পুকুরে ডিম পাড়বে না যতক্ষণ না পর্যন্ত পূর্ণযৌবনা মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হচ্ছে গোনাডোট্রোপিন। বিজ্ঞানীরা আরও বললেন এই বিশেষ হর্মোন নিঃসরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জলের পরিবেশের উপর এবং বন্যাপ্লাবিত নদীতেই কেবলমাত্র এই বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মাছের জননপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত এই গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর মৎস্য-বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন, কোন উপায়ে যদি গোনাডোট্রোপিন হর্মোন নিঃসরণের উপযুক্ত পরিবেশ পুকুর বা খাল-বিলের জলে সৃষ্টি করা যায়, তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের এই চিন্তাধারা বিশেষ কার্যকরী হয় নি। কারণ পুকুরে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে তাঁরা চেষ্টা সুরু করলেন। অবশেষে 1930 সালে আর্জেন্টিনার মৎস্য-বিজ্ঞানী হাউসে বললেন—হ্যাঁ, মাছকে পুকুরের জলে ডিম পাড়তে বাধ্য করা যাবে। প্রশ্ন উঠল, কি করে? তিনি বললেন, পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোন গোনাডোট্রোপিন ইনজেকশন দিয়ে মাছকে ডিম পাড়ানো সম্ভব। হাউসের এই ধারণাকে 1934 সালে প্রথম কার্যে পরিণত করলেন ব্রেজিলের মৎস্য-বিজ্ঞানী ভন ইরিং ও তাঁর সহকর্মীরা। এর পর 1938 সালে এই কাজে সফল হন রাশিয়ার বিজ্ঞানি গারবিলস্কি। ভারতে সর্বপ্রথম ডঃ থান কৃত্রিম উপায়ে মৎস্য প্রজননের কাজ শুরু

করেন। তিনি 1937 সালে স্তন্যপায়ী প্রাণীর পিটুইটারি নিঃসৃত হর্মোনের সাহায্যে মগেল মাছকে পুকুরে ডিম পাড়তে বাধ্য করেন। কিন্তু মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের সাহায্যে মাছকে ডিম পাড়ানোর ব্যাপারে প্রথম কৃতকার্য হন ডঃ হীরালাল চৌধুরী। তিনি 1955 সালে ইসোমাস ডানরিকাস নামে এক মাছের দেহে কাতলা মাছের গোনাডোট্রোপিন প্রবেশ করিয়ে ডিম পাড়তে বাধ্য করেন। মাছ চাষের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার ফলে আজ অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে।

এই নতুন ও উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্যে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত সদ্য মৃত মাছের গ্রন্থি গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে 5—7 দিন বরফে রাখা মাছের গ্রন্থিও ভাল কাজ দেয়। মাছের মাথার উপরের হাড় কেটে মস্তিষ্ক উন্মুক্ত করে মস্তিষ্কের নিচের দিকে অবস্থিত সরষের দানা আকারের পিটুইটারি গ্রন্থিটিকে চিমটার সাহায্যে সংগ্রহ করে অ্যাবসলুট অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রাখা হয়। গ্রন্থিটিকে সম্পূর্ণ ভাবে জলমুক্ত ও মেদমুক্ত করার জন্যে 24 ঘণ্টা পর অ্যালকোহল পরিবর্তন করা হয়। এই গ্রন্থিকে এবার বৈদ্যুতিক পেষক যন্ত্রে পেষণের ফলে নিঃসৃত হর্মোন গ্লিসারিনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষিত করা হয়। এইভাবে সংরক্ষণের ফলে 9—61 দিন পর্যন্ত হর্মোনের গুণাগুণ বজায় থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে দেহে হর্মোনের উপস্থিতি ঘটিয়ে ডিম-পাড়ানোর জন্যে স্ত্রী-মাছকে প্রথমে দেহের ওজন অনুপাতে (2-3 মিগ্রা/কেজি) একবার হর্মোন ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই হর্মোন স্ত্রী-মাছের দেহে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। 6 ঘণ্টা পরে এই উত্তেজিত মাছের দেহে আবার 5-8 মিগ্রা/কেজি অনুপাতে হর্মোন ইনজেকশন দেওয়া হয়। শুধু স্ত্রী-মাছের দেহে হর্মোন প্রবেশ করালে কাজ হবে না। পুরুষ মাছকেও হর্মোন ইনজেকশন দেওয়া প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে একটি স্ত্রী-মাছের জন্যে 2টি পুরুষমাছ বাছাই করে সে 2টিকে 2-3 মিগ্রা / কেজি অনুপাতে কেবলমাত্র একবার ইনজেকশন দিতে হবে। পুরুষ মাছকে ইনজেকশন দেওয়া হয় স্ত্রী-মাছকে দ্বিতীয়বার ইনজেকশান দেওয়ার সময়। স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে ঘাড় অথবা পৃষ্ঠ-পাখ্‌নার গোড়ায় ইনজেকশন দেওয়ার পর জলে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত এক আবদ্ধ জায়গায় রাখা হয়। এই আবদ্ধ জায়গাকে 'হাপা' বলা হয় এবং এখানেই দেহ নিঃসৃত ডিম ও শুক্রাণুর মিলন ঘটে।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজননের সাফল্য লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা এখন গোনাডোট্রোপিনের নতুন নতুন ভাণ্ডারের সন্ধানে ব্যস্ত। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা অত্যন্ত ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। এছাড়া পিটুইটারি নিঃসৃত হর্মোনের গুণগত মান প্রতি ঋতুতে সমান নয় এবং মজুত করে রাখলে এই হর্মোনের শক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে গবেষণার ফলে এমন অনেকগুলি অজৈব পদার্থ ও স্টেরোয়েড আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি পিটুইটারি নিঃসৃত গোনাডোট্রোপিন হর্মোনের ঘাটতি মেটাতে সক্ষম।

ক্ষুধা ও আহারের মাত্রা

মাধবেন্দ্রনাথ পাল*

"ব্যক্তির স্বাভাবিক 'অগ্নিবল' বা পরিপাক ক্ষমতার মাত্রার (তীব্রতা বা মন্দভাব) অনুসারে কার পক্ষে কতটুকু আহার পরিমিত তা নির্ধারণ করতে হয়, এটাই আয়ুর্বেদমতে ক্ষুধা তথা আহারের মাত্রা নির্দেশ করে।"…পরিমিত আহারের ফলে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।"

কার কত বেশি বা কম খিদে পেয়েছে তা মাপা যায় কিভাবে—এই প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভরশীল। আবার ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশের প্রভাব ক্ষুধার মাত্রা নির্ধারণ করে। ভূরিভোজের পর সাধারণত যথা নির্দিষ্ট সময়কাল বা যে নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আহার গ্রহণের কথা, তা অতিক্রান্ত হলেও স্বাভাবিক ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। শীতকালে ক্ষুধা বেশি পায়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রায় সব লোকের সে অভিজ্ঞতা শোনা যায়।

শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ইচ্ছা বা চাহিদাই ক্ষুধা। যদি সেই ক্ষয়ক্ষতি মাপবার উপায় থাকত তবে ক্ষুধার প্রকৃত পরিমাপ পাওয়া সহজ হত। কিন্তু সেরূপ কোনপ্রকার উপায় জানা নেই। প্রচলিত উপায়ে ব্যক্তির আহার গ্রহণের ইচ্ছা থেকে ক্ষুধা ও তার মাত্রার আন্দাজ করতে হয়। ব্যক্তিবিশেষ ও সময়বিশেষের উপর এই ইচ্ছা নির্ভরশীল; ক্ষুধার বাহ্যিক অভিব্যক্তি এই ইচ্ছার মধ্যে প্রতিফলিত। ব্যক্তিবিশেষ নিজেই উপলব্ধি করতে পারে কোন কিছু আহারের পর আর কতটুকু আহার করতে হবে বা আর করতে হবে না; এই পরোক্ষ উপায়ে নিজ নিজ ক্ষুধার মাত্রা নির্ধারণ করতে পারে। মোট কথা, যে পরিমাণ আহার করলে আর আহার গ্রহণের ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না, সেটুকু থেকেই ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুধার মাত্রা অনুভব করতে হয়।

তাছাড়া, যদি আহারের মাত্রা এমন হয় যে, আহারের পর অস্বস্তি ও আইঢাই করতে হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে আহার ক্ষুধার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মাত্রামত আহার করলে খাদ্যদ্রব্য যথাকালে, বা যে সময়ে যা পরিপাক হওয়ার কথা, সে সময়ে জীর্ণ হয় ও দেহের পোষণ করে। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে আহার করলে, জীর্ণ হয় না, দেহের পোষণ হয় না ও নানারূপ অসুখের কারণ ঘটে। এ থেকে বোঝা যায়, ব্যক্তির জীর্ণ করার একটা সামর্থ্য বা ক্ষমতা আছে—চলতি কথায় তার নাম হজম ক্ষমতা বা পোষাকী ভাষায় পরিপাক শক্তি বা ক্ষমতা। আয়ুর্বেদের ভাষায় এই ক্ষমতাকে বলে 'অগ্নিবল'।

অগ্নি যেমন জ্বালানি দগ্ধ করে, তেমনি অগ্নিবলে ভুক্ত আহার পাকস্থলীতে জীর্ণ হয়ে যায় ও পরিণামে দেহ-পোষণের উপযোগী হয়। অগ্নিবল ক্ষুধার অন্তর্নিহিত ইচ্ছার তীব্রতা বা মন্দভাব নির্দেশ করে। ক্ষুধার আগ্রহ সচরাচর না দেখা দিলে বা কম মাত্রায় থাকলে অগ্নিবলের অভাব বা ঘাটতি হয়েছে বুঝতে হবে। এই অবস্থা আয়ুর্বেদমতে অগ্নিমান্দ্য রোগের হেতুরূপে পরিচিত।

স্পষ্টত, ক্ষুধার মাত্রা অগ্নিবলের উপর নির্ভরশীল। কার্যত ক্ষুধার মাত্রা অনুসারে আহারের মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়; এবং তা অগ্নিবলের তীব্রতা বা মন্দভাব অনুযায়ী হওয়া সঙ্গত। অতএব, ক্ষুধা ও আহারের মাত্রা পরস্পর নির্ভরশীল।

* F/7, এম আই. জি হাউজিং এস্টেট; 37, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-700 037

যে পরিমাণ খাদ্য কোন ব্যক্তি আহার করলে অনায়াসে ও যথাকালে জীর্ণ হয়, পরিপাকের কোন বাধা উপস্থিত হয় না এবং যথারীতি দেহের পোষণ সম্ভব হয়, তাই সেই ব্যক্তির ক্ষুধা তথা আহারের পরিমিত মাত্রারূপে গণ্য। এক পোয়া চালের ভাত বা আধ পোয়া ময়দার রুটি বা লুচি খাওয়া যে ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের পক্ষে পরিমিত আহার, এরূপ কোন বিধি নির্দেশ করা যায় না। কারও পক্ষে আধ পোয়া চালের ভাত পরিমিত আহার। ব্যক্তির স্বাভাবিক অগ্নিবল বা পরিপাক ক্ষমতার মাত্রার তীব্রতা বা মন্দভাব অনুসারেই কার পক্ষে কতটুকু আহার পরিমিত তা নির্ধারণ করতে হয়, এটাই আয়ুর্বেদ মতে ক্ষুধা বা আহারের মাত্রা নির্দেশ করে।

"যাবদযস্যাশনশিতং অনুপহত্যপ্রকৃতিং
যথাকালং জরাং গচ্ছতি।
তাবদস্য মাত্রা প্রমাণং
বেদিতব্যং ভবতি॥"

আয়ুর্বেদোক্ত শ্লোকের মর্মার্থঃ যার যেরূপ আহার করলে প্রকৃতি বা নিজস্ব সত্তা উপহত না বাধাপ্রাপ্ত হয় না, আহার্য দ্রব্য যথাসময়ে জীর্ণ হয় তাই তার আহারের মাত্রা বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ আহারের মাত্রা ঠিক ঠিক না হলে ভোক্তার প্রকৃতি বা নিজস্ব সত্তা বাধা পায় বা আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিক ব্যহত হয়। আহারের পরিমাণ মাত্রা ছাড়া হলে ভোক্তার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়ে, শরীর আয়াস ও শ্রমবিমুখ হয়, দু'পা চলতে পারে না, কোন মানসিক ব্যাপার চিন্তা করার সামর্থ্য থাকে না এবং মনেরও স্ফূর্তি থাকে না। এই সব কার না জানা আছে।

অতি ভোজন যেমন ক্ষতিকর, তেমনি অল্প ভোজন বা মাত্রা অপেক্ষা কম আহার করাও ক্ষতিকর,—ক্ষয়ক্ষতি পূরণ না হয়ে ক্রমশ দেহ শীর্ণ ও দুর্বল হয়, এবং রোগ আক্রমণের পথ সহজ হয়ে উঠে। অতিভোজন বা অল্পভোজন উচিত নয়, পরিমিত মাত্রায় আহারই কাম্য। পরিমিত আহারের ফলে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভের উপরও সুস্থতা ও পুষ্টি নির্ভরশীল এবং সেই আহার গ্রহণের রীতি পরিমিত আহারের পরিপূরক।

পরিষদের খবর

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

(1)

গত 1লা এপ্রিল 24 পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের বিজ্ঞান সংসদ স্থানীয় বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান সংসদের সভ্যদের তৈরী মডেলের সঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে কলমে কেন্দ্রে'র কয়েকটি মডেল দেখানো হয়। উদ্বোধনের দিনে পরিষদের কর্মসচিব স্থানীয় লোকেদের প্রদর্শনীটি দেখার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে খুব আনন্দিত হন এবং সংসদের কর্মীদের ও দর্শকদের ধন্যবাদ জানান।

(2)

গত 3রা মার্চ থেকে 5ই মার্চ পর্যন্ত হরিনাভী ডি ভি. এ. এস হাই স্কুলে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের 'সত্যেন বোস বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে'র পক্ষ থেকে উক্ত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। এটি স্থানীয় অঞ্চলে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

ভ্রম সংশোধন—মার্চ'78 সংখ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞান এর 138, 139 পৃষ্ঠায় (ভেবে কর) 'সাতটি' এবং প্রতিটি '7'-এর স্থলে যথাক্রমে 'নয়টি' এবং '9' হবে। এই ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

কাঃ সঃ

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

এনরিকো ফের্মি



(1901—1954)

ফের্মি বিশ্বাস করতেন তাঁর প্রতিটি কাজ ও চিন্তার মধ্যে আছে মৌলিকত্ব। এই আত্মবিশ্বাস তাঁকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে।

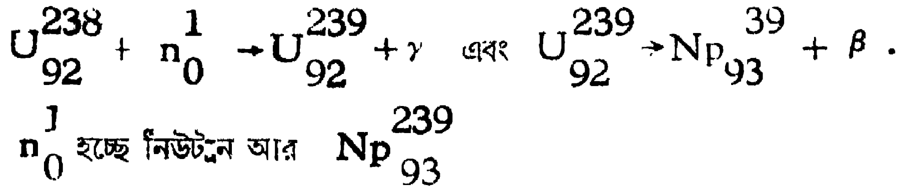
মৌলিক কণাগুলি যে দুই বিজ্ঞানীর নামে পরিচিতি বহন করে চলেছে তাঁদের একজন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আর অন্য জন এনরিকো ফের্মি। এনরিকো ফের্মি 1901 সালে 29শে সেপ্টেম্বর

রোমে জন্মগ্রহণ করেন। রোমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে 1918 সালে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় 1922 সালে তাঁকে পদার্থবিদ্যার উপর ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। এর পর কিছুদিন বিখ্যাত পদার্থবিদ্ ম্যাক্স বর্ণ-এর কাছে পড়াশুনা করেন। 1924 সালে ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ও বলবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং 1927 সালে রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 1938 সাল পর্যন্ত রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করবার পর 1939 সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 1946 সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে তিনি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ইটালীর রয়েল অ্যাকাডেমি স্থাপনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ফের্মি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্ হিসাবেই সমধিক পরিচিত। হাইসেনবার্গ, ডিরাক, শ্রয়ডিঙ্গার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অনুসৃত কণা বলবিদ্যার উপরই ছিল তাঁর প্রথম দিকের কাজ। ঐ সময় বর্ণালী, পরিমাত্রা, কার্বন ডাই-অক্সাইড্-এর উপর রামন-ক্রিয়া, অ্যামোনিয়া অণুর ঘূর্ণন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা-পত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রোমে থাকার সময় পাউলির অনিশ্চয়তা-সূত্রের সঙ্গে সমঃ খে তিনি যে গ্যাসীয় তত্ত্বের অবতারণা করেন, তা বিজ্ঞানীমহলে একটি উচ্চ পর্যায়ের কাজ বলে পরিগণিত। অবশ্য ডিরাক জাত্য-গ্যাসের উপর অনুরূপ তত্ত্বের সন্ধান দেন। 1932 সালের 'রিভিউ অব্ মডার্ন ফিজিক্স-এ' প্রকাশিত ডিরাকের বিকিরণ তত্ত্ব ও কণা-বলবিদ্যার উপর তাঁর প্রবন্ধ যেমন অনুপম তেমনি জ্ঞানগর্ভ। ঐ বছরেই নীলস্ বোর 'ফ্যারাডে স্মৃতি বক্তৃতায়' বিটা রশ্মির হ্রাস বা ক্ষয় সম্বন্ধে যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, সে বিষয়ে পাউলির ব্যাখ্যা অপেক্ষা ফের্মির ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য।

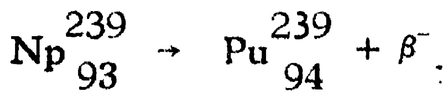
ইতিমধ্যে ফের্মি আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করলেও 1933 সালে ফের্মির গবেষণা এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়। ঐ সময় কুরী ও জোলিও প্লুটোনিয়াম থেকে প্রাপ্ত আল্ফা (α)- কণার সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের সংঘাত ঘটিয়ে অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় ফসফরাস তৈরি করতে সমর্থ হন। এটিই প্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ফের্মি 1933 সালের শেষ দিকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ার উপর কাজ শুরু করেন। সংঘাতকারী α কণার বদলে তিনি ব্যবহার করেন নিউট্রন কণা। নিউট্রনের উৎস হিসাবে একটি বাল্বে বেরিলিয়াম চূর্ণের সঙ্গে রেডন রাখার ফলে রেডন থেকে নির্গত α-কণা বেরিলিয়াম-নিউক্লিয়াসে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিলিয়াম বিয়োজিত হয়ে নিউট্রন কণা বের হয়। এই নিউট্রন পরীক্ষণীয় বস্তুকে আঘাত করে। ফের্মি ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘ ছয় মাসের প্রচেষ্টায় দেখাতে সমর্থ হন যে, প্যারাফিন বা জলের মধ্য দিয়ে নিউট্রন কণাগুলি যাবার পর এগুলির গতি খানিকটা কমে যায় এবং এরূপে নিম্নগতি সম্পন্ন নিউট্রনের কার্যক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যায়। নিম্নগতিসম্পন্ন নিউট্রনের সংঘাতে রূপোর তেজস্ক্রিয়তা প্রায় 100 গুণ বেড়ে যায়। নিউট্রন ও প্রোটনের ভর প্রায় সমান। দ্রুতগামী নিউট্রনের প্রোটনের সঙ্গে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে উৎপন্ন গতিশক্তি নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। দেখা যায়, 10^6 ভোল্ট গতিশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন কণা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে 20 বার সংঘাতের পর যে অবশিষ্ট গতিশক্তি থাকে, তা তাপীয় আলোড়নের শক্তির সঙ্গে সমতুল। নিম্নগতির

নিউট্রনের সাহায্যে ফের্মি ও তাঁর সহযোগীরা বেশির ভাগ মৌলের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপন্ন করতে সমর্থ হন। 1934 সালে ভারী মৌল ইউরেনিয়ামের সঙ্গে নিম্নগতিযুক্ত নিউট্রনের সংঘাতে পাওয়া গেল অধিকতর পরমাণু-সংখ্যার এক নতুন মৌলের আইসোটোপ। সাধারণত ইউরেনিয়াম আইসোটোপের পরমাণু-সংখ্যা 92 এবং ভরসংখ্যা 238. এর কেন্দ্রীন 92টি প্রোটন ও 146টি নিউট্রন দ্বারা গঠিত। এই তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে -কণা নিঃসৃত হয়। U^{238}_{92}-এর প্রতীক চিহ্ন। নিউট্রনের সঙ্গে U^{238}_{92} -এর সংঘাতে দেখা গেল গামা (γ) রশ্মির বিচ্ছুরণ ও বিটা (β) কণার নির্গমন। ফের্মি এর কারণ হিসাবে দেখালেন, সংঘাতের ফলে প্রথম ধাপে সাধারণ ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনে একটি নিউট্রনের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং দ্বিতীয় ধাপে β কণার নির্গমনের ফলে একটি ইলেকট্রন বের হয়ে যায় অর্থাৎ কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই জন্যেই U^{239}_{93} পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াটির সমীকরণ হবে—



$$U^{238}_{92} + n^{1}_{0} \rightarrow U^{239}_{92} + \gamma \quad \text{এবং} \quad U^{239}_{92} \rightarrow Np^{239}_{93} + \beta .$$

n^{1}_{0} হচ্ছে নিউট্রন আর Np^{239}_{93} একটি নতুন মৌল যার নাম নেপচুনিয়াম। নেপচুনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌল এবং এ থেকে β কণা নির্গমনের ফলে যে নতুন মৌলের উৎপত্তি হয় তাকে প্লুটোনিয়াম বলা হয়। এর ভর-সংখ্যা 239, পরমাণু সংখ্যা 94 এবং প্রতীক চিহ্ন Pu^{239}_{94} এই প্রক্রিয়ার সমীকরণ



$$Np^{239}_{93} \rightarrow Pu^{239}_{94} + \beta^{-}.$$

1938 সালের হার্ন এবং স্ট্রাসম্যানের তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের রাসায়নিক গুণাবলীর বিশ্লেষণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘাতের ঘটনাচক্রের সত্যতাকে সুদৃঢ় করে। এই পরীক্ষাকে অবলম্বন করেই কেন্দ্রীন বিভাজনের উৎপত্তি এবং তা থেকেই 1945 সালে মানব ইতিহাসের দুরপনেয় কলঙ্ক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ। 1942 সালে পারমাণবিক শক্তির উপর গবেষণায় ফের্মি প্লুটোনিয়াম প্রস্তুতির পারমাণবিক ভোল্টীয় স্তূপ (pile) নির্মাণ করেন। এটি 'ফের্মি স্তূপ' নামে পরিচিত। 1934 সালে ফের্মি প্রোটন-নিউট্রন সম্বন্ধে যে তত্ত্বের অবতারণা করেন, তাতে দেখা যায় প্রোটন ও নিউট্রন একটি মৌলিক কণা নিউক্লিয়নের বিভিন্ন দশা (phase)। একটি পজিট্রন নির্গত হয়ে প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হয় আর একটি ইলেকট্রন নির্গত হয়ে নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়। এই তত্ত্বে শক্তির নিত্যতা বজায় রাখার জন্যে ফের্মি পাউলির আগেই একটি অনুমানসিদ্ধ কণার ব্যবহার করেন। এই কণার নাম নিউট্রিনো। এটি অনাহিত এবং এর ভর ইলেকট্রনের ভর অপেক্ষা বেশি নয়।

কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে মৌলিক কণাগুলি বোসন ও ফের্মিয়ন এই দুই ভাগে বিভক্ত। দুটি অনন্য ব্যতিচারী কণার দশা এক হলে ঐ কণাকে বোসন আর বিপরীত হলে ফের্মিয়ন বলা হয়। ফোটন, মেসন, গ্রাভিটন হল বোসন আর ইলেকট্রন, মিউয়ন, বেরিয়ন প্রভৃতি ফের্মিয়ন।

বহু আন্তর্জাতিক সম্মানের অধিকারী ফের্মি 1938 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

1953 সালে এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর নামেই সর্বাপেক্ষা স্থায়ী আইসোপের নামকরণ করা হয়েছে ফেমির্য়াম। প্লুটোনিয়ামের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘাতে এই বিরল মৌলিক কণার উৎপত্তি হয়। এর ভর-সংখ্যা 253, পরমাণু-সংখ্যা 100 এবং প্রতীক চিহ্ন Fm^{253}_{100}.

শতাধিক গবেষণা পত্রে ফের্মির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় বহু সমস্যার সমাধান ও বহু নতুন পথের সন্ধান। তিনি শুধু গবেষক ছিলেন না, তাঁর মত সুশিক্ষক খুবই বিরল। 1943 সালে লস্ আলামোসে ওপেনহাইমারের পারমাণবিক বোমা প্রকল্পে কাজ করার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি নিয়মিত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীদের পদার্থবিদ্যায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। টেনিস খেলাতে ও পাহাড়ে উঠতে তিনি খুব ভালবাসতেন। 1954 সালে এই কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রতনমোহন খাঁ*

* সিটি কলেজ, গণিত বিভাগ, কলিকাতা-700 009

গরুর গাড়ির আধুনিকীকরণ

ভারতের যানবাহন একটি বড় সমস্যা। পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশে পূর্বে প্রচলিত যানবাহনগুলির সংস্কার করে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। এজন্যেই ভারত সরকারের উদ্যোগে অ্যাগ্রিএক্সপো-77-এ (Agriexpo-77) আধুনিক গরুর গাড়ির প্রদর্শনী করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান এবং এই গ্রামাঞ্চলের একমাত্র যানই হল গরুর গাড়ি। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া এই গরুর গাড়ির প্রচলনও বন্ধ করা যাবে না। তাহলে বহুলোক যারা এই গরুর গাড়ির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের জীবনধারণের পথ জটিল হয়ে পড়বে। এছাড়া এটা বন্ধ করার অন্যতম বাধা হল গ্রামাঞ্চলের রাস্তা। ভারতের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পথই কাঁচা, উঁচু-নিচু ও বর্ষাকালে কর্দমাক্ত। ফলে, অপর কোন যানবাহন চলাচলও সম্ভব নয়। তার উপর গরুর গাড়িই হল একমাত্র সস্তার যান। ফলে, এটাই গ্রামবাসীদের কাছে সহজলভ্য। কিন্তু, কার্যান্তরে দেখা যাচ্ছে শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরাঞ্চলেও গরুর গাড়ির চলাচল বেড়ে যাচ্ছে। কারণ, এই গরুর গাড়ির সহজ-লভ্যতার সুযোগ শহরবাসীরাও সাদরে গ্রহণ করছেন।

এই সব বিভিন্ন কারণে গরুর গাড়ির কিছু আধুনিকীকরণ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহুব্যক্তি উন্নত ধরণের গরুর গাড়ি তৈরি করে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অ্যাগ্রি-এক্সপো-77-এর গোযান বিভাগে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমার তৈরী গরুর গাড়ির বৈশিষ্ট্যগুলি হল, স্টীয়ারিং, ব্রেক, নতুন ধরণের জোয়াল, স্প্রিং, বিয়ারিং, বিশেষ ধরণের চাকা, উন্নত ধরণের চাকা, উন্নত ধরণের ঘর, অতিরিক্ত চাকা প্রভৃতি।

গাড়িকে নির্দিষ্ট দিকে ঘুরাবার জন্যে প্রয়োজন ষ্টিয়ারিংয়ের। চালকের সামনে একটা হাতল থাকবে। সেই হাতল যুক্ত থাকবে গাড়ির নিচের দিকের একটা দণ্ডের সঙ্গে। জোয়ালের দু-পাশে দু-টি আংটা থাকবে। ঐ আংটা দুটির সঙ্গে ঐ দণ্ডের দু-প্রান্তের সংযোগ থাকবে। ফলে, সেটি ঘুরানোর সঙ্গে সঙ্গেই জোয়ালটাও ঘুরতে থাকবে এবং গরুর গাড়িটা সেদিকে চলতে থাকবে। এর জন্যে গরুর নাকে ফুটো করে বাধতে হবে না, গরুকে চাবুকের আঁচড়ও সহ্য করতে হবে না আর গাড়ির দিকনির্দেশও নিখুঁত হবে।

গাড়িকে থামাবার জন্যে প্রয়োজন ব্রেক-এর। এক্ষেত্রেও চালকের সামনে থাকবে একটা হাতল। সেটা ধরে টানলেই গাড়ি গতিরুদ্ধ হবে। গাড়ির পিছনের দণ্ডের সঙ্গে চাকা আটকানো থাকবে; দণ্ডের উপর থাকবে কতকগুলি খাঁজ। ঐ দণ্ডের ঠিক পিছনে দুটি স্প্রিং-এর সঙ্গে আটকানো থাকবে একটা লোহার পাত এবং তার সঙ্গে শক্ত তারের মাধ্যমে যুক্ত থাকবে ঐ হাতল। ফলে, হাতল ধরে সামনে পিছনে করে চালক গাড়ির গতি মুক্ত অথবা রুদ্ধ করতে পারবে। কারণ, ঐ পাত খাঁজের মধ্যে ঢুকলেই গাড়ির গতি রুদ্ধ হবে।

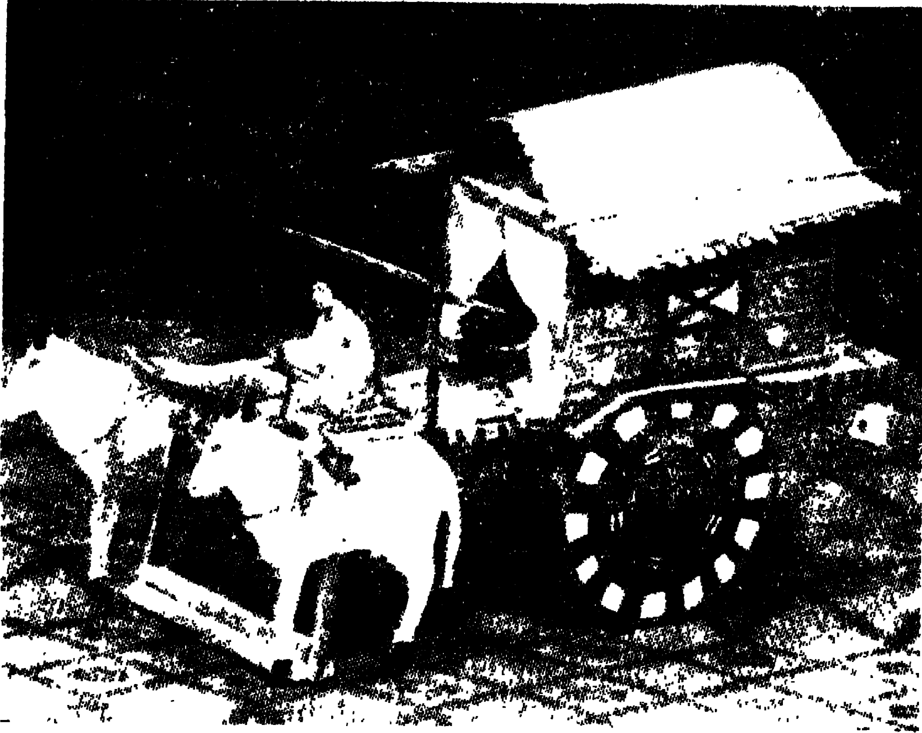
মূল গাড়ির সঙ্গে গরুকে পূর্বের ন্যায় জোয়াল দিয়েই যুক্ত করা হবে। তবে, এই জোয়ালটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। জোয়ালটা এমন ভাবে আটকানো যাতে স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে। এছাড়া এর শেষাংশ দুটি কিছুটা বাঁকানো এবং ঐ অংশের নিচে কিছুটা গদি লাগানো। বাঁকানো থাকবার ফলে গরুর ঘাড়ের উপর চাপ কম পড়বে আর গদি থাকার জন্যে গরুর ঘাড়ে ক্ষতেরও সৃষ্টি হবে না। নইলে, আজ এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিনেও এই পরম উপকারী প্রাণীটির উপর যা নির্যাতন করা হয়, তা অকথ্য। তবে জোয়ালের সঙ্গে গরুগুলি পূর্বের ন্যায় একছড়া দড়ি দিয়েই বাধা থাকবে।

ঝাঁকুনীহীন ও স্বচ্ছন্দে চলবার জন্যে প্রয়োজন গাড়িতে স্প্রিং-এর। এক্ষেত্রে, ব্যবহৃত স্প্রিং অনেকটা রিক্সা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত স্প্রিং-এর মত। মূল গাড়ির পাশ্বীয় খুঁটি দুটির সঙ্গে এইরূপ দুটি স্প্রিং আটকানো থাকবে। ফলে গাড়ির আরোহী বা বহনকৃত বস্তুর উপর ঝাঁকুনীর তীব্রতা কমবে। এই জাতীয় স্প্রিং-এর মূল্যও অত্যন্ত কম। এই স্প্রিংটির নিচের দিকে বিয়ারিং যুক্ত থাকবে।

গাড়ির নির্বন্ধ ও স্বচ্ছন্দ গতির জন্যে বিয়ারিং-এর প্রয়োজন। প্রচলিত গরুর গাড়িগুলিতে অক্ষ-দণ্ড থাকে মূল দেহের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু চাকা ঘূর্ণনশীল। এই নতুন গাড়িটাতে বিয়ারিংদুটি স্প্রিং-এর মাধ্যমে মূল দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আর বিয়ারিং-এর মধ্যস্থ ছিদ্রে আটকানো থাকবে অক্ষদণ্ড। ঐ অক্ষদণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত থাকবে চাকা। ফলে গাড়ির গতি বর্তমানের গাড়িগুলির মত জড়তাপূর্ণ হবে না এবং কম শ্রমেই গরু গাড়ি টানতে পারবে। গাড়ির দু-পাশে এইরকম দুটি বিয়ারিং থাকবে।

এই গাড়ির চাকাটাও একটু বিশেষ ধরণের। বর্তমানে প্রচলিত গাড়ির মত এর চাকাও কাঠের তৈরিই হবে। তবে চাকার উপর একটা লোহার বেড় আটকানো থাকবে। সেই বেড়ের পাশ দুটি উঁচু করা। ঐ বেড়ের খাঁজের মধ্য দিয়ে ঢুকানো থাকবে রাবার-এর খাঁজকাটা ষ্ট্রিপ (strip)। ফলে গাড়ি শহরের পীচের রাস্তায়, গ্রামের কর্দমাক্ত বা উঁচু-নিচু রাস্তায় সাবলীল গতিতে চলতে পারবে, পিছলে বা, হেঁচড়ে যাবে না। এছাড়া চাকাও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

এই গাড়িটার উপরের ঘরটাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ঘর হবে কাঠের কাঠামোর উপর চাটাই দিয়ে তৈরী। ঘরটা হবে কতকটা আয়ত ক্ষেত্রাকার। ফলে আরোহী স্বচ্ছন্দে বসতে পারবে এবং বসবার উপযুক্ত স্থানও বাড়বে। এছাড়া ঘরের উপরের ছাদ হবে ঢেউখেলানো। মধ্যে উঁচু ও দু'পাশ ক্রমশ ঢালু, ফলে বৃষ্টির জল ভিতরে আসবে না আর দুই ছাদের মধ্যে থাকবে জিনিসপত্র রাখবার জায়গা। ঘরের সামনে পিছনে দরজা বা পর্দা লাগানো যাবে। এছাড়া ঘরের মধ্যে আরোহীদের দু'-সারিতে বসবার বন্দোবস্ত করা যাবে।



আধুনিক গরুর গাড়ি

গাড়িটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অতিরিক্ত তৃতীয় চাকা। এটি গাড়ির পিছনের দিকে একটা দণ্ডের প্রান্তে যুক্ত থাকবে। এই দণ্ডটি প্রয়োজন মত উঠিয়ে বা নামিয়ে রাখা যাবে। এই চাকাটি আকারে ছোট। যখন গাড়িতে ভার বেশি হবে, কিম্বা কর্দমাক্ত পথে চলার সময় ঐ অতিরিক্ত চাকাটি নামিয়ে দেওয়া যাবে। ফলে, গাড়ির চলার পক্ষে সহায়তা ও ঠোকা উভয়ের কাজই হবে। এই দণ্ডটি এরূপভাবে লাগানো, যাতে সামনের দিকেই কেবল ভাঁজ হতে পারে কিন্তু পিছনের দিকে পারে না।

এই মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বাদেও গাড়িটার আরও কতকগুলি গৌণ বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হল—কাদা যাতে ছিটে না আসে সেজন্যে দু-পাশের চাকার উপর লাগানো থাকবে মাডগার্ড। এটি টিনের তৈরি হবে। চালককে রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তার উপর

থাকবে ছাদ। এটা গাড়ির দু'পাশের দুটি দণ্ডের সঙ্গে আটকানো থাকবে। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছাদটা একটু ঢালু থাকবে। চালকের বসবার জন্যে আরামপ্রদ ও সুবিধাজনকভাবে প্রস্তুত আসন থাকবে। আর থাকবে হর্ণ। এটা রাস্তার যানবাহন ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজন। ঐ একই কাজে ব্যবহারের জন্যে গাড়ির পিছন দিকে লণ্ঠনও ঝুলিয়ে রাখা প্রয়োজন। গাড়ির থেকে গরুগুলি খুলবার সময় যাতে সামনের দিকের যন্ত্রপাতিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্যে সামনের দিকে একটা ঠোকা লাগানো থাকবে।

গাড়িটাকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে তৈরি করবার জন্যে গাড়ির মূলদেহ বাঁশ ও কাঠেরই, কতকটা সাধারণ গাড়ির মত তৈরি করা হয়েছে। আর এই গাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণও চালক নিজেই করতে পারবে। বর্তমানে প্রচলিত গাড়িগুলির মত এটাকেও অতি সহজেই তারা ব্যবহার করতে পারবে। গাড়িটা এইরকমভাবে প্রস্তুত—যাতে চালক নিজেই টুকিটাকি সারিয়ে নিতে পারবে। সর্বোপরি, এই গাড়িটার তৈরির খরচও খুব বেশি নয়। এইরকম গাড়ির মাধ্যমে এ দেশের গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক শিল্পের প্রসার সম্ভব। কারণ, গাড়িটার উপরের ঘরটি ইচ্ছামত খোলা যায়। প্রয়োজনমত এটা খুলে উপরে মালপত্র নিয়েও গাড়িটা চালানো যাবে। কিম্বা মালপত্র পরিবহনের জন্যে গাড়ির উপরে কাঠের খোলা বাক্সও লাগিয়ে নেওয়া চলবে। এই রকম দুই ভাবেই ব্যবহার করার উপযোগী করে গাড়িটাকে তৈরি করা হয়েছে। এই গাড়ি ব্যবহার করে যেমন সময়ের সাশ্রয় হবে, তেমনি অনেক বেশি উপার্জনের সুবিধা হবে। ফলে, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থারও কিঞ্চিৎ উন্নতি হতে পারবে।

মণীষ কুমার ব্যানার্জী*

5/ডি, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-700 067

লেখক ও প্রকাশকদিগের প্রতি নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' নিয়মিত বিজ্ঞান পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনা প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান পুস্তক লেখক ও প্রকাশকদিগকে দুই কপি পুস্তক পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।"

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দেখার এক নতুন কায়দা

আমাদের চোখে-দেখা জিনিসের ছবি তোলাকে বলে আলোক-চিত্র-গ্রহণ পদ্ধতি বা ফোটোগ্রাফি (photography)। আমাদের চোখে-দেখা জিনিসের তো বটেই চোখে-না-দেখা জিনিসেরও তাপের ছবি (heat picture) তোলাকে বলে তাপ-চিত্র-গ্রহণ পদ্ধতি বা থার্মোগ্র্যাফি (thermography)।

থার্মোগ্র্যাফি ব্যাপারটা কি, আর একটু প্রাঞ্জল করে বলা দরকার। বস্তুরই তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে—তা থেকে কতটা অবলোহিত রশ্মি বিকিরিত হবে। বিকিরিত অবলোহিত তাপরশ্মি দৃশ্য আলোর মতই ফটোগ্র্যাফের প্লেটে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অবশ্য এর জন্যে বিশেষ ধরনের প্লেট দরকার। তাপরশ্মির সাহায্যে তোলা ছবিই হল থার্মোগ্রাফ।

থার্মোগ্র্যাফির সম্ভাবনা বা কর্মশক্তি অসীম। শরীরে হয়ত একটা টিউমার হতে চলেছে। এখনও এমন কোন আকারের হয় নি যে সেটাকে টিউমার বলা চলে—এই আলপিনের ডগার সাইজ হয়েছে ধরা যাক। থার্মোগ্র্যাফিতে তা ধরা পড়ে যাবে। ঐ জায়গার বর্ধিত তাপমাত্রাই তার নির্দেশ দেবে। তাপ-নিয়ন্ত্রিত একটা ঘরের দেয়ালের এক জায়গার অন্তরণ (insulation) খারাপ হয়ে গেছে; সেখান দিয়ে তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। থার্মোগ্র্যাফিতে ধরা পড়ে যাবে ঠিক কোন্‌খানটিতে দেয়ালের অন্তরণে দোষ আছে। কারখানার চুল্লীর দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ধাতু ক্ষয়ে গেছে বা ফেটে গেছে বা নরম হয়ে গেছে যাতে কারখানার লোকদের জীবন সংশয় পর্যন্ত হতে পারে। চুল্লীটিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। থার্মোগ্র্যাফিতে কিন্তু এগুলি সহজেই ধরা পড়ে যাবে। মানুষের পায়ের রক্ত বহনকারী নলের কোথাও হয়ত ঠিক মত কাজ হচ্ছে না যার ফলে শিরাস্ফীতি (varicose veins) হতে পারে। থার্মোগ্র্যাফি চিনিয়ে দেবে কোন্ রক্ত বহনকারী নলটি কাজ করছে না।

থার্মোগ্র্যাফ অনেকটা দেখতে একটা ছোট্ট টেলিভিশন ক্যামেরার মত। যে বাস্তব থার্মোগ্র্যাফি নিতে হবে, যন্ত্রটি সেদিকে জায়গামত রাখলেই যন্ত্রসংলগ্ন পর্দায় ফুটে উঠবে সেই জিনিসটার সাদা-কালো তাপ-চিত্র। সাধারণত যে-সব জায়গা গরম, সেই জায়গাগুলি হাল্‌কাভাবে চিত্রিত হয়। আর, ঠাণ্ডা জায়গাগুলি চিত্রিত হয় গাঢ়ভাবে। ছবিটাকে দেখায় অনেকটা সাধারণ একটা ফোটোগ্রাফ-নেগেটিভের মত। তবে কিছু কিছু পদ্ধতিতে সাদা-কালো আবার উল্‌টোভাবেও পড়ে; তেমনি কিছু পদ্ধতিতে সুন্দর সুন্দর রং-বেরং চিত্রও পাওয়া যায়।

এই থার্মোগ্র্যাফির একটা পদ্ধতিতে অতীতের ঘটনার ছবিও পাওয়া যায়। যেমন, একটা চেয়ারে কয়েক মিনিটের জন্যে একজন লোক বসে উঠে গেছে। সেই খালি চেয়ারে ফোকাস করে পূর্বোক্ত মানুষটি তার দেহের যে উত্তাপ চেয়ারে রেখে গেছে তার তাপ-চিত্র পাওয়া যাবে। ভাবতে অদ্ভুত লাগে বটে! আর ছবিটা এতই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কেউ যদি পা দুটি মুড়ে চেয়ারে বসে গিয়ে থাকে তাও বোঝা যাবে যে লোকটা পা দুটি মুড়ে চেয়ারে বসেছিল।

থার্মোগ্র্যাফির সবচেয়ে মূল্যবান ব্যবহার হচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। বহুক্ষেত্রেই এটা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে এবং রোগের চিকিৎসাতে ডাক্তারদের নৈপুণ্যে সহায়তা করেছে। ব্রেস্ট টিউমার নিরূপণে এটা বিশেষ সাহায্য করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। চামড়ার উপর কোন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ (growth) যে বাড়তি তাপ উৎপাদন করে তা আশেপাশের চামড়ার তাপের চেয়ে পৃথক হয়ে ফুটে ওঠে।

ব্রেস্ট ক্যানসারের প্রচলিত পরীক্ষা হচ্ছে ম্যামোগ্র্যাফি (ব্রেস্ট-এর এক্স-রে) এবং ক্লিনিক্যাল্ পরীক্ষা। কিন্তু এ দুটি পদ্ধতিতে ব্রেস্ট ক্যানসারের যাবতীয় ব্যাপার ধরা পড়ে না। অনেক ছোট ছোট ক্যান্সারের সম্ভাবনা থার্মোগ্র্যাফি নির্দেশ করতে পারে যা কিনা ঐ দুটি পদ্ধতিতে হদিশ করা যায় না। ফলে, ঐ দুটি পদ্ধতির সঙ্গে থার্মোগ্র্যাফি যুক্ত হওয়াতে এখন ব্রেস্ট ক্যানসার নিরূপণ 92 শতাংশই নির্ভুল হচ্ছে। তাই এই যন্ত্রটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতির বাহন।

চামড়ার উপরকার তাপের তারতম্য পৃথক করার ক্ষমতা থার্মোগ্র্যাফির আছে বলেই রক্ত-সঞ্চালন সমস্যার প্রশ্নে এর ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। শিরাস্ফীতির বিষয়টাই ধরা যাক্। শিরার ভিতরকার ভাল্ভ্গুলি বিকল হয়ে পড়ার দরুণই এই রোগের উৎপত্তি হয় এবং স্বাভাবিক রক্তস্রোতের পথে তখন তা বাধার সৃষ্টি করে। খুব গুরুতর অবস্থাতে এই সব শিরা (incompetent veins) অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু যতবারই অস্ত্রোপচার করা হোক না কেন ভাল হয়ে গেলেও এই রোগ বার বার ফিরে আসে; কারণ রোগীর দেহে কিছু কিছু অক্ষম শিরা খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। ফলে সেখান দিয়েই আবার রোগের আক্রমণ হয়। এখানে থার্মোগ্র্যাফির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অক্ষম শিরার উপরকার চামড়ায় রক্তের তাপ অন্যান্য স্থান থেকে বেশি হওয়ায় থার্মোগ্র্যাফিতে এই সব অক্ষম শিরার অবস্থানগুলি ধরা পড়ে। এইরূপে দোষযুক্ত শিরার অন্তত 40 শতাংশই স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাতে ধরা যেত না, কিন্তু থার্মোগ্র্যাফিতে এখন প্রায় 95 শতাংশই নির্ভুলভাবে ধরা পড়ছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে থার্মোগ্র্যাফির ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। দেহের কোন অংশ যখন সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যায় তখন সেই জায়গায় কোন রক্ত প্রবাহিত হয় না; ফলে, সেই জায়গায় তাপমাত্রার তফাৎ হয়। এ অবস্থায় থার্মোগ্রাম পোড়ার গভীরতা বলে দেয়। তাতে যেমন চিকিৎসা-ব্যবস্থা দ্রুততর হয় তেমনি বিষ সংক্রমণের আশংকাও কমে যায়। সন্ধিবাতজনিত অস্থিপ্রদাহ কতটা স্থান জুড়ে আক্রমণ করেছে তাও থার্মোগ্রাম পরিষ্কার বলে দিতে পারে। মাথায় রক্ত-প্রবাহ কমে গেলে থার্মোগ্রামই যথাযথ নির্দেশ দেয় — যে-নির্দেশকে সম্ভাব্য স্ট্রোক্-এর সাবধান-সংকেত বলেই ধরে নেওয়া হয়।

থার্মোগ্র্যাফি যেমন জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে তেমনি অর্থ বাঁচাতেও পারে। যেমন, থার্মোগ্র্যাফের সাহায্যে কোনো তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের কোথা দিয়ে তাপ লীক্ করছে তা বোঝা যায়; ফলে, মালিকের জ্বালানি খরচের বিল কমাতে সাহায্য করে। শিল্পেও থার্মোগ্র্যাফির মূল্য কম নয়। যেমন, ইস্পাত শিল্পে হঠাৎ যদি চুল্লীর দেয়াল বিদীর্ণ হয়ে যায় তাহলে টন টন গলিত ধাতু নষ্ট হয়ে

যাবে, তেমনি নষ্ট হবে কোটি কোটি টাকা। থার্মোগ্রাফের সাহায্য পেলে ইন্সপেক্টর্‌রা আগে থেকেই জানতে পারেন কোথায় 'উইক্ স্পট্' গড়ে উঠছে।

কলকারখানার পরিত্যক্ত বাজে জিনিস নদীতে পড়ে নদীর জল প্রায়ই কলুষিত করে। সে সব অবস্থাতেও থার্মোগ্রাফ নিয়ে হেলিকপ্টার থেকে সার্ভে করে পল্যুশন-কন্ট্রোল এক্সপার্ট্‌রা ঐসব পরিত্যক্ত জিনিসের উৎস কোথায় তার সন্ধান করতে পারেন। সাধারণত ঐসব পরিত্যক্ত জিনিসের তাপ নদীর জলের তাপের চেয়ে বেশি, তাই থার্মোগ্রাফ তার কাজ এখানেও দেখাতে পারে।

যেহেতু থার্মোগ্রাফি বিরাট জায়গার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গরম জায়গাগুলি পৃথকভাবে দেখাতে পারে সেজন্যে দেখা যায় এর সম্ভাব্য ব্যবহার নাটকীয়তাপূর্ণ। বহনযোগ্য থার্মোগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ধোঁয়া ভর্তি ঘরে অতি সহজেই এই যন্ত্রের সাহায্যে আগুনের উৎস কোথায় তার সন্ধান করা যায়। তেমনি ধোঁয়ার মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রে কেউ হারিয়ে যায় তাকেও খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

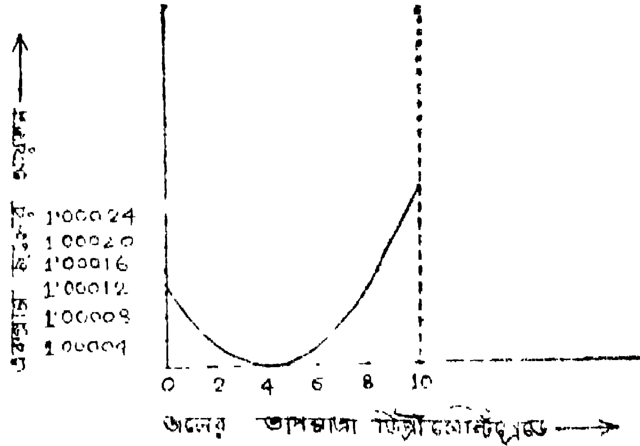
থার্মোগ্রাফির যে কত রকম কুশল ব্যবহার হতে পারে তার আর শেষ নেই। মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক দেশে এক সময় সীমান্ত রক্ষীরা কিছুতেই বেআইনীভাবে ওষুধ পাচার বন্ধ করতে পারছিল না। এই সমস্যার একটা প্রধান অংশ এই ছিল যে—জল, পেট্রল ও অন্যান্য তরল পদার্থ বহন করে যে-সব বড় বড় ট্যাঙ্কার, কাস্টমের বেড়া পার হত সেই ট্যাঙ্কারগুলি পুরোপুরি সার্চ করে দেখা একরকম অসম্ভব ছিল। চোরাকারবারীরা এটা বুঝেছিল বলেই তারা ট্যাঙ্কারের গোপন প্রকোষ্ঠে মুখ-বন্ধ-করা আধারে নির্বিঘ্নে ওষুধ পাচার করে যেত। এখন কথা হচ্ছে, জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থ কঠিন পদার্থের চেয়ে সাধারণভাবেই দেরীতে গরম হয়ে ওঠে। রাত্রির ঠাণ্ডার পরে যখন সূর্য ওঠে তখন ট্যাঙ্কের ভিতরে রক্ষিত তরল পদার্থে বেষ্টিত কঠিন জিনিসটাই আগে গরম হয়ে ওঠে, পরে গরম হয় তরল পদার্থ। এই সূত্রটাই পুলিশকে সাহায্য করল। তারা সূর্য ওঠার পরে ট্যাঙ্কারগুলি পরীক্ষা করতে লাগল এবং ওষুধের সেই প্রকোষ্ঠগুলি থার্মোগ্রামে স্পষ্ট ধরা পড়ে গেল। এই সব হতভাগ্য চোরাকারবারীরা নিশ্চয়ই তখন এই আবিষ্কারকে অলৌকিক কাণ্ড বলেই মনে করেছিল। আর, সত্যি কথা বলতে কি মানুষের জীবনকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাবার পবিত্র কাজে ব্যবহৃত এই যে দেখার এক নতুন কায়দা তা বাস্তবিক পক্ষে এক অদ্ভুত ব্যাপারই বটে!

সুনীলাংশু দাশ*

11, সেন্টার সিটি রোড, ফ্ল্যাট-এল 6, কলিকাতা 700 050

জলের ঘনত্ব – 4° সেন্টিগ্রেডে

বিজ্ঞানী টি. সি. হোপ-এর (T. C. Hope) জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ সম্পর্কিত পরীক্ষাটি পদার্থবিদ্‌গণের নিকট সুপরিচিত। 1805 খৃষ্টাব্দে তিনি এই পরীক্ষাটি সুসম্পন্ন করেন এবং এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে জলের ঘনত্ব 4°C এ সবচেয়ে বেশি।



চিত্র 1

1 গ্রাম জলের আয়তন তাপমাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয় লেখাচিত্রের সাহায্যে এখানে তা প্রদর্শিত হল। স্পষ্টত 4°C এ জলের আয়তন সবচেয়ে কম অর্থাৎ ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই এর থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। (চিত্র 1)।

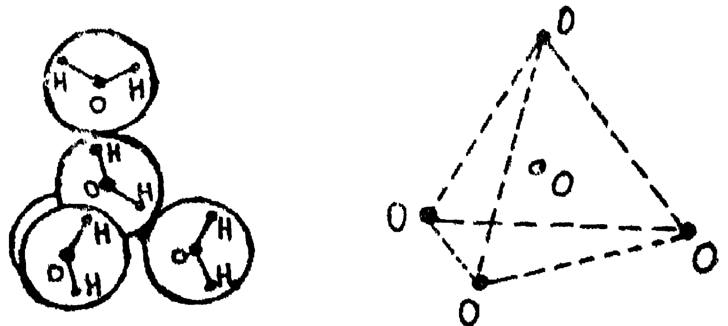
জলের এইরূপ ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের জন্যে শীতপ্রধান দেশে পুকুর এবং হ্রদের জলের উপরিভাগ বরফে পরিণত হলেও নিম্নভাগের জল জলচর প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রাখে। 4°C এ জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি —তাই জলাশয়ের তলদেশে শীতল জলধারা অবস্থান করে।

অন্য কোন তরলের ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ সম্পর্কিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় না। জলের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়ার কারণ প্রধানত আণবিক ঘটনা।

অবশ্য জলে অবদ্রব্য দ্রবীভূত থাকলে জলের সবচেয়ে বেশি ঘনত্বের তাপমাত্রা 4°C অপেক্ষা কম পরিলক্ষিত হয়।

জলের ঘনত্ব 4°C এ সবচেয়ে বেশি —এর মূলে যে বৈজ্ঞানিক রহস্য রয়েছে, সেটা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাধারণভাবে জলের একটি অণু অপর চারটি অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি চতুস্তলক (tetrahedron) গঠন করে (চিত্র 2)। এর ফলে জল ভঙ্গুর, ফিতাসদৃশ এবং স্ফটিক বা কেলাসের আকৃতি লাভ করে। এখন তাপমাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অণুগুলির সংযোগ (bonds) ছিন্ন হয় এবং অধিক সংখ্যক বন্ধনহীন অণু চতুস্তলকের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে। ফলে জলের স্ফটিকাকার গঠন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।



চিত্র 2

প্রসঙ্গত জলের, এইরূপ ফিতাকৃতি স্ফটিকসদৃশ গঠনের জন্যেই ভৌতধর্মের ব্যতিক্রমগুলি লক্ষ্য করা যায় এবং ব্যতিক্রান্ত তাপীয় প্রসারণও এই জন্যেই ঘটে।

অতএব তাপমাত্রাবৃদ্ধি পেলেই জলের ফিতাসদৃশ গঠনটি ভেঙ্গে পড়ে এবং অণুগুলি আরও বেশি কাছাকাছি হয়ে ঘনীভূত হয়। ফলে আয়তন সঙ্কুচিত হয় এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। 4^0C পর্যন্ত জলের এইরূপ গঠনসংক্রান্ত ক্রিয়া প্রভাবশালী থাকে এবং 4^0C-এ জলের আয়তন সর্বনিম্ন অর্থাৎ ঘনত্ব সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হয়।

তারপর 4^0C এর অধিক তাপমাত্রা পেলে আন্তর্আণবিক কম্পন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরমাণুগুলির মধ্যের গড় দূরত্ব বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ঘনত্ব কমতে থাকে। বলা বাহুল্য কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে তাপপ্রযুক্ত হলে যে প্রসারণ লক্ষ্য করা যায় তা মূলত এই কারণেই ঘটে থাকে।

সুশীলকুমার নাথ*

* গ্রাম-স্থিরপাড়া, পোঃ-মণ্ডলপাড়া, জেলা-24 পরগণা।

জেনে রাখ

জ্বরের সময় সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

জ্বরের সময় সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত—এই কথাটা বাবা, মা, ঠাকুরমা-দিদিমা অনেকের কাছেই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর সঠিক কারণ হয়ত অনেকেরই জানা নেই। যখন জ্বর হয়, তখন দেহের তাপমাত্রা বাড়ার জন্যে শ্বাসকার্যের গতিবেগ, হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের হার প্রভৃতি সকল জৈবনিক কাজের হার বেড়ে যায়। ফলে ব্যাসাল-মেটাবলিক রেট (B.M.R.) বা মৌল বিপাক (যখন কোন প্রাণী সম্পূর্ণ বিশ্রাম অবস্থায় থাকে তখনও তার দেহ থেকে শক্তি নির্গত হয়। একেই মৌল বিপাক বা ব্যাসাল মেটাবলিক রেট [B.M.R.] বলে।) দ্বিগুণের চেয়েও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় যদি কাজ করা হয়, তাহলে অপচিতির হার বেড়ে যাবে অর্থাৎ শরীরের গঠনক্রিয়ার চেয়ে ধ্বংসক্রিয়াই বেশি হবে। ফলে ক্রমাগত শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সেজন্যে জ্বর হলে সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন অত্যন্ত আবশ্যক।

গণেশচন্দ্র ঘোষ*

* খরিদা। পাঠক বাজার, পোঃ-খড়্গপুর, জেলা-মেদিনীপুর

ভেবে কর

নিচের প্রশ্নগুলির তিনটি উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করতে হবে। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করবার জন্যে নির্ধারিত সময় মাত্র পনের মিনিট। ঐ সময়সীমার মধ্যে সঠিকভাবে কুড়িটির বেশি পারলে 'A' গ্রেড পাবে এবং পনেরটির বেশি পারলে 'B' গ্রেড পাবে এই ভাবে নিজেদের মূল্যায়ন করতে পার।

1. একটি তরলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে তুলে আনার পর দেখা গেল হাত একটুও ভেজে নি। তরলটার নাম বলতে পার ?

(a) স্পিরিট (b) পারদ (c) বেন্‌জিন

2. নিচের সংখ্যাগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজানো আছে। শূন্যস্থানের সংখ্যাটি বের কর।

(i) 2, 5, 10, 17,—,37 (a) 30 (b) 34 (c) 26

(ii) 1, 2,—, 24, 120, 720 (a) 6 (b) 8 (c) 12

3. আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগসম্পন্ন কণার নাম—

(a) ট্যাকিয়ন (b) মেশন (c) কোয়ার্ক

4. 'ডায়ালিসিস্' কথাটি বিজ্ঞানের যে শাখার সঙ্গে যুক্ত তার নাম—

(a) পদার্থবিদ্যা (b) অংকশাস্ত্র (c) চিকিৎসাশাস্ত্র

5. একটি ফুলকে লাল দেখায় তার কারণ হল—

(a) তা সূর্যের আলোর লাল রঙটি শোষণ করে।

(b) তা সূর্যের আলোর লাল রঙ ছাড়া আর সব রঙ শোষণ করে।

(c) এর উপর সূর্যের আলো পড়লে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়।

6. কোন মানুষের স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের মান প্রতি মিনিটে

(a) 30-32 বার, (b) 18-22 বার, (c) 12-16 বার।

7. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পান—

(a) আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের জন্যে

(b) আলোক-তড়িৎ ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার এবং অন্যান্য তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার কাজের জন্যে

(c) কোয়াণ্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে

8. পরিবর্তী প্রবাহ (alternating current) থেকে সমপ্রবাহ (direct current) পাওয়ার জন্যে যে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয় তার নাম—

(a) ট্রান্সফর্মার (b) ট্রানজিস্টর (c) রেক্‌টিফায়ার

9. তুঁতে বা ব্লু ভিট্রিয়ল (blue vitriol)-এর রাসায়নিক সংকেত হল—

(a) $CuSO_4, 5H_2O$ (b) $MgSO_4, 7H_2O$ (c) $ZnSO_4, 7H_2O$

10. যে ভিটামিনের অভাবের জন্যে 'রিকেট' রোগ হয় তা হল—
(a) ভিটামিন-কে (b) ভিটামিন-ডি (c) ভিটামিন-এ

11. নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের বোমাগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে শক্তিশালী ?
(a) পরমাণু বোমা (b) হাইড্রোজেন বোমা (c) কোবাল্ট বোমা

12. নিম্নলিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কার কাঠিন্য সবচেয়ে বেশি ?
(a) লোহা (b) হীরক (c) সীসা

13. নবআবিষ্কৃত পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণার নাম—
(a) কোয়ার্ক (b) ট্যাকিয়ন (c) কোয়াণ্টাম

14. পদার্থের চতুর্থ অবস্থার নাম—
(a) তরল (b) প্লাজ্‌মা (c) গ্যাস

15. মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল—
(a) $98.6^{\circ}F$ (b) $96.8^{\circ}F$ (c) $89.4^{\circ}F$

16. 256 ফুট গভীরতাবিশিষ্ট একটি পাতকুয়োর উপর থেকে একটি ঢিলকে ছেড়ে দিলে কত সময়ে নিচে গিয়ে পৌঁছবে ?
(a) 2 সেকেণ্ড (b) 6 সেকেণ্ড (c) 4 সেকেণ্ড

17. লাফিং গ্যাসের নাম—
(a) নাইট্রিক অক্সাইড (b) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (c) নাইট্রাস অক্সাইড

18. কোন্‌টির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি ?
(a) শব্দতরঙ্গ (b) আলোক তরঙ্গ (c) তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ

19. পিতার বয়েস যখন 30 বছর তখন পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রের বয়স যখন 30 বছর তখন পিতার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুর সময় পিতাপুত্রের বয়সের সমষ্টি কত ?
(a) 30 বছর (b) 60 বছর (c) 90 বছর

20. সূর্য নিজের অক্ষের চারিদিকে একবার পূর্ণ আবর্তনে সময় নেয়—
(a) 27 দিন (b) 31 দিন (c) 365 দিন

21. 'আলোকবর্ষ'—এই একক দিয়ে কি মাপা হয় ?
(a) দূরত্ব (b) সময় (c) আলোর গতিবেগ

22. মার্স গ্যাসের রাসায়নিক নাম—
(a) ইথিলিন (b) মিথেন (c) ইথেন

23. বৈদ্যুতিক পাখার কার্যপ্রণালী কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ?
(a) মোটর নীতি (b) ডায়নামো নীতি (c) এ দুটির কোনটাই নয়।

(সমাধান 192 নং পৃষ্ঠায়)

তুষারকান্তি দাশ*

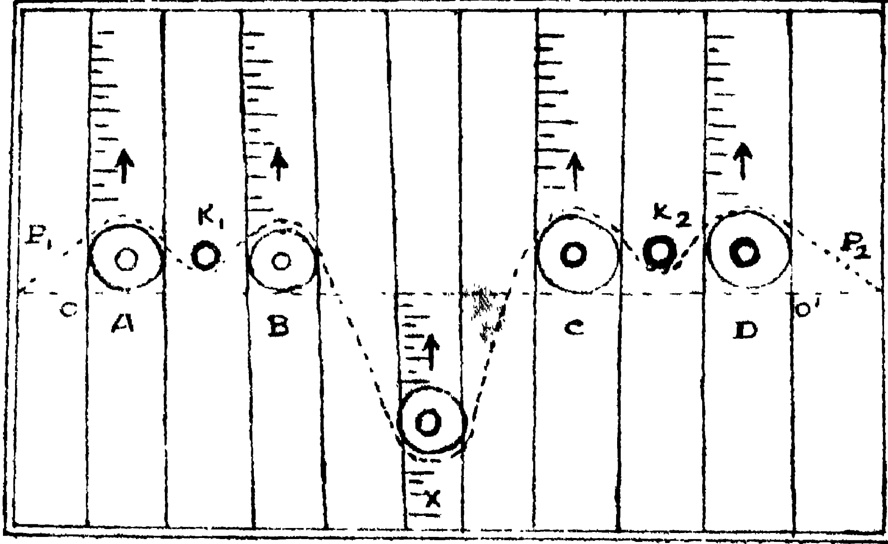
* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

মডেল তৈরি

(1)

যান্ত্রিক উপায়ে যোগ করা

আজ অধিকাংশ কঠিন বা জটিল অঙ্ক করতে গিয়ে মানুষ সাহায্য নেয় যে যন্ত্রের, তার নাম কম্পিউটার। জটিল অঙ্কের সমাধানের জন্যে এর গঠনও জটিল। কিন্তু যন্ত্রের এই জটিল রূপ তৈরি হয় বহুদিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে। প্রথম অবস্থায় মানুষ চেষ্টা করে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে করতে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ প্রথমে কেমন করে যোগ করতো—তারই একটা মডেল এখানে দেওয়া হল।



এই মডেলটি তৈরি করার জন্যে প্রয়োজন কয়েকটি পুলি এবং একটি চেন। পুলি এবং চেনের সাহায্যে সাধারণ ভারি জিনিস তোলা ও অন্যান্য কাজ করা হয়ে থাকে কিন্তু এখানে ঐ পুলি ও চেন দিয়ে অঙ্ক করা হবে। এখানে চারটি সংখ্যা A, B, C, D-র যোগ করা হবে; এর জন্যে পাঁচটি সমান আকারের সচলপুলি A, B, C, D, X এবং দুটি অচল পুলি K_1 ও K_2 ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্র অনুসারে সচল পুলির উপর দিয়ে এবং অচল পুলির নিচ দিয়ে চেনের দু-মাথা বার করে দেয়ালের P_1 এবং P_2 বিন্দুতে আটকে দেওয়া হল। চারটি পুলি A, B, C, D প্রথমে একই তলে OO' রেখা বরাবর রাখা হল এবং এই OO' রেখা বরাবরই চারটি পুলির 'শূন্য' এবং এই লাইনের উপরে এক একটি পুলি উঠিয়ে তাকে স্কেলের গায়ে এক একটি সংখ্যার গায়ে আটকে রাখা হয়। এখন পুলিগুলির সঙ্গে স্কেলের সংখ্যাগুলির যোগফলই পাওয়া প্রয়োজন। এই যোগফল পাওয়া যাবে X পুলির সঙ্গে সংযুক্ত স্কেল থেকে। A,B,C, D পুলির

ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে X পুলিও ওঠানামা করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, OO´ বরাবর X পুলির সঙ্গে সংযুক্ত স্কেলের সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি থাকবে এবং 'শূন্য' থাকবে A, B, C, D চারটি পুলি যখন OO´ লাইন বরাবর অবস্থান করবে—তখন X পুলি স্কেলের গায়ে যেখানে অবস্থান করবে সেখানে। এভাবে একবার বিভিন্ন পুলির অবস্থানের সঙ্গে স্কেলের পাঠের সম্পর্ক ঠিক করে নিয়ে বিভিন্ন সংখ্যার যোগ করা সম্ভব হবে। $X = A + B + C + D$

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়*

* 3/3, রামচাঁদ নন্দী লেন কলিকাতা-700006

শব্দ-কূট

1.			X	2.			X	3.	
4.			X	5.			X	6.	7.
	X	X	8.			X	9.		
10.	11.			X	X	X	12.		
X	13.			X	14.			X	
15.		X	X	16.			X	X	X
	X	17.		X		X	18.	19.	20.
	23.		X	21.	22.		X		
X		X	X	24.			25.	X	X
26.			X		X	X	27.		X

পাশাপাশি

1. ইলেকট্রনের আধানের ভগ্নাংশ আধান বিশিষ্ট প্রাথমিক কণা,
2. সিমেট্রিক স্ট্যাটিসটিক্স মেনে চলে যে সমস্ত কণা,
3. কাপড় কাচার উপাদান,
4. দ্রাবক ও দ্রবণের বাষ্পচাপ সংক্রান্ত সূত্রের প্রতিষ্ঠাতা,
5. বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী,
6. একমুখী তড়িত প্রবাহ,
8. তাপ কণিকা,
10 এক প্রকারের শর্করা,
12. মহাবিশ্বের চতুর্থ মাত্রা,
13. কৃত্রিম রেশম,
14. যে সব প্রাথমিক কণা তীব্র মিথস্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তাদের শ্রেণীগত নাম,
15. বস্তুর প্রতিবিম্ব গড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ চেহারার স্বচ্ছ বস্তুখণ্ড,
16. বিখ্যাত বিজ্ঞানী যাঁর নিয়ম অনুসারে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তড়িদাহিত কণার গতিপথ নির্দিষ্ট হয়,
17. বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ (সপ্তদশ শতক),
18 ঊনবিংশ শতকের আমেরিকান পদার্থবিদ—যিনি তাপগতিবিদ্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে বিখ্যাত,

21. ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রাথমিক কণিকা,

24. ঊনবিংশ শতকের বৃটিশ পদার্থবিদ, যিনি ক্ষুদ্র পদার্থ কণিকা থেকে আলোর বিচ্ছুরণের উপর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং তার ভিত্তিতে আকাশের নীলিমার ব্যাখ্যা দেন,

26. নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান পদার্থবিদ,

27. দৈর্ঘ্যের একক।

কো	য়া	র্ক	X	বো	স	ন	X	মো	রু
রা	উ	ল্ট	X	র	ম	ন	X	স্ক	বি
ন্ডা	X	X	ফো	ন	ন	X	মে	য়া	ডি
ম	লি	বে	ট	X	X	X	স	ম	য়া
X	রে	য়	ন	X	হ্যা	ড্র	ন	X	ম
লে	ন্জ	X	X	ফ্লে	মি	ং	X	X	X
প	X	ফে	র্মি	X	ল	X	স্পি	ব	ম
টন	ল	র্মি	X	প্রো	ট-	ন	X	ন্ট	ক্তি
X	দ্য	X	X	স্ম	ন	ওয়া	ল	X	X
প্ল্যা	ঙ্ক	য়ে	X	ন	X	X	গ	জ	X

শব্দকূটের সমাধান

উপর-নীচ

1. অ্যালুমিনার স্ফটিক রূপ,

2. পর্যায় সারণীর IIIA গ্রুপের একটি মৌলিক পদার্থ,

3. পর্যায় সারণীর IA পর্যায়ের একটি মৌলিক পদার্থ,

7. পর্যায় সারণির IA পর্যায়েরই আর একটি মৌলিক পদার্থ,

9. বিশেষ এক ধরণের প্রাথমিক কণার মিথস্ক্রিয়ার মধ্যস্থ কণা,

11. নোবেল পুরস্কারবিজয়ী আমেরিকান পদার্থবিদ,

14. বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ (ঊনবিংশ শতক),

15. নোবেল পুরস্কারবিজয়ী জার্মান পদার্থবিদ,

17. অতিক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক,

19. নোবেল পুরস্কারবিজয়ী (1954) জার্মান পদার্থবিদ,

20 আইসোটোপের উপর গবেষণার জন্যে রসায়নে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৃটিশ বিজ্ঞানী,

21. অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গড়ে-ওঠা প্রাণীদেহের অন্যতম মৌলিক উপাদান

23. নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রাশিয়ান পদার্থবিদ,

25. বিশেষ গাণিতিক অপেক্ষক।

গৌতম বিশ্বাস*

* 69, কে. পি. চট্টরাজ রোড বহরমপুর · 742 101

'ভেবে কর' শীর্ষক প্রশ্নাবলীর উত্তর

1. (b), 2. (i) (c), 2 (ii) (a), 3. (a), 4. (c), 5. (b), 6. (b), 7. (b), 8. (c), 9. (a), 10. (b), 11. (c), 12. (b) 13. (a), 14. (b), 15. (a), 16. (c), 17. (c), 18. (a), 19. (c), 20. (a), 21. (a), 22. (b), 23. (a)

পরীক্ষা কর মজা পাবে

(1)

একটা পাইরেক্স কাচের তৈরী টেস্ট টিউবের কিছুটা পটাশিয়াম নাইট্রেট নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গরম করে গলিয়ে নাও। গলে-যাওয়া পটাশিয়াম নাইট্রেটের উপর কিছুটা কাঠ-কয়লার গুঁড়ো (চারকোল পাউডার) উপর থেকে নিক্ষেপ কর। পরীক্ষাটা কোন অন্ধকার স্থানে করলে দেখবে, কাঠ-কয়লার গুঁড়ো ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র গোলাপী আলোয় ঘরটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে! তার সঙ্গে আরও দেখবে—কাঠ-কয়লার গুঁড়ো পটাশিয়াম নাইট্রেটের উপর গতিশীল অবস্থায় থাকবে। এজন্যে অল্প শব্দও শোনা যায়।

এর কারণ হল উচ্চ তাপে পটাশিয়াম নাইট্রেট থেকে অক্সিজেন নির্গত হয় যা কার্বনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। বিক্রিয়া করার সময় ঐ শব্দ শোনা যাবে। পটাশিয়াম নাইট্রেটে পটাশিয়াম ধাতু উপরিউক্ত আলো দেয়।

(2)

কোন সাদা কাপড়কে ইচ্ছামত বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে মজা করা যায়। এখানে একটি পরীক্ষার কথা বলছি যা করে দেখতে পার।

তিনটি পাত্রের প্রত্যেকটাতে 200 সি.সি. করে জল নাও। একটাতে প্রায় 15 গ্রাম পটাশিয়াম থাইওসায়ানেট, আর একটাতে প্রায় 20 গ্রাম পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইড এবং বাকি পাত্রে প্রায় 50 গ্রাম ফেরিক ক্লোরাইড নিয়ে জলীয় দ্রবণ তৈরি কর। এবার কাপড়টা প্রথমে ফেরিক ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে ভিজিয়ে নাও। ভিজে কাপড়টিকে থাইওসায়ানেটের জলীয় দ্রবণে ডোবালে কাপড়টার রঙ লাল হয়ে যাবে। থাইওসায়ানেট দ্রবণে না ডুবিয়ে কাপড়টা পটাশিয়াম ফেরোসায়ানেডের জলীয় দ্রবণে ডোবালে তার রঙ নীল হয়ে যাবে।

এই পরীক্ষায় ফেরিক ক্লোরাইডের লোহা ফেরোসায়ানাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় নীল রঙ তৈরি করে এবং পটাশিয়াম থাইওসায়ানেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে টকটকে লাল রঙ তৈরি করে।

আরতি পাল*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ 1. মাডাম কুরী কি জন্যে নোবেল পুরস্কার পান ?

কবিতা পাল
বারাসত, 24-পরগণা

2. (ক) কিভাবে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয় ?

(খ) সাধারণত কি কি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় ?

(গ) P^{32} আইসোটোপটি কোন্ কোন্ রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় ?

শ্যামল রায়, আবদার রউফ জয়দেব খাঁড়া
কাঁঠালপাড়া, মেদিনীপুর

3. আর্কিঅপ্টেরিক্স্ কি ?

সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-700 072

উত্তর ঃ 1. মাডাম কুরী ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী 1903 সালে নোবেল পুরস্কার পান। 1898 সালে তাঁরা পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম নামে দুটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। তবে, পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তরকারী অবদানের জন্যেই তাঁদের ঐ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করার জন্যে হেনরী বেকেরেলের সঙ্গে মাডাম কুরী আবার যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পান 1911 সালে। মাডাম কুরীই সর্বপ্রথম দু-বার এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন।

2. (ক) জৈব পদার্থের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করেই ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় এই বিকিরণ প্রয়োগ করা হয়। জৈব পদার্থে বিকিরণ প্রয়োগ করলে কোষ-বিভাজন শুরু হতে দেরী হয় ; কোষ-বিভাজন বন্ধ হয়ে যায় কিংবা কোষ হঠাৎ বা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। কোষ ও বিকিরণের প্রকৃতির উপর তা নির্ভর করে।

দেহের কোন অংশের কোষ বা কোষসমষ্টি যদি দূষিত কিংবা প্রাণঘাতী হয়, তবে সেখানকার কোষগুলি বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় দেহের ঐ অংশটি ক্যান্সার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বলা হয়। অংশটিতে বিকিরণ প্রয়োগ করলে তার প্রভাবে দূষিত কোষগুলিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে ; কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং এমনকি কোষগুলি বিনষ্টও হয়। এ জন্যেই ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় বিকিরণকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

(খ) ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে রেডিয়াম এবং র‍্যাডন খুবই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তবে রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগ

করা হচ্ছে। এদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন—131, কোবাল্ট—60, সোনা—198, ফসফরাস—32 ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। রোগগ্রস্ত অংশের অবস্থা এবং গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ঐ রোগের চিকিৎসায় আইসোটোপ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(গ) P^{32} (ফসফরাস—32) নামক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটি প্রধানত লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর থেকে যে শক্তিশালী β-রশ্মি বের হয়, তা দিয়ে এক বিশেষ ধরণের চর্মরোগের (haemangioma) চিকিৎসাও করা হয়।

৬ আর্কিঅপ্টেরিক্স্ শব্দটি গ্রীক ভাষার। এর অর্থ—পুরনো পাখি। জার্মানীর একটি খনিতে এই পাখির পালক ও কংকাল আবিষ্কৃত হয়। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই পালক ও কংকাল দেখে নানা গবেষণা করে জানতে পেরেছেন, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো পাখি। বর্তমানে এই পাখির কোন অস্তিত্ব নেই। গবেষণার মাধ্যমে আর্কিঅপ্টেরিক্স সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা গেছে। এই পাখি নাকি অনেকটা কাক বা কোকিলের মত ছিল। তবে, চোখ ও মাথা ছিল কাক বা কোকিলের চেয়ে বড় এবং তাদিয়ে তারা বহুদূরে পর্যন্ত দেখতে পেত। ডানাগুলিও ছিল অপেক্ষাকৃত বড় এবং তার মধ্যে থাকত ছোট ছোট আঙুল। এই পাখির নাকি দাঁতও ছিল বলে বিজ্ঞানীরা বলেছেন। সরীসৃপের মত লম্বা লেজ এবং বেশ লম্বা দুটি পা ছিল। পাখির আঙুলে বড় বড় নখ ছিল; তার সাহায্যে এরা গাছের ডালে ইচ্ছামত ঝুলে থাকত।

আর্কিঅপ্টেরিক্স খুবই সাহসী পাখি বলে জানা গেছে। তারা আক্রান্ত হলে ডানা, নখ এবং দাঁত দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করে দিত। সাধারণত ফলমূল, পোকা, সমুদ্রের মাছ ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবনধারণ করত।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর জুলাই '78 সংখ্যা "অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন" সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। ঐ সংখ্যায় প্রকাশের জন্যে আইনষ্টাইন সম্পর্কিত প্রবন্ধ পাঠাতে লেখক / লেখিকাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার চার পৃষ্ঠার (ছবিসহ) অনধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ কার্যকরী সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে 31শে মে (1978)-এর মধ্যে পাঠাতে হবে।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

(1)

চাঁদের দেশে মাটির মানুষ

লেখক : শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী ; প্রাপ্তিস্থান : শ্রীজে এন. লাহিড়ী, পোঃ পলাশী (ভায়া—গড়াপ), জেলা—হুগলী ; পৃষ্ঠা সংখ্যা—228 ; প্রকাশ কাল — .977 ; মূল্য—কুড়ি টাকা।

চাঁদের অভিযানের উপর বাংলা ভাষায় পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই লেখকের এই সংকলন ও প্রকাশনকে বাংলা ভাষার পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবে। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি কেবলমাত্র সংগ্রাহকের কাজ করেছেন। তবে পুস্তকটিকে শুধু তথ্য-সংগ্রহ হিসাবে মনে হয় না। তথ্যগুলির বিন্যাস এবং লেখার পরিপাটি পুস্তকটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার কৌতূহল ও ঔৎসুক্য বজায় রাখে।

সমগ্র পুস্তকটিকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে চাঁদের গতি-প্রকৃতি, চাঁদের কিছু বৈশিষ্ট্য, সৌরমণ্ডলে চাঁদের অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই আলোচনার মধ্যে চাঁদের সম্বন্ধে নানা দেশের উপকথা পুস্তকটির সাহিত্যিক মূল্য যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনি গ্যালিলিও-কেপ্‌লার প্রদর্শিত পথে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের সঠিক তথ্য তুলে ধরেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে চাঁদে যাবার প্রস্তুতির জন্যে রকেট ও নানা প্রকল্পের বিবরণ এবং রাশিয়া ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা। তৃতীয় পর্যায়ে আছে নকল উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ও স্থাপন এবং বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ফলে স্বপ্নময় চাঁদের মাটিতে অ্যাপোলো যানে আমেরিকার মানুষের প্রথম পদক্ষেপ এবং রাশিয়ার যন্ত্রের পরশ। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে পাওয়া যায় মানুষের হস্তে ও যন্ত্রে সংগৃহীত চাঁদের পাথর নিয়ে গবেষণার ফলাফল এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার বিস্তৃত পথের রূপলেখাটি।

বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পুস্তকখানি তথ্যের দিক দিয়ে যেমন মূল্যবান তেমনি সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণের কাছে বইখানি কম আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয় না। এ ধরণের পুস্তক নিশ্চয়ই সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল বাড়াতে সহায়ক হবে। বানান ভুল ও অন্যান্য কিছু ত্রুটি পুস্তকটির সৌন্দর্যের কিছুটা হানি ঘটিয়েছে।

রতন মোহন খাঁ

গণিত বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা-700 009

(2)

বিজ্ঞান সংস্কৃতি—সচিত্র মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা।

সম্পাদক : সৌমেন গুহ, মূল্য : 1·50 টাকা

সমাজ পুনর্গঠনের কাজে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগকে কেন্দ্র করে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন নিবন্ধ রচনা ও পরিবেশন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে 'বিজ্ঞান সংস্কৃতি' পত্রিকাটির আবির্ভাব। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, 1978.

প্রথম খণ্ডটি পড়লে সর্বাগ্রে মনে আসে, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন, প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়বস্তুর উপর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশে সম্পাদক বিশেষভাবে প্রয়াসী। আরও মনে আসে, যাঁরা এই পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের নিষ্ঠা ও কর্মপ্রচেষ্টা খুবই উন্নত পর্যায়ের। আশা করা যায়, পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও পরিবেশিত হবে—যা তাদের বিজ্ঞান মানসিকতা উন্মেষের আরও সহায়ক হবে।

আজকের দিনে এ জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করাটা খুবই প্রশংসনীয়। পত্রিকাটি সাধারণ পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদপটটি খুবই মনোরম।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু জানতে হলে উক্ত কেন্দ্রের আহ্বায়ক শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডঃ শ্যামসুন্দর দে কিংবা শ্রীদুলাল-কুমার সাহা বা শ্রীঅসীম দত্তের সঙ্গে ঐ কেন্দ্র চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, চিঠিপত্র কর্মসচিব বা বিভাগীয় আহ্বায়কদের নামে যথাবিধি পাঠানো যাবে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে কর্মসচিব বা বিভিন্ন আহ্বায়কদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্য/সভ্যাদের সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

1লা, অক্টোবর, 1977
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'প্যাকেট সর্টিং সার্ভিস'-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

			পৃঃ
1.	উদ্ভিদ-জীবন—গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার		72
2	জড় ও শক্তি—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ		116
3	সুবাস ও সুরভি—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		88
4.	আচার্য প্রমথনাথ বসু—মনোরঞ্জন গুপ্ত		80
5.	কয়লা—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য		104
6.	খাদ্য ও পুষ্টি—শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল		95
7.	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস		120
8	খাদ্য থেকে যে শক্তি পাই—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়		173
9.	রোগ ও তাহার প্রতিকার—শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার		110
	উপরের প্রতিটি পুস্তকের মূল্য মাত্র এক টাকা		
10.	ধরিত্রী—শ্রীসুকুমার বসু	মূল্য : 50 পয়সা	76
11.	পদার্থ বিদ্যা, 1ম খণ্ড—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	মূল্য : এক টাকা	80
12.	পদার্থ বিদ্যা, 2য় খণ্ড—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	মূল্য : এক টাকা	82
13	সৌর পদার্থ বিদ্যা—শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	মূল্য : 1.50 টাকা	205
14.	ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়—ননীমাধব চৌধুরী	মূল্য : 3.50 টাকা	341
15.	আকাশ পরিচয় (2য় সংস্করণ) শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ	মূল্য : [illegible].00 টাকা	224
16.	বিদ্যুৎপার্ট সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা—সতীশরঞ্জন খাস্তগীর	মূল্য : 3.00 টাকা	61
17.	অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায়	মূল্য : 6.00 টাকা	364
18.	বোস সংখ্যায়ন—শ্রীমহাদেব দত্ত	মূল্য : 2.00 টাকা	74

প্রকাশক—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন : 55-0660

একমাত্র পরিবেশক : ওরিয়েন্ট লংম্যান অ্যাণ্ড কোং লিঃ

17, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-700 072

ফোন : 23-1601

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 5, মে, 1978

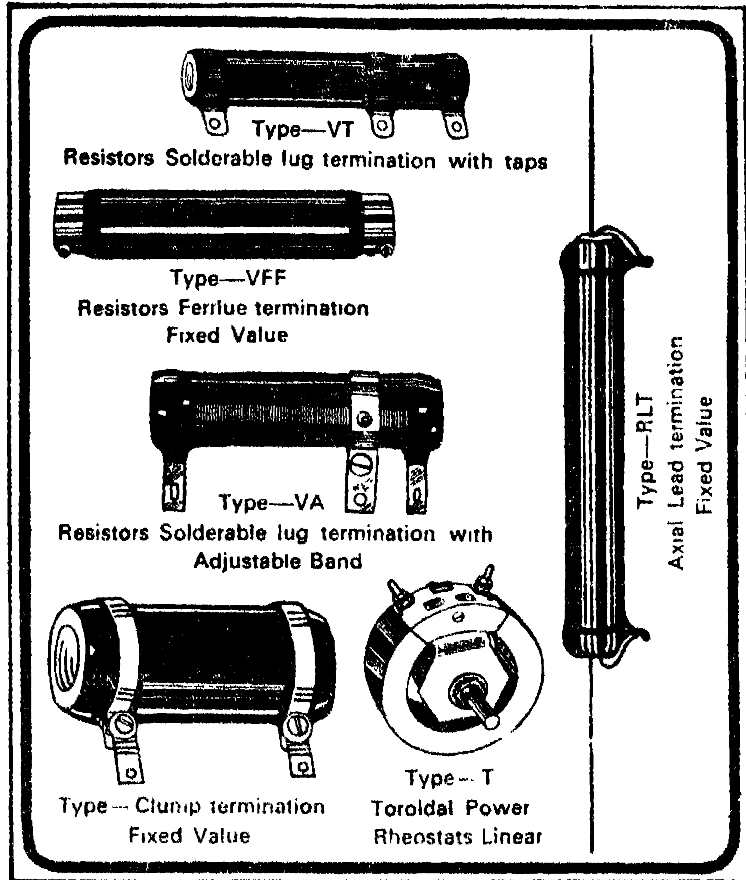
কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়





Type—VT
Resistors Solderable lug termination with taps
Type—VFF
Resistors Ferrule termination
Fixed Value
Type—VA
Resistors Solderable lug termination with
Adjustable Band
Type—RLT
Axial Lead termination
Fixed Value
Type—Clump termination
Fixed Value
Type—T
Toroidal Power
Rheostats Linear



স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ | মে, 1978 | পঞ্চম সংখ্যা

টর্নাডো ও তার শক্তির উৎস

গণেশ বিশ্বাস*

টর্নাডো বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে মারাত্মক, বিক্ষুব্ধ অবস্থা। তার প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান আজও অসম্পূর্ণ। টর্নাডোর বিপুল বিধ্বংসী শক্তির উৎস এবং বাংলার এক টর্নাডোর স্বরূপ ও এজাতীয় কতিপয় বিষয়ের মধ্যে এই প্রবন্ধের পরিসীমা সীমাবদ্ধ।

বায়ুমণ্ডলের স্বল্পক্ষণস্থায়ী যাবতীয় বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যে টর্নাডো নামক ঘূর্ণিঝড়ই সবচেয়ে প্রচণ্ড ও মারাত্মক। টর্নাডো এক প্রকার স্থানীয় ঘূর্ণি-ঝড় ও স্থলভাগের ঘটনা। জলস্তম্ভ **(waterspout)** প্রায় একই ধরনের দৃশ্য—প্রকাশ পায় বিশাল জল-রাশিরূপে এবং ঘটে বিশেষ করে সমুদ্রের উপরে।

টর্নাডোর আকৃতি—টর্নাডো দেখতে যেন আকাশের মেঘ থেকে ঝুলন্ত ফানেল আকৃতির আর একটি মেঘ—এর প্রশস্ত ভূমি (base) থাকে বিদ্যুৎ-মেঘের মধ্যে, আর সরু দিকটা থাকে মৃত্তিকা স্পর্শ করে (চিত্র)। সাধারণ মেঘের মত এর বেশির ভাগ অংশে থাকে ঘনীভূত জলীয় বাষ্প বা জল। যখন প্রথম দেখা দেয়, এর অবয়ব থাকে অনেকটা খাড়া, কিন্তু যখন উৎস-মেঘটি সরে যেতে থাকে, তখন তা কাত হয়ে পড়ে। সময় সময় আসল মেঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কখনো কখনো উপরের মেঘ থেকে একই সময়ে কতিপয় ফানেল নিচের দিকে নেমে আসে, কিন্তু সবগুলি হয়ত মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। টর্নাডোর ব্যাস কয়েক মিটার থেকে কয়েক-শ' মিটার

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, কাঁথি পি. কে. কলেজ, কাঁথি, মেদিনীপুর

পর্যন্ত হতে পারে। এদের গড় ব্যাস 250 মিটারের মত। সাধারণ লোক টর্নাডোকে টাইফুন, হ্যারিকেন প্রভৃতি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন



একটি পূর্ণাঙ্গ টর্নাডোর ফটো—হাতির শুঁড়ের ধরণের একটি বিদ্যুৎবর্ষী মেঘ। [ফটো H. R. Byers প্রণীত General Meteoroloy থেকে অনুমতি-ক্রমে প্রাপ্ত]।

বলে এই বিষয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্রের নিম্নচাপ থেকে যে সব ক্ষতিকর ঝড়ঝঞ্ঝা উৎপন্ন হয়, সেগুলি মূলত একই ধরণের, কেবল বায়ুমণ্ডলের চাপ, উষ্ণতা, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির তারতম্যের জন্যে এরা বিভিন্ন আকার ও বেগ লাভ করে। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর থেকে উৎপন্ন ঝড়কে ভারতে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় (cyclone) বলে; এই ধরণের ঝড় প্রশান্ত মহা-সাগরীয় (চীন-জাপান) অঞ্চলে টাইফুন (typhoon), উত্তর ও মধ্য আমেরিকায় (ক্যারেবীয় দ্বীপসমূহে) হ্যারিকেন, অষ্ট্রেলিয়াতে উইলিউইলিস (willy-willies) প্রভৃতি নামে খ্যাত। এই ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের বেগ থাকে ঘণ্টায় 120 কি. মি -এর বেশি। এসবের সঙ্গে টর্নাডো ঘূর্ণিঝড়ের কোন সম্পর্ক নেই।

জলস্তম্ভ—আকাশে ভারী মেঘ এবং নিচে বিশাল জলরাশি, এই অবস্থায় কখনো কখনো মেঘ ও জলকে যুক্ত করে এক প্রকার ফানেল আকৃতির মেঘ। এই স্তম্ভসদৃশ মেঘ জলস্তম্ভ নামে পরিচিত। আকাশস্থ মেঘ বায়ুপ্রবাহে একদিকে সরে যেতে থাকলে, এই স্তম্ভ বেঁকে যায়। স্তম্ভের মোটা দিক থাকে মেঘের মধ্যে আর সরু দিকটা থাকে নিচের দিকে জল স্পর্শ করে। একটি জলস্তম্ভের দৈর্ঘ্য হতে পারে কয়েক-শ' মিটার আর ব্যাস 25 থেকে 30 মিটার, কি তারও বেশি। জলস্তম্ভ দু-ধরণের হয়—(.) বিদ্যুৎ-মেঘ থেকে নিচের দিকে নেমে-আসা জলের উপর টর্নাডো ধরণের এক প্রকার স্তম্ভ এবং (ii) জলতল থেকে উপরের দিকে বৃদ্ধিযুক্ত মেঘের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন স্তম্ভ। উভয় প্রকার স্তম্ভই উপরের দিকে জল টেনে তোলে। তবে টর্নাডো ধরণের জলস্তম্ভই বেশি মারাত্মক। প্রায়ই দেখা যায়—একই সময়ে একাধিক জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়; এগুলি জল পরিত্যাগ করে একই সঙ্গে পর পর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এই দৃশ্য স্থায়ী হয় মাত্র কয়েক মিনিট।

টর্নাডো এবং জলস্তম্ভ—উভয়ের উৎপত্তিই বিদ্যুৎ-মেঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

জলস্তম্ভ বছরের যে কোন ঋতুতেই পৃথিবীর যে কোন স্থানে উৎপন্ন হতে পারে। তবে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রগামী নৌকার পক্ষে 'কাল-বৈশাখী'র কালটাই বোধ হয় বেশি বিপজ্জনক। এই জন্যে চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝা-মাঝি পর্যন্ত দিন 12টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত নাবিকগণ তাদের নৌকা নিয়ে সমুদ্রের খাড়িতে অবস্থান করেন, কারণ প্রতিদিন এই সময়ের মধ্যই কালবৈশাখীর কার্যকলাপ—যেমন, বজ্রবিদ্যুৎসহ

ঝড়-বৃষ্টি, জলস্তম্ভের আবির্ভাব প্রভৃতি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে বেশি। এই দু-মাস রাত 1 টা থেকে দিন 1 টার মধ্যে বঙ্গোপসাগরে নৌচলাচল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

আবহ-বিজ্ঞানে দু-ধরণের টর্নাডোর আলোচনা আছে—(i) কোল্ড-ফ্রন্ট (cold-front) সংশ্লিষ্ট এবং (ii) বিদ্যুৎ-মেঘ সংশ্লিষ্ট।

আবহ-বিজ্ঞানে 'ফ্রন্ট' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। পৃথিবীর কোন কোন অংশে, যেমন 40° N অক্ষাংশের উত্তরে প্রায় হাজার কি মি ব্যাপী বায়ুস্তূপ থাকে। এই ধরণের প্রতিটি বায়ুস্তূপ উষ্ণতা ও আর্দ্রতার দিক থেকে দীর্ঘকাল প্রায় একই অবস্থায় থাকে। কিন্তু দুটি পাশাপাশি বায়ুস্তূপের ভৌত ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে। এরূপ দুটি বায়ুস্তূপের মধ্যে যে বায়ুপ্রাচীর (প্রায় 15 থেকে 75 কি. মি. প্রস্থযুক্ত) বিভাজকরূপে অবস্থান করে, তাকে ফ্রন্ট বলে। ফ্রন্ট অঞ্চলের উষ্ণতা, আর্দ্রতা এবং স্থৈতিক শক্তি পাশাপাশি দুটি বায়ুস্তূপ থেকে ভিন্ন হয়। ফ্রন্ট-অঞ্চল বরাবর বায়ুস্তূপ দুটির স্থৈতিক শক্তির কিছু অংশ রূপান্তরিত হয় ঝড়ের গতীয় শক্তিতে।

বিভিন্ন উষ্ণতা ও বিভিন্ন পরিমাণ জলীয় বাষ্প সম্পন্ন দুটি বায়ুস্তূপের যে ফ্রন্ট বা তার অংশ-বিশেষের চলনের ফলে শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ুর স্থান দখল করতে থাকে, তাকে বলা হয় কোল্ড-ফ্রন্ট।

ফ্রন্ট বিভিন্ন বায়ুস্তূপ সম্পর্কিত একটি জটিল ব্যাপার। ফ্রন্টের নানা অদ্ভুত কার্যের ফলে বিদ্যুৎ-মেঘ, বিভিন্ন ধরনের ঘূর্ণিঝড়, টর্নাডো প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা প্রকাশ পায়।

টর্নাডোর প্রকৃতি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে টর্নাডোর আবির্ভাব ঘটে অপরাহ্ণের দিকে। উত্তর আমেরিকায় এই ঘূর্ণিঝড় আসে (শতকরা প্রায় 95টি) দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিম—এই অংশের মধ্য দিয়ে; বেশির ভাগ (শতকরা 61টি) টর্নাডো আসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। এই ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন বামাবর্ত। এই ঝড় স্বল্প স্থান জুড়ে ধাবিত হয় এবং 5 থেকে 10 কি মি-এর মধ্যে এর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে টর্নাডোর 300 কি মি পর্যন্ত পথ অতিক্রম করার মত অসাধারণ ঘটনাও আছে প্রাকৃতিক ঘটনার ইতিহাসে।

টর্নাডো মাটি থেকে ধূলি, আবর্জনাস্তূপ প্রভৃতি আকর্ষণ করে উপরে টেনে তোলে। অপকেন্দ্র বলের প্রভাবে সেগুলি আবার ছড়িয়ে পড়ে বাইরের দিকে। এর বাতাসের বেগ থাকে ঘণ্টায় 375 কি. মি থেকে 830 কি. মি. পর্যন্ত। এর পথে অবস্থিত খুব কম অট্টালিকাই রক্ষা পায়; এর দাপটে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা প্রভৃতি সব ধ্বংস হয় এবং কখনো কখনো ভারী জিনিসও, যেমন বড় গাছ, ঘরের চালা—টিনের বা খড়ের যেমনই হোক, অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। টর্নাডো-ফানেলের যে ব্যাস, তার চারগুণ পর্যন্ত হতে পারে এর বিধ্বংসী পথের বিস্তার।

টর্নাডোর কোন স্থান অতিক্রমকালে সেখানকার বায়ুর চাপ 25 মিলিবার-এর মত হ্রাস পায়; সময় সময় চাপ আরো বেশি পরিমাণে হ্রাস পায়। (এক মিলিবার = 1000 ডাইন / প্রতি বর্গ সে মি) কোন টর্নাডো একটি অট্টালিকার উপর দিয়ে যাবার সময় সেখানকার বাইরের বায়ুর চাপ হঠাৎ এমন হ্রাস পায় যে, ভিতরের চাপ তত তাড়াতাড়ি বাইরের চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না; ফলে অট্টালিকাটির প্রায় বিস্ফোরণ ঘটে। প্রচণ্ড ধরণের টর্নাডোর দাপটে অট্টালিকাসমূহের ক্ষয়ক্ষতি হয় বিস্ফোরণ থেকেও বেশি।

একমাত্র মেরু অঞ্চল ছাড়া টর্নাডো পৃথিবীর যে কোন অংশেই প্রকাশ পেতে পারে। উত্তর আমেরিকার রকি পবর্তমালার পূর্বে, দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাণ্ডিস পর্বতের পূর্বাঞ্চলে এবং পূর্ব-ভারতে টর্নাডো প্রায়ই দেখা যায়। এর মধ্যে আবার মিসিসিপি নদীর উপত্যকাতেই এর প্রকোপ

সবচেয়ে বেশি। কখন কোথায় টর্নাডোর আবির্ভাব ঘটবে তার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় না, তবে বায়ুমণ্ডলের যে অবস্থায় টর্নাডো প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, আবহ বিভাগ তেমন একটি বিস্তৃত ভূভাগের কথা আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারে। বিদ্যুৎ-মেঘ সংশ্লিষ্ট টর্নাডোর পরমায়ু ও শক্তি অল্লক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যায়; এই ধরণের টর্নাডোর গতিপথও অনির্দিষ্ট।

টর্নাডোর শক্তির উৎস—আজ পর্যন্ত টর্নাডোর উৎপত্তির **সঠিক** কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। আকাশে বিক্ষিপ্তভাবে তীব্র বিদ্যুৎ-মেঘের ক্রিয়া চলতে থাকলে কখনো কখনো টর্নাডো প্রকাশ পায়। কোন কোন বিজ্ঞানী প্রস্তাব করেছেন, টর্নাডোর বিধ্বংসী ক্ষমতা লাভ হয় তার প্রচণ্ড তড়িৎ-ক্রিয়া থেকে। জোন্স (**Jones, H.L. 1955**)-এর গবেষণা থেকে জানা যায়, টর্নাডোতে প্রতি সেকেণ্ডে 10 থেকে 20 বার তড়িৎ মোক্ষণ হয় (সাধারণ বিদ্যুৎ-মেঘে তড়িৎ মোক্ষণ হয় প্রতি 20 সেকেণ্ডে কি তারও বেশি সময়ে মাত্র একবার); প্রত্যেকবার তড়িৎমোক্ষণ কালে যদি বিদ্যুৎ-মেঘের একটি মাত্র সাধারণ বিদ্যুৎ-চমক্কালীন প্রচুর তড়িৎ-শক্তি (10 লক্ষ কিলোওয়াটের মত) মুক্ত হয়, তাতে টর্নাডো-ঘূর্ণিঝড়কে সক্রিয় রাখার পক্ষে এই ভাবে যথেষ্ট শক্তি লাভ হতে পারে। তড়িৎ-শক্তি প্রথমে তাপ-শক্তিতে, তারপর সেই তাপ-শক্তি প্রবল বায়ু-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

এদেশের স্থলভাগের ঘূর্ণিঝড়গুলি সবই বিদ্যুৎ-মেঘ সংশ্লিষ্ট টর্নাডোর অন্তর্ভুক্ত।

একটি টর্নাডো—মেদিনীপুর জেলার ভাইটগড় গ্রামে, 1977 সালের 15ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ১টায়, হঠাৎ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী যে ঘূর্ণিঝড়ের আবির্ভাব ঘটে, লেখকের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী এবং পুনার আবহবিভাগ একে একটি স্বাভাবিক টর্নাডো আখ্যা দেয়। কৌতূহলের বিষয় বলে এই টর্নাডো সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল—

(1) এই ঘূর্ণিঝড় উৎপন্ন হয় কয়েকটি গ্রামের মধ্যবর্তী একটি ফাঁকা মাঠে;

(2) এই ঘূর্ণিঝড় স্থায়ী ছিল মাত্র 10-15 মিনিট;

(3) ঘূর্ণিঝড়ের দৌড় ছিল প্রায় 2¼ কিলোমিটারের মত;

(4) ঘূর্ণিবিধ্বংসী পথের বিস্তার ছিল প্রায় তিন-শ' মিটার;

(5) অগ্রগতির সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি;

(6) এই ঘূর্ণিঝড়ের মাত্র 10-15 মিনিট পরমায়ুর মধ্যে লোক মারা যায় 8 জন, আহত হয় 18 জন;

(7) ঘূর্ণি 55 কি গ্রা. ওজনের একজন শ্রমিককে প্রায় 15 মিটার উঁচুতে তুলে নিয়ে যায়; সেই উঁচুতে তাকে 2-3 মিনিট ধরে এক টুকরো কাগজের মত এক দিক থেকে আর এক দিকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়; অবশেষে তাকে প্রথম অবস্থান থেকে প্রায় 75 মিটার দূরে হালকাভাবে মাটিতে ফেলে দেয়, যার ফলে লোকটি আঘাত পায় কম;

(8) দু'জন পূর্ণবয়স্ক লোক আত্মরক্ষার জন্যে পশ্চিম দিকের মাঠে (ঘূর্ণির গতিপথের বাঁ-দিকে) ছুটে গেলে, তারা উভয়েই ঝড়ের আছড়ানিতে সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং সংজ্ঞা হারায়;

(9) ঘূর্ণি এক বৃদ্ধা ও তার শিশু নাতিকে ঘর থেকে চালাসহ উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রায় 5 মিটার দূরের একটি পুকুরে নিক্ষেপ করলে উভয়েরই মৃত্যু ঘটে;

(10) 12 থেকে 18 বছরের মধ্যে তিনজন শ্রমিক-বালককে তাদের ইঁট ভাঙার জায়গা থেকে প্রায় 10 মিটার উঁচু দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে, 30 থেকে 50 মিটার দূরে নিক্ষেপ করে; ঘটনাস্থলেই মারা যায় তারা;

(11) একটি বড় তেঁতুল গাছ, প্রায় 40 মিটার দূরে নিক্ষিপ্ত হয়;

(12) ঘূর্ণিতে ধ্বংস হয়েছিল বহু বাড়ি-ঘরের চালা, দেয়াল, আর ধানের গোলা ;

(13) ঘূর্ণির গতিপথের বহু গাছ ও টেলিগ্রাফের পোস্ট পড়ে যায় মাটিতে ;

(14) ঘূর্ণির দৌড়ের পথে অনুভূত হয় প্রচণ্ড তাপ। ঘূর্ণির পথের সব গাছকে মনে হচ্ছিল ঝলসানো। কোন গাছেরই পাতা বলতে কিছুই ছিল না, কোন গাছকেই আর চেনা যাচ্ছিল না সহজে ;

(15) আত্মরক্ষার জন্যে যারা ছুটে গিয়েছিল ঘূর্ণির গতিপথের ডান দিকে (পূর্বদিকে), তারা প্রায় সকলেই ছিল অক্ষত। হতাহতের ঘটনাগুলি সবই ঘটেছিল ঘূর্ণির পথের বাঁ-দিকে। ঘূর্ণির পথ ছিল কতকটা বামাবর্ত ;

(16) ঘূর্ণির দৌড়ের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়ে যায় বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড বৃষ্টি।

মৃতদের মধ্যে কেউ বজ্রাঘাতে কিম্বা ঘূর্ণির শোষণজনিত অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ হারিয়েছিল কিনা বলা যায় না, কারণ কারও পোস্টমরটেম হয় নি।

টর্নাডো সম্বন্ধে গবেষণার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট, কিন্তু এদেশে তার সুযোগ-সুবিধা নিতান্তই সীমিত।

প্রজনন যন্ত্র-বিজ্ঞানে সম্ভাবনা ও বিপদ

শান্তনু ঝা*

প্রজনন বিষয়ে আমরা সবাই কম-বেশি কৌতূহলী, এই প্রবন্ধে প্রজনন বিষয়ে পাঠকদের কিছুটা ধারণা জন্মাবে বলে আশা করা যায়।

প্রজনন যন্ত্রবিদ্যার উপর কিছু আলোচনার আগে জানা দরকার জিন কি? জীবকোষের কেন্দ্রে অবস্থিত বংশগতির ধারক ও বাহকের মূল বস্তু হল জিন। রাসায়নিক দৃষ্টিতে জিন হচ্ছে এক অতিকায় ডি. এন. এ. নামক অণু যা অ্যাডেনিন, গুয়েনিন, থাইমিন ও সায়টোসিন—এই চার রকমের ক্ষারকযুক্ত ছোট ছোট নিউক্লিওটাইডের পলিমার।

জিনের বা ডি এন. এ-র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবের বংশগতির নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন সম্পর্কিত বিজ্ঞানই প্রজনন যন্ত্র-বিজ্ঞান বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। হরগোবিন্দ খোরানা ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অব্ টেক্নোলজিতে প্রথম জিন সংশ্লেষণ ঘটিয়ে সুপ্রজননবিদ্যার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তারই ক্রমবিকাশ।

বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে মানুষের কতটা অগ্রসর হওয়া উচিৎ বা উচিৎ নয়—এ সম্পর্কে বিশ্বে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 1976 সালে চিকাগো শহরের মেয়র সেখানকার পরীক্ষাগারে দু-মাসের জন্যে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কিত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আইন করে বন্ধ করেন।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং সম্ভবত মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত সূক্ষ্মতম ও নবতম অবদান। এই বিজ্ঞান মানুষকে এখন এক পর্যায়ে এনে ফেলেছে, যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করবে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 100টিরও

* মালদা জিলা স্কুল, মালদা

বেশি পরীক্ষাগারে বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ডি. এন. এ-র সমবায় ও সমোন্নয়ন ঘটিয়ে বংশগতির সংকর অণু গঠনের চেষ্টা চলছে। স্ট্যান্‌লি এন কোহেন এবং তাঁর সহকর্মী এ ব্যাপারে যুগান্তকারী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

এই বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য ব্যাকৃটিরিয়ার দেহকোষগুলিকে চিকিৎসা-বিদ্যার মূল্যবান জৈবনিক পদার্থসমূহ যেমন—ইনসুলিন পিটুইটারি গ্রোথ হর্মোন, মানবদেহের অ্যান্টিবডি এবং টীকা তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় ভাইরাসঘটিত প্রোটিন উৎপাদনের কারখানা হিসাবে কাজে লাগানো। বিজ্ঞানী জেস্থুয়া ল্যাডার বার্গের মতে ব্যাকৃটিরিয়াকে ইচ্ছামত উৎপন্ন করার কৌশল, চিকিৎসাশাস্ত্রের সনাক্তকরণে এক সূক্ষ্মতম ও আধুনিকতম যন্ত্রবিদ্যার জন্ম দেবে এবং অসংখ্য প্রকারের প্রোটিন উৎপাদনে সক্ষম হবে।

জিন প্রতিস্থাপন (gene transplantation) মানুষের বংশগত রোগ নিরাময়ের সহায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ ডায়াবিটিসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডায়াবিটিস একটি জিনঘটিত রোগ। বেশির ভাগ রোগীকেই ইনসুলিন হর্মোন বারবার ইঞ্জেক্ট (inject) করিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এখন একজন রোগীকে এমন এক বা এক সেট জিন সরবরাহ করা যায় যাতে করে রোগীর দেহেই ইনসুলিন হর্মোন উৎপন্ন হতে পারে। এই জিন সরবরাহ দু-ভাবে হতে পারে। প্রথমত, ভাইরাস বাহকের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে SV40 বা সোপ প্যাপাইলোমা (Shope Papiloma)-র মত ভাইরাস মাঝে মাঝে রোগীর দেহে সংক্রমণ করাতে হবে। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট কোষগুলির দ্বারা জিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত হওয়া পদ্ধতিতে।

যে ব্যক্তির দেহে এভাবে চিকিৎসা করা হল, তাঁর ইচ্ছানুসারে পিতার দেহকোষের জিনের অনুপ্রবেশ সন্তান-সন্ততির মধ্যে ঘটানো হবে। এভাবে সম্পূর্ণ বংশধারাকেই হয়ত এই রোগমুক্ত করা যাবে।

সোপ প্যাপাইলোমা দিয়ে আরও এক প্রকার জিন সাজারী আছে। আর্জিনিমিয়া রোগে রক্তে আর্জিনিন অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে মানসিক অপূর্ণতা ও আরও অনেক উপসর্গ দেখা যায়। উক্ত ভাইরাস দিয়ে সংক্রমিত করলে কোষে আর্জিনেজ এনজাইম প্রস্তুত হয়। ঐ এনজাইম আর্জিনেজকে ভেঙ্গে ফেলে এবং রোগীর রোগমুক্তি ঘটে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুকে একটি মাতৃদেহ থেকে উঠিয়ে নিয়ে অপর কোন মাতৃদেহে প্রতিস্থাপিত করে সেই মাতার বন্ধ্যাকরণ কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

যে কোন পুরুষের একটি দেহকোষ অন্য একটি মহিলার জরায়ুর মধ্যে প্রতিস্থাপন করলে দেখা যাবে, সেই দেহকোষটি ভ্রূণে রূপান্তরিত হচ্ছে। এর ফলে যে সন্তানের সৃষ্টি হবে তা হুবহু পুরুষটির বৈশিষ্ট্য সমন্বিত।

সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং। অশিম্বজাতীয় উদ্ভিদকে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী উদ্ভিদে পরিবর্তন করা যাবে। এমন উদ্ভিদ উৎপন্ন করা যাবে যা শুষ্ক মাটিতেও উৎপন্ন করা যায়। আবার লবণাক্ত মাটিতে যে উদ্ভিদ জন্মায় তাদের লবণ প্রতিরোধী করা যাবে।

মানুষ বা ব্যাকৃটিরিয়ার ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জি-নীয়ারিং বহুবিধ সমস্যারও সৃষ্টি করবে। এই বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষের ক্ষেত্রে মারাত্মক ধরণের নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করবে।

যখন সমাজ তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ বা সর্বশ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাদের প্রতিলিপিকরণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি করবে তার দ্বারা স্বৈরাচারী যে স্বৈরশাসন কায়েম করবে তার অবসান হবে না।

এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে ডি এন. এ প্রতিস্থাপনের ফলে সৃষ্ট ভাইরাস সমস্ত মানুষের পক্ষে ধ্বংসাত্মক হতে পারে যার নিয়ন্ত্রণ মানুষের ক্ষমতার মধ্যে নাও থাকতে পারে।

সাধারণভাবে, এসকেরেসি কোলিকে (E. Coli) ডি এন. এ. অণুর পোষক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর এক বিশেষ ষ্ট্রেন মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে। যদি পরীক্ষাধীন কোন এসকেরেসি কোলি নব সংযুক্ত ডি. এন. এ. নিয়ে পরীক্ষাগার থেকে নির্গত হয়, তবে তার ব্যাপক সংক্রমণ হতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। 11 জন জীব-বিজ্ঞানীকে নিয়ে গঠিত সমিতির প্রতিবেদনে ঘোষিত হয়েছে—

(i) এমন কোন ব্যাক্‌টিরিয়াল প্লাসমিড (bacterial plasmid) সৃষ্টি করা হবে না যা এমন বিষক্রিয়া সংঘটিত করতে পারে যে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে;

(ii) প্রাণী ভাইরাস, বিশেষভাবে যে সমস্ত ভাইরাস টিউমার সৃষ্টি করে তাদের ক্ষেত্রে কোনরকম ডি. এন এ. সংযোজন বা প্রতিলিপিকরণ চলবে না।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে প্রকৃতির। এর ফলে যে কোন সময়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এমন ভাবে বিঘ্নিত হতে পারে, যার ফলে এমন একটি বীজও উৎপন্ন হবে না যা অঙ্কুরিত হতে পারে।

সুতরাং কি করা উচিৎ—এই প্রশ্নেই বিজ্ঞানীরা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

ডঃ রবার্টস সিন্সিমারের মতে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং এর বিরোধীগণ জানেন না যে, মানুষের ভবিতব্য নিয়ন্ত্রণে ক্রোমোজোমের ভূমিকা কি! আবার অন্য এক বিজ্ঞানীর মতে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে তা মানব সমাজের অবনতি ও অধঃপতনই ঘটাবে।

যাই হোক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পথে যে কোন ধরণের বাধা অবিজ্ঞজনোচিত এবং অবাস্তব। অবশ্যই মানুষের বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করে এই বিদ্যার আরও উন্নতি সাধন করতেই হবে।

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু জানতে হলে উক্ত কেন্দ্রের আহ্বায়ক শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডঃ শ্যামসুন্দর দে কিংবা শ্রীদুলালকুমার সাহা বা শ্রীঅসীম দত্তের সঙ্গে ঐ কেন্দ্র চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, চিঠিপত্র কর্মসচিব বা বিভাগীয় আহ্বায়কদের নামে যথাবিধি পাঠানো যাবে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে কর্মসচিব বা বিভিন্ন আহ্বায়কদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্য/সভ্যাদের সহযোগীতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

1লা, অক্টোবর, 1977
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন: 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সমাজবিরোধী আচরণের উৎস কোথায়?

বিশ্বনাথ ঘোষ*

অপরাধ কি বংশগত, না সমাজ ব্যবস্থাই অপরাধের উৎস—এই সব নানা প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে এই প্রবন্ধে।

আইন জনমতকে প্রকাশ করে বলে তার দ্বারা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। কোন ব্যক্তি তার কাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন ভঙ্গ করলে তার আচরণকে সমাজবিরোধী বলে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে অপরাধমূলক আচরণকে সমাজবিরোধী আচরণ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, যে আচরণ রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের পরিপন্থী তাই সমাজবিরোধী।

অপর ব্যক্তি অথবা অন্যের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করাকে অপরাধ বলে। অপরাধ একটি আপেক্ষিক ধারণা। কারণ এক সমাজে যা অপরাধ অন্য সমাজে তা অপরাধ নাও হতে পারে অথবা এক সময়ে যা অপরাধ বলে গণ্য হয়, পরবর্তী যুগে তা অপরাধ বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। উনিশ শতকের আফ্রিকার এক উপজাতির মধ্যে বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতামাতাকে হত্যা করা একটা স্বাভাবিক প্রথা বলে মনে করা হত; কিন্তু বর্তমানে মানবিকতাবোধ প্রসারের দরুণ তারাই একে অপরাধ বলে মনে করে। মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে ইংলণ্ডে পকেটমার ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত, কিন্তু বর্তমানে একে আর গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হয় না। মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হলে মদ বিক্রয় একটি অপরাধ, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে তা আর অপরাধ বলে গণ্য হয় না। অবশ্য চুরি, নরহত্যা, নারীধর্ষণ এবং দেশদ্রোহিতা—সকল সভ্য সমাজেই অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত এবং নিন্দিত।

রাষ্ট্রের নিয়মকানুনকে আইন বলা হয়। আর তা ভঙ্গ করাকে অপরাধ বলে। যে সকল নিয়মকানুন ব্যক্তির আচরণের ঔচিত্যের সঙ্গে জড়িত, সেগুলিকে নৈতিক নিয়ম বলা হয়। এই নিয়ম ভঙ্গ করাকে অন্যায় বলা হয়। পরিশেষে ধর্মীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা হলে তাকে বলা হয় পাপ।

অপরাধ গুরুত্ব অনুসারে তিন শ্রেণীর—প্রথমত, রাষ্ট্রদ্রোহিতা অর্থাৎ বিদেশী শত্রুকে সহায়তা করা; দ্বিতীয়ত, নরহত্যা, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, লঠ, ঘরে আগুন লাগানো প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ; তৃতীয়ত, মাতলামি, লাইসেন্স ব্যতিরেকে গাড়ি চালানো বা পথের যত্রতত্র প্রস্রাব করা ইত্যাদি অসদাচারণ।

অন্যান্য দেশের মত একদা ভারতে অপরাধী সম্পর্কে এই ধারণা ছিল, অপরাধী ব্যক্তি জন্ম থেকেই কতকগুলি অপরাধপ্রবণতা নিয়ে জন্মায়। স্বাধীনতালাভের পূর্বে বৃটিশ সরকারের অধীনে ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে 'অপরাধী উপজাতি' (criminal tribes) বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই সকল উপজাতির কোন ব্যক্তি যদি এক স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র আসতে চাইত, তা হলে তাকে নিকটবর্তী পুলিশ থানায় তা জানাতে হত। একথা অনস্বীকার্য যে, এই সকল উপজাতি বহু অপরাধের জন্যে দায়ী। চম্বলের উপত্যকায় আজও তাদের বিভীষিকার রাজত্বের অবসান ঘটে নি। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সরকার অপরাধী উপজাতি সংক্রান্ত আইনের উচ্ছেদ করেছেন

* ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, ২৪পরগণা

এবং যাতে তারা সভ্য ও ভদ্র জীবনযাপন করে সেই উদ্দেশ্যে তাদের কৃষি জমি প্রদান এবং জীবিকা অর্জনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও করে দেওয়া হয়েছে।

অপরাধ শেষ পর্যন্ত লাভজনক হয় না। তবুও কেন লোকে অপরাধ করে ?

প্রবংশ তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের ধারণা অপরাধ বংশগত। কিন্তু বর্তমানে সমাজ-বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, এই তত্ত্ব ভ্রান্ত। অপরাধমূলক আচরণ বংশগত নয়—এটি ব্যক্তির অর্জিত গুণ বা দোষ। একথা অবশ্য সত্য যে, কিছু কিছু পরিবারকে অপরাধী পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করা যায়—যে পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তিই অপরাধী এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারত সরকারের আইনেও কতকগুলি অপরাধ-প্রবণ উপজাতির উল্লেখ ছিল। ব্যক্তির কতকগুলি দৈহিক বা মানসিক ত্রুটি বংশগত হতে পারে যাদের সঙ্গে অপরাধপ্রবণতা বিশেষভাবে বিজড়িত। রোজানফ (Rosanoff) নামক একজন অপরাধ-বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, 70 শতাংশ ক্ষেত্রে যমজ সন্তানের একটি অপরাধী হলে অপরটিও অপরাধী হবে। গ্লুইক এবং গ্লুইক (Glueck and Glueck) নামক দু-জন মার্কিন অপরাধ-বিজ্ঞানী এক হাজার অপরাধীর 'বিষয়' অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মাত্র 50 শতাংশ অপরাধী অপরাধভুক্ত পরিবার থেকে এসেছে।

লামব্রসো নামক ইতালির প্রখ্যাত অপরাধ-বিজ্ঞানী অপরাধীর প্রবংশতত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি অপরাধীর কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। উঁচু ও সূচালো মাথা, নিচু লড়ানে কপাল, চ্যাপ্টা নাক, বড় বড় কুলোপানা কান এবং ঠেলে বেরিয়েআসা ভ্রূযুগলের সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক আছে। অবশ্য বর্তমানে লামব্রসোর মতবাদ পূর্বের জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

অপর একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞ অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কোন সমাজ অপরাধমুক্ত নয়, কিন্তু সমাজের সকল অংশই সমান অপরাধপ্রবণ নয়। এর কোন কোন অংশে অপরাধপ্রবণতা অধিক আবার কোন কোন অংশে তা অনেক কম। গ্রাম সমাজ-আচার শাসিত এবং সমাজ-বন্ধন দৃঢ়তর বলে সাধারণভাবে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে অপরাধ-প্রবণতা অনেক কম। শহরের সব অংশ আবার সমান অপরাধপ্রবণ নয়। এর বিশেষ বিশেষ এলাকা অধিকতর অপরাধপ্রবণ—এদের অপরাধ-প্রবণ এলাকা (delinquency area) বলা হয়। শহর বা শহরতলীর বস্তি অঞ্চল অপরাধীদের আড্ডা স্থল। বহুকাল পূর্বে বার্ট (Burt) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, লণ্ডন শহরের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চল আছে যেগুলি ইংলণ্ডের অধিকাংশ অপরাধীর জন্মস্থান। যেখানে বাসস্থানের অব্যবস্থা, অতিরিক্ত জনঘনত্ব, যে এলাকায় অধিকাংশ হোটেল এবং সিনেমা অবস্থিত, সেই সব অঞ্চল অপরাধী সৃষ্টির উর্বর ক্ষেত্র। শ (Shaw)-এর অনুশীলন থেকেও দেখা যায়, আমেরিকায় শিকাগো শহরের কেন্দ্র থেকে অধিক সংখ্যক অপরাধীর উদ্ভব হয়েছে এবং যতই শহরের উপান্তে যাওয়া যায় অপরাধীর সংখ্যা ততই কমতে থাকে। বার্ট যে সকল বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন, ভারতের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করতে হবে। তা হল—গণিকা-পল্লী। যদি কেউ কলকাতার 'অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলি' চিহ্নিত করবার চেষ্টা করে, তাহলে দেখা যাবে, এগুলি এক একটি গণিকাপল্লীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গণিকাপল্লীর সঙ্গে অন্ধকারের জগতের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

শিশুর গতিবিধি বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির বাইরে যেতে আরম্ভ করে এবং খেলার সঙ্গী খোঁজে। খেলার সঙ্গী, স্কুলের সঙ্গী এবং বন্ধুবর্গ বালকটির নমনীয় মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। শহরে জনসংখ্যার চাপ ও ঠেলাঠেলির দরুণ ঘিঞ্জি

ঘিঞ্জি বস্তি গড়ে ওঠে। এছাড়া অপরিকল্পিত শহরের বসতি এলাকায় কারখানা, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সংস্থা গড়ে ওঠে। এটি পরিণামে সাংঘাতিক সামাজিক এবং নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে তারা অনুকূল পরিবেশে উঠে যেতে পারে, কিন্তু যারা দরিদ্র—বাধ্য হয়েই তাদের সেই স্থানে থাকতে হয়। ঘিঞ্জি অঞ্চলে ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের কোন সুযোগ থাকে না। খেলার মাঠ না পেয়ে ছেলেরা রাস্তাকেই খেলার মাঠে পরিণত করে। এইভাবে ধনবসতি পূর্ণ এলাকা বা বস্তি অঞ্চলে এক একটি মস্তান দল (gang) গড়ে ওঠে। সাধারণত এক একটি পাড়ায় একাধিক মস্তান দল গড়ে ওঠে এবং সামান্য কারণে এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়। অশ্রাব্য খিস্তি এবং দিব্যি ছাড়া এরা কথা বলে না। এবং শীঘ্রই অপরাধ জগতের সাংকেতিক ভাষায় রপ্ত হয়ে উঠে।

মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানী হোয়াইট (Whyte) রাস্তার মোড়ে আড্ডাধারী যুবকদের সম্পর্কে গবেষণা করে মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শহরের অভিজাত এলাকার লোকেরা বস্তি এলাকার ছেলেদের ঘৃণার চোখে দেখে। বস্তির ছেলেরা মা ও বাবার আদর যত্ন এবং স্নেহ থেকে বঞ্চিত; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা ও বাবা উভয়েই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনের জন্যে। ছেলেদের খোঁজখবর নেওয়ার সময় তাদের নাই। ছেলেরা স্কুলে যায় না। আবার করবারও কিছু থাকে না। বস্তির বিত্তহীন বেকার যুবকদের সম্পর্কে অনুশীলন করে হোয়াইট বলেন, এরা আমোদ-প্রিয়, অলস এবং স্বীকৃতি ও নিরাপত্তার জন্যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে একটা মস্তান দল গড়ে ওঠে, যার কেন্দ্রে থাকে একজন নেতা—'গুরু'। দলের নেতা যদি চাকুরী পায় বা বিয়ে করে, তাহলে সে আর আগের মত দলের কাজে পুরা সময় দিতে পারবে না এবং দল ভেঙ্গে পড়বে। অন্য ভাবে বলা যায়, যেহেতু বেকার যুবকদের কোন কাজ নেই, দায়িত্ব নেই, গুরুত্ব নেই, কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই, তাই সে সহজেই রাস্তার মোড়ে আড্ডাধারী মস্তানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়—যেখানে তার উল্লিখিত অভাবগুলি পূরণ হয়। বাবা যদি ছেলেকে পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে, তাতে কোন ফল হবে না। মস্তানদের দলে একটি যুবকের ব্যক্তিত্ব পূরণের যে সুযোগ আছে তার বিকল্প সুস্থ ব্যবস্থা যদি করা যায়, তবেই সে আর ওই দলের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অধিকাংশ মস্তান এবং সমাজবিরোধী যুবকেরা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অভাবের তাড়নায় এদের বাপ-মা সর্বদাই কলহ বিবাদে লিপ্ত। এদের অনেকের বাবা লম্পট, মদ্যপ, জুয়াড়ী এবং রাজনৈতিক নেতাদের গুণ্ডা বা দালাল। ফলে সন্তানের জীবনে বাবার সৎপ্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ খুবই কম দেখা যায়। ব্যক্তির আচরণ গঠনে পরিবারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সৎ পরিবার সুনাগরিক সৃষ্টি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, 50 শতাংশ অপরাধী ভগ্নগৃহ (broken house) থেকে আসছে। মাতা বা পিতার মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের দরুণ সংসার বা গৃহ ভাঙ্গে। সন্তানের জীবনে মাতার প্রভাব অসীম, তারই প্রভাবে সন্তান সামাজিক হয়ে উঠে। মা যদি মারা যায় বা স্বামীকে পরিত্যাগ করে, তা হলে শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে বাধ্য; অপরাধীরা বাল্যজীবনে বাপ-মার স্নেহযত্ন থেকে বঞ্চিত থাকে। অনেক অপরাধীর বাল্যজীবন সৎমায়ের লাঞ্ছনা বিড়ম্বিত অথবা গৃহ থেকে বিতাড়িত অথবা অনাথ আশ্রমে কেটেছে। অপরাধীদের বর্তমান জীবনেও অনেকেই বিপত্নীক অথবা স্ত্রীকর্তৃক পরিত্যক্ত অথবা বেশ্যাবাড়ীর অধিবাসী।

অপরাধমূলক আচরণের পিছনে দারিদ্র্যও একটি মূল কারণ। অধিকাংশ অপরাধীই হয় দরিদ্র পরিবারের সন্তান নতুবা বেকার। গ্লুইক এবং গ্লুইকের গবেষণা থেকে দেখা যায়, আমেরিকার

মাত্র 28'8 শতাংশ অপরাধী স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান, বাকী সব দরিদ্র পরিবারভুক্ত। এই সব দরিদ্র পরিবারের কোনরূপ সঞ্চয় নেই। দিন আনে, দিন খায়। তাঁদের আলোচনা থেকে দেখা যায়, সকল অপরাধীর পিতা হয় দক্ষ নতুবা অদক্ষ শ্রমিক, কিন্তু কেউ কেরানী বা পেশাগত উপ-জীবিকাভুক্ত ব্যক্তি নয়। সমাজ বিজ্ঞানী উদয়শঙ্করের গবেষণা থেকে দেখা যায়, ভারতে মাত্র 4 শতাংশ অপরাধী স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান, বাকী 96 শতাংশ দুঃস্থ পরিবারভুক্ত। কিন্তু দারিদ্য অবক্ষয় এবং অপরাধের একটা বড় কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। দেশে অসংখ্য গরীব এবং বেকার লোক আছে যারা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। সব গরীব ছেলেই চোর হয় না বা সব গরীব মেয়েই গণিকার পথ গ্রহণ করে না।

অনেকে অপরাধ-প্রবণতাকে জাতিগত (racial) বলে গণ্য করেন। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা একেবারেই পরিত্যক্ত হয়েছে। জাতিগত কারণ অপেক্ষা পরিবেশগত কারণ অনেক বেশি প্রভাবশালী। উত্তর ভারতের (বর্তমান পাকিস্তান) পাঠান, আফ্রিদি প্রভৃতি দুর্দান্ত পার্বত্য উপজাতিও একদা গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল। যে নিগ্রোজাতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিক অপরাধের জন্যে দায়ী করা হয়, সেই নিগ্রোজাতি ডাঃ মার্টিন লুথার কিং এর মত মহামানবের জন্ম দিয়েছে।

অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই অপরাধের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করতে পারে। ধৃত অপরাধীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি (IQ) স্বাভাবিক মানুষের বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক কম। নাবালক অপরাধীদের মধ্যে জড়বুদ্ধি বালকের সংখ্যাই অধিক এবং বয়স্ক অপরাধীদের মধ্যে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন (IQ) লোক দুর্লভ।

বর্তমানে অপরাধ সংক্রান্ত গবেষণায় মানসিক অসুস্থতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের (psychopathetic personality) উল্লেখ করা হয়। এটি মানসিক এবং দৈহিক বিশৃংখলা যা সমাজবিরোধী আচরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। অধিকাংশ অপরাধীই দেহগত এবং জন্মগত (congenitally) দিক থেকে কতকগুলি ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। এরা ঠিক উন্মাদ নয়, কিন্তু মানসিক দিক থেকে অপরিণত। এদের অনেকেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং চতুর; কিন্তু নৈতিক এবং সামাজিক বোধহীন। অপরাধীর এই চরিত্রগত ত্রুটি জন্মগত, যার দরুণ তার সামাজিক বোধ এবং কর্তব্যজ্ঞান জাগরিত হতে পারে না। মানসিক অসুস্থতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের লক্ষণ—অনুভূতি শূন্যতা, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণের অযোগ্যতা এবং বালকোচিত আচরণ। অপরের উপর নিজ কাজের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না করে তারা ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্তমান ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি তাদের একমাত্র চিন্তা, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে—এইমাত্র প্রচণ্ড উল্লাস তার ঠিক পর মুহূর্তেই সামান্য কারণে প্রচণ্ড মানসিক অবসাদ। অপরাধপ্রবণতা, নীতিবোধ শূন্যতা, ভবঘুরেমি এবং যৌন বিকৃতি—এগুলি হল মানসিক রুগ্ন ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অনুসারে অপরাধ ও সমাজ-বিরোধী আচরণের উৎস হল অবদমিত যৌন কামনা। নাবালকের পক্ষে যৌন আকাঙ্ক্ষা সমাজানুমোদিত পথে পূরণ করা সম্ভব নয়, তাই এর বহিঃপ্রকাশ ব্যাহত হলে তা সমাজবিরোধী আচরণের তির্যক পথে আত্মপ্রকাশ করে; আর এইভাবে সে যৌন কামনা তৃপ্তির আনন্দলাভ করে। যে বালক পিতার অতিরিক্ত কঠোর শাসনে মানুষ হয়েছে, তার মনে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত তা পরবর্তী জীবনে অসামাজিক আচরণ ও আইনের বিরুদ্ধাচারণ করে পিতার স্বৈরাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বাল্যকালের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার পরিণত বহিঃপ্রকাশই হল অপরাধমূলক ও সমাজবিরোধী আচরণ। মনো-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেও

সমাজবিরোধী আচরণের প্রবণতা আছে কিন্তু তারা একে দমন করতে পারে অথবা অন্য কোন সমাজানুমোদিত ও গঠনমূলক কাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে।

অপরাধমূলক আচরণের বিকল্প ব্যাখ্যা হল—সামঞ্জস্যহীনতা (maladjustment) অর্থাৎ সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে বনিবনাহীন আচরণ। যখন কোন লোক সমাজের অনুমোদিত পথে তার মূল চাহিদা মিটাতে অসমর্থ, তখন তার নিকট দুটি পথ খোলা থাকে – হয় চাহিদা পূরণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা নতুবা অসামাজিক পথে তা চরিতার্থ করা। এক শ্রেণীর অপরাধ-বিজ্ঞানী মনে করেন, অপরাধী ব্যক্তিমাত্রেই স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি (neurotic)। অপরাধ পরিণামে লাভজনক নয়, অপরাধী জানে একদিন না একদিন সে ধরা পড়বেই; তথাপি সে অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে না। একটা অবচেতন সমাজবিরোধী অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না তাদের অপরাধ কার্যে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে।

অপরাধীদের প্রতি শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র আছে। কিন্তু সমাজবিরোধী আচরণের মূল উৎস হল অবাঞ্ছিত পরিবেশ এবং মানসিক রুগ্ন ব্যক্তিত্ব। উন্নত পরিবেশ এবং মানসিক অসুস্থতা-পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুচিকিৎসার দ্বারাই সমাজবিরোধী অনাচারের মূল উৎস উৎপাটন করা সম্ভব।

চক্ষু ব্যাংক কি এবং কেন ?

বিমান দাশগুপ্ত*

"চক্ষুরত্নম্ মহাধনম্"—এই মহাধন যে দান করে তার চেয়ে বড় দাতা আর কে ? চক্ষুদানের মহাব্রতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জানেন কি ? পৃথিবীতে যত অন্ধ লোক আছে তার প্রতি 5 জনে 1 জন ভারতীয়। সারা ভারতে অন্ধ জনসংখ্যা একটা পরিসংখ্যান অনুযায়ী 60 লক্ষ: আর কেবল পশ্চিমবঙ্গেই অন্ধ জনসংখ্যা দু-লক্ষের উপর। এর মধ্যে প্রায় 80 হাজার অন্ধ আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার কল্যাণে সফল কর্ণিয়া গ্রাফ্‌টিং দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারে।

ট্র্যাকোমা, অপ্‌থালমিয়া, বসন্ত, অপুষ্টি, আঘাত প্রভৃতি কারণে যে সকল ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, তাঁদেরকে সফল কর্ণিয়া গ্রাফ্‌টিং দ্বারা অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। যে বিশেষ সংগঠনের দ্বারা এটা করা যায়, তা চক্ষু ব্যাংক নামে পরিচিত। কলকাতায় দুটি চক্ষু ব্যাংক আছে; একটি নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে আর দ্বিতীয়টি মেডিকেল কলেজে। মেডিকেল কলেজে যে চক্ষু ব্যাংক আছে সেটি পুরনো আর নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে যেটি আছে তা অতুলবল্লভ চক্ষু ব্যাংক নামে পরিচিত। এটি মাত্র বছর চারেক হল তৈরি হয়েছে। যতদূর জানা যায়, সারা ভারতে এরকম 33টি ব্যাংক আছে। ব্যাংকে যেমন টাকা জমা রাখা হয়, চক্ষু ব্যাংকে তেমনি থাকে চক্ষু। ব্যাংকে টাকা থাকে ভল্টে বা লকারে আর চক্ষু

*বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক-E, ফ্লাট-7, কলিকাতা-700 037

ব্যাংকে চক্ষু থাকে ঠাণ্ডা বাক্সে তথা রেফ্রিজারেটরে।

চক্ষুর সম্মুখভাগের স্বচ্ছ অংশের নাম কর্ণিয়া। সাধারণত চক্ষু সামগ্রিকভাবেই সংরক্ষণ করা হয়। তবে কর্ণিয়া আংশিকভাবে ও দাতার চোখ থেকে নেওয়া যায় এবং সংরক্ষণ করা যায়। দুটি চোখ আলাদাভাবে শুদ্ধ বোতলে রাখা হয়। কখনও একসঙ্গে রাখা হয় না, পাছে বাইরের জীবাণু সংসর্গে কোন একটি চোখ দূষিত হলে তার সংস্পর্শে দ্বিতীয় চোখটিও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চক্ষু ব্যাংকগুলিতে সর্বদাই একজন ডাক্তার থাকেন। এখনও এই ব্যাংকগুলিকে জনসাধারণের স্বেচ্ছামূলক দান থেকেই চক্ষু সংগ্রহ করতে হয়। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কোন নিকটাত্মীয় ব্যাংকে যোগাযোগ করলে ব্যাংকের ডাক্তার এসে ঐ চোখ সংগ্রহ করে থাকেন। এদেশের মত গরম দেশে মৃত্যুর 2 ঘণ্টার মধ্যে চোখটিকে সংগ্রহ করতে হয় এবং তিন চারদিনের মধ্যে তার গ্রহীতাকে গ্রাফ্‌ট্ করতে হয়। স্বেচ্ছামূলক দানের জন্যে কলকাতার ব্যাংকগুলিতে 'প্রতিশ্রুতি-পত্র' আছে। এর দ্বারা দাতা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই ব্যাংককে তাঁর ইচ্ছার কথা জানাতে পারেন। তবে এই প্রতিশ্রুতি পত্র অপরিহার্য নয়, মৃতের নিকটাত্মীয়ের নির্দেশে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঐ চোখ নিতে পারেন। তবে দুঃখের কথা, প্রয়োজনের তুলনায় বিশেষত কলকাতায় চক্ষু সংগ্রহ নামমাত্র হয়ে থাকে।

চক্ষু-সংগ্রহের পরে তাড়াতাড়ি সেটিকে গ্রাফ্‌ট করার জন্যে পূর্ব থেকেই একটি গ্রহীতা প্যানেল করা থাকে। ঐ প্যানেলে গ্রহীতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি থাকে যোগাযোগ করার জন্যে। এই অপারেশন চক্ষু ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে হয়ে থাকে। তবে অপারেশনের পরেও কিছুকাল রোগীকে হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন হয়।

অন্ধ ব্যক্তি সমাজের পক্ষে বোঝাস্বরূপ। কেননা জীবনধারণের জন্যে তাদের অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। আজকাল অন্ধদের ব্রেইলি পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে ; তবুও আমাদের দেশে সে সবই সীমিত বলতে বাধা নেই। তাই চক্ষু-ব্যাংক সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের কৌতূহল যত বাড়বে বা চক্ষুদানের ব্যাপারে যতই তারা এগিয়ে আসবে ততই বিজ্ঞানের এই আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে কিছু অন্ধ লোককে সুন্দর জীবন দান করা যাবে।

লেখক ও প্রকাশকদিগের প্রতি নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' নিয়মিত বিজ্ঞান পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনা প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান পুস্তক লেখক ও প্রকাশকদিগকে দুই কপি পুস্তক পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।"

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রোগ নির্ণয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ

প্রদীপকুমার দত্ত*

বিভিন্ন ক্ষেত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ সার্থকভাবে হয়ে থাকে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও তা সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে পারবে—সেরকম সম্ভাবনা বর্তমানে দেখা দিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে রোগ নির্ণয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যে শব্দের কম্পাংক সেকেণ্ডে 20 হাজারের বেশি তাকে বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ। সমুদ্রের গভীরতা, জলের নিচে নিমজ্জমান বস্তুর উপস্থিতি, পদার্থের অভ্যন্তরের ফাটল প্রভৃতি নিরূপণ; দুটি তরলের অবদ্রব প্রস্তুতি; কোন জীবাণুর প্রভাব হ্রাস-বৃদ্ধি করা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সার্থকভাবে হয়ে থাকে। বর্তমানে শব্দোত্তর তরঙ্গ রোগ নির্ণয়েও সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে—এমন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। জানা গেছে—এই তরঙ্গ রঞ্জেন রশ্মির মতই দেহের বিভিন্ন কোমল কলার **(tissue)** মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে, এর প্রয়োগে দেহের কোন কলার ক্ষতি হয়। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে আরও গবেষণা চলছে। পশুর উপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাংক, প্রাবল্য ও স্থায়িত্ব একটি করে নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকলে তা কোন ক্ষতি করে না এবং বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দোত্তর তরঙ্গের ক্ষেত্রে তাদের মান ঐ সীমার যথেষ্ট নিচে। তবুও অনেকের ধারণা শব্দোত্তর তরঙ্গ কোন অপ্রত্যাশিত ক্ষতি করতে পারে।

বর্তমানে রোগ নির্ণয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ পদ্ধতিকে পাল্স্-ইকো-সনোগ্রাফি **(pulse-echo sonography)** রাডারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রাডারের সাহায্যে যেমন কোনও বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা হয়, তেমনই রোগ নির্ণয়ের জন্যে একটি ট্রান্সডিউসার কর্তৃক সৃষ্ট শব্দোত্তর তরঙ্গকে দেহের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়। ঐ তরঙ্গ বিভিন্ন ধর্মসম্পন্ন কলার বিভেদতল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ঐ ট্রান্সডিউসারেই। রাডারের মতই ট্রান্সডিউসারটি একাধারে প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রের কাজ করে। ট্রান্সডিউসারে ফিরে আসার পর তরঙ্গকে পুনরায় বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করা হয় এবং অসিলোস্কোপের সাহায্যে তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়। ট্রান্সডিউসার থেকে প্রেরিত হবার পর তরঙ্গের ট্রান্সডিউসারে পুনরায় ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা ট্রান্সডিউসার থেকে কলার বিভেদতলের দূরত্ব ও শব্দোত্তর তরঙ্গ দেহের যে সব অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করার জন্যে ব্যবহৃত হয় পিজো-ইলেকট্রিক কেলাস। এই কেলাসের সাহায্যে বৈদ্যুতিক কম্পনকে যান্ত্রিক কম্পনে রূপান্তরিত করা হয়। এজন্যে ইলেকট্রনিক বর্তনীর সাহায্যে বৈদ্যুতিক কম্পন সৃষ্টি করা হয় ও উপযুক্তভাবে কাটা পিজো-ইলেকট্রিক কেলাসের উপর সেই কম্পন প্রযুক্ত হয়।

*পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী

এভাবে প্রয়োজনীয় কম্পাংকবিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় প্রাবল্যের শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। রোগ নির্ণয়ের জন্যে 10^6 হার্জেরও বেশি কম্পাংকবিশিষ্ট তরঙ্গের প্রয়োজন।

ধাত্রীবিদ্যা (obstetrics) ও স্ত্রীরোগের ক্ষেত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত, গর্ভাবস্থায় জরায়ু এমন একটি তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে যা শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রবাহের পক্ষে একটি ভাল মাধ্যম। দ্বিতীয়ত, এর প্রয়োগে বিকাশশীল ভ্রূণের কোন ক্ষতি হয় না। এর ফলে এটি রঞ্জেন রশ্মির একটি উপযুক্ত বিকল্পরূপে পরিগণিত হয়। কারণ রঞ্জেন রশ্মির প্রয়োগে ভ্রূণের ক্ষতি সাধিত হবার সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে জরায়ুতে অনুসন্ধান করলে গর্ভসঞ্চারের পর ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যেই তা জানা সম্ভব। এ ছাড়া ভ্রূণের সংখ্যা, ভ্রূণের আকার, তার অবস্থান নির্ণয়ও এই তরঙ্গের সাহায্যে করা যায়। শুধু এই নয়, ভ্রূণের কোন গুরুতর অস্বাভাবিক অবস্থা এই তরঙ্গ ব্যবহার করে জানা যেতে পারে।

বিভিন্ন কোমল কলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে বলে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ হৃদরোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ভালবের অস্বাভাবিকতা, হৃৎপিণ্ডের জন্মগত ত্রুটি (congenital heart defects) প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্যে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে ইকো-কার্ডিয়োগ্রাম (echocardiogram) গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোন বিপদের আশংকা থাকে না। নানা কারণে রোগাক্রান্ত হবার ফলে দুর্বল রোগীদের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্যে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা রয়েছে। তা হল, হৃৎপিণ্ড পরিক্রমাকারী তরঙ্গকে পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে যেতে হয় বলে তা কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যদিও মাথার খুলি দ্বারা শব্দোত্তর তরঙ্গ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবুও স্নায়ুরোগ (neurology) নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করা যায়। এজন্যে কানের উপরে যেখানে মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা সেখান দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এই তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্কের মধ্যরেখার (midline of the brain) অবস্থান নির্ণয় করা যায়। নানা কারণে এই মধ্যরেখার কোন পার্শ্বে স্থানচ্যুতি হতে পারে, যেমন—মস্তিষ্কে টিউমার বা সিস্টের (cyst) উপস্থিতি, এডেমা (edema) বা মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক তরল জমা, স্ট্রোকের ফলে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি। শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে এই স্থানচ্যুতি নির্ণয় করা যায়।

চোখের মধ্যে সহজেই শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রেরণ করা যায়। চোখে একপ্রকার তরল উপস্থিত থাকে বলে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে পরীক্ষা করার পক্ষে চোখ একটি ভাল মাধ্যম। বিচ্ছিন্ন রেটিনা নির্ণয়, অস্ত্রোপচার করে দূর করার মত কোন বহিরাগত পদার্থের চোখে উপস্থিতি ও তার অবস্থান নির্ণয় প্রভৃতির জন্যে এই তরঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে।

শব্দোত্তর তরঙ্গের যে সব প্রয়োগ এখন গবেষণার স্তরে রয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—দেহে টিউমারের অবস্থান নির্ণয়, কম বিপজ্জনক বা বিপজ্জনক নয় এবং খুবই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, বিশেষত বুক (breast) ও পেটের (abdominal regions) মধ্যেকার বৃদ্ধি, প্রোস্টেট গ্রন্থি (prostate gland) পরীক্ষা প্রভৃতি।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ নির্ণয় করার জন্যে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহারের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। যদি মাথায় রক্ত-বাহী ধমনীতে (carotid artery) রক্ত জমাট বেঁধে যায়, তবে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধমনীতে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হবার আগেই যদি রক্ত জমাট বাঁধার কথা জানা যায়, তবে অস্ত্রো-পচার করে তা দূর করে স্ট্রোক ও মস্তিষ্কের ক্ষতির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব। এজন্যে বর্তমানে

যে আর্টেরিয়োগ্রাফিক (arteriographic) পদ্ধতি রয়েছে, তাতে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

বিজ্ঞানীরা প্রচলিত পালস্-ইকো সনোগ্রাফি ব্যবহার করে মাথার রক্তবাহী ধমনীগুল পরীক্ষা করে দেখেন যে, শতকরা প্রায় 75টি ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষার ফল অনুরূপ। অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্টেরিয়োগ্রাফিক পদ্ধতির ফলাফল নেতিবাচক হলেও সনোগ্রাফিক পদ্ধতির ফলাফল ইতিবাচক হতে দেখা যায়, কিন্তু কখনও এর বিপরীত হয় না।

কয়েকজন বিজ্ঞানী ধমনীতে রক্ত প্রবাহ নির্ণয় করার জন্যে ডপ্‌লার ক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছেন। এজন্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন ওয়াশিংটনের ইনষ্টিটিউট অব এনভাইরনমেণ্টাল মেডিসিন ও ফিজিওলজি-এর এম রীড ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। এর মূল তত্ত্ব হল, কোন শব্দোত্তর তরঙ্গ একটি গতিশীল পদার্থের উপর আপতিত হলে তার কম্পাংক পরিবর্তিত হয়। কম্পাংকের এই পরিবর্তন নির্ভর করে বস্তুর গতির মান ও অভিমুখের উপর। ফলে তরঙ্গের পরিবর্তন নির্ণয় করে রক্ত প্রবাহ নির্ণয় করা যায়। রীডের মতে আর্টেরিয়োগ্রাফিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল ও তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন তথ্য নির্দেশ করে এবং একে অপরের পরিপূরক, কিন্তু একটি অপরটির স্থান অধিকার করতে পারে না।

বর্তমানে যে সব শব্দোত্তর তরঙ্গ যন্ত্রচিকিৎসকগণ ব্যবহার করেন, সেগুলির কিছু ত্রুটি রয়েছে ও তা দূর করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার চিকিৎসকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হাতিয়ার রূপে পরিগণিত হবে।

পরিশেষে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে, শব্দোত্তর তরঙ্গ শুধু রোগ নির্ণয় নয় রোগ নিরাময়ের কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। শব্দোত্তর তরঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করে তার প্রাবল্য কোন বিন্দুতে বা অবস্থানে বৃদ্ধি করা যায় বলে কেন্দ্রীভূত ঐ তরঙ্গ দ্বারা কোন নির্বাচিত কলাকে নষ্ট বা ধ্বংস করা যেতে পারে। ফলে নির্বাচিত কলা ছাড়া অন্য কোন কলার (যাদের মধ্য দিয়ে এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয়) কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্কে টিউমারের অবস্থান নির্ণয় ও উচ্চ প্রাবল্যের শব্দোত্তর তরঙ্গের দ্বারা তা নষ্ট করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে এই তরঙ্গ দ্রুত বিভাজনশীল কোষের মাইটোসিসকে (mitosis) বাধা দিতে পারে। অবস্থা বিশেষে তা লাভজনক হতে পারে ও রোগ নিরাময়ের কাজে লাগানো যেতে পারে। যদি কলাসমূহের উপর এই তরঙ্গের ক্রিয়া আরও ভালভাবে জানা যায়, তবে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় নতুন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে—এমন আশা করা অসঙ্গত হবে না।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর জুলাই '78 সংখ্যা "অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন" সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। ঐ সংখ্যায় প্রকাশের জন্যে আইনষ্টাইন সম্পর্কিত প্রবন্ধ পাঠাতে লেখক / লেখিকাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার চার পৃষ্ঠার (ছবিসহ) অনধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ কার্যকরী সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে 31শে মে (1978)-এর মধ্যে পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞান দীর্ঘজীবী হোক

ম্যাক্সিম গোর্কী

(অনুবাদক—অংশুতোষ খাঁ*)

[ম্যাক্সিম গোর্কীর (1868-1936) কথাসাহিত্যিক হিসাবে পরিচিতির প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের স্বপক্ষে এই ঐতিহাসিক ভাষণটি তিনি 1917 সালে কেরেন্সকির অস্থায়ী সরকারের সময়ে "ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন ফর দি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোপ্যাগেশন অফ্ দি পজিটিভ সায়েন্সেস-এর প্রথম অধিবেশনে পাঠ করেন। নিচের লেখাটি "নেচার" পত্রিকার 272তম সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরেজিতে অনূদিত লেখার বঙ্গানুবাদ। স্মরণ করা যায়, এ বছর গোর্কীর 110তম জন্মবর্ষ]

সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ! আপনাদের কাছে, সম্ভবত, এটি অদ্ভুত লাগবে যে, আমি বিজ্ঞান সম্পর্কে, নবজাত রাশিয়ার জীবনে এর তাৎপর্য সম্পর্কে এবং নতুন রাশিয়ার ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কি ভূমিকা পালন করবে সে সম্পর্কে আমার অনভিজ্ঞ মতামত উপস্থাপিত করে আপনাদের বিব্রত করব বলে মনস্থির করেছি।

কিন্তু আমার এই ঔদ্ধত্য সম্পর্কে আপনাদের স্বাভাবিক এবং সহজবোধ্য সন্দেহজনক মনোভাব হয়ত আমি দূর করতে পারি, যদি ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার মনোভাব এবং আমাদের দেশের মত চিন্তাভাবনায় পেছিয়ে থাকা দেশে বিজ্ঞান যে সৃজনী-মূলক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং পারিবে সে সম্পর্কে আমার ধারণা সংক্ষেপে আপনাদের কাছে নিবেদন করার অনুমতি পাই।

মাননীয় নাগরিকবৃন্দ! শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের মত সৃজনীমূলক এবং সামাজিক ধারণা শিক্ষণে আর কোন শক্তিশালী মাধ্যমের কথা আমি জানি না। শিল্পকলায় সামান্য পরিচিত একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমি এ সম্পর্কে আরও কিছু বলব। মানুষের শিক্ষার প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানকে আমি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সজ্ঞানে প্রথম স্থানে রাখব।

কেননা শিল্পকলা অনুভূতিসঞ্জাত; খুব সহজেই স্রষ্টার মানসিকতার খামখেয়ালীপনার শিকার হয়ে পড়ে; ঐটি খুব বেশি পরিমাণে শিল্পীর তথাকথিত মেজাজের উপর নির্ভরশীল; আর সে কারণেই এ। খুব অল্প ক্ষেত্রেই প্রকৃত অর্থে মুক্ত, খুব অল্প ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, জাতিগত এবং বর্ণগত কুসংস্কারের শক্তিশালী প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সক্ষম।

এই সব প্রভাবমুক্ত ও সঠিক পর্যবেক্ষণের ফলনশীল জমিতে প্রচণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞান অংক-শাস্ত্রের লৌহদৃঢ় নীতির দ্বারা পরিচালিত। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ভাবনা প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক এবং সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যপিয়াসী। রুশ, জার্মান কিংবা ইতালীয় শিল্পকলার কথা আমাদের বলার অধিকার আছে কিন্তু এই গ্রহে কেবলমাত্র একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান রয়েছে এবং এই ঘটনা আমাদের ভাবনায় ডানা মেলে দেয়, ঠেলে নিয়ে যায় বিশ্বের রহস্যের

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

প্রান্তে, জানান দেয় আমাদের অস্তিত্বের দুর্ভাগ্যের মূলগুলি ; বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে ঐক্য, স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যের দ্বার।

রুশ গণতন্ত্র, যা এই সময়ে আবার নতুন জীবনী-ধারায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে, সঠিক বিজ্ঞান-চেতনায় তাকে পরিপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনাদের বোঝানোর দায়িত্ব আমার নয়। কে. এ. টিমিরিয়াজেভ্, একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী ও ব্যক্তি জীবনে সবচেয়ে সৎ মানুষ, দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন "ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের এবং গণতন্ত্রের।" এটি একটি মহান সত্য এবং আমি গভীরভাবে বিশ্বাসী যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে না চললে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই।

আমরা যারা রাশিয়ার মানুষ, আমাদের নিজেদের সঠিক বিজ্ঞান-চেতনায় সজ্জিত হওয়া খুব বেশি জরুরী। অন্য কোন জাতির চেয়ে রুশজাতির বেশি প্রয়োজন বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাবার, এর প্রতি ভালবাসা তৈরি করার ও এর সার্বজনীন শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার। এটি বোঝা দরকার যে, সেই বুদ্ধি আমাদের আলোকবর্তিকা, এটি সেই শক্তি যার তাপ আমাদের উদ্দীপ্ত করতে পারে, এবং কেবলমাত্র এর প্রদীপ্ত ডানায় ভর করে মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, যা সত্যের জন্যে মানুষের দুঃখবরণ ও সত্যের প্রতি তার অতৃপ্ত পিয়াসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে রাশিয়ার ইতিহাস আমাদের ঘিরে এমন এক জাল বুনে রেখেছে, যা বুদ্ধির সৃজনী ক্ষমতা ও বিজ্ঞানের মহান সাফল্যগুলি সম্পর্কে সন্দেহজনক, এমনকি বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল ও আজও জাগিয়ে চলেছে। অভিজাত শ্রেণী পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতার ধ্যান-ধারণাগুলি রাশিয়ায় নিয়ে এসেছে। জাতির অধিকাংশের কাছে অভিজাতজনের পরিচয় একজন জমিদার হিসাবে, একজন ক্রীতদাস-মালিক হিসাবে—তাঁর কাছ থেকে ভাল কি প্রত্যাশা করা যায়? কৃষকের ধারণায় ছিল, বিজ্ঞানী একজন ভদ্রলোক, সংস্কারের বাঁধনমুক্ত কর্মী নন।

এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনসাধারণের গীর্জামুখী শিক্ষা, যা সৌন্দর্য এবং মুক্ত ও নির্ভীক অনুসন্ধিৎসু চিন্তার সঙ্গে এক অমীমাংসেয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এছাড়াও রয়েছে রাজতন্ত্র যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক দিয়ে জ্ঞান আহরণের যে কোন প্রয়াস দমন করেছে। রাশিয়ার মানুষের প্রাণশক্তি দমনে এমনতর সব প্রভাবের যোগফলে আরও অনেক প্রভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সে আলোচনার জায়গা এখানে নয়। এই ধরণের সমস্ত বিরোধী প্রভাবে একজন রুশীয়র মনে বিজ্ঞানের মহান অনুসন্ধিৎসা এবং বিজ্ঞানীদের অন্ধ গোঁড়ামি সম্পর্কে পুরাপুরি জৈবিক ও প্রবৃত্তিজাত বিরোধী মনোভাব জেগে ওঠা উচিত।

এই নিরানন্দ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি? একমাত্র একটি পথই খোলা রয়েছে; বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি বিজ্ঞানকে মানুষের এই প্রাচীন অবিশ্বাসের ভিত্‌কে ধ্বংস করতে হবে, উৎপাটন করতে হবে জনসাধারণের মনের অজ্ঞানতার সন্দেহের মূলকে, কুসংস্কারের শিকল ছিঁড়ে মুক্তি দিতে হবে আমাদের সকলের অমূল্য সম্পদ মনকে, আর সেই মনে মেলে দিতে হবে জ্ঞানের ডানা, রাশিয়ার মানুষদের উঠিয়ে আনতে হবে সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে।

জনসাধারণকে অবশ্যই জানতে হবে যে, তাঁরা যে পরিবেশে বাস করছেন, যা বিজ্ঞান একান্তভাবে তাঁদের জন্যে তৈরি করেছে। তাঁদের অবশ্যই বুঝতে হবে, মাঠে যে ভদ্রলোক ফুল সংগ্রহ করছেন, তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় কাটাচ্ছেন না, কিন্তু তিনি একজন কৃষি গবেষককে তৈরি করছেন গ্রামের জন্যে; তাঁদের বুঝতে হবে, তাঁদের পিঠের তুলোর পোষাকগুলি তৈরি হয়েছে কারখানায় যেটি অবশ্যই সম্ভব হত না অংকের সূত্র ব্যতিরেকে; তাঁদের বুঝতে হবে ডাক্তারের ওষুধ বিজ্ঞানীদের কষ্টসাধ্য

পরিশ্রমের ফল। তাঁরা অবশ্যই জানবেন যে, পৃথিবীতে রয়েছে এক বুদ্ধির আবাস যা অক্লান্তভাবে যত্ন নিয়ে তাঁদের জীবনের কল্যাণী ভাবনায় রয়েছে রত।

শহুরে মানুষকে ঘিরে রয়েছে বিজ্ঞানের আরও আবরণ। এখানে প্রতি পদে একজন মানুষের কাছে প্রতিভাত হয় বুদ্ধির বিজয় আর মানুষের কল্যাণে শৃঙ্খলিত প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োগ। ট্রামগাড়ি আর সিনেমা, মোটরগাড়ি আর গ্রামফোন, কোটের বোতাম আর থার্মোমিটার—সব কিছুই, প্রয়োজনীয় ও বিলাসী, বড় ও ছোট বিজ্ঞানের তৈরি। রাস্তার একজন মানুষের মহান বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির দৈনন্দিন জীবনে, রাশিয়ার নোংরা পরিবেশে মিশে যাওয়ার ব্যাপারটি চিন্তার অতীত, যদিও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ভাবনাগুলি তার নিজের জীবনে ঢুকে পড়েছে, পূর্ণ করে রেখেছে তার সারা জীবন ব্যবহারিক বিবিধ রূপের আকারে।

এটি আমার জানা যে, রাস্তার মানুষজনদের বিজ্ঞানের বিষয়ে অবহিত করার ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার দায়িত্ব সংগঠকদের এবং অবশ্যই বিজ্ঞানীর নয় যিনি অস্তিত্বের গোপনতম রহস্য উন্মোচনে মগ্ন রয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার তাৎপর্য অপরিসীম এবং বিরাট দায়িত্বপূর্ণ—অপরিসীম কেননা একমাত্র এটিই রাশিয়ার মানুষের চিন্তা-ভাবনার সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারে, এবং বিজ্ঞানের লক্ষ্য সম্পর্কে সহানুভূতির পরিবেশ তৈরি করতে ও বুদ্ধির শক্তির প্রতি জনসাধারণের আস্থা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

সেই কারণেই আমার মনে হয়, সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রথম প্রশ্ন অস্তিত্বের বিরাট রহস্যগুলি উন্মোচনে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমস্ত বুদ্ধি নিয়োজিত করার মত এক সংগঠন তৈরি করা। আমার ধারণা অনুযায়ী, এই সংগঠন হবে বিজ্ঞানী-দের স্বাধীনভাবে মিলিত হওয়ার এক সংগঠন, যা পৃথিবীর সমধর্মী সংগঠনগুলির, যেমন ব্রিটেনে রয়েছে, সঙ্গে ভাবনার আদান-প্রদান করবে এবং নিজের সমস্যাগুলি ছাড়াও এই সৌরজগতের মস্তিষ্ক ও শিরাস্বরূপ একটি অন্তঃগ্রহ বিজ্ঞান-জানালা তৈরি করার প্রয়াস করবে।

বিশেষ করে রাশিয়ার মত দেশে, যেখানে বুদ্ধির প্রতি যথোচিত মর্যাদাভাব এখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি এবং যেখানে এর বিকাশ রাজতন্ত্রের অসভ্য, অশিক্ষিত জোয়ালে নৈরাশ্যজনকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, এমন এক সংগঠন তৈরি করা প্রয়োজন।

পুরনো শাসনাধীন রাশিয়ার মত এমন কোন দেশ নেই যেখানে জাতির জীবনীধারার সর্বোচ্চ প্রকাশ—বিজ্ঞান—এত পিছনে ছিল, যেখানে বিজ্ঞানের মুক্ত ভাবনার প্রয়াস এত বিপজ্জনক ভাবা হত এবং বিজ্ঞানসাধকদের এমন ঘৃণার চোখে দেখা হত। আমরা নিজেরাই জানি, কি নির্লজ্জতার সঙ্গে নির্মমভাবে বিজ্ঞানের পবিত্র ডানায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজনীতির হাত। আমাদের কত নির্ভীক বিজ্ঞানীদের মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছিল ও কত অসাধারণ প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছিল আত্মপ্রকাশের সুযোগের অভাবে, আপনাদের তা স্মরণ আছে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীদের সামনে নিজেদের বিচিত্র কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার এক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে প্রকৃত বিজ্ঞানের সীমানার অসীম বিস্তৃতির আর গভীরতার, মৃতের স্তূপ থেকে রাশিয়ার মানুষের নবজন্মের।

কল্পনার জগতে বিচরণ করার অনুমতি চাইছি—সেই কল্পনা ই গভীর বোধ থেকে উৎসারিত যে, মানুষের ইচ্ছায় ও বুদ্ধিবলে এমন কোন স্বপ্ন নেই যা বাস্তবে রূপায়িত হবে না।

কল্পনা করছি এমন এক প্রতিষ্ঠানের—এক "বিজ্ঞান-নগরীর"—যেখানে থাকবে সারি সারি মন্দির, মন্দিরের আরাধকেরা হবেন এক একজন বিজ্ঞানী যিনি স্বাধীনভাবে নিজের ভগবানের আরাধনায় রত থাকবেন। সেখানে রয়েছে সারি সারি সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী, চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার আর যাদুঘর

(museum)—যেখানে দিনের পর দিন বিজ্ঞানী তাঁর উজ্জ্বল সন্ধানী চোখ মেলবেন আমাদের গ্রহের চারপাশের ভয়ংকর রহস্তের অন্ধকারে। সেখানে থাকবে কামারশালা আর কারখানা, যেখানে বিজ্ঞানীরা কারিগর ও স্বর্ণকারদের মত, বিশ্বের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে সংহত ও তরলতর করে রূপ দেবেন কার্যকরী প্রতিপাদ্যে, সত্যের সন্ধানে নতুন অস্ত্রে।

এই "বিজ্ঞান-নগরে" বিজ্ঞানী রইবেন স্বাধীন, মুক্ত এক আবহাওয়ার মাঝে, সৃজনীক্ষমতার বিকাশের অনুকূল পরিবেশে এবং তাঁর কাজ সারা দেশে বুদ্ধির প্রতি ভালবাসার পরিমণ্ডল তৈরি করবে ও দেশের মানুষের মাঝে জাগিয়ে তুলবে বুদ্ধির শক্তি আর সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ।

আমি বিশ্বাস করি যে, বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রকৃত বিজ্ঞানের তাৎপর্য গ্রহণ করবে। আমি জানি যে, গণতন্ত্র প্রকৃত বিজ্ঞানকে ভালবাসে এবং আমি বলব যে, আপনাদের সংকল্পে রয়েছে রাশিয়ার আত্মিক পুনর্জন্ম।

রাশিয়ার জীবনে আলো পড়ুক।

এই দিনগুলিতে, যখন আমাদের দুর্ভাগ্যপীড়িত ক্লিষ্ট দেশে নতুন জীবনের প্রভাত-শিখা দীপ্ত হয়ে উঠেছে, যখন রাশিয়ার মানুষ স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করেছেন, এই সুখী, স্মরণীয় দিনগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা, বিজ্ঞানীরা মহান ঘটনাগুলি থেকে দূরে থাকতে পারেন না।

ইতিহাস তাঁদের আহ্বান জানাবে তাঁদের অধিকারলব্ধ আসনে নতুন জীবন গড়ে তোলার পুরোভাগে আসীন হওয়ার। তাঁরাই দেশকে নেতৃত্ব দেবেন। তাঁদের দায়িত্ব এই গ্রহের বুদ্ধির রত্নখনি থেকে, বিশ্ব বিজ্ঞানের রত্নখনি থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষুধাকাতর মানুষদের তৃপ্তিবৃত্তির।

আমরা কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবে জীবনের পুরনো কাঠামোটাকে ধ্বংস করেছি—সাংস্কৃতিক ধারণার ক্ষেত্রে এটি এখনও আমাদের চারপাশে রয়েছে, এমন কি আমাদের মাঝেও। আমাদের নিজেদেরও রাজতন্ত্রের শাসনের ঘুণধরা ও মরচে পড়া দেশকে সংস্কৃত করার জন্যে প্রয়োজন দানবীয় শক্তির।

আমাদের শিখতে হবে কিভাবে বাঁচতে হয়, কিভাবে কাজ করতে হয়, নিজেদের শ্রমের প্রতি কিভাবে অনুরাগ জন্মাতে হয়। আমাদের বোঝা প্রয়োজন যে, শ্রম আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপানো কিছু নয়; শ্রম হল বেঁচে থাকার ইচ্ছার মুক্ত প্রকাশ এবং প্রেমের মত, স্বাধীন শ্রমে লুকিয়ে রয়েছে ঐশ্বরিক আনন্দ। এটি আমাদের বুঝতে হবে, এবং কেবলমাত্র প্রকৃত বিজ্ঞান আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে, আমাদের দুঃখজনক ভ্রান্তিগুলির ক্ষত আমরা নিরাময় করতে পারি সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণায় নিজেদের পরিপূর্ণ করে।

নাগরিকবৃন্দ! সংস্কৃতির রয়েছে তিনটি স্তম্ভ—বিজ্ঞান, কলা আর শিল্প (industry)। 1791 থেকে 1793 এই দিনগুলিতে ফ্রান্সের কন্‌ভেনশন ন্যাশনালের (Convention Nationale) মহান কাজগুলির কথা স্মরণ করার অনুমতি চাইছি। এই তিন বছরে, বিশৃঙ্খল ও সন্ত্রাসকবলিত পরিবেশে, বিদেশী আক্রমণের বিপদের মুখে কন্‌ভেনশন বাফন (Buffon) প্রবর্তিত তিনটি বিভাগকে বারোটি বিভাগে সম্প্রসারিত করে, সারা য়ুরোপের ঈর্ষার বস্তু উদ্ভিদ-উদ্যান (botanical garden) প্রতিষ্ঠা করে, কলা ও বাণিজ্যের এক সংগ্রহশালা স্থাপন করে, প্রতিষ্ঠা করে তিনটি চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের (medical school)। যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে কনভেনশন অধ্যাপক আর ছাত্রদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিপক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

অকল্পনীয় প্রতিকূল পরিবেশে কনভেনশন কৃষকদের জন্যে "কাউন্সেলস ফর্ অটাম সোয়িং" প্রকাশ করে এবং কনভেনশনের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক ডুবান্টন (Dubanton) তাঁর ক্লাসিক "হ্যাণ্ডবুক ফর্ সেফার্ডস" রচনা করেন। কনভেনশন বদ্ধ জলাশয়গুলির সংস্কার ও আদর্শ খামার সংগঠনের ব্যবস্থা করে,

এবং 1793 সালে চূড়ান্ত সন্ত্রাসের মাঝে ফরাসী দর্শনের পিতৃস্থানীয় দেকার্তের আবক্ষমূর্তি প্যাথিয়নে (Pantheon) স্থাপন করে, বেকনের রচনাবলী প্রকাশ করে, বিবিধ বৈজ্ঞানিক অভিযান সংগঠিত করে, কৃষি বিষয়ক নিগম প্রতিষ্ঠা করে; উপরন্তু, কনভেনশনের সহযোগিতায় তাম্পিয়নি (Tampioni) পম্পেই নগরীর খননকার্যের সূচনা করেন।

স্মরণ করা যায়, ব্রিটেনের অ্যাসোসিয়েশন অফ সায়েন্টিস্টস্ গড়ে উঠেছিল 1810 সালে, এমন একটা সময়ে যখন ইংলণ্ড ধ্বংসের কূলে দাঁড়িয়ে ছিল। নাগরিকবৃন্দ, আমাদের দায়িত্ব এদেশের সবচেয়ে মস্তিষ্কধর মানুষদের, সৃজনশীল প্রাণচালিকা শক্তিগুলিকে সংগঠিত করার; রাশিয়ায় বিজ্ঞানের মুক্ত ও অসীম উন্নতির সম্ভাবনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি আমাদের গড়ে তুলতে হবে; আমাদের বিজ্ঞানীরা দেশের জন্যে নিজেদের সর্বোচ্চ সৃজনী-ক্ষমতা যাতে নিয়োগ করতে পারেন সে ব্যাপারে বন্ধুসুলভ মনোযোগ দিতে হবে।

মুক্ত অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান যত উপরে উঠবে, বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগের সম্ভাবনা তত প্রসারিত হবে। আমরা জানি, প্রকৃতিতে মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, চিন্তার পদ্ধতির চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নেই, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই।

বিজ্ঞান দীর্ঘজীবী হোক।

মানবদেহে ধূমপানের প্রভাব

রাধারাণী মাইতি*

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের মানুষই তামাকু সেবনে অভ্যস্ত এবং দিনের পর দিন যত তামাক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে—ধূমপায়ীর সংখ্যাও তত বাড়ছে, যদিও সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'। সিগারেটের অপগুণ বিষয়ে তীব্র মতভেদ থাকলেও এটা ঠিক যে ধূমপান ও স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক খুব জটিল এবং ধূমপানের সঙ্গে ক্যানসার গঠনকারী (carcinogenic) উপাদানের সম্পর্ক হয়তো রয়েছে।

তামাক হল একটি ওষধি (herb) এবং যেটির ধোঁয়া মানুষের মনের মধ্যে কখন কখন তীব্র বিতর্কের বস্তু হলেও মানুষ আজ প্রায় তিন'শ বছর ধরে ধূমপান করে আসছে। আরাম করে খাওয়ার জন্যে ও বেশি পরিমাণ গ্রহণের জন্যে পাইপের সাহায্যে ধূমপান ও খৈনি খাওয়া (chewing) এবং নস্যি নেওয়া (snuffing) দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তামাকু সেবন প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে মনে করতেন, ধূমপান হচ্ছে নোংরা ও জঘন্য অভ্যাস এবং মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের ক্ষতিকারক।

যাই হোক না কেন, সিগারেট 1535°F (835°C) উষ্ণতায় জ্বলে ভস্মীভূত হয়। ঐ উচ্চ উষ্ণতায় কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য জমা হয়। সিগারেটের ধোঁয়াতে প্রায় 500 রকমের বিভিন্ন ধরনের যৌগ আছে, যার বেশির ভাগ প্রাকৃতিক তামাকের মধ্য থেকে পাওয়া যায় না। তামাক-পাতার মধ্যে থাকে রাসায়নিক যৌগের একটি

*গ্রাম-পাকুই, পোঃ-বালিচক, জেলা-মেদিনীপুর

জটিল মিশ্রণ। যেমন—সেলুলোজঘটিত যৌগ, শ্বেতসার, প্রোটিন, সুগার অ্যালকলয়েড (নিকোটিন ইত্যাদি), পেপ্‌টিক দ্রব্য, হাইড্রোকার্বন, ফেনল, ফ্যাটি অ্যাসিড, আইসোপ্রিনোএড্‌স, ষ্টেরল এবং অজৈব খনিজ দ্রব্যাদি।

সিগারেটের ধেঁায়া হল গ্যাস, অঘনীভূত বাষ্প (uncondensed vapour) ও বিশেষ ধরণের তরলের মিশ্রণ। যখন মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ধেঁায়া লক্ষ লক্ষ অনু-পরমাণুর ঘন এরোসল (aerosol)-এ পরিণত হয়। ভস্মীকরণ মণ্ডলের তাপমাত্রা সিগারেটের গঠন নির্ণয়ে একটি অন্যতম সহায়ক। বায়ুর উপস্থিতিতে সিগারেটের ভস্মীকরণ তাপমাত্রা 1660°F (90444°C) এবং বায়ুর অনুপস্থিতিতে ঐ তাপমাত্রা 1544°F (840°C)। ঐ তাপমাত্রায় বৃহৎ বিয়োজন (pyrotic) বিক্রিয়া ঘটে যেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এর মধ্যে 9 রকমের গ্যাসীয় যৌগ ফুসফুসকে উত্তেজিত করে। কতকগুলি ফুসফুস ও কণ্ঠের ক্ষতিকারক এবং সাতটি যৌগ ক্যানসার সৃষ্টির সহায়ক বলে কেউ কেউ মনে করেন। আরো অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এগুলির মধ্যে কতকগুলি যৌগের ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতা ওগুলির মুক্তাবস্থার ক্ষমতার চেয়ে প্রায় 40 গুণ বেশি।

এর সম্ভবপর ব্যাখ্যা হল ধেঁায়ার কতকগুলি যৌগ, যেগুলি নিজেরা ক্যানসার সৃষ্টি করে না, সেগুলি যেসব যৌগ ক্যানসার সৃষ্টি করে সেগুলির কর্মক্ষমতা বর্ধিত করে। যদি ঐ ধেঁায়া নিয়ে 2 থেকে 5 সেকেণ্ড ফুসফুসে রাখা হয়, তবে প্রায় সমস্ত অণু-পরমাণু থিতিয়ে পড়ে এবং তা ফুসফুসেই থেকে যায়। অক্ষিপক্ষাবলী (cilia) নামে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রলোম সর্বদা ফুসফুস পরিষ্কার করে রাখে তাদের ক্ষতি করে।

বিজ্ঞানীরা কোন কোন তামাকের মধ্যে সামান্য পোলোনিয়ামের (P_0) অস্তিত্ব পেয়েছেন। ধূমপানের একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে তাঁরা জানতে পেরেছেন পোলোনিয়াম সিগারেটের ভস্মীকরণ তাপে বাষ্পে পরিণত হয় এবং তার বেশির ভাগ ধেঁায়ার সঙ্গে ফুসফুসে চলে যায়। অন্যান্য কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় মৌলও ছাইয়ের মধ্যে থাকে। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন, যে সমস্ত মানুষ দিনে 40টি সিগারেট খায়, তাদের ফুসফুসের মধ্যে স্থানীয় বিকিরণ মাত্রার পরিমাণ 35 রেম (rem) থেকে 100 রেমের মত।

সিগারেটের ধেঁায়াতে অবস্থিত যে পোলোনিয়াম শ্বাসকার্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়, তা শ্বাসনালীতে ক্যানসারের উৎপত্তি ঘটাতে পারে এবং ঐ ধেঁায়ার অন্য উপাদানগুলি (যেমন—আলকাত্‌রা, রঞ্জন) ঐ রোগের বৃদ্ধির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কি-না? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই জটিল। কারণ, এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর সাধারণত মানুষ তাদের বা অপরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে দেয়। ঐ ধরণের প্রশ্ন কখন কখন অমূলকও হয়। জীবদেহের উপর নানা পরীক্ষা ছাড়া এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক সমীক্ষায় দেখা যায়—যে সমস্ত লোক সিগারেট খায় তাদের মৃত্যুর হার, যারা সিগারেট খায় না তাদের চেয়ে অনেক বেশি। ধূমপান ফুসফুস ক্যানসার, কণ্ঠ ক্যানসার ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী রোগের (chronic bronchitis) প্রধান কারণ বলে এখন অনেকেই মনে করছেন। ধূমপায়ীদের হৃদরোগে অপঘাতজনিত মৃত্যুর এবং শ্বাসরোধের প্রকোপ অ-ধূমপায়ীদের তুলনায় অনেক বেশি। যে সব মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় ধূমপান করে, তারা অধিকতর কম ওজনের শিশু প্রসব করে এবং প্রায়ই পূর্ণ সময়ের পূর্বেই শিশু প্রসব হয়। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে, রোগের স্থায়িত্ব ও মৃত্যুর হার ধূমপান বৃদ্ধির হারের সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং যারা ধূমপান বন্ধ করে তাদের বেলায় কিছুটা কম হয়।

প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান

আহারের রীতি

মাধবেন্দ্রনাথ পাল*

সাধ্য বা আপন আপন শরীর পোষণের উপযোগী ও হিতকর আহার করা উচিৎ। একাগ্র মনে, শান্তচিত্তে ভোজন করা উচিৎ; অতি দ্রুত বা অতি বিলম্বে আহার করা উচিৎ নয় ইত্যাদি আয়ুর্বেদের নানা বিধি-নিষেধ এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়।

আহার শরীরের বল, বর্ণ, আরোগ্য ও ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতার মূলস্বরূপ। আহারের বিষমতা ঘটলে বা ক্ষুধার মাত্রা অপেক্ষা কম, বেশি বা অযোগ্য আহার করলে রোগের উৎপত্তি হয়—সুশ্রুতের এই অভিমত। সেজন্যে আহার কিভাবে করা উচিৎ সে বিষয়ে চরক ও সুশ্রুত উভয়েই আপন আপন সংহিতায় বিশদ বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেসবের সারমর্ম এখানে আলোচ্য।

আহারীয় বা আহার্য দ্রব্য প্রধানত ভোজ্য, পেয়, লেহ্য ও ভোক্ষ্য—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাত, মিষ্টান্নাদি যে সব দ্রব্য বিশেষ না চিবিয়েই আহার করা যায় তাদের ভোজ্য বলে। দুধ, সরবৎ ইত্যাদি তরল আহার্য দ্রব্য পেয় নামে পরিচিত। চাটনি, জেলী, মধু, আইসক্রীম ইত্যাদি যে সব দ্রব্য চেটে চেটে বা চুষে চুষে খেতে হয় তাদের নাম লেহ্য বা চোষ্য। হাতরুটি, নাড়ু, মাংস ইত্যাদি যে সব কঠিন খাদ্য বিশেষভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হয় তাদের নাম ভোক্ষ্য।

আহারের মুখ্য এই সব আহার্য দ্রব্য প্রস্তুতের জন্যে প্রস্তুতকারক রসুইকার ও রন্ধনশালা কিরূপ হওয়া সঙ্গত, সে বিষয়ে পর্যন্ত সুশ্রুতের নির্দেশ স্মরণীয়। প্রশস্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কক্ষে আহার্য দ্রব্য প্রস্তুতের জন্যে বিশ্বাসী রসুইকার নিযুক্ত করা উচিৎ।

ফল ও অন্যান্য ভোক্ষ্য ভোজনকর্তার ডান পাশে, দুধ ও অন্যান্য পেয় তার বাম পাশে এবং গুড়জাত দ্রব্য সম্মুখে বা ডান ও বামপাশের মধ্যখানে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

শান্ত, নিরবিলি ও সুগন্ধে পুষ্পে সাজানো রমণীয় স্থানে ভোজন করা উচিৎ। ক্ষুধার্ত হলে যথাসময়ে উচ্চ আসনে দেহ সমভাবে রাখা, সুখে-স্বচ্ছন্দে উপবেশন করা ও আপন আপন প্রকৃতির উপযোগী আহার্য মাত্রা অনুসারে ভোজন করা উচিৎ। আহারের সময় বিশেষভাবে স্মরণীয়। ক্ষুধার উদ্রেক হলেই আহারের সময় এসেছে বুঝতে হবে, অন্যথা নয়। ক্ষুধার উদ্রেকের পূর্বে এবং ক্ষুধার সময় অতীত হলে কখনও ভোজন করা কর্তব্য নয়। যে সময় ক্ষুধা হয় সে সময় না খেলে পরে অগ্নিবল বায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে ও তখন আহার করলে অতিকষ্টে পরিপাক হয় এবং দ্বিতীয়বার আর ভোজনের ইচ্ছা থাকে না।

ভোজনের সুরুতে সাধারণত আদা ও লবণ সহযোগে ক্ষুধার উদ্রেক নিশ্চিত করার রীতি এখনও অনেক ভোজের বাড়িতে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে মধুর রসযুক্ত বা মিষ্ট আহার্য দ্রব্য, পরে অম্ল ও লবণ রসযুক্ত আহার্য দ্রব্য এবং চিকিৎসকের আদেশ

*F/7, এম. আই. জি হাউজিং এস্টেট, 37, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-700 037

থাকলে তারপরে তীক্ষ্ণ কষায়যুক্ত আহার্য দ্রব্য ভোজনের কথা। সবশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'— মধুর রসযুক্ত আহার্য দিয়ে আহার সমাপন করা উচিৎ।

প্রথমে ডালিম ইত্যাদি ফল, পরে পেয়াদি এবং তারপরে ভোক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করতে হয়। ক্রমশ বেশি রুচিকর দ্রব্য পর পর আহার করা উচিৎ। প্রথমে সাধারণ রুচিকর, পরে আরও রুচিকর, তারপর আরও বেশি রুচিকর, এবং সবশেষে সবচেয়ে বেশি রুচিকর দ্রব্য ভোজন করতে হয়। রুচিকর দ্রব্য স্বাদু দ্রব্য নামেও পরিচিত। যে দ্রব্য একবার ভোজন করলে পুনরায় ভোজনের ইচ্ছা হয় তাকেই স্বাদু দ্রব্য বলে। খাদ্যদ্রব্য স্বাদু হলে প্রিয়তা বা ভাল লাগা, বল, পুষ্টি, পুলক ও সুখ জন্মায় এবং অস্বাদু হলে তার বিপরীত হয়। এমন অনেক দ্রব্য আছে যা খেতে রুচিকর বা স্বাদু হয় না; কিন্তু অন্য আহার্য দ্রব্যের প্রতি রুচি উৎপাদন করে, এদের অরোচিষ্ণু বলে। ভোজনের প্রথমে নিমপাতা বা ঐরূপ তিক্তস্বাদযুক্ত দ্রব্য খেলে পরবর্তী আহার্য দ্রব্যের প্রতি রুচি জন্মায়।

ভোজনের সময় মন থেকে রাগ, দ্বেষাদি আবেগ সরিয়ে ফেলতে হয়, নচেৎ পরিপাক বাধা পায়। প্রশান্ত ও খুশি মনে আহার করা উচিৎ।

ভোক্তা নিজের অবস্থা সম্যক চিন্তা করবে ও সেইমত আহার করবে। "ইদং মম উপশেতে ইদং ন উপশেতে ইতি বিদিতং যস্মাত্মানঃ আত্মসাম্যং ভবন্তি। তস্মাৎ আত্মানং অভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যগতি ॥" চরকের উপরিউক্ত শ্লোকের মর্মার্থঃ এটি আমার শরীর পোষণের উপযোগী ও হিতকর এবং এটি আমার শরীর পোষণের অনুপযোগী ও অহিতকর—এইরূপ বিচার-বিবেচনার পর কেবলমাত্র সাত্ম্য আহার বা শরীর পোষণের উপযোগী ও হিতকর আহার্য দ্রব্য ভোজন করা উচিৎ। একই দ্রব্য যে সবসময় ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সাত্ম্য হবে একথা বলা যায় না। দেশ, কাল ও ক্ষুধার প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর সাত্ম্য আহার নির্ভরশীল। কোন দ্রব্য যতই পুষ্টিকর হোক না কেন, পরিপূর্ণ ভোজনের পর ক্ষুধা শান্ত হলে, সেই দ্রব্য আহার করলে সাত্ম্য হতে পারে না। শরীরের যথোচিত পোষণ হলেই কোন দ্রব্য সাত্ম্য হতে পারে অন্যথায় নয়।

আহার অতি দ্রুত বা অতি বিলম্বে করা উচিৎ নয়। আহারের সময় গল্প করা, বা হাসাহাসি করা উচিৎ নয়। স্থিরচিত্ত ও নিবিষ্ট মনে আহার করা উচিৎ। এইরূপে আহারের রীতি এখনও দ্বিজগণের উপবীত ধারণ অনুষ্ঠানের পর যথানির্দিষ্ট-কাল পর্যন্ত অবশ্য পালনীয়। অতি দ্রুত আহার করলে ভুক্তদ্রব্য উপরের দিকে ঠেলে আসে, যেখানে পরিপাকের পূর্বে ভুক্তদ্রব্যের যাবার কথা সেখানে প্রবেশ করে না, সেজন্যে শারীরিক অবসন্ন-ভাব জন্মায়; তাছাড়া, খাদ্যের স্বাদুতা অনুভব করা যায় না। সুতরাং আহারজনিত সুখ হয় না এবং সুখ না হলে শরীরের আহারজনিত যথোচিত পুষ্টি হয় না। অতি ধীরে ধীরে আহার করলে আহার্য দ্রব্য শীতল হয়ে যায়, আহারে তৃপ্তি হয় না ও অধিকমাত্রায় ভোজন হয়। ভোজনের সময় অন্যমনস্ক হয়ে কথা বলতে বলতে ও হাসাহাসি করতে করতে অধিক ভোজনজনিত দোষ ঘটে।

ভোজনের সময় ভোক্তা নিজ উদরের কুক্ষি বা আমাশয়কে মনে মনে তিন ভাগে ভাগ করে নেবেন এবং তার এক ভাগ কঠিন খাদ্য ও দ্বিতীয়ভাগ লেহ্য পেয়াদি দ্রব্য দ্বারা পূরণ করবেন এবং অবশিষ্ট একভাগ বায়ু, পিত্ত ও কফের গতিবিধির জন্যে ফাঁকা রেখে দেবেন। এইরূপ বিভাগ করে যথামাত্রায় আহার করলে অমাত্রাজনিত কোনরূপ অশুভ ফল লক্ষ্য করা যায় না।

আহার সমাপনান্তে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকা আহার্যের কণিকা ধীরে ধীরে বের করে দিতে হয়, নচেৎ ঐগুলি পচনের ফলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, দাঁতে ছোপ পড়ে, পোকা ধরে এবং পরিণামে পরবর্তী আহারের সঙ্গে ঐসব দূষিত পদার্থ ক্রমশ দেহাভ্যন্তরে

উপস্থিত হয়ে নানা পীড়ার কারণ ঘটায়। আহারের পর পর কিছুক্ষণ শান্তভাবে থেকে বিশ্রাম নিতে হয় এবং পরে এক-শ' পা চলাচল করতে হয়।

উপরিউক্ত বিধিনিষেধ অনুসারে আহার করলে উদরে কোন পীড়া অনুভূত হয় না, হৃদ্‌যন্ত্র সুপটু ও সক্রিয় থাকে, ইন্দ্রিয়সমূহের পরিতৃপ্তি, ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি হয়; বসা, শোওয়া, চলাফেরা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাস্য ও উপহাস ইত্যাদি কার্যে সুখের অনুভূতি হয়। দুপুরের আহার, সন্ধ্যায় ও রাত্রির আহার প্রাতঃকালে অনায়াসে পরিপাক হয়। তাছাড়া শরীরের বল, বর্ণ ও পুষ্টি যথোচিত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞান প্রদর্শনী

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানের মডেল, চার্ট ও কুটিরশিল্প নিয়ে একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়ে গেল—গত 16ই এপ্রিল। এটি আয়োজন করেছিলেন সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল।

বরিষার বিবেকানন্দ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রায় সারাদিন ধরে এই প্রদর্শনীটি চলে। এটি সমৃদ্ধ ছিল—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের তৈরী নানা রকম মডেল ও চার্ট দিয়ে। মডেলের মধ্যে ছিল স্বয়ংক্রিয় পাম্পের সুইচ, বৈদ্যুতিক তালা, বিস্তীর্ণ জলাশয়ে মাছ ডাকবার



হাতে-কলমে কেন্দ্রের প্রদর্শনী বিভাগের 'মাটি পরীক্ষা করে সার নির্বাচন' অংশে বিভিন্ন পরীক্ষা দেখছেন কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার।

যন্ত্র, মাটি দ্রবণ করার যন্ত্র ইত্যাদি সংখ্যায় প্রায় 25টি। আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মাটি পরীক্ষা ও সার নির্বাচন এবং নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল সনাক্তকরণের সহজ পরীক্ষাগুলি।

সরষের তেলে শিয়ালকাঁটা বীজের তেল আছে কিনা ; ঘি, মাখন, বেবিফুড, রঙ্গিন খাবার, দুধ, মশলাপাতি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল আছে কিনা, তা অল্পখরচে খুবই কম সময়ে যে কেউ জেনে নিতে পারেন। যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞানের অভাবনীয় দিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার চেয়ে তাঁদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বিজ্ঞান ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশল জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। পরিষদের শিক্ষার্থীরা দৃঢ় প্রত্যয়ে ঐ কাজ হাতে নিয়েছে—যা ছিল অধ্যাপক বসুর স্বপ্ন।

কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার খুবই মনযোগ সহকারে প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন।

সায়েন্স অ্যাসোশিয়েশন অব বেঙ্গলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু আকর্ষণীয় মডেল ও হস্তশিল্প প্রদর্শন করা হয়। বর্ধমানের নিউটন সায়েন্স ক্লাব কয়েকটি মডেল নিয়ে এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিল।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গত 11ই এপ্রিল থেকে 13ই এপ্রিল পর্যন্ত হাওড়ায় বিজয়কৃষ্ণ গার্লস্ কলেজের উদ্যোগে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পরিষদের সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে কলমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই প্রদর্শনীতে বহু মডেল প্রদর্শনের জন্যে দেওয়া হয়। কলেজের ছাত্রীরা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল দর্শকদের কাছে সুন্দর-ভাবে উপস্থাপিত করে। প্রদর্শনীটি ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

চুঁচুড়া সায়েন্স ক্লাব আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনা সভা

চুঁচুড়া সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে 15ই এপ্রিল '78 দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাই স্কুলে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী (1879-1955) উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় আইনষ্টাইনের জীবনী ও অবদান সম্বন্ধে আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তি যোগদান করেন।

অশোক নগর বিজ্ঞান সংস্থার বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অধিকার

27শে জানুয়ারী '78 থেকে 4ঠা ফেব্রুয়ারী '78 পর্যন্ত NCERT (National Council of Education and Research Training) এবং জহর শিশু ভবন কর্তৃক আয়োজিত চতুর্থ রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় অশোক নগর বিজ্ঞান সংস্থা কর্তৃক প্রদর্শিত প্রোজেক্টসমূহ প্রথম স্থান দখল করে এবং এক হাজার টাকার MMC Award লাভ করে। এদের প্রদর্শিত প্রোজেক্ট সমূহ—i) কচুরীপানা থেকে জ্বালানী গ্যাস, ii) অপ্টিক্যাল ব্যালান্স, iii) শক্তির রূপান্তর, iv) ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় চাবি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে ইনষ্টিটিউশন অব পাব্লিক হেল্‌থ ইঞ্জিনীয়ারস (ইণ্ডিয়া)-এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সহযোগিতায় আগামী 5ই জুন '78 কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষে ধ্বংসমুক্ত উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা ও প্রদর্শনীর (5ই জুন থেকে 8ই জুন '78) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন

বর্তমান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সমস্থানিক মৌলের ব্যবহার এবং প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরমাণু-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান এবং কৃষি-বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান গবেষণার পরিধি সমস্থানিক মৌলের উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। সমস্থানিক মৌলের গবেষণায় যে কয়জন বিজ্ঞানী সার্থক কৃতিত্ব রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে ফ্র্যান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন-এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই বৃটিশ বিজ্ঞানীর জন্ম 1877 খৃষ্টাব্দের 1লা সেপ্টেম্বর। বার্মিংহামের হারবোর্ণের এক ধাতু ব্যবসায়ীর ছেলে অ্যাস্টন ছেলেবেলা থেকেই অংকশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেন। ছাত্রাবস্থায় দারিদ্র্যের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে তাঁকে বড় হতে হয়। প্রথমে ম্যালভার্ণ কলেজে এবং পরে বার্মিংহাম ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। বহু কৃতি মনীষীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই হয়েছিল।

1909 খৃস্টাব্দ অ্যাস্টনের জীবনে স্মরণীয়। ঐ বছরে তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. জে. টমসন-এর সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সুযোগ পান। টমসনই আবিষ্কার করেন এই তরুণ প্রতিভাকে এবং বিশ্ববিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস পরীক্ষাগারে নিজের গবেষণার সহায়করূপে নির্বাচিত করেন। অ্যাস্টন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। দারিদ্রমুক্ত অ্যাস্টন নিজেকে পুরোপুরি গবেষণার কাজে নিযুক্ত করেন। এই সময় টমসন ধনাত্মক রশ্মির বিশ্লেষণ সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। সুবিধামত নিম্নচাপে তড়িৎ মোক্ষণ নলে অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথোডের সঙ্গে সূক্ষ্মছিদ্রযুক্ত পিতলের নল যুক্ত করে ধনাত্মক রশ্মিগুচ্ছকে পর্যায়ক্রমে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে তিনি ধনাত্মক রশ্মির ছবি তুলছিলেন। ছবিগুলি পরীক্ষা করে বিভিন্ন আধান এবং ভরের অনুপাত বিশিষ্ট কণার উপস্থিতি টের পান। মোক্ষণ নলে নিয়ন গ্যাস নিয়ে টমসন প্রাপ্ত ছবির বিশ্লেষণে দু'রকম ভরবিশিষ্ট কণার অস্তিত্ব টের পান! কিন্তু তাঁর এই গবেষণা সম্বন্ধে টমসন তখনই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। 1913 খৃষ্টাব্দে অ্যাস্টন বিশুদ্ধ নিয়ন গ্যাস নিয়ে সাধারণ আংশিক পাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে 20·15 ও 20·28 পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট দু-রকমের কণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় নিয়ন এক রকমের বর্ণালী উৎপন্ন করলেও একই প্রকারের মৌলিক কণা দিয়ে গঠিত নয়, একই মৌলের একাধিক রূপের সংমিশ্রণ। এই সময় সমস্থানিক

মৌল সম্বন্ধীয় তত্ত্বের সবেমাত্র সূচনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে এই তত্ত্বের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং সিদ্ধান্ত করা হয় টমসন তড়িৎ মোক্ষণ নলে নিয়ন গ্যাস ব্যবহার করে যে দু'রকমের রেখাচিত্র পেয়েছিলেন, তা নিয়নের সমস্থানিক মৌলের উপস্থিতির জন্যে। এভাবে অ্যাস্টনের নিরলস গবেষণার ফলে টমসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হল। শুধু তাই নয় এই সিদ্ধান্তের পরবর্তী অধ্যায় হল বিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

1919 খৃষ্টাব্দে অ্যাস্টন টমসনের যন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন করে একটি নতুন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের নাম দেন 'মাস্ স্পেক্টোগ্রাফ'। টমসনের যন্ত্রে চৌম্বক এবং তড়িৎক্ষেত্র কণাগুলিকে সমকৌণিক তলে বিচ্যুত করেছিল কিন্তু অ্যাস্টনের যন্ত্রে এই বিচ্যুতি ঘটানো হয়েছিল একই তলে। কিন্তু বিচ্যুতির দিক ছিল বিপরীত। তার ফলে ছবি তোলার প্লেটকে সুবিধামত জায়গায় রেখে বিভিন্ন কণার পৃথক সূক্ষ্ম ছবি তোলা সম্ভব হয়েছিল। এই ছবি অর্থাৎ 'মাস্ স্পেকট্রাম এর প্রত্যেকটি রেখা নির্দিষ্ট ভর/আধান মান সূচিত করে। নির্দিষ্ট ভরবিশিষ্ট কণার বর্ণালীর সঙ্গে এই রেখাগুলির তুলনা করে যে কোন কণার ভর নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। এই যন্ত্রের সাহায্যে অ্যাস্টন মৌলের পারমাণবিক ভর 1,000 ভাগের 1 ভাগ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া সমস্থানিক মৌলগুলি সমপ্রকৃতির হওয়ার জন্যে এগুলিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরস্পর থেকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অ্যাস্টনের যন্ত্রের সাহায্যে এদের আধান এবং ভরের অনুপাত অনুযায়ী পৃথক করা সম্ভব হয়েছিল। 1927 খৃষ্টাব্দে অ্যাস্টন এই যন্ত্রের উন্নতি বিধান করে 1,000,000 ভাগের 1 ভাগ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে গণনা করতে সমর্থ হন। দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে অ্যাস্টন সমস্ত মৌল এবং সমস্থানিক মৌলের পারমাণবিক ভর নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেন। অ্যাস্টনের আবিষ্কারের ফলে প্রাউটের প্রকল্পও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যাস্টনের এই গবেষণায় সামগ্রিকভাবে রসায়ন-বিজ্ঞান এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই সমৃদ্ধ হয়।

অ্যাস্টন তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিরূপে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্মানিত হন। 1920-তে ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ পান এবং 1921-এ হন F.R.S.। 1922-এ লাভ করেন হিউজেস মেডেল। ঐবছরই রসায়ন-বিজ্ঞানে অ্যাস্টনকে সর্বোচ্চ সম্মানস্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। 1923-এ লাভ করেন জন স্কট মেডেল এবং প্যাটার্নো মেডেল। 1938 এবং 1945 খৃষ্টাব্দে পান যথাক্রমে রয়্যাল মেডেল এবং ডাল্টন মেডেল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দক্ষ সাঁতারু ও গল্ফ খেলোয়াড়। সঙ্গীতরসিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

আজ অ্যাস্টনের জন্মের পর এক-শ' বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বিজ্ঞান আজ উন্নতির চরম শিখরে কিন্তু বিজ্ঞানকে এই শিখরের দিকে তুলে দিতে যে সব বিজ্ঞানী অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন অ্যাস্টন নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। এই লোকোত্তর প্রতিভার গবেষণাকার্য ও জীবনী আলোচনার মাধ্যমে ঋষিঋণ স্বীকৃতি একান্ত কর্তব্য। এই নিবন্ধের মাধ্যমে তাঁকে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দুর্গাশঙ্কর মল্লিক*

* রসায়নবিদ্যা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

ডিটারজেন্টের গোপন কথা

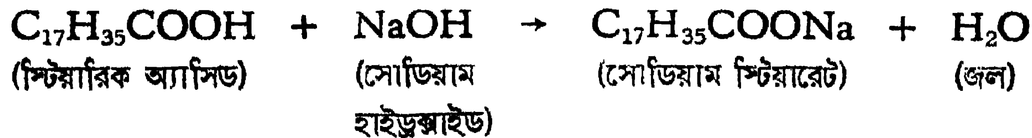
গামলায় কিছুটা গরম জল নিয়ে তাতে কয়েক চামচ ডিটারজেন্ট (detergent) মিশিয়ে নাড়তেই ফেনায় ভরে উঠল গামলার জল,—আর তার মধ্যে অপরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে রগড়াতেই দেখা গেল তাতে ময়লার দাগ নেই। কিন্তু কি করে এ সম্ভব হল? মানুষের দৃষ্টির বাইরে গামলার মধ্যে কি এমন ঘটল যা ময়লাকে কাপড় থেকে তাড়িয়ে দিল?

অণু-পরমাণুর জগতটাকে যদি দেখতে পাওয়া যেত তবে নিশ্চই মানুষের চোখে পড়ত—গামলার জলের মধ্যে হচ্ছে ভীষণ যুদ্ধ—ডিটারজেন্ট পাউডারের অণু আর ময়লার মধ্যে। তবে সবরকম ময়লার সঙ্গে ডিটারজেন্ট যুদ্ধ করতে পারে না। ময়লা বলতে বোঝায় সাধারণত কালি, রক্ত ও চর্বিজাতীয় বস্তুর দাগ। ডিটারজেন্ট এই চর্বি জাতীয় ময়লা পরিষ্কার করতে পারে বেশি। ডিটারজেন্ট-অণুর গঠন থেকেই বুঝতে পারা যায়—কেন ডিটারজেন্ট চর্বিজাতীয় ময়লা (greasy stain) পরিষ্কার করতে পারে।

স্নেহজ অ্যাসিড (fatty acid) থেকে এই ডিটারজেন্ট তৈরি করা হয়। স্নেহজ অ্যাসিড-এর সঙ্গে ক্ষার (NaOH বা KOH) বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে এই ডিটারজেন্ট। আসলে ডিটারজেন্ট হল জৈব অ্যাসিডের লবণ।

স্নেহজ অ্যাসিড + ক্ষার → ডিটারজেন্ট + জল

স্টিয়ারিক অ্যাসিড (stearic acid), পামিক অ্যাসিড (palmic acid), ওলিক অ্যাসিড (oleic acid) ইত্যাদি স্নেহজ অ্যাসিড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্টিয়ারিক অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে সোডিয়াম স্টিয়ারেট (sodium stearate) আর জল।



$$C_{17}H_{35}COOH + NaOH \rightarrow C_{17}H_{35}COONa + H_2O$$

(স্টিয়ারিক অ্যাসিড) (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) (সোডিয়াম স্টিয়ারেট) (জল)

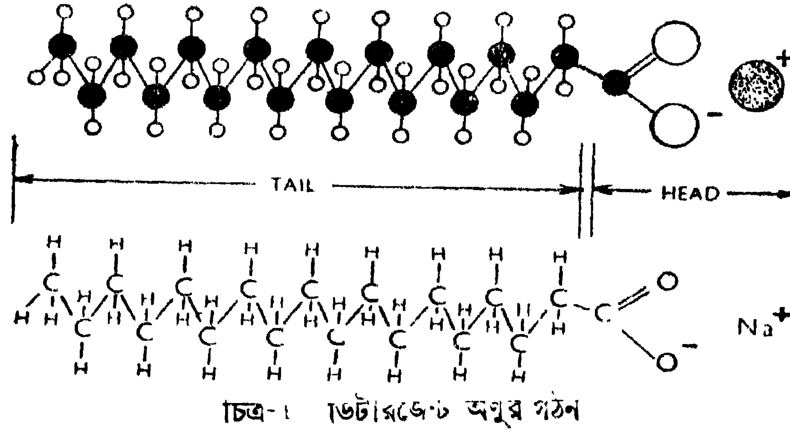
এই সোডিয়াম স্টিয়ারেটই হচ্ছে ডিটারজেন্ট।

ডিটারজেন্ট-এর অণুর গঠনে দুটি অংশ দেখতে পাওয়া যায়—(1) মাথা (head) ও (2) লেজ (tail)। নিচের ছবিতে বিভিন্নভাবে একটি ডিটারজেন্ট অণুর (এখানে সোডিয়াম স্টিয়ারেটের) গঠন দেখানো হয়েছে (চিত্র-1)।

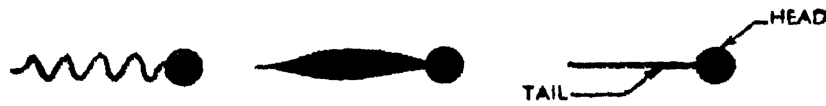
ডিটারজেন্টের অণুকে সাধারণত তিন রকম ভাবে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র-2)।

ডিটারজেন্টের এই 'মাথা'র অংশ ভালবাসে জল তাই সে জলের দিকে থাকতে চায়, আর 'লেজের'র অংশ ভালবাসে চর্বিজাতীয় পদার্থ। তাই জলে ডিটারজেন্ট অণু তাদের লেজকে জল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। অণুগুলি তাই একসঙ্গে জোট বেঁধে তৈরি করে ছোট

ছোট গোলাকার ক্লাম্প (clump)—এগুলিকে ব্যবহারিক রসায়ন-বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় মাইসেল **(micelle)**। আর যে অণুগুলি জোট বাঁধতে পারে না, তারা মুক্ত অবস্থায় জলে ঘুরে বেড়ায়।



চিত্র-1। ডিটারজেন্ট অণুর গঠন

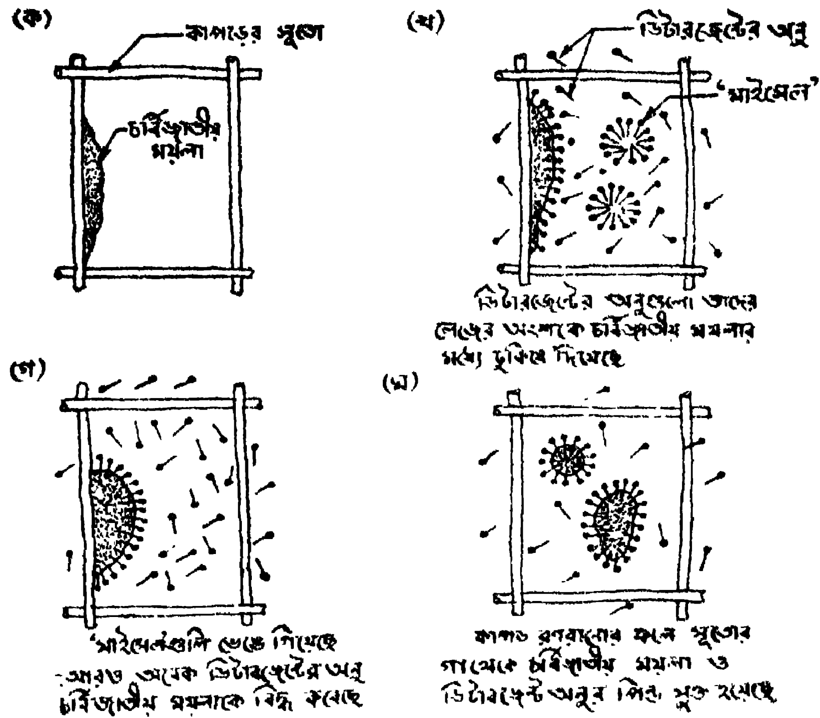


চিত্র-2

এইবার যখন অপরিষ্কৃত কাপড় ডিটারজেন্ট মেশানো জলের মধ্যে ফেলা হল, গরম জলের সংস্পর্শে এসে চর্বিজাতীয় ময়লা নরম হয়ে যায়। মুক্ত ডিটারজেন্ট অণুগুলি ছুটে এসে তাদের লেজটিকে ঢুকিয়ে দেয় চর্বিজাতীয় ময়লার মধ্যে। এমনি ভাবে মুক্ত অণু শেষ হলে মাইসেল ভাঙতে শুরু করে, আর অণুগুলি ছুটে যায় চর্বিজাতীয় ময়লার দিকে। চর্বিজাতীয় ময়লাকে চারদিক থেকে বিদ্ধ করে ডিটারজেন্টের অণুগুলি তার গায়ে একটা আস্তরণ সৃষ্টি করে। চর্বিজাতীয় পদার্থ এখন সুতোর গায়ে লেগে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কাপড় রগড়ালেই সুতোর গা থেকে তারা পড়ে যায়। চারদিকে ডিটারজেন্ট অণু বেষ্টিত হয়ে এই চর্বিজাতীয় পদার্থ জলে অবদ্রব **(emulsion)** হিসাবে ভাসতে থাকে, আর কাপড় হয়ে যায় পরিষ্কার। চিত্রে দেখানো হয়েছে ডিটারজেন্টের অণু চর্বিজাতীয় ময়লাকে কি ভাবে কাপড় থেকে তাড়িয়ে দেয় (চিত্র-3)।

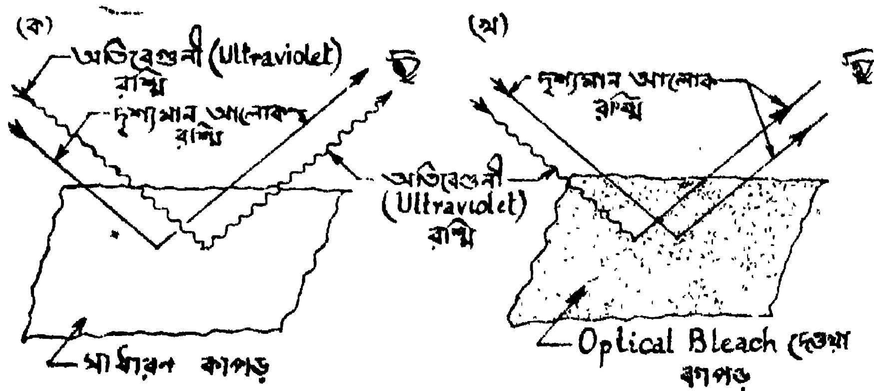
বাজারে যে ডিটারজেন্ট কিনতে পাওয়া যায় তার সবটুকুই কিন্তু প্রকৃত ডিটারজেন্ট নয়। আরও বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য তার সঙ্গে মেশান হয়। সাধারণত ডিটারজেন্ট পাউডারের চারভাগের একভাগ থাকে প্রকৃত ডিটারজেন্ট। ডিটারজেন্টের চেয়েও বেশি পরিমাণ থাকে বিল্ডার **(builder)**—যেমন, ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন অরথোফসফেট **(disodium hydrogen orthrophosphate)**— যা ময়লা সরাতে সাহায্য করে। কিছু পরিমাণ পারবোরেটও **(perborate)** মেশানো থাকে। পারবোরেট হিসাবে সোডিয়াম পারবোরেট **(sodium perborate)** ব্যবহার করা হয়। এই সোডিয়াম পারবোরেট ($NaBO_3$, $4H_2O$) বিরঞ্জক দ্রব্য **(bleaching agent)** হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া

ডিটারজেণ্ট পাউডারের মধ্যে থাকে সোডিয়াম কার্বক্সিল মিথাইল সেল্‌লোজ **(sodium carboxyl methyl cellulose)** যা ময়লা ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ডিটারজেণ্ট পাউডারে রঞ্জক দ্রব্য,



চিত্র—3. ডিটারজেণ্টের কর্মপদ্ধতি

সুগন্ধি দ্রব্য ছাড়াও থাকে দৃক্‌-বিরঞ্জন **(optical bleach)** নামে এক ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য। এই বস্তুটির জন্যই ডিটারজেণ্ট পাউডারে কাচা কাপড় হয় উজ্জ্বল। এই দৃক্‌-বিরঞ্জন কাপড়ের গায়ে



চিত্র-4. (ক) দৃক্‌-বিরঞ্জন না থাকার ফলে অতিবেগুনী রশ্মি, যা দেখতে পাওয়া যায় না, তা অতিবেগুনী রশ্মি হিসাবেই প্রতিফলিত হয়। (খ) দৃক্‌-বিরঞ্জন থাকার ফলে অতিবেগুনী রশ্মি দৃশ্যমান আলোতে প্রতিফলিত হয়, তাই কাপড় এত উজ্জ্বল দেখায়।

একটা আস্তরণের মত পড়ে। দৃক্‌-বিরঞ্জনের একটা আশ্চর্য গুণ আছে—এই পদার্থের উপর অতিবেগুণী রশ্মি (ultraviolet ray) পড়লে তা দৃশ্যমান আলো হিসাবে বিচ্ছুরিত হয়।

কাপড়ের গায়ে লেগে থাকা দ্যুক্-বিরঞ্জন এই অতিরিক্ত আলো বিচ্ছুরিত করে বলেই কাপড় এত উজ্জ্বল হয় (চিত্র-4)। বাজারে যে টিনোপাল (tinopal) জাতীয় পাউডার পাওয়া যায়, তার মধ্যেও থাকে এই দ্যুক্-বিরঞ্জন। এতে সাধারণত যে দ্যুক্-বিরঞ্জন ব্যবহার করা হয় তার রাসায়নিক নাম বিটা-মিথাইল আম-বিটাইফেরন (β-methyl umbetiferon)।

সৌরীনকুমার পাল*

* হেয়ার স্কুল, কলিকাতা-700 012

সম-সম্ভাব্য অংশক চয়ন

রাজ্যের খবরাখবর সংগ্রহের মধ্য দিয়ে পরিসংখ্যানের জন্ম হলেও আজ আমরা প্রতিনিয়ত পরিসংখ্যানের বেড়াজালে আবদ্ধ। বাড়ির গৃহিণীর একটি ভাল শাড়ি কিনতে হলেও মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাবটা একটু দেখে নিতে হয়। পারিবারিক হিসাবটাও একটা পরিসংখ্যান। পারিবারিক কথা বাদ দিলাম। যে কোন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিসংখ্যানজনিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। পুরো বিষয়টিকে বলা হয় সমগ্রক (population বা universe)। সমগ্রকের বিভিন্ন একক সম্বন্ধে তথ্যগুলিকে বলা হয় উপাত্ত (data)। যেমন আমাদের দেশের আদিবাসীদের উপর সমীক্ষা করলে আদিবাসীরা হবে সমগ্রক এবং তাদের এক একটি বিষয়ের একাধিক তথ্যগুলি হবে এক একটি এককের উপাত্ত। পরিসংখ্যানের পুরো ব্যাপারটিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় (i) উপাত্ত সংগ্রহ, (ii) সংকলন, (iii) বিশ্লেষণ, (iv) সিদ্ধান্ত প্রণয়ন। উপাত্ত দুই ধরণের মৌলিক (primary) ও মাধ্যমিক (secondary)। সরাসরি সমীক্ষা বা পরীক্ষা দ্বারা সংগৃহীত উপাত্তগুলি মৌলিক আর কোন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ মাধ্যমিক।

উপাত্ত সংগ্রহ পরিসংখ্যানের প্রাথমিক ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। উপাত্ত সংগ্রহকালে কয়েকটি নির্দেশিকা মেনে চলতে হয়—(i) সমীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা, (ii) নির্ভুল তথ্য সংগ্রহে কর্মীদের সতর্কতা, (iii) ফলাফলের স্তর বিন্যাসের (accuracy) কথা মনে রাখা, (iv) তথ্যগুলি গুণগত উচ্চমানের হওয়া। কিসের জন্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তা ঠিক জানা না থাকলে কর্মীদের পক্ষে ঠিক ঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। নির্ভুল তথ্য সংগৃহীত না হলে সিদ্ধান্তও নির্ভুল হবে কেমন করে? কোন্ স্তর পর্যন্ত ফলাফল প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তথ্য সংগৃহীত করতে হবে। একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গড় বয়স কত বছর বা কত বছর কত মাস বা কত বছর কত মাস কত দিন হিসাবে বলা যায়। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা ঠিক করতে হয়। তথ্যের গুণগত মানের উপরই বিচ্যুতি (error) নির্ভর করবে।

উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি হল পূর্ণ গণনা বা সমীক্ষা **(complete enumeration বা census)** আর অপরটি হল আংশিক সমীক্ষা বা নমুনা পরীক্ষা **(sample survey)**।

পূর্ণ সমীক্ষা অত্যন্ত ব্যাপক। সমগ্রকের বহু একক সম্বন্ধে এই সমীক্ষায় তথ্য সংগৃহীত হয়। হরিণঘাটার দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের উপর পূর্ণ সমীক্ষা চালাতে হলে সমীক্ষাকারীদের খোঁজ করতে হবে— **(i)** দুগ্ধবতী গাভী ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা কত, **(ii)** কতগুলি থেকে প্রত্যহ দুধ পাওয়া যায়, **(iii)** দুধ দেওয়াকালে প্রতিটির সন্তান বেঁচে আছে কিনা, **(iv)** বেঁচে না থাকার কারণ, **(v)** দৈনিক দুধের পরিমাণ, **(vi)** প্রতিটি গাভী ও মহিষ থেকে প্রাপ্ত দুধের পরিমাণ, **(vii)** কি কি পশুখাদ্য ব্যবহার করা হয়, **(viii)** পশুখাদ্যের পরিমাণ, সংগ্রহের স্থান ও দাম, **(ix)** পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা, **(x)** দুধের পরিমাণ ও গুণগত উন্নয়নের জন্যে গবেষণার কাজ, **(xi)** প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সংখ্যা, **(xii)** কর্মীদের বিভাগ, **(xiii)** কর্মীদের সংগঠন সংস্থা ও তার কাজ, **(xiv)** দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্র, **(xv)** প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, ইত্যাদি। পূর্ণ গণনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আদমসুমারী **(population census)**। অন্যান্য বহু দেশের মত আমাদের দেশেও প্রতি দশবছর অন্তর লোকগণনা বা আদমসুমারীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম লোকগণনা হয় 1872 খৃঃ (যদিও একে পূর্ণ সমীক্ষা বলা যায় না)। 1971 খৃঃ আমাদের দেশে শেষ লোকগণনা হয়েছে। পরবর্তী গণনা হবে 1981 খৃঃ। 1971 খৃঃ গণনায় জানা যায় ভারতের জনসংখ্যা 55·8 কোটি এবং বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা 70 লক্ষ 5 হাজার। আদমসুমারী যেমন ব্যাপক তেমনি একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর উপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে আবার এক একটি একক বিষয়ে উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রকল্প রচনার পথ সুগম হয়। কিন্তু পূর্ণ সমীক্ষা (i) ব্যয়বহুল, (ii) সময়সাপেক্ষ, (iii) লোকবল, পারদর্শী কর্মী ও বিভিন্ন রকমের তথ্য প্রদানকারীদের উপর নির্ভরশীল। একটি ছোটখাট সংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পূর্ণ সমীক্ষা চালানো সহজসাধ্য নয়। এই কারণে আংশিক সমীক্ষা বা নমুনা পরীক্ষার উপরই পরিসংখ্যানকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়।

নমুনা সমীক্ষায় সমগ্রকের অংশবিশেষের উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করে সমগ্রকের গুণাগুণ বিচার করা হয়। এই পদ্ধতির নামই অংশক চয়ন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সামান্য অংশ পরীক্ষা করে সমগ্রকের কি সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে? অনেক কাজে এ কথা মনেই আসে না। রান্নার সময় একটিমাত্র ভাত দেখেই হাঁড়ির ভাত ঠিক সিদ্ধ হয়েছে কিনা যাচাই করা হয়। প্রতিটি ভাত পরীক্ষা করাকে অর্বাচীনের কাজ বলেই বিবেচিত হবে। বাজারে চাল কিনতে হলে সমগ্র বস্তায় চাল না দেখে দু-একটি চাল হাতে নিয়ে বা মুখে দিয়ে সমগ্র বস্তার চালের গুণাগুণ বিচার করা হয়। রসায়নাগারে কোন রাসায়নিক দ্রব্যের পরীক্ষার জন্যে সামান্যতম অংশের পরীক্ষাই যথেষ্ট। একটি মিলের সরিষার তেলে ভেজাল আছে কিনা দেখার জন্যে সমস্ত তেল পরীক্ষাগারে আনা হয় না। একটি শিশিতে করে সামান্য তেল এনেই পরীক্ষা করা হয়।

অংশক চয়ন পদ্ধতি নির্ভর করে সঠিক অংশক নির্ণয়ের উপর। উদ্দেশ্যমূলক চয়ন হলে, সব শ্রমই ব্যর্থ হবে, পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। সঠিক অংশ নির্ণয় বা সঠিক অংশক হল সেই নমুনা যাতে সমগ্রকের সব কিছু গুণাবলীর প্রতিফলন থাকে। এরূপ অংশক চয়নই সম-সম্ভাব্য অংশক চয়ন। সম-সম্ভাব্য অংশক চয়নের সুবিধা হল—(i) ব্যয়বহুল নয়, (ii) উপাত্তগুলিকে ইচ্ছামত সূক্ষ্ম স্তর পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়, (iii) উপাত্তগুলির উপর সম্ভাবনা তত্ত্ব প্রয়োগ করে পরিসংখ্যানগত প্যারামিটারগুলি (যেমন গড়, বিস্তৃতি, বিচ্যুতি, বণ্টন অপেক্ষক ইত্যাদি) পাওয়া যায়, (iv) বহু পারদর্শী কর্মীর প্রয়োজন হয় না, (v) অল্পসময়ে ও অল্পস্থানে সমীক্ষা চালানো যায়। সম-সম্ভাব্য অংশক চয়ন পদ্ধতি পূর্ণ সমীক্ষায় বিরোধী নয় বরং পরিপূরক। তবে এই পদ্ধতির ব্যাপকতা কম এবং এতে বড় রকমের বিচ্যুতি থাকায় সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য গণিতের সাহায্যে বিচ্যুতির মাত্রা নির্ণয় আজ আর কোন দুরূহ ব্যাপায় নয়।

রতনমোহন খাঁ*

* সিটি কলেজ, গণিত বিভাগ, কলিকাতা-700 009

পরীক্ষা কর

নিচের প্রতিটি প্রশ্নের দুটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের কর

1. পরিষ্কার আকাশ নীল দেখায়, কারণ—
   (a) নীল আলো বেশি বিক্ষিপ্ত হয় বলে।
   (b) নীল আলো শোষিত হয় বলে।
2. পৃথিবীর শতকরা কত ভাগ জলে আচ্ছাদিত ?
   (a) শতকরা 70 ভাগ।
   (b) শতকরা 75 ভাগ।
3. ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন কে ?
   (a) সকলে (Shockley)।
   (b) মরলে (Morley)।
4. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে—
   (a) ক্যালসিয়াম। (b) ফসফরাস।
5. আর্দ্র বায়ুর মধ্যে শব্দের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়, কারণ—
   (a) আর্দ্র বায়ুর ঘনত্ব শুষ্ক বায়ুর চেয়ে কম।
   (b) আর্দ্র বায়ুর ঘনত্ব শুষ্ক বায়ুর চেয়ে বেশি।

6. লাল বর্ণের ফুল সবুজ আলোতে—

✓(a) কালো বর্ণের দেখায়।

(b) নীল বর্ণের দেখায়।

7. লাল বর্ণের ফুল নীল আলোতে—

(a) সবুজ বর্ণের দেখায়।

✓(b) বেগুনি-লাল বর্ণের দেখায়।

8. পেঁচা ভাল দেখতে পায়—

(a) সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

(b) আংশিক অন্ধকারে।

9. রেডিও মাইক্রোমিটার ব্যবহার হয়—

(a) বেতার তরঙ্গ মাপার জন্যে।

(b) তাপ-বিকিরণ মাপার জন্যে।

10. মরিচা পড়ার জন্যে লোহার ওজন—

(a) বৃদ্ধি পায়। (b) হ্রাস পায়।

11. স্বল্প দৃষ্টি (near sight) দোষযুক্ত চোখে ভাল দেখতে পায় না—

(a) কাছের জিনিষ। (b) দূরের জিনিষ।

12. 4°C উষ্ণতায় এক সি.সি. জলের ওজন এক গ্রাম হলে এক ঘনফুট জলের ওজন হবে—

(a) এক পাউণ্ড। (b) 62·5 পাউণ্ড।

13. এক্স-রশ্মির সমগোত্রীয় রশ্মি—

(a) মহাজাগতিক রশ্মি। (b) গামা রশ্মি।

14. কুরীদম্পতি প্রথম যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন, তা হল—

(a) রেডিয়াম। (b) পোলোনিয়াম।

15. মহাজাগতিক রশ্মির (cosmic ray) উৎসস্থল—

(a) পৃথিবীর আয়নমণ্ডলে। (b) পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে।

16. খুব সরু ব্যাসযুক্ত কৈশিক (capillary) কাচনল জলে ডোবালে নলের মধ্যে জল কিছুটা উপরে উঠে, তার কারণ—

(a) জলের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ। (b) জলের পৃষ্ঠটান।

17. মানুষের হাত কোন্ শ্রেণীর লিভার ?

(a) প্রথম শ্রেণীর। (b) তৃতীয় শ্রেণীর।

18. চাঁদে কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ওজনের—

(a) $\frac{1}{6}$ ভাগ। (b) $\frac{1}{16}$ ভাগ।

19. উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি হয়—
    (a) শিকড়ে। (b) পাতায়।

20. মানুষের দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন নিঃসরণ করে—
    (a) পিটুইটারী গ্রন্থি। (b) থাইরয়েড গ্রন্থি।

(উত্তর 235নং পৃষ্ঠায়)

গুরুপদ ঘোষ*

*গ্রাম-আব্বারপুর, পোঃ সিউড়ী, বীরভূম

জেনে রাখ

আয়নায় কেন পারদ প্রলেপ দেওয়া হয়—

আয়নার পিছনে যে প্রলেপ দেওয়া থাকে তা পারদ প্রলেপ। কিন্তু পারদ বিযাক্ত। তাই প্রথমে পারদ প্রলেপ দিয়ে তার উপর আবার লাল রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে করে দুটি উপকার হয়। যথা—পারদ প্রলেপ সহজে নষ্ট হয় না, অপর দিকে বিযাক্ত পারদ খাবারের সঙ্গে লেগে বিপদ ঘটাতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, পারদ খুব দামী হওয়া সত্ত্বেও আয়নায় কেন পারদ প্রলেপ দেওয়া হয়, অন্য রঙের প্রলেপ তো দেওয়া যেতে পারতো ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—কোন রঙীন পদার্থ যেমন লাল, নীল প্রভৃতি রঙের প্রলেপ দিলে কি হবে ? একথা জানা আছে—আয়নার সামনের তলে আলোক রশ্মি আপতিত হলে রশ্মি কাচ ভেদ করে চলে যায় এবং ঐ প্রলেপ তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ঐ প্রতিফলিত রশ্মি চোখে আসলে তখন আমরা বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখে থাকি। বলা বাহুল্য, সাদা আলো সাত রঙের আলোক রশ্মির সমষ্টি। এখন প্রলেপ যদি রঙীন হয় তাহলে এক রঙের রশ্মি প্রতিফলিত হবে, বাকী ছয় রঙের রশ্মি ঐ প্রলেপ শোষণ করবে। অর্থাৎ লাল রঙের প্রলেপ থাকলে শুধু লাল রঙের রশ্মি প্রতিফলিত হবে, বেগুনী রঙের প্রলেপ থাকলে কেবলমাত্র বেগুনী রঙের রশ্মি প্রতিফলিত হবে। সুতরাং মোট আপতিত রশ্মির তুলনায় প্রতিফলিত রশ্মি সাত ভাগে এক ভাগ আসায় প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা খুব হ্রাস পাবে। তাছাড়া প্রলেপ তল থেকে রঙীন আলো আসায় আয়নার সামনে থেকে ঐ প্রলেপের রঙ দেখা যাবে। এই সকল কারণে প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হবে।

এখন আসা যাক, কালো রঙের প্রলেপ দিলে কি হয় ? কালো রঙ কোন রঙ নয়। আলোর অভাব মানে কালো। অর্থাৎ যে স্থান থেকে আলো প্রতিফলিত হয় না সেই স্থানকে কালো দেখায়। বলা বাহুল্য কালো রঙের কোন জিনিসের উপর আলো আপতিত হলে কালো সকল রঙের

রশ্মি শোষণ করে নেবে। কোন রঙের রশ্মি প্রতিফলিত করবে না। সুতরাং ঐ কালো রঙের প্রলেপের উপর আলো পড়লে ঐ প্রলেপ থেকে কোন রশ্মি প্রতিফলিত হবে না। ফলে প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না।

এখন বাকী রইল সাদা রঙ। সাদা রঙ অবশ্য সব রঙের রশ্মি প্রতিফলিত করবে, খুব কমই নিজে শোষণ করবে। ফলে প্রতিবিম্ব উজ্জ্বল হওয়া দরকার। কিন্তু বাইরে থেকে সাদা রঙকে দেখা যাবে। এই কারণের জন্যেই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট না হয়ে অস্পষ্ট হবে।

কিন্তু পারদ চকচকে, উত্তম প্রতিফলক। কাচের ভিতর দিয়ে পারদকে একটু কালচে রঙের দেখায় কিন্তু প্রতিবিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে তেমন বিঘ্ন ঘটায় না। অথচ এটি খুব কম রশ্মি শোষণ করে, প্রায় সবই প্রতিফলিত করে দেয়। এই জন্যে পারদ দামী হওয়া সত্ত্বেও আয়নায় পারদ ব্যবহার করা হয়।

মঙ্গলগ্রহকে কেন লাল দেখায়—

পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহকে লাল দেখায়। অনেক পুরনো গ্রন্থে, কাব্যে মঙ্গলের কথা উল্লেখ আছে। সব ক্ষেত্রেই মঙ্গলকে লাল গ্রহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মঙ্গল গ্রহকে কেন লাল দেখায় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

1976 সালে জুলাই মাসে আমেরিকার ভাইকিং-, মহাকাশযানটি মঙ্গলের মাটিতে নেমে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছে তা থেকে বুঝা গেছে যে মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল আছে, তবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত এত বেশি গ্যাস নেই। সেখানকার বায়ুমণ্ডলে 3% নাইট্রোজেন আছে, প্রায় 1·5% অক্সিজেন আছে এবং অন্যান্য গ্যাসও কিছু কিছু আছে। তবে ধূলিকণার পরিমাণ অত্যধিক। জলীয় বাষ্পও কিছু আছে। ফলে সূর্য থেকে আলোক রশ্মি মঙ্গলে যাবার আগে ঐ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যেতে হয়। তখন আলোক রশ্মি বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে যায়। আলোর এই বিচ্ছুরণের (scattering of light) ফলে দেখা যায় লাল রঙের বিচ্ছুরণ সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া মঙ্গলের মাটি দেখতে লাল। ফলে ঐ মাটি থেকে যে আলো প্রতিফলিত হবে তা লাল রঙের। সম্ভবত এই দুই কারণে মঙ্গলকে লাল দেখায়।

চাঁদে বায়ু নেই কেন?

এ পর্যন্ত উন্নত দেশগুলি যে যে জায়গায় তাদের মহাকাশযান পাঠিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে তা হল চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহ। দেখা গেছে মঙ্গলে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল আছে কিন্তু চাঁদে নেই। কারণ কি? এই কারণের উত্তর দেওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে কঠিন ব্যাপার ছিল না। চাঁদে বায়ু না থাকার জন্যে দায়ী একমাত্র চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ বল। দেখা গেছে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ বল (gravitational force) পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। পৃথিবী তার বিশাল বায়ুমণ্ডলকে ধরে রেখেছে এই মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্যে। গ্যাস সব সময় দূরে চলে যেতে চায়। তাই দেখা যায় পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি আর যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুর ঘনত্ব তত কমতে থাকে। তার কারণ পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ু মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্যে

দূরে চলে যেতে পারে না, পৃথিবীপৃষ্ঠে খালি ধাক্কা খায়। ফলে এখানে বায়ুর ঘনত্ব বেশি। আর অনেক উপরে ঐ বলের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম থাকায় সেখানে বায়ুর ঘনত্বও কম। মাধ্যাকর্ষণ বল অনেক কমে গেলে অর্থাৎ বায়ুকে ধরে রাখার মত যে বল দরকার তা থেকে কম হলে বায়ু আর পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকবে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল উপেক্ষা করে চলে যাবে। চন্দ্রে ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে। বায়ুকে ধরে রাখার মত বলের তুলনায় অনেক কম চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ বল। সুতরাং সৃষ্টির পরে সেখানে বায়ু সৃষ্টি হলেও বায়ু চন্দ্র ত্যাগ করে চলে গেছে। সেখানে এখন কৃত্রিম উপায়ে বায়ু প্রস্তুত করলেও বায়ু চন্দ্রে থাকবে না।

নবকুমার ভট্টাচার্য*

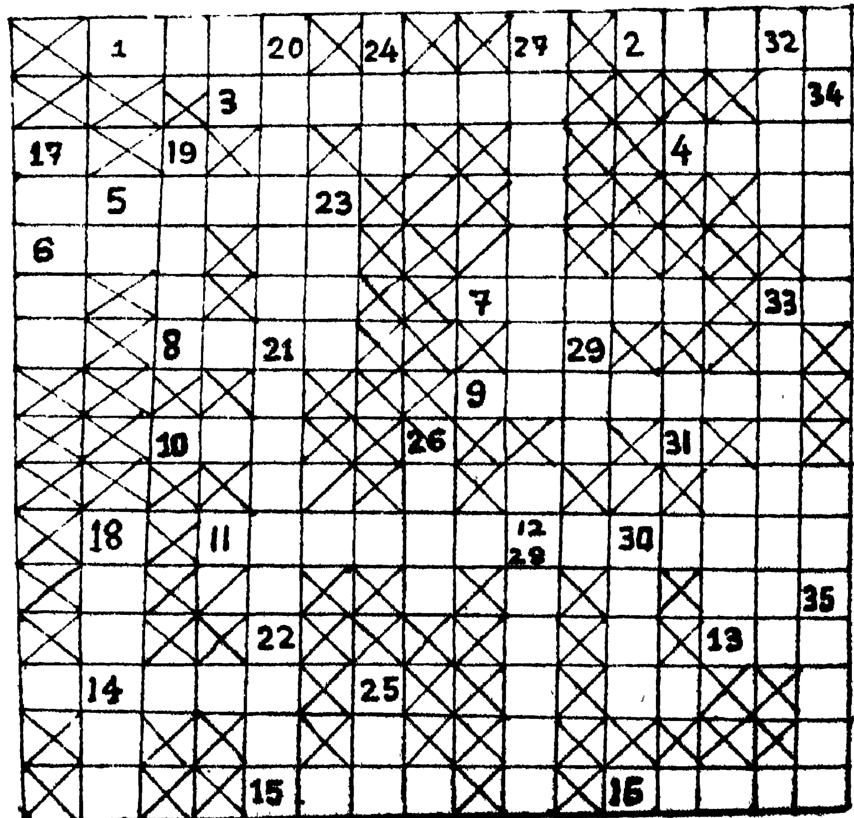
* বিজ্ঞান-বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা-700 009

শব্দ-কূট

নিচের যন্ত্রগুলির আবিষ্কারকদের নাম উপযুক্ত ঘরে বসিয়ে শব্দ-কূটটি সমাধান কর—

পাশাপাশি

1. দূরবীক্ষণ যন্ত্র,
2. মিলিটারি ট্যাঙ্ক,
3. টর্পেডো,
4. অণুবীক্ষণ যন্ত্র,
5. মোটর সাইকেল,
6. রেডিও,
7. বেলুন,
8. এক্স-রে,
9. লিনোটাইপ,
10. টেলিগ্রাফ,
11. ফাউনটেন পেন,
12. টেলিভিসান,
13. স্টেথোস্কোপ,
14. টেলিফোন,
15. স্টীমার,
16. রেল ইঞ্জিন



উপর-নিচে

17. ইক্‌মিক্‌ কুকার,
18. থার্মোমিটার,
19. সেলাইকল,
20. দিয়াশলাই,
21. বাষ্পীয় ইঞ্জিন.
22. পিস্তল.
23 হার্মোনিয়াম.
24. মেশিনগান,
25. এরোপ্লেন. (দুই ভাই)
26. ফটোগ্রাফ (কালার),
27. ছাপার হরফ,
28. ক্রেস্কোগ্রাফ,
29. ডিজেল এঞ্জিন.
30. সবচেয়ে বেশি যন্ত্রের আবিষ্কর্তা (সিনেমাসহ)
31. ডিনামাইট,
32. ব্যারোমিটার.
33. হেলিকপ্টার,
34. সাবমেরিন,
35. বাই-সাইকেল

	গ্যা	লি	লি	ও		সে			গু		গ্ল	ই	ন	ট	ন
			হো	য়া	ই	ট	হে	ড	টে					বাঁ	জ
ই		খি		কা		লিং			ন			ক্যা	ন	মে	ন
ন্দু	ডে	ম	লা	র	দ্য				বা					লি	হ
মা	র্ক	নি			বে				র্গ						ল্যা
ধ		য়			ই			মঁ	গ	ল	ফি	য়ে		মি	ড
ব		র	ন	জে	ল					ডি				কো	
				ম				মা	র	জে	ন	শ্রে	লা	র	
		মো	র	স			লি			ল		লো		স	
				ও			প					বে		কি	
	ফ্যা		ও	য়া	টা	র	ম্যা	ন	জ	ন	এ	ল	বে	য়া	ড
	রে			ট			ন		গ		ডি				ম্যা
	ন			কো					দী		স		লে	নে	ক্
গ্রা	হা	ম	বে	ল		বা			শ		ন				মি
	ই			ট		ই			চ						লা
	ট			ফু	ল	ট	ন		ন্দ্র		স্টি	ফে	ন	স	ন

তপনকুমার মাজি*

31/7, হর্ষবর্ধন রোড, দুর্গাপুর-1, বর্ধমান পিন-713204

‘পরীক্ষা কর’র উত্তর

1 (a), 2 (a), 3 (a), 4 (a), 5 (a), 6 (a), 7 (b), 8 (b), 9 (b), 10 (a), 11 (b), 12 (b), 13 (b), 14 (b), 15 (b), 16 (b), 17 (b), 18 (a), 19 (b), 20 (a).

মডেল তৈরি

তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র

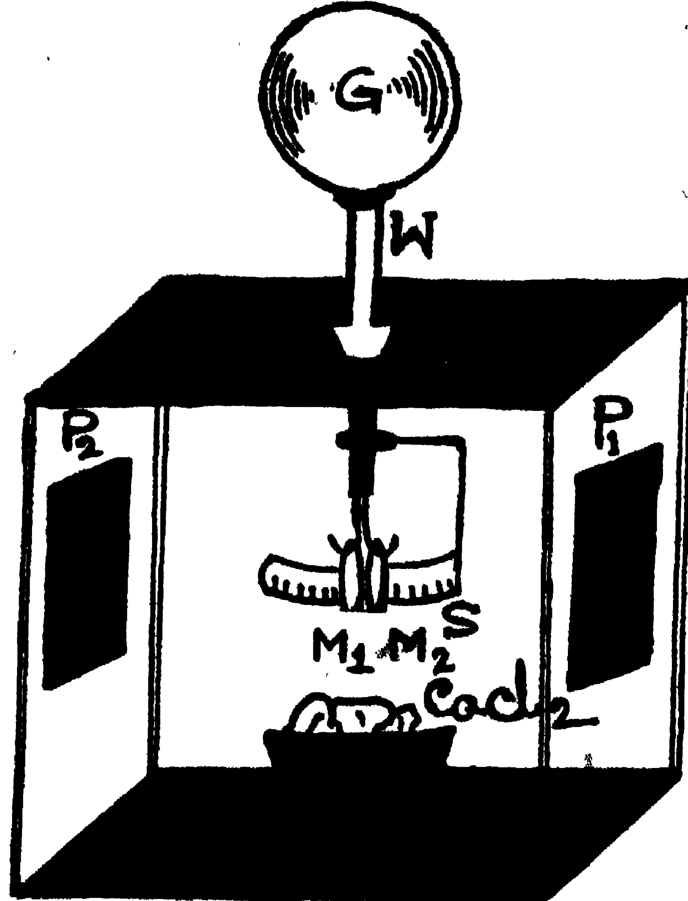
তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কোন স্থির তড়িতের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। এখানে খুব কম খরচে একটি তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করবার কথা বলা হয়েছে। এটি তৈরির জন্যে নিচের জিনিসগুলির প্রয়োজন ঃ

(i) 5″ × 3″ মাপের চারিটি স্বচ্ছ কাচের টুকরো,

(ii) ⅛″ মাপের 2″ লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের কোণ,

(iii) কিছুটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত,

(iv) 6″ লম্বা একটি তামার তার (16 S.W.G.),



তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র

(v) 1″ ব্যাসবিশিষ্ট একটি ধাতু গোলক,

(vi) একটি ছোট প্লাসটিকের বাটিতে কিছুটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) প্রায় 25 গ্রাম,

(vii) স্ক্রু, শোলা, কর্ক প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিস।

প্রথমে ঐ কাচের টুক্‌রো চারটি অ্যালুমিনিয়ামের কোণের সাহায্যে লাগিয়ে একটি বর্গাকৃতি কাচের বাক্স তৈরি করতে হবে। এখন ঐ বাক্সের উপরে এবং নিচের দিকে কাচের পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের পাত স্ক্রুর সাহায্যে আটকে নিতে হবে, এবং কাচের বাক্সের ভিতরের দিকের পরস্পর বিপরীত দেয়ালে দুটি অ্যালুমিনিয়ামের বর্গাকৃতি পাত (P_1P_2) আটকানো হয়। এরপর কাচের বাক্সের উপরের দিকের অ্যালুমিনিয়ামের ঠিক মধ্যে একটি ছিদ্র করে রবার কর্কের সাহায্যে ঐ তামার তারটি (W) ঢুকিয়ে দিতে হবে। তামার তারের এক প্রান্তে ধাতুগোলকটি (G) ঝালাই করে নিতে হবে এবং প্রান্তটিতে চিত্রানুযায়ী খুব পাতলা করে কাটা দুই টুক্‌রো শোলা (M_1M_2) রাখতে হবে। চিত্রানুযায়ী সুবিধা মত একটি শক্ত কাগজের স্কেল (S) রবার কর্কের সাহায্যে শোলার ঐ টুক্‌রো দুটির ঠিক পিছনে আটকানো হয়।

এখন বাক্সের মধ্যে একটি বাটিতে অনাদ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) রাখা হল এবং শোলার টুকরো ও তামার দণ্ড সমেত অ্যালুমিনিয়ামের টুক্‌রোটি কাচের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

কার্যপদ্ধতি

যখন কোন তড়িৎতাহিত বস্তুকে ঐ তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের ধাতুগোলকের সঙ্গে স্পর্শ করানো হয়, তখন ঐ তড়িৎ তামার রড্ দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে শোলার টুক্‌রোতে উপস্থিত হয়। এখানে দুটি শোলার টুক্‌রো একই রকম তড়িতে (ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক) আহিত হয়। এ অবস্থায় শোলার টুক্‌রো দুটি পরস্পর বিকর্ষণ করে। তার ফলে শোলার টুক্‌রো দুটি ফাঁক হয়ে যায় এবং তা কাচের দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের পাতে বিপরীত আধান উৎপন্ন করে। অ্যালুমিনিয়াম পাতে আবিষ্ট তড়িৎ শোলার টুক্‌রো দুটিকে আকর্ষণ করে, ফলে শোলার টুক্‌রোর বিক্ষেপ আরও বেড়ে যায় এবং যন্ত্রটি সুবেদী হয়। শোলার টুক্‌রো দুটি স্কেলের কত দাগ পর্যন্ত গিয়েছে, তা দেখে তড়িতের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। অবশ্য, জানা তড়িৎ দিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে আগে থেকে স্কেলটি চিহ্নিত করে নিতে হবে।

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে যন্ত্রটির ক্রিয়া বিঘ্নিত হবে। সেজন্যে কাচপাত্রের ভিতরে বাটিতে আর্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড রাখা হয়। অনাদ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং কাচপাত্র প্রায় শুষ্ক রাখে।

শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে বলে, শীতকালে যন্ত্রটি বেশি কার্যকরী হয়।

কল্যাণ দাস*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

রসায়ন-বিজ্ঞানের দুটি আবিষ্কার

রসায়ন-বিজ্ঞানীরা পৃথিবী বিখ্যাত দুটি সমস্যার সমাধান করেছিলেন। সেই সমস্যা দুটি বেশ মজার এবং এর সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত আছে। এই দুটি সমস্যার উৎপত্তি ও সমাধান সম্পর্কে এখানে আজ কিছু বলা হবে।

প্রথম সমস্যাটি হল নেপোলিয়নের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানকার্য এবং রহস্যোদ্ধারের জন্যে ওয়াসসেন (Wassen) নামক এক ভৌত-রসায়নবিদ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। দিগ্‌বিজয়ী বীর নেপোলিয়নের মৃত্যু রহস্যটি এখন আলোচনা করা হচ্ছে।

নেপোলিয়নের মৃত্যু হয় সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে, ৫ই মে, 1821 সালে। তাঁর মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছিল পাকস্থলীর ক্যানসার রোগ। এই কথা অনেকেই বিশ্বাস করতেন না কারণ নেপোলিয়ন মৃত্যুর কয়েক দিন আগে যা লিখে গেছিলেন, তার সারমর্ম হল—

"আমাকে ব্রিটিশ গুপ্তঘাতকরা হত্যা করছে, ক্রমে ক্রমে।" এই 'ক্রমে ক্রমে' কথাটির থেকে আভাষ পাওয়া যায় যে নেপোলিয়নের মৃত্যুর কারণ মন্থর বিষক্রিয়া। এই বিষ ছিল স্বাদহীন যাতে নেপোলিয়ন কিছু সন্দেহ করতে না পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আর্সাইন [AsH_3 (Arsine)] নামে রাসায়নিক যৌগটি (আর্সেনিক যৌগ) হল এমন একটি বিষাক্ত পদার্থ যা প্রায় স্বাদহীন, বর্ণহীন এবং খুবই বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ। এতে আবার একটু রসুনের গন্ধ রয়েছে সুতরাং এই যৌগ খাদ্যে অথবা পানীয়তে মিশিয়ে দিলে সহজে বোঝা যাবে না। অপর একটি পদার্থ লিউইসাইট [$C_2H_2AsCl_3$ (Lewisite)] একটি বিষাক্ত আর্সেনিক যেটিও হয়ত ব্যবহৃত হয়েছিল। আলোচনা এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে আন্দাজ করা যায় যে নেপোলিয়নের খাদ্যে অথবা তিনি যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরের বায়ুতে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু প্রমাণ কোথায়? কথা হয়েছিল নেপোলিয়নের কবর খুঁড়ে তাঁর দেহ তোলা হবে এবং অনুসন্ধান চালানো হবে। কিন্তু এর পিছনে ধর্মীয় নিষেধ থাকায় অন্য উপায় বের করা হল।

প্রায় 139 বছর পরে অনুসন্ধান কাজ আরম্ভ হল এক অদ্ভুত উপায়ে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরের কাছে নেপোলিয়নের দেহের কয়েকটা চুল চেয়ে পাঠালেন। চুল পাওয়া গেল, যেগুলি নেপোলিয়নের মাথা থেকে মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরে কেটে নেওয়া হয়েছিল।

আর্সেনিক মানুষের রক্তে মিশলে, তা ক্রমশ চুলে এবং লোমে জমতে থাকে। সুতরাং যদি যাদুঘর থেকে পাওয়া চুলের মধ্যে আর্সেনিক যৌগ পাওয়া যায় তবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে নেপোলিয়ন আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় নিহত হয়েছেন।

কিন্তু সেই চুলের মধ্যে আর্সেনিক পরমাণু যদি থেকে থাকে তবে তার পরিমাণ স্বভাবতঃই খুব সামান্য, সেইজন্যে অসুবিধা দেখা দিল, কি করে আর্সেনিকের উপস্থিতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

তখনকার দিনের সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি এমন কিছু একটা উন্নত ছিল না যা সঠিক 10^{-10}gm অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্রতম পরিমাণ পার্থক্যকে সনাক্ত করতে পারে।

এই সময়ে ওয়াস্‌সেন চমৎকার উপায়ে এই সমস্যাটির সমাধান করেন। ওয়াসসেন একটি পারমাণবিক চুল্লীর (অ্যাটমিক রিঅ্যাকটরের) মধ্যে চুলগুলিকে রাখলেন এবং কিছু বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে সত্যই নেপোলিয়নের চুলে আর্সেনিকের পরিমাণ সাধারণ মাত্রার চেয়ে প্রায় 13 গুণ বেশি রয়েছে। অতএব প্রমাণিত হল নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়েছিল আর্সেনিক বিষক্রিয়ায়।

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওয়াস্‌সেন এই সত্যকে তুলে ধরেছিলেন, সেই প্রক্রিয়ার নাম 'সক্রিয়করণ বিশ্লেষণ **(activation analysis)**। এই পদ্ধতিকে তিনি আর্সেনিক মৌলের আইসোটোপ অর্থাৎ $^{76}_{33}$As-এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ সম্ভবত গাইগার কাউণ্টার নামক যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করেন। নেপোলিয়নের চুলের মধ্যে যে সাধারণ আর্সেনিক ছিল সেটিকে $^{76}_{33}$As—এই আইসোটোপে রূপান্তরিত করতেই ওয়াসসেন পারমাণবিক চুল্লীর সাহায্য নিয়েছিলেন। পরে ঐ আর্সেনিক আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ থেকেই নেপোলিয়ানের চুলে কতটা আর্সেনিক ছিল তা জানা গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজনীয় যে, যদিও আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি খুবই উন্নত, তবুও মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিও অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ পদার্থের উপস্থিতি নির্ধারণে সক্ষম। জার্মান বিজ্ঞানী এমিলফিশারের মতে মানুষের নাক বিউটেন-থাওল [butanethiol (C_4H_9HS)] বলে একটি রাসায়নিক যৌগের 10^{-12} gm পরিমাণ যদি একটি সাধারণ আকারের ঘরে পড়ে থাকে, তার উপস্থিতি নির্ধারণ করতে পারে।

দ্বিতীয় সমস্যাটাও বেশ মজার। বহু দিন থেকেই বহুমূত্র (diabetic) রোগীদের চিনি অথবা শর্করাজাতীয় খাদ্য খাওয়া বারণ। আরও একটি সমস্যা স্থূলকায় অর্থাৎ মোটা লোকদের ও শর্করাজাতীয় বা চিনিজাতীয় খাদ্য খাওয়া বারণ, কারণ ওগুলিতে খাদ্যমূল্য (calorific-value) বেশি আছে।

এই সমস্যা দুটি সমাধান করতে হলে এমন একটা পদার্থ তৈরি করা যায় যেটি চিনির চেয়ে অথবা চিনির মত মিষ্টি, অথচ তাতে গ্লুকোজের (glucose) চিহ্নমাত্র থাকবে না এবং খাদ্যমূল্য তাতে খুব কম হওয়া চাই।

অবশেষে রাসায়নিকরা একটা খুব মিষ্টি—চিনির চেয়ে প্রায় 550 গুণ মিষ্টি—পদার্থ তৈরি করলেন যার নাম রাখা হল "স্যাকারিন" (saccharin), যেটির রাসায়নিক সূত্র হল—



$$C_6H_4COSO_2NH$$

পরে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা আরো দুটি মিষ্ট পদার্থের আবিষ্কার করেন যে দুটি হল—

সুকারাইল সোডিয়াম **(sucaryl sodium)** **($C_6H_{10}.NH.HSO_3.Na$)** এবং ক্যালসিয়াম সাইক্লামেট্ **(calcium cyclamate)**।

সাধারণত কোন পদার্থে অ্যালকোহলিক হাইড্রক্সিল মূলক **(alchoholic hydroxyl**

group) অর্থাৎ OH^- মূলক থাকলে তবেই সে পদার্থ মিষ্টি হয় কিন্তু আশ্চর্যের কথা উপরে বর্ণিত তিনটে পদার্থের কোনটিতেই OH^- মূলক নেই।

স্যাকারিনের আবিষ্কার খুব আকস্মিক যাকে ইংরেজিতে বলা হয় serendipity অর্থাৎ দৈববশত আবিষ্কার।

এক সময় এক স্নাতক ছাত্র, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভের জন্যে অধ্যাপক ইরা রেমসেনের (Ira Remsen) কাছে রাসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করছিলেন। একদিন সেই ছাত্রটি কয়েকটা পাত্রে পরীক্ষাগারে নির্মিত রাসায়নিক যৌগগুলি রেখে যান। রেমসেনের এক ভৃত্য ছিলেন যাঁর নাম উইলিয়াম স্টিউয়ার্ট। উইলিয়ামের ছিল সর্ববিষয়েই কৌতূহল। তিনি সাধারণত কোন সদ্যপ্রস্তুত রাসায়নিক পদার্থে আঙ্গুল ডোবাতেন এবং জিভে ঠেকিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করতেন। একদিন উইলিয়াম উত্তেজিত হয়ে অধ্যাপক রেমসেনকে বললেন যে তিনি একটি অবিশ্বাস্য রকমের মিষ্টি পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন একটা পাত্রের মধ্যে, তখন রেমসেন ঐ পদার্থটি পরীক্ষা করলেন এবং এর রাসায়নিক ধর্মগুলি আবিষ্কার করেন। এইভাবেই স্যাকারিনের আবিষ্কার সম্ভবপর হল।

চন্দ্রশেখর রায়*

*140, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কালকাতা-700 007

পরমাণুর গঠন

একথা সকলেরই জানা আছে যে হাইড্রোজেনের (protonium) পরমাণুর কেন্দ্রীন কেবলমাত্র ধনাত্মক-আধানযুক্ত (positive-charged) মৌল-কণা (fundamental particle) প্রোটন (proton) নিয়ে গঠিত। হাইড্রোজেনের (protonium) পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটিমাত্র প্রোটন থাকে। হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য যে কোন মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রীনে ধনাত্মক-আধানযুক্ত কণা প্রোটন ছাড়াও আধানহীন কণা নিউট্রন (neutron) বর্তমান থাকে। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য সব মৌলের কেন্দ্রীন নিউট্রন এবং প্রোটন-এর সমবায়ে গঠিত।

প্ল্যানেটরী মডেল অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে পরমাণুর দুটি অংশ—একটি 'কেন্দ্রীন' এবং অপরটি 'কক্ষপথ' বা 'ইলেকট্রন মহল'। যে কোন মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রীনে ধনাত্মক-আধানযুক্ত কণা প্রোটন এবং কক্ষপথে ঋণাত্মক-আধানযুক্ত কণা (negetive-charged) ইলেকট্রন (electron) সমসংখ্যায় [সেই সংখ্যাটিকেই ঐ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) বলা হয়] বর্তমান থাকে বলে সাধারণ অবস্থায় পরমাণু আধানহীন বা নিস্তড়িৎ থাকে। বিভিন্ন ভৌত উপায় অবলম্বন করে পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন সরানো যেতে পারে, যার ফলে আধানহীন

পরমাণু ধনাত্মক-আধানযুক্ত হয়। ইলেকট্রনের মত পরমাণুর প্রোটনসংখ্যার পরিবর্তন সাধারণ উপায়ে সম্ভব হয় না। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কেন্দ্রীনের প্রোটনসংখ্যা পরিবর্তন করে দেখা গেছে যে এর ফলে মৌলের মৌলিকত্ব নাশ হয় অর্থাৎ এক মৌলের পরমাণু অন্য মৌলের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। সোনার পারমাণবিক সংখ্যা 79 হওয়ায় সীসার কেন্দ্রীনের প্রোটনসংখ্যা 82 থেকে 79-তে কমাবার ফলে সীসা সোনায় পরিণত হয়।

ইলেকট্রন ওজনহীন হওয়ায় ইলেকট্রনের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির ফলে পরমাণু কেবলমাত্র ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধানসম্পন্ন হয় এবং প্রোটনের সংখ্যাপরিবর্তনের ফলে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তন তো হয়ই, উপরন্তু মৌলের মৌলিকত্ব নষ্ট হয়, কিন্তু আইসোটোপ আবিষ্কারের ফলে দেখা গেছে যে একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিউট্রন সংখ্যা বিভিন্ন হলেও পারমাণবিক ভর ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোন প্রকার পার্থক্য দেখা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে—হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ—প্রোটোনিয়াম (protonium), ডিউটেরিয়াম (deuterium) ও ট্রাইটিয়াম (tritium)—নিউট্রন সংখ্যা যথাক্রমে 0, 1 ও 2 হলেও এই তিন প্রকার হাইড্রোজেনের পরমাণুতে হাইড্রোজেনের মৌলিকত্ব পূর্ণভাবে বজায় থাকে, অর্থাৎ হাইড্রোজেনের এই তিনটি আইসোটোপের মধ্যে পারমাণবিক ভর ছাড়া অন্য কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না।

সম্প্রতি নিউট্রন সম্পর্কে আমেরিকার পদার্থ-বিজ্ঞানিগণ এক বিশেষ গবেষণায় রত আছেন। তাঁদের দৃঢ় ধারণা যে পরমাণুর নিউট্রন দুই-প্রকার কণার দ্বারা গঠিত—যেগুলির একটির আধান অন্যটির বিপরীত এবং এর ফলেই নিউট্রন আধানহীন হয়ে থাকে। হয়তো অতি অল্পকালের মধ্যেই এই তথ্য পৃথিবীর সব দেশের পদার্থ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা গৃহীত হবে।

দীপ্তিময় দত্ত*

*কাঁচড়াপাড়া টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ নেতাজী সুভাষ স্যানাটোরিয়াম, জিলা-নদীয়া

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 রিফ্রাক্‌টরিস কি ? এই শ্রেণীর পদার্থকে কত ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ? ফায়ার ব্রিকস্‌-এর রাসায়নিক উপাদান কি কি ?

সুবলচন্দ্র পাইন
রামরাজাতলা, হাওড়া

2. জলরঙের পুরনো ছবিতে অনেক সময় চোকলা উঠে আসতে দেখা যায়। এর কারণ কি ? জলরঙের ছবির রঙ ক্রমশ বদ্‌লে যায় কেন ?

কাজরী দাস
মুর্শিদাবাদ

3. জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি কবে প্রকাশিত হয় ? এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয়-বস্তুর উপর প্রবন্ধ লেখা রয়েছে সেগুলি কি কখনো কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ?

গৌতম চক্রবর্তী
কলিকাতা-700 024

উত্তর 1. যে সমস্ত পদার্থ উচ্চ তাপ এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করতে পারে সেগুলিকে রিফ্রাক্‌টরিস শ্রেণীর পদার্থ বলা হয়। উচ্চ তাপমাত্রা বলতে সাধারণত প্রায় $1000^{0}C$ বা তার বেশি ধরা হয়ে থাকে। তবে তাপমাত্রার সঙ্গে চাপের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। টেরাকোটা, টালি প্রভৃতি তৈরি করতে এবং সর্বোপরি ধাতুশিল্পে রিফ্রাক্‌টরিস ছাড়া চলা অসম্ভব। রিফ্রাক্‌টরিস-এর সাহায্যে উচ্চ তাপে বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব।

রিফ্রাক্‌টরিসকে (i) অম্ল (ii) ক্ষার ও (iii) নিরপেক্ষ—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

অম্লজাতীয় রিফ্রাক্‌টরিস অম্ল বা অম্লজাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে বা পরিবেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফায়ার ব্রিকস, সিলিমেনাইট প্রভৃতি পদার্থ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি প্রায় $1400^{0}C$ পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে। লৌহশিল্পে স্টীল তৈরিতে ফায়ার ব্রিকস-এর সাহায্যেই চুল্লী নির্মাণ করা হয়।

ক্ষারজাতীয় রিফ্রাক্‌টরিস ক্ষার বা ক্ষারজাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে বা পরিবেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ডলোমাইট, ম্যাগ্‌নেসাইট, ফসটেরাইট প্রভৃতি পদার্থ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত পদার্থে লোহা থাকে না তা তৈরি করতে এ জাতীয় রিফ্রাক্‌টরিস্‌ ব্যবহৃত হয়।

নিরপেক্ষ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রিফ্রাকটরিসগুলি হল গ্রাফাইট, জারকোনিয়াম ইত্যাদি পদার্থ। অম্ল এবং ক্ষার উভয়ের দ্বারাই এগুলি প্রভাবিত হয়।

ফায়ার ব্রিকস-এর রাসায়নিক উপাদান হল : SiO_2—50 থেকে 70 ভাগ, Al_2O_3—25

থেকে 35 ভাগ, TiO_2—1 থেকে 2 ভাগ, Fe_2O_3—2 থেকে 6 ভাগ। এছাড়াও অল্প মাত্রায় থাকে CaO, MgO প্রভৃতি উপাদান।

কি কি উপাদান কি পরিমাণে আছে এবং সেগুলির বিশুদ্ধতাই রিফ্রাকটরিসজাতীয় পদার্থের গুণাগুণ ও উচ্চ তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

2. জলরঙের ছবিতে যে চোকলা উঠে আসে তাকে ইংরেজিতে ফ্লেকিং বলে। জলরঙের ছবি আঁকবার সময় রঙ দিয়ে প্রলেপ খুব বেশি পুরু করলে পরবর্তীকালে এই চোক্‌লা উঠে আসে। রঙে আঠা বা আঠাজাতীয় পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণ থাকা দরকার। আঠার পরিমাণ কম হলে কিংবা যদি রঙের একাধিক প্রলেপ ছবিতে দিতে হয়—সেখানে তাড়াতাড়ি চোক্‌লা উঠে আসে। এর জন্যে দায়ী জলীয় বাষ্প।

বাতাস থেকে প্রতিনিয়তই ছবির কাগজ জল শোষণ করে আবার ছেড়ে দেয়। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর এই জলীয় বাষ্প ছাড়া বা শোষণ করা নির্ভর করে। বাষ্প শোষণের পর কাগজের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং যখন কাগজ তাপ পরিত্যাগ করে, তখন কাগজের আয়তন সংকুচিত হয়। এই সংকোচন-প্রসারণ ছবিতে রঙ পুরনো অবস্থায় সহ্য করতে পারে না। তখনই রঙের চোকলা উঠে আসে। যখন ছবি তৈরি হয়, তখন ছবির রঙ জলীয় বাষ্পের ঐ প্রভাব সহ্য করতে পারে; তাই নতুন ছবিতে চোক্‌লা উঠে আসে না। ছবির স্থান বদল করলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার জলীয় বাষ্পের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি আগের স্থানের তুলনায় আলাদা হলে তার প্রভাবও ছবিতে গিয়ে পড়ে। সেজন্যে কখন কখন দেখা যায়, ছবি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলে ভাল থাকে; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা আগের তুলনায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ছবিতে ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে। তখন আরও তাড়াতাড়ি ছবি নষ্ট হয়ে যায়।

এ থেকে রক্ষা পেতে গেলে ছবিকে ভাল করে কাঠ ও কাচের ফ্রেমে বাঁধাই করা আবশ্যক। জলীয় বাষ্পের প্রভাব থেকে ছবিকে রক্ষা করবার জন্যে জল-নিরোধক কাগজ বা প্লাষ্টিক কাগজ দিয়ে ছবিকে ভাল করে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখবার ব্যবস্থা থাকলে ছবি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না।

বাতাসে নানারকম গ্যাসের সঙ্গে কার্বন, ধাতু-কণা, লবণ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। শিল্পাঞ্চলের বাতাসে এগুলি ছাড়াও থাকে ক্লোরিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার, সালফার-ডাই-অক্‌সাইড ইত্যাদি। জল রঙের ছবির রঙের সঙ্গে এই পদার্থের স্বতঃই বিক্রিয়া ঘটে থাকে। বিক্রিয়ার প্রকৃতি এবং হার অনুযায়ী ছবির রঙ বদ্‌লে যায়।

মাঝে মাঝে হাইড্রোজেন পার-অক্‌সাইড, খুব লঘু অক্সালিক অ্যাসিড, কার্বন টেট্রাক্লো-রাইড, এমনকি অনেক পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে পুরনো ছবির রঙ খানিকটা আগের মত করে নেওয়া যায়।

3. বাংলা 1328 সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গ্রন্থ 'অব্যক্ত' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর উপর তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন। এর কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য, দাসী, মুকুল, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

>

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পরিষদের খবর

বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা

পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে গত 23শে এপ্রিল সন্ধ্যা 6টার সময় শ্রীজগৎবন্ধু ভট্টাচার্য 'চলমান মহাদেশ' শীর্ষক বিষয়বস্তুর উপরে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদান করেন। খুবই প্রাঞ্জলভাবে তিনি এ-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপিত করেন। শ্রোতাদের মধ্যে বক্তৃতাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। বক্তৃতার শেষে পরিষদের আজীবন সদস্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় বক্তাকে এবং উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভ্রম সংশোধন—এপ্রিল '78 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 174 পৃষ্ঠায় "ক্ষুধা ও আহারের মাত্রা" শীর্ষক প্রবন্ধে বামস্তম্ভের 8 লাইনের শেষাংশে 'কারও' শব্দটির পূর্বে "কারও পক্ষে এক সের চালের ভাত পরিমিত আহার আবার" এবং ডান স্তম্ভের 5 লাইনের 'ক্রিয়াকলাপ' শব্দটির পূর্বে "স্বাভাবিক" শব্দটি এবং 18 লাইনে 'নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভের' পর এবং 'উপর ও সুস্থতা' ইত্যাদি শব্দের পূর্বে "সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিভাবে বা রীতি অনুসারে আহার করতে হয়, তার" পড়তে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকুট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। কার্যকরী সম্পাদকের নামে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয়ে (পি 23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) হাতে বা ডাকযোগে প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতিমাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'প্যাকেট সার্টিং সার্ভিস'-এর মাধ্যমে পাঠানো হয় ; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.

2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**

3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ-বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

6 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 6, জুন, 1978

প্রধান উপদেষ্টা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কার্যকরী সম্পাদক
শ্রীরতনমোহন খাঁ

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়

সহায়তায়
পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সুচী

বিষয়-সূচী





Gram : 'Multizyme' Calcutta | Dial : 55-4583

BILIGEN

(Because of its most efficient Galenical colagogue contents)

Remvoes all Liver Trouble
Removes Constipation
Increases Appetite

Assures Normal Flow of Bile
Rectifies Bowel Troubles
Re-establishes the Lost
Physiological Functions of Liver

Standard Pharma Remedies

445, Rabindra Sarani
Calcutta-700005

A RESPECTABLE HOUSE FOR YOUR REQUIREMENTS IN

All sorts of

LAMP BLOWN GLASS APPARATUS

for Schools, Colleges & Research Institutions

ASSOCIATED SCIENTIFIC CORPORATION

232, UPPER CIRCULAR ROAD
CALCUTTA—4

Phone :
Factory : 55-1588
Residence: 55-2001

Gram—ASCINCORP

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ | জুন, 1978 | ষষ্ঠ সংখ্যা

টিস্যু-কাল্‌চার

সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়*

কৃত্রিম খাদ্য-মাধ্যমে একটি কোষ থেকে পরিপূর্ণ কলাতন্ত্রের উদ্ভব-পদ্ধতিকে টিস্যু-কাল্‌চার বলে। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদকোষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে কলার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে এটা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে, এই টিস্যু-কাল্‌চার পদ্ধতিতে প্রাণীদেহের শ্বেতকণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে এবং কখনও কখনও পত্র থেকেও (যথা—পাথরকুচি) কাক্ষিক বা পত্র-মুকুল বের হয়। পরে এই মুকুল থেকেই জন্ম নেয় নতুন নতুন অপত্য উদ্ভিদ। এইভাবে অযৌন জনন পদ্ধতিতে উদ্ভিদ তার জীবন-চক্র সম্পন্ন করে। প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের মুকুলের উদ্ভব দেখা যায় না (কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী ছাড়া)। কারণ প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবর্তন সুনির্দিষ্ট।

উদ্ভিদ জগতের এই বিচিত্র জীবন-চক্র লক্ষ্য করেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হ্যাবারল্যানডট্ (1902) প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে একটি সজীব উদ্ভিদ-কোষ থেকে কোন পুষ্টিকারক বা বৃদ্ধিকারক খাদ্য-মাধ্যমের (**growth medium**) সাহায্যে একটি

---

*জকপুর, ঘটোকপোড়া, চন্দননগর, হুগলী

পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ গঠন করা সম্ভব হতে পারে। তাঁর এই চিন্তাধারাই জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল, যা অনেক প্রচেষ্টার পর আজকের দিনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কৃত্রিম খাদ্য-মাধ্যমে একটি কোষ থেকে পরিপূর্ণ কলাতন্ত্রের উদ্ভবের এই ঘটনাকেই বর্তমানে টিস্থ-কাল্‌চার (tissue culture) নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানী হ্যাবারল্যানডট্‌-এর পর 1939 খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হোয়াইট এবং গথ্‌রেট—এই টিস্থ-কাল্‌চার সম্বন্ধে আরো অনেক কাজ করেন। তাঁরাই প্রথম গাজরের মজ্জা (pith) থেকে কোষ নিয়ে শর্করা (carbohydrate), ভিটামিন এবং অজৈব লবণ (inorganic salt) দিয়ে তৈরী কৃত্রিম খাদ্য-মাধ্যমের সাহায্যে এদের বৃদ্ধি ঘটান। হ্যাবারল্যানডট্‌-এর চিন্তাধারা সেই প্রথম বাস্তবে রূপায়িত হয়। এইভাবে কোষ থেকে ঐ মাধ্যম-এর মধ্যে যে কলা (rissue)-র উদ্ভব ঘটে, তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ক্যালাস (callus)। ভবিষ্যতে এই ক্যালাসের প্রত্যেকটি কোষ এক একটি মৌলিক কোষের মত আচরণ করে। কালক্রমে এক একটি মৌলিক কোষ হৃদ্‌যন্ত্রের আকৃতিবিশিষ্ট ভ্রূণে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ভ্রূণটিকে মাটিতে স্থানান্তরিত করা হলে সেখানেই সেটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়।

যদিও হোয়াইট এবং গথ্‌রেট এই দু-জন বিজ্ঞানী এই টিস্থ-কাল্‌চারের পথপ্রদর্শক, তবুও এই বিংশ শতাব্দীতে তাঁদের উত্তরসূরী—মহেশ্বরী, স্কুগ, নিস্‌, স্টিউয়ারট, মিলার এবং আরও অনেকের কথা অবশ্যই অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করা হবে। এঁরাই বলেছিলেন যে কৃত্রিম বৃদ্ধি মাধ্যমে যদি নারকেলের দুধ (cocoanutmilk) মেশানো যায় তাহলে কোষ-বিভাজন এবং কলার বৃদ্ধি দুই দ্রুত হয়।

যে মাধ্যমে কোষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে টিস্থ-কল্‌চার করা হয় তার একটা গঠন-উপাদান বর্ণনা করা হল। মোট দু-ভাগে এই মাধ্যমকে ভাগ করা হয়:—

(ক)	কাইনেটিন (হরমোন)	— 2 মিলিগ্রাম / লিটার
	ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (I. A. A.)— (অক্সিন নামক হরমোন)	ঐ
(খ)	এল (L)—টাইরোসিন (অ্যামিনো অ্যাসিড)	— 100 মিলিগ্রাম / লিটার
	অ্যাডেনিন সালফেট	— 160 মিলিগ্রাম / লিটার
	সোডিয়াম অর্থ ফসফেট	— 340 মিলিগ্রাম / লিটার

— এছাড়া জল এবং অ্যাগার* (agar) পাউডার।

প্রথম (অর্থাৎ 'ক') মাধ্যমটির কাজ হল কোষ থেকে ক্যালাস—প্রস্তুত করা এবং দ্বিতীয় (অর্থাৎ 'খ') মাধ্যমের কাজ হল ভ্রূণমূল ও মুকুলের ঘটানো।

কেমন করে পরীক্ষাগারে কোষ থেকে টিস্থ-কাল্‌চার করা হয় সেই প্রসঙ্গে এবার দু-চার কথা বলা যাক। প্রথমে 'ক' মাধ্যমকে অনেকগুলি 250 মিলিলিটার ফ্লাস্কে (আরলেনমিয়ার ফ্লাস্ক) নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাগ করে দেওয়া হয়। তারপর বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা অধিক চাপ ও তাপ প্রয়োগে (অটোক্লেভ নামক যন্ত্রের সাহায্যে) ঐ মাধ্যমকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এর পর ঐ ফ্লাস্কগুলি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে

*অ্যাগার (agar)—জেলিডিয়াম নামক একপ্রকার শৈবাল (algae) থেকে তৈরী। 'বৃদ্ধি-মাধ্যমকে' জমাতে (solidify) প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষণীয় উদ্ভিদের কাণ্ডের মজ্জা বা কোন অগ্রস্থ ভাজক কলার (epical meristematic tissue) অংশ থেকে খুব সাবধানে খানিকটা অংশ নিয়ে একটি ফ্লাস্কের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়। এই কাজ করার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যথা, বাইরে থেকে যাতে জীবাণু ঢুকতে না পারে সেজন্যে জীবাণু-নাশক ওষুধ ছড়িয়ে 'কাল্চার-রুম'-এর ভিতর কাজ করা হয়। কাজ করার কিছুক্ষণ আগে থেকে ঐ ঘরে অতিবেগুনি (ultra-violet) আলো জ্বেলে রেখেও ঘরকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। কাজের সময় ঐ আলো নিভিয়ে ফেলা হয় কারণ 'আল্ট্রা' রশ্মি আমাদের শরীরে ক্ষতি করে। এর পর ফ্লাস্কটিকে 27°C তাপমাত্রায় অন্ধকার ঘরে রাখা হয়। 4, 8, 12 ও 16 দিন অন্তর ঐ পরীক্ষণীয় কলার অংশটিকে একটি থেকে আর একটি ফ্লাস্কে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। ধীরে ধীরে কোষ কলায় রূপান্তরিত হয়; সৃষ্টি হয় ক্যালাস।

এর পর ঐ ক্যালাস টিস্যুকে দ্বিতীয় ('খ') মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয় (এক্ষেত্রেও মাধ্যমটিকে অনেকগুলি ফ্লাস্কে ভাগ করে নেওয়া হয়)। এই অবস্থায় ক্যালাসের প্রত্যেকটি কোষ ভ্রূণের মত আচরণ করে। ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটে ভ্রূণ-মুকুলের। দেখা দেয় মূল ও পাতা। এই অবস্থায় ভ্রূণগুলিকে মাটির সংস্পর্শে আনা হয়। ক্রমান্বয়ে ঐ ভ্রূণ রূপান্তরিত হয় পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে। এইভাবে 'টিস্যু-কাল্চারের' কাজ সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষায় উদ্ভূত ক্যালাস টিস্যুর সঙ্গে পরীক্ষণীয় উদ্ভিদের কলাস্থ কোষের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় কিনা—তা জানার জন্যে প্রথমে ক্যালাস টিস্যুটিকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করা হয় (এক মিলিমিটার পুরু)। পরে এই খণ্ডগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব 4% (চার শতাংশ) মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন যুক্ত আইসোপেপটোনে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং এর মধ্যে তরল নাইট্রোজেন যুক্ত করে ঠাণ্ডা রাখা হয়। এই অবস্থায় ঐ ক্যালাস খণ্ডগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব আল্ট্রা লো-টেম্পারেচার ফ্রিজার'-এ (−38°) স্থানান্তরিত করা হয়। এর পর ক্যালাস খণ্ডগুলিকে পরিস্রুত (filtered) প্যারাফিন-এ ডুবিয়ে ব্লক তৈরি করা হয় এবং 20μ (μ = মাইক্রন, অর্থাৎ এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগ।) স্থূলতায় মাইক্রোটোম নামক যন্ত্রে ছেদ করা হয়। পরে ঐ ছেদিত খণ্ডগুলিকে প্যারাফিনমুক্ত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ক্যালাস কলার কোষের ক্রোমজোম সংখ্যা পরীক্ষণীয় কাণ্ডস্থ কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা অপেক্ষা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অধিক হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একে পলিপ্লয়ডি (poliploidy) বলা হয়।

এছাড়াও, কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভূত ক্যালাস-কলার অভ্যন্তরে যে জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন (bio-chemical change) ঘটে, তাও রসায়নাগারে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তামাক গাছের কোষ থেকে টিস্যু-কাল্চারের সময় লক্ষ্য করা হয়েছে যে, কোষে অক্সিন (I.A.A) নামক হরমোনের পরিমাণ যখন কমে যায় এবং সাইটোকাইনিনের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় তখনই ক্যালাস থেকে কাণ্ড উদ্ভূত হয়। আবার যদি ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটে অর্থাৎ সাইটোকাইনিনের পরিমাণ কমে যায় এবং অক্সিনের অনুপাত বেড়ে যায় তখন মূলের উদ্ভব ঘটে।

স্টিউয়ারট এবং মিয়ারস আরও লক্ষ্য করেছেন যে 'মাধ্যমে'র মধ্যস্থ টাইরোসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড কোষকে ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড অক্সিডেস নামক একপ্রকার উৎসেচক সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এই উৎসেচকই অক্সিন অপেক্ষা সাইটোকাইনিন-এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বর্তমানে এই টিস্যু কাল্চারের কাজ আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। দুটি পৃথক পৃথক উদ্ভিদ-কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমকে কোষ থেকে মুক্ত করে তার পর তাদের মিলন ঘটিয়ে তা থেকে

ক্যালাস টিস্যুর উদ্ভব ঘটানোর প্রচেষ্টাও এখন সফল হয়েছে। এই ধরণের কাজে কয়েকটি বিশেষ ধরণের উৎসেচক মাধ্যম ব্যবহার করে প্রথম পরীক্ষণীয় কোষের কোষ-প্রাচীরটি নষ্ট করে ফেলা হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় লাইসিস (lysis)। ফলে শুধুমাত্র প্রোটোপ্লাজ্‌ম পড়ে থাকে। এই অবস্থায় কৃত্রিম মাধ্যমে দুটি ভিন্নধর্মী প্রোটোপ্লাজ্‌মের মিলন ঘটে। সৃষ্টি হয় উদ্ভিদের কিছু নতুন প্রজাতি।

কৃত্রিম উপায়ে কোষ থেকে কলার বৃদ্ধি ঘটিয়ে নানান দিক থেকে উপকার পাওয়া গেছে। এর ফলেই কোষের অভ্যন্তরস্থ নানান জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির কোষস্থ খোলা প্রোটোপ্লাষ্ট (naked protoplast)-এর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে সংকরায়ণ পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কাজকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা গেছে।

পরিশেষে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে প্রাণীদের ক্ষেত্রেও কি এটা সম্ভব হয়েছে?—না, প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় নি। কারণ উদ্ভিদ-কোষে ক্লোরোফিল (chlorophyll—একটি জৈব রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ) থাকায় কোষ নিজেই সূর্যালোক ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু প্রাণীরা (ইউগ্লিনা) তা পারে না। খাদ্যের জন্যে তাদের রক্ত সংবহনের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রাণীকোষের সমস্ত কিছুই একটা আভ্যন্তরীণ পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে প্রাণীকোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর উদ্ভব ঘটানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু এই টিস্যু-কাল্‌চার পদ্ধতিতে প্রাণীদেহের রক্তস্থ শ্বেতকণিকার (W.B.C.) সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে আশা জাগে যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা একটি প্রাণীকোষ থেকে এই টিস্যু-কাল্‌চার পদ্ধতিতে উদ্ভিদের মতই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকুট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। কার্যকরী সম্পাদকের নামে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয়ে (পি 23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) হাতে বা ডাকযোগে প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*

ভারতে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস অতিপ্রাচীন। সেই ইতিহাসে চিকিৎসা-বিদ্যার আসনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রে যেমন ভেষজবিদ্যা, শল্যবিদ্যা, শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা বহু উন্নতি লাভ করেছিল ; আরবদেশীয়দের মধ্য দিয়ে গ্রীস ও রোমের মারফৎ সেই সব উন্নতির অনেক অংশ মধ্য ইউরোপে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বস্তুত ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রদূতরূপে গণ্য হওয়া উচিৎ— কোন কোন ঐতিহাসিকের এই অভিমত।

প্রাচীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে চিকিৎসাবিদ্যা একটি উল্লেখযোগ্য আসন দখল করে আছে। তখনকার চিকিৎসাবিদ্যা বললে প্রধানতঃ আয়ুর্বেদকেই বোঝায়। আয়ুর্বেদের সময় এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে চিকিৎসাবিদ্যার জন্ম আয়ুর্বেদেরও বহু পূর্বে। অথর্ব-সংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভেষজ (medicine), শল্য (surgery) ও স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয় তাঁর **'Hindu Achievements in Exact Science'** গ্রন্থে বলেছেন—**"Hindu medicine has influenced the medical systems of other peoples of the world. The work of Indian Physicians and Pharmacologists was known in the ancient Greece and Rome. The materia medica of the Hindus has influenced medieval European Practice also through the Saracens. (PP-50)."** (হিন্দুদের চিকিৎসাবিদ্যা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির চিকিৎসাবিদ্যাকে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ ভারতীয় চিকিৎসক ও ভেষজবিদদের কাজের কথা জানতেন। হিন্দুভেষজ বিজ্ঞান আরবদের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।)

তিনি আরও বলেছেন—**"From the stand-point of Comparative Chronology' Hindu medicine has been ahead of the European and has been of service in its growth and development. (PP-48)"** (তুলনামূলক কালবিচারে হিন্দুভেষজবিদ্যা ইউরোপীয় ভেষজবিদ্যার থেকে এগিয়েছিল এবং তার বৃদ্ধি ও উন্নতির মূলে সাহায্য করেছিল।) সুতরাং প্রাচীন গ্রীক বৈদ্যগণের বহু পূর্বে বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে যে ভেষজ ও শল্যবিদ্যার স্বাধীন চর্চা ও গবেষণা হত এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে রোগকে ঈশ্বরের শাস্তি বলে মনে করা হত ; এবং রোগ

---

*অলিগঞ্জ (চতুষ্পাঠী), পোঃ+জেলা-মেদিনীপুর

নিরাময়ের জন্যে ধর্মযাজকদেরই ডাকা হত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তি তখনও ইউরোপে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্যগণই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন। হিপোক্রেটিশ (Hippocrates, 450 B.C.) প্রাচীন গ্রীসে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। কিন্তু হর্নেলের (Hornel) মতে প্রাচীন ভারতে ভেষজ ও শল্যবিদ্যার চর্চা 500 খৃষ্টপূর্বাব্দেরও আগেকার। হিপোক্রেটিশ (450 B.C) থিওফ্র্যাস্টাস (350 B. C.), ডিওস্‌কোরিড (100 A.D.), প্রমুখ গ্রীক চিকিৎসকগণও হিন্দু ভেষজবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং বিভিন্ন গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি করতেন।

প্রায় 2500 বছর আগেকার 'ত্রিপিটক' নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসংগ্রহে আয়ুর্বেদের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধের সমসাময়িককালে জীবক নামে একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যের নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পালিবিনয়পিটকে ও মূলসর্বাস্তিবাদবিনয়পিটকের অন্তর্গত চীবরবস্তুখণ্ডে তার চিকিৎসা প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন তক্ষশীলা নগরীতে প্রসিদ্ধ বৈদ্য আত্রেয়ের নিকট তিনি বৈদ্যকশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

প্রাচীন হিন্দু বৈদ্যগণের মধ্যে আত্রেয়, ক্ষরপাণি জাতুকর্ণ, পরাশর, ভেদ, হারীত, ধন্বন্তরি, সুশ্রুত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। চরক সোনা, রূপা, তামা, সীসা, টিন ও লোহা—এই ছয়টি ধাতু থেকে ওষুধ তৈরি করতেন। চরক ও সুশ্রুত মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়—এই ছয়টি রসের বিষয় জানতেন। হিন্দু ভিষক্‌গণই সর্বপ্রথম পারদ শরীরের অভ্যন্তরে ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করেন। সুশ্রুত-চরকের আমলে প্রায় সাত-শ' গাছগাছড়া থেকে ওষুধ সংগ্রহ করা হত। দুষ্প্রাপ্য ওষুধ সংগ্রহের জন্যে আরবদেশের লোকেরা বারবার ভারতে এসেছে, এমন কি সুযোগ্য ভিষক্‌কে তাদের দেশে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে ভেষজবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—"ভারতীয় আয়ুর্বেদ যে প্রাচীনযুগে সর্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করেছিল এবং আরবজাতি যে এদেশ থেকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করে ইউরোপে ছড়িয়েছিল তাতে বিস্মিত হবার কারণ নাই।"

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' ও 'সুশ্রুত সংহিতা' যথাক্রমে ভেষজবিদ্ চরক ও শল্যবিদ্ সুশ্রুতের অমর কীর্তি। চরক ও সুশ্রুতের কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। শ্রীবিনয়কুমার সরকারের মতে—"Two greatmen in Hindu medicine are Charak (C. sixth to fourth century B. C.), the physician and Sushruta (early Christan era), the surgeon" [হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যায় দু-জন মহাপুরুষ হলেন চরক (আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দী, খৃঃ পূঃ) নামে ভেষজবিদ্ এবং সুশ্রুত (খৃষ্টযুগের প্রথম দিকে) নামে শল্যবিদ।] 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা' গ্রন্থে ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন —"মূল চরক সংহিতা কবে রচিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ; সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা অনেকটা বর্তমান আকার ধারণ করে, পরে নবম শতাব্দীতে দৃঢ়বল এর সঙ্গে অনেক অংশ যোজনা করেন। সুশ্রুত সম্ভবত খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর 'History of Hindu Chemestry' গ্রন্থে বুদ্ধের জন্মের আগে চরকের সময় নির্দেশ করেছেন। কৃষ্ণচৈতন্য তাঁর 'A New History of Sanskrit Literature' গ্রন্থে বলেছেন—"There was a succession of brilliant men in this field, the most important among them being Sushruta who lived in the fifth century before Christ, Charaka of the second century after Christ, Vagbhata of the seventh century and Bhava Misra of the sixteenth century. (PP-16)" (অর্থাৎ

এই চিকিৎসাক্ষেত্রে পরপর বহু উজ্জ্বল প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর সুশ্রুত, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর চরক, সপ্তম শতাব্দীর বাগভট এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ভাবমিশ্র।)

সুশ্রুতের রচনায় অনেক রকম অস্ত্রোপচারের কথা জানা যায়। মোট যন্ত্রসংখ্যা ছিল এক-শ' এক। তা দিয়ে চোখের ছানি কাটা হত, হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করা হত, আবার দরকারমত অঙ্গচ্ছেদ ও স্থানচ্যুত অস্থির পুনঃসংস্থাপন করা হত। আধুনিক কালের প্লাষ্টিক সার্জারী (plastic surgery) তখনকার দিনে অজানা ছিল না। সেকালে সংজ্ঞানাশক (anaesthetic) হিসাবে ব্যবহার ছিল ভেষজ মিশানো মদের। শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান ও বিকৃত শারীর বা প্যাথোলজিতে সুশ্রুতের ছিল অসাধারণ দক্ষতা। শবব্যবচ্ছেদে সুশ্রুতের অবঘর্ষণ প্রণালীকে বর্তমানে নতুন করে ভেবে দেখা হচ্ছে। সুশ্রুত সংহিতায় বর্ণিত এই প্রণালীতে বলা আছে - প্রথমে, উপযুক্ত বয়সের সর্বঅঙ্গবিশিষ্ট নীরোগ মৃতদেহ থেকে মল মূত্র অন্ত্রাদি বের করে ফেলে দিতে হবে। এইভাবে পরিশোষিত মৃতদেহ শণ ইত্যাদি লতাগুল্ম দিয়ে বেঁধে স্থির জলাশয়ের মধ্যে স্থাপিত মাচার উপর ভালভাবে বেঁধে রাখতে হবে। সাত দিন এইভাবে রাখার পর পচন সম্পূর্ণ হলে, উক্ত মৃতদেহ জল থেকে তুলে আনতে হবে। বেনার মূল, চুল, বাঁশের চাঁচনি বা কুচি দিয়ে ঘষতে হবে। শবটি জলে থেকে যথেষ্ট স্ফীত হওয়ায় গাত্রত্বক থেকে সুরু করে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একের পর এক প্রকাশ পাবে ও স্পষ্ট হয়ে নজরে আসবে।

প্রাচীন হিন্দু বৈদ্যগণ মানব শরীরের 500 মাংসপেশী, এবং 32টি দাঁত ও 20টি নখসহ 300 অস্থির কথা জানতেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণ তন্ত্রের আলাদা আলাদা ভাগ ছিল। ইউরোপে 1628 খৃষ্টাব্দে হার্ভে সবপ্রথম রক্তসংবহন তথ্যের আবিষ্কার করেন। কিন্তু এর হাজার বছর পূবে চরক এই তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দু বৈদ্যগণ বিপাকক্রিয়া, সংবহন, স্নায়ুর ক্রিয়া, ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং বংশগতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তন্ত্র এবং শিবসংহিতায় স্নায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ষষ্ঠদেশ শতাব্দীতে ভারতে গোবীজের টীকা দেওয়ার কথাও জানা ছিল।

বর্তমানে আয়ুর্বেদকে বিজ্ঞানের অঙ্গ বলে স্বীকার করে বহু স্থানে আয়ুর্বেদের পঠন-পাঠন ও গবেষণা শুরু হয়েছে। ভারতবাসীর পক্ষে তা যথেষ্ট গৌরবের বিষয়।

লেখক ও প্রকাশকদিগের প্রতি নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' নিয়মিত বিজ্ঞান পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনা প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান পুস্তক লেখক ও প্রকাশকদিগকে দুই কপি পুস্তক পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নক্ষত্রের কথা

সোমনাথ কুণ্ডু*

নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের কৌতূহল অসীম। এখানে নক্ষত্র সম্বন্ধেই মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে।

মেঘমুক্ত রাতের আকাশে তাকালে যে হাজার-খানেক তারা বা নক্ষত্র দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকটাই সূর্যের মতই সুবৃহৎ অগ্নিগোলক। তারাগুলি নিতান্ত সুদূর জগতের বাসিন্দা বলে মনে হয় অতি ছোট। একটা সাধারণ উপমা দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। যদি সূর্যের আয়তন হত একটা কাচের গুলির সমান তবে পৃথিবী হত একটা বালির কণা সূর্য থেকে এক মিটার মত দূরে; অন্যান্য গ্রহগুলি থাকতো 30 মিটারের মধ্যেই। আর সবচেয়ে কাছের তারাটা থাকতো সূর্য থেকে প্রায় 240 কিলোমিটার দূরে।

এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে অগণিত তারা। তাদের মাত্র ছয় হাজার খালি চোখে দেখা যায়—তবে শহর অঞ্চলে দেখা যায় আরও কম, কারণ শহরের উজ্জ্বল কৃত্রিম আলোয় অনেক অনুজ্জ্বল তারাই অস্পষ্ট হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তারারা থাকে ঝাঁক বেঁধে। এক একটা ঝাঁকেই থাকে প্রায় 50000 তারা। এই রকম প্রচুর ঝাঁক, কোটি কোটি তারা ও বৃহৎ গ্যাস ও ধূলিকণার পুঞ্জ নিয়ে তৈরি হয় এক একটা নীহারিকা বা তারাজগৎ বা গ্যালাক্সি (galaxy)। সূর্য ছায়াপথ নামে ঐ রকম এক নীহারিকার বাসিন্দা। ছায়াপথে আছে 10000 কোটির উপর তারা এবং প্রচুর গ্যাস ও ধূলিকণার পুঞ্জ। ছায়াপথের চেহারাটা অনেকটা চ্যাপ্টা পিরিচের মত যার মাঝখানটা একটু ফোলা; কিন্তু পিরিচটার চেহারা এতই বিশাল যে এক ধার থেকে আর একধারে আলো পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় এক লক্ষ বছর।

নক্ষত্রের জীবন-চক্র

প্রচুর গ্যাস ও ধূলিকণা যখন মহাশূন্যে এক জায়গায় জমতে থাকে তখন মহাকর্ষের জন্যে ঐ গ্যাসের ঘনত্ব ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং গ্যাস কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এই সময় তাদের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এবং চাপ বাড়তে থাকে, এই ভাবে এক সময় কেন্দ্র অঞ্চলে অতি উচ্চ তাপ ও চাপ সৃষ্টি হয় এবং কেন্দ্রের কাছাকাছি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলি (এই উচ্চ তাপে গ্যাস প্লাজ্মা অবস্থায় থাকে) পরস্পর সংযোজিত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হতে সুরু করে এবং সেই সঙ্গে এক প্রচণ্ড শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয়। এই ভাবে অনুজ্জ্বল গ্যাসপুঞ্জ থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের জন্ম হয়। এই ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগে কয়েক কোটি বছর, তাই এর পুরোটাই অনুমান-ভিত্তিক।

প্রথম জীবনে তারার বেশির ভাগ অংশই ভর্তি থাকে হাইড্রোজেন দিয়ে—এই হাইড্রোজেনই তার জ্বালানী। এই সময় তারাদের বলা হয় মূল-অনুক্রম (main sequence) তারা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন শেষ হয়ে আসতে থাকে,

*73, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-700 029

পড়ে থাকে হিলিয়াম তখন নতুন জ্বালানী হিসাবে হিলিয়াম সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং তারাটা ক্রমশ আকারে বড় ও উজ্জ্বলতর হতে থাকে। এই পরিবর্তন চলে স্বল্প সময় ধরে এবং ঐ সময়ে তারাটিকে বলা হয় নোভা। এর পর এটি অতিকায় লাল তারায় পর্যবসিত হয়। আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা আবার বাড়তে বাড়তে এক সময় হঠাৎ অতিকায় লাল তারাটা একটা ভয়ানক বিস্ফোরণের ফলে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ উপাদান দিয়ে আবার নতুন তারা সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণকে বলে অতিনোভা (supernova)। অনেক সময় নোভার পর অতিনোভা না হয়ে তারা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে তখন তাদের বলে শ্বেত বামন (white dwarf)। এক সময় এদের আর কোনও ঔজ্জ্বল্য থাকে না তখন এদের বলে কালো বামন (black dwarf)।

নক্ষত্রের আয়তন

সূর্য একটা মূলঅনুক্রম তারা। এর ভর পৃথিবীর প্রায় তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ আর ব্যাস পৃথিবীর এক-শ' দশ গুণ। কিছু তারা আছে যারা সূর্যের চেয়ে অনেক বড় যেমন বেটেলগিয়াস (betelgeuse)। এটা একটা অতিকায় লাল তারা। সূর্যের জায়গায় একে বসালে পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত হবে এর বিস্তৃতি। এর আয়তন প্রায় 1000000 সূর্যের সমান তবে ভর সেই তুলনায় নেহাত কম—সূর্যের কুড়ি গুণ। কিছু তারার আয়তন মোটামুটি সূর্যের মতন। কালপুরুষের কুকুর লুব্ধক (Sirius A)-এর ব্যাস ও ভর সূর্যের দ্বিগুণ। সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টরাই (Proxima centauri)-এর আয়তন সূর্যের চার ভাগের একভাগ আর ভর দশ ভাগের এক ভাগ। কালপুরুষের লুব্ধকে প্রদক্ষিণ করে একটা ছোট তারা লুব্ধক (Sirius B)। সেই তারাটার আয়তন প্রায় পৃথিবীর মত কিন্তু ভর প্রায় সূর্যের কাছাকাছি। এই তারাটা শ্বেত বামন। শ্বেত বামনগুলির আপেক্ষিক ভর হয় অত্যন্ত বেশি। লুব্ধক থেকে যদি এক দেশালাই বাক্স ভর্তি পদার্থ নিয়ে আসা যায় তবে তারই ওজন হবে প্রায় এক টন।

যুগ্ম নক্ষত্র ও কম্পনশীল নক্ষত্র।

খালি চোখে আকাশের প্রত্যেকটা তারাকেই একটা আলোকবিন্দু মনে হয় তবে অনেক তারাই আছে যারা আসলে টি, তিনটি বা চারটি করে তারার এক একটা দল। আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধক দুটি তারা নিয়ে গঠিত। একটা বড় তারা সিরিয়াস-A-কে প্রদক্ষিণ করছে একটা ছোট তারা সিরিয়াস-B। বড়টার তুলনায় ছোটটা 10000 গুণ অনুজ্জ্বল। মিথুন রাশির ক্যাস্টর তারাটি আসলে ছয়টি ছোট বড় তারার একটি দল। কিছু কিছু যুগ্ম (double) তারা শক্তিশালী দূরবীণেও একটা বিন্দুই মনে হয়। তখন এদের চিনতে অন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। প্রথমত বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায়—আবার যুগ্ম তারাগুলির একটা অপরটাকে প্রদক্ষিণ করার সময় মাঝে মাঝে দুটিই আমাদের দৃষ্টিপথের সঙ্গে এক সরলরেখায় এসে পড়ে, তখন ব্যাপারটা হয় নক্ষত্রের গ্রহণ। গ্রহণের সময় একটা তারা অপরটাকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলার ফলে যুগ্ম তারার সামগ্রিক ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। এই গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেও তারাটা যুগ্ম কিনা বোঝা যায়। অ্যালগোল (Algol) নামে যুগ্ম তারাটার গ্রহণ লক্ষ্য করার মত। প্রতি 69 ঘণ্টা অন্তর একবার গ্রহণ হয় এবং গ্রহণ 10 ঘণ্টা থাকে। গ্রহণের সময় সামগ্রিক ঔজ্জ্বল্য কমে এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যায়।

তারার ঔজ্জ্বল্য শুধু মাত্র গ্রহণের জন্যেই বাড়ে-কমে, তা নয়। কিছু তারা আছে তাদের আভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ার তারতম্যের জন্যেও তাদের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে কমে। এদের কম্পনশীল তারা বলা হয়। ঐ রকম ঔজ্জ্বল্য বাড়া কমার আসল কারণ সম্পর্কে জ্যোতির্বিদরা খুব স্পষ্ট করে কিছুই বলতে সক্ষম নন। তাঁরা

এগুলির নাম দিয়েছেন সেফাইড (Cepheid variable) এবং জ্যোতির্বিদের কাছে এই তারাগুলি খুব কাজের। তাঁরা এগুলির ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে তার থেকে তারাগুলির আসল ঔজ্জ্বল্য বের করেন। ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের ফলে তারাগুলির দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। আবার কোন একটা সুদূরের তারা জগতে যদি একটা সেফাইডের সন্ধান পাওয়া যায় তবে সেটার দূরত্ব বের করতে পারলেই ঐ ঝাঁকের অন্যান্য তারাগুলির একটা গড় দূরত্ব বের করা সম্ভব হয়।

জ্যোতির্বিস্তায় দূরত্বের পরিমাপ।

জ্যোতির্বিদ্যায় বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের পৃথিবী থেকে দূরত্ব মাপার একটা প্রধান উপায় লম্বন (parallax) পদ্ধতি। কোন একটা স্থির বস্তুকে দুটি আলাদা স্থান থেকে লক্ষ্য করলে বস্তুটার অবস্থানের আপাত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনটাকেই বলে লম্বন। যে দুই ভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ্য করা হয় তাদের যদি একটা সরল রেখা দিয়ে যোগ করা যায় তবে সেই সরল রেখাটাকে বলে ভূমিরেখা। এখন দুই স্থান থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে বস্তুর যে কোণের পরিবর্তন হয়, ঐ কোণের মাপের দ্বারা লম্বনকে প্রকাশ করা হয়, আর ঐ কোণের মাপ নেওয়া হয় সেকেণ্ডে। এবার যদি লম্বনের মাপ নেওয়া হয় এবং ভূমিরেখার (base line) দৈর্ঘ্য জানা থাকে তাহলে সেই বস্তুর দূরত্ব সহজেই বের করা যায়।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের যে লম্বন লক্ষ্য করা যায় তার নাম জিওসেন্ট্রিক (geocentric) লম্বন। এই লম্বনকে সৌরজগতের মধ্যে দূরত্ব মাপার জন্যে যথেষ্ট ধরা যেতে পারে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে (6378 k.m.) ভূমিরেখা ধরে সূর্যের জিওসেন্ট্রিক লম্বন পাওয়া যায় $8^{\cdot}799'' \pm {}^{\cdot}001''$ আর এর থেকে সূর্যের দূরত্ব পাওয়া যায় 149,470,000 ± 17000 কিলোমিটার। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে আকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের লম্বন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের দূরত্ব মাপার জন্যে একটা বিশেষ একক ব্যবহার করা হয় যার নাম পারসেক (parsec)। পৃথিবীর সূর্যকে পরিক্রমার উপবৃত্তাকার কক্ষ পথের অর্ধপরাক্ষকে (semimajor axis) ভূমিরেখা ধরলে এক পারসেক দূরত্বে লম্বনের পরিমাপ হয় এক সেকেণ্ড। এখন ঐ অর্ধপরাক্ষকে বলে জ্যোতির্বিদ্যার একক। এক সেকেণ্ড কোণটা খুব ছোট বলে লেখা যায়—

$$\frac{\text{এক জ্যোতির্বিদ্যার একক (astronomical unit)}}{\text{এক পারসেক}} = 1 \text{ সেকেণ্ড} = \frac{1}{206265} \text{ রেডিয়ান}$$

অর্থাৎ এক পারসেক = 206265 জ্যোতির্বিদ্যার একক
= $3^{\cdot}084 \times 10^{13}$ কিলোমিটার
= $3^{\cdot}26$ আলোকবর্ষ।

এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলে এক আলোক বর্ষ।

এক জ্যোতির্বিদ্যার একক = $1^{\cdot}495 \times 10^{8}$ কিলোমিটার।

পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধপরাক্ষকে ভূমিরেখা ধরে কোন নক্ষত্রের লম্বন পরিমাপের জন্যে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। এর জন্যে প্রচুর ফটো তোলা হয় এবং প্রায় ·01″ পর্যন্ত নিখুঁত করে লম্বনের পরিমাপ করা হয়। তারপর p সেকেণ্ড যদি হয় লম্বনের পরিমাপ এবং r পারসেক যদি হয় নক্ষত্রের দূরত্ব তবে $p = \frac{1}{r}$ বা $r = \frac{1}{p}$.

এই পদ্ধতিতে মোটামুটি সূক্ষ্মভাবে চল্লিশ পারসেক দূরত্ব পর্যন্ত মাপা যায়।

অতি দূরের কোন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দূরত্ব পরিমাপের জন্যে অবশ্য সৌরজগতের গতিকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনমত বৃহৎ ভূমিরেখা (base line) পাওয়া যেতে পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে জ্যোতিষ্কদের নিজস্ব গতির কথাও চিন্তা করতে হয়। কারণ

প্রত্যেকটা জ্যোতিষ্কই গতিশীল কেউই সম্পূর্ণ স্থির নয়।

সুদূরের তারার দূরত্ব মাপার আর একটা পদ্ধতি হল তারাদের ঔজ্জ্বল্য বিচার। প্রথমে তারা বর্ণালী বিচার করে ঠিক করা হয় সেটার আসল ঔজ্জ্বল্য, তারপর দেখা হয় সাধারণভাবে কতটা উজ্জ্বল দেখায় ও এর থেকে বের করা যায় তার দূরত্ব। এই ভাবে সহজে দূরত্ব বের করা যায় সেফাইডদের।

তারার নাম	সেকেণ্ডে লম্বনের মাপ	দূরত্ব আলোকবর্ষ
স্বাতী নক্ষত্র (Arcturus)	·760	4·3
লুব্ধক (Sirius)	·375	8·7
বার্ণাড (Barnard)-এর তারা	·545	6·0
কাপ্টাইন (Kapetyn)-এর তারা	·251	13·0

নক্ষত্রের রং ও ঔজ্জ্বল্য

তারাদের ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে তাদের বহিরাবরণের তাপমাত্রার উপর। ঐ তাপমাত্রা অনুযায়ী জ্যোতির্বিদরা তারাদের সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। নিচের তালিকা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

তারার শ্রেণী	বহিরাবরণের তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	রং	নাম
O	30000-এর উপর	নীলচে সাদা	লোটা ওরিওনিস (Lota Orionis)
B	20000—30000	”	রিগ্যাল (Rigal), স্পিকা (Spica)
A	12000—20000	সাদা	লুব্ধক (Sirius), অভিজিৎ (Vega)
F	8000	হলদে সাদা	অগস্ত্য (Canopus) প্রকীয়ন (Procyon)
G	6000	হলুদ	সূর্য
K	4500	কমলা	স্বাতী নক্ষত্র অ্যালডেব্যারন (Aldebaran)
M	3000	লাল	বেটেলগিয়াস (Betelgeuse) অ্যাণ্টারেস (Anteres)

অনেক আগে থেকেই জ্যোতির্বিদরা তারাদের ঔজ্জ্বল্য অনুযায়ী তাদের ভাগ করেছেন। আকাশের উজ্জ্বলতম তারাদের দেওয়া হয়েছে প্রথম মাত্রা (first magnitude), তার থেকে কম উজ্জ্বল তারাগুলিকে বলা হয় দ্বিতীয় মাত্রা, এইভাবে আকাশে এখন পর্যন্ত দেখা গেছে 23 মাত্রার তারা। প্রত্যেক মাত্রার তারাগুলি আগের মাত্রার তারা থেকে আড়াই গুণ অনুজ্জ্বল। কিন্তু যে তারার ঔজ্জ্বল্য 1 মাত্রার তারার থেকে বেশি তার মাত্রা নিশ্চয় হবে এক-এর কম—এইভাবে শূন্য মাত্রার ও ঋণাত্মক মাত্রার তারাও দেখা যায়। নিচে কিছু বিভিন্ন মাত্রার তারার পরিচয় দেওয়া হল।

তারা	মাত্রা
সূর্য	−26·8
লুব্ধক	−1·4
অগস্ত্য	−0·7

তারা	মাত্রা	তারা	মাত্রা
আল্ফা সেণ্টরাই	−0·3	অ্যাণ্টারেস	+1·0
স্বাতী নক্ষত্র	−0·1	স্পিকা (Spica)	+1·0
অভিজিৎ	0·0	পোলাক্স (Pollux)	+1·2
প্রকীয়ন	+0·4	ডেনেব (Deneb)	+1·3
বেটেলগিয়াস	+0·7	রেগুলাস	+1·4
অ্যালটেয়ার (Altair)	+0·8		
অ্যালডেব্যারান	+0.8		

খালি চোখে মাত্র ষষ্ঠ মাত্রার তারা অবধি দেখা যায়।

একক কোষ-প্রোটিন—প্রোটিনের নতুন উৎস

মণ্টু কুমার বসাক*

দেহের গঠনে প্রোটিনের আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদানটির উৎপাদনও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে একক কোষ থেকে প্রোটিন তৈরি করতে পারলে। একক কোষ-প্রোটিনের কথাই বলা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

যে কোন দেশে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যে সীমিত, তা সকলেরই জানা। আর এও সত্য যে উন্নত চাষ পদ্ধতির সাহায্যে ফলন বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। কাজেই ইচ্ছা করলেই বর্তমানে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের চারগুণ বা পাঁচ গুণ বেশি খাদ্যশস্য তৈরি করতে পারা যাবে না। অথচ যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এখন যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে ভবিষ্যতে লাগবে তার অনেক গুণ বেশি। খাদ্যের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। মানব দেহের বিভিন্ন কোষ, কলা ও পেশী প্রভৃতি গঠনে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ থেকে এই প্রোটিন পেয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে প্রোটিনের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে ভাবনা হয়, প্রয়োজনীয় প্রোটিনের যোগান আসবে কোথা থেকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation) মতে—প্রোটিনের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যেকার দূরত্ব যদি বাড়তেই থাকে এবং তা রোধ করার কোন উপায় বের করা না যায়, তবে তার ফলে একদিন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন সমস্ত মানব সভ্যতারই বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

এই রকম অবস্থার থেকে বাঁচতে হলে প্রভূত পরিমাণে প্রোটিনের উৎপাদন একান্ত আবশ্যক। আর তা করতে হবে চাষযোগ্য জমির উপর নির্ভর না করেই। সেটা একমাত্র সম্ভব যদি একক কোষ

* পাটশিল্প গবেষণাগার, 12, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-700 040

(single cell) থেকে প্রোটিন তৈরির পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায়।

একক কোষ-প্রোটিন বলতে কি বোঝায়? একক কোষ-প্রোটিন বলতে বোঝায় এমন প্রোটিন, যা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরণের জীবাণু, যথা ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক (fungus), ইষ্ট (yeast), ক্ষুদ্র শ্যাওলা (algae) প্রভৃতির দেহকোষ থেকে। উৎপাদিত প্রোটিনের নামের সঙ্গে এইসব জীবাণুর নাম জড়িত থাকলে, মনস্তাত্ত্বিক কারণে মানুষ তা গ্রহণ করতে নাও পারে। এই অসুবিধা এড়ানোর জন্যেই কোন জীবাণুর উল্লেখ না করে, শুধু বলা হয় একক কোষ-প্রোটিন অর্থাৎ এমন প্রোটিন যা পাওয়া গেছে একক কোষযুক্ত জীবাণুর দেহকোষ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ব্যাক্টিরিয়া, ক্ষুদ্র শ্যাওলা, ইষ্ট বা তন্তুময় (filamentous) ছত্রাক—এরা সকলেই একক কোষ জীবাণু।

একক কোষ-প্রোটিন তৈরির সুবিধা—উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের চেয়ে একক কোষ-প্রোটিন তৈরি করার অনেক সুবিধা আছে। প্রথমত জীবাণুর আকার খুব ছোট হওয়ায় এবং তাদের বংশবৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয় বলে, অল্প সময়ে অল্প জায়গায় অনেক বেশি জীবাণুর উৎপাদন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের, যেমন—বেশি তাপ সহ্য করার ক্ষমতা কিংবা আরও দ্রুত বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা প্রভৃতির উন্নতিসাধন সম্ভব। তৃতীয়ত জীবাণুর উৎপাদন অবিচ্ছিন্নভাবে আবহাওয়ার উপর নির্ভর না করেই করা যায়। এছাড়া জীবাণুর দেহকোষে প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশি। কোন কোন জীবাণুর দেহে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা 50 ভাগেরও উপর। একক কোষ জীবাণু এমন সব বস্তুর উপরে জন্মানো যায়, যা সব সময় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এই সব বস্তুর অধিকাংশ কৃষিজাত আবর্জনা হওয়ায় এদের দামও খুব কম। যে সমস্ত বস্তু ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আছে আখের ছিব্‌ড়ে, বাদামের খোসা, ধানের কুঁড়ো ও খড়। এছাড়া বিভিন্ন রকমের হাইড্রোকার্বন ব্যবহার করেও জীবাণুর উৎপাদন করা সম্ভব।

একক কোষ-প্রোটিনের পুষ্টিগত মান—পশুর খাদ্য হিসাবে একক কোষ-প্রোটিনের পুষ্টিগত মান খুবই ভাল। বিশেষ করে এই প্রোটিনের সঙ্গে অল্প করে মিথিওনাইন (methionine) অ্যামিনো অ্যাসিড মিশিয়ে দিলে সেই মিশ্রণ চমৎকার পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পশুখাদ্য হিসাবে একক কোষ-প্রোটিনের উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের খাদ্য হিসাবে এরা এখনও বিবেচিত হচ্ছে না। তার প্রথম কারণ এদের কোষে নিউক্লিক অ্যাসিডের (nucleic acid) পরিমাণ বেশি থাকায় এরা সহজপাচ্য নয়। তাছাড়া অগ্ন্যাশয় রসে (pancreatic juice) অবস্থিত নিউক্লিয়েজ (nuclease) উৎসেচকের (enzyme) ক্রিয়ার ফলে নিউক্লিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিডে (uric acid) পরিণত হয়। এই ইউরিক অ্যাসিড যথেষ্ট দ্রবণীয় না হওয়ায় মানুষের দেহের কলা, পেশী ও গাঁটে জমতে থাকে। এর ফলে বাত (gout) রোগের সৃষ্টি হয়। একক কোষ-প্রোটিন গ্রহণের ফলে কিড্‌নীতে পাথরও তৈরি হতে পারে।) এখন প্রশ্ন হচ্ছে একক কোষ-প্রোটিন কি তবে কোনদিনই মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না? এর উত্তরে বলা যায়—নিশ্চয়ই যাবে। বিজ্ঞানীদের অনেক ধরণের উপায় জানা আছে যার সাহায্যে জীবাণুর দেহকোষে নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। যেমন জীবাণুর বৃদ্ধি সীমিত রেখে, বিশেষ করে কার্বন ও ফসফেটের যোগান কমিয়ে দিয়ে, কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্ষারীয় হাইড্রোলিসিস (alkaline hydrolysis) অথবা উৎসেচকের সাহায্যে বিনষ্ট করে দিয়ে। বর্তমানে এই পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে নিউক্লিক অ্যাসিড

বেশি থাকার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বেশি বেগ পেতে হবে না।

বিষাক্ততাজনিত সমস্যা অনেকেই মনে করেন জীবাণুর দেহকোষ থেকে যে প্রোটিন পাওয়া যাবে তা স্বাভাবিক কারণেই বিষাক্ত হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও জানা দরকার যে এই ধরণের বিষ-জনিত সমস্যা শুধুমাত্র একক কোষ-প্রোটিনের মধ্যে পাওয়া গেছে তা নয়। আজ পর্যন্ত যত রকম উৎস থেকেই প্রোটিন তৈরির চেষ্টা হয়েছে, সবেতেই এই সমস্যা ছিল। যথা—ফিস মিলে, 1, 2, ডাই ক্লোরো-ইথেন (1, 2, dichloroethane); রেপ সীডে—থাইওগ্লাইকোসাইড (thioglycosides); পিনাটে এফ্লাটক্সিন (aflatoxin) প্রভৃতি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধনের ফলে এগুলি এখন বিষমুক্ত। অতএব একক কোষ-প্রোটিনের ক্ষেত্রেও যে বিষ দূর করা যাবে না, তা নয়।

প্রোটিনের অভাব দূর করার জন্যে প্রোটিন তৈরির নতুন নতুন পদ্ধতিসম্বলিত বিভিন্ন ধরণের রিপোর্ট গত কয়েক বছর ধরেই প্রকাশিত হচ্ছে। একক কোষ-প্রোটিন এরই মধ্যে একটি বিশেষ পদ্ধতি। ঠিকমত নজর দিতে পারলে, একক কোষ-প্রোটিনই যে একদিন বিশ্বে প্রোটিনের অভাব দূর করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

পাট ও পাট-প্রজননের অগ্রগতি

অসিতবরণ মণ্ডল*

পাট আমাদের দেশের একটি অর্থকরী শস্য। কৃষিতে গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাটেও প্রজনন উপায়ে বেশ কতকগুলি প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। এই প্রজাতিগুলি কৃষিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সফল করেছে। এসব বিষয় এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

পাট একটি প্রয়োজনীয় আঁশবহুল শস্য। পাটের 40টির মত জাত আছে। এই 4 টি বিভিন্ন জাত আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জন্মায়। এগুলির মধ্যে 36টি জাত আফ্রিকায় জন্মায়। ভারতবর্ষে টি জাত জন্মায়। এই চল্লিশটি জাতের মধ্যে মাত্র দুটি জাতের পাট চাষযোগ্য। এই দুটি জাতের পাটের মধ্যে একটি জাতকে বলে তিতা পাট, যার বৈজ্ঞানিক নাম করকোরাস ক্যাপসুলারিস (corchorus capsularis) এবং অপরটিকে বলে মিঠাপাট যার বৈজ্ঞানিক নাম করকোরাস ওলিটোরিয়াস (corchorus olitorius)। ভারতবর্ষে ক্যাপসুলারিসের অন্তর্গত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি আফ্রিকাতে পাওয়া যায় না। আবার ওলিটোরিয়াসের অন্তর্গত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রায় সব উদ্ভিদকে আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তাই আফ্রিকাকে মিঠাপাটের এবং ভারত, ব্রহ্ম অঞ্চলকে তিতাপাটের প্রধান উৎপত্তি স্থল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমাদের

*বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

দেশে পাটের চাষযোগ্য জমির শতকরা 75 ভাগ জমিতে করকোরাস ক্যাপসুলারিসের বা তিতাপাটের এবং বাকি 25 ভাগ জমিতে ওলিটোরিয়াস বা মিঠা-পাটের চাষ করা হয়। শুধু মাত্র বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষেই পৃথিবীর শতকরা 95 ভাগ পাট উৎপন্ন হয়। পাট আমাদের একটি প্রধান রপ্তানি শস্য। এটি থেকে প্রতি বছর আমাদের দেশ বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ করে। পাটের আঁশ থেকে বিভিন্ন ধরণের থলি এবং কাপড় তৈরি হয় এবং নিম্নমানের আঁশকে শিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্য রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

যদিও দুটি জাতের পাট দেখতে একই ধরণের মনে হয় কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলে কতকগুলি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—করকোরাস ক্যাপসুলারিসের অন্তর্গত উদ্ভিদগুলি টোরিয়াসের তুলনায় উচ্চতায় ছোট। এদের পাতাগুলি তিতা কিন্তু ওলিটোরিয়াসের পাতাগুলি স্বাদবিহীন। এই জন্যে ক্যাপসুলারিসকে তিতাপাট এবং ওলিটোরিয়াসকে মিঠাপাট বলে। তিতাপাটের ফুল ছোট হয়, এদের থেকে উৎপন্ন ফলের গুটিটি গোল অথবা বল্লম আকৃতির কিন্তু মিঠাপাটের গুটিটি লম্বা চোঙাকৃতি। মিঠাপাটের আঁশের রঙ হলদে অথবা লালচে ধরণের কিন্তু তিতাপাটের আঁশের রঙ সাদা। এই দুটি জাতের পাট আবার বিভিন্ন মাটিতে জন্মায়। তিতাপাটের উদ্ভিদের প্রধান মূলটি ছোট হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয় কিন্তু মিঠাপাটের প্রধান মূলটি লম্বা হয় এবং এর শাখা-প্রশাখা কম হয়। মূলের এই গঠনগত পার্থক্যের জন্যেই খুব সম্ভবত দুটি জাত বিভিন্ন মাটিকে বেছে নিয়েছে। মিঠাপাট উঁচু জমিতে ভাল জন্মায়, দাঁড়ানো জল সহ্য করতে পারে না কিন্তু তিতাপাট উঁচু-নিচু সব জমিতেই জন্মাতে পারে। অনেক আগে থেকে পাটের চাষ হয়ে থাকলেও ভারত-বর্ষে উন্নতশীল পাটের চাষ শুরু হয়েছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে। এর আগে শুধু মাত্র জংলী প্রজাতির পাটের চাষ হত। এই সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে যেগুলি একর প্রতি ভাল ফলন দিয়েছে এবং পাট চাষে কৃষকেরা উৎসাহও পেয়েছে। এই সব প্রজাতির আবির্ভাবের পিছনে আছে বিজ্ঞানীদের অশেষ পরি-শ্রম, ধৈর্য এবং মননশীলতা। প্রথম অবস্থায় পাটের চাষ কয়েকটি আঞ্চলিক প্রজাতির উপর সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলির ফলন ছিল খুব কম। তাছাড়া এগুলি বিভিন্ন জলবায়ু এবং রোগ প্রতিরোধে অক্ষমও ছিল। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য শস্যের মত পাটেও বেশ কতকগুলি প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে যেগুলি কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সফল করেছে।

ফলন (yeild)—পাট প্রজননের প্রধান একটি উদ্দেশ্য ফলন বৃদ্ধি। এই ফলন বৃদ্ধির জন্যে পাট প্রজননে গোড়ার দিকে বাছাই পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রজনন পদ্ধতির উন্নতর সঙ্গে সঙ্গে সংকরণ, পরিব্যক্তি প্রজনন **(mutation breeding)**, পলিপ্লয়ডি প্রজননের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাটের ফলন পাটগাছের মোট ওজন এবং পাটের আঁশের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাই বেশি পরিমাণে ফলন পেতে হলে বড় ধরণের গাছের প্রয়োজন। কিন্তু পাট প্রজননে ফলন মূল্যায়ণ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যখন পাটের বীজ উৎপন্ন হয় সেই সময় গাছগুলি কেটে তা থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় সেই আঁশের ওজন কমে যায় এবং এমনকি ওর গুণগত বৈশিষ্ট্য **(qualitative characteristics)** নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই একসঙ্গে প্রতি উদ্ভিদের ফলন মূল্যায়ণ এবং সেই গাছের বংশরক্ষার জন্যে বীজ সংগ্রহ সম্ভব নয়। এই সমস্যা এড়ানোর জন্যে প্রথমের দিকে বিজ্ঞানীরা গাছের মোট উচ্চতা এবং গোড়ার ব্যাসকে **(basal diameter)** কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য ফলন নির্ণয় করেন। এখন পাটের আঁশ এবং পাটকাঠির অনুপাতকে কাজে লাগিয়ে ফলন নির্ণয় করা হয়। তবে আজকাল প্রত্যক্ষ ফলন নির্ণয় এবং গাছের বংশরক্ষা সম্ভব হয়েছে কয়েকটি হরমোনের সাহায্যে। ফুল আসার পূর্ব মুহূর্তে সম্ভাব্য পরীক্ষণীয় গাছগুলির মাথাগুলিকে কেটে নিয়ে হরমোন প্রয়োগ করে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

সুব্যবস্থিতভাবে পাটের উন্নতিসাধন আরম্ভ হয়েছে 1904 খৃষ্টাব্দ থেকে যখন তদানীন্তন বাংলার কৃষিবিভাগ আর এস ফিন্‌লোকে নিযুক্ত করে। তাঁরই গবেষণায় 1916 খৃষ্টাব্দে প্রথম একটি প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। এটির নাম দেওয়া হয় কাকিয়া বোম্বাই। এর পরে বের হয়েছে তিতাপাটের D-154 এবং মিঠাপাটের চিনসুরা গ্রীন দুটি প্রজাতি। প্রায় অনেক বছর চিনসুরা গ্রীন এবং D-154 প্রজাতি দুটি উন্নত মানের প্রজাতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরে অবশ্য বাছাইকৃত তিতাপাটের JRC-212, JRC-321 এবং মিঠাপাটের JRO-632 প্রজাতিগুলি যথাক্রমে D-154 এবং চিনসুরা গ্রীন প্রজাতি দুটিকে প্রতিস্থাপিত করে। এর পরে সংকরণ, অভিব্যক্তি প্রজনন ঘটিয়ে বেশ কয়েকটি প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে যেগুলি এখন পর্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট প্রজাতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে JRO-632-এর উপর গামারশ্মি প্রয়োগে JR-1 এবং দুটি খর্বাকৃতি গাছের সংকরণে JRO-3690 অন্যতম। JR-1-এর ফলন JRO-632-এর তুলনায় শতকরা 12 এবং JRO-3690-এর ফলন JRO-632-এর তুলনায় শতকরা 15-18 ভাগ বেশি।

জল্‌দি জাত উদ্ভাবন—অন্যান্য শস্য উদ্ভিদের মত পাটেও জল্‌দি জাতের প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন ধরা যাক তিতাপাটের প্রজাতিগুলিকে ফেব্রুয়ারীর মধ্য থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা চলে এবং জুন-জুলাই মাসে এগুলিকে কাটা চলে। এর পরে ঐ একই জমিতে ধান আবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু মিঠাপাটের ক্ষেত্রে এই ধরনের দুটি শস্যকে লাগানো অসুবিধা-জনক হয়ে পড়ে। কারণ মিঠা পাটকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগে বপন করা চলে না। এছাড়া জল্‌দি জাতের আঁশের গুণগতমান ভাল। তিতা এবং মিঠা—এই দুরকম পাটে কয়েকটি জল্‌দি জাতের আবির্ভাব ঘটেছে। তিতাপাটে ফল্গুক এবং ফল্গুককে প্রজননের কাজে লাগিয়ে কয়েকটি জাতের পাট বের করা হয়েছে। মিঠা পাটেও কয়েকটি জাত পাওয়া গেছে। যেমন—চিনসুরা গ্রীন, রূপালি ইত্যাদি। জল্‌দি জাত উদ্ভাবনে কৃত্রিম পরিব্যক্তি প্রজনন এবং সংকরণ বিশেষ সহায়ক। জল্‌দি প্রজাতিগুলির অধিকাংশই নিম্ন ফলন দেয়। এক সঙ্গে উচ্চ ফলন এবং জল্‌দি বৈশিষ্ট্যকে আনা দুরূহ হয়ে পড়ে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য—পাটের বাজার দর স্বভাবতই পাটের গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এই গুণগত মান ভাল প্রজাতি, মাটি এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় ভাল গুণগত মানের প্রজাতি থাকলেও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া গুণগত মানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ রোগ পোকা আক্রমণে অথবা খারাপ জল-হাওয়ার জন্যে পাটের ঐ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্য আঁশের দৈর্ঘ্য, আঁশের শক্তি, রঙ, ঔজ্জ্বল্য, সূক্ষ্মতা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। সাধারণত মিঠাপাট গুণগত মানের দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। মিঠা পাটের কয়েকটি ভাল গুণগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতির নাম করা যেতে পারে। যেমন—JRO-632, R-26, তেমনি তিতাপাটেও JRC-321, JRC-206 প্রভৃতি কয়েকটি প্রজাতির পাট বের হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে জল্‌দি জাতের কোন প্রজাতি ভাল গুণগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। গুণগতমান মূল্যায়নে কলি-কাতায় পাট প্রযুক্তি গবেষণাগারটি স্থাপিত হয়েছে।

কীট-পতঙ্গ, রোগ-প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি - পাটে রোগ এবং কীটশত্রু দমনের জন্যে প্রতিরোধক প্রজাতি সৃষ্টির কাজ আগে থেকেই নেওয়া হয়েছে। রোগের মধ্যে গোড়াপচা (stem rot) এবং অ্যান-থ্রাকনোজ (anthraxnose) এবং পোকার মধ্যে ঘোড়াপোকা (semilooper), এপিয়ন, মাকড় (mites), ডাঁটাকাটা পোকা প্রধান শত্রু। তিতাপাটে D-154 এবং JRC-918 এই দুটি প্রজাতিকে প্রজননে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। কেননা এদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধক্ষম (গোড়াপচা) জিন আছে।

রোগকীট প্রতিরোধকতার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই রশ্মি প্রয়োগ করে প্রতিরোধক উদ্ভিদ পাওয়া গেছে।

ঝল্‌সা প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি—(lodging resistant variety)—ঝল্‌সে যাওয়া বৈশিষ্ট্যটি কয়েকটি উপাদানের উপর নির্ভর করে—(i) দুর্বল কাণ্ড, (ii) দুর্বল মূল এবং (iii) রোগ ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ। পাটে ঝল্‌সা প্রতিরোধক্ষমতার জন্যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, দানাশস্যে তার অনেকাংশই অন্য প্রকারের। দানাশস্যে খর্বাকৃতি উদ্ভিদ (dwarf plant) এবং এর শক্ত কাণ্ডের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পাটে খর্বাকৃতি উদ্ভিদের উপর গুরুত্ব দিলে ফলন অত্যন্ত হ্রাস পেয়ে যাবে। আবার বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট গাছকে ঝল্‌সা প্রতিরোধের কাজে লাগানো চলে না। শক্ত কাণ্ড, শক্ত জাইলেম, শক্ত মূল এবং ভাল উচ্চতাসম্পন্ন উদ্ভিদের উপর জোর দেওয়া হয়।

ঝল্‌সা প্রতিরোধে 'সুদান গ্রীন'-কে কাজে লাগানো হয়েছে এবং এর থেকে কয়েকটি ঝল্‌সা প্রতিরোধক্ষম প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর পাট-গবেষণা কেন্দ্রটি নিরলসভাবে পাটের উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কৃষকদের সমস্যার সমাধানই তাঁদের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। আজকাল দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা সংকর পাট চাষের সম্ভাব্যতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কেননা সংকর পাট অন্যান্য ভাল প্রজাতির তুলনায় 15-20% বেশি ফলন দেয়। কিন্তু পাটে অধিক পরিমাণে সংকর বীজ উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত পুংবন্ধ্যা (male sterile) উদ্ভিদের অভাব।

সৌরশক্তি

নিখিলরঞ্জন সাহা*

আগামী দিনের অনিবার্য শক্তি-সংকটে সূর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে সহজে ও স্বল্পব্যয়ে সার্থকতা আনতে পারে তা নিয়ে আজকের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। তারই আশু সাফল্য এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

যেদিন মানুষ প্রথম পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালিয়েছিল এবং তা দিয়ে কাঠ পুড়িয়ে তাপ সৃষ্টি করতে শিখেছিল, ঠিক সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ। তারপর যুগে যুগে মানুষ তার অবিরাম ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার তাগিদে শক্তির উৎস হিসেবে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পারমাণবিক পদার্থসমূহের ব্যবহারের বিবিধ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ভাণ্ডারে এসব খনিজ পদার্থের পরিমাণতো অত্যন্ত সীমিত—আজকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এসব পদার্থ আগামী দেড়-শ' বছরেই সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীর ভাণ্ডারটি যদি সম্পূর্ণভাবে খনিজ তেলে ভরপুর থাকতো, তা দিয়েও আগামী 365 বছরের বেশি চলা সম্ভব হত না। ভারতের ভাণ্ডারে যদিও বেশ বড় রকমের বিবিধ খনিজ পদার্থ রয়েছে—যেমন 4300 মিলিয়ন টন কয়লা, 250

* 8, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলিকাতা-700 050

মিলিয়ন টন তেল, 130 মিলিয়ন ঘন-মিটার গ্যাস। এছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি থোরিয়াম পারমাণবিক খনিজ পদার্থও ভারতেই আছে। এসব পদার্থ একবার ব্যবহার করা হলে তা পুনঃ ব্যবহারও করা যায় না; তাছাড়া এগুলির অনেকেই আবার জীবদেহে প্রচণ্ড ক্ষতিরও কারণ হয়ে থাকে। এভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর আগামী দিনের মানুষের সভ্যতা প্রচণ্ডভাবে শক্তি-সংকটে বিপন্ন হয়ে উঠবে। এই সমস্যা সমাধানে সূর্যই হবে একমাত্র অবলম্বন— যার অফুরন্ত শক্তি অসীম সময় ধরে মানুষ কোনদিকে কোনরূপ ক্ষতি স্বীকার না করেই যাতে অনায়াসে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে সেজন্যে আজকের বিজ্ঞানীরা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু সমস্যা হল উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবনে।

সূর্য, পৃথিবী ও সৌরশক্তি—সূর্যকে ঘিরেই সৌরজগত—পৃথিবী তার একটি সদস্য। সূর্যের দেহের অভ্যন্তরে সর্বদা ফিউশন (fusion) প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু বিস্ফোরিত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হবার সময় প্রায় 30 মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়। করোনা (corona) নামক যে স্তরটি সূর্যকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত ঘিরে রয়েছে তাতে আছে অফুরন্ত বিদ্যুৎবাহী প্রোটন যা নিরবচ্ছিন্ন কণাধারায় মহাশূন্যে অবিরত প্রসারিত হয়। এ স্তরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা প্রায় 2 মিলিয়ন ডিগ্রী। আর সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা প্রায় 10,000 ডিগ্রী। এর বিকিরণ শক্তির পরিমাণ $3{\cdot}7\times10^{26}$ ওয়াট যার 1/120 মিলিয়ন ভাগ সৌরজগতের সব সদস্য পায়। পৃথিবী পায় মোট সৌরশক্তির 5×10^{-10} অংশ যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় $1{\cdot}7\times10^{17}$ ওয়াট।

ভূপৃষ্ঠে আপতিত সৌরবিকিরণের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় 1/4 মাইক্রন থেকে 3 মাইক্রন (1 মাইক্রন $=10^{-4}$ সেন্টিমিটার)। এই বিকিরণের অর্ধেকটা হচ্ছে অদৃশ্যমান আলো এবং বাকিটা ঈষৎ লাল বা দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ যা তাপ তৈরির কারণ হিসেবে গণ্য হয়। আবার, এ বিকিরণের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য অংশ বা অতিবেগুনি রশ্মি নামে পরিচিত। এভাবে পৃথিবীর বায়ুস্তরের বাইরে প্রতি বর্গমিটারে পতিত সৌর বিকিরণের গড় তীব্রতা প্রায় 1·36 কিলোওয়াট। অর্থাৎ প্রতি দিনে প্রতি বর্গমিটারে তা প্রায় $2\times4\times10^{25}$ ফোটনের (photon) সমান যার শক্তির পরিমাণ প্রায় 1·8 ইলেকট্রন ভোল্টেরও বেশি। আবার বায়ুস্তরের বহির্পৃষ্ঠে প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটারে প্রায় 429 বি. টি. ইউ. তাপ পাওয়া যায় যাকে বলা হয় সৌরধ্রুবক (solar constant) বা ল্যাংগলী (langley)। ভূপৃষ্ঠে সৌরবিকিরণের একক এই ল্যাংগলীর পরিমাণ প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রতি মিনিটে প্রায় এক ক্যালরির সমান। এভাবে মোট শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি বছরে প্রায় 10^{18} অশ্ব ঘণ্টা যা পৃথিবীর সমস্ত দাহ্যবস্তু তিন দিনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করার হারের সমান। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে এ শক্তির মাত্র অর্ধাংশ এসে পৌঁছয়। বাকিটা বায়ুস্তরের মেঘ, ধূলিকণা, ধোঁয়া, কুয়াশা ইত্যাদির দ্বারা শোষিত ও প্রতিফলিত হয়ে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, এভাবে প্রতিফলিত শক্তির পরিমাণ মোট শক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং শোষিত হয় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ উদ্ভিদ প্রতি বছরে প্রায় 6×10^{18} অশ্ব ঘণ্টা শক্তি ব্যবহার করে। এরা এক হাজার ফোটনের মধ্যে মাত্র একটিকে কার্যত ব্যবহার করে বাকি সবটাই আবার শূন্যে ফিরিয়ে দেয়। আবার এ বিকিরণ রশ্মির একটা সুনির্দিষ্ট তরঙ্গের অংশ বায়বীয় জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণুর দ্বারা শোষিত হয়। মেঘমুক্ত ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গফুটে প্রতি ঘণ্টায় আপতিত সূর্য-কিরণের তীব্রতার মান মধ্যাহ্নে প্রায় 300—350 বি. টি. ইউ. হতে পারে। সূর্য থেকে ভূপৃষ্ঠে আগত সর্বমোট সৌরশক্তির পরিমাণ আজকের মানুষের তৈরী অন্যান্য সব যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত শক্তির তুলনায় প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশি। এ বিপুল শক্তি পৃথিবীকে উত্তপ্ত

করে প্রাণী ও জীবের খাদ্য তৈরি করে, জীবন-বায়ু অক্সিজেন-কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমতা রক্ষা করে সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে। জানা গেছে, সৌর-শক্তির প্রায় 70% দিবাভাগে ভূত্বকে রক্ষিত হয়, যার 15% অনাবৃত ভূপৃষ্ঠে শোষিত হয়। বাকি 85% শক্তির ব্যবহার হয় জলভাগের জলরাশিকে বাষ্পীভূত করার কাজে, উদ্ভিদের বৃদ্ধির কাজে। এভাবে দেখা যায়, নগ্ন ভূত্বকে শোষিত সৌর শক্তির 500 ভাগের এক ভাগ যদি কোনভাবে করায়ত্ত করতে পারা যায় তাহলে পৃথিবীর আজকের শক্তি সংকটের পুরাপুরি সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

পৃথিবীপৃষ্ঠের সমস্ত অঞ্চলে সৌরবিকিরণের অসম বণ্টনের ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। 4 ° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত প্রশস্ত সৌরবেল্টে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ বিকিরণ ধরা পড়ে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলি ক্রান্তিয়মারেখার 30° দক্ষিণ থেকে 30° উত্তরে অবস্থিত যেখানে সূর্যালোক পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা সৌরশক্তিকে অনায়াসে কাজে লাগাতে পারে।

ভারতে হায়দ্রাবাদের প্রতি বর্গমিটারের প্রাত্যহিক গড় সৌরশক্তির পরিমাণ প্রায় 4·5 কিলোওয়াট-ঘণ্টা। মেঘমুক্ত সূর্যালোকিত দিনে এর পরিমাণ প্রতি বর্গ-মিটারে 7 কিলোওয়াট-ঘণ্টা ছাড়িয়ে যায়। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের মাসিক সৌরশক্তির গড় প্রায় 12·5 কিলোক্যালোরি। আমরা বছরে গ্রহণ করি 150 কিলোক্যালোরি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে যখন মোট আপতিত শক্তির বার্ষিক পরিমাণ থাকে প্রায় 60×10^{16} কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

সৌরশক্তির ব্যবহার— কোন অঞ্চলে সৌর-শক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা সেই অঞ্চলের উপর পতিত সূর্যের আলোক বিকিরণের পরিমাণ, তীব্রতা, সময়ের দীর্ঘতা, আপতন কোণ, ইত্যাদির পরি-সংখ্যানের উপরে নির্ভর করে। এসব তথ্য পাবার জন্যে যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তার প্রায় সবই আজ ভারতে পাওয়া যায় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সেসব যন্ত্রপাতি স্থাপন করে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছে অনেক দিন পূর্ব থেকেই। সৌরশক্তিকে সরাসরি তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করার বিবিধ পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি উদ্ভাবনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষকেরা আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। সূর্যালোক শোষণের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির তলদেশ স্বভাবতই বেশ প্রশস্ত ও এমনভাবে গতিশীল হতে হবে যা সূর্যের গতিকে সরাসরি অনুসরণ করতে পারে। সেখানে আবার এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে রূপান্তরিত শক্তি সংরক্ষণ করা যায় যা সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে যেসব পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে অতিপরিবাহী চুম্বকের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে শক্তির পরিবর্তনের জন্যে কোন মাধ্যমিক স্তরের প্রয়োজন হয় না। এর ব্যয়বহুলতা কমানোর জন্যে অবশ্য চেষ্টা চলছে। এভাবে আংশিক সফলতা ইতিমধ্যেই এসেছে; কিন্তু তা গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের কাজে ব্যবহার করার মত অবস্থা এখনও হয়ে ওঠে নি। খুব শীঘ্রই এমন সব যন্ত্রের সঙ্গে বাস্তবভাবে সুপরিচিত হওয়া যাবে যাদের সাহায্যে জল গরম করা, রান্না করা, বাড়িঘরের বা খাদ্যদ্রব্যের উষ্ণতা বা শীতলতা নিয়ন্ত্রণ করা, কৃষি-কার্যে জল নিষ্কাশনের কাজ করা, বিদ্যুৎ তৈরি করা ও তা ব্যবহার করা, ইত্যাদি সম্ভব হবে। এখন একটু বিশদভাবে দেখা যাক কিভাবে এসব সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

সৌরচুল্লী, সংগ্রাহক ও একত্রিকরক— কালো রঙের যে কোন তাপ পরিবাহী ধাতব পাত যা সূর্যালোক শোষণ করে তাকে স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের আস্তরণে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হয় যাতে তাপ চারধারে বিকিরিত না হতে পারে। সেজন্যে প্রয়োজনীয় তাপ কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ঐ পাতের চার পাশ আবৃত করা হয়। সূর্যরশ্মিকে বিভিন্ন আকারের ফলকের দ্বারা একত্রিভূত করে

তীব্রতা বাড়িয়ে তা ঐ কালোতলবিশিষ্ট পাতের আয়তনে নিবদ্ধ করা হয়। এই তীব্র রশ্মি স্বচ্ছ আস্তরণের মধ্য দিয়ে ঐ কালো রঙের আবৃত পাতে শোষিত হয়ে তাতে ঈষৎ লাল রশ্মি বিকিরণ করে; যার ফলে তাতে তাপের উদ্ভব হয়। এই তাপ কোন প্রবাহিত তরল পদার্থের দ্বারা স্থানান্তরিত করা হয়। এভাবে 200—2000°C পর্যন্ত তাপমাত্রা পাওয়া যেতে পারে। প্রবাহিত তরল পদার্থের গুণাগুণ, কালো ধাতব পাতের ও প্রতিফলকের আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদির পরিমাপ কাজের মানের উপর নির্ভর করে। এভাবেই আন্তর্জাতিক বাজারে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের সৌরচুল্লী, তাপ সংগ্রাহক ও একত্রিকরকের প্রচলন হয়েছে। ভারতে পাঞ্জাবের লুধিয়ানার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লীর ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, রুড়কির কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, ভারত হেভি ইলেকট্রনিকস্ লিমিটেড প্রভৃতি স্থানে এবিষয়ে সাফল্য অর্জনের জন্যে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হয়েছে। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে উন্নতমানের সৌর সংগ্রাহক ও একত্রিকরকের (concentrator) সাহায্যে বাড়িঘর ও খাদ্যদ্রব্যের শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

সৌর জল-পাম্প—এর কারিগরি পদ্ধতিতে সচরাচর রাবারের বেলোও (bellow) ব্যবহার করে জলকে পাম্প করে উচ্চ চাপে সংরক্ষণ করা হয়। তা করতে নিম্ন স্ফুটনাংকের তরল পেট্রোলিয়াম ইথারের সাহায্যে ঐ বেলোওগুলিকে সক্রিয় রেখে তাতে উচ্চ চাপের বাষ্প তৈরি করা হয় যা জলকে বেলোও-র মধ্য দিয়ে উচু স্থানে অবস্থিত পাত্রে ঠেলে নিয়ে যায়। তারপর ঐ বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে আবার তরলে নিয়ে গেলে তখন ঐ বেলোও-র মধ্যে বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই বায়ুশূন্যতা পূরণে নিম্নভূভাগ থেকে জলরাশি আবার ঐসব বেলোওতে এসে জমে। এভাবে জল নিষ্কাশনের অবিরাম ক্রিয়া চলতে থাকে। এ ধরনের সৌর জল-পাম্পের প্রচলন পল্লীগ্রামের পানীয় জল সরবরাহে ও ক্ষেতখামারের কাজে শুরে হয়ে গেছে। এসব দিকেও ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা মোটামুটি সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তাপীয় বিদ্যুৎ শক্তি—তাপমাত্রা মাপতে যেসব থার্মোকাপ্‌ল্ (thermocouple) ব্যবহার করা হয় তাতে দক্ষতা 1%-র বেশি নয়। সম্প্রতি বিভিন্ন অর্ধপরিবাহকের সংকরের (alloy) সাহায্যে এর দক্ষতা 10%-র বেশি হতে চলেছে। এতে থার্মোকাপ্‌লের সন্ধিতে যে তাপের সৃষ্টি করতে হয় তা সৌর সংগ্রাহকের সাহায্যে করা হয়। এদিকে আরও সাফল্যের জন্যে গবেষণা চলছে।

সূর্য থেকে সমুদ্র যে প্রচুর পরিমাণে তাপ সংগ্রহ করে তা দিয়েও বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা সম্ভব। স্বভাবত সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা তার নিচের তলের চেয়ে বেশি থাকে। এই তাপ দ্বারা কোন নিম্ন স্ফুটনাংকের জৈব তরলকে বাষ্পে পরিণত করে তাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ বাষ্পকে পুনঃব্যবহারের জন্যে একে সমুদ্র-জলের তলভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলেই তা আবার তরল হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে শক্তির রূপান্তরের দক্ষতা মাত্র 2% বাস্তবে পাওয়া গেছে—তবে যেহেতু এতে অধিক পরিমাণে সৌর তাপ সংগৃহীত হয় সেজন্যে এর দক্ষতা বাড়াতে প্রচুর গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে।

অন্যভাবে বেশ কিছুসংখ্যক বৃহৎ আয়তনের প্রতিফলকের সাহায্যে সূর্যালোককে প্রতিফলিত করে তীব্র তাপ সৃষ্টির মাধ্যমে জলরাশিকে বাষ্পে পরিণত করে এবং তাকে সঠিকভাবে গতিশীল করে জেনারেটরের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করার বাস্তব পদক্ষেপ ইতিমধ্যে বেশ কয়টি উন্নত দেশে দেখা যাচ্ছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যে সূর্যের তাপ সঞ্চয় করে তার সাহায্যেও বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করার পরিকল্পনা সম্প্রতি ফ্রান্সে নেওয়া হয়েছে।

আলো থেকে বিদ্যুৎ শক্তি—সেমিকণ্ডাক্টর

ইলেকট্রনিক্সের বিজ্ঞানীরা সারিবদ্ধ আলোক উত্তেজিত **P-N** সন্ধির দ্বারা তৈরি করেছে সৌর ব্যাটারী (**soler cell**) যার সাহায্যে আলো থেকে বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তর একটি আকর্ষণীয়, নির্ভরযোগ্য ও সহজ নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্ধতি। তবে আজও এতে রূপান্তরিত শক্তির দক্ষতা 20% কম, মূল্যও অধিক। তদুপরি শক্তি সংরক্ষণের সমস্যাও রয়েছে। অতি বিশুদ্ধ (6N%) সিলিকনের একক স্ফটিক হচ্ছে সৌর ব্যাটারী তৈরির একটি সবিশেষ উপাদান। পৃথিবীর ভাণ্ডারে এর অস্তিত্ব ব্যাপক পরিমাণ হলেও একে অতিবিশুদ্ধ স্তরে নিয়ে যেতে আজও ব্যয় বেশি পড়ছে। চেষ্টা যেমন চলছে এর এ ব্যয়বহুলতা কমানোর উদ্দেশ্যে—তেমনি গবেষণাও চলছে এর বিকল্প উপায় উদ্ভাবনে। ইতিমধ্যে গবেষণালব্ধ ফল থেকে দেখা গেছে যে পর্যায়ক্রমিক তালিকার (**periodic table**) তিন-পাঁচ বিভাগের যৌগের মধ্যে তিনটিতে (অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্টিমনাইড, ইণ্ডিয়াম ফস্‌ফরাইড ও গ্যালিয়াম আর্সেনাইড) সিলিকনের তুলনায় অধিক গুণাগুণ রয়েছে। এছাড়া ক্যাড্‌মিয়াম সালফাইড ও কিউপ্রাস সালফাইডের যৌগেও বাস্তব সাফল্য এসেছে। কিন্তু এ সবেও পুরাপুরি চাহিদা মিটছে না—তাই ব্যাপক গবেষণা চলছে অন্যান্য আরও বিভিন্ন দুই / তিন / চার জাতীয় মৌলের যৌগকে কাজে লাগিয়ে এর শক্তির পরিমাণ, দক্ষতা ও জীবনকাল বাড়ানোর জন্যে।

এভাবে আজ অবধি যা সাফল্য এসেছে তাতেই এই সৌরব্যাটারী কৃতিত্বের সঙ্গে বেতার প্রেরক-যন্ত্রে, কৃত্রিম উপগ্রহে, মহাশূন্য যানে ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে হয় এবিষয়ের গবেষণাপ্রসূত ফল আগামী দিনের শক্তি সংকটে একটা সবিশেষ ও একক ভূমিকা পালন করবে।

সৌরশক্তিচালিত হাইড্রোজেন জেনারেটর—সূর্যের আলোর সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে গ্লুকোজজাতীয় খাদ্য তৈরি করে তাতে প্রচুর হাইড্রোজেন নিহিত থাকে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এ হাইড্রোজেনকে গ্যাসীয় অবস্থায় সংরক্ষিত করে তাকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। নীলাভ সবুজ রংয়ের শৈবাল থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস পেতে তারা সক্ষম হয়েছে। জলে যে হাইড্রোজেন আছে তাকেও সূর্যের আলোর দ্বারা গ্যাসীয় অবস্থায় নিয়ে যেতে আমেরিকার দু-জন তরুণ গবেষক কৃতকার্য হয়েছেন। জলের মধ্যে আলোক শোষণকারী রুথেনিয়াম (**ruthenium**) মিশিয়ে সূর্যালোকের সাহায্যে জলের অণুকে ভেঙে গ্যাসীয় অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। এ ধরণের কাজে সাফল্য আসলেও এখনো এ নিয়ে বৃহৎ পরিকল্পনা নেবার মত অবস্থা আসে নি—তবে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্রদ।

মহাশূন্য থেকে শক্তি—রাতের বেলায় সৌর-শক্তি পাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের জিওসিন্‌ক্রোনাস কক্ষে (**geocynchronous orbit**) কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের মাধ্যমে সৌর প্যানেলে রূপান্তরিত বিদ্যুৎ শক্তিকে মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন (**microwave transmission**) করে পৃথিবীপৃষ্ঠে গ্রহণ করার বাস্তব পদক্ষেপ আজ সাফল্যের দ্বারে উপনীত। এভাবে পাওয়া শক্তির পরিমাণ ও দক্ষতা ভূপৃষ্ঠ থেকে **15** গুণ বেশি। তবে এ পদ্ধতির উন্নত প্রাকৌশলিক ও কারিগরি দিক এবং ব্যয়বহুলতা স্বল্প উন্নত দেশগুলিকে একটু নিরাশ করলেও হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

অর্থনৈতিক প্রগতি ও প্রকৃতি সংরক্ষণ

ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র*

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রকৃতির বস্তুসমূহের মধ্যে গড়ে উঠে সাম্যাবস্থা। কোন কারণে এক বা একাধিক বস্তুর অংশ বিশেষের অবলুপ্তি ঘটালে সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। এই কারণে প্রকৃতি সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিকমত সংরক্ষিত না হলে মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য একথা চিন্তা করে পৃথিবীর সকল দেশের মনীষীরা প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। একই সঙ্গে সারা দুনিয়ার নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা প্রকৃতি ও পরিবেশ বিজ্ঞানের নানা দিক দিয়ে আলোচনাও শুরু করেছেন। গত কয়েক বছর আগে ষ্টকহোমে (Stockholme) অনুষ্ঠিত পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা-চক্রের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমস্যা কত জটিল।

একথা ঠিক যে উন্নত ও উন্নয়নশীল – উভয় দেশের চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়কেরা পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ব্যাপারে একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এই সকল সমস্যার প্রধান কারণ কলকারখানা, নানারকম যানবাহন প্রভৃতির বর্জ্য পদার্থের জন্যে সৃষ্ট দূষিত পরিবেশ, দারিদ্র্য প্রভৃতি। এই অবস্থায় প্রগতিশীল দেশ, যথা ভারত, বিশেষ করে যে সকল দেশের বেশির ভাগ নাগরিক অশিক্ষিত ও প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ— সেই সকল দেশের সরকারের সামনে অর্থনৈতিক প্রগতির ব্যাপারে দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রথমটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে বিভিন্ন প্রকল্প চালু রাখায় পরিবেশ সমস্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় সেদিকে নজর রাখা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে দূষিত পরিবেশ সমস্যাকে কিভাবে এড়ানো যায় তার চেষ্টা করা।

সাধারণভাবে দেখা যায় প্রাচ্যের জীবন-যাত্রা প্রকৃতির সঙ্গে যত ওতপ্রোতভাবে জড়িত পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা তত গভীর সম্পর্কযুক্ত নয়। এই কারণেই বোধ হয় সাধারণ প্রাচ্যবাসীর চাহিদা যে কোন পাশ্চাত্যবাসী থেকে অপেক্ষাকৃত কম। এসত্ত্বেও প্রাচ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশের দুরবস্থা সহজেই চোখে পড়ে। এর প্রধান কারণ প্রাচ্যবাসীদের কতকগুলি বেহিসাবী, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিহীন অভ্যাস। প্রথম উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শিফ্‌টিং কাল্‌টিভেশন। এই অভ্যাস সাধারণভাবে পার্বত্য ও অরণ্য উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বনের খানিকটা অংশ কেটে পরিষ্কার করে চাষ-আবাদ করা হয় কয়েক বছর। তার পর আবার ঐ জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় আবাদ শুরু হয়। কয়েক শত বছরের পুরনো বনাঞ্চল ধ্বংস করায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয় উদাহরণ গৃহপালিত পশুর বনাঞ্চলে বিচরণ। সভ্যতার আদি যুগ থেকে দরিদ্র লোকেরা গরু, মহিষ, ছাগল পোষা ও তাদের জনসাধারণের জমিতে চরতে

* 398 দমদম পার্ক, কলিকাতা-700 055

দেওয়া জন্মগত অধিকার বলে মনে করেন। ঐসকল পশু সব গাছপালা খেয়ে তরুলতাবিহীন পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এইভাবে শুষ্ক মরু অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। গবাদি পশুর বনাঞ্চলে বিচরণ দেশের অর্থনীতিতে কত ক্ষতি করে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গুজরাটের গির অভয়ারণ্যে পরিচালিত একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে অঞ্চলে গবাদি পশু ও মানুষ যাতায়াত করে সে সকল অঞ্চলে হেক্টর প্রতি বার্ষিক ঘাস উৎপাদন হয় 475 কিলোগ্রাম। অন্যদিকে বনের যে অংশে গবাদিপশু ও মানুষ যাতায়াত করে না সেখানে ঘাসের বার্ষিক উৎপাদন দাঁড়ায় হেক্টর প্রতি 4500 কিলোগ্রাম। অতএব বলা যায় ভারতবাসী যদি গৃহপালিত জীবের বিচরণ ও জমি সংরক্ষণের কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা মেনে চলতো তবে বার্ষিক ঘাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেত দশগুণ। অনুরূপভাবে বহু তরুলতার উৎপাদন বৃদ্ধি পেত মনে করা অন্যায় হবে না। তৃতীয় উদাহরণ, গাছের গুড়ি বা ডালপালাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার। আধুনিক যুগে নানারকম জ্বালানী/অগ্নি উৎপাদনকারী যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও বনজ সম্পদকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হ্রাস পায় নি; বরং গত পনেরো বছরে (1960-61 থেকে 1975-76) ভারতে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় 35 ভাগ। শত শত বছরের পুরনো এই সকল বেহিসেবী আচরণ আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তার হিসেব করতে সময় লাগবে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে দেখা দিয়েছে বাসস্থান সমস্যা ও খাদ্য সমস্যা। খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশে আধুনিক কালে নানা রকম সংকর বীজের সাহায্যে অধিক ফলন চাষের আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে বহু সুগুণের অধিকারী বিভিন্ন প্রজাতি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। স্মরণ রাখা দরকার, বন্য বীজের অভাব ঘটলে সংকর বীজ সুগুণের অধিকারী হতে পারবে না, ফলে সহজেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এ সব ছাড়াও রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বহু উপকারী প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কয়জন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া দুষ্কর। ভারতে সাধারণভাবে হেক্টর প্রতি প্রায় 200 গ্রাম কীটনাশক ব্যবহার করা হয়; আর পশ্চিম জার্মানীতে হেক্টর প্রতি কীটনাশক ব্যবহার হয় প্রায় দশ হাজার গ্রাম। এই একটি উদাহরণ থেকে আন্দাজ করা যায় পশ্চিমের পরিবেশ প্রাচ্য অপেক্ষা কত দূষিত। ভারতের জনসাধারণের সামনে প্রশ্ন, তাঁরা পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করে পরিবেশকে আরও দূষিত করে নিজেদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করবেন—না বিভিন্ন কীটনাশক জীব আবিষ্কার করে ক্ষতিগ্রস্ত জীবের ধ্বংস আনবেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি যদিও খুবই ভাল তবে সময়সাপেক্ষ। কারণ কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না কবে বা কতদিনের মধ্যে কীটনাশক জীব আবিষ্কার হবে। অন্যদিকে পেটের ক্ষুধা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজী নয়।

আবাসস্থলের সমস্যা ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্যেই চাই জমি ও অর্থ। বনজসম্পদ বেশ চড়া দরে বিক্রি হয়। বছরে দু-শ' কোটি ডলার মূল্যের বনজ সম্পদ রপ্তানী হয় কেবল মাত্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি থেকে। এ ব্যতীত বন পরিষ্কার করে গৃহনির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন, চা, কফি, রবার, ইউক্যালিপ্‌টাস প্রভৃতি মুদ্রা অর্জনকারী গাছের চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই সারা ভারতে মাত্র তেইশ শতাংশ জমি অরণ্যাবৃত আছে যদিও জাতীয় অরণ্য নীতি অনুযায়ী ভারতের তিরিশ শতাংশ জমি অরণ্যাবৃত থাকার কথা। বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে নানারকম ক্ষতির সঙ্গে বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিগত পঁচিশ বছরে বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ-শ' কোটি টাকা।

বনের শীতল ছায়ার অবলুপ্তির সঙ্গে বহু বন্য প্রাণী নীরবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। অনেকেরই ধারণা নেই সভ্যতার আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কত প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন প্রতি বছর-ই পৃথিবীর কোন-না-কোন অঞ্চলে একটি করে প্রজাতি লোপ পেয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বন্যজীব ধ্বংসের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজাতির সঙ্গে তার নিষ্কলঙ্ক পরিবেশের গুরুত্ব বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন। তাই আধুনিক যুগে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সুন্দর করে তোলার একটি হাতিয়ার হিসেবে ধরা হয়। ভারত সরকার অবশিষ্ট বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে বন্যপ্রাণীর জীবনযাত্রা, সংরক্ষণ, পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্যে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ ধার্য করেছেন। অন্যান্য দেশের সরকারও তাঁদের নিজেদের বন্যপ্রাণী রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রয়োজন মত বন্যপ্রাণী ও বন্য পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন সরকারের উৎসাহ দেখে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে বড় বড় শহরের অধিবাসীরা ধোঁয়াশার (smog) কবল থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ সবল জীবন-যাপন করবে, দূরে হয়ে যাবে নানা রোগ, ফিরে আসবে মুক্ত বায়ু, নির্মল আকাশ, সুগুণের অধিকারী খাদ্যসম্ভার।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর জুলাই '78 সংখ্যা "আইনষ্টাইন" সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে, এতে আইনষ্টাইন-এর জীবনী এবং বৈজ্ঞানিক অবদান সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর রচনা থাকবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক কপি ছাপা হবে। "আইনষ্টাইন সংখ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞান" এজেন্টদের কত কপি প্রয়োজন তজ্জন্য তাঁদেরকে সত্বর পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

কালাজ্বর ও স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

গত কয়েক মাসে কালাজ্বর এই শব্দটা বেশ কয়েকবারই খবরের কাগজে দেখা গেছে। আজকাল এই শব্দটার সঙ্গে অনেকের পরিচয় নেই বললেই চলে। তবে এটা যে একটা অসুখের নাম তা কাউকে নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। কালাজ্বর রোগ নতুন নয়। প্রাচীনকালের পুঁথিপত্র থেকে জানা যায় যে ভারত, চীন, আফ্রিকা, গ্রীস, ইতালী এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এ রোগ একসময় মানব সভ্যতাকে আতংকিত করে তুলেছিল। এই রোগে পিলে বড় হয়। ক্রমশ রক্তশূন্যতা বাড়ে। রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমতে শুরু করে। সর্বশেষে জল জমে সারা দেহ ফুলে ওঠে। এর পর একদিন মৃত্যুই রোগীকে মুক্তি দেয়।

ভারতে আসাম, বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজে চিরদিন এই রোগে মানুষ ভুগেছে আর প্রাণ দিয়েছে। তবে বাংলা আর আসামেই ছিল এর ভয়াবহতা সবচেয়ে প্রবল।

1859 সালে বর্ধমানে কালাজ্বর মহামারীরূপে দেখা দেয়। দশ বছরের মধ্যে আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। 1856-59 সালে পাটনাও এই রোগের কবলে পড়ে। পাণ্ডুয়াতে 1862 সালে ছয় মাসে 1200 লোকের মৃত্যু হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের স্যানেটারী কমিশনারের রিপোর্টে দেখা যায় 1877 সালে মহামারী আক্রান্ত গ্রামগুলিতে 70 শতাংশ লোক প্রাণ হারান। আসামে গারো পাহাড়ে, কামরূপে ও গোয়ালপাড়ায় কালাজ্বর মহামারীতে শতকরা 31·5 জন রোগী প্রাণ হারান। আসামের গাড়ো প্রদেশের অধিবাসীরা এ রোগকে বলত 'কালাহাজর'। অনুমান করা যায় তাই থেকেই এ রোগের নামকরণ কালাজ্বর (Kalazar)।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই সারা পৃথিবী জুড়ে এ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন একই সঙ্গে বহু সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানী। ফাইলেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কারক ও ম্যালেরিয়া গবেষণায় স্যার রোনাল্ড রসের পরামর্শদাতা স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন 1903 সালে ঘোষণা করলেন, এক ধরনের প্যারাসাইট বা পরজীবী কীটাণুই এই রোগের কারণ। ইংল্যাণ্ডের নেট্লী হাসপাতালের

ডাক্তার লিশম্যান 1900 সালে এক রোগীর পিলের মধ্যে স্লিপিং সিক্‌নেসের প্যারাসাইটের মত এক ধরণের কীটাণু লক্ষ্য করেছিলেন। ম্যানসনের ঘোষণার পর তিনি এর উপর এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এ প্রবন্ধের প্রকাশের আগেই 1900 সালে জনৈক অনুসন্ধানী ডোনোভ্যান এই পরজীবী কীটাণুর উপর এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় ঠিক একই সময়ে জার্মানীর হামবুর্গ হাসপাতালে জ্বরে মৃত এক চীনা সৈন্যের লিভার, পিলে ও হাড়ের মজ্জায় অনুরূপ এক প্যারাসাইট পাওয়া গেল। 1903 সালের ডিসেম্বরে ভারতের দার্জিলিং থেকে জ্বর গায়ে একরোগী হাজির হলেন ম্যানসনের বাড়িতে লণ্ডনে। তিনি রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন যে তার রক্ত লিশম্যান ডোনোভ্যান বর্ণিত কীটাণুতে ভরা। এই প্যারাসাইটের নাম হল 'লিশম্যান-ডোনোভ্যান-বডিস'। কালাজ্বর ম্যালেরিয়ারই রকমফের এই ধারণা পাল্টে গেল। সবাই বুঝল কালাজ্বর সম্পূর্ণ এক আলাদা ধরনের কীটাণুর দেহেতে অনুপ্রবেশেরই ফল। জানুয়ারী 1906 সাল। 'কালাজ্বরের বিভিন্ন রূপ' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল কলকাতা থেকে। লেখক ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের মেডিসিনের শিক্ষক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

1873 সালের 19শে ডিসেম্বর উপেন্দ্রনাথের জন্ম। বাবা রেলওয়ের খ্যাতনামা চিকিৎসক, ভাবলেন ছেলে তাঁরই মত ডাক্তার হবেন। ডাক্তারী পড়ানোর অভিপ্রায়ে উপেন্দ্রনাথকে ভর্তি করলেন হুগলী কলেজে। কিন্তু ছেলের ঝোঁক অধ্যাপনার প্রতি। আগ্রহ গণিত ও রসায়নে। হুগলী কলেজ থেকে অংকে অনার্স নিয়ে উপেন্দ্রনাথ স্নাতক হলেন। কিন্তু পিতার আগ্রহে আবার তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হল। অনায়াসেই তিনি এল. এম. এফ (L.M.F.) ও পরের বছর 1899 সালে এম. বি. (M.B.) ডিগ্রি পেলেন। এখানে উল্লেখ্য তিনি সার্জারী ও মেডিসিনে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেন। এরই ফাঁকে একসময় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জন করেন। অধ্যাপনার কাজ নিয়ে উপেন্দ্রনাথ চলে আসেন সোজা ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে। সরকারী চাকুরী। তাঁর সারাদিনই কাটত অধ্যাপনায়—চিকিৎসা আর গবেষণায়। 1902 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. (M.D.) ডিগ্রী অর্জন করেন এবং 1909 সালে 'রক্তকণিকা গলে যাওয়া' বা হিমোলাইসিসের উপর গবেষণার মৌলিকত্বে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী পান। ঠিক এই সময়েই তিনি বদ্‌লী হয়ে এলেন ক্যাম্পবেল হাসপাতালে। সুযোগ্য শিক্ষক হিসেবে অল্প দিনের মধ্যেই উপেন্দ্রনাথের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল সুনাম চিকিৎসক হিসেবেও। হাসপাতালের চাকুরী ও রোগীদের চিকিৎসা এই নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে সারাদিন কেটে যেত। নাওয়া খাওয়ার সময়ও পেতেন না। কিন্তু এরই ফাঁকে তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর গবেষণা। পরীক্ষাগার ক্যাম্পবেল হাসপাতালের ছোট একটি ঘর। এ ঘরে না ছিল ইলেকট্রিসিটি না গ্যাসের বন্দোবস্ত। কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে রাতের পর রাত তিনি তাঁর অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন কঠোর অধ্যবসায় সম্বল করে।

1904 সালে স্যার লিওনার্ড রজার্স কালাজ্বর সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের নাম 'লিশম্যান ডোনোভ্যান বডিস ইন ম্যালেরিয়াল ক্যাচেকসিয়া অ্যান্ড কালাজ্বর'। এর দু' বছর পরই প্রকাশ হয় উপেন্দ্রনাথের গবেষণা-পত্র।

আগে কুইনাইন দিয়ে কালাজ্বরের চিকিৎসা করা হত। কিন্তু বিশেষ সুফল কিছুই পাওয়া যেত না। মৃত্যু এই রোগে 98 শতাংশ মানুষের জীবনে বিভীষিকা এনে দিয়েছিল। 1913 সালে দক্ষিণ আমেরিকায় কালাজ্বরজনিত চামড়ার রোগে ডাঃ ভি আন্না অ্যান্টিমনি টারটারেট ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল পান। 1915 সালে বাচ্চাদের কালাজ্বরের চিকিৎসায় অ্যান্টিমনি টারটারেটের ব্যবহার শুরু হয়। এই একই বছরে স্যার লিওনার্ড রজার্স ভারতে কালাজ্বরের চিকিৎসায় শিরায় এই ওষুধ ইন্জেকসন দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু ক্যাম্পবেল হাসপাতালে উপেন্দ্রনাথ দেখলেন এই ওষুধের প্রয়োগে রোগীর বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাঁর মনে হল, এর বদলে সোডিয়াম-অ্যান্টিমনিল-টারটারেট ভাল ফল দেবে। সত্যিই তাই, এই নতুন ওষুধ আগের ওষুধের তুলনায় অনেক বেশি নির্বিষ এবং কার্যকরী। 1915 সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে তাঁর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। তাঁর এই নতুন ওষুধ চিকিৎসায় ব্যবহার করা শুরু হল। এদিকে উপেন্দ্রনাথ খুঁজে ফিরছেন আরও কার্যকরী ওষুধ যা দিতে পারে লক্ষ লক্ষ কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীকে নতুন জীবন। ইলেকট্রোলাইসিসের সাহায্যে অ্যান্টিমনি ধাতুর সূক্ষ্মতম গুঁড়া প্রস্তুত করে তিনি রোগীর দেহে ইন্জেকসন করে আগের থেকে আরো কিছু উৎসাহজনক ফল পেলেন। প্রবন্ধ বেরল 1916 সালের জানুয়ারীতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে। সেই বছরেরই এপ্রিল মাসে এসিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখায় এই পদ্ধতিতে কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীকে কি করে রোগমুক্ত করা হয়েছে তার বিবরণ দিলেন। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েসন 1919 সালে উপেন্দ্রনাথকে তাঁর গবেষণা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অর্থ সাহায্য করলেন।

ধাতব অ্যান্টিমনি ভাল ফল দিলেও রোগীর দেহে প্রয়োগ করায় অনেক অসুবিধা আর সোডিয়াম অ্যান্টিমনিল টারটারেটের দ্বারা রোগ সারাতে দীর্ঘদিন লাগে। উপেন্দ্রনাথ মন দিলেন আরো ভাল ওষুধ আবিষ্কারে।

কেমোথেরাপির জনক পল আরলিক আরসেনিক (As)ঘটিত জৈব পদার্থ অ্যাটকসিল থেকে স্যালভারসন তৈরি করেছিলেন। অ্যাটকসিল স্লিপিং সিক্‌নেস রোগীর উপর ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। আবার কালাজ্বরের প্যারাসাইট আর স্লিপিং সিক্‌নেসের প্যারাসাইটে অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার কালাজ্বরে অ্যান্টিমনি ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া গেছে। উপেন্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন অ্যাটকসিলে আর্সেনিকের জায়গায় অ্যান্টিমনি (Sb) প্রতিস্থাপিত করলে কেমন ফল পাওয়া যায় দেখাই যাক না। রসায়নের এম-এস-সি উপেন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টাতে তৈরি করলেন পি-অ্যামিনো-ফিনাইল-ষ্টিবিনিক অ্যাসিড (p-amino-phenyl-stebenic-acid)। আশ্চর্য! এ ওষুধ ব্যবহারে আগের সব ওষুধের চেয়ে ভাল ফল পাওয়া গেল। কিন্তু পাওয়া গেলে কি হবে এ ওষুধ সম্পূর্ণ নির্বিষ নয়। তাই কি উপায়ে সম্পূর্ণ নির্বিষ ওষুধ প্রস্তুত করা যেতে পারে তার সন্ধানে উপেন্দ্রনাথ গবেষণা সুরু করলেন। দিনরাত তাঁর ধ্যান কালাজ্বরের ওষুধ চাই-ই চাই। উপেন্দ্রনাথ সারাদিন এক রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে অপর এক রাসায়নিক দ্রব্যের

বিক্রিয়া ঘটিয়ে খুঁজে চললেন কালাজ্বরের মহৌষধি। এই সময় ম্যালেরিয়ার প্রচলিত এক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ম্যালেরিয়া রোগীকে সাংঘাতিক ব্যথা থেকে রেহাই দেবার জন্যে শুধু কুইনাইনের ইনজেকসন না দিয়ে কুইনাইনের সঙ্গে ইউরিয়ার বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক ধরনের কুইনাইন-ইউরিয়া যৌগ ইনজেকসন করা হত। উপেন্দ্রনাথ পি-অ্যামিনো-ষ্টিবিনিক অ্যাসিডের সঙ্গে ইউরিয়ার বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রস্তুত করলেন ইউরিয়া-ষ্টিবামাইন। পরীক্ষার এবং রোগাক্রান্ত শরীরে প্রয়োগে দেখা গেল এই ইউরিয়া ষ্টিবামাইন যৌগ অতি দ্রুত কালাজ্বরের পরজীবী কীটাণু ধ্বংস করে অথচ রোগীর কোন ক্ষতি হয় না। অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে কলকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালের একতলার এক অপরিসর ঘরে ইলেকট্রিক বা গ্যাসের সাহায্য না পেয়ে লণ্ঠনের আলোতেই পরীক্ষা চালিয়ে বাংলার সন্তান উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করলেন। এটা ছিল 1921 সাল। এর পর এর এক বিস্তারিত বিবরণ বেরল অক্টোবর 1922 সালে। ইউরিয়া ষ্টিবামাইন-এর ব্যবহার ভারতবর্ষের গণ্ডী ছাড়িয়ে চীন দেশে গিয়ে পৌঁছল। দশ বছরের মধ্যে কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হার কমে এল হুহু করে। 1925 সালে ভারতে কালাজ্বর আক্রান্তের সংখ্যা 60,940 জন আর 1935 সালে 11,110 জন। 1925 সালে আসামে কালাজ্বরে মৃত্যু হয় 6365 জনের এবং 1935 সালে 845 জনের। মৃত্যুহার শতকরা 98 থেকে 2 শতকরায় নেমে এল।

এবার আসতে লাগল সম্মান। 1921 সালে উপেন্দ্রনাথ পেলেন মিণ্টো পদক। 1924 সালে সরকার কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রদান করলেন আর ভারতের বড়লাট তাঁকে নাইটহুড-এর সম্মানে ভূষিত করলেন।

উপেন্দ্রনাথ সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে নিজ গবেষণাগার খুললেন। চিকিৎসা করে উপার্জন করলেন প্রভূত অর্থ। তিনি দান করতেনও দু-হাতে। এই দানের জন্যে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ অ্যাণ্ড সেণ্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। তিনিই ছিলেন ঐ পদে প্রথম ভারতীয়। বাংলার সেণ্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন আবার সহকারী সভাপতি ও বাংলার লাটসাহেব সভাপতি। বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটি পরপর তিনবার তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করেন।

বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে সত্যানুসন্ধানী ও মানবদরদী। তাঁর দানের হিসেবের তালিকায় দুঃস্থ পরিবার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক্স ইনস্টিটিউট প্রভৃতি কেউই বাদ যায় নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আপনাকে গবেষণায় নিযুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর লিখিত গবেষণাপত্র, পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় দেড়-শ'। আজও দেশ-বিদেশের গুণীজনের কাছে সেগুলি সমাদৃত হয়।

1946 সালের 6ই ফেব্রুয়ারী 73 বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এই প্রবন্ধের শেষ এখানেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই অংশটুকু ব্যতিরেকে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লেখার প্রথমেই বলেছি, "গত কয়েক মাসে 'কালাজ্বর' এই শব্দটা বেশ কয়েকবারই

খবরের কাগজে দেখা গেছে।" হ্যাঁ, বিহারের ও বাংলার কিছু অংশে কিছুদিন আগে বেশ কিছু রোগীর রক্তে এই রোগের কীটাণু পাওয়া গেছে। এই রোগ আর যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' কলকাতার যে কোম্পানী প্রস্তুত করতেন, তারা এর উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—যে কয়জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলা এবং ইউরিয়া ষ্টিবামাইন ওষুধটির সীমিত উৎপাদন চালু করা যাতে এই কালাজ্বর ভবিষ্যতে বিভীষিকার রূপ ধারণ করতে না পারে।

অরূপ রায়*

* 48, রাজেন্দ্র নগর, সাকৃচি, জামসেদপুর, বিহার

শূন্যে কেন বজ্রনাদ

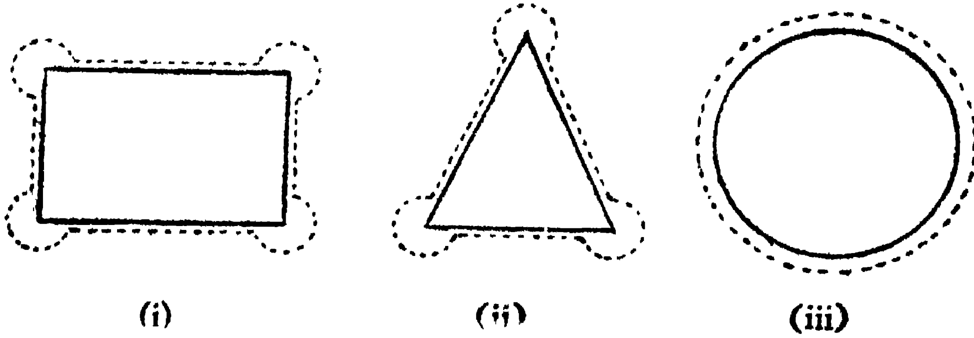
আকাশ কি প্রকৃতই শূন্য? -অন্তত যতদূরে মেঘ থাকে? মেঘ তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি– মাটি থেকে প্রায় দেড় মাইল উপরে ভাসমান। আকাশ যদি শূন্য হয়, তাছাড়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল **(gravitational force)** আছে, তবে কার উপর ভিত্তি করেই বা মেঘ ভেসে থাকবে?

আসলে মেঘের নিচে (উপরেও প্রায় ছয়-শ' মাইল পর্যন্ত) আছে বায়ুমণ্ডল ও অন্যান্য অনেক গ্যাসের স্তর। মেঘে উপস্থিত জলকণাগুলি যেসব গ্যাসীয় পদার্থের চেয়ে হাল্কা, তাদের উপর ভর করে ভেসে বেড়ায়।

এখন প্রশ্ন হল, ঐ মেঘ থেকে বজ্রনাদ শোনা যায় কিভাবে এবং বজ্রপাত-ই বা আসে কোথা থেকে? বজ্রনাদ এবং বজ্রপাত-এর কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমে পরিবাহীর পৃষ্ঠে আধান বন্টন এবং আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

যে কোন বস্তুকে কোন নির্দিষ্ট বস্তু দিয়ে ঘষলে ঐ বস্তুতে তড়িতের উদ্ভব হয়, (যেমন, কোন কাচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে ঐ দণ্ডে ধনাত্মক তড়িৎ উৎপন্ন হয়; আবার এবোনাইট দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে এতে ঋণাত্মক তড়িৎ উৎপন্ন হয়) অর্থাৎ বস্তু দুটির মধ্যে ইলেকট্রনের (বস্তুর পরমাণুতে অবস্থিত ঋণাত্মক তড়িৎ কণা) বিনিময় ঘটে। তখন বস্তুকে তড়িতাহিত বস্তু বলে; যার ধর্ম হল কেবল উপরের পিঠে আধান **(charge)** ধরে রাখা। বস্তুটি যদি এবড়ো-খেবড়ো হয় তবে সূচালো অংশে তা বেশি আধান রাখবে আর অপেক্ষাকৃত মসৃণ বা নিচু অংশে কম আধান রাখবে। একেই বলে আধান বন্টন। পরপৃষ্ঠার চিত্র থেকে তা বোঝা যাবে। কাটা লাইনগুলি আধান ধরে নিতে হবে।

এবারে আসা যাক তলমাত্রিক ঘনত্বের কথায়—বস্তুপৃষ্ঠে কোন বিন্দুর চারদিকে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে যত পরিমাণ আধান থাকবে, তা-ই বস্তুটির তলমাত্রিক ঘনত্ব **(surface density)** বোঝাবে।



সুতরাং বোঝা গেল অমসৃণ বস্তুর সুচালো অংশের তলমাত্রিক ঘনত্ব মসৃণ অংশের চেয়ে বেশি।

তড়িতাহিত বস্তুর **(charged body)** আর একটি ধর্ম হল কাছাকাছি অবস্থিত অন্য কোন বস্তুর উপর আবেশ **(induction)** সৃষ্টি করা। যাকে বলে তড়িতাবেশ **(electrostatic induction)** অর্থাৎ, ঐ বস্তুটিকেও তড়িতাহিত করা; তবে সম-আধানে না—বিপরীত আধানে। (প্রথম বস্তু ধনাত্মক হলে দ্বিতীয় বস্তু হবে ঋণাত্মক)।

এই ঘটনাই ঘটে বজ্রপাত তথা বজ্রনাদের ক্ষেত্রে। মেঘ এখানে তড়িতাহিত বস্তুর কাজ করে; তবে রেশম, পশম অথবা কোন যন্ত্রের দ্বারা আহিত হয় না। সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনী **(ultra-violet)** রশ্মি, মহাজগত থেকে বিকিরিত মহাজাগতিক **(cosmic)** রশ্মি, পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় **(radio-active)** পদার্থ (সাধারণত ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম) থেকে নির্গত রশ্মির ক্রিয়ায় এবং অন্যান্য অজ্ঞাত অনেক কারণে আহিত হয়। একটি তড়িতাহিত মেঘ অপর একটি মেঘের উপর আবেশ সৃষ্টি করে। ফলে দুই বিপরীত আধানের মধ্যে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের **(electric spark)** সৃষ্টি হয়; যা বিদ্যুৎ ঝলক হিসাবে দেখা যায়।

বজ্রপাতের ক্ষেত্রে মেঘের সঙ্গে পৃথিবী-পৃষ্ঠের তড়িতাবেশ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত উঁচু অথচ মসৃণ স্থানে তড়িতাধান বেশি জমা হয়। কারণ সুচালো না হওয়ায় তড়িৎ মোক্ষণ **(electric discharge)** হয় না। অর্থাৎ আধান বেরিয়ে **(leak)** যায় না। (সুচালো মুখের তলমাত্রিক ঘনত্ব বেশি বলে পারিপার্শ্বিক বায়ুকণার সঙ্গে আবেশ সৃষ্টি হয়ে আধান ক্ষয় হয়।) ফলে মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে বিভব প্রভেদ **(potential difference)** ক্রমে বাড়তে থাকে। তাই এক সময় মেঘ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটি বিরাট অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। এটাই বজ্রপাত।

বজ্রনাদের কারণটাও বেশ সোজা। পৃথিবী ও মেঘের মধ্যে অথবা মেঘে-মেঘে যে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় তাতে পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডল তথা গ্যাসীয় মণ্ডল হঠাৎ প্রচণ্ড গরম হয়ে

পড়ে ও প্রসারিত হয়। আবার এই হঠাৎ প্রসারণের ফলে বায়ুমণ্ডল তথা গ্যাসীয় মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এর ফলে এবং পাশের ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ুর চাপের ফলে সঙ্কোচন হয়। এই সঙ্কোচন প্রসারণ এত দ্রুত ও প্রবল হয় যে, বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ-ই শব্দ-তরঙ্গ (sound-wave) বা বজ্রনাদ হিসাবে শোনা যায়।

বড় বড় অট্টালিকা কলকারখানার উঁচু দালান প্রভৃতিকে বজ্রপাতের হাত থেকে নিস্তার দেবার জন্যে যে বজ্রনিবারক (lightning arrester) তৈরি হয় তা বস্তুর তলমাত্রিক ঘনত্ব-সূত্রের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। একটি বিদ্যুতের সুপরিবাহী (সাধারণত তামা বা লোহা) তারের মাথায় কতকগুলি সূচালো ফলা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই মাথাটিকে অট্টালিকার ছাদের আরও কিছু উপরে রেখে নিম্নাংশ অট্টালিকার গা ঘেসে নামিয়ে মাটিতে গভীরভাবে পুঁতে দেওয়া হয়। মেঘ ও তারের মধ্যে তড়িতাবেশের ফলে যে তড়িতাধান সৃষ্টি হয়, তার বেশির ভাগই তারের মাধ্যমে পৃথিবীতে চলে যায়। কিন্তু সূচালো অংশে তলমাত্রিক ঘনত্বের ফলে আধান থেকে যায়। এই আধান তার-সংযুক্ত বায়ুকণাগুলিকে সমতড়িতে আহিত করে। ফলে বিকর্ষিত হয়ে তড়িতাহিত বায়ুকণা মেঘের দিকে ধাওয়া করে এবং আধানকে প্রশমিত করে। তাই মেঘ ও অট্টালিকার মধ্যে বিভব-প্রভেদ বেশি হতে পারে না। ফলে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ তথা বজ্রপাত হবারও সম্ভাবনা থাকে না।

মৃগাঙ্কমৌলী মণ্ডল*

* 2/35, যতীনদাস নগর কলিকাতা-700 056

দুঃখ প্রকাশ

1977 সালের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পূজা সংখ্যায় ["জ্ঞান ও বিজ্ঞান" অক্টোবর-নভেম্বর, 1977] বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরে প্রকাশিত শ্রীসুব্রত ঘোষের [ইনি পরিষদের একজন সদস্য] "বিজ্ঞানের গল্প—প্লাষ্টিক সার্জারি" প্রবন্ধটি দেব সাহিত্য কুটির কর্তৃক প্রকাশিত শারদীয় সংকলন শুকসারীতে (1376) প্রকাশিত ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের "একটি আবিষ্কারের কাহিনী" প্রবন্ধের বহুলাংশে নকল বলে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (ইনি পরিষদের একজন প্রাক্তন সদস্য) লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের যথার্থতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্যে আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। ইতি—

রতনমোহন খাঁ
কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পরিবেশ দূষিতকরণ ও তা প্রতিকারের উপায়

[সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে 5ই জুন'78 বিশ্বপরিবেশ দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এই প্রবন্ধে পরিবেশ দূষণ এবং তার প্রতিকারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।]

পরিবেশ বলতে সাধারণত জল, হাওয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ ইত্যাদি বোঝায় যা ছাড়া জীব জগতের জীবনধারণ অসম্ভব। সুতরাং এই বিশুদ্ধ পরিবেশের প্রধান অঙ্গ জল ও হাওয়ায় বিভিন্ন পদার্থ মেশানোর ফলে জীবজগতের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই ঘটনাকে পরিবেশ দূষিতকরণ বলা যায়।

কিভাবে বোঝা যাবে যে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী এই বাতাস ও জল কি পরিমাণ দূষিত হয়েছে, কিসের জন্যে দূষিত হয়েছে ও কি পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে? এরূপ নানা ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষার সাহায্যে জানা যায় এবং সেই সঙ্গে প্রতিকার ও বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। এই পরিবেশ দূষিতকরণের উপরেই 1972 সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেছে। সেই সম্মেলনে পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে জীব-বিজ্ঞানীরা মানবজাতিকে পরিবেশ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। এমন কি কলকাতায় এই সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসেছিল; তাতে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। পরিবেশের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণগুলি হল—

(i) পৃথিবীর ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই অনুপাতে উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস।

(ii) জনবসতিপূর্ণ স্থানে নদীনালার পার্শ্ববর্তী স্থানে কলকারখানা স্থাপন।

(iii) যানবাহনের জ্বালানি হিসাবে কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসোলিনের ব্যবহার বৃদ্ধি।

(iv) পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির দ্বারা ক্রমাগত পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

(v) অধিক মাত্রায় কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার। ইত্যাদি।

সকলেরই জানা আছে যে, উদ্ভিদ ও মানুষের মধ্যে একটা বিরাট সম্পর্ক আছে। সমস্ত প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেন (O_2) গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ত্যাগ করে। কিন্তু উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মানব সভ্যতারও বিকাশ ঘটছে। মানুষ বাসস্থানের জন্যে বড় বড় জঙ্গল কেটে গৃহ নির্মাণ করছে, গ্রাম স্থাপন করছে, বড় বড় শহর, কলকারখানা ইত্যাদি তৈরি করছে। এর ফলে উদ্ভিদের সংখ্যা পৃথিবীতে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে এমন একদিন হয়ত আসতে পারে যখন পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কমে যাবে যেটা প্রাণীজগতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এছাড়া

উদ্ভিদের সঙ্গে প্রকৃতির একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে যা বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে। বর্তমান বিজ্ঞানীরা মনে করেন দেশের যত আয়তন আছে তার পাঁচ ভাগের একভাগ অরণ্য থাকা প্রয়োজন।

দেশের বড় বড় শহরে কলকারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আবহাওয়া পরিবেশকে ভীষণভাবে দূষিত করে তোলে। কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া যার মধ্যে কার্বনকণা, সালফার কণা, বিভিন্ন ধরণের ধাতু এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাসীয় পদার্থ যেমন কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড ফসফরাস, নাইট্রোজেন অক্সাইড, মিথেন, ইথেন ইত্যাদি হাইড্রোকার্বন ও ওজোন (O_3) প্রভৃতি মিশ্রিত থাকতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ব্রিটেনে প্রত্যেক বছর 60 লক্ষ টন সালফার ডাই-অক্সাইড বাতাসে নির্গত হয়।

এই সকল বিষাক্ত পদার্থ মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সালফার অক্সাইড গ্যাসটি বাতাসের সঙ্গে আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং জলীয় দ্রবণের সঙ্গে ক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করে যা ফুসফুসের মাংসে ক্ষত সৃষ্টি করে। সুতরাং এইভাবে কিছুকাল চলতে থাকলে ফুসফুসে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নাইট্রিক অক্সাইড রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ও চোখের অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কতকগুলি হাইড্রোকার্বন ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে। সূর্যের আলোয় হাইড্রোকার্বন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড মিলে পারক্সাসিল নাইট্রেট নামের **(peroxyacyl nitrate, PAN)** যৌগ তৈরি করে। এই **PAN** চোখের অস্বস্তিকর অবস্থা ও ফুসফুসের উপর ক্রিয়া করে।

বিষাক্ত পদার্থগুলি উদ্ভিদেরও প্রভূত ক্ষতি করে। যেমন অধিক সালফার গাছের নাইট্রোজেন বিপাকীয় পদ্ধতিতে বাধার সৃষ্টি করে। নাইট্রোজেনের অক্সাইড গাছের বৃদ্ধি বন্ধ করে। - ওজোন (O_3) বিভিন্ন গাছের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি করে। এছাড়া ওজোন তামাক গাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

এছাড়াও বড় বড় সমুদ্র, নদী, নালা, খাল, বিল, জলাশয় বিভিন্ন কারণে দূষিত হয়। সমুদ্র দূষিত হয় প্রধানত দুটি উপায়ে—যথা, পেট্রোল প্রভৃতি খনিজ তৈল দ্বারা এবং সমুদ্র ধারে অবস্থিত শহরের ও কলকারখানার নর্দমার জল, আবর্জনা ও বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের দ্বারা। বর্তমানে পৃথিবীতে তৈলশিল্প (oil industry) বিরাট আকার ধারণ করেছে। তৈলবাহী জাহাজের দ্বারা এখন সারা পৃথিবীতে বছরে 8×10^8 টন তেল পরিবাহিত হয় এবং জলকে দূষিত করে। একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—1967 সালে টোরি ক্যানিওন (Torrey canyon) নামে তৈলবাহী জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটবার পর 120000 টন তেল সমুদ্রের জলে নির্গত হয়েছিল। এর ফলে সমুদ্রের জল দূষিত হয়েছিল; প্রায় এক লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক পাখি ঐ অঞ্চলে মারা গিয়েছিল এবং বহু সামুদ্রিক মাছ, প্রাণী নষ্ট হয়েছিল। কলকারখানায় যে সব ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলি সরাসরি নদীনালা ইত্যাদিতে ফেলা হয়। বিষাক্ত পদার্থগুলি নদীর দ্বারা সাগরের জলের সঙ্গে মেশে। যার ফলে জলজ উদ্ভিদ, মাছ বা অন্যান্য প্রাণীর প্রভূত ক্ষতি হয়।

হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে ত্রিবেণী থেকে আরম্ভ করে হাওড়া পর্যন্ত বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠেছে। এই সব কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ একদিকে গঙ্গার জলকে যেমন দূষিত করছে অপরদিকে ঐসব কারখানার চিমনী থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া শহরতলীর জনবসতি এবং গাছপালাকে বিশেষভাবে ক্ষতি করছে।

দেশের দৃঢ় অর্থনৈতিক মূল কাঠামো নির্ভর করে নানারকম শিল্প বিপ্লবের উপর। সেই জন্যে চাই নতুন নতুন কলকারখানা। কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ এবং ধোঁয়া প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের ক্ষতিকারক। তাই বলে কি কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে? কিন্তু তা কোনদিন সম্ভব নয়। সুতরাং কতকগুলি সতর্কতামূলক আইন বের করতে হবে যাতে পরিবেশ এভাবে দূষিত না হয়।

যেমন—

(i) কলকারখানার চুল্লিগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যার থেকে কম দূষিত গ্যাস বের হয়।

(ii) কলকারখানার চিমনিতে এমন যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে যেটা বিষাক্ত গ্যাসকে শোষণ করে নেবে।

(iii) মারাত্মকভাবে দূষিত পরিত্যক্ত পদার্থগুলি বিভিন্ন প্রকার শুদ্ধির পর (treatment) মুক্ত করা যেতে পারে।

যানবাহন ব্যতীত আজকালকার সভ্য মানবসমাজ অচল, কিন্তু বর্তমান মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন এবং অন্যান্য যানবাহনগুলিতে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ও গ্যাসজ্বালানিকেই ব্যবহার করা হয়। পেট্রোলের সঙ্গে সামান্য সীসের (Pb) যৌগ মেশানো হয়। মানুষের প্রশ্বাসের সঙ্গে বা বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এই সীসা মানবদেহে জমে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি সীসা শরীরে জমলে স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে বা মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাস বা মোটরে জ্বালানির গ্যাসোলিনের কিছুটা জারিত না হয়ে বাতাসে মিশ্রিত হয়, যেটা বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গ্যাসোলিন-ওজোনাইড ও গ্যাসোলিন-পারক্সাইড গঠন করে। এই পদার্থ দুটি মানুষের এবং উদ্ভিদের খুব ক্ষতি করে। সুতরাং এর প্রতিকার হিসাবে এমন জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে যা থেকে বিষাক্ত গ্যাস না বেরোয়, যেমন বৈদ্যুতিক জ্বালানি। তাছাড়া যানবাহনগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার কারণ তা থেকে যেন উপযুক্ত প্রজ্বলনের অভাবে দূষিত গ্যাস বের হয়ে না আসে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত উন্নতির ফলে মানুষ আজ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। ক্ষমতালিপ্সু দেশগুলি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যেমন তাদের শক্তি জাহির করছে তেমনি নির্মল পরিবেশকে দূষিত করছে এবং নিরীহ মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রতিটি জীবকে তিলে তিলে ধ্বংস করছে। এই বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং পরে সেইগুলি বায়ুমণ্ডলে অন্যান্য মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নূতন নূতন পদার্থের (আইসোটোপ) সৃষ্টি হয়। কতকগুলি আইসোটোপ বাতাসে অনির্দিষ্টকাল অপরিবর্তিত অবস্থায়

থাকে। আস্তে আস্তে এইগুলি বৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীতে নেমে আসে ও বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে খাদ্যের সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি মানুষের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক উপাদান বা জিনের পরিব্যক্তি বা মিউটেশান (জিনের হঠাৎ পরিবর্তন) ঘটিয়ে দিতে পারে। তার ফলে মানুষের দেহে ক্ষতি হতে পারে এবং এই ক্ষতিকারক গুণগুলি বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হতেও পারে। অবশ্য এমনও দেখা গেছে পরিব্যক্তির ফলে নূতন গুণের সমাবেশ হতে পারে এবং বংশপরম্পরায় বাহিত হতে পারে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা আমাদের যে ক্ষতি হতে পারে তা নিচে দেওয়া হল ঃ—

(i) ক্যান্সার, লিউকোমিয়া, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি।

(ii) দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(iii) বংশানুক্রমিক বৈকল্য।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে দেহের পেশী, অস্থিমজ্জা ও রক্তকোষকে আয়নিত করে। সুতরাং তাকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি ওষুধ সামান্য প্রতিকার করতে পারে, যেমন—সাইনোকোবালেমিন বা ভিটামিন বি-12। পাইরাইডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড এই ওষুধটি লিউকোমিয়া, ডারমাটাইটিস ইত্যাদি রোগ দমনের ক্ষমতা রাখে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সরাসরি বায়ুমণ্ডলকে যাতে ক্ষতি না করতে পারে সে বিষয়ে আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা ওষুধের চেয়ে অনেক উপযোগী। প্রবাদ বাক্যটি **"Prevention is better than cure"** এখানে বোধ হয় বেশি প্রযোজ্য।

বর্তমানে দেশে দেশে জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবুজ বিপ্লবের **(green revolution)** জন্যে অভিযান চলছে অর্থাৎ অধিক ফসল উৎপাদনের জন্যে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টা চলছে। অধিক ফসল উৎপাদন করতে গেলে উদ্ভিদকে বিভিন্ন রকমের রোগও কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বর্তমানে যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ কীটনাশক (ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় (যেমন—ডি.-ডি.-টি, অ্যানড্রিন ইত্যাদি) সেগুলি অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ বিনাশ করে। তবুও সেগুলি ব্যবহারে অসুবিধা ও ক্ষতি আছে। যেমন—ঐ ওষুধগুলি অপরিবর্তিত অবস্থায় মাটিতে বা জলে থেকে যায় ও পরিবেশকে দূষিত করে। বর্তমানে ভারতে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ মাটিতে ও জলে 29 ভাগ ডি.-ডি.-টি আছে; যা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। (ii) কীট-নাশক ওষুধগুলি অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ছাড়াও অনেক উপকারী কীট-পতঙ্গকেও মেরে ফেলে (যেমন প্রজাপতি, মথ, মৌমাছি), (iii) অধিক মাত্রায় ওষুধগুলি ব্যবহৃত হলে এই বিষাক্ত দ্রব্যগুলির কিছু পরিমাণ শস্যদানায় সঞ্চিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদেহেও সঞ্চিত হয়। বিষাক্ত দ্রব্য সমন্বিত শস্যদানা এবং প্রাণীগুলিকে যখন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তখন তাদের শরীরও বিষময় হয়ে যায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। সুতরাং এমন কতকগুলি কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাকনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে যেগুলির নিম্নলিখিত সুবিধা আছে।

(i) কোন সুনির্দিষ্ট কতকগুলি দলের অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ বা ছত্রাক মারবে।

(ii) জল ও মাটিতে মিশে কিছু দিনের মধ্যে সেইগুলি অন্যান্য পদার্থে রূপান্তরিত হবে। তখন ঐগুলি কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন কোন কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করলে ঐ সকল অনিষ্টকারী পোকাদের মারা যাবে না, কারণ দীর্ঘদিন ওষুধ প্রয়োগের ফলে তাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে ওঠে, যা প্রাণীজগতের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। যেমন মশারা ডি. ডি. টির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে।

এই সব কারণে বিজ্ঞানীরা কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের বিকল্প পথ খুঁজে বের করার জন্যে গবেষণা করছেন। তাঁরা একটি পদ্ধতি বের করেছেন যার নাম 'বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোল' (biological control); অর্থাৎ সোজা বাংলা ভাষায় যাকে বলা যায় 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'। বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোল বলতে বোঝায় অনিষ্টকারী কোন প্রাণীকে অপর কোন পরিপূরক প্রাণীর (ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি) দ্বারা ধ্বংস করা, কিন্তু এর কোন খারাপ ফল থাকবে না, যা উদ্ভিদ বা অন্য কোন প্রাণীর ক্ষতি করে।

বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোল পদ্ধতি এবং প্রয়োগ কৃতকার্য হলে ক্ষতিকারক জীব বিনষ্ট করবার জন্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব ব্যবহার করবার প্রয়োজন হবে না, ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার ভয় থাকবে না।

অলোকেশ সামন্ত*

* কাঁচরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, কাঁচরাপাড়া, 24পরগণা

কারিগরী শিল্পে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

সূক্ষ্ম পরিমাপ এবং নিখুঁত গঠনকার্যে সহায়তা করার জন্যে কারিগরী শিল্পে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কোন কোন বস্তুতে স্বয়ংক্রিয় বিভাজন ঘটে। ফলে বস্তুটি নিম্নতর শক্তিস্তরের ভরে পরিণত হয় এবং বিকিরণ ঘটে। শক্তিস্তরের পার্থক্যজনিত বস্তুক্ষয় থেকে এই শক্তির উৎপত্তি। এই বিকিরণ অল্প শক্তি সম্পন্ন, যা একটা পাতলা কাগজ দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়, বা অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে যা কয়েক সেন্টিমিটার পুরু ইস্পাতের পাত ভেদ করে যেতে সক্ষম। এই বিকিরিত শক্তি প্রায় সব বস্তু দ্বারাই অল্প বিস্তর শোষিত হয় এবং বস্তুর এই শোষণ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বস্তুর স্থূলত্ব, ক্ষয় বা আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদির পরিমাপ করা সম্ভব।

কোন মৌল পদার্থের অনুরূপ সংখ্যক ইলেকট্রন এবং প্রোটন কিন্তু বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন নিয়ে গঠিত এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থকে প্রথম মৌল পদার্থের আইসোটোপ বলা হয়। একটি মৌল পদার্থের এক বা একাধিক আইসোটোপ থাকতে পারে যেমন ইউরেনিয়ামের আইসোটোপের সংখ্যা চৌদ্দ, হাইড্রোজেনের তিন।

দেখা যায় প্রকৃতি কোন কোন পরমাণুর গঠন বিশেষ পছন্দ করে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব পরমাণুর কোন পরিবর্তন হয় না। আবার কোন কোন পরমাণু সদাই অস্থির। তারা নিজেদের পারমাণবিক গঠনকে ভেঙেচুরে নতুন ভাবে সাজিয়ে নেবার চেষ্টায় সতত চঞ্চল। এই ভাঙাগড়ার মাঝে এসব পরমাণু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শক্তির বিকিরণ ঘটে। যখন কোন আইসোটেপ নিজেকে ভেঙে ফেলে কোন স্থির মৌলিক রূপ ধারণ করার কাজে ব্যাপৃত হয় তখন তাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এ পর্যন্ত প্রায় 900টি তেজস্ক্রিয় এবং 280টি স্থির আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য এ দুটি সংখ্যাই ক্রমশ বেড়ে চলছে।

কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিভাজিত হয়ে যখন স্থায়ী ভরে পরিণত হয় তখন নিউট্রন, তড়িৎ-আহিত কণা এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে। কোন বিকিরণ এককভাবে বা একসঙ্গে একাধিক প্রকারের হওয়াও সম্ভব। পদার্থের এই অবস্থাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় বিয়োজন (**radio active decay**)। এই বিকিরণ শক্তি যখন অপর কোন পদার্থের পরমাণুকে আঘাত করে তখন অনেক ক্ষেত্রে সেই পদার্থের পরমাণুর ভ্রাম্যমান ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে আয়নের সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে সূক্ষ্ম মাপজোখের ক্ষেত্রে এই আয়নের সহায়তা নেওয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবে বিভাজিত হয়ে কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের স্থায়ী মৌলে পরিণত হতে যে সময় লাগে তার হেরফের হয় না। আইসোটোপের কোন পরমাণু কখন বিভাজিত হবে তা বলা সম্ভব না হলেও একটি আইসোটোপের নির্দিষ্ট ভরের অর্ধাংশ কতক্ষণে সম্পূর্ণ বিভাজিত হয়ে অন্য মৌলে পরিণত হবে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কোন আইসোটোপের অর্ধেক ভর বিভাজিত হয়ে অন্য মৌলে পরিবর্তিত হতে যে সময় লাগে তাকে ঐ আইসোটোপের অর্ধজীবনকাল **(half life period)** বলা হয়। এই অর্ধজীবনকাল কোন আইসোটোপের ক্ষেত্রে সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক হাজার বছর হওয়া সম্ভব। নিচে কয়েকটি আইসোটোপের অর্ধজীবনকাল, বিকিরিত শক্তির চরিত্র ও শক্তির পরিমাপ দেওয়া হল।

	আইসোটোপ	অর্ধজীবন	বিকিরণ	শক্তি (Mev)
1.	থ্যালিয়াম 204	3·8 বছর	বিটা (−)	0·766
2.	স্ট্রনসিয়াম 89	52 দিন	বিটা (−)	1·46
3.	স্টনশিয়াম 90	28·1 দিন	বিটা (−)	0·546
4.	রুথেনিয়াম 106	1 বছর	বিটা (−)	0·039
5.	ইরিডিয়াম 192	75 দিন	বিটা (−)	0·67

	আইসোটোপ	অর্ধজীবন	বিকিরণ	শক্তি (Mev)
6.	সিজিয়াম	2·3 বছর	e^-	0·23
	134		β (—)	0·7
7.	সিজিয়াম	30 বছর	e^-	1·2
	137		গামা	0·6
8.	কোবাল্ট	5·3 বছর	β^-	1·48
	60			

(কারিগরী শিল্পে ব্যবহারের জন্যে সেই সব আইসোটোপকেই বেছে নেওয়া হয় যাদের অর্ধজীবন কাল কয়েক বছর বা মাস)

আলফা কণিকা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন দ্বারা গঠিত। এরা মূলত ইলেকট্রনবিহীন হিলিয়াম পরমাণু। এই বিকিরণের ভেদ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। কয়েকটা পাতলা কাগজই এদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

বিটা কণিকা ঋণাত্মক। এদের ভর সামান্য এবং বাতাসে কয়েক মিটার পর্যন্ত এদের দৌড়। তিন সেন্টিমিটার পুরু কাঠের টুকরো বা আধ সেন্টিমিটার অ্যালুমিনিয়ামের চাদর দিয়ে এদের প্রতিরোধ করা যায়।

গামা রশ্মি পদার্থ নয়, তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রবাহ। এদের গতি আলোর বেগের সমান। এরা বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে এবং সব রকম কঠিন পদার্থ ভেদ করতে সক্ষম। 30 সেন্টিমিটার পুরু ইস্পাত ভেদ করেও এই বিকিরণের যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এই তিন শ্রেণীর বিকিরণকেই ক্ষেত্র বিশেষে কারিগরী শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

শিল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত অপসরমান বস্তুর স্থূলত্ব নির্ধারণ করতে হয় এবং সময় বিশেষে এই স্থূলত্বের ইতরবিশেষ হলে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এ ধরনের প্রয়োজন দেখা দেয় কাগজ বা কৃত্রিম তন্তু বা কোন ধাতুর চাদর তৈরি করার সময়। যান্ত্রিক মাপন পদ্ধতিতে এ ধরনের কাগজ, তন্তু বা চাদর তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্পর্শ, ওজন বা ধ্বংস না করে তার স্থূলত্ব মাপা এবং তারতম্য ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা দূর করা সম্ভব নয় কিন্তু বিকিরণ পদ্ধতিতে তা সম্ভব।

যে বস্তুর স্থূলত্ব নির্ধারণ করা হবে তার একদিকে থাকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের আধার অপর দিকে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক। এই পরিমাপক মূলত একটা আয়ন কক্ষ। আয়ন কক্ষ অবস্থিত গ্যাসের অণুর সঙ্গে বিটা কণিকার সংঘর্ষের ফলে আয়ন দ্রব সৃষ্টি হয় এবং ঐ গ্যাস আয়নিত হয়। ঐ আয়ন কক্ষে যদি একটি ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বার রাখা হয় তাহলে মুক্ত ইলেকট্রন কণিকা এই তড়িদ্দ্বারের দিকে চলে আসবে। এর ফলে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প (প্রায় 10^{-9} অ্যাম্পিয়ার) হলেও পরিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে তা মাপা সম্ভব। যে বস্তুর স্থূলত্ব মাপা হবে তার স্থূলতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে এই বিদ্যুৎ প্রবাহেরও বৃদ্ধি বা হ্রাস হবে যা ব্যবহার করে প্রয়োজনমত সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব।

আলোক রশ্মি যেমন বস্তুবিশেষের তল থেকে প্রতিফলিত হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণও অনুরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়। অ্যালুমিনিয়াম, ষ্টেনলেশ বা ক্রোমিণ্টলের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিফলনের সাহায্য নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিকে পশ্চাৎ বিচ্ছুরণ (back scatter) পদ্ধতি বলা হয়।

বাস্তব স্থূলতা মাপনের জন্যে উপরিউক্ত দুই পদ্ধতিতেই ধরে নেওয়া হয়, যে বস্তুর স্থূলতা মাপা হবে তার ঘনত্ব সর্বদা সমান। কারণ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শোষণ ক্ষমতা নির্ভর করে বস্তুর পরিমাণের উপর। প্রকৃতপক্ষে এই দুই পদ্ধতিই পদার্থের পরিমাণের তুলনা করা। ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকলে পাওয়া যাবে স্থূলতার তুলনামূলক পরিমাপ।

অনাময় চট্টোপাধ্যায়*

*সুহৃদ লেন; জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

মোলাস্কা

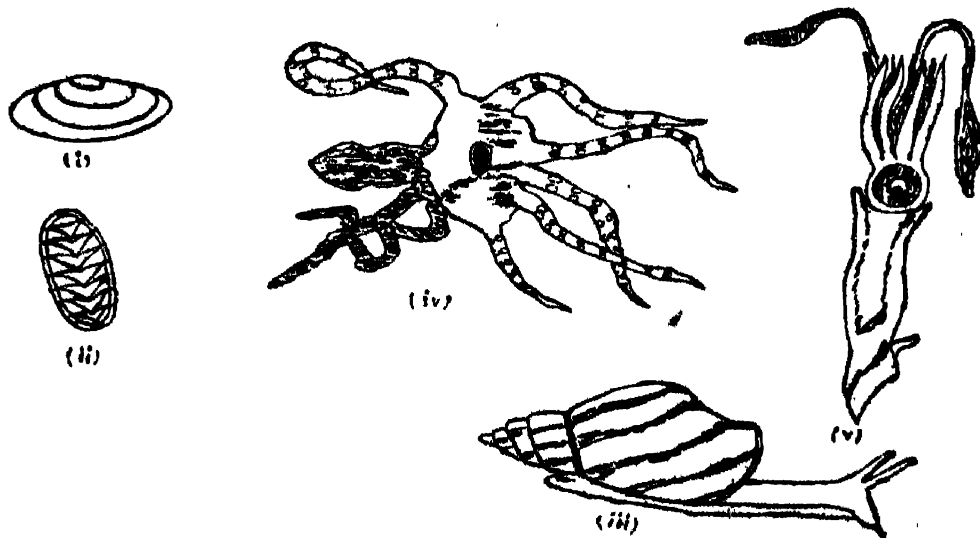
জলে স্থলে কত বিচিত্র প্রাণীই না বিচরণ করে। আমাদের পরিচিত প্রাণীগুলি ছাড়াও এমন বহু প্রাণী আছে যাদের আমরা সচরাচর দেখি না বা যাদের হয়ত কোনদিনই দেখা যাবে না। এইসব কোটি কোটি প্রাণীর নানা বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা প্রাণীজগৎকে দশটি পর্বে ভাগ করেছেন। মোলাস্কা হল অষ্টম পর্ব। প্রাণীকুলের বিরাট একটি অংশ এই পর্বের অন্তর্গত। মোলাস্কা শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'মোলাস্কাস' থেকে এসেছে। এর অর্থ হল নরম। নরম, থলথলে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিয়েই মোলাস্কা পর্ব। এই পর্বে প্রাণীদের প্রায় সকলেরই দেহ একটি খোলকে ঢাকা থাকে এবং নরম দেহের উপর থাকে ম্যাণ্টলের (mantle) আবরণ। এরা প্রায় সকলেই বিভাগহীন (segmentless)। শক্ত ঘাঁসিম যে উপাদানে গঠিত খোলক সেই একই উপাদানে গঠিত। রসায়নে এর নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$)। গ্রামে দু-একজন প্রবীণের কাছে খোঁজ করলে জানা যায় এক শ্রেণীর লোক এই খোলক সংগ্রহ করে পাকা বাড়ির জন্যে চুন তৈরি করত। ওদের বলা হত চুনুরী। আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংগে সংগে ওরা আজ অবলুপ্ত।

মোলাস্কা পর্ব আবার ছয়টি উপপর্বে বিভক্ত—গ্যাস্ট্রোপোডা, পোলিসিওপোডা, স্ক্যাফোপোডা, অ্যাম্ফিনিউরা মনোপ্ল্যাকোফোরা এবং সেফালোপোডা।

বর্ষাকালে পিচ্ছিল পুকুরের পাড়ে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় পিঠে এক বিরাট বোঝা নিয়ে একদল ছোট প্রাণী খুব ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে চলেছে। পুকুরের জলে একদল হাঁস ঘুরছে আর কাদা থেকে কি সব তুলে খাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জল থেকে ঝোপঝাড় তুলছে আর তা থেকে কি ছাড়াচ্ছে বা কাদা থেকে হাত-পা দিয়ে খুঁজে কিসব কুড়চ্ছে। এগুলি শামুক, ঝিনুক, গুগলী। গুগলী ছোট শামুক জাতীয় প্রাণী। পুকুর, নদী, সমুদ্র

বা স্থলের শামুক, গেঁড়ি (slug), হেল্ক (whelk), লিম্পেট (limpet) প্রভৃতি প্রাণীরই গ্যাস্ট্রোপোডার অন্তর্ভুক্ত। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটি কঠিন খোলক আছে। কিছু কিছু খোলক আবার প্যাঁচানো। এরা প্রয়োজনে খোলক থেকে মাথা আর দেহের কিছু অংশ বের করে আবার ভয় পেলে সারা শরীর খোলকের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। খোলকটি বর্মের মত কাজ করে। স্থল-শামুকের ফুসফুস থাকে, জলের শামুকদের কারও থাকে ফুলকা আর কারও থাকে ফুসফুস। স্থল শামুকদের বাঁচার জন্যে প্রচুর জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন। আবহাওয়া শুষ্ক হলে এরা খোলকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চলার সময় এদের দেহ থেকে পিচ্ছিলকারক রস বের হয়। এই রস চলার সুবিধা করে এবং নরম দেহটিকে রক্ষা করে। এরা খুবই ধীরগতি। 'আপেল শামুক' নামে পুকুর বা নদীতে বিরাট আকৃতির কিছু শামুকও দেখা যায়। গেঁড়ির কোন বহির্খোলক নেই।

পেলিসিওপোডার অন্তর্গত প্রাণীদের মধ্যে ঝিনুক ও ক্লামই প্রধান। এদের একজোড়া খোলক থাকে, ঐ খোলকজোড়া বই-এর মলাটের মত খোলে ও বন্ধ হয়। স্ত্রী-ঝিনুক বছরে লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ে। অনেক সময় ঝিনুকের মধ্যে ছোট পাথর বা অন্য কোন ছোট জিনিস ঢুকে পড়ে। তার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঝিনুকরা একটি তরল রস নিঃসৃত করে যা জমাট বেঁধে প্রস্তুত হয় মুক্তা। প্রায় সকল পেলিসিওপোডাই সামুদ্রিক জীব। দীঘা বা পুরীর সমুদ্রের রঙ-বেরঙের ঝিনুকের কথা আমরা অনেকেই জানি। অবশ্য পুকুরেও যে ঝিনুক পাওয়া যায় সেকথা আগেই বলা হয়েছে।



(i) ঝিনুক, (ii) চিটোন, (iii) শামুক, (iv) অক্টোপাস, (v) স্কুইড

স্ক্যাফোপোডা উপপর্বের প্রাণীদের খোলক অদ্ভুত আকৃতির। এগুলি দেখতে অনেকটা দাঁত বা শিং-এর মত এবং এর একদিক খোলা।

অ্যাম্ফিনিউরন বা চিটোনদের খোলকে আছে আটটি ভাগ। এদের কয়েকটি কৃমির ন্যায় আবার কয়েকটির আকার চ্যাপ্টা।

মোলাস্কা পর্বের পঞ্চম উপপর্ব মনোপ্ল্যাকোফোরাদের নিয়ে গঠিত। এরা খুব দুর্লভ এবং এদের সম্বন্ধে খুব কম তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। একটি খোলক নিয়ে গঠিত এদের কাঠামো বেশ সরল।

সেফালোপডরা হল শেষ উপপর্বের প্রাণী। অক্টোপাস, স্কুইড এবং ক্যাটলফিস এই উপপর্বের প্রধান তিনটি প্রাণী। এদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই শোনা যায়, যার অধিকাংশই ভিত্তিহীন। এরা অসামাজিক, ভীরু এবং প্রায় দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে। অক্টোপাশের আছে আটটি পেশীবহুল শুঁড় এবং স্কুইডের আছে আটটি ছোট ও দুটি বড় শুঁড়। স্কুইডরা সর্বদা পিছনদিকে সাঁতার কাটে। এদের উভয়েরই শুঁড়ে অসংখ্য চোষক বর্তমান। ঐ শুঁড়ের সাহায্যেই এরা শিকার ধরে এবং সাঁতার কাটে। এদের দেহে প্রায় খোলকের কোন চিহ্নই নেই। এরা মাংসাশী এবং খাদ্য চিবানোর জন্যে এদের মুখে শক্ত মাড়ি আছে। নিরীহ মাছ, কাঁকড়া এসবই এদের প্রধান খাদ্য। স্কুইড ও অক্টোপাসরা সমুদ্রের অনেক প্রাণীর কাছে বিভীষিকার কারণ হলেও এরা হাঙর, তিমি, বাইন (eel) এবং অনেক অঞ্চলে মানুষের প্রিয় খাদ্য। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অক্টোপাস ও সাধারণ স্কুইডরা নিজেদের দেহ থেকে জলে কালো কালির ন্যায় তরল পদার্থ ছড়িয়ে দেয় এবং তার অন্ধকারেঃ পালিয়ে যায়। মেসিনা প্রণালীর নিকটে গভীর সমুদ্রে একটি বিশেষ জাতের স্কুইড বাস করে। আত্মরক্ষার সময় এদের দেহ থেকেও একপ্রকার তরল পদার্থও জ্বলজ্বলে রস বেরোয়, যেটাকে তরল আগুন বলে মনে হয়। এভাবে শত্রুকে ভয় দেখিয়ে এরা আত্মরক্ষা করে। কয়েক ইঞ্চি থেকে তিরিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা অক্টোপাসও আছে। দৈত্যাকৃতি স্কুইড পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়। ক্যাটলফিস অক্টোপাসজাতীয় ছোট প্রাণী। এরা মাত্র ছয় থেকে দশ ইঞ্চি লম্বা হয়।

আজ পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ রকমের মোলাস্কার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অনেকগুলি মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ মোলাস্কাই থাকে সমুদ্রে। কয়েক রকমের শামুক বিষাক্ত জীবাণুর বাহক এবং কিছু মোলাস্কা ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। পৃথিবীর কয়েকটি স্থানে খাদ্য হিসাবে ঝিনুকের চাষ হচ্ছে।

দীপঙ্কর খাঁ*

10 গ্যালিফ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 003

শব্দ-কূট

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে শব্দ-কূটটি সমাধান কর ঃ

পাশাপাশি

1. মশার দ্বারা সংক্রমিত একটি ভাইরাসঘটিত রোগ ;
5. ইথার-এর আবিষ্কারক
7. একটি উৎকৃষ্ট জৈব রাসায়নিক সার ;
8. ইলেক্‌ট্রিক ট্রান্সফরমারের আবিষ্কর্তা
10. টেলিফোন আবিস্কারক ;
11. এম কে. এস. পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ভরের একক ;
13. একটি বিশিষ্ট ভেক্‌টর রাশি ;
14. একটি হ্যালোজেন গোষ্ঠীর মৌলিক গ্যাস ;
15. ব্রাওফাইটা শ্রেণীর অন্তর্গত একটি উদ্ভিদ ;
17. উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে দায়ী একটি হরমোন ।

উপর থেকে নিচে

2. দুগ্ধের প্রোটিন ;
3. কোন্ প্রাণীর কোষের মধ্যে প্লাস্টিড বিদ্যমান ;
4. উচ্চপ্রোটিনযুক্ত একটি খাদ্য ;
6. বংশগতির ধারক ও বাহক ;
9. তেজস্ক্রিয় মৌলের রশ্মির দ্বারা আক্রান্ত একটি রোগ ;
10. ভিটামিন বি-এর অভাব-জনিত একটি রোগ ;

1		2			3		4
5	X	6	X	7			
X	8		9	X		X	
10		X		X		X	
	X	X	11		X	12	X
13		X		X	14		
15		16		X	X		X
X	X		X	17			X

12. গাছের ফুল ফুটাতে সাহায্য করে এমন একটি হরমোন ;

13. পেয়ারা যে গ্রুপের অন্তর্গত ;

16. কোন্ উপগোত্রভুক্ত উদ্ভিদদের মূলে রাইজোবিয়াম পরিলক্ষিত হয় ।

(সমাধান 288 পৃষ্ঠায়)

শুভ্রকান্তি সামন্ত*

* গ্রাম+পোঃ—পান্না, জেলা-মেদিনীপুর

পদার্থবিদ্যার টুকিটাকি

হাতে চেষ্টা কর



চিত্র—1



চিত্র—2

চিত্র-1-এ বালকটি চেয়ারে যে ভাবে বসে আছে তুমিও যদি দেহে সোজা রেখে ঐ ভাবে বসে থাক তবে সামনের দিকে না ঝুঁকে বা পা-কে চেয়ারের নিচে না এনে তুমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে কি ? চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু পারবে না ।

কেন পারবে না বলতে গেলে বস্তুর সাম্য অবস্থা সম্বন্ধে একটি কথা জানিয়ে রাখি। কোন বস্তু দাঁড়িয়ে থাকে তখন যখন তার ভারকেন্দ্র থেকে অঙ্কিত লম্বরেখা তার ভূমি দিয়ে যায় ।

চিত্র-2-এ আনত চোঙটি পড়ে যেতে বাধ্য। কারণ চোঙটির ভারকেন্দ্র থেকে অঙ্কিত লম্বরেখা তার ভূমি দিয়ে যাচ্ছে না ।

তেমনি তুমিও পড়ে যাবে যদি তোমার দেহের ভারকেন্দ্র থেকে অঙ্কিত লম্বরেখা তোমার পা দুটির বাইরের প্রান্ত দিয়ে অঙ্কিত ক্ষেত্রের (চিত্র-3) মধ্যে না পড়ে। সেজন্যে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর।

এখন গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক। যে বালকটি চেয়ারে বসে আছে তার দেহের ভারকেন্দ্র তার নাভি থেকে প্রায় 20 সে.মি. উপরে দেহের ভিতর মেরুদণ্ডের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। যদি এই ভারকেন্দ্র থেকে লম্ব টানা হয় তবে এই লম্বরেখা পায়ের পিছনে চেয়ারের মধ্য দিয়ে


চিত্র –3

অতিক্রম করে। কিন্তু বালকটিকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হলে তার ভারকেন্দ্র এবং পা দুটি দ্বারা অধিকৃত স্থানকে একই লম্বরেখায় আনতে হবে। সেজন্যে আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি বা পা-কে চেয়ারে নিচে আনি যাতে দেহের ভারকেন্দ্র ও পা দুটি দ্বারা অধিকৃত স্থান একই লম্বরেখায় আসে। তা যদি না করি তবে কিছুতেই আমরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে পারব না।

জল কিভাবে আগুন নেভায়?

প্রথমত জল যখন জ্বলন্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। সমপরিমাণ ঠান্ডা জল ফুটন্ত জলে পৌঁছতে যে তাপ লাগে ফুটন্ত জল বাষ্পে পরিণত হতে তার চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশি তাপ লাগে। সেজন্যে জ্বলন্ত বস্তুর তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত জল বাষ্প পরিণত হওয়ার ফলে তার আয়তন প্রায় এক-শ' গুণ বর্ধিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং জ্বলন্ত বস্তুর উপর একটা আস্তরণ সৃষ্টি করে। ফলে মুক্ত বায়ুকে জ্বলন্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসতে দেয় না। সুতরাং বায়ু ছাড়া দহন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রঞ্জিতকুমার সামন্ত*

*35/4, বলাইমিস্ত্রী লেন, পোঃ বি গার্ডেন, হাওড়া-3

শব্দ-কূট-এর সমাধান

পাশাপাশি

1. এনকেফ্যালাইটিস, 5. লং, 7. ইউরিয়া, 8. স্ট্যানলি, 10. বেল (গ্রেহাম), 11. কিগ্রা, 13. বেগ, 14. ক্লোরিন, 15. রিকসিয়া, 17. অক্সিন,

উপর থেকে নিচে

2. কোজন, 3. ইউগ্লিনা, 4. সয়াবিন, 6. জিন, 9. লিউকেমিয়া, 10. বেরিবেরি, 12. ফ্লোরিজেন, 13. বেরি, 16. সিমিদ, (উপগোত্রীয়),

মডেল তৈরি

হাইড্রোলিক সার্কিট

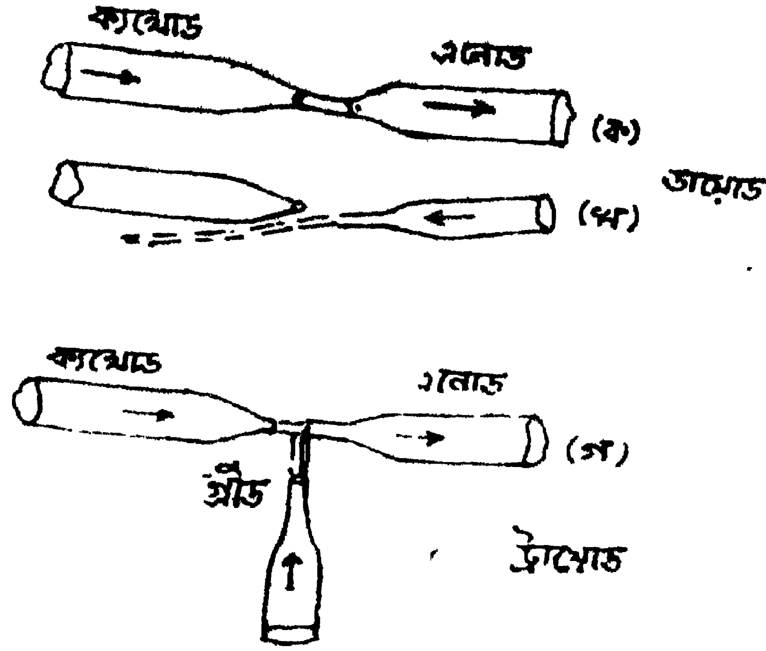
ইলেকট্রিক সার্কিট, ম্যাগনেটিক সার্কিট এবং ইলেকট্রনিক সার্কিটের নাম আমাদের কাছে মোটামুটি পরিচিত। আর একটা নতুন সার্কিটের কথা এখানে বলবো—যার নাম হাইড্রোলিক সার্কিট। হাইড্রো কথার অর্থ—জল। সুতরাং জলের প্রবাহকে কেন্দ্র করে যে বর্তনী তৈরি হয় তার নামই ইংরেজিতে হাইড্রোলিক সার্কিট।

বিদ্যুতের প্রবাহ সম্পর্কে পড়তে গিয়ে কয়েকটি শব্দের সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত হয়েছি, যেমন—রোধ, বিভব, তড়িৎ-প্রবাহ। জলের প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে গেলেও আমাদের এই শব্দগুলির প্রয়োজন হয়, কেননা তড়িৎ-প্রবাহ এবং জলের প্রবাহের মধ্যে বিরাট সামঞ্জস্য আছে। কোন দুটি বিন্দু A এবং B-এর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ যেমন ঐ দুটি বিন্দুর বিভব-প্রভেদের সমানুপাতিক এবং ঐ দুটি বিন্দুর মধ্যে রোধের ব্যস্তানুপাতিক যখন অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, জলের প্রবাহের ক্ষেত্রেও তাই। দুটি বিন্দুর মধ্যে জলের প্রবাহ ঐ দুটি বিন্দুর চাপের প্রভেদের বা বিভব প্রভেদের সমানুপাতিক এবং যে নল দিয়ে জল প্রবাহিত হবে তার রোধের ব্যস্তানুপাতিক। এছাড়া তড়িৎ-প্রবাহের জন্যে যেমন সমবায় বা সমান্তরাল বর্তনী করা হয়, জলের প্রবাহের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত সমবায় ও সমান্তরাল বর্তনী করা হয়ে থাকে। একটি নলের মধ্য দিয়ে যখন একদিকে জল প্রবাহিত হয় তখন এই প্রবাহকে তড়িৎ-প্রবাহের ক্ষেত্রে সমপ্রবাহের (direct current) সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। আবার নলদিয়ে তৈরী একটি বৃত্তাকার বর্তনীর কোন এক জায়গায় যদি একটি সিলিণ্ডার লাগানো থাকে যার মধ্যে একটি উভমুখী পিস্টন ওঠানামা করে তখন ঐ বর্তনীর মধ্যে জলের যে প্রবাহ হয় তা কখনো দক্ষিণাবর্ত (clock-wise) এবং কখনো বামাবর্তী (anti-clockwise) এবং প্রবাহকে পরিবর্তী প্রবাহের (alternating current) সঙ্গে তুলনা করা চলে।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা হাইড্রোলিক সার্কিটের সঙ্গে ইলেকট্রিক সার্কিটের সামঞ্জস্যের কথা। এছাড়া ইলেকট্রনিক সার্কিটের সমতুল্য বিভিন্ন হাইড্রোলিক সার্কিটও করা সম্ভব।

প্রথমেই আসা যাক ডায়োডের কথায়। ডায়োডের একটি দিকেই তড়িৎ প্রবাহিত হয়, অন্যদিকে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না। হাইড্রোলিক-ডায়োডেরও ঐ একই চরিত্র। দুটি কাচের ড্রপার নেওয়া হল, যেগুলির সরুমুখের ব্যাস মোটামুটি একই। এবার বাঁদিকের ড্রপারটির (ক্যাথোড) সঙ্গে প্লাস্টিক নল দিয়ে উঁচু জলের পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উপরের জলের চাপে ড্রপারের সরু মুখ দিয়ে জলের ফোয়ারা বেরিয়ে এল। ডানদিকের ড্রপার (অ্যানোড) এবার প্রায় $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দূরে এমনভাবে বাঁদিকের ড্রপারের তুলনায় সামান্য নিচে রাখা হল যেন জলের ফোয়ারা বাঁদিক থেকে বেরিয়ে সোজা ডানদিকের মুখে প্রবেশ করে। কিন্তু ড্রপার দুটির ঐ অবস্থায় যদি উঁচু জলের পাত্র থেকে নেমে আসা নলটি বাঁদিকের বদলে ডানদিকে ড্রপারে লাগানো হয় তবে জলের ফোয়ারা বাঁদিকের ড্রপারে

(ক্যাথোডে) প্রবেশ করবে না। কারণ জলের ফোয়ারা বাঁদিকের ডুপারের ঠিক নিচ দিয়ে চলে যাবে। সুতরাং জল কেবলমাত্র ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকেই প্রবাহিত হবে (চিত্র-1)।



চিত্র 1

এমনিভাবে হাইড্রোলিক ট্রায়োডও তৈরি করা যাবে। ক্যাথোড এবং অ্যানোড ডুপার দুটির সঙ্গে লম্বকরে একই তলে আর একটি ডুপার রাখা হল। তৃতীয় ডুপারটিকে বলা হয় গ্রীড। এবার যখন ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে ফোয়ারার জল প্রবাহিত হচ্ছে তখন গ্রীড ডুপারের মধ্য দিয়ে আর একটি জলাধার থেকে জলের ফোয়ারা পাঠানো হল ; ফলে গ্রীডের ফোয়ারা ক্যাথোড-অ্যানোডের ফোয়ারাকে বাঁকিয়ে দেবে এবং জল অ্যানোডে প্রবেশ করতে পারবে না। গ্রীডের ফোয়ারার বেগ যখন কম থাকবে তখন খুব অল্প জল অ্যানোডে প্রবেশ করবে, কিন্তু গ্রীডের ফোয়ারার বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানোডের জলের প্রবেশও বন্ধ হয়ে যাবে। এমনি করে ক্যাথোড-অ্যানোডের ফোয়ারাকে গ্রীডের ফোয়ারা নিয়ন্ত্রণ করবে (চিত্র-1)।

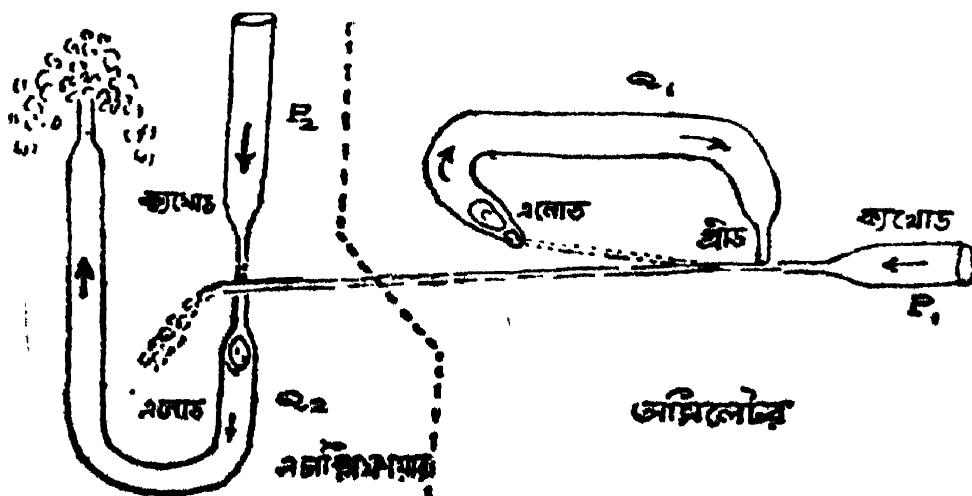
এবার এই হাইড্রোলিক ট্রায়োড দিয়ে কেমন করে অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ার তৈরি করা যায় সে কথায় আসা যাক। ট্রায়োডের ডুপার তিনটিকে ঠিকমত রেখে অ্যানোড এবং গ্রীডকে একটি প্লাষ্টিকের নল দিয়ে সংযুক্ত করে দেওয়া হল এবং ক্যাথোডকে কিছুটা উচুতে রাখা জলাধারের সঙ্গে একটি নল দিয়ে যুক্ত করা হল। জল-চাপের পার্থক্যের জন্যে জল ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে অ্যানোডে প্রবেশ করবে। অ্যানোডে প্রবেশ করে এই জল প্লাষ্টিকের নল বেয়ে গ্রীডের দিকে আসতে থাকবে। কিন্তু কি বেগে ঐ জল নল বেয়ে আসতে পারবে তা অনেকটা নির্ভর করবে জলের ঘনত্বের উপর। আবার জল নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহের সময় তার মধ্যে কিছু বুদ্বুদ তৈরি হবে এবং বুদ্বুদ নলের মুখের কাছে জমা হতে থাকবে। জল যত অ্যানোড থেকে বেরিয়ে গ্রীডের দিকে আসতে

থাকবে, গ্রীডের মুখে বুদ্‌বুদের উপর চাপও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। কিন্তু বুদ্‌বুদের গায়ে আটকে থাকা জলের চাপ আস্তে আস্তে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছবে যে বুদ্‌বুদ আর তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না এবং গ্রীড থেকে জল ফোয়ারার আকারে বেরিয়ে আসতে থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে জলের ঘনত্ব বা ভর প্রবাহের ক্ষেত্রে তড়িৎ-বর্তনীর ইনডাকটেন্স-এর মত এবং বুদ্‌বুদের উপর চাপ পড়লে তা স্প্রিং-এর মত চরিত্রবিশিষ্ট ক্যাপাসিট্যান্সের মত কাজ করবে এবং বুদবুদের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি এই নিয়ন্ত্রণের কাজকে পরিচালনা করবে।

এবার গ্রীডের ফোয়ারার জল যখন ক্যাথোড-অ্যানোডের ফোয়ারার উপর পড়বে তখন ক্যাথোডের ফোয়ারার দিক কিছুটা বেঁকে যাবে এবং অ্যানোডে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু অ্যানোডে জলের প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেলে গ্রীডের ফোয়ারার জলের যোগানও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যানোডের জলের প্রবেশ বন্ধ হবার আগে শেষ যে জল ঢুকেছিল তা গ্রীডের মুখে এসে পৌঁছতে যতক্ষণ সময় নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রীডের ফোয়ারার বেগ আস্তে আস্তে কমে এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রীডের জল বন্ধ হয়ে গেলে ক্যাথোডের জল আবার অ্যানোডে প্রবেশ করবে এবং অ্যানোড-গ্রীড সংযোগকারী নলের মধ্যে ধীরে ধীরে জমা হতে থাকবে। ক্যাথোডের ফোয়ারা যখন অ্যানোডে প্রবেশ করতে না পেরে বাইরে আসছে, তখন সেখানে একটি পাত্র রাখলে ঐ পাত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর জল এসে পড়বে। সুতরাং এই আউটপুটকে (output) ইলেকট্রনিক অসিলেটরের আউটপুট-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

হাইড্রোলিক অসিলেটরেরও একটি নির্দিষ্ট দোলনকাল থাকবে। ঐ দোলনকাল নির্ভর করবে জলের চাপ এবং গ্রীডের মুখে উৎপন্ন বুদ্‌বুদের মধ্যে সঞ্চিত শক্তির উপর।

এবার আসা যাক হাইড্রোলিক সার্কিটের একটি নতুন দিকে। হাইড্রোলিক অসিলেটরের আউটপুট কিভাবে অ্যামপ্লিফাই করা যায়? অসিলেটরের আউটপুট গ্রহণ করার জন্যে যে পাত্রটি রাখা হয়েছে, ওটিকে সরিয়ে দিয়ে ওখানে (চিত্র-2 অনুসারে) আর একটি ক্যাথোড-অ্যানোডের সংযোগস্থলকে



চিত্র 2

রাখা হল। দ্বিতীয় ক্যাথোডকে অনেকে উঁচু জলাধারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হল যাতে এর জলের চাপ প্রথমটির তুলনায় অনেক গুণ বেশি হয়। এবার প্রথম ক্যাথোডের জল যখন প্রথম অ্যানোডে প্রবেশ করবে,

তখন দ্বিতীয় ক্যাথোডের জলও দ্বিতীয় অ্যানোডে প্রবেশ করবে এবং ফোয়ারার মত বাইরে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু প্রথম ক্যাথোডের বলে যখন বেঁকে দ্বিতীয় ফোয়ারার পথে (ক্যাথোড-অ্যানোডের সংযোগস্থলে) পড়বে, দ্বিতীয় ক্যাথোডের জলও তখন আর দ্বিতীয় অ্যানোডে পৌঁছবে না, ফলে দ্বিতীয় অ্যানোডের আউটপুট-এর ফোয়ারাও বন্ধ হয়ে যাবে, আবার যখন প্রথম ফোয়ারার জল ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে যাবে, দ্বিতীয় অ্যানোডের জলও তখন প্রবলবেগে ফোয়ারার আকারে বেরোতে থাকবে। সুতরাং প্রথমে অসিলেটরের আউটপুট থেকে খুব সামান্য জল নির্দিষ্ট সময় পর পর বের হচ্ছিল, সেই জলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুটে অনেক শক্তিশালী ফোয়ারা নির্দিষ্ট সময় পর পর বেরিয়ে আসবে।

এই হাইড্রোলিক অসিলেটর বা অ্যামপ্লিফায়ারকে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে; বিশেষ করে রাসায়নিক গবেষণাগারে। যদি কোন তরল রাসায়নিক পদার্থ অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় পর পর মিশ্রণের প্রয়োজন হয়, তবে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা যাবে।

বিজয় বল*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: 1. চাঁদের আকাশ ও পৃথিবীর আকাশ কি দেখতে এক?

শ্যামল বসু, কলিকাতা-700 006

2. মহাকাশে মানুষের দীর্ঘসময় অতিবাহিত করার সর্বোচ্চ সীমা কত?

মায়া লাহিড়ী, কলিকাতা-700 003

3. প্রতিপদার্থ (antimatter) কি?

সময় রায়, হাওড়া

উত্তর: 1. পৃথিবীর আকাশ দিনের বেলায় নীল আর রাতে কালো। চাঁদের আকাশ পৃথিবীর রাতের আকাশের মত কালো। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জন্য দিনের বেলা আকাশ নীল দেখায় এবং কোন নক্ষত্র দেখা যায় না। চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল নেই এবং প্রায় 15 দিন ব্যাপি একটানা দিনের মধ্যেও সূর্য ও নক্ষত্র একই সঙ্গে দেখা যায়।

2. মহাকাশ থেকে বহু বিষয়ে গবেষণা চালাবার জন্যে মহাকাশ স্টেশন তৈরির চেষ্টার এবং মহাকাশে দীর্ঘ সময় থাকার প্রয়োজন আছে। তারই জন্যে আমেরিকার স্কাইল্যাব প্রকল্প এবং রাশিয়ার স্যালিয়ুট প্রকল্প। স্কাইল্যাব-4-তে প্রায় 4-বছর আগে জেরল্ড ক্যার, এডওয়ার্ড গিবসন এবং উইলিয়াম পোগ 84 দিন মহাকাশে কাটিয়ে আসেন। এই রেকর্ড ভেঙে দেয় রাশিয়ান অভিযাত্রীরা। স্যালিয়ুট-6 যানে সোভিয়েট মহাকাশযাত্রী যুরী রোমানেনকো (33) ও জর্জ

গ্রেচকো (46) 96 দিনের চেয়ে কিছু বেশি সময় মহাকাশে থেকে গত 16ই মার্চ (1978) কাজাখস্তানে ফিরে এসেছেন।

3. এক কথায় প্রতিপদার্থ হল সাধারণ পদার্থের বিপরীত পদার্থ। পদার্থের পরমাণু গঠনে অংশ গ্রহণ করে নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন। প্রতিপদার্থের পরমাণু অনুরূপ পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে সব বিষয়ে অবিকল সমান কেবল আধানের ক্ষেত্রে বিপরীত চরিত্রের। একটি মৌলকণার বিপরীত কণাকে বলা হয় তার প্রতিকণা। যেমন—ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন। ডিরাক প্রথম তত্ত্বগতভাবে এরূপ কণার সন্ধান দেন এবং কার্ল অ্যান্ডারসন একে আবিষ্কার করেন। পদার্থ ও প্রতিপদার্থ বা কণা ও তার প্রতিকণা মিলিত হলে উভয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং গামারশ্মির উদ্ভব হয়। যে কোন মৌল তার প্রতিমৌলের সংস্পর্শে আসা মাত্র তীব্র বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পর বিলুপ্ত হয়ে বিকিরণের শক্তিতে পর্যবসিত হয়।

পুস্তক-পরিচয়

অদৃশ্য জগৎ

লেখক—সমরেন্দ্রনাথ সেন; প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী; 79, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-700 009; প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর, 1977; পৃষ্ঠা সংখ্যা—299; মূল্য—পঁচিশ টাকা।

পৃথিবীর উপরে, ভিতরে ও পৃথিবী ছাড়িয়ে নীল আকাশে ভিড় করে আছে কত রহস্য। এদের জানার কৌতূহল মানুষের বহু দিনের। তাই এই নিয়ে রচিত হয়েছে নানা দেশে নানা উপকথা। রাতের আকাশে কত দীপাবলী, দিনের আকাশে একমাত্র প্রখর সূর্য—এরাই কি মহাবিশ্বের অধিবাসী, না বিশ্ব অনন্ত? দৃষ্টির অগোচরে এমনকি দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বাইরেও কোন জগৎ আছে? যদি থাকে তবে এসবের মূলে কি আছে কোন মহাজাগতিক নিয়ম? এসবের উৎপত্তি ও পরিণতিই বা কি? নানা প্রশ্নে মানুষ বার বার হয়েছে বিব্রত, একের পর এক সমাধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গাণিতিক বিশ্লেষণ ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, আজও সুসামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নি। টলেমির পৃথিবী-কেন্দ্রিক তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়ে কোপারনিকাসের জ্যোতিষে। হার্শেলের সূর্যকেন্দ্রিক পরিকল্পনা প্রায় এক-শ' বছর পরে ভুল বলে প্রমাণিত হল হার্লো শ্যাপ্লির নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব ও ঐ জগতে সূর্যের অবস্থান নির্ণয়ে। হাব্‌লের ঔজ্জ্বল্য তত্ত্বে প্রতিভাত হল সম্প্রসারণশীল বিশ্ব। 1950-এর পূর্বে বহু মনীষী যে শান্ত, সমাহিত, সুসমঞ্জস্য সমগ্র বিশ্বের রূপের ধারণা করেছিলেন তাও বদ্‌লে গেল মাত্র এই কয়েক দশকের লোমহর্ষক আবিষ্কারে। নিউটনের দূরক্রিয়া এবং ভরবিন্দু ও বস্তুবিষয়ক সূত্রগুলি পদার্থ-

বিদ্যার মূল স্তম্ভ হিসাবে আড়াই-শ' বছর ধরে পরিগণিত থাকার পর ঊনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকে ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, হার্টজ্ প্রমুখ মনীষীর তরঙ্গবাদে এবং প্লাঙ্ক অনুসৃত কণাবাদে বিজ্ঞানীদের মোহমুক্তি ঘটে।

গত কয়েক দশকে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে শক্তিশালী দূরবীণ, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ। এসবের মারফৎ মিলেছে বহু অজানার সন্ধান, জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তত্ত্বে। মহাবিশ্বের বিরাটত্বের কাছে এত সব সমুদ্রবেলায় কিছু উপলখণ্ড সংগ্রহের মতই নগণ্য। ভবিষ্যতে হয়ত উন্মোচিত হবে আরও কত উত্তেজনাপূর্ণ রহস্য। মহাবিশ্বের প্রকৃত পরিচয় গাণিতিক বিশ্লেষণে ও যান্ত্রিক দর্শনে পুরোপুরি পেতে গেলে, হয়ত জন্ম নেবে বিজ্ঞানের এক নতুন দিক। সত্তর দশক পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যান্ত্রিক দর্শনে সন্ধান পেয়েছেন বহু বিস্ময়কর বস্তুর—যা সবই আলোক সীমার বাইরে। এরা হল রেডিও-নক্ষত্র, কোয়াসার, অতিনোভা, পালসার, নিউট্রন নক্ষত্র, অন্ধকূপ, মহাকাশ এক্সরে, অণুতরঙ্গ প্রভৃতি। এদের নিয়েই লেখকের অদৃশ্য জগৎ। অদৃশ্য জগতের বস্তুসমূহের আবিষ্কার, এদের উৎপত্তি, গঠন, পরিণতি প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মতামত এবং নির্ভরশীল তত্ত্ব লেখক এই পুস্তকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন। শেষ অধ্যায়ে সৃষ্টিরহস্য, সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ও বিশ্বের পরিণাম বিষয়ে মতামতগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

যে কোন পাঠক-পাঠিকা বিশ্বপরিক্রমায় উৎসাহিত হবে এই পুস্তকপাঠে। বহু চিত্র, তালিকা, আনুসঙ্গিকতার উল্লেখ পুস্তকখানির তথ্যগত মূল্য বৃদ্ধি করেছে। যদিও লেখক গাণিতিক জটিলতা পরিহার করেছেন এবং লেখার মধ্যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে, তবুও পুস্তকখানি আরো সহজবোধ্য হলে জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারে বিশেষ সহায়ক হত।

পুস্তকখানির বাঁধাই, মুদ্রণ, প্রচ্ছদ বেশ সুন্দর ও আকর্ষণীয়। আশা করি পুস্তকখানি বাংলাভাষায় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

রতনমোহন খাঁ*

* সিটি কলেজ, গণিত বিভাগ, কলিকাতা-700 009

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1978

একত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সত্যেন্দ্র ভবন

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন-55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী থেকে জুন 1978

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1978

চিত্র-সূচী

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতিমাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'প্যাকেট সার্টিং সার্ভিস'-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়, মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়, উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন, প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ-বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

[illegible]—[illegible], কলিকাতা-700 009

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

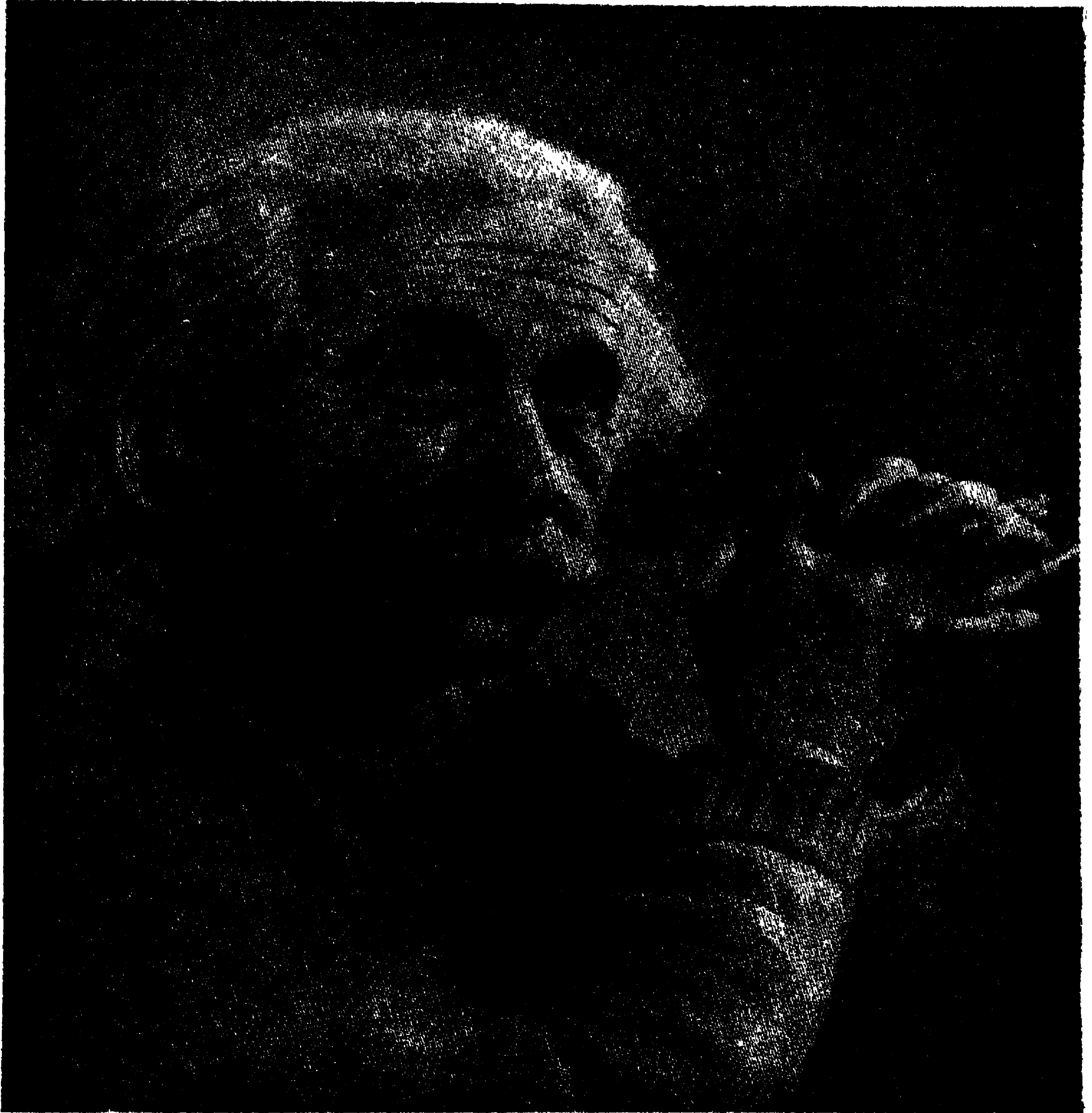
সংখ্যা 7, জুলাই, 1978

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়



অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

জন্ম : 14ই মার্চ, 1879 মৃত্যু : 18ই এপ্রিল, 1955

আইনস্টাইন সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ | জুলাই, 1978 | সপ্তম সংখ্যা

নিঃসঙ্গ পথিক

(একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা)

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব (unified field theory) বা অখণ্ড ক্ষেত্রতত্ত্বের চিন্তায় আইনস্টাইন বড়ই একা ছিলেন। কয়েক জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর চিন্তাধারার সমধর্মী হলেও পদার্থবিদদের অধিকাংশ সম্পূর্ণ অন্য পথে গবেষণা করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আবার বিশেষভাবে আইনস্টাইনের মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। সুতরাং আইনস্টাইন নিঃসঙ্গ ছিলেন। দুরূহ গণিতকে বর্জন করে সাধারণের মনে এই নিঃসঙ্গ পথের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে নিঃসঙ্গ পথটির বাইরেও দৃষ্টিপাত করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অবশ্য আইনস্টাইন চিরদিনই নিঃসঙ্গ। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞকে শিক্ষক পেয়েও আইনস্টাইন তাঁদের নির্দেশে গবেষণা করেন নি এমনকি পড়াশুনাও করেন নি। অল্প বয়স থেকে তিনি গতিবিদ্যা সম্বন্ধে মাখ (Mach) লিখিত বিশ্লেষণ পড়তেন আর দার্শনিকদের লেখা পড়তেন। হিউম (Hume) ও কাণ্ট (Kant) তিনি বিশেষভাবে পড়েছিলেন। অল্প বয়সে তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব (electro-magnetic theory) সম্বন্ধে আইনস্টাইনের মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাতত্ত্বের পূর্ণ রূপ পাওয়ার পথে এই প্রশ্ন অন্যতম ছিল।

*আই. আই. টি. খড়গপুর

অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও বিশেষ অপেক্ষবাদ বা বিশেষ আপেক্ষিকতাতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসাহী হয়েছেন কিন্তু তাঁদের মনে প্রধান ছিল পরীক্ষিত ফলাফল ও তত্ত্বের মেলা বা না মেলা। ফলে আইনষ্টাইনের গবেষণার মূল কথাটিই সকলের থেকে ভিন্ন—তিনি তাঁর বিশেষ অপেক্ষবাদের প্রবন্ধে প্রথম চিন্তা আরম্ভ করেন পরস্পর দূরে থাকা দুটি ঘড়ির সময়ের কথা বিশ্লেষণ করে।

বিশেষ অপেক্ষবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে আইনষ্টাইন এই মত পোষণ করলেন যে, এই তত্ত্ব নির্ভুল কিন্তু অসম্পূর্ণ। এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করতে গিয়ে প্রায় আপনা থেকেই এসে পড়ল সাধারণ অপেক্ষবাদ। সাধারণ অপেক্ষবাদ মাধ্যাকর্ষণের অতি সুন্দর তত্ত্ব তুলে ধরল। একে সুন্দর বলা হচ্ছে যুক্তির দিক থেকে, সাধারণ মানুষের মনে ছবি ফোটানোর দিক থেকে নয় (এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইতে 53 পাতায় কিছু আলোচনা করেছেন)। আইনষ্টাইন এই মত পোষণ করতেন যে যুক্তির সৌন্দর্যের পথই সত্যের পথ—মানুষের মনের ছবি সংস্কারমুক্ত নয়—তাই সে পথে সত্য পাওয়া যাবে না।

আগের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সাধারণ অপেক্ষবাদ মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব সুদৃঢ় করল। কিন্তু অন্যান্য বল? যথা—তড়িৎ-চুম্বক বল? সুতরাং মনে করতে হবে কি যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদও অসম্পূর্ণ? আইনষ্টাইন তাই মনে করতেন। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সম্প্রসারণে যেমন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তেমনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সম্প্রসারণে সম্পূর্ণভাবে পদার্থবিদ্যার মূল সূত্র পাওয়া যাবে আইনষ্টাইন মনে করতেন। এরই নাম অখণ্ড ক্ষেত্রতত্ত্ব।

কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই যুক্তি মেনে নেন নি কেন? এই প্রশ্নের আলোচনা না হলে অখণ্ডতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠিক অনুভূতি গড়ে উঠবে না।

বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানের দুটি স্তম্ভ অপেক্ষবাদ ও কণাতম বলবিদ্যা (quantum mechanics)। কণাতম বলবিদ্যার উন্নত অংশ কণাতম ক্ষেত্রতত্ত্ব (quantum mechanics)। এদের মধ্যে কণাতম ক্ষেত্রতত্ত্বে যুক্তি ও অঙ্কের গোঁজামিল সর্বজনস্বীকৃত কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষিত ফলাফলের মিল এত বেশি যে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে গোঁজামিলগুলির অস্তিত্ব সাময়িক—একটু দেরি হলেও তত্ত্বটিকে পরে গড়েপিটে গাণিতিক নির্ভুলতায় আনা যাবে। অপেক্ষবাদেও পরীক্ষিত ফল মেলে নি এমন পরীক্ষা আদৌ নেই কিন্তু মিলেছে এমন পরীক্ষার সংখ্যা বড় কম।

অপেক্ষবাদ আইনষ্টাইনের একার আবিষ্কার কিন্তু কণাতমবাদ অনেকের টুকরা টুকরা চিন্তা ও চেষ্টার সমষ্টি। যাঁদের মিলিত দানে কণাতম বলবিদ্যা গড়ে উঠে আইনষ্টাইনও তাঁদের মধ্যে একজন। শুধু নিজেই যে তিনি এ বিষয়ে কাজ করেছেন তাই নয় অন্যান্য অনেকের গবেষণার তাৎপর্যও তিনি তুলে ধরেছেন। ডিব্রলীর গবেষণার তাৎপর্য তিনি অনেককে মুখে বলেছেন—সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর মত ও অল্প লেখা সর্বজনবিদিত। এ সমস্ত সত্ত্বেও আইনষ্টাইন কিন্তু মনে করতেন যে, কণাতমতত্ত্ব সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও এটি একদিন আরও কোনও বৃহৎ ও সম্পূর্ণ তত্ত্বের অঙ্গীভূত হবে। তবে তাঁর বিশেষ বন্ধু বর্ণ (Born)-কে চিঠিতে লিখেছিলেন যে সেদিন তুমিও থাকবে না—আমিও থাকব না। সুতরাং আইনষ্টাইন চলেছেন তাঁর নিজের পথে তাঁর দার্শনিক মনের সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ তত্ত্বের খোঁজে আর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কণাতমতত্ত্বে ডুবে আছেন—শুধু তার সাফল্যে নয়—এর মধ্যেই মূল সত্য আছে মনে করে—সাফল্য তার সাক্ষ্য মাত্র।

কণাতমতত্ত্ববিদেরা বিশেষ অপেক্ষবাদ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মানেন। বিশেষ অপেক্ষবাদের সঙ্গে কণাতমতত্ত্বের সমন্বয়ও খুব সুন্দর ভাবেই ঘটেছে। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতাতত্ত্বের প্রতি কণাতমতত্ত্ববিদদের নজর এযাবৎ বড় কম ছিল—এখন অল্পই হয়েছে মাত্র। কিন্তু সম্প্রতি ফাইনম্যান (Feynman), ওয়াইনবার্গ (Weinberg) প্রমুখের গবেষণায় সাধারণ অপেক্ষবাদের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা

সাংঘাতিক। তাঁরা গ্র্যাভিটন (graviton) নামক কল্পিত মৌলিক কণার এমন গুণাগুণ কল্পনা করছেন যে তার অস্তিত্ব মেনে নিলে শুধু বিশেষ আপেক্ষিকতার ধর্মই সাধারণ আপেক্ষিকতার ফলাফল দেবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি বিভ্রম মাত্র। এই বিভ্রমকে সত্য মনে করে তারই পথে খোঁজা হচ্ছে অখণ্ডতত্ত্ব? যাই হোক গ্র্যাভিটন এখনও কেউ দেখতে পান নি। তাছাড়া অনেকের মত এইভাবে প্রাপ্ত সাধারণ আপেক্ষিকতা-তত্ত্বের সে সৌন্দর্য নেই যা আইনষ্টাইনকৃত আপেক্ষিকতাতত্ত্বের আছে।

দুঃখের বিষয় অখণ্ড ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত এমন কোনও ফলাফল নেই যার দৃষ্টান্ত দিয়ে সাধারণকে অখণ্ডতত্ত্বে বিশ্বাস করানো যায়। শুধু একটি ছোট নজির বোধ হয় দেখানো যায়। নেচারে (Nature) 1951 সালের 168 খণ্ডের 40 পৃষ্ঠায় পাপাপেত্রু (Papapetrou) ও শ্রডিংগার (schrödinger) অখণ্ড ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তিতে যা বলেন তার অর্থ অনেকটা এই দাঁড়ায় যে অখণ্ড ক্ষেত্রতত্ত্ব মতে চুম্বকের একক আধান থাকবে না। এই ফল কোনও তত্ত্বেই পাওয়া যায় না—সুতরাং এটা অখণ্ড তত্ত্বের সাফল্য হতেও পারে।

ভারতবর্ষে অখণ্ড তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে। গুজরাটে অধ্যাপক বৈদ্য এবং বারাণসীতে অধ্যাপক মিশ্র এসম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক ভি ভি. নারলিকার তাঁর ছাত্র রামজী তেওয়ারি সহ ভারতে এ-বিষয় প্রথম কাজ করেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাজ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাতায় ও অন্যত্র বহু আলোচিত। তাঁর ফরমুলা ব্যবহার করেন খড়গপুরের জে আর. রাও এবং রাও-এর কৃত কিছু জিনিষকে কাজে লাগান ডক্টর আব. সরকার এবং খড়গপুরের আর. এস. তেওয়ারি।

অখণ্ড ক্ষেত্রতত্ত্ব আইনষ্টাইনের সাধনার শেষ সোপান। এ সোপান তিনি পার হতে সক্ষম হন নি, কিন্তু এর মধ্যে নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে গেছেন। অখণ্ডতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাঁরাও আইনষ্টাইনকে ও তার চিন্তাধারার একমুখীতাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন।

আলবার্ট আইনষ্টাইন

তপেন রায়*

মানব সভ্যতার ইতিহাসটা সুপ্রাচীন। সে তুলনায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মানুষের উপলব্ধিতে এসেছে অনেক পরের যুগে, প্রাচ্যেই আগে সেই উন্মেষ হয়েছে বলতে হবে, প্রতীচ্যে তারও পরে। তবে বর্তমান মানব-সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক চর্চা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তাদেরই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে চলেছে।

পদার্থবিদ্যার চমকপ্রদ প্রসারের কথাটা যদি সার আইজাকের সময় থেকে ধরা যায় তবে এই, মাত্র শ'-তিনেক বছরে কি প্রচণ্ড অগ্রগতিটাই না হয়েছে। আমাদের প্রকৃতিদেবীর আইনকানুনগুলি এবং তাদের মধ্যেকার গূঢ় পারস্পরিক সম্বন্ধ বের করাটাই যেন পদার্থবিদদের একটা রঙীন নেশা। অনেক সময় মাপজোখ করে কানুনটাকে বের করতে হচ্ছে আবার কখনও কখনও আর্ষ প্রয়োগ এর মত কানুনটা কেউ বললেন এবং তা থেকে প্রসূত ফলাফল এক্স-পেরিমেণ্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হল ঠিক কি বেঠিক। যা ভাবছ, তা ঠিক নয়, ব্যাপারগুলি খুবই সাট্‌ল্‌—একটা কিছু বললেই হল না। ভুল হলেও কি ধরনের জিনিষ বলা চলে সেটা অনেক পাকা মাথার (বয়সের কথা নয়) দরকার। যাই হোক একটা সময় যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝিতে অনেক পদার্থবিদই ভাবতেন এবং এখনও অনেকে ভাবেন যে এমন একটা কানুন বের করা যাক যেটা থেকে তার বিভিন্ন প্রকাশ হিসেবে বেরোবে পদার্থবিদ্যার আসল এবং মৌলিক কানুনগুলি, যেমন নিউটনের গতিসূত্র, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় সমীকরণ, ডিরাকের সমীকরণ ইত্যাদি।

সার আইজাক নিউটন তাঁর তত্ত্বে বলেছেন যে বিশ্বের তাবৎ বস্তু মাধ্যাকর্ষণজনিত বলে একে অন্যকে আকর্ষণ করছে, আরও বলেছেন তাঁর গতিসূত্রে; যেমন কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে তার ত্বরণ হবে। এবং এই সূত্রগুলির সাহায্যেই গতি-বিজ্ঞান ও টেকনলজি ইত্যাদির যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও অগ্রগতি হয়েছে এবং মানব সভ্যতায় তাঁর দান অসামান্য। নিউটনের সূত্রগুলি স্বতঃসিদ্ধ বা অ্যাক্সিয়াম। এবার প্রশ্ন হচ্ছে কেন এ রকম অ্যাক্সিয়াম? "এরকম মূল সূত্রগুলির কারণ কি এবং কেন"—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যায়। আমরা এ ধরনের প্রশ্নকে "অতি প্রশ্ন" নাম দিতে পারি। আমার বোঝাবার সুবিধার জন্য আমি এধরণের নামকরণ করেছি। পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক ঋষিকন্যা শ্রীমতী গার্গী তাঁর বাবাকে এরকম কেনর পর কেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁর বাবা ঋষি যাজ্ঞবল্ক চঞ্চল হয়ে বলেছিলেন এগুলি "অতিপ্রশ্ন"।

পদার্থবিদ্যার অনেক সূত্র যেমন সোনোমিটার তারের কম্পন সংখ্যা, কৃত্রিম উপগ্রহের ঘূর্ণনকাল, এরোপ্লেনের উপর উর্ধ্বচাপ, স্থিতিস্থাপক পদার্থের জন্যে হুকের সূত্র ইত্যাদি এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক যেগুলি কয়েকটি মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরী। এগুলির কারণ বা কেন এই প্রশ্নের জবাব মূল সূত্র থেকেই দেওয়া যায়, এগুলি "অতিপ্রশ্ন" নয়। আমি যে উদাহরণগুলি উপরে দিয়েছি অতটা সহজদৃষ্ট ছাড়াও আরও অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা হিসেবে এমন এমন উদাহরণ আছে যেগুলি বেশ কঠিন সূত্র বলে মনে হয় কিন্তু সেগুলিও মূলত যদি কয়েকটি মূলসূত্রের অপত্য হয় তবে তারাও "অতি-প্রশ্নের" পর্যায়ে পড়ে না।

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-700 032

আলবার্ট আইনষ্টাইন পদার্থবিদ্যার অনেক বিষয়ে কাজ করে গেছেন ও সেই সব কাজের সূত্রাবলী যথাক্রমে সেই সব বিষয়ের আইনষ্টাইনের সমীকরণ নামে খ্যাত। যেমন, আইনষ্টাইনের ব্রাউনিয়ান গতি সম্বন্ধীয় সমীকরণ, ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণ, বোস-আইনষ্টাইন ঘনীভবন, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তাপের সমীকরণ, আইনষ্টাইনের A, B সহগঘটিত সমীকরণ ইত্যাদি আরও অনেক অনেক। ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণের জন্যে আইনষ্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। যে কোন সিনেমা হলে ছবির সঙ্গে যে শব্দ আমরা শুনতে পাই সেটা ঐ ফটো-ইলেকট্রিক ঘটনার জন্যেই সম্ভব।

আইনষ্টাইনের উপরিউক্ত সমস্ত কাজই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তবুও কোনটাই অতিপ্রশ্নঘটিত নয়। আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার একটা মেরুদণ্ড বলা চলে। স্থির ও গতিশীল (সমগতিসম্পন্ন) দুই নির্দেশতন্ত্রের এক থেকে অন্যতে স্থান-কালের রূপান্তরই এই তত্ত্বের বক্তব্য। কিন্তু এর নিঃসৃত ফলাফল গতি-বিজ্ঞানে তথা বল-বিজ্ঞানে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এই সূত্রের বহুল ফলিত প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। সেটা পারমাণবিক শক্তি ; অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে পরমাণু সংযোজনে আবার পরমাণু বিভাজনে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যেতে পারে, সেটা এই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বই প্রমাণ করছে।

আইনষ্টাইনের কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় তিনি যাতেই হাত দিয়েছেন তাতেই যেন সোনা ফলিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্। 1904 সালে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশের পর আইনষ্টাইন ত্বরণ-ঘটিত সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন। দশ বছর একাগ্র চিন্তার ও গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণের পর তিনি একটি "অতি প্রশ্নের" জবাবের সম্মুখীন হন। এটাই আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাতত্ত্ব নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বলের কথা উত্থাপন করেন এবং এই বলজনিত বস্তুর গতিপথ নিউটনের গতিসূত্র দ্বারা সঠিক নিরূপণ সম্ভব। এখন কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন—মাধ্যাকর্ষণ বল হয় কেন? গতিসূত্র নিউটন যেমন বলেছেন সে রকম হল কেন? এই প্রশ্ন দুটিই এক ধরনের অতি প্রশ্ন। ঠিক এই অতি প্রশ্নের জবাব 1914 সালে আইনষ্টাইনের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব থেকে যেন পাওয়া গেল।

আইনষ্টাইনের মতে দেশ-কালের জ্যামিতি খুশী-মত ধরা যাবে না। বস্তুর বিন্যাসের উপর জ্যামিতির প্রকৃতি নির্ভর করছে। বিপরীত দিক থেকে দেখলে ব্যাপারটা আবার মনে হবে জ্যামিতিটা যেন বস্তুগুলি কিভাবে ছড়ানো এবং কোথায় কত কত ভরের বস্তু আছে তা ঠিক করে দিচ্ছে। অর্থাৎ বস্তু, বিন্যাস ও জ্যামিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তু নিরপেক্ষ জ্যামিতির সঙ্গে প্রকৃতিদেবীর কোন সম্বন্ধ নেই, তা কেবল কল্পনা মাত্র। আইনষ্টাইনের এই অভিনব প্রস্তাবের পিছনে আছে গাণিতিক সূত্র। সেই সূত্র থেকেই বেরিয়ে আসছে ত্রিমাত্রিক দেশে, বস্তুর গতি কি ধরণের হবে তার নিখুঁত গাণিতিক বিবরণ। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি।

সূর্য ও পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। নিউটনের মতে সূর্য পৃথিবীকে মাধ্যাকর্ষণজনিত বল প্রয়োগ করে টানছে। (পৃথিবীও সূর্যকে টানছে)। আবার এই রকম বলের পাল্লায় পড়ে নিউটনের গতিসূত্র অনুসারে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিউটন গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে গতি-পথটা যে উপবৃত্তাকার এবং সূর্য যে সেই উপবৃত্তের একটা ফোকাসে আছে সেটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্যে মহামতি নিউটনকে যে কটা নোবেল প্রাইজ দেওয়া যায় সেটাও অনুধাবনের বিষয়। নিউটনের হিসাব অনুসারে উপবৃত্তটা আর নড়াচড়া করছে না সেটা স্থির হয়ে থাকছে। এবার আইন-ষ্টাইনের মত অনুযায়ী ঘটনাটা দেখা যাক। সূর্য ও

পৃথিবী চতুর্মাত্রিক দেশ-কালে অবস্থান করছে এই ধরলেই তাদের ঐ দেশ-কালের জ্যামিতি কি রকম হবে তা ঠিক হয়ে গেল গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। দুটি পিঁপড়েকে একটা থালার উপর ছেড়ে দিলে তারা এক রকম জ্যামিতি দেখবে আবার ঐ পিঁপড়ে দুটিকে একটা ফুটবলের উপর ছেড়ে দিলে তারা অন্য রকম জ্যামিতি দেখবে। যাই হোক সূর্য ও পৃথিবীর চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের জ্যামিতি ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ গাণিতিক সূত্রই ঠিক করে দিচ্ছে ত্রিমাত্রিক দেশে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে কি কক্ষপথে চলবে। অঙ্ক কষে বেরুলো প্রথম দর্শনে কক্ষপথটা উপবৃত্তাকার যার ফোকাসে সূর্য; অর্থাৎ নিউটনের কক্ষপথ। প্রথম দর্শন বলতে আমি বলতে চাইছি যে অতি সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে। এবার যদি ঐ ব্যতিক্রমটা ধরা হয় অর্থাৎ আগের মত বাদ দেওয়া না হয় তাহলে দেখা যাবে যে নিউটনের উপবৃত্ত, যেটা ত্রিমাত্রিক জগতে স্থির ছিল সেটা আইনষ্টাইনীয় গাণিতিক হিসাবে অতি সামান্য মানে ঘূর্ণায়মান, এতই সামান্য যে 1 সেকেণ্ড পরিমাণ কোণ ঘুরতে প্রায় 100 বছর লাগে। কিন্তু সেটাও মাপা হয়েছে আর আইনষ্টাইনের গাণিতিক হিসাবও ঠিক সেই মাপটার সঙ্গে মিলছে।

"কেন নিউটনের সূত্রাবলী?" এর উত্তর যেন আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জ্যামিতিক গঠন। কেন এই জ্যামিতিক গঠন—তার উত্তর যেন আমরা এইভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকার জন্যে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কেন আমরা এইভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে আছি? তার উত্তর···। আইনষ্টাইন নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার এই ব্যাখ্যাকে পদার্থবিদ্যার জ্যামিতিকরণ নাম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সঠিক জ্যামিতিই যেন প্রকৃতিদেবীর কাঠামো আর সেটাই আর একভাবে আমাদের কাছে প্রাকৃতিক আইনের সূত্র হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

আইনষ্টাইন বলবিদ্যার ব্যাখ্যাতেই থেমে থাকেন নি। তিনি পুরো পদার্থবিদ্যাটাকেই জ্যামিতিকরণ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। দার্শনিক মনোবৃত্তি সম্বলিত এ প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নিখুঁত গাণিতিক সূত্রাবলীর এমন সুন্দর প্রতিকৃতি অঙ্কন আলবার্ট আইনষ্টাইনের গবেষণার এক গগনচুম্বী কীর্তিস্তম্ভ।

আইনষ্টাইন সম্বন্ধে অনেকেই লিখেছেন এবং লিখছেন। তাঁদের অনেকেরই লেখায় দেখতে পাই আইনষ্টাইন বেহালা বাজাতেন, কচি কচি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তিনি ছিলেন নিরাড়ম্বর, অতীব শান্তিপ্রিয় মনীষী। কথাগুলি খুবই কাজের। এর মানে সুকুমার বৃত্তিগুলি বুদ্ধিদীপ্ত আইনষ্টাইনের জীবন থেকে কোনও দিন লোপ পায় নি। আমাদের মধ্যে অনেকেই শেয়ালের বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে বুদ্ধিমান মনে করেন এবং সুকুমারবৃত্তিসম্পন্ন লোককে প্রায়সই ক্যাবলা উপাধিতে ভূষিত করেন। আইনষ্টাইনকেও নির্বোধ ও ক্যাবলা ভেবেছেন অনেকে, সেজন্যে আমি অন্য লেখকদের রচনা পড়তে বলছি, এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না।

এবার দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একটা আইনষ্টাইনের বাল্যকালের এবং আর একটা তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সময়কার। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃতিটা কিছুটা হয়তো বোঝাবার সাহায্য করতে পারে।

আলবার্টের জীবনের শুরুতে তাঁর বাবা তাঁকে একটা কম্পাস (চুম্বকীয়) উপহার দেন, সেটা পেয়ে আইনষ্টাইন বলেছেন তাঁর কাছে সেটা রোম্যান্টিক মনে হয়েছিল এবং পরিণত বয়সেও নাকি তিনি সেই রোম্যান্সটা ভুলতে পারেন নি। আরেকটা ঘটনা—আইনষ্টাইন যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন সুইডেনের রাজার হাত থেকে পুরস্কার পাওয়া মাত্র সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী (যাঁর সঙ্গে আইনষ্টাইনের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল) এবং যে বিদ্যাপীঠে তিনি শিক্ষিত হয়েছিলেন তার মধ্যে পুরো টাকাটা ভাগ করে দেন।

আজও আইনষ্টাইনের জেনরেল রিলেটিভিটি (সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব) নিয়ে বিশ্বের প্রচুর লোক গবেষণায় নিযুক্ত এবং তাঁর শেষ জীবনের ইউনিফায়েড থিওরী নিয়েও গবেষকদের চিন্তার অবধি নেই।

আইনষ্টাইনের তত্ত্বাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু ও বিকিরণ-মিথস্ক্রিয়া

পার্থ ঘোষ*

কৃষ্ণবস্তু (black body) বিকিরণ নিয়ে গবেষণাকালে 1900 সালে প্লাঙ্ক (Planck) যখন তাঁর প্রসিদ্ধ কোয়ান্টাম ধ্রুবক h আবিষ্কার করেন সেই সময় ঠিক পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় নি যে অণু-পরমাণু জগতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণায় কি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। আইনষ্টাইনই (Einstein) প্রথম প্লাঙ্ক ধ্রুবকের মর্মার্থ উপলব্ধি করেন। 1902 থেকে 1905 সালের মধ্যে তিনি কয়েকটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এগুলির বিষয়বস্তু ছিল পরিসাংখ্যিক বলবিদ্যা, ব্রাউনিয়ান (Brownian) বিচলন, কোয়ান্টামবাদ ও আপেক্ষিকতাবাদ।

পরিসাংখ্যিক বলবিদ্যার এনট্রপির (entropy) সঙ্গে সম্ভাবনার (W) একটি প্রগাঢ় সম্বন্ধ আছে। সেটি হল বোলট্জ্‌ম্যান এর (Boltzmann) প্রসিদ্ধ সমীকরণ

$$S = k \log W + \text{constant} \qquad (1)$$

আইনষ্টাইন এই সমীকরণের এক অভিনব ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করলেন। এ পর্যন্ত সমীকরণকে এনট্রপির সংজ্ঞা হিসেবেই সকলে ধরে এসেছেন। আইনষ্টাইনই এই পদ্ধতিকে উল্টে ব্যবহার করলেন; অর্থাৎ এনট্রপিকেই ধরে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন তার থেকে পারমাণবিক অবস্থাগুলির পরিসাংখ্যিক সম্ভাবনা W সম্বন্ধে কি জানা যেতে পারে। এই অনুসন্ধান প্রণালী অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ হয়। তিনি দেখলেন যে বিচ্ছিন্ন (isolated) কোন বস্তুর একাংশ ঘনফলে (V) L যদি শক্তির স্ফুরণ (fluctuation) হয় তাহলে তার বর্গের সমক হবে

$$\overline{L^2} = k\left[-\left(\frac{\partial^2 S}{\partial E^2}\right)_{T,V}\right]^{-1} = kT^2\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V ; \qquad (2)$$

এখানে T তাপমাত্রা আর E শক্তির গড়। সুতরাং প্লাঙ্ক-এর সূত্র থেকে তিনিই সর্বপ্রথম দেখালেন যে

$$\overline{L^2} = h\nu E + \frac{c^3}{8\pi\nu^2 d\nu} \frac{E^2}{V} ; \qquad (3)$$

এখানে ধরা হয়েছে বিকিরণের স্পন্দনসংখ্যা ν থেকে $\nu + d\nu$-এর মধ্যবর্তী। এই সূত্রের দ্বিতীয় অংশটির ব্যাখ্যা সহজেই সনাতন (classical) তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রতত্ত্বে পাওয়া যায়। তরঙ্গমালার ব্যতিকরণ (interference) থেকে এর উৎপত্তি। কিন্তু প্রথম অংশটি তরঙ্গবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই অংশটির ব্যাখ্যা মেলে যদি মনে করি বিকিরণ অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে না থেকে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও তাদের শক্তির পরিমাণ $h\nu$। তাহলে আদর্শ গ্যাসের একাংশ ঘনফলে পরমাণু সংখ্যার স্ফুরণের সঙ্গে প্রথম অংশটির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

সেই যুগে বিকিরণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের

---

*46, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-700 026

প্রয়োগ সুপ্রচলিত ছিল না। তাই আইনষ্টাইন বিকিরণের গতিপথে আয়নের ব্রাউনিয়ান বিচলন বিশ্লেষণ করে দেখলেন সেখানেও অনুরূপ দুটি অংশ পাওয়া যায়। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে ভিন-এর (Vien) সূত্র (প্লাঙ্ক-এর সূত্রের $h\nu >> kT$ সীমায় এই ভিন সূত্র পাওয়া যায়) থেকে কেবলমাত্র প্রথম অংশটিই পাওয়া যায়। এইভাবে বিকিরণের কণিকা-রূপ সম্বন্ধে তাঁর ধীরে ধীরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়।

তখন তিনি এই আলোক-কণিকা প্রকল্পের প্রমাণ অন্যত্র খুঁজতে শুরু করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিস্ময়কর মৌলিকতার পরিচয় দেন। তিনি দেখান যে আলোক-তড়িৎ (photo-electricity) ও প্রতিপ্রভার (fluorescence) ব্যাখ্যা কেবলমাত্র আলোক-কণিকাবাদ দ্বারাই সম্ভব, তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব বা তরঙ্গবাদ এসব ক্ষেত্রে অকেজো। পরে তিনি এই নতুন আলোক-কণিকাতত্ত্ব আরও অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেন। যেমন রঞ্জেন রশ্মি দ্বারা ঋণাত্মক রশ্মির (cathode rays) আনুষঙ্গিক উৎপাদন ও ব্রেমষ্ট্রালুং (Bramstrahlubg)-এর স্পন্দনসংখ্যার উচ্চসীমা (high frequency limit)। রঞ্জেন রশ্মি নিয়ে গবেষণা কালে 1924 সালে কম্পটন (Compton) লক্ষ্য করেন যে ইলেকট্রনের উপর পড়লে এই রশ্মি ও ইলেকট্রন বিশেষভাবে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক দুটি বিলিয়ার্ড বলের মধ্যে ধাক্কা লাগলে যেমন দেখা যায়। এই বিক্ষেপ প্রক্রিয়াকে কম্পটনের ফল বলা হয়। কম্পটনের ফলই আলোক-কণিকার বাস্তবতার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এখানে বলা প্রয়োজন যে প্লাঙ্ক তাঁর সূত্রের উৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে বিকিরণের অবিচ্ছিন্নতা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। তিনি কেবল বস্তুর মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার কল্পনা করেন। তিনি ধরে নেন যে বস্তুর মধ্যে এক ধরণের স্পন্দক (oscillator) আছে যেগুলি কেবলমাত্র $nh\nu$ পরিমাণের শক্তি গ্রহণ বা পরিত্যাগ করতে পারে। (এখানে ν স্পন্দনসংখ্যা ও n যে কোন পূর্ণসংখ্যা।) সাধারণত আমরা যে সমস্ত স্পন্দক দেখতে পাই, যেমন দোলক (pendulum) অথবা স্প্রিং, তারা একটি সীমা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ শক্তিই গ্রহণ বা পরিত্যাগ করতে পারে। প্লাঙ্ক-এর কল্পিত স্পন্দকগুলি নতুন ধরণের। এগুলিকে কোয়ান্টাম স্পন্দক বলা যেতে পারে। এই কোয়ান্টামের ধারণা আইনষ্টাইনই সর্বপ্রথম বিকিরণের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন; অর্থাৎ আলোক-কণিকাবাদ প্রবর্তন করেন বা আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে বিকিরণ ক্ষেত্রের কোয়ান্টামীকরণ (quantisation)।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 1913 সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সময় আইনষ্টাইনের আলোক-কণিকাবাদের উপর ভিত্তি করে নীলস বোর (Neils Bohr) তাঁর যুগান্তকারী পরমাণুর প্রতিকল্প (model) উপস্থাপন করেন। এই প্রতিকল্প অনুযায়ী অনেকটা প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম স্পন্দকের মত পরমাণুও কেবলমাত্র বিশিষ্ট কয়েকটি স্থিতিশীল অবস্থায় (stationary states) থাকতে পারে ও একটি অবস্থা থেকে অন্য যে কোন স্বল্প-শক্তিধারী অবস্থায় নামলে এই দুই অবস্থার শক্তির বিয়োগফল $h\nu$ শক্তির আলোক-কণিকারূপে নিক্ষিপ্ত হয়। বোর-এর প্রতিকল্প যখন স্বীকৃতি পেল তখন প্রশ্ন উঠল এই রকম বোর পরমাণু ও বিকিরণের মিথস্ক্রিয়া কি ধরণের হলে সাম্যাবস্থায় প্লাঙ্কের সূত্র পাওয়া যাবে। 1917 সালে আইনষ্টাইন এই সমস্যার অত্যন্ত সহজ সুন্দর সমাধান করেন। ধরা যাক একটি পরমাণুর দুটি মাত্র স্থিতিশীল অবস্থা আছে। একটি নিম্নতর অনুত্তেজিত অবস্থা '1' আর অন্যটি উত্তেজিত অবস্থা '2'। আইনষ্টাইন ধরে নিলেন যে পরমাণুটি যদি উত্তেজিত অবস্থা '2 টিতে থাকে তাহলে তার '1' অবস্থাটিতে ফিরে আসার একটি বিশেষ সম্ভাবনা আছে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে বোর-এর প্রতিকল্প অনুযায়ী এই দুই পারমাণবিক অবস্থার শক্তির

বিয়োগফল ν_{21} শক্তির একটি আলোক-কণিকারূপে বেরিয়ে আসবে। প্রতি সেকেণ্ডে এইরূপ প্রক্রিয়ার সংখ্যা '2' অবস্থার পরমাণুর প্রারম্ভিক সংখ্যার সমানুপাতিক হবে, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বস্তুর বিভাজন বা ক্ষয় যে রকম আকস্মিকভাবে হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে 'স্বতস্ফূর্ত নির্গমন' (**spontaneous emission**) বলা হয়। আবার পরমাণুগুলিকে '1' থেকে '2' অবস্থায় উত্তেজিত করতে গেলে প্রয়োজন $h\nu_{12}$ শক্তির বিকিরণের। আর এই গ্রহণ প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা ν_{12} স্পন্দনসংখ্যার বিকিরণের ঘনত্বের সমানুপাতিক। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'আবিষ্ট বা প্রভাবিত গ্রহণ' (**induced absorption**) প্রক্রিয়া।

এই দুই প্রক্রিয়ার ভারসাম্য থেকে কিন্তু আইনষ্টাইন প্লাঙ্ক এর সূত্রে উপনীত হতে অক্ষম হলেন। প্রয়োজন হল তৃতীয় একটি প্রক্রিয়ার কল্পনার। আইনষ্টাইন অনুমান করলেন যে $2 \rightarrow 1$ নির্গমন প্রক্রিয়া $h\nu_{21}$ শক্তির বিকিরণের প্রভাবেও ঘটতে পারে এবং তার সম্ভাবনা ν_{21} স্পন্দনসংখ্যার বিকিরণের ঘনত্বের সমানুপাতিক। এই তৃতীয় প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'আবিষ্ট বা প্রভাবিত বা উদ্দীপিত নির্গমন' (**induced or stimulated emission**)। উদ্দীপিত নির্গমন ($2 \rightarrow 1$) ও আবিষ্ট গ্রহণের ($1 \rightarrow 2$) সম্ভাবনা যদি সমান হয় তাহলেই প্লাঙ্ক এর সূত্র পাওয়া যায়।

আইনষ্টাইন-এর এই প্রবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত বিকিরণ প্রক্রিয়ায় আকস্মিকতা ও পরিসংখ্যানের প্রবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধটিতে তিনি আরও দেখান যে স্বতস্ফূর্ত নির্গমন প্রক্রিয়ায় আলোক-কণিকাগুলি $h\nu/c$ ভরবেগ নিয়ে এলোমেলো ভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে ও সেই সঙ্গে পরমাণুটিও উল্টোদিকে সমান ভরবেগে প্রক্ষিপ্ত হয়। এহেন বিকিরণকে তিনি 'সূচ-সম বিকিরণ' (**needle-like radiation**) নাম দেন। এই ধারণা কিন্তু সনাতন আলোক-তরঙ্গবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। 1933 সালে ফ্রিস (Frisch) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই ধরণের আচরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে আইনষ্টাইন-ই প্রথম বিজ্ঞানে অহেতুবাদ ও অনিমিত্ত-বাদের প্রবর্তন করেন।

প্রবন্ধটির আরও একটি তাৎপর্য ছিল। সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া সব সময়েই অন্তত দুটি অবস্থার মধ্যে প্রতিসমভাবে (**symmetrically**) ঘটে। সনাতন বলবিদ্যায় কিন্তু সব সময়েই বল বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থার কাজ করে ও তার ফলাফল কেবলমাত্র ওই অবস্থার ও বলের বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভরশীল। প্রতি-সাম্যের এই ধারণা পরে ম্যাট্রিক্স (**matrix**) বলবিদ্যার একটি মূল ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটির আরও একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। 1917 সালে আইনষ্টাইন যখন উদ্দীপিত নির্গমন প্রক্রিয়ার কল্পনা করেন তখন কিন্তু এই প্রক্রিয়ার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। কেবলমাত্র প্লাঙ্কের সূত্র পেতেই এই প্রক্রিয়ার কল্পনা করার প্রয়োজন হয়েছিল। উদ্দীপিত নির্গমনই কিন্তু মেসার (**maser**) ও লেসার (**laser**) রশ্মির মূল উৎস। প্রায় পঁচিশ বছর পরে 1940 শতকে মেসার ও পরে লেসার রশ্মির আবিষ্কার আইনষ্টাইনের বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির আরও একটি পরিচয়।

আলোক নির্গমন যে দুটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় হতে পারে এই ধারণাটি আচার্য সত্যেন বসুর কাছে কিছুটা কৃত্রিম বলে মনে হয়েছিল। তিনি 1924 সালে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কোয়াণ্টাম পরিসংখ্যান আবিষ্কার করেন। তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিসম্মত ও সন্তোষজনকভাবে প্লাঙ্কের সূত্রের ব্যাখ্যা করা। সে যাবৎ বিকিরণের তরঙ্গ ও কণিকারূপের যুগপৎ ব্যবহার তাঁর কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হয় নি। তিনি কেবলমাত্র কণিকারূপ ধরেই প্লাঙ্কের সূত্র পাওয়ার চেষ্টা করেন ও দেখান যে বোলট্জ্ম্যান সংখ্যান বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুন পরিসংখ্যানের

প্রবর্তন না করলে কিছুতেই প্লাঙ্কের সূত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এর থেকেই (ও Kirchoff-এর নিয়ম থেকেও) তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে প্লাঙ্কের সূত্রটি পারমাণবিক বিকিরণ প্রক্রিয়ার প্রতিকল্পের উপর নির্ভর করে না। এই সূত্র আলোক-কণিকা সমষ্টির স্বকীয় পরিসংখ্যানের ফল। তিনি তাই চেষ্টা করেন নির্গমন প্রক্রিয়াটাকে মূলত একই অভিন্ন প্রক্রিয়া মেনে নিয়ে কিভাবে প্লাঙ্কের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। দুঃখের বিষয় তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। আধুনিক কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বে অবশ্য নির্গমন প্রক্রিয়ার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই দুটি অংশ পাওয়া যায়। ঠিক যেমন আইনষ্টাইন অনুমান করেছিলেন, আবার একই সঙ্গে বস্তু-সংখ্যানও পাওয়া যায়। তথাপি একথা বলা প্রয়োজন যে আধুনিক কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও ন্যায়সঙ্গত তত্ত্ব বলে দাবী করা যায় না। এই তত্ত্বে কণিকার ভর, আধান ইত্যাদির গণনায় কিছু অর্থহীন অনন্তরাশি (infinities) এসে পড়ে। সেগুলিকে ন্যায্য ও বিধিসম্মত গাণিতিক উপায়ে এড়িয়ে যাওয়া এখনও সম্ভব হয় নি।

বস্তু ও বিকিরণের মিথস্ক্রিয়ার রহস্যোদ্ঘাটনে ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিস্থাপনে আইনষ্টাইনের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই প্রথম বিকিরণের তরঙ্গ ও কণিকা—এই দ্বৈত রূপ উপলব্ধি করেন ও প্লাঙ্কের ধ্রুবকের সর্বজনীন গুরুত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এই তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈত-বাদের দার্শনিক ও ন্যায়সম্মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীলস বোর তাঁর পরিপূরণ সিদ্ধান্ত (complementarity principle) প্রস্তাব করেন। বিজ্ঞানে আকস্মিকতা ও অহেতুবাদের ভিত্তিস্থাপনও আইনষ্টাইনই করেন। যদিও আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিগত অহেতুবাদকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আকস্মিকতা মূলত আমাদের অজ্ঞানপ্রসূত। পরমাণুর গঠন-প্রণালীর মধ্যেই এই আপাত আকস্মিকতার রহস্য লুকিয়ে আছে। কথিত আছে তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি বিশ্বাস করি না ঈশ্বর বিশ্ব নিয়ে দাবা খেলছেন।" আধুনিক বিজ্ঞানীরা অবশ্য আইনষ্টাইনের সঙ্গে একমত নন। তাহলেও তাঁরা একথা একবাক্যে স্বীকার করে নেন যে আইনষ্টাইনের তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচনা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বহু সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সেগুলির সমাধান করতে সাহায্য করে। 1935 সালে পোডোলস্কী (Podolsky) ও রোজেন (Rosen)-এর সঙ্গে আইনষ্টাইন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরুদ্ধে গুরুতর সমালোচনা করেন ও দেখান যে তাঁর বাস্তবতার ধারণা অনুযায়ী এই তত্ত্ব অসম্পূর্ণ। নীলস বোর ও অন্যান্য মনীষীরা পরিপূরণ সিদ্ধান্তের সাহায্যে ওই সমস্ত আপত্তি বহুলাংশে খণ্ডন করতে সক্ষম হন। তবু আজও কিছু কিছু সন্দিহান তত্ত্ববিদ আইনষ্টাইনের আদর্শে আধুনিক বিজ্ঞানে খোয়ানো সনাতনী হেতুবাদ অন্বেষণ করে চলেছেন।

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

ব্রাউনীয় সঞ্চালনের আইনষ্টাইনীয় ব্যাখ্যা

সুশীলকুমার সিংহ*

1827 খৃষ্টাব্দে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন বিভিন্ন গাছগাছড়া থেকে সংগৃহীত পোলেন চূর্ণ জলের মধ্যে নিমজ্জিত করে একটি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ঐ চূর্ণগুলির ব্যাস ছিল এক ইঞ্চির পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের মতন। তিনি দেখলেন, ঐ বস্তুকণাগুলি ক্রমাগত উত্তেজিতভাবে এবং আপাত-দৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। অনেক পরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্তে এলেন জলের মধ্যে কোনও স্রোত বা জলের ধীরগতিতে বাষ্পীভবন বস্তুকণাগুলির গতির জন্যে মোটেই দায়ী নয়, ঐ বিশৃঙ্খল গতি পোলেন চূর্ণগুলির নিজেদেরই বৈশিষ্ট্য। ব্রাউন প্রথমে ভাবলেন, পোলেন চূর্ণগুলি বোধ হয় জীবিত; কিন্তু পরে হারবেরিয়াম থেকে মৃত উদ্ভিদের শুকনো পোলেন চূর্ণ নিয়ে পরীক্ষা করেও একই ফল পাওয়া গেল। তখন ব্রাউন সিদ্ধান্তে আসেন, বস্তুকণাগুলি সম্ভবত এমন একটি ভৌত অবস্থায় আছে, যা এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। ব্রাউন এই ধরণের বস্তুকণার নাম দেন 'সক্রিয় অণু' (active molecule)। শুধু উদ্ভিদের পোলেন চূর্ণই নয়, ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক —এই রকম বেশ কিছু বস্তুকণা নিয়েও ব্রাউন পরীক্ষা করেন, এবং সবক্ষেত্রেই বস্তুকণাগুলির বিশৃঙ্খল গতির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। অর্থাৎ, যে কোনও ক্ষুদ্রকায় বস্তুকণা জল বা অন্য তরল পদার্থে ভাসমান থাকলেই ঐ বস্তুকণাগুলি ক্রমাগত বিশৃঙ্খলভাবে নড়চড়া করে; এবং এই ধরণের ঘটনাকে 'ব্রাউনীয় সঞ্চালন' বলা হয়।

ব্রাউনীয় সঞ্চালনের কারণ কি? ঐ সব অজৈব বস্তুকণা তরল পদার্থে নিমজ্জিত থাকলেই উত্তেজিত হয়ে অবিরল বিশৃঙ্খলভাবে এধারে-ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই উত্তেজনা-শক্তির উৎস কোথায়? গাণিতিক ভাষায় এই গতিবিধির বর্ণনা দেওয়া যাই-বা কিভাবে? এই সব প্রশ্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের মনে প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

ব্রাউনীয় সঞ্চালনের আবিষ্কারের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এ সম্বন্ধে ধারণা কিছু স্পষ্ট হতে শুরু করে। সেই সময়ে যে ধারণাটি গড়ে উঠে তা হল এইরূপ:— ধরা যাক, তরল পদার্থগুলি অণুর সমবায়ে গঠিত। এই অণু হল তরল পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক বস্তুকণা যার মধ্যে তরল পদার্থের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত আছে। তরল পদার্থের অণুগুলি যদি অবিরাম বিশৃঙ্খল গতিতে সঞ্চালিত হয়, তবে তরলের মধ্যে ভাসমান বস্তুকণার সর্বত্র বিভিন্ন দিক থেকে অণুগুলি বস্তুকণাকে আঘাত করবে। এর ফলে তরলে ভাসমান বস্তুকণাও চারদিকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হবে। অর্থাৎ, ভাসমান বস্তুকণার বিশৃঙ্খল গতি তরলের অণুর বিশৃঙ্খল গতিরই পরিচয় বহন করছে।

তৎকালীন বিচারে, উপরিউক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তি মূলত কতগুলি অনুমান। এই অনুমানগুলি হল— (ক) তরল পদার্থগুলি বা যে কোনও পদার্থ অণুর সমবায়ে গঠিত, এবং (খ) তরলের মধ্যে অণুগুলি বিশৃঙ্খল গতিতে অবিরাম সঞ্চরণশীল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও উপরিউক্ত অণুর অস্তিত্ব একটি অনুমান বলেই বেশ কিছু বিজ্ঞানী মনে করতেন। তাঁদের মতে, তখন পর্যন্ত অণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে তা গুণভিত্তিক নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ড্যানিয়েল বারনৌলী এবং

* সাহা ইন্সটিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

পরে ম্যাক্সওয়েল ও বোল্‌ট্‌জমান গ্যাসের আণবিক অস্তিত্ব ধরে নিয়ে তাত্ত্বিক পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার যে গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন এবং বিশেষ করে বয়েল (নিউটনের সমসাময়িক) এর আবিষ্কৃত পরীক্ষালব্ধ গ্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা দেন, তাও অনেকের কাছে অণুর অস্তিত্বের স্বপক্ষে যথোপযুক্ত পরিমাণভিত্তিক যুক্তি বলে বিবেচিত হয় নি। অন্য দিকে, বস্তুর আণবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে গ্যে-লুসাক, অ্যাভোগাড্রো এবং পরে লড্‌স্মিট্‌ গ্যাসীয় পদার্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন। গ্যাসের মধ্যে অণুগুলি প্রচণ্ড গতিতে ইতঃস্তত সঞ্চরণশীল। এই গতির ফলে অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে। পর পর দুটি সংঘর্ষের মধ্যে একটি অণুর গড়পড়তা গতি প্রচণ্ড হলেও প্রতি সেকেণ্ডে সংঘর্ষের সংখ্যা এত বেশি যে কোনও অণুই কোনও একস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে বেশি দূর এগোতে পারে না। এই অগ্রগতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক কম হলেও কোনও এক স্থানের অণুগুচ্ছ ধীরে ধীরে গ্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের ঘটনাকে ব্যাপন **(diffusion)** বলা হয়। লড্‌স্মিট গ্যাসীয় পদার্থে ব্যাপনের পরীক্ষালব্ধ ফল আলোচনা করে অণুর আয়তন এবং সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও সাধারণ তাপমাত্রায় একক আয়তনে কতগুলি অণু থাকতে পারে, তার একটি হিসাব দেন।

পদার্থের আণবিক সংগঠনের তত্ত্ব যখন এই অবস্থায় তখনই অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের ব্রাউনীয় সঞ্চালন বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি তরল পদার্থে নিমজ্জিত বর্তুলাকার বস্তুকণার গতিবিধি কি রকম হবে, সে সম্বন্ধে গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর বিশ্লেষণের মূল কথাটি ছিল এইরূপ—বর্তুলাকার বস্তুকণার সর্বত্র বিভিন্ন দিক থেকে তরলের অণু আঘাত করলে বস্তুকণার উপর এই সব সংঘাতজনিত বলের গড়পড়তা পরিমাণ হবে শূন্য। তখন বস্তুকণাটি অন্য সব নিমজ্জিত বস্তুকণার সঙ্গে মিলিতভাবে আদর্শে গ্যাসের মতন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। আদর্শ গ্যাসে অণুদের যেমন ব্যাপন হয়, বস্তুকণাগুলিও নিজেদের মধ্যে সেইভাবে ব্যাপ্ত হবে; এবং তার ফলে বিশেষ কোনও বস্তু-কণাকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেটি তরলের মধ্যে ব্যাপ্ত হচ্ছে। এই ব্যাপনের জন্যে বস্তুকণাদের ঘনত্বের ফ্লাক্‌চুয়েশান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, বস্তুকণাদের মধ্যে সংঘর্ষে নয়, বরং তরলের অণুদের সঙ্গে বস্তুকণার সংঘর্ষের ফলেই বস্তুকণাদের ঘনত্বের ফ্লাক্‌চুয়েশান হচ্ছে। আইনষ্টাইন দেখান যে এই ভাবে ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে কোনও একটি বস্তুকণা t সময়ের মধ্যে Δ দূরত্ব অতিক্রম করলে $(\Delta)^2/2t$ একটি ধ্রুবক হয়, এবং সেই ধ্রুবকটি হল বস্তুকণাদের মধ্যে ব্যাপনের ধ্রুবক। আবার যেহেতু বস্তুকণাগুলি নিজেদের মধ্যে ব্যাপ্ত হবার সময় তরলের মধ্য দিয়ে গতিশীল হচ্ছে, বস্তুকণাগুলির উপর সান্দ্রতার জন্যে একটি বল স্টোক্‌স্‌-এর নিয়মানুযায়ী ক্রিয়াশীল থাকবে। এর ফলে, উপরিউক্ত ব্যাপনের ধ্রুবক তরল পদার্থের সান্দ্রতার গুণাঙ্ক বস্তু-কণার ব্যাস ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হবে। তাছাড়া ব্যাপনের ধ্রুবক আদর্শ গ্যাসের নিয়মানুযায়ী তাপমাত্রা বোল্‌ট্‌জ্‌ম্যান ধ্রুবক-এর উপর নির্ভর তো করবেই। এগুলি বিবেচনা করে, আইনষ্টাইন ব্যাপনের ধ্রুবকের একটি সূত্র পান, এবং এই সূত্রের সঙ্গে ব্যাপনের ধ্রুবকের $(\Delta)^2/2t$ মানের সমতা ব্যবহার করে নিম্নোক্ত সূত্রটি আবিষ্কার করেন,

$$\Delta = \left(\frac{RT}{N} \cdot \frac{1}{3\pi\eta r}\right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{t}$$

R = গ্যাস-ধ্রুবক, N = অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা, η = তরলের সান্দ্রতার গুণাঙ্ক, r = বস্তুকণার ব্যাসার্ধ। উপরিউক্ত সূত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুকণা t সময়ের ব্যবধানে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তা $\sqrt{t}$-এর সমানুপাতী। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় ব্যবধানে বস্তুকণার অতিক্রান্ত দূরত্ব পরিমাপ করলে, এবং বস্তুকণার ব্যাসার্ধ, তরলের সান্দ্রতার গুণাঙ্ক,

গ্যাস-ধ্রুবকের মান জানা থাকলে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা, N-এর মান পাওয়া যাবে। আইনষ্টাইন এই প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেন যে ব্রাউনীয় কণিকার গতিবিধিও উপরিউক্ত সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে, কারণ ব্রাউনীয় কণিকাও তরলের মধ্যে নিমজ্জিত বস্তুকণিকা। তবে সে সময়ে ব্রাউনীয় কণিকার গতিবিধির উপর পর্যবেক্ষণ অনেক হলেও উপরিউক্ত সূত্রটির যথার্থতা পর্যালোচনা করার মতন যথেষ্ট পরিমাণভিত্তিক পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য ছিল না। সেই জন্যে আইনষ্টাইন নিজে ব্রাউনীয় সঞ্চালনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সূত্রটির যথার্থতা আলোচনা করতে পারেন নি। আইনষ্টাইনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার তিন বছরের মধ্যেই জে বি পেরিন সতর্কতার সঙ্গে ব্রাউনীয় সঞ্চালনের পর্যবেক্ষণ করে আইনষ্টাইনের সূত্রের যথার্থতা প্রমাণ করেন। আইনষ্টাইনের এই বিশ্লেষণের এবং পেরিনের পরীক্ষার বিশদ বর্ণনা আজকার কলেজের অনেক পাঠ্যপুস্তকেই পাওয়া যায়। সেজন্যে এই বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হল না।

আইনষ্টাইনের এই বিশ্লেষণের বিশেষত্ব হল যে, তিনি এক্ষেত্রে পুরোপুরি পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার না করে, অসমোটিক চাপ ও স্টোক্সের নিয়মের মতন পরীক্ষাসিদ্ধ কতগুলি সূত্রের ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলে, তদানীন্তন সন্দিগ্ধ বিজ্ঞানীদের পক্ষে তাঁর সূত্রটিকে স্বীকার করা অনেক সহজ হয়েছিল। আইনষ্টাইন ও পেরিনের উপরিবর্ণিত গবেষণার পরই সব বিজ্ঞানীই পদার্থের আণবিক সংগঠন সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হন, এবং এবিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়। সেজন্যে 1905 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আইনষ্টাইনের এই প্রবন্ধটিকে বস্তুর কণিকাবাদ তত্ত্বের সমর্থনে একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা হয়।

মহাবিশ্বের ইতিবৃত্ত

রমাতোষ সরকার*

আকাশ ও পৃথিবীর *সৃষ্টি* হয় খৃষ্টপূর্ব 4004 সনে, এ-কথা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেন বৃটেনের একজন ধর্মযাজক, আরচবিশপ জেমস আশার (James Ussher); আর, সে-ঘটনার দিন-ক্ষণ যে ছিল 23শে অক্টোবর সকাল 9টা, সে-কথাটা যোগ করেন তাঁর কিছু যোগ্য অনুগামী। এই ধ্রুব সত্য ওঁরা নাকি পেয়েছিলেন প্রাচীন হিব্রু ধর্মপুস্তক বর্ণিত গূঢ় তথ্য বিশ্লেষণ করে। তারিখ আর সময়টা গ্রীনিজের না অন্য কোন জায়গার হিসাবে, সেটাই শুধু ওঁরা উল্লেখ করেন নি।

ভাবতে অবাক লাগে, কিন্তু ইউরোপের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের একটা অংশে এ-ঘোষণা তখন সমাদর পেয়েছিল, বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে সভ্যতাভিমানী মানুষের কৌতূহল অন্তত কিছুটাও তৃপ্ত হয়েছিল আশারের 'আষাঢ়ে গল্প' শুনে।

কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতিযোগী হিসাবে রূপকথার দিন আজ বিগত হয়েছে। রূপকথা রচনার মূল্য এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে; কিন্তু সে অন্য মূল্য, মানুষের মনন-ক্রিয়ার অন্য এক ক্ষেত্রে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার আজ 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' (cosmogony)-এর উপর ন্যস্ত।

* বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, কলকাতা-700 071

রূপকথার যুগ থেকে বিজ্ঞানের যুগে উত্তরণ সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটিয়েছে, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। এক দিক থেকে বরং বলা যায় যে, জিজ্ঞাসু মনের অতৃপ্তি বিজ্ঞান এক্ষেত্রে আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে; কারণ, বিজ্ঞান মানুষের প্রশ্ন করার ক্ষেত্র অনেক গুণ প্রসারিত করেছে। আগে —এমন কি 50।60 বছর আগেও মানুষ বিশ্ব বলতে যা বুঝত, প্রকৃত বিশ্ব যে অসংখ্য অনুরূপ বিশ্বের সমবায়, এ-কথা বিজ্ঞান আজ সন্দেহাতীতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছে। 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' তাই এক প্রশাখা বিজ্ঞান মাত্র; মূল বিজ্ঞান আজ 'বিশ্ববিজ্ঞান' (cosmology) —যার উপজীব্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা, উদ্দেশ্য তার সমগ্র অতীত-বর্তমানের ইতিবৃত্ত রচনা করা, আর উচ্চাশা হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক তত্ত্ব নিরূপণ করা।

দূর মহাকাশে জ্ঞানরাজ্যের এই দ্রুত বিস্তৃতিতে মানুষকে যা রসদ সরবরাহ করেছে, অশেষ সাহায্য করেছে, তা হল বিরাট বিরাট দূরবীন, যাকে সম্ভব করে তুলেছে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা; আর বিশেষ সাহস জুগিয়েছে অনেক সময়ে পথ-নির্দেশ করেছে 'আপেক্ষিকতাবাদ', যার উদ্‌গাতা অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন।

বাস্তবিক পক্ষে 1918 সালে যেদিন আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে 100 ইঞ্চি ব্যাসের এক দূরবীন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেদিনই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের পুরানো ধ্যানধারণার মৃত্যু-পরোয়ানা লেখা হয়েছে।

আর আইনষ্টাইন যথাক্রমে 1905 ও 1916 সালে 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' ও 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ' প্রচার করে—জড় ও শক্তির, স্থান ও কালের মধ্যে অজানা অপ্রত্যাশিত নতুন সম্পর্ক নির্দেশ করে, মহাবিশ্বকে অনুধাবন করার পথকে সুপ্রশস্ত ও আলোকিত করেছেন।

আগের দিনে, অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত, বিজ্ঞানীরা 'মহাবিশ্ব' বা 'বিশ্ব' (Universe)-কে প্রধানত তারার সমবায়রূপে কল্পনা করতেন। সংখ্যাহীন তারা বিশাল মহাকাশের সর্বত্র এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এই ছিল ওঁদের কাছে মহাবিশ্বের রূপরেখা। সৌর-জগতের মত 'নাক্ষত্র জগৎ' অন্যান্য তারাদের ঘিরেও থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, এটা ছিল ওঁদের একটি কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা-গবেষণার বিষয়। তারা ছাড়া মহাকাশে কিছু কিছু মেঘের মত বস্তুও অবশ্য ওঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেগুলিকে ওঁরা বলতেন 'নীহারিকা' (nebula)। এক সময়ে ওঁরা মনে করতেন যে নীহারিকারা সব গ্যাসের বা ধূলিকণা মিশ্রিত গ্যাসের সমষ্টি। দূরবীনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ওঁরা জানতে লাগলেন যে, কিছু কিছু নীহারিকা কোনরূপ গ্যাসের সমষ্টি নয়, তারার সমষ্টি—অনেক তারা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কিন্তু সে-তুলনায় পরস্পরের কাছে থেকে ঐ মেঘের রূপেই দেখা দেয়। তখন পার্থক্য সূচিত করতে ওঁরা 'গ্যাসীয় নীহারিকা' আর 'নাক্ষত্র নীহারিকা' নামগুলি ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু আঠারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নীহারিকারা বিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় কোন গুরুত্বই পায় নি; আর তার পরেও, ক্রমশ বেশ কিছু সংখ্যক নীহারিকা তারাসমষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও, ওঁরা সেগুলির বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন করার প্রায় কোন চেষ্টাই করেন নি।

তথাকথিত নাক্ষত্র নীহারিকারা বিজ্ঞানীদের চিন্তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিতে শুরু করল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তখন দূরত্ব-নির্ণয়ের নবতম কৌশল প্রয়োগ করে ক্রমে ক্রমে এ-তথ্য ওঁরা আবিষ্কার করতে লাগলেন যে, নাক্ষত্র নীহারিকার তারাগুলি ঠিক সাধারণ তারাদের মত নয়—ওরা সব আছে অসাধারণ বেশি দূরত্বে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, পৃথিবী থেকে সাধারণ একটি তারার দূরত্ব যেখানে খুব বেশি হলে হয় 80 হাজার আলোক-বর্ষের মত, সেখানে

নাক্ষত্র নীহারিকার অন্তর্গত একটি তারার দূরত্ব খুব কম হলেও (এত কম যে, তাকে বিশেষ ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করতে হয়), তা হবে প্রায় 1 লক্ষ 70 হাজার আলোক-বর্ষের মত। এই তথ্যের আলোতে বিজ্ঞানীদের যেন নতুন করে বিশ্বরূপ-দর্শন ঘটল। কয়েকটি নতুন ধারণা ওঁদের চিন্তাভাবনায় স্থান করে নিল, তাদের বোঝাতে নতুন শব্দের সৃষ্টি করতে হল বা পুরানো শব্দের অর্থের কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হল। ওঁরা বুঝলেন যে, মহাকাশে তারার বণ্টন খুবই বৈষম্যমূলক: এক এক জায়গায় বিশাল এলাকা জুড়ে অনেক তারা তুলনামূলক বিচারে পরস্পরের কাছে থেকে এক-একটি জোট গঠন করে রেখেছে, কিন্তু দুটি প্রতিবেশী জোটের অন্তর্বর্তী বিশালতর এলাকা জুড়ে কোন তারাই নেই। এমন এক-একটি জোটের নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্মাণ্ড' (galaxy), তাদের মধ্যবর্তী স্থানের নাম 'আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশ' (inter-galactic space)। সমগ্র মহাকাশ তার সমগ্র জড় ও শক্তির সম্ভার নিয়ে যা গঠন করেছে, যাকে বলা হয় 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' বা মহাবিশ্ব' বা সংক্ষেপে শুধুই 'বিশ্ব' (Universe), তা অবশ্য 'ব্রহ্মাণ্ড'-র সঙ্গে সমার্থক নয়। বিজ্ঞানীরা এখন সবিস্ময়ে উপলব্ধি করেছেন যে, আগের যুগে ওঁরা 'বিশ্ব' বলতে যা বুঝতেন যার সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান ওঁরা ধীরে ধীরে অনেক শতাব্দী ধরে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন, তা যেন বিরাটতর কিছুর অংশ মাত্র, তার বাইরেও অনেক কিছু ছিল বা আছে। আগেকার ধারণার 'বিশ্ব' তাই এখন হয়েছে 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড' (our galaxy) বা (তার এক রূপ দীর্ঘদিন ধরে 'ছায়াপথ' নামে পরিচিত ছিল বলে) 'ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড' (milky way galaxy)। বিজ্ঞানীরা এখন জানেন যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড আরও অনেক ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিতভাবে গড়ে তুলেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মাণ্ড আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পার্থক্যের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের অবহিত করার পরেই, আধুনিক দূরবীন তথা আধুনিক পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের কাছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করল। জানা গেল যে, মহাকাশে ব্রহ্মাণ্ডের বণ্টনও (তারাদের মতই) বৈষম্যমূলক—স্থানে স্থানে কিছু সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড জোটবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু দুই জোটের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ব্রহ্মাণ্ডই নেই। এই জোটগুলিকে ওঁরা নাম দিয়েছেন 'ব্রহ্মাণ্ডজোট (group or cluster of galaxies)। 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড' যে-জোটের মধ্যে রয়েছে, সেটির নাম 'স্থানীয় জোট' (local group or local cluster)। এমন আরও অনেক জোটের সন্ধান ওঁরা পেয়েছেন—'কন্যা জোট' (Virgo cluster), 'কোমা জোট' (Coma cluster) ইত্যাদি। স্থানীয় জোটে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড থেকে বেশ দূরে আছে যে-ব্রহ্মাণ্ডগুলি, তাদের দূরত্ব প্রায় 20 লক্ষ আলোকবর্ষের মত; অপর পক্ষে, স্থানীয় জোট থেকে কন্যা জোটের দূরত্ব প্রায় 3 কোটি 30 লক্ষ আলোকবর্ষ, কোমা জোটের প্রায় 24 কোটি আলোকবর্ষ ইত্যাদি।

আধুনিক পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞান অতঃপর যে-তথ্যটি প্রকাশ করল তাতে বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা আবার এক প্রচণ্ড নাড়া খেল, যদিও আইনষ্টাইনের তত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি তার প্রথম পূর্বাভাস বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়েছিল 10 বছরেরও বেশি আগে এবং তার পরেও প্রকারান্তরে আরও কয়েকবার। 1929 সালে প্রখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী এডুইন হাব্‌ল্ সে-তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন এবং তার কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সুযোগ্য সহযোগী হুমাসন তার ক্ষেত্র আরও অনেক দূর প্রসারিত করেন। বর্ণালীর লাল-অপসরণের মাধ্যমে পাওয়া সে-তথ্যটি এই যে, ব্রহ্মাণ্ডজোটগুলি মহাকাশে স্থির নয়—প্রতিটি জোট অপর প্রতিটি জোটের কাছ থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছে, আর সরার বেগ দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে

সঙ্গে বেড়েই চলেছে : তত্ত্ব যা ইঙ্গিত করেছিল তথ্য সেটাকেই সমর্থন করল মহাবিশ্ব 'অচল' বা 'স্থির' (static) নয়, 'সচল' বা 'অস্থির' (non-static)।

ব্রহ্মাণ্ডজোটদের এই 'অপসরণ বেগ' নির্ণয় করা হয়েছে। হাব্‌ল্‌, যে মাননির্ণয় করেছিলেন, পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা পর পর কয়েক বার তার সংশোধন করেছেন। অ্যালান স্যানডেজ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ মান হল—প্রতি 10 লক্ষ আলোকবর্ষে প্রতি সেকেণ্ডে 17 কিলোমিটার; অর্থাৎ, অপসরণশীল ব্রহ্মাণ্ডদের বেগ 10 লক্ষ আলোকবর্ষ অন্তর সেকেণ্ডে 17 কিলোমিটার হারে বেড়ে চলেছে।

ব্রহ্মাণ্ডগুলির পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাওয়ার যে-তথ্য হাব্‌ল্‌ কর্তৃক বিশের দশকের শেষে আবিষ্কৃত হল, তাকে ভিত্তি করে বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে একাধিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে যেটি প্রধান তাকে 'প্রারম্ভবাদ' (theory of the beginning) বা 'উদ্‌বর্তনবাদ' (theory of evolution) নামে অভিহিত করা যায়। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন আমেরিকা-প্রবাসী রুশ-বিজ্ঞানী জরজ গ্যাম্‌অ। মূলত এঁর প্রস্তাবিত 'প্রকল্প' (hypothesis) এবং 'প্রতিমূর্তি' (model) অবলম্বন করেই এ-বিষয়ে অনেক বিস্তৃত আলোচনা-গবেষণা হয়েছে।

প্রারম্ভবাদীদের মতে ব্রহ্মাণ্ডজোটগুলি আজ যে-সব পথ ধরে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগে ধাবমান, সে-পথগুলি ধরে উল্টোমুখে চললে মহা-কাশের একটা জায়গায় গিয়ে পৌছান যায় (অর্থাৎ, ওঁদের মতে জোটগুলির গতিপথগুলি সব প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের পথগুলির মত—সব পথেরই শুরু একই জায়গা থেকে। জোটগুলি যাত্রা শুরু করেছে কোন এক দিন এক সময়ে সেই একই জায়গা থেকে, বিভিন্ন পথে ক্রমবর্ধমান গতিবেগে সে-চলা আজও চলেছে।

জোটগুলির বর্তমান দূরত্ব, গতিবেগ ইত্যাদি সাধ্যমত নির্ণয় করে, তার সাহায্যে হিসাব কষে প্রারম্ভবাদীরা মোটামুটিভাবে স্থির করেছেন কতদিন আগে এ-চলার শুরু হয়ে থাকতে পারে। সে প্রায় 10 থেকে 20 শ' কোটি (billion) বছর আগে। ওঁরা সেটাকেই মোটামুটিভাবে মহাবিশ্বের বয়স বলে মনে করেন। ওঁদের প্রকল্প অনুসারে, ঐ সময়ে মহাকাশে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেই জায়গায় যেখানে ব্রহ্মাণ্ডজোটদের গতিপথগুলি মিলেছে; বর্তমান মহাবিশ্বের সৃষ্টি সেই মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। বিস্ফোরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা-প্রচেষ্টার দরুণ, প্রারম্ভবাদের আর এক নাম মহাবিস্ফোরণবাদ (Big Bang Theory)।

প্রারম্ভবাদীদের বক্তব্য শুনলে বোঝা যায় যে, বিশ্বসৃষ্টির প্রসঙ্গে ওঁরা 'সৃষ্টি' কথাটিতে একটি বিশেষ অর্থ আরোপ করে থাকেন। গ্যাম্‌অর ভাষায় এ সৃষ্টি 'making something out of nothing' নয়, এবং 'making something shapely out of shapelesness'। এ-সৃষ্টির পূর্বের কথা কল্পনা করতে তাই কোন যুক্তিগত বাধা নেই। ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গে পঞ্চম শতাব্দীতে সেণ্ট অগাষ্টীন একবার এক অচিন্তিতপূর্ব প্রশ্নের আলোচনা করেছিলেন—ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার আগে কি করছিলেন? তাঁর ঐ-প্রচেষ্টার কথা মনে রেখে, গ্যাম্‌অ আধুনিক বিজ্ঞান-কল্পিত প্রাক্‌-সৃষ্টি যুগকে 'সেণ্ট অগাষ্টীনের যুগ' (St. Augustine's era) নাম দিয়েছেন।

প্রারম্ভবাদীদের প্রকল্প এবং বিশ্লেষণ অনুসারে বোধ হয় সেণ্ট অগাষ্টীনের যুগ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে কোনদিনই নিশ্চিত ভাবে কোন কিছুই জানা সম্ভব হবে না। মহা-প্রলয়ংকর যে-বিস্ফোরণের কথা বলা হয়েছে, তাতে সৃষ্টিপূর্ব যুগের সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে, সে যুগের যা কিছু নিদর্শন আর সাক্ষ্যপ্রমাণ। আমাদের মহাবিশ্বের যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তা এক নতুন বস্তু; এর মধ্যে পুরানো যুগের

স্বাক্ষর কিছুমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। কল্পনা করা যেতে পারে (কিন্তু কল্পনার সমর্থনে কোন ঘটনাকে খাড়া করা যাবে না) যে, সেন্ট অগাষ্টীনের যুগে একবার কোন এক কারণে সে-যুগের 'বিশ্ব'-র সমস্ত 'বস্তু' মহাকাশের কোন এক বিন্দুর দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়েছিল, আর সেই মহাসঙ্কোচন (big sqeeze)-এর ফলে ঘটেছিল এক মহাজাগতিক সংঘর্ষ (cosmic collision)। সেই সংঘর্ষের ফলে যে-ধ্বংসকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, কোন তুলনা দিয়ে তাকে বোঝা যাবে না। পুরানো 'বস্তু' তার আকৃতি ও প্রকৃতির কিছুমাত্র বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি সেই ধ্বংসের হাত থেকে। ধ্বংসশেষে যা পড়েছিল তা এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ। গ্যামভ তার নাম দিয়েছেন 'আইলেম' (Ylem)। আমাদের আজকের পরিচিত যত পরমাণু, যাদের সমবায়ে আমাদের অণু থেকে ব্রহ্মাণ্ডজোট পর্যন্ত সব কিছু গঠিত, সব সেই আইলেম থেকেই উৎপন্ন। দুটি কঠিন বস্তুখণ্ডের মধ্যে সংঘর্ষ হলে, চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয় আর তারা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরতে থাকে; প্রারম্ভবাদীদের মতে, তাঁদের কল্পিত আইলেমের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মাণ্ডজোটগুলির দূর-সঞ্চরণ সম্ভবত মহাজাগতিক সংঘর্ষের অনুরূপ পরিণতি।

কিন্তু প্রারম্ভবাদীদের বক্তব্যের প্রতিবাদ হয়েছে। বিশ্বের শুরু নেই, শেষ নেই, মহাকালে অনাদি, অনন্ত এর ব্যাপ্তি—এ-রকম একটা ধারণা অনেক দিন ধরে বিজ্ঞানের রাজ্যে আশ্রয় পেয়ে আসছিল; কিছুটা প্রকাশ্যে, কিছুটা প্রচ্ছন্ন ভাবে। তাই বিশ্বের অতীত সীমাহীন নয়, এক বিশেষ লগ্নে এর জন্ম বা সৃষ্টি হয়েছে, প্রারম্ভবাদীদের এ-ঘোষণা বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয় নি। প্রতিবাদের জবাবে প্রারম্ভবাদীরা ভূবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাক্ষ্য সংগ্রহ করে এনে বলেছেন যে, বাস্তবের নির্দেশ তাঁদেরই পক্ষে। ওঁরা বলেন বিশ্বের বিভিন্ন অংশ, তার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বয়স আছে, তাদের উৎপত্তি হয়েছে কোন না কোন এক সময়ে; সব মিলিয়ে যে বিশ্ব তারও তাই বয়স থাকাটাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

প্রথমে আমাদের পৃথিবীর কথাটাই ধরা যাক। এর কি কোন বয়সের ঠিক-ঠিকানা নেই, এ কি আবহমান কাল থেকেই রয়েছে? বিজ্ঞানীরা নানান দিক থেকে হিসাব খাড়া করতে চেষ্টা করেছেন। সাগর জলে লুনের বর্তমান পরিমাণ আর নদীগুলি কি হারে সাগরে লুন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে একটা হিসাব আসে। সুদূর অতীতের গলিত অবস্থা থেকে বর্তমানের কঠিন ভূপৃষ্ঠ গঠিত হতে কি সময় লাগতে পারে, তারও একটা হিসাব আছে। হিসাব আছে এমন আরও অনেক ঘটনার। আর সবশেষে পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর সীসার আপেক্ষিক পরিমাণ থেকে প্রায় সঠিক ভাবেই বলা যায় পৃথিবীর অন্যতম উপাদান ঐ মৌলিক পদার্থগুলি, আর সেই সূত্রে মোটামুটিভাবে অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলিও কবে সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে কষা হিসাব-গুলি পরস্পর বিরোধী তো নয়ই বরং বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐ হিসাবগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা-গুলির বয়স প্রায় 3শ' কোটি বছর, আর পৃথিবীর বয়স 4.5শ' কোটি বছর বা তার কিছু বেশি। পৃথিবী ছাড়া মহাবিশ্বের আর যে অঙ্গকে সরাসরি পরীক্ষা করার সুযোগ দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ছিল তা হচ্ছে উল্কাপিণ্ড। বিজ্ঞানীরা তাদের নিয়েও পরীক্ষা চালিয়েছেন – হিসাব করেছেন তাদের সম্ভাব্য বয়স। সে-হিসাব অনুসারে উল্কাপিণ্ডদের বয়স হচ্ছে 4.3 থেকে 5শ' কোটি বছরের মত। সম্প্রতি নভশ্চারণাবিদ্যা (astronautics)-র দৌলতে চাঁদের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সুযোগ এসেছে, তারও বয়স-নির্ণয় করা গেছে, আর সে-বয়সটাও প্রারম্ভ-বাদের সমর্থকেরা আজকাল উদ্ধৃত করে থাকেন। দেখা গেছে যে, চাঁদ হচ্ছে পৃথিবী বা উল্কাদের সমবয়সী। সূর্য প্রভৃতি তারাদের সম্পর্কেও একটা

হিসাব আছে। ওদের রং আর ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে একটা সম্পর্কও আবিষ্কার করে, বিজ্ঞানীরা ওদের উদবর্তনের একটা সাধারণ ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। আর তার ফলে ওদেরও বয়স নির্ণয় করতে পেরেছেন। ওদের হিসাব মত অত বৃদ্ধ তারাদের বয়স হচ্ছে 10 থেকে 20শ' কোটি বছরের মধ্যে।

ব্যাপারটা প্রণিধানযোগ্য। দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের পৃথক পৃথক অংশের, এমন কি তার মূল রাসায়নিক উপাদান পরমাণুদেরও 'সৃষ্টি' হয়েছে কোন না কোন এক সময়ে, তাদের তাহলে বয়স আছে। আর ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হিসাবে অঙ্ক কষে দেখা যাচ্ছে যে, সে বয়স সব ক্ষেত্রেই হচ্ছে কয়েক শ' কোটির ঘরে। এটা কি কিছুই নির্দেশ করে না? বিশ্বেরও কি তাহলে একটা বয়স নেই, আর সে-বয়সটা কি কয়েক শ' কোটি বছরেরও মত নয়? বিরুদ্ধবাদীদের কাছে প্রারম্ভবাদীদের এই প্রশ্ন।

বিরুদ্ধবাদীদের বিকল্প যে-মতবাদ এ-যাবৎকাল বিজ্ঞানী সমাজে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পেয়েছে, তাকে বলা হয় 'স্থিতাবস্থাবাদ (Theory of steady state)। এই মতবাদের প্রস্তাবক এবং প্রধান প্রধান সমর্থকেরা প্রায় সবাই ইংরেজ—হারমান বনডি, টমাস গোল্ড্, ফ্রেড হয়েল প্রমুখ। খুঁটিনাটি প্রশ্নে এঁদের মধ্যেও কিছু কিছু মত-পার্থক্য আছে—কিন্তু এঁরা সবাই মনে করেন যে মহাবিশ্বে বস্তুসৃষ্টি চলেছেই এবং চলবেই, আর সেটাই এঁদের বক্তব্যের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিক। তাই এঁদের মতবাদের বিকল্প নাম হচ্ছে 'নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টির মতবাদ' (Theory of continuous creation)।

বিগত কয়েক শতক ধরে সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার পিছনে যে কয়েকটি মূলনীতি কার্যকরী ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান দুটি হল 'বস্তু-পরিমাণের নিত্যতার নীতি' এবং 'শক্তি-পরিমাণের নিত্যতার নীতি'। এগুলি পরীক্ষিত নীতি এই দাবীতে অনেকে এদের 'নীতি' না বলে 'বিধি' (law) নামেও অভিহিত করতেন। এই দুই নীতি অনুসারে বিশ্বে বস্তু এবং শক্তির মোট পরিমাণটা পৃথক পৃথক ভাবে অপরিবর্তনীয়, তার কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আইনষ্টাইনের হাতে এই স্বীকৃত নীতি দুটো কিছুটা ধাক্কা খায়, কিন্তু সে ধাক্কা সামলে নেবার মত—রূপান্তরিত হয়ে তাদের বাঁচার উপায় আইনষ্টাইনই নির্দেশ করে দেন। আইনষ্টাইন দেখান যে, বস্তুর বা শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস হতে পারে—কিন্তু একটি অপরটির বিনিময়ে, অর্থাৎ বিশ্বে এককভাবে বস্তুর বা শক্তির পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, ঘটে অপরটির আনুপাতিক বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিয়ে।

প্রারম্ভবাদীরা এই নীতিটা মানেন। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বে সৃষ্টি মোটের উপর একেবারেই হয়েছে—সেই মহাবিস্ফোরণের সময়ে। সেই সময়ে উৎপন্ন যত শক্তি আর ইলেকট্রন প্রভৃতি অন্তিম বস্তুকণিকাই বিশ্বের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র উপাদান। বিস্ফোরণের দরুণ দিকে দিকে সবেগে নিক্ষিপ্ত শক্তি ও বস্তুকণার মিশ্রণ ধীরে ধীরে তাপ হারিয়ে ঘনীভূত হয়ে গঠন করেছে বিরাট বিরাট নীহারিকা, যা থেকে ক্রমশ এসেছে ব্রহ্মাণ্ডজোট, ব্রহ্মাণ্ড, তারা প্রভৃতি যা কিছু আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আয়তনে বেড়েই চলেছে! অতএব, অনিবার্যভাবে তাতে বস্তু ও শক্তির গড় ঘনত্ব (average density) কমেই চলেছে। প্রারম্ভবাদীরা তাই মনে করেন।

স্থিতাবস্থাবাদীরা কিন্তু তা করেন না। এঁরা বলেন, এই ঘনত্বটা অপরিবর্তনশীল, আবহমানকাল থেকে এর মান একই আছে, একই থাকবে ভবিষ্যতে। কারণ, বিশ্বের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে। আর, শুধু ঘনত্ব নয়, মোটামুটিভাবে সারা বিশ্বের কোন মূলগত, গুরুত্বসম্পন্ন পরিবর্তন হচ্ছে না—যা হচ্ছে তা হল ছোটখাট স্থানীয় খুঁটিনাটির পরিবর্তন; সৃষ্টি কোন

এক বিশেষ মুহূর্তে একেবারে হয় নি—তা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে নির্বিশেষে সকল মুহূর্তে।

মহাকাশের বস্তুর গড় ঘনত্বটা এত কম আর সেই সঙ্গে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বেগও এতই মন্থর যে, গড় ঘনত্বটা বজায় রাখতে খুব বেশি বস্তু সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে না। স্থিতাবস্থাবাদীদের হিসাব মত, প্রতি হাজার কোটি বছরে এক ঘন মিটার স্থান পিছু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হলেই হবে। ওঁদের মতে নতুন সৃষ্ট এই হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভারী পরমাণু গঠিত হয় যা থেকে ধাপে ধাপে নতুন ব্রহ্মাণ্ডজোট গঠিত হয়, সেগুলি সরে যায়, শূন্য স্থান পূরণ করে নবজাত ব্রহ্মাণ্ডজোট।

স্থিতাবস্থাবাদীদের মতে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড থেকে বহুদূরের যে-ব্রহ্মাণ্ডজোট আজ আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, সে-ব্রহ্মাণ্ডজোট কোন দিনই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে দৈহিকভাবে যুক্ত ছিল না, তার জন্যই হয়েছে আমাদের কাছ থেকে দূরে। প্রারম্ভবাদ অনুসারে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডজোটগুলির দূর-অপসরণ শুরু হয়েছে মহাকাশের একই জায়গা থেকে, পরস্পরের সঙ্গে প্রচণ্ড গা-চাপাচাপি অবস্থা থেকে।

প্রারম্ভবাদীদের এক প্রশ্নের জবাবে স্থিতাবস্থাবাদ বলে যে, যদিও বিশ্বের অতীত সীমাহীন, সব পরমাণুগুলির তা নয়। তাই পুরোপুরি সীসায় পরিণত হয়ে যায় নি এমন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আজও বিশ্বে দেখতে পাওয়া যায়; এদের পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত কম বয়সী।

বস্তু বা শক্তির পরিমাণের নিত্যতার ধারণাটা, স্থিতাবস্থাবাদ অনুসারে, একটি 'প্রকল্প' মাত্র—বিধি অবশ্যই নয়। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট বস্তু বা শক্তির পরিমাণটা অপরিবর্তনশীল, এটা সত্যিই কিছু বিজ্ঞানীদের মেপে দেখা নয়। ওটা মানুষের পরীক্ষাগারে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত। মানুষের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাটা স্থান-কালের পটভূমিতে খুবই সীমিত, তার যন্ত্রপাতিরও সেই অবস্থা। তাই পৃথিবীর পরীক্ষাগারে লব্ধ ফলটাকে মহাকাশের এবং মহাকালের সর্বত্র চাপিয়ে দেওয়ার পিছনে প্রয়োজনের তাগিদ থাকতে পারে, আরও কিছু থাকতে পারে, কিন্তু যুক্তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশ নেই। ঐ ধারণা প্রকল্প হিসাবে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক কাজ দিয়েছে। কিন্তু আজ প্রয়োজন হলে উন্নততর প্রকল্পের অনুকূলে তাকে ত্যাগ করা যেতে পারে। এটাই আত্মপক্ষ-সমর্থনে স্থিতাবস্থাবাদীদের প্রধান যুক্তি।

বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদের পক্ষে-বিপক্ষে আরও কিছু যুক্তি-তর্ক ছিল। তার কিছুটা বিজ্ঞানঘটিত আর কিছুটা নিছক দর্শনঘটিত (epistemological)। কিন্তু তাতে কিছু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হত না। আসলে এর সমাধান ছিল পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হাতে।

সম্প্রতি পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞান এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করেছে আর সেগুলি সবই স্থিতাবস্থাবাদের প্রতিকূল।

প্রথমত, দেখা গেছে যে, আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে কিন্তু সে-তুলনায় পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড জোটগুলির মধ্যে কোন ক্ষেত্রেই বয়সের পার্থক্যের কোন লক্ষণ নেই; অর্থাৎ, একই দূরত্বে অবস্থানকারী ব্রহ্মাণ্ডজোটরা সবক্ষেত্রেই সমবয়সী। স্থিতাবস্থবাদ অনুসারে কিন্তু এমন হওয়ার কথা নয়; এ-মতবাদ অনুযায়ী দুটি প্রধান ব্রহ্মাণ্ড জোটের মধ্যবর্তী স্থানে ধীরে ধীরে নতুন জোটের জন্ম হতে পারে বা হয়।

দ্বিতীয়ত, 1960 সাল থেকে কোয়াসার নামে এক নতুন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হতে শুরু করেছে। যারা সব ব্যতিক্রমহীনভাবে আছে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কোন একটিও (তারাদের বা ব্রহ্মাণ্ডদের মত) কাছে নয়। যেহেতু মহাকাশে যে বস্তুকে যত দূরে দেখা যায়, তার দৃষ্টরূপ ততই (বর্তমানের না হয়ে) তার বিগত অতীতের রূপ হয়, অতএব কোন কোয়াসার কাছে না থাকার অর্থ—নিকট অতীতে কোন কোয়াসারের জন্ম না হওয়া। এ-তথ্য নিশ্চয় স্থিতাবস্থাবাদকে সমর্থন করে না, কারণ,

ঐ-মতবাদ অনুসারে মহাবিশ্বের সামগ্রিকভাবে কোন উদ্বর্তন নেই—তার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের রূপ মোটামুটি ভাবে একই।

তৃতীয়ত, 1965 সালে প্রথম আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীজ-এর পেনজিয়াস (Pengias) ও উইলসন (Wilson) নামের দুই বিজ্ঞানীর কাছে মহাকাশ থেকে ভেসে-আসা ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এক রেডিও বিকিরণ ধরা দিয়েছে, যা আসছে সব সময়ে সমপরিমাণে সবদিক থেকে। গ্যামভ প্রমুখ কয়েকজন প্রারম্ভবাদী এমন বিকিরণের সম্ভাবনার কথা 40-এর দশকেই ঘোষণা করেছিলেন। এঁদের তত্ত্ব অনুসারে সৃষ্টির প্রায় সমসাময়িক কালে তখনকার মহাবিশ্ব এমন এক বিকিরণে আচ্ছন্ন ছিল। মহাবিশ্ব যত বিস্ফারিত হচ্ছে, সে-বিকিরণ ততই ছড়িয়ে পড়ছে, ক্ষীণতর হচ্ছে এবং তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ততই বাড়ছে। এঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, সে বিকিরণ এখনও ধরা দিতে পারে, ধরা দিলে বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে-আসা সে-বিকিরণ ধরা দেবে রেডিও তরঙ্গের রূপে আর তা আসবে আমাদের চতুর্দিক থেকে সমপরিমাণে।

পর্যবেক্ষণলব্ধ সাম্প্রতিক এই তথ্যগুলি দাঁড়িপাল্লাকে স্থিতাবস্থাবাদের বিপক্ষে অনেক পরিমাণে ঝুলিয়ে দিয়েছে, সন্দেহ নেই, তাই বলে প্রারম্ভবাদ যে এখন সব বিজ্ঞানীর পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে, তা নয়। কারণ ইতিপূর্বেই বিকল্প হিসাবে তার এক শাখা-মতবাদের উদ্ভব হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ড জোটগুলির পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাওয়ার যে ঘটনা আজ স্বীকৃত সত্য, প্রারম্ভবাদীরা তাকে অনুসরণ করেছেন সুদূর অতীত পর্যন্ত, তাঁদের কল্পিত মহাবিস্ফোরণের লগ্ন পর্যন্ত; আর অনাগত ভবিষ্যতেও এই সরে যাওয়া চলতেই থাকবে, এই রায় দিয়েছেন। এঁরা এঁদের তত্ত্বে মহাবিশ্বকে যে-রূপ দিয়েছেন, তাতে মহাবিশ্বের এক সার্থক কিন্তু দুর্বোধ্য নাম হয়েছে 'স্ফীয়মান মহাবিশ্ব' (Expanding Universe)। এই তত্ত্বের বিরোধী কেউ কেউ কিন্তু মহাবিশ্বকে 'স্পন্দমান মহাবিশ্ব' (Pulsating Universe) রূপে কল্পনা করেছেন। এঁরা মনে করেন যে, মহাবিশ্বের বর্তমান স্ফীতিশীলতা একটি সাময়িক ঘটনা। এই চলার বেগ মহাকর্ষে বাধায় ক্রমশ মন্থর হচ্ছে, একদিন নিঃশেষিত হবে, আর তারপর তা হবে বিপরীতমুখী—ক্রমবর্ধমান বেগে মহাকাশের যত ব্রহ্মাণ্ড ছুটে যাবে পরস্পরের দিকে। তারপর? তারপর হবে আবার এক মহাপ্রলয়ংকর সংঘর্ষ, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, শুরু হবে আবার নতুন এক 'বিশ্ব'র সৃষ্টি। সৃষ্টির এক হিসাবে শুরু আছে, শেষ আছে; আবার অন্য দিক থেকে তা অনাদি অনন্ত। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—এই বৃত্তে চলেছে প্রকৃতির লীলাখেলা।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাব্‌লের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের আগেই প্রকৃতি আইনষ্টাইনের তত্ত্বের মাধ্যমে তার অস্থিরতার পূর্বাভাস দিয়েছিল। 'বিশ্ব বিজ্ঞান'-এর সূত্রপাত করে বা তাকে উজ্জীবিত করে, আইনষ্টাইন 1916 সালে যখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে মহাবিশ্বের এক প্রতিমূর্তি গঠন করেন, তখন তা হল এক অস্থির প্রতিমূর্তি—সে-বিশ্ব ছিল সঙ্কোচনশীল। তখন অবশ্য সে-প্রতিমূর্তি কারুরই মনঃপূত হয় নি; তাই বিজ্ঞানীরা তাকে অবাস্তব ধরে নিয়ে তার রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা করেন। আইনষ্টাইন তাঁর বহু-বিতর্কিত 'ল্যামব্‌ডা টারম' (Lambda term)-এর সাহায্য মহাবিশ্বের প্রতিমূর্তিকে অচল রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু এডিংটন পরে দেখান যে সে-অচলত্ব ত্রিশঙ্কুর মত অসহায়—বস্তুর গড় ঘনত্বের বা আভ্যন্তর চাপের সামান্যতম পরিবর্তনেই তা সচল হতে বাধ্য। আইনষ্টাইনের অব্যবহিত পরেই ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ডি. সিটার আর এক প্রতিমূর্তি গড়েন। এতে তিনি মহাবিশ্বে বস্তুর গড় ঘনত্ব শূন্য কল্পনা করে, তাকে অচল রাখেন; কিন্তু দেখা গেল সে-বিশ্বে একটিমাত্র দর্শক আর একটি মাত্র বস্তুপিণ্ড অনুপ্রবেশ করলেই তা দর্শকের

চোখে অচল রূপ পরিগ্রহ করবে। আরও কয়েক বছর বাদে, 1922 সালে রুশ বিজ্ঞানী ফ্রীডম্যান দেখান যে, আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে মহাবিশ্বের কয়েক প্রকার প্রতিমূর্তি গঠন করা সম্ভব—সে-প্রতিমূর্তি সম্প্রসারণশীল হতে পারে, আবার সঙ্কোচনশীলও হতে পারে।

দেখা যাচ্ছে যে, গত প্রায় 50 বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ বা তত্ত্ব-নির্মাণের ক্ষেত্রে রুদ্ধশ্বাস অগ্রগতির হওয়া সত্ত্বেও, মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত এখনও রচিত হয় নি। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান তথা মানুষকে তুচ্ছ করার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কারণ নিখুঁত নির্ভুল ইতিবৃত্ত রচনা যে কত কঠিন হতে পারে, তা আর্চ বিশপ আশারের যুগে বা তার আগে জানা ছিল না। মানুষের সৃষ্ট-বিজ্ঞানই মানুষের জানার অপূর্ণতা, তার ত্রুটিবিচ্যুতি প্রমাণ করেছে। আর সেটাই শেষ কথা নয়। মহত্বটা শুধু মহাবিশ্বের একার গুণ নয়, ওতে মানুষেরও ভাগ আছে। তার জানার অংশ সামান্য হলেও, জানতে চাওয়ার বাসনা আর জানতে পারার ক্ষমতা সামান্য নয়। মানুষের সাম্প্রতিক ইতিহাস তা ভালভাবেই প্রমাণ করছে। আর, ভবিষ্যৎটা পড়ে আছে।

চতুর্মাত্রিক দেশ ও কাল

চঞ্চল মজুমদার*

মানব ও প্রকৃতির খেলা চলেছে একটি চতুর্মাত্রিক জগতে। কোন দ্রষ্টা যদি এই জগৎ থেকে জীবন স্পন্দন ও নিসর্গলীলা পরিহার করে বস্তু-নিরপেক্ষ জগৎ কল্পনা করেন, তবে এই চিরন্তন অস্তিত্ব হচ্ছে দেশ ও কাল। দেশ ত্রিমাত্রিক, কাল একমাত্রিক। দেশের পরিচয় দানের জন্যে নির্দিষ্ট অনুক্রমে তিনটি বাস্তব সংখ্যার প্রয়োজন হয়; সময় জ্ঞাপনের জন্যে একটি বাস্তব সংখ্যাই যথেষ্ট। বহু দিন পূর্বেই মননশীল মানুষ দেশ ও কালের মিলিত অস্তিত্বের সম্মুখীন হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আছে—'কালো হ্যয়ং নিরবধিঃ। বিপুলা চ পৃথ্বী।' জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা বহু দেশে বহু দিন থেকে চলেছে। তা থেকে দেশ-কালের ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। গ্যালিলিও এবং নিউটনের বলবিদ্যায় দেশ-কালের পটভূমিকায় গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র জগতের বিশ্লেষণ চলেছে—এটাই প্রাচীন বলবিদ্যায় উৎস এবং সম্ভবত মূল প্রতিপাদ্য।

এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাতত্ত্ব চতুর্মাত্রিক জগৎকে বিজ্ঞানীদের চেতনায় গভীরভাবে মুদ্রিত করেছে। পরিচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সামান্য বাইরে পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারে অনেক তথ্যই প্রাচীন বলবিদ্যার সংস্কারের প্রয়োজন ত্বরান্বিত করে—আপেক্ষিকতাতত্ত্ব সেই প্রয়োজনেরই ফল।

বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ হেরমান মিনকাওভ্স্কি চতুর্মাত্রিক বিশ্বের আবশ্যকতা ও ব্যবহার প্রসঙ্গে 1908 খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের আশীতম সম্মেলনে একটি বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন। আমরা এই গভীর চিন্তানায়কের সুললিত ভাষণটির অনুবাদ প্রকাশ করছি। (সমগ্রভাবে মূল জার্মান

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

ভাবণটি সংগ্রহ করতে না পারলেও ঐ ভাবণের সঠিক ইংরেজী অনুবাদ সহজলভ্য ছিল। মূল ভাবণটি দেখলে অনুবাদটি ত্রুটিমুক্ত করা যেত—ভবিষ্যতে তা করবার চেষ্টা করব।)

দেশ ও কাল : হেরমান মিনকাওস্কি

দেশ ও কাল সম্পর্কে যে সব ধারণা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি সেগুলি পদার্থ-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত – সেখানেই তাদের গুরুত্ব। এই ধারণাগুলি যুগান্তকারী। এখন থেকে শুধু দেশ কিংবা শুধু কাল "আঁধারে মিলায়ে যাবে"। তাদের এক বিশিষ্ট মিলিত অস্তিত্বই স্বকীয়তা বজায় রাখবে।

1

প্রথমে আমি দেখাতে চাই কি ভাবে আজকের সর্ববাদিসম্মত বলবিদ্যা থেকে শুরু করে বিশুদ্ধ গণিতের চিন্তাধারা বেয়ে দেশ-কালের পরিবর্তিত ধারণাতে উত্তরিত হওয়া সম্ভব। নিউটনীয় বলবিদ্যার সমীকরণগুলিতে দু'ধরণের ধ্রুবত্ব বা নিত্যতা দেখা যায়। প্রথমত স্থান নির্দেশতন্ত্রকে যে কোন ভাবে সরানো যায়, কিংবা, দ্বিতীয়ত যদি আমরা গতীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাই নির্দেশতন্ত্রকে কোন সুষম রৈখিক গতিবেগ দিয়ে, তাহলে সমীকরণগুলির আকার বদলায় না, তাছাড়া কখন থেকে সময় মাপা হচ্ছে তার কোন গুরুত্ব নেই। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্কে শেষ কথা হয়ে গেছে ধরে নিয়ে আমরা বল-বিদ্যার স্বতঃসিদ্ধের জন্যে তৈরি হই। এজন্যে এই দুটি ধ্রুবত্ব প্রায় কখনই একত্র উচ্চারিত হয় না। এই দুটি ধ্রুবত্বের প্রত্যেকটি বলবিদ্যার অবকলনীয় সমীকরণগুলিতে একটি রূপান্তর-সঙ্ঘের অস্তিত্বের কথা বলছে। প্রথম সঙ্ঘটির অস্তিত্ব দেশের মূল গুণ বলে ধরা হয়। দ্বিতীয় সঙ্ঘটিকে অবহেলা করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ তাহলে আমরা নির্ভাবনায় এই সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে পারি—দেশ যা আমরা স্থির বলে ধরে থাকি তা কি আসলে সুষম রৈখিক গতিতে চলন্ত? সুতরাং এই দুটি সঙ্ঘ পাশাপাশি পৃথক জীবনযাপন করছে। তাদের চারিত্রিক বৈষম্য তাদের মেলাবার চেষ্টাকে ব্যাহত করে থাকতে পারে। অথচ যখন তাদের মিলিয়ে দেখা যায়, তখন যে পূর্ণ সঙ্ঘটির উদ্ভব হয় তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

ব্যাপারটা চাক্ষুষ করার জন্যে আমরা ছবি বা লেখ-এর সাহায্য নেব। দেশের সমকৌণিক স্থানাঙ্ক (কার্টেজীয় স্থানাঙ্ক) হচ্ছে x, y, z; কাল বোঝাচ্ছে t। আমাদের সকল অনুভূতিতে দেশ কাল অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। কোন জায়গা কেউ দেখে থাকলে একটা নির্দিষ্ট সময়েই সে সেই দেশ দেখেছে। কোন সময় কেউ সময় মেপে থাকলে সে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তবে সময় মেপেছে। তবুও আমি এই রীতিকে মেনে চলব যে, দেশ ও কালের পৃথক অর্থ আছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের বিন্দুকে, অর্থাৎ $xyzt$-র একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য চতুষ্টয়কে আমি বলব একটি 'ভুবনবিন্দু'। $xyzt$-র সমস্ত চিন্তনীয় মূল্যসমষ্টিকে আমরা বলব 'ভুবন'। আমি এই ছোট খড়িটা দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে ভুবনের চারটি নির্দেশ রেখা বীরদর্পে আঁকতে পারি। একটি খড়ির রেখার মধ্যে সহস্র সহস্র অণু নৃত্য করছে—সেই রেখাটি বিরাট বিশ্বে পৃথিবীর গতির সঙ্গে চলছে—আমরা এ সব বিমূর্ত রূপ ভাবতে পারি। তাছাড়া চারটি মাত্রা থাকায় যে উচ্চতর কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় তা আমাদের গণিতবিদদের কাছে খুব বড় যন্ত্রণা নয়। তবে সর্বদেশে সর্বকালে এক মহাশূন্য বিরাজ করছে এটা না ভেবে আমি ধরে নেব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি অস্তিত্ব আছে। এই অস্তিত্বকে বস্তু বা তড়িৎ বলা এড়িয়ে আমি শুধু বলব 'পদার্থ'। ভুবনবিন্দু $xyzt$-তে যে পদার্থবিন্দু আছে, আমরা তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। ধরে নেব যে আমরা এই পদার্থ-বিন্দুকে অন্য যে কোন সময় চিনতে পারব। dt সময়ে দেশের স্থানাঙ্ক পরিবর্তন হচ্ছে dx, dy, dz। এখন আমরা একটি ছবি পাচ্ছি—পদার্থবিন্দু তার অবিনশ্বর জীবনে একটি 'ভুবনরেখা' তৈরি

করছে—এই ভুবনরেখার প্রত্যেক বিন্দুকে নির্দ্বিধায় $-\infty$ থেকে $+\infty$ বিস্তৃত চলরাশি t দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। সমগ্র বিশ্ব এখন আমাদের সামনে এই রকম ভুবনরেখায় ভেঙে যাচ্ছে। যা বলতে যাচ্ছি তা এই - আমার মতে সব প্রাকৃতিক নিয়ম এই বিভিন্ন ভুবনরেখার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই তাদের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ পেতে পারে।

দেশ ও কালের ধারণা xyz $t=0$ চিহ্নিত তল ও তার দুই পাশ $t>0$, $t<0$-কে পৃথক করে দেয়। সরলতার জন্যে দেশের মূলবিন্দু এবং কালের মূলবিন্দু এক করে ধরি। তাহলে প্রথমোক্ত সঙ্ঘ বলছে যে, বলবিদ্যায় $t=0$ সময়ে আমরা xyz-অক্ষগুলিকে মূলবিন্দুর চারপাশে যে কোন আবর্তন দিতে পারি, এই আবর্তন

$$x^2+y^2+z^2$$

ফর্মের রূপ অপরিবর্তিত রাখে এমন সুষম রৈখিক রূপান্তর। দ্বিতীয় সঙ্ঘের মূল কথা এই—বলবিদ্যার নিয়মাবলী না বদলে আমরা x, y, z, t-র জায়গায় $x-\alpha t, y-\beta t, z-\gamma t, t$ লিখতে পারি। এখানে α, β, γ তিনটি খুশিমত বেছে নেওয়া নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা। কাজেই $t>0$ ভুবনের এই উপরের অংশটিতে আমরা যে কোন দিকে কালের অক্ষটিকে চালাতে পারি। এখন প্রশ্ন উপরের দিকে কালের অক্ষের দিকের যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার সঙ্গে দেশের অক্ষগুলির পরস্পর লম্ব হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কি সম্পর্ক?

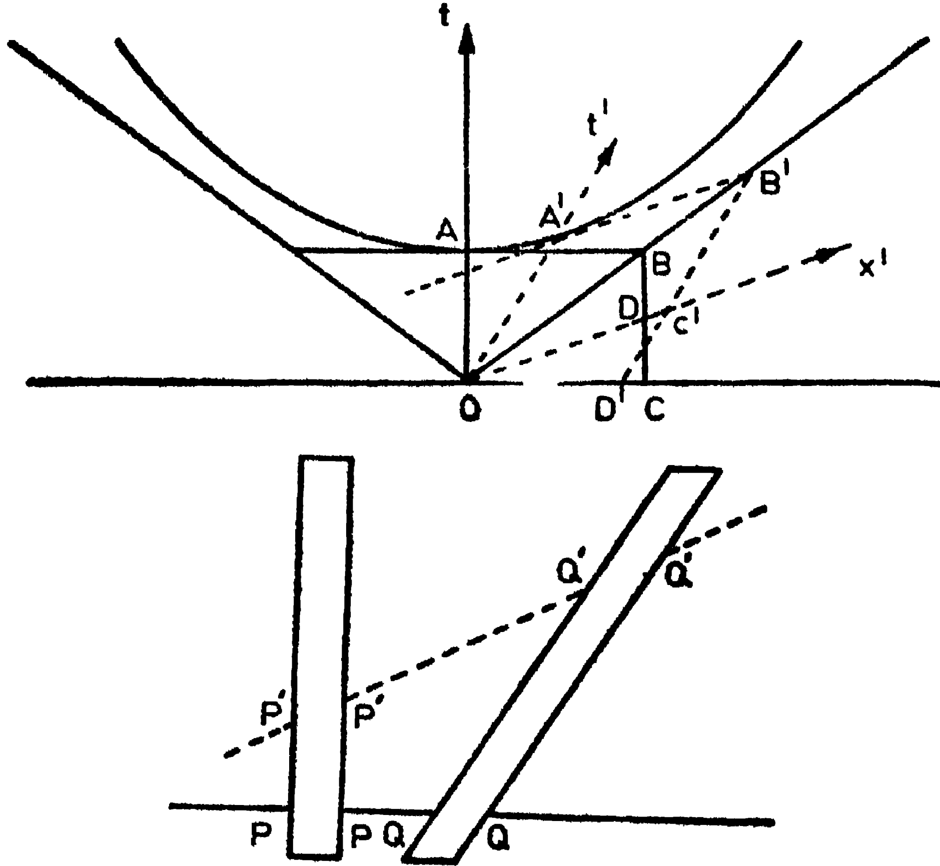
এই সম্পর্ক পেতে গিয়ে আমরা একটি ধনসংখ্যা c নিচ্ছি এবং

$$c^2t^2-x^2-y^2-z^2=1.$$

এই সমীকরণটির লেখচিত্র আলোচনা করব। লেখটি $t=0$ দিয়ে দু-তলে বিভক্ত—দ্বিপত্রী পরাগোলকের মতন। এখন $t>0$ অঞ্চলের পরাগোলকটি নেওয়া যাক। আর xyz t থেকে চারটি নতুন চলরাশি $x'y'z't'$-তে সুষম রৈখিক রূপান্তরের কথা ভাবি—এই নতুন রাশি চারটি এমন যাতে পত্রটির গাণিতিক আকার বদলায় নি। স্পষ্টত, দেশের মূলবিন্দু স্থির রেখে আবর্তন এই রূপান্তরগুলির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের মধ্যে একটিকে বেছে নিলেই সবগুলির পরিচয় মিলবে—এমন একটি নিচ্ছি যাতে y ও z অপরিবর্তিত থাকবে। এই পত্রটির $(x-t)$ তলের প্রস্থচ্ছেদ এঁকে দেখাচ্ছি (চিত্র 1)—তাতে থাকছে $c^2t^2-x^2=1$ পরাবৃত্তের উপরের অংশ ও তার অসীম স্পর্শক দুটি সরলরেখা। মূলবিন্দু O-থেকে অররেখা OA' টেনেছি এই পরাবৃত্ত পর্যন্ত। A'-এ পরাবৃত্তের স্পর্শক টেনেছি, সেটা ডানদিকের অসীম-স্পর্শককে B'-তে ছেদ করেছে। $OA'B'C'$ সামান্তরিকটিকে সম্পূর্ণ করেছি। পরে কাজে লাগবে তাই $B'C'$-কে বাড়িয়ে x-অক্ষকে D'-এ ছেদ করিয়েছি। আমরা যদি OC' ও OA'-কে বঙ্কিম অক্ষ $x't'$ ধরি এবং পরিমাণ দিই $OC'=1$, $OA'=\frac{1}{c}$ তাহলে এই পরাবৃত্তের শাখাটি আবার $c^2t'^2-x'^2=1$, $t'>0$ রূপটি ফিরে পাবে। xyzt থেকে $x'y'z't'$ যাওয়া আমাদের আলোচ্য রূপান্তরগুলির অন্তর্গত। এই রূপান্তরগুলির সঙ্গে আমরা দেশ ও কালের মূলবিন্দুর ইচ্ছামত সরণকে সংযুক্ত করলে রূপান্তরগুলি একটি সঙ্ঘ গড়ছে যেটা স্পষ্টই c-র উপর নির্ভরশীল। এই সঙ্ঘটিকে আমি বলব G_c।

এখন আমরা c-কে অসীমের দিকে বাড়াতে থাকি—$1/c$ তখন শূন্যর দিকে যাচ্ছে—আমরা ছবি থেকে দেখছি পরাবৃত্তটি x-অক্ষের দিকে ক্রমে ঝুঁকে যাচ্ছে। অসীম স্পর্শক দুটির কোণ ক্রমশই আরও স্থূল হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত t' অক্ষ উপরের যে কোন দিকে থাকতে পারে, আর x' ক্রমশ x হয়ে দাঁড়ায়। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, G_c সঙ্ঘটি $c=\infty$ সীমাতে G_∞ সঙ্ঘে আর G_∞ সঙ্ঘটি নিউটনীয় বলবিদ্যার সঙ্ঘ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এটা হচ্ছে বলেই, গণিতের দিক থেকে G_c G_∞-র চেয়ে বোঝা সহজ বলে, মনে হয় যে, কোন কল্পনাবিলাসী

গণিতজ্ঞের হয়ত মনে হতে পারত যে, এমনও হতে পারে যে প্রকৃত পক্ষে নৈসর্গিক ঘটনাবলীর ধ্রুবত্ব সঙ্ঘ G∞ নয় সেই ধ্রুবত্বসঙ্ঘ হচ্ছে G_c— c সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট কিন্তু সাধারণ চলতি মাপে c অনেক, অনেক c। যদি অন্তরীক্ষ বা মহাশূন্য নিয়ে কথা বলতে না চান তবে অন্যভাবে এই সংখ্যাটি নিরূপণ করা যায় — বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় এককের সঙ্গে স্থির বিদ্যুতের এককের অনুপাত।



চিত্র-1

বড়। এই ধরণের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বিশুদ্ধ গণিতের পক্ষে একটা বিরাট জয় হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় নি। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' এই প্রবাদ বাক্য অনুসারে অতীত ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ রেখে আমরা এই নিসর্গ দর্শনের রূপান্তরের সুদূরপ্রসারী ফলগুলিকে এখনই বুঝে ফেলার চেষ্টা করতে পারি।

এখানে বলে নিই আমরা শেষ পর্যন্ত c-র কি মূল্য নেব। মহাশূন্যে আলোকের গতিবেগই হচ্ছে

G_c সঙ্ঘ-সম্পর্কে প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তা তখন এইভাবে নিতে হবে।

প্রাকৃতিক ঘটনার সামগ্রিক রূপ থেকে ক্রমশ উন্নততর আসন্নরূপ কল্পনা করে এমন একটি দেশ-কালের নির্দেশতন্ত্র x, z··-তে পৌঁছানো সম্ভব যা দিয়ে দেখানো যায় যে সব ঘটনা নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে চলে। যখন এটা করা যায়, তখন এই নির্দেশতন্ত্রটি অবিকল্পভাবে নিরূপিত হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর রূপ অপরিবর্তিত রেখে এই নির্দেশতন্ত্রে G_c সঙ্ঘের অন্তর্গত যে কোন রূপান্তর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

একটা উদাহরণ দিই। পূর্বের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা সময়কে t' দিয়ে বলতে পারি। কিন্তু তাহলে দেশকেও $x'\ y\ z$ অক্ষ দিয়ে নির্দেশ করতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি $x'\ y\ z\ t'$ দিয়ে যেমন লেখা যাবে তেমন $xyzt$ দিয়ে লেখা যাবে। তাহলে আমাদের ভুবনে শুধু এই অর্থে একটি দেশ নেই—আছে অসংখ্য দেশ, যেমন ত্রিমাত্রিক দেশে আছে অসংখ্য দ্বিমাত্রিক তল। তিনমাত্রার জ্যামিতি এখন চতুর্মাত্রিক পদার্থবিদ্যার একটি পবিচ্ছেদ। এখন আপনারা জানলেন কেন প্রথমেই বলেছিলুম যে, দেশ ও কাল 'আধারে মিলায়ে যাবে', শুধু রয়ে যাবে একটি ভুবন।

2

এখন প্রশ্ন, কি সব ঘটনা আমাদের এই পরিবর্তিত দেশ-কালের ধারণা নিতে বাধ্য করল? এই ধারণা কি কখনই অভিজ্ঞতার পরিপন্থী নয়? এই ধারণা কি নৈসর্গিক ঘটনার সরল বিবরণে সাহায্য করে? (ক্রমশ)

আইনষ্টাইনের বিজ্ঞান-দর্শন চিন্তা

দিলীপ ঘোষরায়*

বিংশ শতাব্দীতে সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেও বিপ্লব ঘটছে। বস্তুজগতে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, যার প্রতিনিধিত্ব করছে কোয়াণ্টাম এবং আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব। কণা ও বিপুল গতির জগতে বস্তুর যে অচিন্ত্যনীয় ও অভিনব প্রকাশ ঘটেছে তার ব্যাখ্যার দুরূহ জটিলতার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের মৌল প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রতীয়মানতার থেকে সত্তার অনুসন্ধান বিংশ শতকের বিজ্ঞান-এর জটিলতা এমন এক আকার ধারণ করেছে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাধ্য হচ্ছে দর্শন-প্রকৃতের মূল দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নগুলির সম্পর্কে আলোচনা করতে। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীরা আশ্রয় নিয়েছেন বিষয়ীগত ভাববাদের* প্রতিক্রিয়াশীলতায়—যেমন প্রত্যক্ষবাদীরা** এবং পরিমাপবাদীরা***। অন্যদিকে বিজ্ঞানীদেব বৃহৎ অংশ অনুসরণ করছেন বস্তুবাদী পথ**** (দ্বান্দিক ও ভীরু বস্তুবাদ উভয়ই)। আবার বিজ্ঞানীদের একটা অংশ এই জটিলতার দুরূহ আবর্তে হারিয়ে যাবার আশঙ্কায় কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের খুঁটিনাটির মধ্যেই বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন।

*বিষয়ীগত ভাববাদ বলেছে যে ভৌত জিনিষগুলি হল আমাদের আত্মগত সংবেদনসমূহের—চিন্তাসমূহের ফল। বস্তুজগৎ বিষয়ীর চেতনার উপর নির্ভরশীল—এই হচ্ছে বিষয়ীগত ভাববাদের মূলকথা।

**প্রত্যক্ষবাদীদের মতানুসারে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লব্ধজ্ঞানের বস্তুগত প্রমাণ থাকতে পারে না, বিজ্ঞানের প্রধান কাজ sense-data বর্ণনা করা, বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস করা। প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন 'যে বিজ্ঞান বস্তুজগতের বিষয়গত জ্ঞানলাভ করতে পারে না।

***পরিমাপবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে পরিমাপের (এটা কেবল চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে) দ্বারা নির্ণীত হওয়া সম্ভব নয় এমন কোন অমূর্ত ধারণার (concept) কোন অর্থ থাকতে পারে না। কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে এই রকম ধারণাগুলির কোন স্থান থাকা উচিৎ নয়।

****বস্তুবাদের মতে প্রকৃতির অস্তিত্ব বস্তুগত অর্থাৎ মানব-মন-বহির্ভূত ও মানস-নিরপেক্ষ। চেতনা বস্তুর সর্বোচ্চ গুণ। বস্তু ও চেতনার প্রাথমিকতা—দর্শনশাস্ত্রে এই মূল প্রশ্নে বস্তুবাদীরা বস্তুকেই প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করেন।

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

আপেক্ষিকতাবাদের রহস্য উদ্ঘাটনকারী বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'অ্যালবার্ট' আইনষ্টাইন এই সব বিতর্ক থেকে দূরে সরে থাকেন নি। তত্ত্বসৃষ্টির ও বস্তুজগতের ব্যাখ্যায় জ্ঞানতত্ত্ব ও দর্শন-প্রকৃতের মৌলপ্রশ্নগুলি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে আইনষ্টাইন তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, যেমন করেছেন তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনগুলিতে। এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর ফ্যাসীবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কথা আমাদের অজানা নয়। বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে আইনষ্টাইনের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

হেগেল বা মার্কস যে অর্থে দার্শনিক আইনষ্টাইন সে অর্থে দার্শনিক নন। হেগেল বা মার্কস বা লেনিনের তুলনায় আইনষ্টাইনের চিন্তাক্ষেত্র অনেক সীমিত—মূলত পদার্থবিদ্যা। তাত্ত্বিক পদার্থ-বিজ্ঞানে তত্ত্বসৃষ্টির পদ্ধতি ও রীতিনীতি হচ্ছে আইনষ্টাইনের দর্শনচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। এর সঙ্গে দর্শন-প্রকৃতের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড় এবং আইনষ্টাইন এটা ভালভাবেই জানেন। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন হচ্ছে বস্তু ও সত্তার সম্পর্ক। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে দর্শন-প্রকৃতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রশ্নাতীত।* এটা আরও ভাল বোঝা যায় যখন আমরা চিন্তা করি যে আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদনগুলির (ব্যক্তি ও যান্ত্রিক উভয়ই) বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস, এগুলির বিমূর্তন (abstraction) এবং প্রয়োগই হচ্ছে জ্ঞান আহরণের একমাত্র প্রধান উপায়। র‍্যাশনালিষ্ট পদ্ধতি নয়। জ্ঞানের একমাত্র উৎস অজ্ঞান (non-knowledge)—লেনিনের এই বক্তব্য অভ্রান্ত। অন্যথায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে (বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পরিমাপ পদার্থবিদ্যার (কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ) তত্ত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণে এবং তত্ত্বসৃষ্টির পদ্ধতির আলোচনায় যে দর্শন-প্রকৃতের দ্বন্দ্বগুলি উপস্থিত থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।**

বস্তুর বিমূর্ত ধারণা (concept) নেহাৎই মনোগত, আত্মিক—বলেছেন আর্নষ্ট মাখ্। আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদনগুলির পারম্পর্যের (complexes of sensations) একটা স্থায়ী প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক সূত্র বা নিয়মের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তথ্য সমষ্টির (facts and perception) বহির্গত বিশেষ কোন অর্থ নেই। এর একমাত্র তাৎপর্য প্রয়োগ ক্ষেত্রে সুবিধার অর্থাৎ জাগতিক নিয়মগুলি কিংবা কার্যকারণ সম্পর্ক ইত্যাদির মূল্য অর্থকরী (economic value) অর্থাৎ সুবিধাজনক। এক কথায় আর্নষ্ট মাখ্ বলতে চাইছেন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের অসংখ্য ইন্দ্রিয় সংবেদনগুলির বিচ্ছিন্নতাকে বিন্যাস করার এক সুবিধাজনক (economic) সহায়ক-ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতের বিষয়গত জ্ঞানলাভের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। কোন বিমূর্ত ধারণার তাৎপর্য ও অর্থ নির্ণীত হতে পারে একমাত্র প্রত্যক্ষ পরিমাপ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে (direct, definite measurement operation) যা কেবলমাত্র চিন্তার মধ্যেই সীমিত থাকতে পারে অর্থাৎ জার্মান ভাষায় যাকে বলে Gedanken পরীক্ষা। প্রত্যক্ষ পরিমাপ (Gedanken অন্তর্ভুক্ত) দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব না এমন কোন ধারণার স্থান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে হওয়া উচিৎ নয়—বললেন ব্রিজম্যান। আর্নষ্ট মাখ্ প্রত্যক্ষবাদী (positivist) আর ব্রিজম্যান পরিমাপ

*এমনকি প্রত্যক্ষবাদী কুলচূড়ামনি হান্স রাইফেনবাখ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানে বিতর্ক আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে নয়। এটা অধিবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ দর্শন-প্রকৃতর ব্যাপার।
("Rise of scientific philosophy"—Hans Reichenbach)

**মাখ্ ও কোপেনহেগেন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্লাঙ্ক, আইনষ্টাইন, ডি-ব্রগলী, প্রমুখেরা য়োজনফেল্ডের বিরুদ্ধে মারিও বাঙ্গে এবং হাবার্ট ডিংলের বিরুদ্ধে ম্যাক্স বর্ণের লড়াই বস্তুত দর্শনে দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি—ভাববাদ ও বস্তুবাদের লড়াই।

বাদী (operationalist)—ভাষার তারতম্য থাকলেও বক্তব্য উভয়েরই এক। এই বক্তব্যই হচ্ছে কোপেন-হেগেন গোষ্ঠীর ভিত্তি যার মধ্যে রয়েছেন নিলস্ বোর, ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ, উলফ্‌গ্যাঙ পলি, পাস্কুয়াল জর্ডন, লিওন রোজেনফেল্ড প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। লেনিনের বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী বিচারবাদের সত্তর বছর পরে একথা বুঝিয়ে বলতে হয় না যে এই বক্তব্য পুরোপুরি আত্মবাদী (solipsistic) যা বিশপ জর্জ বার্কলে ও ডেভিড হিউমের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি।*

আইনষ্টাইনও শুরুতে মাখ্ ব্রিজম্যানদের জালে জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বসৃষ্টির প্রগতির ধাপে ধাপে এর থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসেন ও পরবর্তীকালে দর্শনের এই বিকৃত দৃষ্টি-ভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রধান প্রবক্তার ভূমিকাও গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য যে ব্রিজম্যান আইনষ্টাইনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে পরিমাপবাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের প্রচ্ছন্ন অভিযোগ তোলেন। কিন্তু বিষয়ীগত ভাববাদ (subjective idealism) এবং এর সব নিয়ন্তর আত্মবাদের সক্ষম বিরোধিতা একমাত্র বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ দ্বারাই সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে আত্মবাদের কুলপুরোহিত রুডলফ উইলী এটা খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন। হয় আত্মবাদ নয় বস্তুবাদ। অতএব মুহূর্তের সুখকে আঁকড়ে ধর—বোঝালেন উইলী। কেবলমাত্র দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভেকধারী রোজেনফেল্ডরাই চিন্তা করতে পারেন এই দুয়ের মিলন।** কিন্তু আইনষ্টাইন রুডলফ উইলনন কিংবা লিওন রোজেনফেল্ডও নন। সরাসরি মাখ্‌কে আক্রমণ করলেন আইনষ্টাইন। ওয়ার্নার হাইসেন-বার্গের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাখের দর্শনকে তিনি দোকানদারসুলভ মনোভাব বলে বর্ণনা করলেন। অষ্টওয়াল্ড ও মাখের প্রত্যক্ষবাদিতার তীব্র বিরোধিতা করে আইনষ্টাইন বললেন, যে এদের দার্শনিক কুসংস্কার বাস্তব তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা দেবার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাখের আত্মবাদের বিরোধিতায় পরিপূর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন আইনষ্টাইন।

তত্ত্ব কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ তথ্যসমষ্টির সংক্ষিপ্ত প্রতীক নয়। মাখের পরিপূর্ণ বিরোধিতা করে আইনষ্টাইন বললেন তত্ত্ব "বাস্তব জগতের চিত্র" এবং ইন্দ্রিয়-অপ্রত্যক্ষ জাগতিক পারম্পর্যগুলি উদ্‌ঘাটন করে। 1931 সালে লেখা "ভৌত বাস্তবতার ধারণার ক্রমবিবর্তনে ম্যাক্সওয়েলের প্রভাব" রচনায় উনি আরও বললেন যে মানস-নিরপেক্ষ বস্তুজগত সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি।* ইন্দ্রিয়জ্ঞান এই বস্তুজগতের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান যার উপলব্ধি কেবলমাত্র কল্পনার দ্বারাই সম্ভব। ভৌত বাস্তবতার পরিপূর্ণ নির্দিষ্টজ্ঞান সম্ভব নয়। সুতরাং বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলিকে পরিবর্তন করার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা যদি আইনষ্টাইনের ব্যবহৃত speculation শব্দ-টিকে বিমূর্তন বা abstraction হিসাবে দেখি তবে তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে প্রভেদ নেই কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তির—ইন্দ্রিয়গোচরতা আর সত্তা এক নয়। ইন্দ্রিয়গোচরতা থেকে সত্তার উপলব্ধিই হচ্ছে বিজ্ঞান।

সামগ্রিকভাবে তত্ত্ব বাস্তবকে প্রতিফলিত করবে এবং এটাই তত্ত্বের নির্ভুলতার মাপকাঠি—বলেছেন আইনষ্টাইন। তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিমূর্ত ধারণা বা concept গুলির তত্ত্ব বহির্ভূত কোন তাৎপর্য থাকতে পারে না। সামগ্রিক ভাবে তত্ত্ব ও তত্ত্ব-অন্তর্ভুক্ত concept-গুলি অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। এই অচ্ছেদ্য

---

*অত্যন্ত ন্যায্য কারণেই প্রত্যক্ষবাদ ও পরিমাপ বাদের অশুভ আঁতাতকে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়েছে ইওরোপ—আমেরিকায়।

**এখানে বাঙ্গে-রোজেনফেল্ডের প্রসিদ্ধ বিতর্কের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

*এব্যাপারে আইনষ্টাইন একক ছিলেন না। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কর্তা ম্যাক্স প্লাঙ্ক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের এই মূল বক্তব্যটি প্রচার করেন। উদাহরণ স্বরূপ প্ল্যাঙ্কের "Where is Science going" বইটি দ্রষ্টব্য।

বন্ধনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে তত্ত্ব বাস্তবকে প্রতিফলিত করলে সেই তত্ত্বগত concept-গুলি বস্তুর ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। অষ্টওয়াল্ড-মাখ্ ব্রিজম্যানদের প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের দূষিত আবহাওয়ায় আইনষ্টাইনের এই বক্তব্য অভিনব। এই দর্শনের প্রতি বিজ্ঞানীদের প্রবল বিদ্বেষের কথা আগেই বলা হয়েছে।* ম্যাক্স্ বর্ণকে তিনি চায়ের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন কেবলমাত্র তাঁর পজিটিভিজ্‌মকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার আনন্দলাভের আশায়। পরবর্তীকালে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব থেকে তিনি নিজেকে যখন বিচ্ছিন্ন করে নেন তারই মূলে তাঁর পজিটিভিষ্ট বিরোধী তীব্র মনোভাব কাজ করেছে। বিজ্ঞানে স্পেসের অবিচ্ছিন্নতার প্রবক্তা ছিলেন আইনষ্টাইন।

নিউটনের গাণিতিক ডিফারেনশিয়াল নিয়ম ভৌত জগতের হেতুবাদের একমাত্র রূপ এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কোয়াণ্টাম পদার্থ-বিজ্ঞানে কেবলমাত্র লক্ষণীয়ের (observable) বাস্তবতা, সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য, বস্তুর বর্ণনার পরিবর্তে বস্তুর প্রতীয়মানতার (appearance) সম্ভাব্যতা ইত্যাদিকে আইনষ্টাইন পরিষ্কার ভাষায় পজিটিভিজ্‌মের উত্তরণ বলে মনে করেছেন এবং তাঁর কাছে পজিটিভিজ্‌ম আর বার্কলের "esse est percipi"-র মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

এতদসত্ত্বেও আইনষ্টাইনের বিচ্যুতি ঘটল যখন তিনি বললেন যে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ (অর্থাৎ বাস্তব জগৎ) থেকে তত্ত্বে পৌঁছনোর কোন যুক্তি-সম্মত পথ নেই। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে তত্ত্ব যা বাস্তবকে প্রতিফলিত করবে তার সৃষ্টির ব্যাপারে বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে হবে অথচ চূড়ান্ত বিচারে আবার সেই বাস্তবের সঙ্গেই যুক্ত হতে হবে। এ এক অসম্ভব ব্যাপার এবং বিজ্ঞানীরা এর বিরোধিতা করেছেন। এখান থেকেই শুরু আইনষ্টাইনের র‍্যাশানালিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। তাহলে তত্ত্ব ও তত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়গুলির মূল কোথায়? এর উত্তরে আইনষ্টাইন আরও অসম্ভব কথাবার্তা বললেন। এগুলি সবই মানবমুক্তির অবাধ সৃষ্টি (free creation of human reason) এবং এর পিছনে রয়েছে এই যুক্তির কর্মতৎপরতা, কোন apriori গুণ নয়—এই হল আইনষ্টাইনের মত। এর সঙ্গে যদি আমরা স্মরণ করি যে আইনষ্টাইনের মতে একমাত্র সামগ্রিকভাবে তত্ত্বের নির্ভুলতা প্রতিপাদ্য তত্ত্বের অন্তর্গত ধারণাগুলির সঠিকতা প্রমাণিত হয় তবে দেখা যাবে যে স্পিনোজা ভক্ত আইনষ্টাইন প্রকৃতপক্ষে রেনে দেকার্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।*

তত্ত্ব যদি সামগ্রিকভাবে বাস্তবকে প্রতিফলিত করে তবে তত্ত্বের ফলাফলগুলি পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা অর্থহীন (যেমন লোরেঞ্জ-ফিৎজেরাল্ড সংকোচন তত্ত্ব বা বিকিরণ তত্ত্ব ইত্যাদি)। তত্ত্বের ফলাফলই বাস্তব এবং বাস্তবের আর অন্য কোন ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণভাবে বিজ্ঞানে এটাকে আপেক্ষিকতাবাদের ফল (relativistic effect) হিসাবে চালান হয়। তত্ত্বের প্রামাণ্য সামগ্রিকভাবে তার ফলাফলের সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতিতে। সে-ক্ষেত্রে তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত যে ধারণাগুলি তাদের নির্বাচনে খানিকটা স্বাধীনতা থাকে যদিও এগুলি তত্ত্বের পক্ষে অপরিহার্য হওয়া প্রয়োজন। কাজেই আইনষ্টাইন

*বিংশ শতকের সর্বাগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই পজিটিভিজ্‌মের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আবার ধরা যেতে পারে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ম্যাক্স্ প্লাঙ্ককে, মাখ্ ও তাঁর অনুগামীদের তিনি প্রচণ্ড তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।

*এই র‍্যাশনালিষ্টিক মনোভাব আইনষ্টাইনের সমাজচিন্তার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনে বুদ্ধিজীবীদের যে বিরাট প্রাধান্য তিনি দিয়েছেন, ব্যক্তিগত জ্ঞান ও চিন্তার উপর যে ভাবে তিনি নির্ভর করেছেন সেগুলি এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। উনি এমন কথাও বলতে পেরেছেন যে মানবজাতির ভাগ্য নির্ভর করছে নৈতিক শক্তির উপর এবং কেবলমাত্র তাদেরই এই শক্তি থাকতে পারে যারা অল্প বয়স থেকে অধ্যয়নের দ্বারা নিজেদের মনকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে পেরেছেন।

মনে করেছেন যে বাস্তবকে আমাদের কাছে দেওয়া হয় না। বাস্তবকে আমাদের কাছে ধাঁধা হিসাবে উপস্থিত হয়। এটা মনে করিয়ে দেয় প্লেটোর গুহাবাসীদের সেই বিখ্যাত উপমা। আইনষ্টাইন এই সব চিন্তায় ভাববাদের আশ্রয় গ্রহণ করলেও তা প্লেটোর মত বিষয়গত ভাববাদ, প্রত্যক্ষবাদীদের বিষয়ীগত ভাববাদ নয়। বোধ হয় লুডভিগফয়ের বাখ্ সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যাপারটিকে অনেক পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করলেন। ফয়ের বাখ্ বললেন যে এই বিশাল বিশ্বচরাচরের ক্ষুদ্র কণিকামাত্র যে মানুষ তার পক্ষে যে সম্পূর্ণতার সে একটা অংশমাত্র সেই সম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ফলে একটি ক্ষুদ্র বালুকণার অতলস্পর্শী রহস্য (জোসেফ দিয়েজোগান), কিম্বা একটি ইলেকট্রনের (লেনিন) এই জ্ঞান আংশিক কিন্তু খাঁটি। এর প্রসার সীমাহীন এবং এই সীমাহীনতার বাস্তবতাই পরম সত্য (absolute truth) "পদার্থবিদ্যার ক্রম বিবর্তনে" আইনষ্টাইন ইনফেল্ডও একই কথা বলেছেন—বলেছেন জ্ঞানের এক আদর্শসীমার কথা যার প্রতি ধাবিত হয় মানব মন ও যার এক নাম বস্তুগত সত্য (objective truth)। ম্যাক্স প্লাঙ্ক কথাটিকে ধারালো ভাবে উপস্থাপিত করছেন যদিও তাঁর বক্তব্যে ভীরু বস্তুবাদের প্রাধান্য আছে। কিন্তু ডুরিং-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ব্যাপারটার যে রূপ দিয়েছেন তার বিস্ময়কর গভীরতা, সংক্ষিপ্ততা, স্বচ্ছতা ও কাব্যময়তা ঐতিহাসিক।

প্রত্যক্ষবাদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও, মাখ্-অষ্টওয়াল্ড ও তাঁদের বিংশ শতকের অনুসারী কোপেনহেগেন গোষ্ঠীর প্রতি প্রচণ্ড বিরাগ সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য হব যে, আইনষ্টাইন প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর দর্শন ও ধাঁধাময় বাস্তবের চিন্তা তাঁকে সহজেই প্রণোদিত করেছে এই ধাঁধাময়তার বিভিন্ন সমতুল্য বর্ণনায় সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করতে। লিও ইনফেল্ডের সঙ্গে লেখা "পদার্থবিদ্যার ক্রমবিবর্তন" বইতে লেখকেরা বেশ জোরের সঙ্গে একথা বলছেন। এটা পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষবাদী কথাবার্তা। অন্যদিকে তত্ত্ব যে আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ তথ্যসমষ্টির বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসের একটা উপায় ছাড়া আর বেশি কিছু নয় মাখ্বাদের এই ধারণা থেকেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতেও পারেন নি। প্রত্যক্ষবাদীদের সঙ্গে আইনষ্টাইনের তফাৎ হল এই যে তিনি এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উৎপত্তি খুঁজেছেন বহির্জগতে, যার মানস-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব তাঁর কাছে প্রশ্নাতীত।

এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে আইনষ্টাইনের জ্ঞানতত্ত্ব ও বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। দর্শনের ক্ষেত্রে বিবেকবর্জিত সুবিধাবাদী—আইনষ্টাইন নিজের মূল্যায়ন নিজেই করেছেন এই ভাবে। আমরা অবশ্যই তাঁকে সুবিধাবাদী বলব না—বিবেকবর্জিত তো নয়ই। কারণ নীতি ও অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ বা সমঝওতাও তিনি করেন নি। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে মূলধারার থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করা—এ দুটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা বলব দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি নমনীয়। এর কারণ আইনষ্টাইন নিজে, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা, নিজের গবেষণার অভিজ্ঞতার উপর অতিনির্ভরশীলতা ও দর্শন সম্বন্ধে তার অত্যন্ত ফিলিষ্টিন মনোভাব। দর্শন বলতে তিনি মনে করতেন এমন একটা কিছু যা তার পক্ষে অসুবিধাজনক সব কিছুকে সত্য মিথ্যা নির্বিচারে বাতিল করে, ফলে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বাঁধাধরা হয়ে পড়ে। এটা পরিষ্কার যে সভ্যতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ দর্শন-দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে এই মহান বিজ্ঞানীর পরিচয় ছিল না এবং এটা পরিষ্কার যে একমাত্র এই দর্শনের আলোকেই এই বিরাট প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মনীষীদের একজন অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব। কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কায়

এবং প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের কথা মনে রেখে তা থেকে আমরা বিরত থাকলাম।

যে সব লেখার সাহায্য নেওয়া হয়েছে

Albert Einstein :

Creative Autobiography

Reply To Criticisms

Physics And Reality

Evolution of Physics

On the Method of Theoretical Physics

Maxwell's Influence On the Evolution of Ideas of Physical Reality

Newton's Mechanics and Its Influence On The Development of Theoretical Physics

Born—Einsrtein Letters

A. Bridgeman—

Einstein's Theory And The Operational Point of View

Logic of Modern Physics

P. Mach—

The Principle of Conservation of Work

সমাজবাদের সমর্থনে আইনষ্টাইন

সুব্রত পাল*

বর্তমান বিশ্বে যখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকৃষ্টতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন কিছু কিছু স্বৈরাচারী শাসকের মুখেও 'সমাজবাদ'-এর বাণী শোনা গেছে। তাতে কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষ হানি হয় নি। বরং একটা সত্যই আরও আরও উদ্ভাসিত হয়েছে।

যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করে তাই চরম স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষেও আগের মত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি জেহাদ ঘোষণা করা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের নামে এবং সমাজতন্ত্রকে মিথ্যা ও বিকৃত রূপে হাজির করে তারা তাদের শোষণ ও শাসন টিকিয়ে রাখতে চান।

দেশপ্রেমিক শান্তিবাদী, মানবতাবাদা প্রভৃতি অনেক ধরনের মানুষের মনে সমাজতন্ত্র কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। এর প্রশস্তি তাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। তবে সকলে যে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সমাজতন্ত্রের গুণগান করে একথা ভাববার কোন কারণ নেই। আবার সকলেই যে এক বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে সমাজতন্ত্রের সমস্ত দিকগুলি উপলব্ধি বা গ্রহণ করতে পেরেছে তাও নয়। এদের অনেকের কাছেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের বৈপ্লবিক পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যাপারগুলি অনুমোদনযোগ্য না হলেও ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষে ধনতন্ত্রের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে অনেক বেশি কল্যাণমূলক এ বিষয়ে তারা প্রায় দ্বিধামুক্ত। এর প্রচুর উদাহরণ মেলে সাহিত্যিকদের সাহিত্যে, শিল্পীদের শিল্পকর্মে এবং বিজ্ঞানীদের অভিমত প্রকাশে।

*পদার্থবিদ্যা (জীবপদার্থ) বিভাগ বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা সাধারণ জনগণের কাছে অন্য জগতের মানুষ হিসাবে পরিচিত। এরকম পরিচিতির যথেষ্ট কারণও আছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অধিকাংশ বিজ্ঞানীই সাধারণত নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যেই বিজ্ঞান সাধনায় নিবিষ্ট রাখতে পছন্দ করেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের সংকট কিংবা মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গ যখন সেই প্রাচীর ভেদ করে সেই সকল ধ্যানমগ্ন মানুষগুলিকে আঘাত করে তখন বোধ হয় তাদের অনেকেই আর নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। ফ্রেডরিক জোলিও কুরীর মত অনেকে সরাসরি প্রতিরোধ সংগ্রামে শামিল হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী বাহিনী যখন প্যারিস দখল করে জোলিও কুরী 'had himself taken part in the last few days of street fighting for the liberation of the city. The man who discovered, through his studies of neutron emission and chain reaction, some of the most important of the necessary pre-conditions for construction of the atom bomb used the most primitive form of bomb imaginable in defence of the barricades—ordinary beer bottles filled with gasoline and fitted with fuses'.[1] বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও তাদের মানবতাবাদী অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ে সরবে মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন না। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের নিজেরই ভাষায় 'যখন আমার মনে হয়েছে যে এখনও নীরব থাকার অর্থ হচ্ছে দুষ্কর্মের পাপের ভাগী হওয়া তখনই মাত্র আমি মুখ খুলেছি।' (পৃঃ 41)*

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সরব হন হিটলারের ইহুদী-বিদ্বেষী নীতির ফলে জার্মানী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে এবং সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'মুখ খোলেন' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিনী পুঁজিপতিদের প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সাহায্য করে। যুদ্ধ সৃষ্ট চাহিদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প উৎপাদন আড়াই গুণ বাড়িয়ে তোলে। 1945 সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রনির্মাণের উন্মত্ততার অবসান হয় নি। সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে শঙ্কিত মার্কিন সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে রাখার নীতি অবলম্বন করে এবং তার বিরুদ্ধে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' চালিয়ে যায় অর্থাৎ শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে দমিয়ে রাখার পরিকল্পনা করে। এর জন্যে অঢেল অর্থ ও দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজের অধিকাংশ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হয়।

এসত্বেও মার্কিন পুঁজি তার সংকট এড়াতে ব্যর্থ হয়। সাধারণভাবে বাজারে চাহিদা পড়ে যাওয়ায় আমেরিকার শিল্প অত্যুৎপাদনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। 1948 সালে দেশের শিল্প উৎপাদন আট শতাংশ হ্রাস পায়। বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। 1948-49-এ মার্কিন অর্থনীতিতে দেখা দেয় চরম মন্দার, যদিও এর তীব্রতা 1929-এর মত ছিল না। সঙ্কটের ঢেউ বৈজ্ঞানিক প্রগতির উপরেও এসে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ একচেটিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী (জি. ই. সি)-র স্বার্থে এবং সক্রিয় প্রচেষ্টায় (বা চক্রান্তে) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদক প্রকল্প

[1]Rober Jungk, Brighter than a thousand Suns p. 147

*প্রবন্ধে ব্যবহৃত অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের সমস্ত উক্তি শৈলশকুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত আইনষ্টাইনের 'জীবন-জিজ্ঞাসা' রচনা সঙ্কলন থেকে নেওয়া হয়েছে

নির্মাণের বিল সেনেটে প্রায় সাত বছর আটকে থাকে।

স্বভাবতই সঙ্কটের প্রভাব থেকে আমেরিকার বিজ্ঞানী সমাজও নিষ্কৃতি পান নি। বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে অবশ্য এই পার্থিব 'অসুখ' থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অতীন্দ্রিয় জগতের আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু ভবিষ্যত সম্বন্ধে যাঁরা বিশ্বাস হারান নি এবং মানুষের শক্তিতে যাঁদের গভীর আস্থা ছিল তাঁরা নৈরাশ্যের অতলে তলিয়ে গেলেন না। অনেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ গ্রহণ করে শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসীবাদকে পরাস্ত করতে সমাজ-তান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবময় ভূমিকা ও পরবর্তীকালে তার সঙ্কটমুক্ত অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তাঁদের মনে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে।

অন্যদিকে যাঁরা সোভিয়েতের শাসন ব্যবস্থাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, এমন কি যারা প্রাথমিক পর্যায়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতির সমর্থক ছিলেন, মার্কিন সরকারের বর্ণ-বৈষম্য; উপনিবেশবাদী ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে সম্পদের অপচয়ের নীতির ফলে তারাও বিক্ষুব্ধ হন এবং অনেকে সরকারের এমনকি মার্কিন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সমালোচনামুখর হন।

মার্কিন পুঁজিবাদের এই সঙ্কটকালে মানবতাবাদী আইনষ্টাইনও অচঞ্চল থাকতে পারেন নি। 1939 সালে তিনিই নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে মার্কিন সরকারকে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের পরামর্শ দেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে যখন তিনি বুঝতে পারেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বোমা ব্যবহার করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চলেছে তিনি বিজ্ঞানী জিলার্ডের সঙ্গে এক যুক্ত চিঠিতে মার্কিন সরকারকে এর থেকে বিরত থাকতে আবেদন করেন। তাঁদের আবেদন উপেক্ষিত হয়। বোধ হয় মার্কিন রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই তার প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা অতঃপর তিনি তার যুদ্ধ বিরোধী প্রচার তীব্রতর করেন।

এছাড়াও সাধারণভাবে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিক বা মেহনতী মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না। তিনি এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং এর বিরুদ্ধে সমালোচনা-মুখর হন। 1949 সালে 'সমাজবাদ কেন' প্রবন্ধে তিনি পুঁজিবাদী সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে সমাজতন্ত্রের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

পদার্থবিদ্যা বা প্রকৃতি-বিজ্ঞানে আইনষ্টাইন সর্ব-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তার ধারণা কতটা স্বচ্ছ বা বৈজ্ঞানিক হতে পারে? প্রশ্ন তুলেছেন অবশ্য আইনষ্টাইন নিজেই তাঁর প্রবন্ধের শুরুতেই—'আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞ নন, তার পক্ষে সমাজবাদ সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করা কি যুক্তিযুক্ত?' (পৃঃ 23) তথাপি তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং যৌক্তিকতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে না গিয়েও একথা বলা যায় যে এতে সমাজতন্ত্রের কোন মার্যাদা হানি হয় নি। বরং তাঁর মত প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর সমর্থন পেয়ে—সে সমর্থন যতই ক্ষীণ এবং অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত হোক না কেন—সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামরত মানুষ উৎসাহিত বোধ করেছে।

সমাজতন্ত্র মনীষীদের মস্তিষ্ক-উদ্ভূত কোন কাল্পনিক বস্তু নয়। সমাজ-বিজ্ঞান বা ইতিহাসের নিয়মেই মানব সমাজের বিকাশ ঘটে এবং এক বিশেষ পর্যায়ে অনিবার্যভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হয়। পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজবাদের বীজ। ধনতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মেই পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব বা পুঁজিপতি ও শ্রমিকের শ্রেণী সংগ্রামের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে এক রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও তার জায়গায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ কিছু ব্যক্তি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের এ-সমর্থন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপুষ্ট নয়। অবশ্য সমাজবাদের পক্ষে তাঁদের অভিব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা ভাববার কোন কারণ নেই। তাঁদের কাছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয় কোন ইতিহাস নির্ধারিত ঘটনা নয় বরং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও যুক্তির প্রতিষ্ঠা, অশুভ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধির বিজয়। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের ধারণা ছিল অনেকটা এরকম।

আইনষ্টাইন অর্থনৈতিক নিয়মকে সমাজ বিকাশের মৌলিক নিয়ম হিসাবে উপলব্ধ করতে পারেন নি। তাঁর মতে ইতিহাসের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির 'অস্তিত্ব প্রধানত সামরিক বিজয়াভিযানের ফলে সম্ভব হয়েছে' (পৃ: 28) যা কোন মতেই অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মের উপর—নির্ভরশীল নয়।

এসত্ত্বেও তিনি উপলব্ধ করতে পেরেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজের বর্তমান আর্থিক অরাজকতাই অনর্থের মূল উৎস।' (পৃ: 28)

পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের বাস্তবতা আইনষ্টাইনের কাছে দুর্বোধ্য ছিল না। 'উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে শ্রমিক নতুন নতুন পণ্য উৎপন্ন করে এবং এইগুলি পুঁজিপতির সম্পত্তি হয়।' (পৃ: 28)

পুঁজিবাদের প্রবক্তারা জোর গলায় দাবি করার চেষ্টা করেন যে ধনতন্ত্রে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় 'স্বাধীন শ্রমচুক্তি'র মাধ্যমে—এ ব্যবস্থায় শ্রমিকও তার নিজের পছন্দমত কাজ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু যে মূল জিনিষটা তারা আড়াল করার চেষ্টা করে তা হচ্ছে যে শ্রমিক কোন উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ভোগ করে না। স্বভাবতই নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রী করার মত তার কিছু থাকে না। সুতরাং 'স্বাধীন শ্রমচুক্তির মাধ্যমে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রী না করলে তার কাছে একমাত্র অনাহারে মরার স্বাধীনতা থাকে।

আইনষ্টাইন পুঁজিপতিদের এই স্বাধীন শ্রমচুক্তি'র প্রবঞ্চনা ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন - "শ্রমের 'স্বাধীন চুক্তি'র ক্ষেত্রে শ্রমিক যা পায়, তা উৎপন্ন পণ্যের যথার্থ মূল্য দ্বারা নিরূপিত হয় না। শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজন এবং কার্য প্রাপ্তির জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও শ্রমিকদের যোগান অনুযায়ী পুঁজিপতির চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক হয়।" (পৃ: 28)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক বা তার শ্রমশক্তির মূল্য এবং তার উৎপাদিত মূল্যের মধ্যে পার্থক্যই সৃষ্টি করে 'উদ্বৃত্ত মূল্য'-এর। মালিক এই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে এবং প্রত্যেকেই বের করে আনে তার মুনাফা। ধনতান্ত্রিক সমাজে 'উৎপাদন উপভোগের জন্যে হয় না, হয় মুনাফার জন্যে' (পৃ: 29)—একথা আইনষ্টাইন স্বীকার করেছেন। (ক্রমশ)

মহাকর্ষ ভাবনা : নিউটন ও আইনস্টাইন

যুগলকান্তি রায়

আপেল ফলটি টুপ্ করে নিউটনের সামনে পড়লো। অমনি নিউটনের মাথায় মহাকর্ষের চিন্তা এলো এবং তার কয়েক দিন পরেই তিনি মহাকর্ষ তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন এমনই একটি মুখরোচক গল্প আমরা সকলে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। আসলে ঐ তত্ত্ব অঙ্ক কষে বের করতে কত বছর ধরে নিউটনকে যে ভাবতে হয়েছে তা তাঁর জীবনী পড়লেই বোঝা যায়। আপেল পড়ার গল্পটি যে গল্পই তাও তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কোন জিনিস উপরে ছুঁড়লে কিভাবে নিচে নেমে আসে এ নিয়ে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ভাবছেন কিন্তু গ্যালিলিওই (1564—1642) বলতে গেলে প্রথম ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্নটির সমাধান খোঁজেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নিয়ে বহু বিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস থাকলেও এঁদের মধ্যে ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রে-র (1546—1601) নাম সকলের আগে করতে হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের পথ দেখিয়েছেন বলা চলে। ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেড্রিখ টাইকোর গবেষণার জন্যে বহু অর্থ ব্যয় করে এলসিনর দুর্গের কাছে ইউরেনিবার্গ মানমন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। এর পর টাইকোর চেষ্টায় আরও দুটো মানমন্দির গড়ে উঠেছিল। তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে তিনি যা দেখতেন তা খাতায় লিখে রাখতেন। তাঁর ঐ তথ্যগুলির অধিকাংশই ছিল নির্ভুল।

কেপ্লার (1571-1630) কিছু দিন টাইকোর সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। টাইকোর সংগৃহীত তথ্য ও নিজের কিছু পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনি সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি কি নিয়মে ঘুরছে সে সম্পর্কে তিনটি সূত্র দেন। তার প্রথমটি হল, গ্রহগুলি উপবৃত্ত পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ; ঐ উপবৃত্তের একটি নাভিতে (focus) সূর্য আছে।

ঐ সূত্রটি দেখে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন ওঠে গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তপথে ঘুরছে না হয় ঠিক হল, কিন্তু কেমন সেই বল (force) যা গ্রহগুলিকে সূর্যের কাছে বেঁধে রেখেছে, কেনই বা ওদের ঘোরার পথ উপবৃত্ত হচ্ছে ? এসবের উত্তর তো, কেপ্লারের সূত্রে নেই।

নিউটন যখন এ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ হবে। তিনি সেই সময়ের মধ্যেই, কেপ্লার, গ্যালিলিও-র বই পড়ে ফেলেছেন। এঁদের বইগুলিই তাঁকে ঐ প্রশ্ন নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল প্রায় কুড়ি বছর পর তিনি এর উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বিশ্বের প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করছে এবং সেই আকর্ষণ নিজেদের মধ্যে যে কোন দূরত্বে হয়। আকর্ষণ বল বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং ওদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। নিউটনের এই কুড়ি বছরের চেষ্টায় আমরা শুধু ঐ 'মহাকর্ষ সূত্র'-ই পাই নি, পেয়েছি আধুনিক গণিতের একটি প্রধান স্তম্ভ 'ক্যালকুলাস।'

পৃথিবীর আকর্ষণের (অভিকর্ষ) জন্যে কোন জিনিস উপর থেকে নেমে আসে একথা নিউটনের বহু আগে, এমন কি প্লেটোর সময় থেকেই মানুষ ভাবতেন। এই আকর্ষণ বলের ধারণাও অনেকের ছিল। নিউটনের কৃতিত্ব হল সেই 'বল' কি নিয়ম মেনে চলে তা তিনি আবিষ্কার করেছেন।

প্রায় আড়াই-শ' বছর পরে মহাকর্ষ সম্পর্কে

নিউটনের ধারণার উপর আঘাত হানলেন অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। 1915 সালে তিনি যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশ করেন তাতে তিনি মহাকর্ষ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন ওসব বল-টল বলে কিছু নেই। বিশ্বকে আমরা এতদিন আমর একটি যন্ত্ররূপে ভেবে এসেছি। সেই ভুল ধারণা থেকেই আমরা ভাবছি যে, একটি বস্তু অপরকে আকর্ষণ করে। তাঁর মতে বস্তর উপস্থিতিতে সে স্থান বক্রতা প্রাপ্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে অন্য বস্তু ঐ ক্ষেত্রের ধর্ম অনুযায়ী তার পথ করে চলে। সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষেত্রের (স্থান-কাল-সন্ততি) বিশেষ ধর্মের জন্যেই গ্রহগুলি ঐ ভাবে ঘুরে। সূর্য ওদের আকর্ষণ করছে একথা ভাবার কোন কারণ নেই।

মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটন ও আইনষ্টাইনের ধারণা একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন 'The Universe and Dr. Einstein'-এর লেখক Lincoln Barnett. বার্নেট বলেছেন, মনে করা যাক একটি ছেলে বড়ো-খেবড়ো জমির উপর মারবেল খেলছে। তার পাশেই একটি বাড়ির দশ তলা থেকে একজন লোক ঐ মারবেল খেলা দেখছেন, জমিটি যে উঁচু-নিচু তা তিনি জানেন না। মারবেলটি যখন উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় আসবে এবং এদিক-ওদিক করবে তিনি তখন অবশ্যই ভাববেন যে, এক অদৃশ্য 'বল' মারবেলটিকে এদিকে-ওদিকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু যিনি ঐ জমিতেই ছেলেটির কাছে বসে আছেন তিনি বলবেন, জমিটা উঁচু-নিচু, গর্ত থাকার জন্যে অর্থাৎ জমিটার বিশেষ ধর্মের জন্যেই মারবেলটা ঐ ভাবে ছুটছে। মহাকর্ষ সম্পর্কে বলতে গেলে আইনষ্টাইন হচ্ছেন জমিতে বসা পর্যবেক্ষক, আর নিউটন হচ্ছেন ঐ দশতলার পর্যবেক্ষক।

জ্যোতির্বিদ্যার নানা সমস্যায় আইনষ্টাইনের সিদ্ধান্ত নিউটনীয় তত্ত্বের কাছাকাছি হলেও বুধ গ্রহের ক্ষেত্রে নিউটনের তত্ত্বকে হার মানতে হয়েছে। বুধগ্রহ অন্যান্য গ্রহের ন্যায় উপবৃত্তপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরলেও এর ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রতি বছর তার পথ থেকে কিছুটা সরে আসে। এর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বে।

আইনষ্টাইন তাঁর তত্ত্বে এ কথাও বলেছিলেন যে সূর্যের কাছাকাছি কোন নক্ষত্র থেকে আলো পৃথিবীতে আসার সময় সূর্যের দিকে কিছুটা বেঁকে যাবে; কতটা বাঁকবে তিনি অঙ্ক কষে যা বলেছিলেন তা পরে পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব থেকে যে হিসাব পাওয়া গেছল তা পরীক্ষালব্ধ ফলের প্রায় দ্বিগুণ।

নিউটন বলেছিলেন, একটি বস্তু স্বাধীনভাবে বিচরণ করলে তা সরল রেখায় যাবে। কোন বস্তু বাঁকা পথে কেন যাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে তিনি 'বল'-এর প্রভাব অনুমান করেছিলেন। আইনষ্টাইন বলেছেন, স্বাধীনভাবে কোন বস্তু সরলপথেই যাবে। তাঁর মতে, চাঁদ একটি স্বাধীন বস্তু। সে সরলরেখাতেই যাচ্ছে। আমাদের কাছে তা মনে হচ্ছে না। তার কারণ হল, সূর্যের উপস্থিতিতে তার কাছাকাছি ক্ষেত্র এমন ভাবে বদলেছে (বক্রতাপ্রাপ্ত) যে সেখানে সরলরেখাকে আমাদের বক্ররেখা মনে হচ্ছে।

যাই হোক, আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে একথা ভাবলে ভুল হবে। শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্র, খুব বেশি গতি অর্থাৎ আলোর গতির কাছাকাছি ক্ষেত্রে আইনষ্টাইনের তত্ত্ব বেশি প্রযোজ্য। তার চেয়েও বড় কথা, স্থান-কাল সম্পর্কে আমাদের বহু দিনের ধারণায় আঘাত হেনে আইনষ্টাইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছেন।

আইনষ্টাইনের ন-বছরের ছেলে এডওয়ার্ড বাবার নাম সকলের মুখে শুনে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "বাবা, সকলে তোমার এত নাম করে কেন" আইনষ্টাইন ছেলেকে কাছে টেনে উত্তর দিয়েছিলেন, 'একটি অন্ধ ছারপোকা গোলকের (sphere) উপর যখন চলে তখন সে জানতেই পারে না যে তার পথ বাঁকা। আমি ভাগ্যবান যে, আমি তা জেনেছি"। এডওয়ার্ড তার বাবার কথা সেদিন বুঝতে পেরেছিল কিনা জানি না। তবে আজ বিজ্ঞানীরা সকলে এটা বোঝেন যে আইনষ্টাইন শুধু নিজেই পথ চেনেন নি, অন্যদেরও পথ চিনিয়ে দিয়ে গেছেন।

আলোক-তড়িৎক্রিয়া ও অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

বিজয় বল*

আইনষ্টাইন নামটি পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্রে এক শিরোনাম। আজ তাঁর জন্ম-শতবর্ষে তাঁর কাজের পূর্ণ মূল্যায়ন করা যেমন কঠিন, তেমনি তাঁর বহু মূল্যবান কাজের মধ্যে কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট তার মূল্যায়নও কঠিন। তবু কোন একসময়ে মূল্যায়নের মাপকাঠিতে তাঁর যে কাজটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এবং তার জন্যে অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল, সেটি হল আলোক-তড়িৎক্রিয়া বা ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট।

আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে আলোর ধর্ম সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। আলো কখন কখন তরঙ্গের দলে থাকে, কখন কখন কণিকার দলে। আলোর তরঙ্গ ধর্মের প্রভাব বেশি দেখা যায় যখন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশি। যেহেতু ব্যতিচার (interference), ডিফ্রাক্সন (diffraction) প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় সে অংশ নেয়, সুতরাং তার তরঙ্গ ধর্ম যে আছে এটা খুবই স্পষ্ট। আবার আলোর কণিকা ধর্ম বেশি পাওয়া যায় যখন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমের দিকে। আলোক-কণিকা এমন একটি কণিকা যার স্থির অবস্থায় ভরশূন্য, যার বেগ আলোর গতিবেগের সমান। এই কণিকার শক্তি তার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তরঙ্গের (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়) কম্পনাংকের (ν) সমানুপাতিক।

যথা আলোক-কণিকার শক্তি E এবং ভরবেগ p তখন

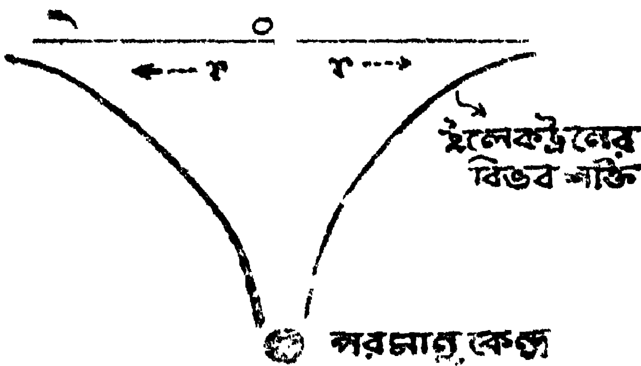
$E = h\nu$ এবং $p = \frac{h\nu}{c}$; h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক, c = আলোর শূন্যে গতিবেগ। আলোক-কণিকার ধর্মের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার নিজস্ব কৌণিক ভরবেগ বা ঘূর্ণন এবং এই কণিকা বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব অনুসরণ করে। এই কণিকার বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে ফোটন।

আলোক-তড়িৎক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের সঙ্গে পদার্থের অন্তর্ক্রিয়া (interaction) হয়, যার ফলে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের ফোটন নামক কণিকাগুলির শক্তি পদার্থের মধ্যে অবস্থিত ইলেকট্রনের কাছে পৌছে যায় এবং সেখানে শোষিত হয়। ইলেকট্রন ফোটনের এই শক্তি গ্রহণ করে পদার্থের বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে এবং তখন এই প্রক্রিয়াকে এক্সট্রিনসিক ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট বা ফটো এমিসিভ এফেক্ট বলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ফোটনের শক্তি গ্রহণ করা সত্ত্বেও পদার্থের বাইরে বেরিয়ে আসে না, সেই শোষিত শক্তি ইলেকট্রনকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন স্তরে উন্নীত করে মাত্র—তখন এই প্রক্রিয়াকে ইনট্রিনসিক ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট বলে। এছাড়া গ্যাসের ক্ষেত্রে অণু-পরমাণু আলোক-শক্তি গ্রহণ করার পর আয়নিত হয় এবং ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে আসে। এটি আর একপ্রকার আলোক-তড়িৎক্রিয়া। সবশেষে আর একটি বিশেষ ধরণের আলোকতড়িৎ-ক্রিয়ার কথা বলি যার নাম নিউক্লিয়ার ফটো-এফেক্ট (nuclear photo-effect)। এই প্রক্রিয়ায় গামারশ্মির ফোটনের শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রে শোষিত হয় এবং পরমাণু কেন্দ্রের বিভিন্ন কণিকা ঐ শক্তির অংশ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

এবার আলোক-শক্তি পদার্থের উপর এসে পড়লে কেমন করে তা থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

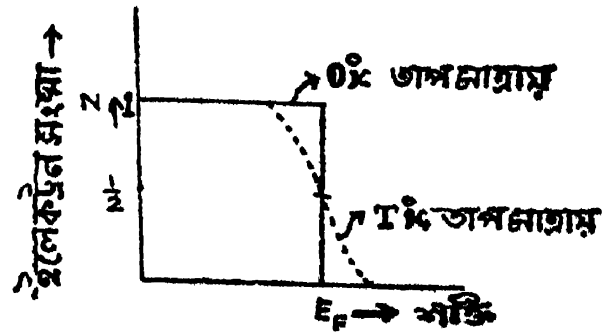
সেদিকে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। আমরা জানি পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকা, যার মধ্যে পদার্থের সমস্ত ভৌত ধর্ম বজায় থাকে, তার নাম পরমাণু। এই পরমাণুর কেন্দ্র ধনাত্মক তড়িৎধর্মী এবং এই কেন্দ্রের চারিদিকে ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী ইলেকট্রন বিচরণ করে। ইলেকট্রনের এই বিচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় পরমাণু কেন্দ্রের বিভব (potential) দ্বারা।



কেন্দ্রের বিভবের (potential field) মধ্যে থেকে ইলেকট্রনের বিভব শক্তি (potential eneragy) কিভাবে কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তা দেখানো হল।

কিন্তু কঠিন পদার্থের মধ্যে একটি পরমাণু একা এভাবে থাকে না। অসংখ্য পরমাণু সারি সারি পাশাপাশি অবস্থান করে। সেখানে একটি পরমাণুর বিভব চারদিকের পরমাণুর বিভবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সঙ্গে বিভবের পরিবর্তনের প্রকৃতিটা ঠিক আগের মত থাকে না। ফলে ইলেকট্রনের বিভবশক্তিরও পরিবর্তন হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কঠিন পদার্থের মধ্যে আছে অসংখ্য পরমাণু এবং তাদের আছে অসংখ্য ইলেকট্রন। এই অসংখ্য ইলেকট্রনের কোন্‌টি কেমন ভাবে বাইরের শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করছে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলে তাদের কোন্‌টি কোন্‌ শক্তিস্তরে উঠে যাচ্ছে বা নেমে যাচ্ছে তাও দেখা সম্ভব নয়। এই ঘটনাকে দেখতে হবে সংখ্যাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেবার আগে কয়েকটি বিশেষ নামকরণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। (i) ফের্মি-শক্তি তল—পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থান করে। প্রতিটি স্তরে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন কতগুলি করে থাকতে পারবে তারও বিশেষ নিয়ম আছে। যদি শূন্য কেলভিন তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের বণ্টনের (distribution) দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যায় নিম্নতম শক্তিস্তরে থেকে সুরু করে প্রতিটি স্তরে যতগুলি ইলেকট্রনের থাকা সম্ভব ততগুলি করেই আছে, কিন্তু একটি বিশেষ স্তরের পর থেকে কোন শক্তিস্তরেই ইলেকট্রন পাওয়া যাচ্ছে না। এই বিশেষ শক্তিস্তরের ধর্মের আরও বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় অন্য তাপমাত্রায়। অন্য তাপমাত্রায় ঐ বিশেষ



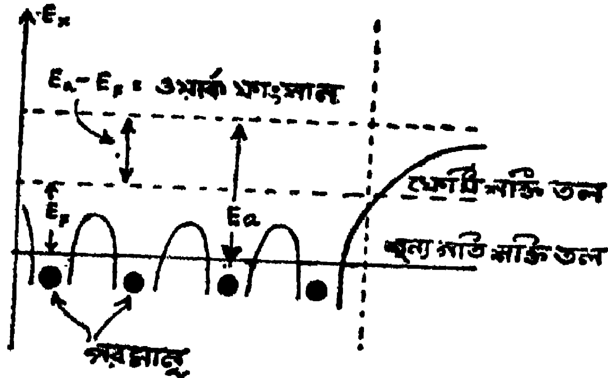
অন্য তাপমাত্রায় ঐ বিশেষ স্তরে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা আগের তুলনায় অধিক হয়।

স্তরে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা আগের তুলনায় অর্ধেক হয়। এই শক্তিস্তরের তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন স্তরে ইলেকট্রনের থাকার সম্ভাবনা অর্ধেকের বেশি এবং বেশি শক্তিসম্পন্ন স্তরে ইলেট্রনের থাকার সম্ভাবনা অর্ধেকের কম। এই বিশেষ শক্তিসম্পন্ন স্তরের নাম ফের্মি-শক্তিস্তর।

(ii) পৃষ্ঠশক্তি স্তর—ইলেকট্রন যখন পদার্থের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে, সে পিছনে ফেলে আসে অসংখ্য ধনাত্মক তড়িৎধর্মী আয়নকে। এই আয়ন সব সময়ই চেষ্টা করে এই ইলেকট্রনগুলিকে পিছনের দিকে টেনে রাখতে। কিন্তু ইলেকট্রন একটি বিশেষ

শক্তিস্তরে পৌঁছলে আয়নের আর ইলেকট্রনকে টেনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না—এই বিশেষ শক্তিস্তরের নাম পৃষ্ঠ শক্তিস্তর।

এবার মনে করি পদার্থের উপর যে আলো এসে পড়ল তার কম্পনাঙ্ক ν, সুতরাং এর প্রতিটি আলোক কণার বা ফোটনের শক্তি $h\nu$। এই শক্তি $h\nu$-র কিছুটা ব্যয়িত হবে ওয়ার্ক-ফাংশানের খাতে আর বাকি শক্তি বেরিয়ে-আসা ইলেকট্রনের সঙ্গেই থাকবে, যা তাকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গতিশক্তি যোগাবে। সমীকরণের সাহায্যে এই ঘটনাকে লেখা যায়



বাইরে থেকে শক্তি পাঠিয়ে কঠিন পদার্থ থেকে ইলেকট্রন পেতে হলে সেই প্রেরিত শক্তির পরিমাপ কমপক্ষে $(E_a - E_f)$-এর সমান হতে হবে। নচেৎ ইলেকট্রনের বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। $(E_a - E_f) = .\phi$. এই $\epsilon\phi$ বা ন্যূনতম শক্তিকে বলা হয় ওয়ার্ক-ফাংশন (work function)।

$$h\nu = e\phi + E_{kmax}$$

যেখানে $e\phi \rightarrow$ ওয়ার্ক-ফাংশান

$E_{kmax} \rightarrow$ সর্বোচ্চ গতিশক্তি

সুতরাং ইলেকট্রন বেরিয়ে আসার সময় তার অর্জিত বেগ হবে

$$V = \sqrt{\frac{2E_{kmax}}{m}}$$

m ঐ কণার ভর। যে ইলেকট্রন এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে বেরিয়ে আসে তার নাম ফটো-ইলেকট্রন।

আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ঘটার প্রক্রিয়াকে মোটামুটি কয়েকটি সূত্রের আকারে লেখা হয়।

(i) পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা ফটো-ইলেকট্রনের সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক বেগ নির্ভর করে আলোর কম্পাঙ্কের উপর, তার ঔজ্জ্বল্যের উপর নয়।

(ii) আলোর ঔজ্জ্বল্য ফটো-ইলেকট্রনের সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতি মুহূর্তে যতগুলি ফোটন পদার্থের দ্বারা শোষিত হচ্ছে—বেরিয়ে-আসা ইলেকট্রনের সংখ্যা তার সমানুপাতিক।

(iii) প্রতিটি পদার্থের ক্ষেত্রেই আপতিত আলোর একটি নিম্নতম কম্পনাঙ্ক আছে যার নিচে কোন ফোটনের পক্ষে কোন ইলেকট্রনকেই বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এই নিম্নতম কম্পনাঙ্ককে বলা হয়থে্রসোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি।

আবার প্রতিটি আলোক-কণার বা ফোটনের শক্তির উপর নির্ভর করে যে সংখ্যক ইলেকট্রন নির্গত হয় তাকে বলা হয় আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার কোয়ান্টাম উৎপাদ। এই কোয়ান্টাম উৎপাদ পদার্থের গুণাগুণ এবং আপতিত আলোর কম্পনাঙ্কের উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন ধাতু, যেমন—লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম প্রভৃতির পাতের উপর একটি নিম্নতম কম্পনাঙ্কের বেশি কম্পনাঙ্কের আলো পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। আবার কেলাসাকার মধ্যম—পরিবাহী (crystalline semiconductor) বা পরাবিদ্যুৎ (die-electric) পদার্থের উপর আলোক-শক্তি এসে পড়লে, তাদের তড়িৎ পরিবহনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার এই দুটি দিক এক্সট্রিনসিক এবং ইনট্রিনসিক-এর উপর নির্ভর করে। বর্তমানে বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক বর্তনীর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক খুলে গেছে। বহু নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এই ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। কম্পিউটারের অনেক কার্যকলাপ এই ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার আবিষ্কারের ইতিহাসের দিকে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

ইংরেজির 1899 সালের কথা, বিজ্ঞান জগতের দুই দিকপাল অধ্যাপক জে. জে. টমসন এবং অধ্যাপক পি. লেনার্ড দু-জনেই আলাদা আলাদাভাবে ধাতব পদার্থের উপর বেগুনীপারের আলো ফেলে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী কণা ইলেকট্রন পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসছে। এর পর অধ্যাপক লেনার্ড একই বিষয়ের উপর তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। 1902 সালে তিনি দেখলেন যে এই নির্গত ইলেকট্রনের বেগ আলোর ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করে না। আলোটি কাছ থেকে ফেল্‌লে নির্গত ইলেকট্রনের যে বেগ হয়, আলোটি যদি ক্রমশ দূরে নিয়ে যাওয়া যায়, আলোর তীব্রতা বা ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও নির্গত ইলেকট্রনের বেগের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা আলোর তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাচ্ছে।

কিন্তু এসব ঘটনা ঘটার কারণ তখনও বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ অস্পষ্ট ছিল। আলোকে তরঙ্গরূপে ভেবেও এর সুস্পষ্ট সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আলো যদি তরঙ্গই হয়, তবে কি করে ধাতব পদার্থকে ধাক্কা মেরে তা থেকে ইলেকট্রন বের করে নিয়ে আসে। যদিও বা আলোক-তরঙ্গের ধাক্কায় ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এভাবে ঘটনাটাকে ধরে নেওয়া হয়, তবে তীব্রতা বা ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে ইলেকট্রনের বেগের কোন সম্পর্ক থাকবে না কেন? এ-প্রশ্ন আরও কঠিন আকার ধারণ করল। আবার ধাতব খণ্ডকে বহুক্ষণ ধরে লাল বা তার থেকে বেশি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোতে রেখে দিলে তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় না, কিন্তু ঐ ধাতবখণ্ডে বেগুনীপারের আলো পড়লেই ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ঘটনার ব্যাখ্যা কি?

আলোক-তড়িৎক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন যখন এভাবে অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল, তখন বিজ্ঞানীরা আর একটি বিষয়েরও সমাধানের পথ নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করছিলেন, সেটি হল 'কৃষ্ণ বস্তু থেকে বিকিরণের ধর্ম'। বিভিন্ন বিজ্ঞানী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে শক্তির বণ্টনের সম্পর্ক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং এই পরীক্ষার ফল হিসাবে পাওয়া গেছে 'কোন একটি তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ শক্তি বণ্টিত হয় একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে, কিন্তু তাপমাত্রা যত বাড়ানো যায় শক্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ বণ্টিত হয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গে।' শক্তির এই বণ্টনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করার মত সূত্র তখনও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। বিজ্ঞানী ভীনের বণ্টন সূত্র দিয়ে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গের দিকের বণ্টনের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দিকটা নয়, আবার র‍্যালে-জীন্সের সূত্রে দীর্ঘ তরঙ্গের দিকের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গের দিক নয়। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের ধর্ম নিয়ে বিজ্ঞানী প্লাঙ্কও তখন বিশেষ ভাবে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তিনি ভীষণ বিশ্বাসী ছিলেন তাপ-বলবিদ্যার (thermodynamics) শক্তি এবং এণ্ট্রপি নিয়ে সূত্রের চরম সত্যতার উপর এবং এই বিশ্বাসের জন্যেই তিনি বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল এবং বোলট্‌জ্‌-ম্যান-এর তাপ-বলবিদ্যার সূত্রে অসংখ্য কণার সর্বোচ্চ সম্ভাবনাপূর্ণ বা গড় ধর্মের ধারণাকে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষালব্ধ ফল তাঁর এই ধারণার উপর বারবার আঘাত হানতে লাগল। কৃষ্ণ বস্তু থেকে বিকিরণের বিজ্ঞানী কার্চফের সূত্র (বিকিরণের বর্ণালীর ধর্ম বিকিরণকারী পদার্থের ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়) তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করল। অপরদিকে জার্মান বিজ্ঞানী ভীনও অঙ্কের সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছিলেন। এমনি অবস্থায় বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক হঠাৎ তাঁর পূর্বের ধারণা পরিবর্তন করলেন। 1900 সালে তিনি কোন তত্ত্বগত বিষয়ের উপর নির্ভর না করেই একটি সূত্র উপস্থাপন করলেন যে সূত্র দিয়ে সমস্ত পরীক্ষালব্ধ ফলকেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল। তিনি তাঁর সূত্রে বললেন যে "শক্তির বিকিরণ ও শোষণ এবং

নেয়া অবিরত এবং অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় ঝাঁকে ঝাঁকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মাধ্যমে এবং এই কণার শক্তি কখন একটি ন্যূনতম শক্তির কম হতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্লাঙ্কের এই মতবাদ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাঁর এই মতের যথার্থতাকে সমর্থন জানালেন। তাঁদের সমস্ত পরীক্ষালব্ধ ফলকে এই সূত্র দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল। এর পর প্লাঙ্ক নিজেকে নিয়োজিত করলেন তাঁর এই সূত্রের তত্ত্বগত দিকটা খুঁজে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তত্ত্বগত দিকটা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এবার প্লাঙ্ককে (বোলট্জ্‌ম্যানের শক্তি বণ্টনের নীতির উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সব সময়ই সন্দেহ ছিল বোলট্জ্‌ম্যানের এই নীতির যথার্থতার উপর অধ্যাপক প্লাঙ্ক প্রায় দশ বছর ধরে তাঁর সূত্রের তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। প্লাঙ্কের এই যুগান্তকারী সূত্র বের হবার পর পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানীই এর তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়েছিলেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইনও এই বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবছিলেন। প্লাঙ্কের এই ধারণা তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করল, অপরদিকে বিজ্ঞানী ভীনের সূত্রকেও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করছিলেন। তার পর সংখ্যাতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন যে বিকিরণকে কণার সমষ্টি ধরলেও তা ভীনের সূত্রকে অনুসরণ করে। আইনষ্টাইন এবার সচেষ্ট হলেন পদার্থ এবং বিকিরণের নতুন ধারণাকে 'আলোক-তড়িৎক্রিয়ার' ব্যাখ্যায় কাজে লাগাতে। 1905 সালে অধ্যাপক আইনষ্টাইন বললেন যে ধাতব পাতের উপর যে আলো এসে পড়ছে তা অসংখ্য আলোক-কণার সমন্বয় মাত্র। যখন এই আলোক-কণিকা কোন একটি ধাতব পদার্থের উপর এসে পড়ে, তখন এটি ধাতব পাতে শোষিত হয় এবং ইলেকট্রনকে ধাতব পাত থেকে বের করে নিয়ে যায় এবং এই নির্গমনের সময় ইলেকট্রনের যে সবচেয়ে বেশি গতিবেগ তা $(h\nu - e\phi)$-এর সমান, সেখানে $\nu \rightarrow$ আপতিত রশ্মির কম্পনাঙ্ক এবং $e\phi$ ইলেকট্রনের পূর্বের অবস্থা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে ব্যয়িত শক্তি। সুতরাং ইলেকট্রনের বেরিয়ে আসার জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শক্তি $e\phi$ যদি আপতিত আলোক-কণিকার শক্তির চেয়ে বেশি হয় তবে ঐ আলোর পক্ষে ইলেকট্রনকে বাইরে বের করে আনা সম্ভব নয়। এর পর আপতিত আলোর শক্তি, ওয়ার্ক-ফাংশান এবং নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তিকে নিয়ে আইনষ্টাইনের মহামূল্যবান সমীকরণ পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করেন মিলিকান 1912 সাল থেকে 1916 সালের মধ্যে এবং অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে এই কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় 1922 সালে।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর শারদীয় সংখ্যার (1978) জন্যে প্রবন্ধ পাঠাতে সভ্য-সভ্যা, পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর চার পৃষ্ঠার (ছবিসহ) অনধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ 20শে অগাষ্টের (1978) মধ্যে কার্যকরী সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পদার্থবিদ্যার মূল স্তম্ভ*

রঞ্জনমোহন খাঁ

আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিক্ষিপ্ত বৈচিত্র্যকে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার মাধ্যমে সুসামঞ্জস্য সূত্রে বা তত্ত্বে গ্রথিত করার প্রচেষ্টাই হল বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হল বৈষয়িক ঘটনা। কিন্তু তত্ত্ব হল গভীর চিন্তাপ্রসূত ফল। তত্ত্বের উৎপত্তিমূলে আছে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন বা প্রতিযোজন এবং এটি কল্পনাপ্রসূত বলে কখনই সম্পূর্ণ ও ধ্রুব নয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারায় সমস্ত ঘটনা, ধারণা ও অনুবন্ধকে কয়েকটি নিরপেক্ষ মৌল ধারণা ও স্বতঃসিদ্ধে নিবদ্ধ করা হয়।

পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যার বিষয়বস্তুর ধারণা পরিমাপের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং ধারণা ও প্রতিজ্ঞাগুলি আবার গাণিতিক সূত্রে আবদ্ধ। বলা যেতে পারে পদার্থবিদ্যা হচ্ছে লব্ধ জ্ঞানের গাণিতিক প্রকাশ।

গবেষকের দল পদার্থবিদ্যার বহু শাখার উন্নতি সাধনে ব্যস্ত। তাঁরা পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী স্ব-স্ব কাজের মধ্য দিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খোঁজেন সূত্রসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ফলে বিংশ শতকে ঘটেছে বহু যুগান্তকারী আবিষ্কার, মানুষের জীবনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে সকল শারীরিক পরিশ্রম লাঘবের।

নানা মনীষীর বহু দিনের নিরলস প্রচেষ্টার ফল হিসাবে এসেছে পদার্থ-বিজ্ঞানে বহু শাখা-প্রশাখা। প্রতিটি শাখা একাধিক তত্ত্বে ভারাক্রান্ত। তাই প্রয়োজন একীভূত তত্ত্বের। যে তত্ত্বে থাকবে মাত্র কয়েকটি মৌলিক ধারণা ও সূত্র, যাদের উপর ভিত্তি করে যুক্তি পরম্পরায় পাওয়া যাবে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা। সমগ্র পদার্থবিদ্যার ঐ মূল স্তম্ভ বা বুনিয়াদকে খুঁজে বের করতে হবে।

মহামতি নিউটন প্রথম সমগ্র পদার্থবিদ্যাকে একটি স্তম্ভের উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। তাঁর পদ্ধতি বা কাঠামোয় আছে তিনটি মৌলিক ধারণা—(i) ভরবিন্দুতে ভর অপরিবর্তনীয়, (ii) দুই ভরবিন্দুর মধ্যে দূর-ক্রিয়া, (iii) ভরবিন্দুর গতিসূত্র। নিউটনীয় ধ্যানধারণা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহলে মূল স্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত ছিল। মহাকর্ষ বলের সূত্র সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধির ব্যাখ্যা, বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন বস্তুর বলবিদ্যা, শক্তির নিত্যতা এবং প্রায় সম্পূর্ণ তাপ-তত্ত্ব নিউটনীয় ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নিউটনীয় তত্ত্ব প্রভাবিত বিজ্ঞানীরা আলো বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অসমর্থ হল। নিউটনীয় তত্ত্বে তরঙ্গবাদের স্থান নেই। নিউটনের মতে আলো হল সূক্ষ্ম বস্তু-কণিকার সমষ্টি। বস্তু-কণিকাগুলির শূন্য স্থান দিয়ে আগমন বা এক মাধ্যম থেকে অন্য এক মাধ্যমে আপতনই হল উৎসের সন্ধান, প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কারণ। দ্বন্দ্ব দেখা দিল আলোর গতির ধ্রুবকত্বে, ব্যতিচার, ব্যবর্তন, সমবর্তন প্রভৃতির ব্যাখ্যাতে। হুইগেন্স প্রবর্তিত আলোর তরঙ্গতত্ত্বে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ফ্রেনেল ও ইয়ং-এর পরীক্ষা তরঙ্গবাদের স্বপক্ষে রায় দিলেও নিউটনীয় প্রভাব থেকে বিজ্ঞানীরা মুক্ত হতে পারলেন না।

এর পর এল ক্ষেত্র পদার্থ (field physics), উন্মুক্ত হল নতুন দিগন্ত। নিউটনের বলভিত্তিক বুনিয়াদ কেঁপে উঠল ম্যাক্সওয়েল, হার্ট্‌জ্‌ ও ফ্যারাডের

---

*নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি (1922) উপলক্ষ্যে প্রদত্ত আইনস্টাইনের বক্তৃতার ভাবানুবাদ

তরঙ্গতত্ত্বে। গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করলেন যে বৈদ্যুতিক আধানের দ্রুত স্পন্দনের ফলে তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পর সমকোণে থাকে এবং বৈদ্যুতিক-চৌম্বক তরঙ্গ ক্ষেত্রদ্বয়ের তলের লম্বাভিমুখে নির্দিষ্ট গতিতে প্রবাহিত হয়। হার্ট্‌জ্‌ গবেষণাগারে 1888 খৃঃ তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন। এই নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত করেছিলেন ফ্যারাডে। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও প্রতিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ফ্যারাডে অনুভব করতেন ও বিশ্বাস করতেন যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকরণ সম্পর্ক তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের উপরই নির্ভরশীল। 1831 খৃঃ তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশও ঐ বিষয়ে সূত্রের আবিষ্কার করেন। তাঁরই প্রদর্শিত বিদ্যুৎ প্রবাহে লৌহচূর্ণের সমাবর্তিত অবস্থান বর্তমানের বণ্টন-ক্ষেত্রের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।

হুইগেন্স ঈথার মাধ্যমে যে তরঙ্গ প্রবাহের চিন্তা করেছিলেন, ফ্যারাডের উত্তরসূরী ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে তা খণ্ডিত হয়ে প্রমাণিত হল মাধ্যম ব্যতীত তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব। ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বেই স্থাপিত হল আলো ও বিদ্যুতের মধ্যে সেতুবন্ধন। দেখা গেল আলোক তরঙ্গ গতিশীল তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া কিছুই নয়। বিপদ দেখা দিল নিউটনের দূর-ক্রিয়া সূত্রে। স্থিতীয় তড়িৎ আধানে পারস্পরিক বিকর্ষণ বা আকর্ষণ দূর থেকে ক্রিয়ার উদাহরণ নয়, এটি চৌম্বক ক্ষেত্রেরই ফল। মহাকর্ষ ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। নিউটনের বিচ্ছিন্নতাবাদের স্থলে স্থান পেল অবিচ্ছিন্নতাবাদ।

টমসনের পরীক্ষায় যেমন পাওয়া গেল ইলেকট্রনের পরিচয় তেমনি পাওয়া গেল তড়িতাহিত গতিশীল বস্তুর মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রশক্তি বস্তুর বর্ধিত গতিশক্তির সঙ্গে প্রায় সমান। বস্তুর পুরাশক্তি, বস্তুর গঠন, জাড্যতা ও মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ব্যাখ্যায় নিউটনীয় গতি-সূত্র অসম্পূর্ণ। প্রচলিত ক্ষেত্রতত্ত্বেও এদের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেল বিংশ শতাব্দীতে। একীভূত মূলতত্ত্ব সুদূর পরাহত হলেও নিউটনের প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপের ভিত্তি ধ্বসে পড়ল। বর্তমান পদার্থবিদ্যা দুই মতবাদে বিভক্ত। একটি হল আপেক্ষিক তত্ত্ব আর অপরটি হল কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এই দুই মতবাদ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় মৌলিকত্বের দাবী রাখলেও একেবারে পরস্পর বিরোধী নয়।

যুক্তি-নির্ভর আপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিদ্যার একটি স্তম্ভ। মাধ্যম ব্যতীত আলোক-তরঙ্গ প্রবাহের ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি লোরেন্‌ৎসের রূপান্তরে অপরিবর্তিত থাকে। এই বৈশিষ্ট্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে পদার্থবিদ্যার সূত্র বা তত্ত্বগুলি কোন জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যমে অকাট্য হলে, ঐ মাধ্যমের আপেক্ষিকে সমবেগে ধাবমান অনুরূপ মাধ্যমেও ঐগুলি অকাট্য থাকবে। বিপরীতক্রমে বলা যায় যে স্থানাঙ্ক ও সময় নির্ধারক জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যমে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি লোরেন্‌ৎস রূপান্তরে অপরিবর্তনীয়। এটিই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূল কথা। এথেকে প্রমাণিত হয় যে দুই স্বতন্ত্র ঘটনার যুগপৎ ঘটা অভিন্ন (invariant) নয়। বস্তুর আয়তন ও ঘড়ির সময় গতি নিরপেক্ষ নয়। আলোর গতির প্রায় সমতুল বেগসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনীয় বলবিদ্যা কার্যকরী নয়। একটি বস্তুর স্থিতাবস্থায় ভর (যাকে বলা যেতে পারে জড়ত্বজনিত ভর) m_0 হলে v বেগে ধাবমান অবস্থায় বস্তুটির ভর হবে m_0+E/c^2; এখানে E হল বেগজনিত বর্ধিত শক্তি এবং c হল আলোর বেগ। এ থেকে সহজেই বলা যায় যে স্থিতাবস্থায় বস্তুর ভর m_0 গ্রাম হলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি m_0c^2 আর্গস। এটিই হচ্ছে ভর ও শক্তির তুল্যতা।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূল ভাবটি নিহিত আছে গ্যালিলিও ও নিউটনীয় ঘটনার মধ্যেই, কিন্তু ঘটনাটির তত্ত্বীয় ব্যাখ্যাই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুর জাড্য ও ওজন দুটি পৃথক বিষয় কিন্তু পরিমাপ করা যায়

একটি মাত্র ধ্রুবকের মাধ্যমে, যাকে বলা হয় ভর। এ-থেকে বলতে হয় যে, কোন স্থানাঙ্ক নির্ধারকে বা মাধ্যমে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বলা সম্ভব নয় যে বস্তুটি ত্বরিত বা সরলরেখায় সমবেগে আছে কিংবা লব্ধ ফলসমূহের কারণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। এই ব্যাখ্যায় মহাকর্ষ ক্ষেত্রে জাড্যগুণসম্পন্ন কাঠামো অযৌক্তিক। গ্যালিলিও ও নিউটনীয় তত্ত্বে একটি অদ্ভুত কাঠামো স্বীকার করা হয়েছে যেখানে জাড্যসূত্র ও গতিসূত্র অকাট্য। এই সমস্যার নিরসনের জন্যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্রগুলি এমনভাবে ঠিক করতে হবে, যাতে তারা যে কোন চলন্ত কাঠামোয় অপরিবর্তিত থাকে। এটাই হবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের অন্তর্নিহিত মূল কাজ। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনীয় ধ্যানধারণার পরিবর্তে পদার্থবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হলেও, এটি পদার্থবিদ্যার শেষ কথা নয় বা একমাত্র স্তম্ভও নয়। সমস্ত ঘটনার মূলে মহাকর্ষ ক্ষেত্র, না হয় তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র।

প্লাঙ্কের শক্তির কণিকারূপে ও আলোর শক্তির কণিকাগুচ্ছ হিসাবে বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে নীলস্ বোর পরমাণুর গঠন বিষয়ে এক বিস্ময়কর তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্বে প্রকাশিত হল যে, পরমাণু এক নির্দিষ্ট শক্তির আধার। বাইরের তাপ বা শক্তির প্রভাবে পরমাণু থেকে ফোটন বা শক্তিকণা নির্গত হওয়ার ব্যাখ্যা এতে পাওয়া গেল। যে কোন পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন (বর্তমানে প্রোটন ও নিউট্রন) আছে এবং ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে। প্রতি কক্ষপথ একটি নির্দিষ্ট শক্তিস্তরের। যে কোন স্তরে ইলেকট্রনের শক্তি প্লাঙ্কের ধ্রুবকের উপর নির্ভর করে। সনাতন তত্ত্বে পরমাণুর এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বোরের পরমাণু গঠনতত্ত্ব ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ-তত্ত্বেও ব্যাখ্যা করা যায় না।

আলোর তরঙ্গধর্ম ও কণাধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হল হুই দ্য-ব্রগ্‌লির বস্তুর তরঙ্গতত্ত্বে। এই তত্ত্বের মূল কথা হল চলন্ত অবস্থায় যে কোন বস্তু হবে বিভিন্ন বেগের বহু তরঙ্গের সমবায়। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে শ্রোয়েডিঙ্গার তরঙ্গ বলবিদ্যাকে নতুন আঙ্গিকে সাজান। বহু বিতর্কের অবসান এই তরঙ্গ বলবিদ্যায় ঘটলেও, ভরবিন্দুর নির্দিষ্ট গতির সঠিক কারণ এতে বুঝা গেল না। দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনা কিরূপে ঘটে তার গাণিতিক বর্ণনা তরঙ্গ বলবিদ্যায় দেওয়া সম্ভব হল না। কিন্তু অতি সহজভাবে ম্যাক্স বর্ণ এই সমস্যার সমাধান করেন। দ্য-ব্রগ্‌লি ও শ্রোয়েডিঙ্গারের বস্তু তরঙ্গ-তত্ত্ব একটি ঘটনার সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গাণিতিক বর্ণনা নয়, এটি ঘটনা সংক্রান্ত পুরা বিষয়টির সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞানের গাণিতিক বর্ণনা। পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে পুরা বিষয়টি থেকে সম্ভাব্য ফলাফলের চিত্র ফুটে উঠে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি বিশেষ ক্ষেত্র G-তে কোন ভরবিন্দুর উপর কয়েকটি বল ক্রিয়া করছে। সনাতন বলবিদ্যা অনুসারে ভরবিন্দুর গতি শক্তি একটি নির্দিষ্ট মানের কম হলে G ক্ষেত্রের বাইরে কোন ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুসারে যে কোন দিকে (যা আগে থেকে বলা যায় না) G ক্ষেত্রের বাইরে ঘটনা ঘটতে পারে। গ্যামোর প্রকল্পে তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ায় এই ঘটনা ঘটে। এই তত্ত্বে নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাঠামোয় পরিমাপ বিষয়ক সম্ভাব্য ফলাফল নিরূপণ করা হয়। দেশ-কাল সাপেক্ষে ঘটনাটির বর্তমান অবস্থার গাণিতিক প্রকাশ এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য নয়। কার্যকারণ সম্বন্ধ পরিহার করে, বাস্তব ঘটনাটি বের না করে এই তত্ত্বে আছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা ও বিচ্ছিন্নতা।

কোয়ান্টামবাদকে অস্বীকার করার কোন হেতু নেই। তবে আপেক্ষিকতাবাদ ও কণাবাদের উপরেও অধিকতর বোধগম্য ভিত্তিতে বাস্তব ও প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। হাইজেনবার্গের

অনিশ্চয়তা নীতি থেকে বলা যায় যে ভবিষ্যতে কোন সম্যক জ্ঞান কোন বাস্তব ঘটনার প্রাকৃতিক গুণাবলীকে একসঙ্গে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে না। বর্তমানে পদার্থবিদ্যার স্তম্ভ বলে কোন সাধারণ তত্ত্ব বলা যাচ্ছে না। পরমাণুর ধারণায় বস্তু ও শক্তির কণিকারূপ এবং অতি ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক ঘটনায় ক্ষেত্রতত্ত্ব অচল আবার মহাকাশ, সময়, মহাকর্ষ ও আলোক সীমার বাইরে সত্য সন্ধানে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অচল। তবে অর্জিত জ্ঞানের থেকে সত্যের সন্ধান অধিকতর মূল্যবান।

রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা

আগামী 31 শে জুলাই '78 বিকাল 4টায় ষোড়শ বার্ষিক "রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা" (1977) সত্যেন্দ্র ভবনের কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে (পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) অনুষ্ঠিত হবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বক্তা ডঃ মনোজকুমার পাল

বিষয়ঃ অতি ভারী পরমাণু কেন্দ্র

শ্রীরতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা

আগামী 31শে জুলাই '78 বিকাল 6টায় চতুর্থ বার্ষিক "শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা" "সত্যেন্দ্র ভবনের কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে" (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 0006) অনুষ্ঠিত হবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বক্তাঃ ডঃ বলাইচাঁদ কুণ্ডু

বিষয়ঃ পাটের সমস্যা ও সম্ভাবনা

শ্রীরতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিশ্ববিজ্ঞানী আইনষ্টাইন

দীপককুমার দাঁ*

(1) একবার আইনষ্টাইন নিজের ঘরে একটি ছবি টাঙাবার জন্যে হাতুড়ি-পেরেক-মই নিয়ে উপরে উঠে যেই পেরেক পুঁততে যাবেন, অমনি মই পিছলে তিনি ভূপাতিত হলেন। বাড়ির লোক ছুটে-এসে তাঁকে ধরে তুলতে গেলে, তিনি বললেন, 'আমি কি সত্যই পড়ে গেছি? না, মেঝেটা আপনা থেকেই উপরে উঠে এসেছে।' এসময় আইনষ্টাইনের বয়স 29-30-এর মত। নিউটন আপেলকে মাটিতে পড়তে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এর গতি উর্দ্ধমুখী হয় না কেন? আর আইনষ্টাইন স্বয়ং প্রপাত হয়ে প্রশ্ন তুললেন—মহাকাশের স্বরূপ কি?

(2) ধরা যাক, কোন একজন লোক একটি চলন্ত গাড়ির সঙ্গে সমান গতিতে ছুটছে। তাহলে লোকটির কাছে চলন্ত গাড়িটাকে স্থির অবস্থাসম্পন্ন বলে মনে হবে। মনে করা যাক, লোকটি আলোর গতিতে $(3 \times 10^{10} \text{cm/sec})$ ছুটছে। তাহলে আলোক-তরঙ্গকেও তার কাছে স্থির মনে হবে। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব মতে আলোক-তরঙ্গ স্থির থাকতে পারে না; তাকে সচল তরঙ্গ হতেই হবে। তাহলে এই অসঙ্গতির কারণ কি?

(3) আলোর তরঙ্গ-তত্ত্বকে স্বীকার করে নিলে একটা মাধ্যমের অস্তিত্বকে কল্পনা করতেই হবে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন 'ঈথার'। এটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। 1881 এবং 1887 খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ দুই বিজ্ঞানী মাইকেলসন এবং মরলে এক বিশেষ ধরণের নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সচেষ্ট হলেন—ঈথার আছে কি না?—তার অস্তিত্ব নিরূপণে। এই পরীক্ষার পিছনে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল—পৃথিবীর আবর্তন বেগ (সেকেণ্ডে 30 কি. মি.) কি আলোর গতিবেগের উপর কোন প্রভাব ঘটাতে পারে, যেমনটি শব্দের বেলায় দেখা যায় (ডপ্‌লার এফেক্ট)। পরীক্ষার ফলাফল সমগ্র পদার্থ-বিজ্ঞানকে এক গভীর নিরাশার গর্ভে নিমজ্জিত করল। ঈথারের অস্তিত্ব ধরা পড়ল না এবং পৃথিবীর আবর্তন বেগের কোন প্রভাব আলোর গতির উপর নেই। এর কারণ কি?

(4) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক য়েরন্সট মাখ্‌ নিউটনকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন তাঁর 'History of Mechanics' গ্রন্থে। নিউটন বলেছিলেন, মহাকাশের দুটি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যেকার আকর্ষণজনিত বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু এই আকর্ষণ বল (action at a distance) কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে বা কাজ করছে—তার ধারণা নিউটনের তত্ত্ব থেকে মেলে না। একখণ্ড চুম্বক রাখলে তার চতুর্দিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। মহাকর্ষ বলকে কি ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করা সম্ভব?

নিউটনের ধারণায়, প্রকৃতির সব ঘটনা একটি অতি বৃহৎ যন্ত্রের মত একের পর এক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। মহাকাশ অন্তহীন, সীমাহীন ও মৌলিক, যা পরনির্ভর নয় এবং মহাকাশ ও সময়-পরস্পর মৌলিক (fundamental); কোন ভাবে পরস্পর নির্ভরশীল নয়। কল্পনা করা যাক, মহাকাশ একটি বিন্দুতে পরিণত হল। তাহলে কি সময়ের অস্তিত্ব থাকবে? অথবা, মহাকাশ যদি নাই থাকে, তাহলেও কি সময় থাকবে? বস্তুর-অস্তিত্ব কি মহাকাশ ও সময় থেকে আলাদা?

*গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনসটিটিউশন, পোঃ-খাঁটুরা, 24 পরগণা

নিউটনের ধারণায় বস্তুর ভর অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

মহাকাশে বিভিন্ন ঘটনার আপাত সঠিক ব্যাখ্যা নিউটনের থেকে পাওয়া গেলেও, অনেকগুলি মূলগত সমস্যার সমাধান কিন্তু পাওয়া যায় নি। নিউটন নিজেও এসব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ণ রহস্য ভেদ করতে না পেরে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে বললেন, 'ঈশ্বর বিশ্বকে যন্ত্ররূপে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বের সূর্য, গ্রহ, তারকা ইত্যাদি সমস্ত বস্তুকে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়ে তাঁর ইচ্ছামত গাণিতিক সূত্র দিয়ে বিশ্বকে চালিয়ে দিয়েছেন।···সমস্ত গ্রহকে সূর্যের চারদিকে চিরন্তন কালের জন্যে আবর্তনের উদ্দেশ্যে সঠিক কক্ষপথে বসিয়ে ঈশ্বরই গ্রহগুলিকে প্রাথমিক বল (initial impulse) দিয়ে সম্মুখে ঠেলে দিয়েছেন। ঈশ্বর সব সৃষ্টি করেছেন, মানুষ প্রকৃতির আকস্মিক সৃষ্টি—তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু নিউটনের এই সব ধারণাকে আমরা কতদিন স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করব ?

(5) লিথিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, রুবিডিয়াম, সীজিয়াম—ইত্যাদি কয়েকটি ধাতু বা ধাতুর অক্সাইডের উপর আলো পড়লে, সেই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। 1872 খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ষ্টোলাটভ (Stolatov) বায়ুশূন্য কাচ-নলে ধাতুর প্লেটের উপর পারদের বাতি থেকে আলো ফেলে বৈদ্যুতিক প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। হার্টজ্, লেনার্ড, হলবাখ্স প্রমুখের পরীক্ষায় এর সত্যতা প্রমাণিত হল। নির্গত ইলেকট্রনের বেগ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু আলোর তীব্রতার উপর ইলেকট্রনের নির্গমন সংখ্যা নির্ভর করে এবং ইলেকট্রনের বেগ নির্ভর করে আলোর রঙের উপর। যেমন, সবুজ আলো ফেললে ইলেকট্রন যে বেগে নির্গত হবে, বেগুনী আলো ফেললে ইলেকট্রনের বেগ বৃদ্ধি পাবে। এর কারণ কি ?

(6) 1827 খৃষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন নামে একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী জলের ভিতর রাখা কিছু পরাগরেণুর গবেষণায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন, রেণুগুলি একজাতীয় বিশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম গতিতে নড়াচড়া করছে। রেণুগুলি যত ক্ষুদ্র হবে, নড়াচড়াও তত বেড়ে যাবে, এমন কি এই গতি অনন্তকাল পর্যন্তও চলতে পারে। এই বিচলনকেই 'ব্রাউনীয় বিচলন' বলে। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ রহস্য কি ?

(7) বিকিরণ কি ? ক্যালরিক মতবাদ, নিউটনের কণিকা তত্ত্ব (corpuscular theory), হায়গেন্সের তরঙ্গবাদ, ম্যাক্স প্লাঙ্কের কণাবাদ, স্টেফানের সূত্র, ভীনের সূত্র, র‍্যালে-জীন্স্ সূত্র—এগুলি কি বিকিরণ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছে ? ফোটন বস্তুদেহে শোষিত হবার পর সবটাই কি বিকিরিত হয় ? স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিকিরণ সম্ভব কি ? পরমাণুর বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শক্তি মাত্রার জন্যে বিকিরিত আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের নিয়ম কিভাবে জানা যাবে ?

(8) জগতের বিভিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে কি একসূত্রে গ্রথিত করা সম্ভব ? যেমন, বিশ্বের দুটি বস্তু (ধরা যাক সূর্য ও পৃথিবী) যে নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ, পরমাণুর কেন্দ্রীনে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউটন কি সেই নিয়মের বশীভূত ? চুম্বকের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রতত্ত্ব—দুটিকে কি একসূত্রে ব্যাখ্যা সম্ভব ? শক্তিকে ক্ষেত্রের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে ; তাহলে কি বস্তুকে ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ?

অন্তত এটুকু বলা যায় জগতে কোন একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে এতগুলি মৌল প্রশ্নের সুস্পষ্ট গাণিতিক ব্যাখ্যা দেওয়া এর আগে সম্ভব হয় নি। একারণে শুধু এই শতাব্দীর একজন হিসাবে নন, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যে সব মনীষীর দানকে এক বিশেষ পর্যায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয় অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁদেরই অন্যতম।

এমন বিনয়ী, সহজ অনাড়ম্বর আচরণে

অভ্যস্ত, আত্মভোলা, শান্তিবাদী, যুদ্ধবিরোধী পরোপকারী আবার বেহলা বাদক, কিছুটা আড্ডাবাজ-বন্ধুবৎসল ; স্কুল-কলেজের নিয়মমাফিক পড়াশুনায় অপারঙ্গম, অসাধারণ শিক্ষক, দুর্বোধ্য জটিলতম তত্ত্বের সহজতর ভাষ্যকার—এতগুলি গুণের সম্যক প্রকাশ হয়েছিল এই একটি ব্যক্তিত্বের 77 বছর বিচরণসীমার মধ্যে। সঙ্গীত ভালবাসেন, স্পিনোজার দর্শনে বিশ্বাসী ; গ্যেটে, শীলার, রবীন্দ্রনাথ শুরু করে সাহিত্যের মূল রসটুকু যিনি নিংড়ে নিংড়ে গ্রহণ করেছেন. গান্ধীকে যিনি মনে করেন যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির সংগ্রামী দূত ; জার্মানীকে মনে-প্রাণে ভালবেসেও যিনি বিশ্ব নাগরিক ও বিশ্ব মানবপ্রেমে উত্তরণ করতে পারেন ; কোন কাজকে তুচ্ছ মনে না করে যিনি অকপটে বলতে পারেন জুতা তৈরির কাজ কিংবা বাতি-ঘরে (light house)-র চাকরী যাঁর কাছে পরম আদরের, বাস্তব জগতে থেকেও যিনি বিমূর্ত জগতের সব কিছুকে ধ্যানের নেত্রে উপলব্ধি করতে পারেন, চেতনা-নিরপেক্ষ বিশ্বের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এই মানুষটিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এক কঠিন-তম কাজ। তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পূর্ণ মীমাংসা আজও হয় নি। আশা করা যায় একদিন তা সুসম্পূর্ণ হবে। হয়ত বা আইনষ্টাইনের বিশ্ব-ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধনও একদিন ঘটবে। কিন্তু এই মানুষটি পৃথিবীর অন্তরে চিরদিন বিনম্র শ্রদ্ধার আসনে বিরাজ করবেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ গুস্তাভ বাকি বলেছেন, 'মানুষটির কোন্‌টি মহত্তর —তাঁর মস্তিষ্ক, যা দিয়ে বিশ্বের গঠন আবিষ্কার করেছেন, না তাঁর অন্তর যা মানুষের দুঃখে বিগলিত হয় ও প্রতিটি সামাজিক অবিচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে'।

পদার্থ-বিজ্ঞানকে আইনষ্টাইন কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন ? এ বিষয়ে তাঁর ছাত্র Loopold Infeld-এর লেখা 'Quest' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, "আইনষ্টাইন আমাকে অনেকবার বলেছেন যে, তাঁর দৈনিক আহারের খরচ যোগাবার জন্যে নিজের হাতে জুতা তৈরি করার মত কোন কায়িক পরিশ্রম এবং পদার্থবিদ্যার গবেষণার কাজকে তাঁর অন্তরের সখের জিনিস হিসাবে গ্রহণ করাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন। পদার্থবিদ্যা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার গবেষণার দ্বারা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্বাহ ঠিক নয় ; পদার্থবিদ্যাকে সংসারযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে জীবিকার্জনের জন্যে বাতিঘরে কাজ করা কিংবা জুতা তৈরি করা—এইরূপ ধরণের কাজ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। স্পিনোজা জীবিকানির্বাহের জন্যে একটি জহুরীর দোকানে হীরে ঘষার কাজ করতেন।"

উপরিউক্ত মন্তব্যের পিছনে একটা বিশেষ ঘটনা আছে। 1933-এ আইনষ্টাইন যখন পাকাপাকি ভাবে আমেরিকায় এসে প্রিন্সটনের বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণায় যোগ দিলেন, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল আপনাকে কোন ক্লাস বা সেমিনারে না গেলেও চলবে। শুধু গবেষণার জন্যে এই চাকরী, আইনষ্টাইন এই প্রস্তাবে বেশ অসন্তুষ্ট হন। তার কারণ উপরের মন্তব্যটি থেকে বোঝা যাবে। একবার এক পত্রিকার দপ্তরের লোক এসে আইনষ্টাইনকে বললেন, আপনি আপেক্ষিকতাবাদের উপর একটি প্রবন্ধ লিখে দিন। এর জন্যে আপনাকে সম্মান-অর্থ দেওয়া হবে। আইনষ্টাইন ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'লেখাটা আমার পেশা নয়। আর অর্থ-প্রাপ্তির জন্যে কিছু লেখাকে আমি ঘৃণা করি।' অথচ, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র Infeld-এর আর্থিক দুরবস্থা মোচনে পরামর্শ দিলেন, তোমার 'Evolution of Physics'—বইটিতে আমার নামটি জুড়ে দিও। তাহলে বই বিক্রী বাড়বে ; আর প্রিন্সটনে তোমার থাকার খরচও মিটবে। এই বইটি লেখায় আইনষ্টাইন তাকে নানাভাবে সাহায্য করছিলেন। বহু ছাত্রকে বিনা দ্বিধায় প্রশংসাপত্র লিখে দিতেন। কোন চিত্রকর এসে যদি বলত, যে আপনার একটা ছবি আঁকতে চাই। তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা

করতেন, যে এতে তার আর্থিক কোন সুবিধা ঘটবে কি না, যদি 'হাঁ বলত, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হতেন। হাসপাতালের অসুস্থ রোগীদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে তিনি সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে বেহালা বাজিয়ে আসতেন।

সুইজারল্যাণ্ড, বার্ন-এর পেটেন্টে অফিসের অজ্ঞাত-নামা কর্মচারীটি বিশ্ববাসীর কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনটি বৈজ্ঞানিক, প্রবন্ধের মাধ্যমে যে আলোড়ন তুলেছিল, তা আজও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সময়টা 1905। প্রথম প্রবন্ধটি ছিল, 'ফটো-ইলেকট্রিক তত্ত্বের গাণিতিক মীমাংসা,' দ্বিতীয়টি ছিল, ব্রাউনীয় বিচলন গতির ব্যাখ্যা এবং শেষেরটি ছিল তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের সবচেয়ে যুগান্তকারী ধারণা আপেক্ষিকতাবাদের আলোচনার (On the Electrodynamics of moving bodies) সূত্রপাত ঘটানো। এই প্রবন্ধটিতে নিউটনের ধারণার আমূল সংশোধন ঘটল এবং আলোর প্রকৃতি ও বেগ, মহাকাশ-সময় সম্পর্ক, বস্তু-শক্তির সম্পর্ক, চারমাত্রার বিশ্বের রূপ, ঈথারের গুণ, সময়ের ধারণা ও বেগের সঙ্গে সম্পর্ক, স্থির-অক্ষ বলে কিছু আছে কিনা—প্রভৃতি নানাবিধ মৌল প্রশ্নের জটিল গাণিতিক মীমাংসা ছিল এবং 1916 সালে তিনি এই তত্ত্বের আরও সার্বজনীন—বিশ্ব নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে মহাকর্ষ 'বল'-কে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ধারণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। এখানে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল, যেটি প্রথমে অনেক বিজ্ঞানীদের কাছেও অবাস্তব মনে হয়েছিল। আলো বিশেষ অতিকায় ভরসম্পন্ন কোন পদার্থ খণ্ডের (যেমন, সূর্য) পাশ দিয়ে গেলে বেঁকে যাবে। অর্থাৎ আলো এক ধরণের কণিকা (ফোটন) যার ভর প্রায় শূন্য বলে ধরা হয়।

এই তত্ত্বে আইনষ্টাইন নির্দ্বিধায় অথচ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "বস্তুর অস্তিত্ব মহাকাশে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। মহাকাশে কোন বস্তু না থাকলে মহাকাশ হত অর্থহীন। অনন্ত মহাশূন্য। কিন্তু প্রতিটি বস্তুর অবস্থিতির জন্যে চারপাশের মহাকাশ নুইয়ে পড়ে এবং তাতে বিকৃতি জন্মে বলে সৃষ্টি হয় একটি ক্ষেত্র। এজন্যে মহাকাশ একটি বস্তু গুণসম্পন্ন মাধ্যম এবং একেই আমি বলেছি ঈথার। এই ঈথারের সনাতন বিজ্ঞানের গুণাবলী নেই।" অর্থাৎ মহাকাশ অসীম নয়; সসীম। এর নির্দিষ্ট সীমা আছে। যদিও তার পরিমাপ কল্পনার রাজ্যেও এক অতি-অবাস্তব বিরাট বলে মনে হয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে—ভর ও শক্তির তুল্যতার (equivalence of mass & energy) ধারণা প্রকাশ এক পরম বিস্ময়কর হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বস্তু হল ঘনীভূত শক্তি। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। সম্পর্কটা $E=mc^2$, যেখানে, E = শক্তি, m = ভর, c = আলোর বেগ। এই শক্তির মান যে কি বিপুল, তা নিম্নের উদাহরণটি থেকে বোঝা যাবে—এক গ্রাম বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তর করলে 20 লক্ষ কোটি ক্যালরি তাপ পাওয়া যেতে পারে। যা দিয়ে মাসে 50 কি. ও. আওয়ার (ইউনিট) পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় এমন 40 হাজার বাড়িতে এক বছরের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ পাঠানো যাবে। পরমাণু বিভাজনের দ্বারা পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে এইভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, এমনকি 'বোমা' তৈরি হিসাবেও তা কাজে লাগানো যাবে।

(ক্রমশ)

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ।
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক চাঁদা 18.00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক চাঁদা 9.00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় 'বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতিমাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19.00 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'ডাক যোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.

2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**

3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ-বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞপ্তি

আলোচনা-সভা

বিষয় : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সমস্যা ও সমাধান

স্থান : সত্যেন্দ্র ভবন [পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

তারিখ : 28শে অগাস্ট, 1978 সোমবার

সময় : বিকাল সাড়ে পাঁচটা

উদ্বোধক : শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি : শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রধান অতিথি : শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা-সভায় অংশ নেবেন : সর্বশ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার, রমেন মজুমদার, সমরজিৎ কর, অলক সেন, অমিত চক্রবর্তী, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চক্রবর্তী. অরূপরতন ভট্টাচার্য, জয়ন্ত বসু, প্রমুখ

সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

রতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সত্যেন্দ্র ভবন
18, অগাষ্ট 1978

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 8, অগাষ্ট, 1978

প্রধান উপদেষ্টা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কার্যকরী সম্পাদক
শ্রীরতনমোহন খাঁ

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সহায়তায়
পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়





কেশুত্তে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল
নির্যাস পারফিউম
প্রোডাক্টস প্রাঃ লিমিটেড

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ | অগাষ্ট, 1978 | অষ্টম সংখ্যা

উষ্ণতা—তাপমাত্রা নয়

রবীন্দ্রনাথ রায়*

ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা কিছু বই এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আজকাল temperature কথাটির পরিভাষা তাপমাত্রা বলা হচ্ছে; অথচ রাজশেখর বসু প্রণীত অভিধান 'চলন্তিকা' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পরিভাষা বিষয়ক গ্রন্থে temperature-এর সমার্থবোধক শব্দ বলা হয়েছে উষ্ণতা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পঠনরত ছাত্রছাত্রী তাই আজ দ্বিধাগ্রস্ত, temperature-কে কি বলা যুক্তিযুক্ত—তাপমাত্রা না উষ্ণতা?

প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক, তাপমাত্রা শব্দটির অর্থ তাপশক্তির মাত্রা। কোন বস্তুর উপরে তাপ প্রয়োগ করলে, বস্তুটি তাপশক্তি আহরণ করে; তাপ আহৃত হলে বস্তুটির মধ্যে তাপশক্তির মাত্রা বা তাপমাত্রা নিশ্চয়ই বাড়ে। আবার কোন তপ্ত বস্তুকে শীতলতর পরিবেশে রাখলে বস্তুর অন্তর্নিহিত তাপশক্তি কিছুটা বর্জিত হয়, অতএব তখন বস্তুর মধ্যস্থ তাপের মাত্রা হ্রাস পায় অর্থাৎ বস্তুটির তাপমাত্রা কমে। লক্ষ্য করা উচিৎ তাপমাত্রা কথাটি এক্ষেত্রে বস্তুটির মধ্যস্থ মোট তাপশক্তির মাত্রা নির্দেশ করছে, তাপমাত্রা কোন তাপজ অবস্থা বোঝায় না।

কিন্তু একথা সত্য যে বস্তুর মধ্যে তাপশক্তি থাকার জন্যে বিশিষ্ট তাপজ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমরা জানি গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি সবক্ষণ কাঁপে, ঘোরে ও অনবরত ছুটে বেড়ায়; কম্পন ও ঘূর্ণনের শক্তি ও গতিশক্তি গ্যাসীয় অণুকে দিচ্ছে গ্যাসের অন্তর্নিহিত তাপশক্তি। এই তাপশক্তির প্রভাবে তরল পদার্থের অণুগুলিও সর্বদা কম্পমান, ঘূর্ণ্যমান ও চলৎশক্তিসম্পন্ন, যদিও গ্যাসীয় অণুর তুলনায় তরলের অণুর

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা-700 009

গতিশক্তি অনেক কম। কঠিন পদার্থের অণুগুলির চলৎশক্তি নেই, কিন্তু তাপের প্রভাবে কঠিন পদার্থের অণুগুলিও সর্বদা কম্পমান। সর্বপ্রকার অণু যে, সর্বক্ষণ চঞ্চল অবস্থায় থাকে তার একমাত্র কারণ পদার্থের অন্তর্নিহিত তাপশক্তি। অতএব তাপের প্রভাবে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে তাপজ অবস্থা সৃষ্টি হয় তারই ফলে অণুগুলি চঞ্চল অবস্থায় থাকে। এই তাপজ অবস্থার নাম উষ্ণতা বা temperature; তাপমাত্রার সঙ্গে উষ্ণতার বিশেষ পার্থক্য এই যে তাপমাত্রা তাপশক্তির মাত্রা নির্দেশ করে, কিন্তু উষ্ণতা বস্তুর মধ্যে সচঞ্চল অবস্থাকে নির্দেশ করে।

প্রসঙ্গত আলোচনা করা যাক,—চরম শূন্য (absolute zero) উষ্ণতায় বস্তুর মধ্যে তাপজ অবস্থাটা কি? এই সর্বনিম্ন উষ্ণতায় দেখা যায় সকল বস্তুর অণু প্রায় স্থাণু নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছে যায়। বলা যেতে পারে চরম শূন্য উষ্ণতায় যে কোন বস্তুর তাপশক্তির মাত্রা (প্রায়) শূন্য। অতএব যে কোন বস্তুর ভর ও আপেক্ষিক তাপ যাই হোক না কেন চরম শূন্য উষ্ণতায় তার তাপমাত্রা শূন্য। চরম শূন্য উষ্ণতায় বস্তুকণার তাপজ অবস্থা হল, স্থির অচঞ্চল চিরস্থাণু অবস্থায় পরিণতি। এই শীতলতম স্থাণু পরিস্থিতি থেকে বস্তু ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্যময় অবস্থা পায়, যতই বস্তুর মধ্যে তাপশক্তি প্রয়োগ করা যায়। বস্তু যত তাপ আহরণ করে, তার অন্তর্নিহিত অণুগুলি ততই গতিশক্তি অর্জন করে এবং বস্তুর তাপজ অবস্থার পরিবর্তন চলতে থাকে ও উষ্ণতা বাড়ে।

কিন্তু যে কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে যেমন তার অণুগুলির গতিশক্তি বাড়ে, তেমনি তাপমাত্রাও বাড়ে। অতএব উষ্ণতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও বাড়ে কিন্তু বস্তুর অন্তর্নিহিত তাপমাত্রা কখনই তার উষ্ণতাকে নির্দেশ করে না। এই তথ্য নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির আলোচনায় বোঝা যাবে:—

(1) একটি এক কিলোগ্রাম ভরের লোহার বল ও একটি দশ কিলোগ্রাম ভরের লৌহপিণ্ড একই উষ্ণতায় রয়েছে, এই অবস্থায় উভয় বস্তুর উপরে সম-পরিমাণ তাপশক্তি প্রয়োগ করা হল; তখন দেখা যাবে লৌহপিণ্ডের তুলনায় লোহার বলটি দশগুণ বেশি উত্তপ্ত হয়েছে। উভয় বস্তুতে সম-মাত্রায় তাপশক্তি আহৃত হয়েছে, অতএব বস্তু দুটির তাপমাত্রার পার্থক্য কিছুই নেই, (সমান তাপ আহৃত, অতএব তাপমাত্রার পরিবর্তন উভয় ক্ষেত্রে সমান) কিন্তু বস্তু দুটির তাপজ অবস্থায় বিশেষ পার্থক্য দেখা দিল,—বলটির তাপজ অবস্থার পরিবর্তন লৌহপিণ্ডের তাপজ অবস্থার পরিবর্তনের তুলনায় দশগুণ বেশি; লোহার বলটি লৌহপিণ্ডের তুলনায় দশগুণ উষ্ণতর হয়ে পড়েছে।

(2) আমরা জানি O°C উষ্ণতার একগ্রাম বরফের উপরে আশি ক্যালরি তাপশক্তি প্রয়োগ করলে O°C উষ্ণতার একগ্রাম জল পাওয়া যায়। অতএব একই তাপজ অবস্থায় (O°C উষ্ণতা) রক্ষিত এক গ্রাম বরফ ও এক গ্রাম জলের তাপমাত্রার মধ্যে আশি ক্যালরি তাপশক্তির পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আশি ক্যালরি তাপশক্তি বস্তুটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে—(কঠিন) বরফ তরল) জলে পরিণত হচ্ছে। তাপ প্রয়োগে বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হল কিন্তু তাপজ অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না; বরফ বা জলের তাপজ অবস্থার অভিব্যক্তি, তার temperature বা উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হল না। সুতরাং প্রমাণ হল, প্রকৃতিতে এমন বহু পরিস্থিতি আছে যখন তাপমাত্রার পরিবর্তন হলেও উষ্ণতার পরিবর্তন হয় না।

(3) এ ছাড়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত তাপশক্তির আদান-প্রদান কখনই তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না। তপ্ত বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুতে তাপশক্তি সঞ্চালিত হয়, একথা আমরা জানি; কিন্তু তপ্ত বস্তুটির মোট তাপশক্তির মাত্রা শীতলতর বস্তুর তাপ (শক্তির) মাত্রার

তুলনায় কম হলেও তাপের সঞ্চালন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ একই পদার্থ (যেমন তামা) দ্বারা গঠিত দুটি বস্তুখণ্ড A ও B নেওয়া হল; ধরা যাক A-র ভর 10 গ্রাম ও B খণ্ডটির ভর এক কিলোগ্রাম। A তাম্রখণ্ডটি যদি 100°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা যায় এবং B খণ্ডটিকে 30°C উষ্ণতায় রাখা যায় তাহলে এই অবস্থায় হিসাব করে দেখানো যায় A তাম্রখণ্ডে মোট তাপমাত্রার পরিমাণ B তাম্রখণ্ডের তাপমাত্রার তুলনায় কম। কিন্তু A ও B তাম্রখণ্ড দুটিকে স্পর্শ করালে (বা তাপ সঞ্চালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলে) 100°C উষ্ণতার তাম্রখণ্ড A থেকে তাপশক্তি 30°C উষ্ণতায় রক্ষিত B তাম্রখণ্ডে সঞ্চারিত হয়। উষ্ণতা হচ্ছে তাপজ অবস্থার লেভেল (level) স্বরূপ। তাপের আদান-প্রদান নির্ভর করে উষ্ণতার পার্থক্যের উপরে; তাপের লেন-দেন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী বস্তুদুটির নিজস্ব তাপমাত্রার উপরে তাপশক্তির আদান-প্রদান নির্ভর করে না। উষ্ণতর বস্তুর মধ্যে মোট তাপমাত্রা কম হলেও নিম্নতর উষ্ণতায় রক্ষিত (উচ্চতর তাপমাত্রাবিশিষ্ট হলেও) বস্তুর মধ্যে তাপশক্তি সঞ্চালিত হয়। উচ্চতর লেভেলে রক্ষিত ছোট জলপাত্রে জলের মাত্রা কম থাকলেও নিম্নতর লেভেলে অবস্থিত চৌবাচ্চায় (জলের মাত্রা বেশি হলেও) যেমন জল উচ্চতর থেকে নিম্নতর লেভেলে প্রবাহিত হয়, ঠিক একইভাবে উচ্চতর উষ্ণতা থেকে নিম্নতর উষ্ণতায় তাপশক্তি সঞ্চালিত হয়। উষ্ণতর বা শীতলতর বস্তুর তাপমাত্রার উপর তাপশক্তির সঞ্চালন কখনই নির্ভর করে না।

তাপমাত্রাকে উষ্ণতা বললে বিভ্রাট কতদূর শোচনীয় হতে পারে তার প্রমাণ মেলে বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে তাপশক্তি উৎপাদন বিষয়ে জুলের সূত্র উল্লেখে, যেমন—

কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে উদ্ভূত তাপমাত্রা (i) প্রবাহমাত্রার বর্গের সমানুপাতিক হয় যদি রোধ ও সময় অপরিবর্তিত থাকে, (ii) রোধের সমানুপাতিক হয়, যদি প্রবাহমাত্রা ও সময় অপরিবর্তিত থাকে, (iii) সময়ের সমানুপাতিক হয়, যদি প্রবাহমাত্রা ও রোধ অপরিবর্তিত থাকে।

এই সূত্র উল্লেখে যদি উদ্ভূত তাপমাত্রাকে উষ্ণতা বলে ধরা হয়, তখন সূত্রটি সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে পরিগণিত হয়। অতএব তাপের মাত্রাকে তাপমাত্রা বলাই যুক্তিসঙ্গত, তাপজ অবস্থা নির্দেশ করার জন্যে উষ্ণতা শব্দটির ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত।

জীবের ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

সুদীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের নানারূপ গবেষণার ফলে জীবের ক্রমবিকাশের চিত্রটি এখন অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

(1) অ্যাজোইক বা অজীবীয় যুগ (Azoic Era)

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সবচেয়ে প্রাচীন ভূস্তর গঠিত হয়েছে প্রায় 400 কোটি বছর আগে। এই স্তরে জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। মনে হয়, তখন কোন জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না। বিজ্ঞানীরা তাই এর নাম দিয়েছেন অ্যাজোইক বা অজীবীয় যুগ (*Azoic* = without life)।

(2) প্রোটোজোইক বা প্রথম জীবীয় যুগ (Protozoic Era)

এই যুগের চিহ্ন হিসেবে কিছু সরলতম জলজ উদ্ভিদ এবং সরলতম মেরুদণ্ডহীন সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীর কল্পিত ইতিহাসের পাতায় এই হল প্রথম জীবের কাহিনী। তাই বিজ্ঞানীরা এযুগের নাম দিয়েছেন প্রোটোজোইক বা প্রথম জীবীয় যুগ (*Proto* — first, *Zoe* = life)।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 50 কোটি বছরের আগেকার স্তর থেকে জীবাশ্মের নিদর্শন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি, অথচ সে তুলনায় অনেক বেশি জীবাশ্ম পাওয়া গেছে অপেক্ষাকৃত নবীন স্তরগুলি থেকে। এর সবচেয়ে বড় কারণ বোধ করি এই যে, তখন জীবের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। আর একটি কারণ বোধ করি এই যে, সৃষ্টির প্রথম দিকে যেসব জীব আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের দেহ পচে গলে নষ্ট হয়ে গেছে, জীবাশ্মে পরিণত হতে পারে নি। এজন্যে অতীতের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের বারবার শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ থেকে প্রায় দু-শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিম জীবের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল জলে। তার দেহে ছিল একটি মাত্র কোষ (cell), আর তার মধ্যে ছিল খানিকটা চটচটে প্রাণপদার্থ, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm) বা জীবপঙ্ক। বর্তমানে পুকুর ও ডোবায় অনেক অ্যামিবা (amoeba) দেখা যায়। প্রয়োজন অনুসারে একটি অ্যামিবা ভেঙে দুটি অ্যামিবায় পরিণত হয়, আর তাতেই তাদের বংশবিস্তার হয়। মনে হয়, অতীতের এককোষী জীবগুলি অনেকাংশে এদের মতই ছিল। এই জীব একটিমাত্র কোষের সাহায্যেই খাওয়া, চলাফেরা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করত। কিন্তু এতে কোন কাজই সুনিয়ন্ত্রিত হত না। প্রত্যেক জীবেরই খাদ্য দরকার। এক জায়গায় চুপ করে থাকলে সেখানকার খাদ্য তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে, তাই এগিয়ে চলার এবং খাদ্য সংগ্রহ করার সুবিধার জন্যে আদিম জীবের দেহে নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হল, আর সেজন্যে জীবদেহে কোষের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে লাগল। এইভাবে সৃষ্টি হল প্রোটোজোয়া, শেওলা প্রভৃতি সরল জলজ জীব। জীবন-সংগ্রামে জয়ী

*রসায়ন বিভাগ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-700 004

হওয়ার জন্যে তাদের নানা উপায় উদ্ভাবন করতে হল। ক্রমে একটি জীব অন্য আর একটি জীবকে আক্রমণ করে উদরসাৎ করতে শিখল, আর আক্রান্ত জীবও শিখল যাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করে পালিয়ে বাঁচতে পারে। এইভাবে জীবদেহের জটিলতা ক্রমশ আরও বাড়তে লাগল।

তবে তখন জীবন সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সমুদ্রেই, ডাঙায় ছিল না কোন প্রাণী, ছিল না কোন উদ্ভিদ, একটি সবুজ তৃণও ছিল না কোনখানে। চারিদিকে বিরাজ করত শ্মশানের নিস্তব্ধতা। এই যুগ মোটামুটি প্রায় 150 কোটি বছর ধরে চলেছিল।

(3) প্যালিওজোইক বা পুরাজীবীয় যুগ (Palaeozoic Era)

তারপর এলো প্যালিওজোইক বা পুরাজীবীয় যুগ। এর স্থায়িত্বকাল প্রায় 30 কোটি বছর। পৃথিবীর ইতিহাসের এই পৃষ্ঠাটি অনেক বেশি চমকপ্রদ। কারণ, এই যুগের নানাপ্রকার জীবাশ্মের নমুনা পাওয়া গেছে প্রাচীন শিলাস্তরে। এই যুগকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—ক্যাম্ব্রিয়ান (cambrıau), অর্ডোভিসিয়ান (ordovician), সিলুরিয়ান (silurian), দেভোনিয়ান (devonian), কার্বনিফেরাস (carboniferous) এবং পারমিয়ান (permian)।

ক্যাম্ব্রিয়ান ও অর্ডোভিসিয়ান পর্যায়

ক্যাম্ব্রিয়ান ও অর্ডোভিসিয়ান পর্যায়ে স্তূপ স্তরগুলিতে (cambrian and ordovician systems) ডাঙার কোন জীবের সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেক রকম জলজ জীবের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন—নানারকম শেওলা, স্পঞ্জ ইত্যাদি, জেলিফিস, তারামাছ, ক্রুস্টেসিয়ান বা কবচী (যেমন—শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি) এবং নানারকম কীট। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাণী হল ট্রাইলোবাইট (trilobite)। একরকম পোকা আছে কাঠ কুরে কুরে খায়, ট্রাইলোবাইটের আকৃতি ছিল অনেকটা সেইরকম। এদের দৈর্ঘ্য ছিল 3 থেকে 70 সেন্টিমিটার পর্যন্ত। এছাড়া ঝিনুক, শামুক এবং একরকম ক্রুস্টেসিয়ান বা বিছেকাঁকড়া, যার নাম ইউরিপ্‌টেরিড, প্রভৃতি ছিল। আর ছিল অক্টোপাসের পূর্বপুরুষ নটিলয়েড। দেভোনিয়ান পর্যায়ে এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল অ্যামোনাইট (ammonite), আর বহু যুগ ধরে তারাই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কম্বোজ (molusc)।

মানুষের বিবর্তনের দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এই পর্যায়ে। তা হল, প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব। মেরুদণ্ডী প্রাণীর সবচেয়ে প্রাচীন জীবাশ্মের নমুনা পাওয়া গেছে অর্ডোভিসিয়ান স্তরে, আর তা হল একপ্রকার চোয়ালহীন মৎস্য। এদের প্রতিনিধি হিসেবে ল্যাম্প্রে, হ্যাগ্‌ফিস প্রভৃতি এখনও এই পৃথিবীতে বিরাজ করছে।

সিলুরিয়ান ও দেভোনিয়ান পর্যায়

সিলুরিয়ান পর্যায়ে (silurian period) জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর খুব বেশি পরিবর্তন হল না। কিন্তু এই সময়েই জীব প্রথম জল ছেড়ে ডাঙার দিকে এগিয়ে চললো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সমুদ্রের শেওলাই হয়তো সর্বপ্রথম ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল। তাদের দেহের চারিদিকে একটি শক্ত আবরণ তৈরি হয়, তাই তারা অল্প সময়ের জন্যে দেহের মধ্যে খানিকটা জল সঞ্চয় করে রাখতে পারত। ঢেউয়ের আঘাতে সাময়িকভাবে শুকনো ডাঙায় পড়লেও এরা সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে যেত না, পুনরায় সমুদ্রে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনপ্রকারে বেঁচে থাকতে পারত। জোয়ারের সময় তাদের বিপদ কেটে যেত, কারণ তখন তারা জলে ফিরে যেত এবং তাদের জলের ভাণ্ডার আবার পূর্ণ করে নেবার সুযোগ পেত। সেই থেকে সৃষ্টির ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হল।

এই সব উদ্ভিদ জল ছেড়ে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হল। কিন্তু তখনও এরা জল ছেড়ে

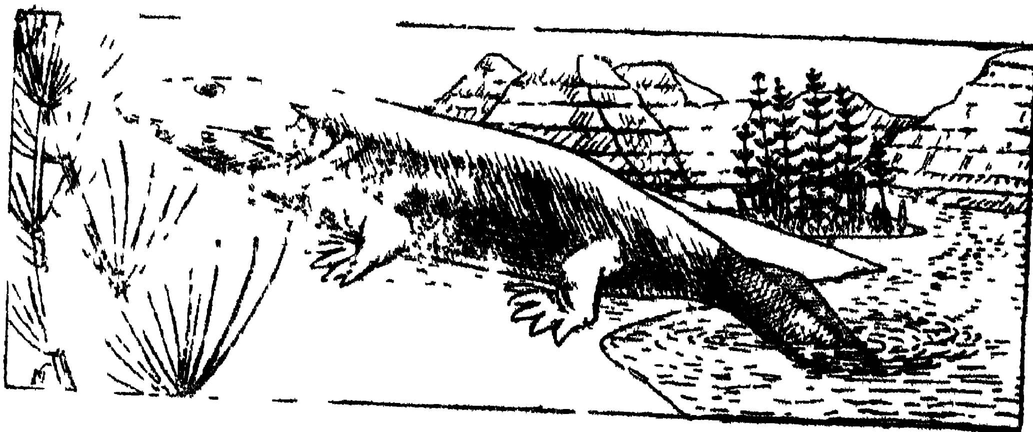
বেশিক্ষণ থাকতে পারত না, তাই এদের আস্তানা হল জলাজায়গারই আশেপাশে। ডাঙার উদ্ভিদও ক্রমে মাটির নিচে শিকড় চালিয়ে রস সংগ্রহ করতে শিখল, সবুজ পাতার সাহায্যে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলের উপাদান দিয়ে খাদ্য তৈরি করতে শুরু করল। এইভাবে তারা ক্রমশ ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়ে উঠল। স্থলজ উদ্ভিদের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া গেছে কতকগুলি সিলপ্‌সিড (psilopsid)-এর নমুনা।

উদ্ভিদ এতকাল সমুদ্রের তলায় গভীর তমসায় জীবনযাপন করছিল। ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হওয়ার পরে সূর্যরশ্মির অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করে তারা যেন মুগ্ধ হয়ে গেল। এই সময় পৃথিবীর কুয়াশার ক্ষীণ আবরণটুকুও একেবারে সরে গেল, পৃথিবীর উপর সূর্যরশ্মি পড়তে লাগল অজস্র ধারায়। আর মহামূল্য সূর্যরশ্মি পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে উদ্ভিদও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল।

এসময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হল লাইকোপ্‌সিড, স্ফেনপ্‌সিড এবং টেরপ্‌সিড। প্রথম দুটি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র দুটি প্রতিনিধি আজও কোনপ্রকারে টিকে রয়েছে। তাদের নাম—ক্লাব-মস (club-moss) এবং হর্স-টেইল (horse tail)। টেরপ্‌সিডের প্রথম প্রতিনিধি হল ফার্ন। সে সময়কার ফার্ন গাছ ক্রমে বৃক্ষের আকার ধারণ করল, কোন-কোনটির উচ্চতা হল প্রায় 100 ফুট। পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ আবরণ ক্রমশ ঘন হতে লাগল।

উদ্ভিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নানাবিধ প্রাণীও ক্রমে ডাঙার দিকে এগিয়ে চললো। এই সময়কার শিলাস্তরে যেসব স্থলচর প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একপ্রকার কাঁকড়াবিছে। কিছু কিছু পোকামাকড়ের নমুনাও অবশ্য এই স্তরে পাওয়া গেছে।

দেভোনিয়ান পর্যায় (devonian period)-কে অনেক সময় মৎস্য-যুগ বলা হয়। কারণ সিলুরিয়ান পর্যায়ে চোয়ালহীন মৎস্য থেকেই প্রথম চোয়াল-যুক্ত মৎস্যের উদ্ভব হয়, তাদের বলা হয় প্ল্যাকোডার্ম। আর দেভোনিয়ান পর্যায়ে তা থেকেই আবির্ভূত হয় নানারকম মৎস্য। এই সময় দেখা দেয় হাঙর, যার দেহের কাঠামো হাড়ের বদলে তরুণাস্থি (cartilage) দিয়ে গড়া। আর দেখা দেয় সত্যিকারের মাছ, যার দেহ হাড়ের কাঠামো দিয়ে গড়া। তা থেকে এক দিকে দেখা দিল লাঙ-ফিস (lung-fish), অন্য দিকে দেখা দিল লোব্‌-ফিন মৎস্য (lobe-finned fish)। লোব্‌-ফিন নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এর দেহে পাখ্‌নার বদলে ছিল



চিত্র 1—প্রথম উভচর প্রাণী ইকথাইওস্টেগা।

পায়ের মত মাংসল প্রত্যঙ্গ, যাদের উপর ভর করে এই প্রাণীটি ডাঙার দিকে এগিয়ে যেতে পারত। তাই এরা যেসব জলাজায়গায় বাস করত, দৈবাৎ তা শুকিয়ে গেলেও এরা মরতো না। ডাঙার উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অন্য জলাশয়ে পৌছতো এবং তাতে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত। ক্রমে তারা চতুষ্পদ হয়ে উঠল। তাদের দেহে ফুসফুস হল এবং তারা পুরোপুরিভাবে ডাঙার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল। এইভাবে সৃষ্টি হল উভচর প্রাণী। এদের দেহের রক্ত শীতল ছিল, এরা বাঁচতো আর্দ্র এবং উষ্ণ আবহাওয়ায়। ডাঙায় থাকলেও এরা ডিম পাড়তো জলে। দেভোনিয়ান পর্যায়ের এই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

উভচর প্রাণীর সবচেয়ে প্রাচীন যে নমুনাটির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে ইক্‌থাইওস্টেগা। বাস্তবিক এটিই সর্বপ্রথম জল থেকে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল। সমকালীন উভচর প্রাণীর মত এরও চারটি পা ছিল, কিন্তু এর গায়ে মাছের মত আঁশ ছিল, আর লেজের উপরে ছিল পাখ্‌না (Fin)।

কার্বনিফেরাস ও পারমিয়ান পর্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি নতুন পাতা খুললো। এই সময় উদ্ভিদের সাড়ম্বর অভিযান শুরু হল। ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত জলাজায়গাই অসংখ্য অবীজ উদ্ভিদে (যেমন—মস্, ফার্ন প্রভৃতিতে) ছেয়ে গেল। এর ফলে স্থানে স্থানে এক-একটি মহারণ্যের সৃষ্টি হল।

তখন পৃথিবীর নানাদিকে আলোড়ন, ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। তাতে হয়তো জায়গায় জায়গায় এক-একটি বিরাট বন, গাছপালা খাল-বিল সব সমেত মাটির নিচে তলিয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে তার উপর বালি, পলিমাটি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জমা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমে সেসব উদ্ভিদের চেহারা বদলে গিয়ে শেষ অবধি কয়লায় পরিণত হয়েছে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে কার্বনিফেরাস পর্যায় (carboniferous period)।

সেই সময় উদ্ভিদ-জগৎ ক্রমশ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে সবীজ উদ্ভিদের আবির্ভাব হল। ঐসব উদ্ভিদ এখন প্রায় সবই লোপ পেয়েছে। এখন যেসব কোনিফার দেখা যায়, তাদেরই শুধু ওই জাতীয় উদ্ভিদের প্রতিনিধি বলে মনে করা যায়।

এই যুগে জলাভূমির নিবিড় অরণ্যে কোন ফুল বা পাখি দেখা যেত না, বড় রকমের ডাঙার কোন প্রাণীও তখন ছিল না। জলার ধারে ডাঙায় তখন শামুক, কাঁকড়াবিছে, নানা রকম পোকা-মাকড়, জল-ফড়িং প্রভৃতি ইতস্তত বিচরণ করত।

পারমিয়ান পর্যায়ে (permian period) এই কীট-পতঙ্গের আকার ক্রমশ আরও বড় হয়ে উঠল। এই সময় বিরাটাকার এক রকম জল-ফড়িং (dragonfly)-এর আবির্ভাব হয়। এদের দু'পাখ্‌না প্রসারিত করলে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মাপ ছিল প্রায় এক গজ। কাঁকড়াবিছে এবং উভচর প্রাণীর সংখ্যাও তখন খুব বেড়ে গিয়েছিল।

এই সময় আর এক প্রকার নতুন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের বলা হয় সরীসৃপ। এই পর্যায়ের যে সরীসৃপের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে কোটিলোসর। উভচর প্রাণীদের মত এরাও ছিল চতুষ্পদ এবং অনুষ্ণ-শোণিত, অর্থাৎ এদের দেহের রক্ত শীতল ছিল এবং এরা বাঁচতো শুধু উষ্ণ আবহাওয়ায়। এরা ডিম পাড়তো ডাঙায়, কাজেই এরাই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সরীসৃপের আবির্ভাবই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কারণ, পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই হল প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী যুগে বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীর আধিপত্য ছিল এদেরই হাতে।

যুগ শেষ হয়ে গেল। সংক্ষেপে বলা যায়, এই যুগ হল অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের আধিপত্যের কাল এবং যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রথম ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল তাদের আবির্ভাবের কাল।



2—বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম সরীসৃপ (Seymouria)

এর পরেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় হঠাৎ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়, তার ফলে জীবজগতেও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরাতন অনেক জীবই একেবারে লোপ পেয়ে গেল, তাদের স্থান অধিকার করল নতুন ধরনের সব জীব। সমুদ্র থেকে ট্রাইলোবাইট বিলুপ্ত হয়ে গেল, নতুন ধরনের সব কম্বোজ, ক্রুস্টেসিয়ান বা কবচী (যেমন—চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি), মাছ প্রভৃতির আবির্ভাব হল। ডাঙায় ফার্নের অরণ্যের স্থান অধিকার করল কোনিফারের অরণ্য। কোটিলোসরের পূর্বপুরুষ লেবিরিন্থোডোণ্টস লুপ্ত হয়ে গেল। উভচর প্রাণীদের মধ্যে টিকে রইলো বর্তমান কালের মত স্যালামাণ্ডার, সোনা-ব্যাঙ, কুনো-ব্যাঙ প্রভৃতি কয়েক রকম প্রাণীর পূর্বপুরুষ।

পারমিয়ান পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যালিওজোইক এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তখন উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ অধিকার করে ফেলেছিল।

(4) মেসোজোইক বা মধ্যজীবীয় যুগ (Mesozoic Era)

এর পর যে যুগের সূচনা হল তার নাম মেসোজোইক বা মধ্যজীবীয় যুগ। এই যুগকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—ট্রায়াসিক (triassic), জুরাসিক (jurassic) এবং ক্রিটেসাস (cretaceous)।

এই যুগ হচ্ছে সরীসৃপদের আধিপত্যের কাল। তবে এই সময় জীবজগতে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, যেমন—ট্রায়াসিক পর্যায়ের শেষ দিকে, অথবা জুরাসিক পর্যায়ের প্রথম দিকে, প্রথম

সপুষ্পক উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। এই সময় কীট-পতঙ্গের বৈচিত্র্য আরও অনেক বেড়ে যায়। ক্রিটেসাস পর্যায়ে যেসব মৎস্যের উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলি সমকালীন মৎস্যের মতই। আর তখনই আবির্ভাব হয়েছিল উষ্ণ শোণিত প্রাণীদের অর্থাৎ পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের। এক কথায় বলা যায় যে, এই যুগেই সমুদ্র এবং স্থলভাগের অবস্থা সব দিক দিয়ে এখনকার মত হয়ে উঠেছিল।

পারমিয়ান পর্যায়ের সরীসৃপ কোটিলোসর থেকে মোটামুটি পাঁচটি ধারায় বিভিন্ন রকম প্রাণীর উদ্ভব হয়। প্রথম ধারায় দেখা দেয় থেকোডোণ্ট, এ থেকেই উদ্ভব হয়েছে সরিসিয়া এবং অর্নিথিসিয়া পাওয়া যায় হাঙরের মত ইকথাইওসর। চতুর্থ ধারায় পাওয়া যায় দীর্ঘগ্রীব প্লেজিওসর, আর পঞ্চম ধারায় পাওয়া যায় থেরাপ্‌সিড। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, থেরাপ্‌সিড থেকেই প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল, ট্রায়াসিক পর্যায়ের শেষ দিকে, অথবা জুরাসিক পর্যায়ের প্রথম দিকে।

অতীতের অতিকায় ডাইনোসরদের (*dino-saur*=terrible lizard) কথা ভাবলেও ভয় হয়। সবার আগে নাম করতে হয় ব্রণ্টোসরাস, ডিপ্লোডোকাস, অ্যাটলাণ্টোসরাস, এডমণ্টোসরাস প্রভৃতি প্রাণীর। এদের মধ্যে আবার ডিপ্লোডোকাসের ঘাড় আর লেজ ছিল সবচেয়ে লম্বা, তবে ব্রণ্টোসরাসও



চিত্র 3- অতীতের দুই অতিকায় ডাইনোসর—স্টেগোসরাস-এর মাথাটি ছিল খুবই ছোট, কিন্তু এর পিঠের উপরে কতকগুলি হাড়ের পাটি সাজানো ছিল, আর লেজের ডগায় ছিল চারটি শূল। তা সত্ত্বেও হিংস্র ডাইনোসর টিরানোসরাস-এর আক্রমণ থেকে এ আত্মরক্ষা করতে পারত না।

(যাদের একত্রে অভিহিত করা হয়েছে ডাইনোসর-রূপে), টেরোসর, গিরগিটি, কুমীর, সাপ এবং আদি পাখি। দ্বিতীয় ধারায় পাওয়া যায় কচ্ছপ, যা আজও পৃথিবীতে বিরাজ করছে। তৃতীয় ধারায় কম যায় না। এইরূপ এক-একটি প্রাণীর দৈর্ঘ্য 75—100 ফুট হত, আর ওজন হত 25 থেকে 60 টন পর্যন্ত। কিন্তু দেহের তুলনায় এদের মাথা ছিল খুবই ছোট। এরা সবাই ছিল অত্যন্ত নিরীহ

প্রকৃতির এবং শাকাশী। বিশাল বপু নিয়ে এরা ডাঙার উপরে ভাল করে চলতে পারত না। তাই এরা সাধারণত জলার ধারে বাস করত, জলে গা ভাসিয়ে চলত, আর কচি ঘাসপাতা চিবিয়ে খেত। গাছপাতা খাওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা হিংস্র প্রাণীর তাড়া খেয়ে জলে নামলে, সময় সময় এদের বিরাট ভারি দেহ হয়তো নরম পাঁকে ডুবে যেত। কোন-ক্রমেই আর উঠে আসতে পারত না। তাই এদের অনেক কঙ্কাল সযত্নে সংরক্ষিত হয়ে আছে কাদা-পাথরের স্তরে।

এই সময় আরও কতকগুলি অতিকায় প্রাণীর আবির্ভাব হয়, যেমন ট্রাইসেরাটপস, স্টেগোসরাস প্রভৃতি। এরাও ছিল পুরোপুরি তৃণভোজী, তবে এরা ডাঙাতেই চলে বেড়াত। ট্রাইসেরাটপ্‌স-এর মাথায় ছিল ভয়ঙ্কর ছুঁচালো তিনটে শিং, সর্বাঙ্গ মোটা চামড়া দিয়ে ঢাকা, আর এই চামড়ার উপরে ছিল হাড়ের মত শক্ত অনেকগুলি বর্ম। ঘাড়ের উপরেও ঢালের মত শক্ত হাড়ের বর্ম ছিল। মাথার খুলির হাড় বর্ধিত হয়ে এই বর্ম তৈরি হত। দেখে মনে হয়, বিপদে পড়লে এরা মাথা নিচু করে রুখে দাঁড়াত, আর শিং দিয়ে শত্রুর শরীর ছিঁড়ে-ফুঁড়ে ফেলত। স্টেগোসরাসের দেহও ছিল শক্ত চামড়ায় মোড়ানো। আর এই চামড়ার উপরে ছিল হাড়ের মত শক্ত অনেকগুলি বর্ম। পিঠের উপরে ছিল দু'সারিতে পর পর কতকগুলি হাড়ের পাটি সাজানো, আর লেজের ডগায় ছিল লম্বা ধারালো চারটি শূল। দেখে মনে হয়, এ ছিল বর্মশূলধারী মস্ত এক যোদ্ধা! কিন্তু দেহের তুলনায় এর মাথাটি ছিল খুবই ছোট, আর দেহটি ছিল এমন কিম্ভূতকিমাকার যে, বর্মশূলধারী হয়েও এ হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না।

এই সময় অনেক রকম অতিকায় মাংসাশী সরীসৃপেরও আবির্ভাব হয়, যেমন অ্যালোসরাস, টিরানোসরাস প্রভৃতি। এদের চেহারা দেখলেই আতঙ্ক জাগে। যেমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি ভয়ঙ্কর তার পিছনের দু'পায়ের থাবা। এর পেশী-বহুল শক্ত ঘাড়ের উপর ছিল বিরাট একটি মুখ এবং তার মধ্যে দু'পাটিতে ছুরির ফলার মত ধারালো দাঁত। এরা পিছনের পা এবং লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াত, লাফ-ঝাঁপেও এরা খুব পটু ছিল। তৃণভোজী কোন প্রাণী দেখলেই এরা তাকে আক্রমণ করে হত্যা করত এবং মহানন্দে তার হাড়-মাস চিবিয়ে খেত। এদের গায়ে জোর বেশি ছিল, অথচ বুদ্ধি ছিল কম। তাই স্বভাবতই এরা ছিল অত্যন্ত হিংসুটে এবং ঝগড়াটে প্রকৃতির, অত্যন্ত অত্যাচারী এবং প্রাণীকুলে আতঙ্কস্বরূপ। একজন আর একজনকে দেখলেই তাকে আক্রমণ করত, আপন-পর বিবেচনা করত না।

সেই সময় টেরোডাক্টাইল নামে এক প্রকার অতিকায় সরীসৃপের আবির্ভাব হয়। এরা আকাশে উড়তে পারত, কিন্তু এদের ঠিক পাখি বলা চলে না। এরা ছিল উড়ন্ত সরীসৃপ। এর সরু লম্বা মুখ ছিল, আর তার মধ্যে দু-সারি ধারালো দাঁত ছিল। বাদুড়ের মত পাত্‌লা চামড়ার ডানা ছিল, তারই সাহায্যে প্রাণীটি আকাশে উড়তে পারত। ডানায় আঁকশির মত নখ ছিল, তাদের সাহায্যে প্রাণীটি গাছের ডালে বা পাহাড়-চূড়ায় ঝুলে থাকত। এর পিছন দিকে আবার গিরগিটির মত লম্বা একটি লেজ ছিল। সেই সময় টেরানোডন নামে আর একরকম উড়ন্ত সরীসৃপের আবির্ভাব হয়, তার লম্বা লেজ ছিল না। আর আকারে সে ছিল আরও বড়। এইরূপ একটি প্রাণীর ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মাপ ছিল প্রায় 30 ফুট।

কালক্রমে সরীসৃপদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আবির্ভূত হল আদি-পাখি। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন আর্কিঅপ্‌টেরিক্‌স (**archeopterix**) বা আদি-পাখি। এ দেখতে ছিল অনেকটা কাক বা কোকিলের মত। এখনকার পাখির মতই এর ডানা ছিল পালকযুক্ত এবং সর্বাঙ্গ পালকে আবৃত। এই

ডানার সাহায্যে এরা বেশ দ্রুতবেগে উড়তে পারত। এই পাখির দুটি লম্বা লম্বা পা ছিল। এই পায়ের সাহায্যে এরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর আকৃতি ছিল খুবই অদ্ভুত। এখনকার পাখির মাঝামাঝি। আর এতেই প্রমাণ হয় যে, বিবর্তনধারায় সরীসৃপ থেকেই প্রথম পাখির উদ্ভব হয়েছে।

এই সময় সমুদ্রের জলেও নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর



চিত্র 4—আদি পাখী—আর্কিঅপ্‌তেরিক্‌স

পাখিদের ঠোঁট থাকে, কিন্তু তাতে দাঁত থাকে না। কিন্তু আদি-পাখির ঠোঁটের মধ্যে দাঁত ছিল। একথা এখন আমরা ভাবতেও পারি না। এদের ডানাও ঠিক এখনকার পাখিদের মত ছিল না। আদি-পাখির ডানায় নখর-বিশিষ্ট আঙ্গুল ছিল। এছাড়া মেরুদণ্ড পুচ্ছমধ্যে বিস্তৃত ছিল। এর সঙ্গে এখনকার পাখির চেয়ে গিরগিটিরই সাদৃশ্য ছিল বেশি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাণীটি ছিল গিরগিটি এবং

সরীসৃপ বিচরণ করত, যেমন—প্লেজিওসরাস, ইক্‌থাইওসরাস, প্লাইওসরাস, আদিম কচ্ছপ ইত্যাদি। এদেরকে বর্তমান যুগের তিমি, হাঙর, কুমীর ও কচ্ছপের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা যায়।

এর অনেক কাল পরে হঠাৎ একসময় অতীতের অতিকায় প্রাণীগুলি সব একযোগে লোপ পেয়ে গেল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই যুগের শেষদিকে ভূপৃষ্ঠে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে হিমালয়, আল্পস,

অ্যাণ্ডিস্ প্রভৃতি পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়ায়। এর ফলে ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাংশের আবহাওয়া হঠাৎ বদ্লে যায়। ক্রমে ঐসব অঞ্চলে একটি হিম-যুগের আবির্ভাব হয়। আর গরমপ্রিয় অতিকায় সরীসৃপগুলি অত্যধিক শীতের প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে সব একযোগে মারা যায়। কিংবা তখন হয়তো আবহাওয়া হঠাৎ খুব শুষ্ক হয়ে উঠেছিল এবং দারুণ জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল। এর ফলে গাছপালা, তৃণ-গুল্ম সব শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাই খাদ্যাভাবে প্রথমে তৃণভোজী সরীসৃপগুলি সব মারা গেল। তারপর মাংসাশী প্রাণী যে সব ছিল, তারা তৃণ-ভোজীদের না পেয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি কামড়াকামড়ি আরম্ভ করল এবং শেষ পর্যন্ত এরা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন, অতীতের সেই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় এমন সব উদ্ভিদের উদ্ভব হয়, যাদের দেহমধ্যে সঞ্চিত ছিল এক প্রকার বিষ (যেমন, অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার)। এইরূপ উদ্ভিদ আহার করে তৃণভোজী ডাইনোসররা দলে দলে মারা যায়। আবার ঐসব বিষাক্ত তৃণভোজী ডাইনোসরদের আহার করে মাংসাশী ডাইনোসররাও হয়তো দলে দলে মারা পড়ে। তবে এসবই অনুমান। সঠিক কি হয়েছিল, এতকাল পরে তা আন্দাজ করা খুবই কঠিন।

(5) টারসিয়ারি বা তৃতীয় যুগ (Tertiary Era)

এরপর অতীতের ইতিহাস থেকে অনেকগুলি পাতা হারিয়ে গেছে। পরের যে পাতাটি পাওয়া গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে টারসিয়ারি বা তৃতীয় যুগ। এই যুগকে মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—ইওসিন (eocene), ওলিগোসিন (oligocene), মাইওসিন (miocene), এবং প্লাইওসিন (pliocene)। এই যুগের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাতকোটি বছর আগে। তখন পৃথিবীর যেরূপ আবহাওয়া ছিল, তা অনেকাংশে বর্তমান কালের আবহাওয়ার মতই। এখন আমরা যেসব ঘাস, গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত, সে-সবই তখন ছিল।

পৃথিবীর পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সরীসৃপ থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কতকগুলি প্রাণীর আবির্ভাব হল। এরা উষ্ণশোণিত প্রাণী, অর্থাৎ সরীসৃপদের মত এদের রক্ত শীতল ছিল না। তাই এরা পৃথিবীর পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারল। এদের ক্রমবিকাশ হল প্রধানত দুটি শাখায় একটি শাখায় হল পাখি, আর অন্য শাখায় হল স্তন্যপায়ী প্রাণী।

টেরোসরের পরিবর্তে বাদুড় এবং পাখি আকাশে আধিপত্য বিস্তার করল। ডাঙায় ডাইনোসরদের স্থান অধিকার করল স্তন্যপায়ী প্রাণীরা। আর সমুদ্রে ভয়াল শিকারী প্রাণী প্লেজিওসর এবং ইক্থাইওসরের স্থান অধিকার ক'রল তিমি এবং হাঙর।

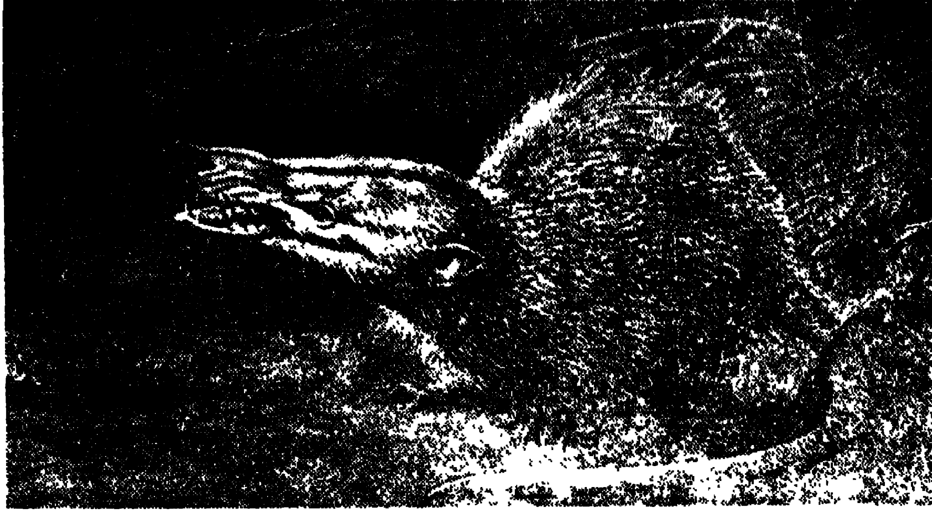
এই সময়েই প্রকৃত পাখির আবির্ভাব ঘটে। পাখি ডিম পাড়ে, ডিমে তা দিলে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। প্রায় সব রকম পাখিই আকাশচারী। উড়বার জন্যে এদের হাত দু'খানি ডানায় পরিণত হয়েছে, লেজ নেই বললেই চলে। প্রকৃত লেজের বদলে কিছু পালকের সাহায্যে নকল লেজ উৎপন্ন হয়েছে। এই নকল লেজটিও উড়তে সাহায্য করে। সমস্ত শরীর পালকে ঢাকা থাকায়, শরীর বেশ হালকা হয় এবং দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ঘ্রাণশক্তি খুব ক্ষীণ, কিন্তু সে তুলনায় দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত

সবচেয়ে প্রাচীন স্তন্যপায়ী দেখতে ছিল অনেকটা ছুঁচো বা ইঁদুরের মত। এদের বাচ্চা হত, আর সেই বাচ্চা মায়ের স্তন্য পান করে বড় হয়ে উঠত। এদের বংশধররাই ক্রমে পৃথিবীর অধিকর্তা হয়ে বসল। তারা সবাই ছিল ডাঙার জীবনে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত।

পৃথিবীর পরিবর্তিত আবহাওয়ায় দেখা দিল প্রায় আজকালকার মত আকৃতি বিশিষ্ট বিড়াল, কুকুর,

হায়না, নেকড়ে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী। হাতি, গণ্ডার, জিরাফ প্রভৃতির পূর্বপুরুষেরও আবির্ভাব তখন হয়েছে। ক্রমে ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ইওহিপ্পাসেরও আবির্ভাব হল।

অত্যন্ত প্রবল। এর ফলে টারসিয়ারি বা তৃতীয় যুগের অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীরই সমূহ বিনাশ ঘটে। এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মানুষের উদ্ভব এবং স্থলভাগে তার আধিপত্য বিস্তার।



চিত্র 5—সবচেয়ে প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখতে ছিল অনেকটা ছুঁচো বা ইঁদুরের মত

বিবর্তনের ধারায় একদল স্তন্যপায়ী প্রাণী ক্রমশ বৃক্ষারোহী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাণী হল—বৃক্ষারোহী শ্রু, লেমুর, টারসিয়ার এবং বানর। বানরের বিকাশ হল প্রধানত দুটি ধারায়—পূর্ব গোলার্ধের বানর এবং পশ্চিম গোলার্ধের বানর। প্রাচীন বানরের অন্য একটি ধারায় আবির্ভাব হয়েছে গিবন, ওরাংওটাং, সিম্পাঞ্জি এবং গরিলার।

(6) কোয়াটারনারি বা চতুর্থ যুগ (Quaternary Era)

টারসিয়ারি (বা, তৃতীয়) যুগ শেষ হলে, আজ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে, শুরু হয় কোয়াটারনারি বা চতুর্থ যুগ। এর সূচনা হয় প্লাইস্টোসিন পর্যায় (pleistocene period) থেকে। বিশাল হিমযুগ (great ice age) দিয়ে এই পর্যায়টি চিহ্নিত। উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশ তখন সুদীর্ঘকাল ধরে হিমবাহ দ্বারা আবৃত ছিল। তাই তখন সমগ্র ভারতেই শীতের প্রকোপ

জ্ঞানীদের মতে, অতীতের বানর-জাতীয় একপ্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এখনকার মানুষের তুলনায় তার শারীরিক শক্তি ছিল বেশি, আর বুদ্ধি ছিল অনেক কম। কিন্তু ঐ সামান্য বুদ্ধির জোরেই মানুষ ছিল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর অনেক দিনের অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আজকের সুসভ্য ও বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্ভব হয়েছে।

এইভাবে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবের ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি হিসেব এখন পাওয়া গেছে। এই হিসেবে সবচেয়ে প্রাচীন যে জীবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তার আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে জন্মায় ডাঙার উদ্ভিদ। প্রায় ষোল কোটি বছর আগে প্রথম পাখির উদ্ভব হয়েছে। আর সে তুলনায় আদিম মানবের আবির্ভাব হয়েছে সেদিন মাত্র, অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোজ্য তেলের অভাব মোচন কি অসম্ভব ?

সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

পশ্চিমবঙ্গে ভোজ্য তেল বলতে বুঝায় প্রধানত সরিষার তেল। কিন্তু এই তেল পশ্চিমবঙ্গে কতটা উৎপন্ন হয় তার খবর কয়জন রাখেন? আমাদের তৈলবীজের মোট চাহিদা বছরে প্রায় 12 লক্ষ টন। 1976 সনের হিসাবে দেখা যায় 2.65 লক্ষ একর জমিতে প্রায় 4 হাজার টন সরিষা উৎপন্ন হয়েছিল।[1] অর্থাৎ চাহিদার কেবলমাত্র 3.3 শতাংশ সরিষা পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে। সরিষা ছাড়াও 2.21 লক্ষ একর জমি থেকে 37 হাজার টন অন্যান্য তৈলবীজ পাওয়ায় ঐ বছর মোট চাহিদার প্রায় 6.3 শতাংশ তৈলবীজ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। 94 শতাংশ ঘাটতি পূরণ করেছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বাইরের প্রদেশ। গত বছর প্রায় 100 কোটি টাকার পরিশুদ্ধ রেপসীড্ তেল ভারত সরকার বিদেশ থেকে আমদানীর ছাড়পত্র দিয়েছিলেন তা অনেকেরই জানা আছে। তেলের এই বিরাট ঘাটতি কি পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে পূরণ করা সম্ভব ?

রাই ও সরিষা

রাই ও সরিষার চাষ শীতকালে হয়ে থাকে। গত 12 বছরের মধ্যে গম চাষের জমির আয়তন প্রায় 10 গুণ বেড়ে যাওয়ায় রাই ও সরিষার জমির পরিমাণ কমে গেছে। আমাদের দেশে রাই ও সরিষার চাষে কোন রকম যত্ন না নেওয়ার ফলে ফলন খুব কম হয় (গড়ে একর প্রতি 150 কেজি মাত্র)। বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে দেখা গেছে যে উন্নত প্রথায় চাষ করলে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উন্নত বীজ, সার ও সেচের ব্যবহার ও রোগ পোকার আক্রমণ দমন করলে উপরিউক্ত ফসলের উৎপাদন একর প্রতি 700 কেজি পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করলে সরিষার গড় ফলন 4.6 গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে জমির পরিমাণ যদি না বাড়ে, পশ্চিমবঙ্গে সরিষার উৎপাদন মোট চাহিদার 15 শতাংশের বেশি বাড়ানো বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব নয় এবং আভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ করতে হলে অন্য প্রকার তৈলবীজ, যেমন—তিল, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, কুসুম, তুলা, তিসি, নারকেল ইত্যাদির চাষ বাড়াতেই হবে।

তিল

প্রায় 33 হাজার একর জমিতে তিল লাগানো হয়ে থাকে। তিল সাধারণত তিন মাসের ফসল, এবং ফলন একর প্রতি 3/4 কুইণ্টাল। কেবলমাত্র শীতকাল ছাড়া পুরো গ্রীষ্মকালে তিলের চাষ করা সম্ভব হলেও সাধারণত আলুচাষের পর ঐ জমিতে তিলের চাষ করার প্রচলন বেশি। 1975-76 সনে 2 লক্ষ 79 হাজার একর আলুর জমিতে যদি তিলের চাষ করা হয় তা হলে বছরে প্রায় 60 হাজার টন তিল পাওয়া যায় যা আমাদের মোট চাহিদার 5 শতাংশের সমান।

চিনাবাদাম

চিনাবাদামকে ভাল জাতের অর্থকরী তৈলবীজ হিসাবে ধরা হয়। বাদামে শতকরা 45-52 ভাগ

*81 পিলখানা রোড, বহরমপুর (742101); মুর্শিদাবাদ

তেল থাকে। ইতিপূর্বে পশ্চিমবাংলায় বাদামের চাষকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় খুব কম চাষীভাই চিনাবাদের চাষ করে থাকেন। এর কারণ মোটামুটি :

(i) আউস ধান ও পাটের ন্যায় প্রধান এবং জনপ্রিয় ফসল না লাগিয়ে চিনাবাদামের চাষ করতে সাধারণের আপত্তি।

(ii) বাঙ্গালীরা বাদাম তেল রান্না খাবার খেতে অভ্যস্ত নয় বলে বাদাম তেলের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন।

(iii) দূর গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন ফসল কেনাবেচার উপযুক্ত বাজারের অভাব।

ভারতবর্ষের বনস্পতি কারখানায় বাদাম তেলের প্রচুর চাহিদা আছে।[1] গ্রামাঞ্চলে যদি বাদাম প্রচুর পরিমাণে ফলানো হয় তাহলে অন্যান্য ফসলের মত বাদামেরও বাজার গড়ে উঠবে। প্রধান সমস্যা এই যে—কি করে বাদাম চাষকে চাষীভাইদের কাছে আকর্ষণীয় করা যায়। যেহেতু বাদাম একটি অর্থকরী ফসল[3] এর চাষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই চাষীভায়েরা করবেন যদি বর্তমানের পছন্দসই ফসলগুলির চাষ বন্ধ না করে বাদামকে একটি বাড়তি ফসল হিসাবে ফলাতে পারেন। বাদামকে বাড়তি ফসল হিসাবে চাষ করার কারিগরী জ্ঞানের আর কোন অভাব নেই। এযাবৎকাল বাদামকে কেবলমাত্র বর্ষায় (আষাঢ়) অথবা প্রাক্‌-বর্ষায় (ফাল্গুন, চৈত্র লাগাবার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হত। পশ্চিমবঙ্গে ভাদ্রমাসে যে বাদাম লাগানো সম্ভব একথা পূর্বে কেহ জানতেন না। 1975 ও 1976 সনে লেখক পরীক্ষা করে দেখেছেন[2] অগাষ্ট মাসে (শ্রাবণ, ভাদ্র) গুচ্ছজাতের বাদাম লাগালে বাদামের একটি ভাল ফসল পাওয়া সম্ভব, কারণ ঐ সময়ের আবহাওয়া জলদী ফুল ফোটা এবং দানার বাড়ের পক্ষে খুব উপযোগী। গাছও বেশ ছোট মাপের হয়। পোলাচী-1 অথবা জে-11 গুচ্ছজাত (105-110 দিনে পাকে) যদি শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয়ার্ধে লাগানো হয় তাহলে অঘ্রাণের মাঝামাঝি বাদামের একটি ফসল তোলা সম্ভব হয়। এই পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে উঁচু সেচযুক্ত এলাকার জন্যে উন্নততর একটি বাৎসরিক তিন ফসলী শস্য পর্যায়-ক্রম করা সম্ভব হয়েছে।[6] যথা—

গম → চৈতালী পাট (অথবা আউস ধান) → চিনা-
(115 দিন) (120 দিন) বাদাম → গম
(110 দিন)

উচ্চ ফলনশীল গম (জাত সোনালিকা) যদি অঘ্রাণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোনা হয় তাহলে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে তা কাটা সম্ভব হবে। সোনালিকা জাতের গম চাষের জন্যে যে নিয়ম বর্তমানে চালু আছে সেই নিয়মেই চাষ করতে হবে। গম তোলার পর ঐ জমিতে প্রয়োজনীয় সেচ, সার ও চাষ দিয়ে চৈতালী পাট (জাত—জে. আর. ও. 878) অথবা 120 দিনে পাকে এমন আউস ধানের জাত লাগাতে হবে চৈত্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। ঐ ফসলের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় যত্ন নিয়ে বীজ বোনার প্রায় 120 দিন অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ঐ ফসল কেটে শ্রাবণের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে খোসাসমেত গোটা চিনাবাদাম (গুচ্ছজাত) সারি সারি করে বুনতে হবে। প্রতি সারির দূরত্ব 30 সে. মি ও সারিতে বীজের দূরত্ব 15 সে. মি. হবে। বাদাম চাষের জন্যে কৃষিবিভাগ অনুমোদিত অন্যান্য যত্ন নিয়ে অঘ্রাণের মাঝামাঝি মাটি থেকে চিনাবাদাম তুলে অঘ্রাণের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ঐ জমিতেই আবার সোনালিকা জাতের গম চাষ করা সম্ভব হবে। যাঁরা বৈশাখী পাট জে. আর. ও.-632 জাত বৈশাখে লাগিয়ে থাকেন তাঁরাও 120 দিন পরে পাট কেটে অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল জলদী বাদাম গঙ্গাপুরী জাতের ('90 দিনে তোলা যায়) চাষ করে সোনালিকা জাতের গম ফলাতে পারেন। বাদামের পর গম চাষ করলে শতকরা 25 থেকে 50 ভাগ গম বেশি পাওয়া যায়।[3]

আগে গ্রামবাংলায় জনসাধারণ গমের আটার রুটি খেতেন না কারণ তাঁরা জমিতে গম ফলাতেন না।

গত এক দশকের মধ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় উন্নত প্রথায় গমের চাষও প্রায় 10 গুণ বেড়ে গেছে এবং বর্তমানে গ্রামবাসীরা গমের আটার রুটি খেতে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের চাষী ভাইয়েরা ইতিমধ্যেই উন্নত প্রথায় পাট এবং উচ্চ-ফলনশীল আউস ধানের চাষ করতে শিখেছেন। কিন্তু পাট (অথবা আউস ধান) ও গমের মধ্যবর্তী সময়ে কি করে চিনাবাদামের একটি অর্থকরী তৈলবীজের চাষ করতে হয় তা তাঁরা এখনও জানেন না। উপরিউক্ত তিন ফসলী শস্যপর্যায়ক্রম সেচযুক্ত উঁচু জমিতে অনুসরণ করলে একই জমি থেকে অধুনা পছন্দসই পাট অথবা আউস ধান এবং গম তো পাবেনই উপরন্তু চিনাবাদামের একটি বাড়তি ফসলও তাঁরা পেতে পারেন। এক একর জমিতে 8।9 কুইণ্টাল বাদামের ফলন হিসাবে 270 কেজি থেকে 360 কেজি বাদামতেল পাওয়া সম্ভব যার বর্তমান বাজার দর প্রায় 2700 টাকা থেকে 3600 টাকা। ঘরে যখন ক্ষেতের ফসল বাদাম থাকবে তখন খুব কম চাষীভাইয়েরই বাদামের তেল না খেয়ে দোকান থেকে চড়া দামে সরিষার তেল কিনে খাবার ইচ্ছা জাগবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না যখন গ্রামবাংলায় জনসাধারণ চিনাবাদামের তেল খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন যেমন গমের বেলায় হয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় 13·96 লক্ষ একর সেচ এলাকায় উচ্চফলনশীল গমের চাষ হয়ে থাকে[1]। 13 লক্ষ একর গমের জমিতে যদি উপরিউক্ত তিনফসলী শস্য পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা হয় তাহলে বছরে 10·4 লক্ষ টন চিনাবাদম বাড়তি পাওয়া সম্ভব যা আমাদের চাহিদার 65 শতাংশের সমান। (হিসাব 25 শতাংশ খোসার ওজন বাদ দেওয়া হয়েছে)।

1975-76 সনের তথ্যে দেখা যায় 52·92 লক্ষ একর জমিতে সেচের সুযোগ করা হয়েছে। তার মধ্যে বোরো ধান, গম, আলু এবং আখের চাষ হয় যথাক্রমে 7·92, 13·96, 2·79 ও 0·90 লক্ষ একর (মোট 25·57 লক্ষ একর) জমিতে[1]। আরও 3·50 লক্ষ একর সেচ এলাকায় যদি উন্নত প্রথায় রাই ও সরিষার চাষ করা হয় তাহলে চাহিদার শতকরা 15 ভাগ তৈলবীজ বাড়তি উৎপাদন হওয়া অসম্ভব নয় এবং তৈলবীজের ঘাটতি আর থাকে না।

বাঙালীরা যেহেতু সরিষার তেল খেতে অভ্যস্ত এবং পছন্দ করে সেই জন্যে আরও বেশি পরিমাণ সেচযোগ্য জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাইসরিষার চাষ করা উচিত। হিসাবে দেখা যায় মোট প্রায় 14 লক্ষ একর সেচযুক্ত এলাকা আমাদের সরিষার তেলের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে সক্ষম এবং তা পাওয়ার অসুবিধা কোথায়? বর্তমান পরিস্থিতিতে তা পাওয়ার কিছু অসুবিধা আছে। কারণ গভীর নলকূপগুলির যতটা জমিতে সেচ দেওয়া উচিত বাস্তবে দেখা যায় তার প্রায় অর্ধেক জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। কারিগরি দিক থেকে তার কারণগুলি ভাল করে খতিয়ে দেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে রাই সরিষার চাষের এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা মোটেই অসঙ্গত হবে না।

বিনা সেচ এলাকায় চাষ

24 পরগণার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি অম্ল ও লবণাক্ত। পুকুর ছাড়া সেচের অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। 7·15 লক্ষ একর জমিতে আগে কেবল মাত্র আমনধানের চাষ হত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটি সংশোধন ও আবাদ করলে সুন্দরবনের অনেক অঞ্চলে আমনধানের পর তুলা, সূর্যমুখী চিনাবাদাম ইত্যাদি তৈলবীজের চাষ বিনা সেচে করা সম্ভব। 1975-76 সনে 400 একর জমিতে তুলা, 180 একর জমিতে সূর্যমুখী এবং 150 একর জমিতে চিনাবাদামের চাষ করা হয়েছিল। সুন্দরবন অঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা বর্ষাকালের আবদ্ধ জল বের করে ফেলা। বাতাসের শক্তির সাহায্যে ও অসংখ্য খাঁড়ির জোয়ারভাঁটা থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করে জল নিষ্কাশন, লবণাক্ত জলকে পরিস্রুত

করা, কুটির শিল্প ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কুসুমকে খরাসহিষ্ণু তৈলবীজ হিসাবে শীতকালে চাষ করা হয়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বর্তমানে কুসুমের চাষ দেখা যায়। 88·33 লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা না থাকায় বছরে ধানের একটি মাত্র ফসল পওয়া সম্ভব হচ্ছে। পয়রা ফসল হিসাবে আমন ধানের পর কুসুমের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কুসুমের ফসল একর প্রতি 4—5 কুইন্টাল। প্রথম প্রথম কাঁটাওলা কুসুমের জাতই লাগানো উচিত। কারণ খোলামাঠে লাগালেও গরু, ছাগলে মুখ দিতে পারে না। তেলের অভাব পূরণ করতে উপরিউক্ত ফসল ছাড়াও তিসি, নারিকেল ও সয়াবীনের চাষের উপর আরও বেশি নজর দেওয়া যেতে পারে।

প্রত্যেক জাতের বীজ থেকে পাওয়া তেলের একটা বিশেষ গন্ধ থাকে এবং আগেই বলা হয়েছে একমাত্র সরষের তেলের গন্ধ ছাড়া আর কোন তেলের গন্ধই আমরা পছন্দ করি না। সরষে ছাড়া অন্য বীজের তেল যদি কারখানায় পরিশুদ্ধ করে বিশেষ গন্ধগুলি দূর করা যায় তখন কিন্তু ঐ তেল খেতে বিশেষ আপত্তি হবে না, উপরন্তু কিছু তেল পরিশুদ্ধ করার কারখানাও গড়ে উঠবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অসঙ্গত হবে না যে পশ্চিম বাংলায় ভোজ্য তেলের অভাব মোচন করা দুঃসাধ্য ত নয়ই উপরন্তু একটু সচেষ্ট হলে এই রাজ্যকে উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত করা সম্ভব।

তথ্যপঞ্জী

1. Agriculture, West Bengal 1947-1976, Offset Press; Govt. of West Bengal, Calcutta-40, pages-12, 16, 20, 44.
2. Annual Reports 1975-76, 1976-77 of Pulses and Oil seeds Research Station, Berhampur, W. B. pages-105, 167.
3. Handbook of Agriculture, I. C. A. R, New Delhi, pages 130, 191.
4. Amrita Bazar Patrika, Calcutta, dated 1-8-1977. page-1, column-2. "No Reduction of Oil prices soon" by Staff Reporter.
5. Groundnut (1962) by C. R. Seshadri, pages-64.
6. ভোজ্য তৈলের অভাবমোচনের নতুন শস্য পর্যায়ক্রম—সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত, 38 (8), অগ্রহায়ণ, 1384, পৃঃ 376—377.

সমুদ্রের জলে কত শক্তি লুকিয়ে আছে

চিত্ত দত্ত*

সমুদ্রের পাড়ে যখন দাঁড়াই, আমরা দেখি জলের বড় বড় ঢেউ অনন্ত সময় জুড়ে তীরে আছড়ে পড়ছে অবিরাম গতিতে। এর মধ্যে কোন ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই। বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে যদি একটু ভাববার চেষ্টা করি, মনে হয় এই জলরাশি অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে যে বিপুল তরঙ্গের সৃষ্টি করে চলেছে—তাকে কি মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় না। আনন্দের বিষয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমুদ্রের এই অসীম সম্পদকে বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলছে। বিদ্যুৎ তৈরির জন্যে সমুদ্রের জলরাশির যে বিশেষ দিকটির প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে—তা হল অবিরাম প্রবাহ নিয়ে এগিয়ে আসা সমুদ্রের ঢেউ আর জোয়ার-ভাঁটাকালীন জলপ্রবাহ। অর্থাৎ সমুদ্রের গতিশীল ঢেউয়ের উচ্চতা আর জোয়ারের প্রবল জলোচ্ছ্বাস যে অসীম শক্তিকে লুকিয়ে রেখেছে তাকে পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করা। সমুদ্রের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে অধুনা আরও যে সূত্রটি নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা সুরু হয়েছে, তা হল সমুদ্রের জলের গভীরতার মধ্যে তাপের যে তারতম্য রয়েছে তাকে এ ব্যাপারে সফলভাবে কাজে লাগানো।

আজ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অভাব এক বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। যার জন্যে আমেরিকার মত উন্নত দেশের প্রেসিডেন্ট জিমি কারটারকেও বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানোর জন্যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 10 দফা কর্মসূচী ঘোষণা করতে হয়েছে। এতদিন ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কয়লা বা তেলের উপর নির্ভরশীলতা ছিল, তার ভাণ্ডার দিন দিন কমে আসাতেই বর্তমানে এ সংকট। এর জন্যে অপ্রচলিত উপাদানের উপর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়েছে বিশেষ ভাবে। সে উপাদানগুলির মধ্যে সমুদ্রের জলের অফুরন্ত সম্পদ এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাপকতা বিরাট। ভারতের 4000 কিলোমিটার উপকূলে সমুদ্রের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক ইউনিট বসানো যায়। প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায়, অন্তত 25,720 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। অন্ধ্র, গুজরাট, কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে অন্তত 643-টি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ষ্টেশন এভাবে বসানো সম্ভব। জনৈক ইঞ্জিনীয়ার এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁর উদ্ভাবিত 'সমুদ্র-তরঙ্গ টারবাইন'-এর মাধ্যমে সমুদ্রের ঢেউয়ে যে বিপুল শক্তি লুকিয়ে আছে, সে শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে বলে তিনি দাবী করেছেন। ঐ যন্ত্রে সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসরমান ঢেউগুলিকে অবিরামভাবে উঁচুতে তুলে নেবার বন্দোবস্ত রয়েছে। উঁচুতে তুলে-ধরা জলপ্রবাহকে একটি পাইপের সাহায্যে দ্রুত গতিতে নিচের দিকে দিলে সে জলের গতি তীরে বসানো 'টারবো জেনারেটার'-এর পাখাগুলিকে ঘোরাতে শুরু করবে এবং এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনেও সমর্থ হবে। ঢেউয়ের জলকে যেভাবে উপরে তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে তাতে অন্তত 30 ঘনমিটার জল 60 থেকে 90 মিটার উঁচুতে তোলার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে

*3/101, বিবেক নগর, কলিকাতা-700 075

দুটি টারবো-জেনারেটার 25 মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। সমুদ্রে ঢেউকে এভাবে কাজে লাগালে বর্তমানে দেশে তাপ-বিদ্যুৎ ও জল-বিদ্যুতে যত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ এর দ্বারা উৎপাদিত হতে পারে বলে উপরিউক্ত ইঞ্জিনীয়ারের ধারণা। সমুদ্রের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। কারণ এর পরীক্ষাসমূহ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ের। তার জন্যে প্রয়োজন আরো সমীক্ষা এবং গবেষণা।

কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের অপর রূপ—এর জোয়ার-ভাঁটাকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে অতি সত্বর আমাদের দেশও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমর্থ হতে পারে। আমাদের দেশে উপকূল ভাগের অসংখ্য খাঁড়ি এবং মোহনাতে প্রতিদিন সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশির ফলে যে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হচ্ছে তা সফলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। আমরা জানি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে জলের যে অবস্থিতি রয়েছে তাতে 12 ঘন্টা 25 মিনিট অন্তর জোয়ারের সৃষ্টি হচ্ছে চন্দ্র এবং সূর্যের আকর্ষণের ফলে। চন্দ্র এবং সূর্য যখন একই রেখায় থেকে ভূপৃষ্ঠকে আকর্ষণ করে তখন জোয়ারের গতি হয় তীব্রতর এবং যখন উভয়ে বিপরীত দিকে থাকে তখন জোয়ার হয় অপেক্ষাকৃত কম জোরালো। বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনীয়ারেরা জোয়ারের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েছেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে। তীব্র গতি নিয়ে 5 থেকে 14 মিটার উঁচু জোয়ারের তরঙ্গ যখন খাঁড়ির দিকে অগ্রসর হয় তখন সে জোয়ারের প্রবাহকে মোহনায় বা খাঁড়ির দিকে লাগানো টারবাইনসমূহের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে সাহায্য করা হয়। টারবাইন জলের প্রবাহে ঘুরতে শুরু করলে যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। খাঁড়ির ভিতর জল প্রবাহে যে শক্তি তৈরি হয় তার মূল সূত্র হল :—

তাৎক্ষণিক শক্তি = খাঁড়ির প্রস্থ × জোয়ারের গতি × জলের ঘনত্ব × মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ

$$\left(\text{জোয়ারের উচ্চতা} \times \frac{\text{খাঁড়ির জলের গড় উচ্চতা}}{2}\right)$$

এই সূত্র থেকে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারা যায়—খাঁড়ির আকৃতি, জলের গভীরতা এবং জোয়ারের উচ্চতা ও গতিবেগ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রধান সহায়ক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জোয়ারের উচ্চতা যদি 4·57 মিটারের বেশি হয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে তা বিশেষভাবে উপযোগী। খাঁড়ির প্রস্থ যদি খুব কম হয়, সাধারণত দেখা যায় জলের গভীরতা সেখানে অনেক বেশি। যেমন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলের লাভ স্ট্রাংলর্ড মোহনা মাত্র 0·3 কিলোমিটার প্রশস্ত; কিন্তু গভীরতা প্রায় 60 মিটার। জোয়ারের গতি 7 নট এবং জোয়ারের উচ্চতা 3·85 মিটার। প্রশস্ততা কম থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সেখানে অসুবিধা নেই। খাঁড়িতে দীর্ঘস্থান জুড়ে যদি জলপ্রবাহ হয়, গতির দ্রুততার জন্যে সেখানে পাড়ের ধস্ নামে ঘন ঘন।

খাঁড়ি বা মোহনায় জোয়ার-ভাঁটার জল প্রবাহের ফলে তিনভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে জোয়ারের জলকে খাঁড়ির মুখে বা একটু ভিতর দিকে ব্যারেজ বা বাঁধ তৈরি করে এর ভিতর জমা করা হয়। স্লুইসগেট খুলে দিলেই সাগর থেকে জোয়ারের জল ভিতরে চলে আসবে। এর পর যখন ভাঁটার সময় আসে, তখন বাঁধে আটকে রাখা জলরাশি টারবাইনের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করা হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। অনেক সময় পাম্প দিয়েও জল সাগর থেকে তুলে জলাধারগুলি পরিপূর্ণ রাখা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল যখন জোয়ারের জল আসে তখন সে জলপ্রবাহকে জলাধারে ঢোকবার আগে টারবাইনের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করা হয়। ঘূর্ণায়মান টারবাইন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।

তৃতীয় পদ্ধতি হল, প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির

সমন্বয়; অর্থাৎ জোয়ারকালীন সময়ে বাঁধে জল ঢোকবার সময় টারবাইনগুলি ঘুরিয়ে দেয় এবং জোয়ার কমে গেলে ভাঁটার সময় জলাধারে আটকে থাকা জল আবার উল্টো দিক দিয়ে টারবাইনগুলি ঘুরিয়ে নিচে সাগরে নেমে আসে। এ পদ্ধতি অনুসারে জোয়ার এবং ভাঁটা—উভয় সময়ই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সফল প্রয়োগ ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে করা হয়েছে। ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, আর্জেন্টেনিয়া প্রভৃতি দেশে এধরণের কিছু কিছু জোয়ার-বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়ে গেয়েছে এবং নির্মীয়মান অন্যান্য প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। এদিক দিয়ে ফ্রান্স পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত। ফ্রান্সের রান্স উপকূলে জোয়ার-বিদ্যুৎ প্রকল্প 1963 সাল থেকেই কাজ শুরু করেছে এবং সেখানকার উৎপাদিত বিদ্যুৎ হল 240 মেগাওয়াট। 1969 সালে রাশিয়ার কিস্লয় জোয়ার-বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের সেভের্ন ব্যারেজ প্রকল্প প্রায় 1930 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। আমেরিকার কাণ্ডি উপকূলে পামাম্মাকোভি প্রকল্প 300 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সমর্থ হবে। আনন্দের বিষয় ভারতবর্ষের গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গে জোয়ার-বিদ্যুৎ প্রকল্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রচুর।

রাষ্ট্রসংঘের অধ্যাপক এরিক এম উইলসন সরকারী আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা পরিদর্শন করে জানিয়েছেন বঙ্গোপসাগরে তিনটি ছোট নদী দুর্গাদোয়ানী, বেলাডোন্না ও পিট থেকে 24 মেগাওয়াট জোয়ার-বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্যে খরচ হবে 24 কোটি টাকা। সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলেও জোয়ারের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিস্থিতি বিদ্যমান। সুন্দরবনে জোয়ারের যে উচ্চতা পাওয়া যায় তা অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম—5 থেকে 6 মিটার। গড়ে উচ্চতা দাঁড়ায় 3 থেকে 3·5 মিটার। সেখানে ফ্রান্সে রান্স উপকূলের জোয়ারের উচ্চতা 11 থেকে 12 মিটার। অবশ্য রান্সের তুলনায় সুন্দরবনের জলের উচ্চতা কম হলেও এখানকার কিছু কিছু উপকূলের বিপুল জলরাশি সে অভাবকে পূরণ করে দেবে। তাই সুন্দরবনের কম উঁচু জোয়ারের বিপুল জলরাশিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করতে হলে রান্সের তুলনায় অনেক বেশি টারবাইন তৈরি করতে হবে। যাতে এগুলির অল্প উচ্চতা তার দ্বারা পুষিয়ে যায়। সুন্দরবনের পরিকল্পিত এ ধরনের অল্প উঁচু টারবাইনের সঙ্গে রাশিয়ার কিস্লয় উপকূলের জোয়ার প্রকল্পের টারবাইনের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে জোয়ারের উচ্চতা আরও কম—মাত্র 3·9 মিটার। গড়ে উচ্চতা 1·3 মিটার। রাশিয়ার শ্বেতসাগরের মুখে 300 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে জোয়ারের উচ্চতা 7 মিটার এবং গড় উচ্চতা 5·6 মি.। তাই সুন্দরবনের জোয়ারের স্বল্প উচ্চতা সেদিক দিয়ে কোন সমস্যা নয়। সুন্দরবনের জোয়ার-বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষিত উন্নত কলাকৌশল আমাদের গ্রহণ করা দরকার। ভারতবর্ষের অপর আদর্শ জোয়ার-বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্থান হল কচ্ছ ও কাম্বে উপসাগর। নবলখীর কাছে লারা এবং ওয়াংখাড়িতে দুটি সম্ভাবনাময় স্থান পাওয়া গেছে। সেখানে জোয়ারের উচ্চতা 7·5 মিটার। এই খাঁড়ি দুটিতে পলি জমা পরিমাণে খুবই কম। যার জন্যে বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনীয়াররা এখানে প্রকল্প তৈরির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছেন। গুজরাটের পরবর্তী পরিকল্পিত প্রকল্পের স্থান হল কাম্বে উপসাগর। এখানকার সোমারী ও ভাবনগর খাঁড়ি এবং ধাদার ও কিম নদী বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ। এখানকার জোয়ারের উচ্চতা অনেক বেশি 10·8 মিটার। তবে পলি জমার পরিমাণ একটু বেশি। জোয়ারের এত উঁচু জলপ্রবাহ এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে।

সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে জোয়ার-বিদ্যুৎ প্রকল্পের যে চিন্তা বিজ্ঞানীদের মনে এসেছে তা রূপায়ণে প্রাথমিক হিসাবের দিক দিয়ে খরচ একটু বেশি। 1974 সালের এক হিসাব অনুযায়ী ও বর্তমান প্রথা অনুযায়ী তাপ-বিদ্যুৎ থেকে তৈরী বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের দাম পড়ে প্রায় 15 পয়সা সেখানে জোয়ার-বিদ্যুৎ থেকে তৈরী প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম হয় প্রায় 38 পয়সা। তবু ভবিষ্যতের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি নজর রেখে দেখা যাবে আপাত বর্ধিত এ বিদ্যুতের দাম পুরো পুষিয়ে যাবে। কারণ পরবর্তী দিন-গুলিতে কয়লা ও তেলের দাম বেড়ে যেতে বাধ্য। অথচ প্রায় বিনা পয়সায় জোয়ার-বিদ্যুতের মূল উপাদানগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে পাওয়া যাবে। তাই প্রথমে প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠ করার জন্যে বেশি খরচ পড়লেও পরবর্তী পর্যায়ে এর খরচ খুব সামান্যই হবে।

তাছাড়া জোয়ার-বিদ্যুতের আর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল পরিবেশের বিশুদ্ধতা। তাপ-বিদ্যুৎ, নিউক্লিয়ার-বিদ্যুৎ আবহাওয়াকে যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত করলেও জোয়ার-বিদ্যুৎ তা থেকে মুক্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সমুদ্র-জলের আর একটা দিকের বৈশিষ্ট্যকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। তা হল এর তাপের তারতম্যতা। সমুদ্র-জলের উপরিভাগ সূর্যের তাপের জন্যে অনেকটা উষ্ণ হয়ে থাকে। তুলনামূলক ভাবে গভীরতম তলদেশে সমুদ্রের জল অনেক ঠাণ্ডা।

ফরাসী বিজ্ঞানী জ্যাক্ আর সোমভাল 1881 সালে এ অবস্থা লক্ষ্য করেন এবং ঘোষণা করেন তাপের এই তারতম্যতার জন্যে সমুদ্রের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু তাঁর এই ঘোষণা বাস্তবে রূপায়িত হয় প্রায় 50 বছর পরে। 1930 সালে সেই ফরাসী বিজ্ঞানীর ছাত্র জর্জ ক্লড কিউবা উপকূলে 'সমুদ্রের তাপশক্তির রূপান্তরের' একটি যন্ত্র বসান। প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে সে যন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেও পরে সমুদ্রের প্রচণ্ড আঘাতে তা নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী সময় আমেরিকা এবং জাপান এ দুটি দেশই এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়ে। 1964 সালে আমেরিকার কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার হিলবার্ট অ্যাণ্ডারসন এবং তাঁর ছেলে জেমস্ এ ধরণের একটি নতুন প্লাণ্ট বসাবার কথা ঘোষণা করেন। 1975 সালে অ্যাণ্ডারসন একটি কার্যকরী যন্ত্রও উপহার দেন। এ যন্ত্রে কৃত্রিমভাবে সমুদ্রের জলের তাপের তারতম্যতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাপানেও অনুরূপভাবে এ যন্ত্র তৈরি করেন ডঃ হারুও উয়ারা যার নাম দিয়েছেন 'সিরাফুল 3 নং'। এ যন্ত্র থেকে 1 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে।

বর্তমানে আমেরিকা এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। যার জন্যে 1976 সালে এ সম্বন্ধে গবেষণা ও প্লাণ্ট তৈরির জন্যে 82 লক্ষ ডলার খরচ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে 1980 সালে 25 মেগাওয়াট একটি প্লাণ্ট তৈরি করা সম্ভব হবে এবং 1984 সালে 100 মেগাওয়াট প্লাণ্ট তৈরি হওয়াও অসম্ভব নয়।

লক হীড্ এ বিষয়ে প্লাণ্ট তৈরি করার জন্যে যে ডিজাইন করেছেন তা হবে কংক্রীটের তৈরী। এই অতিকায় প্লাণ্টের শেষ সীমা 470 মিটার নিচ পর্যন্ত সমুদ্রের জলে ডোবানো থাকবে। যার ভিতর এর কর্মী এবং ইঞ্জিনীয়াররা কাজ করবেন। সমস্ত অংশটাই জলের নিচে থাকাতে শুধু উপরিভাগে 'বয়ার' মত একটি প্লাটফর্ম থাকবে যার উপর হেলিকপ্টার দাঁড়াতে পারবে। লক হীড আশা করছেন এ প্লাণ্ট 160 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারবে।

যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সমুদ্রের জলের তাপের তারতম্যের জন্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব তা খুবই সহজ। কঠিন হল জলের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করা।

এই প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের জলের তাপের পার্থক্য

পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়। সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের উপরিভাগের জল যে মাত্রায় গরম থাকে গভীরতম তলে সমুদ্রের জলের উত্তাপ তুলনামূলকভাবে 20° সেন্টিগ্রেড কম থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে একটি পাইপকে উপরের উষ্ণ জল থেকে নিয়ে গিয়ে নিচের ঠাণ্ডা জল পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। পাইপের উষ্ণ অংশে যদি তরল অ্যামোনিয়া ফেলে দেওয়া যায় তা হলে সে অ্যামোনিয়া তাপে বাষ্পে রূপান্তরিত হয় এবং সে পুঞ্জীভূত বাষ্প টারবাইনকে ঘোরাতে সাহায্য করে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। টারবাইনকে ঘোরাবার পর সে অ্যামোনিয়া বাষ্পকে প্রায় 500 মিটার নিচে শীতলতম জলের দিকে চালিত করা হয়। তখন সে বাষ্প শীতল জলের সংস্পর্শে এসে আবার তরল হয়ে যায় এবং সে তরল অ্যামোনিয়া পাম্পের সাহায্যে উপরে নিয়ে আসা হয়। এভাবে অ্যামোনিয়াকে আবর্ত আকারে তরল ও বাষ্পে রূপান্তরিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

তবে এ প্লান্ট সমুদ্রের উপরে বসানোর জন্যে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ উষ্ণ জলে যে সমুদ্রের জীব রয়েছে তা প্লান্ট স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া মরচে-বিরোধী কোন ধাতু প্লান্টে ব্যবহার করতে গেলে সে ধাতু আবার সমুদ্র জলকে নানাভাবে দূষিতকরণের চেষ্টা করে, যা সমুদ্রের জীবের পক্ষে ক্ষতিকর। অবশ্য পরীক্ষা চলছে যাতে এই দূষিতকরণ বন্ধ করা যায়।

পৃথিবীর সমস্ত সাগরই এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উপযোগী নয়। কারণ তাদের বিভিন্ন পার্থক্য জলের বিভিন্ন স্তরে হওয়া প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে জাপানে উষ্ণ কুরোসিও স্রোত সে আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমেরিকার মেক্সিকো-উপসাগরেও এ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তবে, উভয় স্থান প্রায়শই সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয়। সেজন্যে বিজ্ঞানীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছেন।

বর্তমান বিদ্যুৎ-সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের এভাবে অপ্রচলিত উপাদানের দিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে নবতম প্রচেষ্টা চলছে তা থেকে আমাদের দেশ পিছিয়ে না পড়ে এবং বিদ্যুৎ-সঙ্কট সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকূট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। কার্যকরী সম্পাদকের নামে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয়ে (পি 23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) হাতে বা ডাকযোগে প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।

চতুর্মাত্রিক দেশ ও কাল

চঞ্চল মজুমদার*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পদার্থবিন্দুর ভুবনরেখা হচ্ছে t-অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা। সমবেগে চলন্ত পদার্থবিন্দুর প্রতিভূ হচ্ছে t-অক্ষের সঙ্গে কোণ করে একটি সরলরেখা। পরিবর্তনশীল গতির পদার্থবিন্দুর প্রতিভূ হচ্ছে ভুবনে একটি বক্ররেখা। যদি ভুবনবিন্দু xyzt-তে আমরা ঐ বিন্দু দিয়ে গেছে এমন একটি ভুবনরেখা নেই এবং দেখি যে তা ঐ পরাগোলকের কোন অরভেক্টর OA´-এর সমান্তরাল, তাহলে আমরা OA´-কে নতুন কালের অক্ষ ধরতে পারি। তখন আমাদের নতুন দেশ-কালের ধারণা অনুসারে ভুবনবিন্দুতে অবস্থিত পদার্থটি আপাতদৃষ্টিতে স্থির মনে হবে। এখন আমরা মূল স্বতঃসিদ্ধটিকে উপস্থাপিত করি।

দেশ ও কাল ঠিকমত নির্ধারণ করলে ভুবনবিন্দুতে অবস্থিত কোন পদার্থকে স্থির বলে ধরা যেতে পারে।

স্বতঃসিদ্ধ অনুযায়ী যে কোন ভুবনবিন্দুতে $c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ সব সময় ধনসংখ্যা হয়ে থাকে, অথবা যে কোন গতিবেগই c এর চেয়ে কম। দুটি বাক্য আসলে সমার্থক। সেই জন্যে যে কোন পদার্থের গতিবেগের উর্ধসীমা হিসাবে c-কে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় উক্তিটি করলে স্বতঃসিদ্ধটি সম্পর্কে ভাল ধারণা হয় না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে বলবিদ্যায় অবকলন-সংখ্যার বর্গ-ফর্মের বর্গমূল ব্যবহৃত হয় তার রূপ পরিবর্তিত হবে এবং আলোকের চেয়ে দ্রুতগতি যে সব ঘটনাতে আসে সেখানে জ্যামিতিতে যেমন কাল্পনিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয় সেরকম তেমনই তাদের ব্যবহার হবে।

G_c সঙ্ঘতে ত্বরার ইচ্ছা ও অভিসন্ধির উৎস হচ্ছে এই তথ্য—আলোকের মহাশূন্যে চলন সম্পর্কে অবকলনীয় সমীকরণ G_c সঙ্ঘটিকে মেনে চলে। অন্যদিকে দৃঢ় পদার্থের ধারণা যে বলবিদ্যায় আছে সেই বলবিদ্যা G_∞ সঙ্ঘটি স্বীকার করে। যদি আলোক-বিজ্ঞানে G_c সঙ্ঘ থাকে অথচ আমরা দৃঢ়বস্তুও আঁকড়ে ধরে থাকি তাহলে সহজেই দেখানো যায় যে, একই t-এর দিকে দুটি বিশিষ্ট পরাগোলকের পত্র থাকবে, একটি G_c-র, অন্যটি G_∞-এর। আরও একটি ফল হবে এই যে, পরীক্ষাগারে প্রয়োজনমত দৃঢ়বস্তুর তৈরী আলোক-বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দিয়ে পৃথিবীর গতির সঙ্গে দিক পরিবর্তন করলে নৈসর্গিক ঘটনার পরিবর্তন দেখা যাবে। কিন্তু এই পরিবর্তন দেখার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিশেষত মাইকেলসনের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করার জন্যে এইচ এ লরেঞ্জ একটি প্রকল্প প্রস্তাব করেছেন— প্রকল্পটির সাফল্য আলোক-বিজ্ঞানের G_c সঙ্ঘের অপরিবর্তনীয়তার উপর নির্ভরশীল, লরেঞ্জের মত অনুসারে যে কোন চলন্ত বস্তু চলার দিকে সংকুচিত হতে বাধ্য। গতিবেগ যদি v হয়, তবে এই সংকোচনের অনুপাত

$$1 : \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

এই প্রকল্প শুনতে খুবই অদ্ভুত, কারণ সংকোচন ঈথারের রোধ বা ঐ জাতীয় কিছুতে ঘটছে না। এ যেন ঐশ্বরিক প্রভাব; চলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

---

*পদার্থবিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700009

সমাজবাদের সমর্থনে আইনষ্টাইন

সুব্রত পাল*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকট আইনষ্টাইন ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। এ অবশ্যম্ভাবী সংকট বা 'আর্থিক অরাজকতা'র বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এ সমাজে 'এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে কর্মকরণক্ষম তথা কর্মকরণেচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তি সর্বদা কাজ পেতে পারে। প্রায় সর্বদাই এক বিশাল 'কর্মহীনের বাহিনী' পরিদৃষ্ট হয়। শ্রমিক সর্বদাই কর্মচ্যুতির আশঙ্কায় বিবশ থাকে। কর্মহীন ও স্বল্প পারিশ্রমিকে কর্মরত শ্রমিকদল লাভজনক বাজার বলে বিবেচিত হয় না বলে উপভোগ্য উপকরণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ফলে প্রচণ্ড দুরবস্থা দেখা দেয়। যন্ত্রকৌশলের প্রগতি সকলের জন্যে কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে প্রায়ই অধিকতর মাত্রায় বেকার সৃষ্টি করে। পুঁজিপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুনাফাবৃত্তি পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয় এবং এর পরিণামে ক্রমশ ভয়ঙ্কর মন্দা দেখা দেয়। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রমশক্তির বিপুল অপচয়ের কারণ হয় এবং অবশেষে ব্যক্তিমানবের সামাজিক চেতনাকে পঙ্গু করে দেয়।' (পৃঃ 29)

এথেকে আইনষ্টাইন সিদ্ধান্তে আসেন যে 'এই সব ভীষণ বিপত্তি পরিহারের একটি মাত্র পন্থা বিদ্যমান। এর জন্যে সমাজবাদী অর্থনীতি ও তৎসঙ্গে সামাজিক মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে চালিত নবীন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করতে হবে। এবংবিধ অর্থনীতিতে উৎপাদনের সাধনের কর্তৃত্ব থাকবে স্বয়ং সমাজের উপর এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এর প্রয়োগ হবে। সুপরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গতিবিধান করে প্রয়োজনীয় কার্য প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির ভিতর বিভাজন করে দেবে এবং প্রত্যেকটি নর, নারী ও শিশুকে জীবিকানির্বাহের নিশ্চয়তা দেবে।' (পৃঃ 30)

কোন পদ্ধতিতে এই সমাজবাদ কায়েম করা উচিত এ সম্বন্ধে আইনষ্টাইন কোন ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমেই পুঁজিপতি শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উৎপাদনে মুষ্টিমেয়র ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা কায়েম করার মধ্য দিয়েই শোষণমুক্তি সম্ভব। কিন্তু শান্তিবাদী আইনষ্টাইনের কাছে বোধ হয় রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ বাঞ্ছিত ছিল না। একথা হয়ত তিনি উপলব্ধি করতে অসমর্থ ছিলেন যে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীই নিজের শ্রেণী শাসক ও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য অংশের মানুষের উপর রক্তাক্ত হিংসা চাপিয়ে দেয়—বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পাল্টা বলপ্রয়োগ ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ খোলা থাকে না। গান্ধীবাদের আদর্শে প্রভাবিত আইনষ্টাইন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগের মধ্যেই নিষ্কৃতির পথ খুঁজেছেন।

সমাজবাদী অর্থনীতির সমর্থক হলেও সমাজবাদী রাষ্ট্রকাঠামো সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের কিছু ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাই তিনি মনে করতেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সংখ্যালঘুদের রাজত্ব চলছে।' (পৃঃ 108)।

*পদার্থবিদ্যা (জীবপদার্থ) বিভাগ বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক অপপ্রচার পরিকল্পিতভাবে চালানো হত এবং এই সব অপপ্রচার অনেক ক্ষেত্রে চালানো হত তথাকথিত মানবতাবাদের আড়ালে। তাই মানবতাবাদী আইনষ্টাইনের পক্ষে সেই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া খুব অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে নয়।

সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনুমোদন না করতে পারলেও বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মোহমুক্তি ঘটছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে পুঁজির স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকে "গণতান্ত্রিক (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক—লেখক) পদ্ধতিতে সুসংগঠিত রাজনৈতিক সমাজের পক্ষেও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বিধান পরিষদের সদস্যগণ মূলত পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট বা তাঁদের দ্বারা অন্যভাবে প্রভাবিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন এবং এই সব পুঁজিপতি কার্যত বিধান পরিষদ থেকে নির্বাচনকারীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এর পরিণামে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জনগণের অনগ্রসর অংশের স্বার্থ বাস্তব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রক্ষা করেন না। উপরন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদপ্রাপ্তির সূত্রসমূহ (সংবাদপত্র, বেতার ও শিক্ষাব্যবস্থা) নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কোন নাগরিকের পক্ষে কোন বিষয়ে বিষয়মুখ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে নিজ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা দুষ্কর। এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।" (পৃঃ 28-29)

যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার সাহায্যে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের মত দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন সেই ধরণের বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে মানব সমাজের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তিনি বুঝতে পারতেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র আদৌ সংখ্যালঘুদের শাসন নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্র হচ্ছে ব্যাপক জনগণের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয়র আধিপত্য। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হচ্ছে মুষ্টিমেয়র বিরুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে হয়।

লেখক ও প্রকাশকদিগের প্রতি নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান পুস্তক লেখক ও প্রকাশকদিগকে দুই কপি পুস্তক পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিশ্ববিজ্ঞানী আইনষ্টাইন

দীপককুমার দাঁ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আইনষ্টাইন শক্তির এই বিশাল পরিমাপ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও, 'বোমা' তৈরি করা প্রযুক্তি বিজ্ঞানে সম্ভব হবে, এটা তিনি কল্পনা করেন নি। 1920-21 সালে জার্মানীতে এক যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরমাণু থেকে শক্তি পাবার পরিকল্পনার কথা বললে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তার বক্তব্যকে অস্বীকার করতে থাকেন। কিন্তু সম্ভাব্য বিপদের ভাবনায় তখন থেকেই তিনি মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। 1937-এ জার্মানীতে অটোহান, ষ্ট্রাসম্যান, লিজা মাইটনার যখন নিউট্রন বুলেট প্রয়োগে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটালেন এবং ফের্মির তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত-বিভাজন চুল্লী তৈরি সম্ভব হল এবং জার্মানীতে হিটলার পরমাণু বোমা বানাচ্ছে—এই বিশ্বাস ক্রমশ আইন-ষ্টাইনের মনে যখন বদ্ধমূল হয়ে উঠতে লাগল, তখন সভ্যতার এই সঙ্কট মোচনে আইনষ্টাইন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পত্র লিখলেন পরমাণু বোমা তৈরির কাজে আমেরিকার অংশগ্রহণে (চিঠির তারিখ 2/8/39)।

কিন্তু পরমাণু বোমার বীভৎসতায় তিনি নিজেকেই প্রবঞ্চক বলে মনে করলেন। কারণ তাঁরই আবিষ্কারের সূত্র ধরে যা সম্ভব হয়েছে—তাই মানুষের জীবনে এনেছে ধ্বংসের অভিশাপ। শান্তিবাদী, মানব কল্যাণে নিয়োজিত এই বিজ্ঞানী জীবনের শেষ দশ বছর অবিরাম লেখনী/বক্তৃতায় পরমাণুর শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার সংগ্রামে রত হয়েছিলেন। যুদ্ধের রূপকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি বললেন, "এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মহামানব গান্ধী আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, পথের সন্ধান পেলে মানুষ কি মহান ত্যাগ করতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে অজেয় জড়শক্তির চেয়ে অদম্য বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ মানুষের ইচ্ছা যে মহত্তর, ভারতের মুক্তির জন্যে গান্ধীর প্রচেষ্টা তার জীবন্ত স্বাক্ষর।"

বলা যেতে পারে, তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রকে আইনষ্টাইন একক প্রতিভায় আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে একটা দার্শনিক মেজাজও লুকিয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন (1930, বার্লিন) সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বিশ্বতত্ত্বে ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ও ধারণা পাওয়া যায়। আইনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস করেন কি না?

রবীন্দ্রনাথ—'বিচ্ছিন্নভাবে নয় মানুষের সীমাহীন অস্মিতা বা ব্যক্তিত্ব বিশ্বকে উপলব্ধি করে। এমন কোন বিষয় থাকতে পারে না, যা মানব চেতনায় উপলব্ধ না হয়। বিশ্বের সত্যই হল মানব সত্য। এটি মানব বিশ্ব।'

আইনষ্টাইন বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজের দু-রকমের ধারণার কথা বললেন—(1) বিশ্বের গোটা রূপ বিবেচনা করলে এটি মানুষের চেতনা-নির্ভর; (2) বাস্তবতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিশ্ব মানুষের চেতনা-নির্ভর।

সৌন্দর্য ও সত্য এবং সঙ্গীত ও বলবিদ্যা প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

আইনষ্টাইন সারা জীবনব্যাপী যে জিনিসটিকে গ্রহণ করতে পারেন নি, তা হল কণাবলবিদ্যায়

---

*গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনসটিটিউশন, পোঃ-খাটুরা, 24 পরগণা।

সম্ভাব্যতা এবং অনিশ্চয়তার নীতিকে, যা সনাতন পদার্থবিদ্যাকে অগ্রাহ্য করছে। কিন্তু কণাবলবিদ্যার ক্ষেত্রে নীলস বোরের আবিষ্কারকে গ্রহণ না করেও মন্তব্য করছেন, 'এই আবিষ্কার মানুষের চিন্তা জগতে উচ্চতম শ্রেণীর সঙ্গীতের মাধুর্যের মত। সত্যকে গ্রহণ করেছেন সহজ এবং অবিসম্বাদী জ্ঞান হিসেবে। গ্যালিলিও-র প্রতি তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন; কিন্তু গ্যালিলিও-র নিজে টেলিস্কোপ সহ রোমে যাওয়াকে তিনি সমালোচনা করেছেন। সিংহের গুহায় গিয়ে সিংহকে আক্রমণ করার মত কাজ। যা সত্য তা আজ প্রকাশিত না হলেও সময়ের নিরীখে তা প্রকাশ পাবেই। এর জন্যে কোন ব্যগ্রতা তিনি নিজের জীবনে পছন্দ করেন নি। 1919 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী এডিংটন আলোর বক্রতার সত্যতার পরীক্ষার কথা ঘোষণা করলে পর-দিন ইংল্যাণ্ডের কাগজগুলিতে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশ হল—"Revolution in Physic — Newton overthrown"। আইনষ্টাইন শুধুমাত্র তাঁর মাকে টেলিফোন করে সংবাদটি পাঠালেন। নিরুত্তাপ; নিরুদ্বিগ্ন। নিজের কাজ সম্পর্কে তাঁর এতটা দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি বলতেন, আমার তত্ত্বকে সম্পূর্ণ না বদ্‌লিয়ে এর কোন সংশোধন করা যাবে না।

জীবনের শেষ 30 বছর তিনি একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের তত্ত্বীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চিন্তা থেকে তিনি কোন দিনও ছুটি নেন নি। অথচ জগতের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা-মনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, 'বোধাতীত বিশ্বে অতি উচ্চস্তরের যুক্তিগ্রাহ্য অস্তিত্বের দৃঢ় বিশ্বাসই হল আমার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা। স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।'

ধর্ম সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, 'আদিম যুগের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ভয়ভিত্তিক এবং সভ্য মানুষদের ধর্মগুলির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত প্রধানত নৈতিক নীতির উপর। এই সব ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই দুই প্রকার ধর্মেই ঈশ্বরের ধারণা হল ব্যক্তিরূপী (anthropomorphic) অর্থাৎ ঈশ্বর হল মানুষের আকারধারী ও মানুষের গুণসম্পন্ন।"···মানুষের নৈতিক ব্যবহারের সার্থক ভিত্তি হওয়া উচিত অপরের প্রতি সহানুভূতি-শিক্ষা, সামাজিক বন্ধন ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ, কোন ধর্মের ভিত্তির প্রয়োজন নেই।" ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বর্তমান যুগের সংঘাতের মূল কারণ হল ঈশ্বরের এই নরত্বারোপমূলক কল্পনা।'

মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে; বিশেষ করে ধর্মীয় মানুষেরা। আইনষ্টাইন এসম্পর্কে বলেছেন, 'আমি নিজেকে প্রতিটি জীবন্ত সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এত জড়িত বলে মনে করি যে, এই অনন্ত প্রবাহে কোন একটি মানুষের অস্তিত্বের কোথায় শেষ ও কোথায় শুরু, সে বিষয়ে জানতে বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত নই।

আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রসার যে কত সুদূরপ্রসারী হয়েছে, তা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা অসম্ভব। তাঁর উদ্দীপক বিকিরণ তত্ত্বকে প্রয়োগ করে 1954 সালে অধ্যাপক টাউনস মেসার (MASER) ও লেসার (LASER) রশ্মি সৃষ্টি করেন। অধ্যাপক ডিরাক আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে কণাবলবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে এক অসম্ভব ধারণাকে প্রকাশ করেন—সেটি হল বিপরীত-পদার্থের (antimatter) স্বরূপ। যেমন, ইলেকট্রনের অনুরূপ ভর ও ধর্মসম্পন্ন কণিকা কিন্তু তার তড়িৎ আধান হবে ধনাত্মক। কসমিক রশ্মি- গবেষণায় পজিট্রনের বাস্তব অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। তাঁর তত্ত্বের আরও নানারূপ ব্যবহারিক প্রয়োগ এখনও অব্যাহত আছে।

1955-র 11ই এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধকে এক জীবনে দেখে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হয়েছিলেন। রাসেল আইন-ষ্টাইন ইস্তাহার (1952) তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস বলেছেন, 'তাঁর সঙ্গে আলোচনা চালানো আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠত। তিনি এত দ্রুত ভাবতে পারতেন যে, তাল মিলিয়ে

বুঝে উঠা ও উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন হত।' তাঁর মৃত্যুতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী নীলস বোর বলেছেন, 'তিনি তাঁর পূর্ণতার আদর্শের জন্যে অদম্য আগ্রহ, ঘটনায় তত্ত্বাবলীতে সনাতন বিজ্ঞানের নিয়মাদির প্রযুক্তি এবং সমস্ত বাস্তব বিশ্বকে জানবার একীভূত পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে কণা-বলবিদ্যার অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন। পদার্থবিদ্যার প্রতিটি ধাপ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নূতন আর এক ধাপ আবিষ্কারের সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন ত্রুটিবিচ্যুতি, যা দূর করে পদার্থবিদ্যাকে উন্নত করার জন্যে বিজ্ঞানীদের নূতন উদ্যমে কাজ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে।'

আইজেনহাওয়ার বলেছেন, 'বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের বিস্তারে দানের পরিমাণ তাঁর চেয়ে আর কারোর অত বেশি নয়। তবুও জ্ঞানরূপ শক্তির অধিকারী অন্য কেউ তাঁর মত অত বিনয়ী ছিলেন না, অন্য কারোর অত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে, জ্ঞানবিহীন শক্তি মারাত্মক। এই পারমাণবিক যুগে যাঁরা বাস করছেন, তাঁদের কাছে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন স্বাধীন সমাজে একক ব্যক্তির মহৎ সৃজন ক্ষমতার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।' আইনষ্টাইন বিজ্ঞানী; কিন্তু ঋষিও বটে।

পরিষদের খবর

রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আমন্ত্রণে 31শে জুলাই (1978) বিকাল 4টায় সত্যেন্দ্র ভবনে ষোড়শ বার্ষিক রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা দেন ডঃ মনোজকুমার পাল। বক্তৃতার বিষয় ছিল - 'অতিভারী পরমাণু-কেন্দ্র'। প্রারম্ভে কর্মসচিব ডঃ রতনমোহন খাঁ পরিষদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্যে ডঃ পালকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং পরিশেষে বক্তাকে ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়।

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা

31শে জুলাই (1978) বিকাল 5-টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের আমন্ত্রণে সত্যেন্দ্র ভবনে চতুর্থ বার্ষিক শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন ডঃ বলাইচাঁদ কুণ্ডু। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'পাটের সমস্যা ও সম্ভাবনা'। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। প্রারম্ভে ডঃ গুহ শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ও বক্তার পরিচিতি দেন। এই সভায় উক্ত স্মৃতি-বক্তৃতা তহবিলের দাতা ডঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতি বক্তাকে ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বহু নমুনা ছিল এই বক্তৃতার অন্যতম আকর্ষণ।

বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর আসর

ক্যারোলাস লিনীয়াস



জন্ম—1707
মৃত্যু—1778

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার জীব-বিজ্ঞানীরা গাছ-গাছড়াকে কতকগুলি শ্রেণীতে [যেমন—ওষধি গাছ (herbs), গুল্ম গাছ (shrubs) এবং সাধারণ বৃক্ষ (trees)] বিভক্ত করেছিলেন, আর প্রাণীদের যথাক্রমে জলজ প্রাণী (water animals), ভূমিজ প্রাণী (land animals) এবং খেচর প্রাণী (air animals)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। এতে শ্রেণিবিন্যাস ঠিকমত হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যিনি এই অব্যক্ত বস্তুকে একটি যথার্থ বিন্যস্তরূপে রূপান্তরিত করলেন এবং এমন একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করলেন যাতে পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার জীবদের (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, তিনি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনীয়াস। ইনি বিজ্ঞান জগতে কার্ল ফন্ লিনে নামে অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন আধুনিক বিন্যাস পদ্ধতির (modern systematics)-র জনক এবং প্রাণীতত্ত্ববিদ হিসাবে চার্লস্ ডারউইনের পরেই তাঁর স্থান।

ক্যারোলাস লিনীয়াসের জন্ম হয়েছিল 1707 খৃষ্টাব্দে 13-ই মে সুইডেনের এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর পিতার নাম নিলস্ লিনীয়াস। উনি ছিলেন সুইডেনের একজন খৃষ্টীয় ধর্মযাজক। গাছপালার প্রতি তাঁর ভীষণ মমতা ছিল। মাঝে মাঝে উনি বিভিন্ন প্রকার গাছগাছড়া সংগ্রহ করতেন। পিতার এই গাছপালার প্রতি গভীর অনুরাগ তরুণ ক্যারোলাসের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই শৈশবে ক্যারোলাস তার বেশীর ভাগ অবসর সময় কাটাতেন বিভিন্ন প্রাণী আর গাছগাছড়া সংগ্রহ করে। পিতা নিলস্ তাঁর পুত্রকে গীর্জায় প্রবেশ করাতে চাইলেন, কিন্তু তরুণ ক্যারোলাস একজন ডাক্তার ও

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। পিতাকে পুত্রের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল এবং পিতা-পুত্র উভয়েই বিজ্ঞানের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

বাল্যকালে বিদ্যালয়ে ক্যারোলাস সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। ওঁর পিতাকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে ক্যারোলাসকে মুচীর কাজ শিক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাল। কিন্তু বালকটির পদার্থ-বিজ্ঞানের শিক্ষক ডক্টর রোথ্‌ম্যান প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখতে পেলেন বালকটির মধ্যে এবং ক্যারোলাসের পিতাকে বালকটির পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি ক্যারোলাসকে প্লিনি-র 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি (Natural History), 'ওয়ার্ক্‌স্‌ অব্‌ জোসেফ ডি টুর্নেফোর্ট (Works of Joseph de Tournefort) ও 'হারম্যান বোয়েরহ্যাভ্‌ (Herman Boerhaave), ইত্যাদি বইগুলিও দিলেন। এইগুলিই হল তরুণ লিনীয়াসের বৃত্তি পরিবর্তনের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

পিতার ইচ্ছায় ডাক্তারী পড়ার জন্যে লিনীয়াস যখন 1727 খৃষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 1728 খৃষ্টাব্দে উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন, তখন তাঁর কাছে টাকাপয়সা কিছুই ছিল না। আয়ের তাগিদে কোন আংশিক সময়ের চাকুরী পাওয়ার আশাও ছিল ক্ষীণ। তখন তিনি এমন অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁর পায়ের ছেঁড়া জুতোটি পর্যন্ত গাছের বাকল আর কাগজ দিয়ে কোনক্রমে নিজেকেই সারাতে হত। এই অবস্থায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে (লিনীয়াস যেখানে ডাক্তারী বিদ্যায় তাঁর প্রথম পাঠ নিলেন) ভেষজ গাছগাছড়া লালনপালনের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে তিনি সেখানকার অধ্যাপকদের মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করতে সক্ষম হলেন। এছাড়া ঠোঁট ও নখের গঠন দিয়ে পাখিদের শ্রেণিবিন্যাস করার জন্যে তিনি একটি পরিকল্পনার ছকও তৈরি করলেন। ওই সময়ে চারিদিকে প্রচারিত হল যে, লিনীয়াসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান—জননাঙ্গ (sex organs) অনুসারে ফুলের শ্রেণিবিন্যাস, যা তিনি সেই সময়ে করেছিলেন।

এটিতে কিন্তু লিনীয়াসের সম্পূর্ণ মৌলিকত্ব ছিল না। ভাইল্যাণ্ট নামে একজন ফরাসী লেখক আগেই এক ধরণের চারাগাছ আবিষ্কার করেছিলেন যা ডিম্বাকৃতি কাঠামো উৎপাদন করতে পারে, আর বাকীগুলি যা পরাগ বা বীজ উৎপাদন করতে পারে। তথাপি অন্যগুলি, যারা ছিল উভলিঙ্গ—উদ্ভিদ পুং ও স্ত্রী উভয় অঙ্গ সমন্বয়ে গঠিত। এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণিবিন্যাস প্রতিষ্ঠা করার আগেই ভাইল্যাণ্ট মারা যান। লিনীয়াস এই পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করলেন এবং সবরকম ফুলের উপরে প্রয়োগ করলেন। 1729 খৃষ্টাব্দে মাত্র 22 বছর বয়সে তিনি 'ম্যারেজ অব্‌ দি ফ্লাওয়ারস্‌ (Marriage of the flowers) শিরোনামায় একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন।

1732 খৃষ্টাব্দে উপ্‌সালা সায়েন্স অ্যাকাডেমী থেকে উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে গবেষণার জন্যে তাঁকে ক্যাপল্যাণ্ড-এ সংগ্রহকারী হিসাবে পাঠানো হল। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে এবং ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে তিনি প্রায় 4,600 মাইল দুর্গম পথ পরিভ্রমণ করলেন। দিনের পর দিন তিনি হেঁটেছেন জলাভূমির মধ্যে দিয়ে, যেখানে অনবরত কাদায় তাঁর হাঁটু অবধি ডুবে গেছে। তাঁর বিছানা

বলতে ছিল শ্যাওলার দুটি আস্তরণ, যার একটি গদি হিসাবে, আর অপরটি কম্বল হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছেন। লিনীয়াসকে অন্যান্য অনেক কষ্টও স্বীকার করতে হয়েছিল।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লিনীয়াসের সঙ্গে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তা হল—একটি স্কেল, একটি দূরবীণ (telescope), একটি বিবর্ধক কাচ (magnifying glass), একটি ছুরী, একটি পাখি মারার ছোট বন্দুক, চারাগাছ সংরক্ষণের জন্যে কয়েকটি কাগজ।

প্রায় ছ'মাস পরে পরিশ্রান্ত, শীর্ণকায় লিনীয়াস সব বাধা লঙ্ঘন করে ফিরে এসে উপসালা বৈজ্ঞানিক সমিতিতে প্রবেশ করলেন। আগের যে কোন বিজ্ঞানীর চেয়ে আরও বেশি পরিমাণে জীবন্ত প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণে তিনি সমর্থ হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

লিনীয়াস শ্রেণিবিন্যাসের একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন যার দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পর্ক অনুসারে পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) নামকরণের (nomenclature) একটি সমরূপ প্রক্রিয়া পাওয়া গেল। লিনীয়াস প্রকৃতি-বিজ্ঞানের (Natural History) উপর অনেক বই লেখেন, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 1735 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সিস্টেমা নেচারী' (Systema Naturae) নামক বইটি। ওই সময়ে যতরকম প্রাণী ও উদ্ভিদ ছিল, প্রত্যেকের শ্রেণিবিন্যাস এই বই-এ আছে। তিনিই সর্বপ্রথম নামকরণের দ্বিপদ-পদ্ধতি (binomial system) প্রবর্তন করেন। দুটি পদ-এর সমন্বয়ে কোন একটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নামকরণের পদ্ধতিকেই দ্বিপদ নামকরণ (binomial nomenclature) বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের নামের দুটি করে ল্যাটিন শব্দ বা পদ আছে। প্রথম পদটিকে গণ-নাম (generic name) এবং দ্বিতীয় পদটিকে প্রজাতি নাম (specific name) বলা হয়। নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দ্বিপদ নাম লিখতে হলে গণ-নামের প্রথম অক্ষরটি বড় হরফ এবং প্রজাতি-নামের প্রথম অক্ষরটি ছোট হরফে লিখতে হবে। এইভাবে, মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হল 'হোমো সেপিয়েন্স' (Homo sapiens), আম—'ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা' (Mangifera indica), স্থলপদ্ম—'হিবিস্কাস্ মিউটাবিলিস' (Hibiscus mutabilis), বট্—'ফাইকাস্ বেঙ্গলেন্সিস্' (Ficus bengalensis), অশ্বত্থ—ফাইকাস্ রিলিজিওসা' (Ficus religiosa), ইত্যাদি। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীকে যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম সনাক্ত করে দ্বিপদ নামকরণ অথবা বর্ণনা করেন, তাঁর নাম ঐ নামের শেষে যোগ করার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন, বিজ্ঞানী লিনীয়াস আমগাছের নাম দেন 'ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা'। সুতরাং, বিজ্ঞানীর নামসহ ওর নাম হবে 'ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা লিনীয়াস'। অনেক সময় সুবিধার জন্যে বিজ্ঞানীর নাম সংক্ষিপ্ত করেও লেখা হয়। যেমন, বিজ্ঞানী লিনীয়াসের নাম অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'লিন্' (Linn.) অথবা শুধু 'এল' (L.) লেখা হয়ে থাকে।

নির্দিষ্ট কোন জীবজন্তুর নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করা তখন থেকেই জীবতত্ত্ববিদ্‌দের পক্ষে সম্ভবপর হল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, লিনীয়াস জীব-বিজ্ঞানে যোগাযোগের একটি মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতি অর্জন করলেন। এর ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সুচিহ্নিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভবপর হল, যা শুধুমাত্র তাদের জানার জন্যেই সহজতর হল না, বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে সম্পর্ক জানতেও

সাহায্য করল। কেমনভাবে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তু একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—তা উপলব্ধি করে তিনি সুন্দর একটি নিয়ম প্রকাশ করলেন, যার নাম প্রকৃতি (nature)। তাঁর রচিত 'সিস্টেমা নেচারী' বইটির প্রথম প্রকাশনের সময়ে (1735 খ্রীষ্টাব্দে) পাতার সংখ্যা ছিল মাত্র 14, আর 1768 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 12-তম সংস্করণের সময়ে পাতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 2,500-তে।

উদ্ভিদের ব্যবচ্ছেদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উদ্ভিদের বর্ণনা ও প্রত্যেককে এক একটি নির্দিষ্ট নামকরণের ক্ষেত্রে লিনীয়াসের সামর্থ্য ছিল অতুলনীয়। তিনি শ্রেণিবিন্যাসের যৌন-পদ্ধতিকে (sexual system) একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিণত করেন। যে প্রক্রিয়া অনুসারে 24 শ্রেণীর ফুল প্রতিষ্ঠিত হল, যার প্রত্যেকটি পুংকেশরের (ফুলের পুং জননাঙ্গ) সংখ্যা ও তাদের মধ্যের সন্নিবেশ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক শ্রেণী আবার গর্ভকেশরের (ফুলের স্ত্রী জননাঙ্গ) গঠন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিন্যাসে বিভক্ত। যদিও এটি একটি কৃত্রিম পদ্ধতি, কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে সহজ হওয়ায় চারদিকে খুব শীঘ্রই এর ব্যাপক প্রসার ঘটলো।

1736 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন। সেখানে প্রোফেসর ডিলীনিয়াস তখন লিনীয়ান পদ্ধতিতে এত গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি বেতনের (সুইডেনের মুদ্রা অনুযায়ী) অর্ধেক অংশ লিনীয়াসকে নিয়মিতভাবে দিতে চাইলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন যাতে লিনীয়াস সেখানে তাঁর কাছে দয়া করে থাকেন ও তাঁকে ওই বিষয়ে কিছু শিক্ষা দেন। কিন্তু লিনীয়াস সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। এর পর তিনি হল্যাণ্ডে গেলেন এবং বেশ কয়েক বছর সেখানে থাকার পর চিকিৎসক হিসাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে তিনি স্টকহোমে ফিরে এলেন, যেখানে পরবর্তীকালে 1739 খ্রীষ্টাব্দে তিনি সারা এলিজাবেথ-কে বিবাহ করেন। 1737 খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি 'জিনেরা প্লান্টারাম্' (Genera Plantarum) ও 'ফ্লোরা ল্যাপ্পোনিয়া' (Flora Lapponia) প্রকাশ করেন। উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির বিভ্রান্তি থেকে সঠিক পথপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সচেতন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক-ই ওই সময়ে লিনীয়াস রচিত সদ্য প্রকাশিত 'জিনেরা প্লান্টারাম্' বইটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন।

এর পর তিনি উপ্সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেন। সেই সঙ্গে তিনি স্টকহোমে একটানা ডাক্তারীর একঘেয়েমী থেকেও অব্যাহতি পেলেন। তখন থেকে তিনি অধ্যাপনা ছাড়াও নিজের পছন্দ অনুযায়ী গাছগাছড়া অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ করার যথেষ্ট সময় হাতে পেলেন। তিনি ছিলেন অত্যুৎসাহী অনুশীলনকারী। অধ্যাপনার ফাঁকে উপ্সালার চতুর্দিকে তিনি তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে অনেকবার ভ্রমণ করেছিলেন।

মাতৃভূমি সুইডেনের জন্যে লিনীয়াসের ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, একবার স্পেনের রাজার কাছ থেকে কর্তব্য-বুদ্ধির পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উপযুক্ত বেতনের প্রতিশ্রুতিসহ সেই দেশে বসবাস করার সাদর আমন্ত্রণ তিনি সরাসরি বিনাদ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন। 1761 খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে ফন্ লিনে

(Von Linne) উপাধিতে ভূষিত করা হল এবং তিনি কার্ল ফন্ লিনে (Karl von Linne) নামে অভিহিত হলেন।

বিজ্ঞানী লিনীয়াস 'লিনে' (Linne) নামেই সকলের কাছে অধিক পরিচিত ছিলেন। এমনকি আজও উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস এবং পারিভাষিক শব্দের ক্ষেত্রে লিনীয়াসের দেওয়া মূল নামের প্রতীকিকরণ করতে 'লিন' (Linn) প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তিনি সকলের কাছে এত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে, 1778 খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর সৃষ্টির তাদৃশ কার্যসম্বন্ধীয় পরিকল্পনাগুলি সর্বত্রই সাদরে গৃহীত হয়েছিল। জীবিতকালে লিনীয়াসের কাজকর্মের অধিকার ছিল প্রায় ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের মতই। লিনীয়াস যা বলে গেছেন, তাই উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞানের অন্যান্য যে কোন শাখার যে কোন মত পার্থক্যের সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর লিখিত অনান্য বইগুলি 'ফান্ডামেন্টা বোটানিকা'—1735 (Foundamenta Botanica), 'বিব্লিওথেকা বোটানিকা'—1736 (Bibliotheca Botanica), 'স্পিসিস্ প্লান্টেরাম'—1753 (Species Plantarum) বিজ্ঞান সমাজে এখনও সমধিক আদৃত।

অপূর্ব প্রতিভাধর বিজ্ঞানের এই যাদুকরের কর্মময় জীবনের অবসান হয় 1778 খৃষ্টাব্দে। লিনীয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারের বইপত্রাদি একজন ধনী ইংরেজ তরুণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী কিনে নেন এবং এগুলিকে ইংলন্ডে নিয়ে আসেন। আজো তা লন্ডনের লিনীয়ান সমিতির (Linnaean Society) কার্যালয়ে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। তিনি আজ নেই, কিন্তু তাঁর মহান চিরন্তন সৃষ্টির মধ্যেই তিনি জগতে অমর হয়ে আছেন।

ধনঞ্জয় পাল*

*9/2-সি, রতনবাবু রোড, কলিকাতা-700 002

সমুদ্র ঘোড়া

বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে 'সমুদ্র-ঘোড়া (sea hosre) অন্যতম। সমুদ্র-ঘোড়া মোটেই ঘোড়াজাতীয় নয় ; এক রকমের সামুদ্রিক মাছ মাত্র। তবে মুখের আকৃতি ঘোড়ার মত বলে মাছটিকে সমুদ্র-ঘোড়া বলা হয়।

হাড় দিয়ে গঠিত অন্তঃকঙ্কালবিশিষ্ট (bonyfish) এই মাছটিকে প্রাণীবিদ্যায় শ্রেণী বিভাগ অনুসারে সিঙ্গনাথিফরমেস বর্গের (Order—Syngnathiformes) অন্তর্গত, হিপোক্যাম্পাসগণের (Genus—Hippocampus) মধ্যে ধরা হয়।

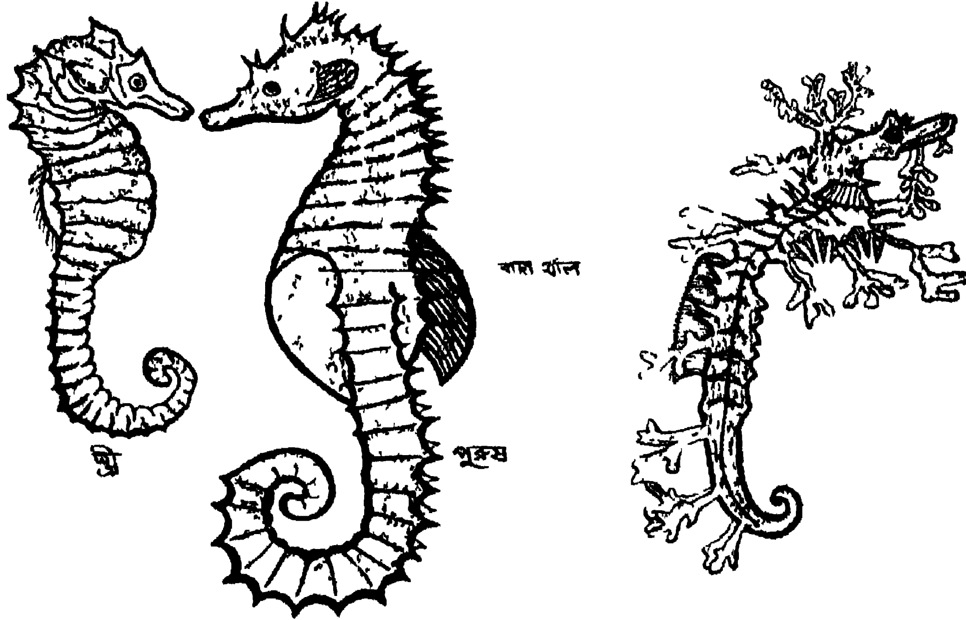
উষ্ণ মণ্ডলের সব সমুদ্রেই এদের দেখা যায়। সমুদ্রেরর অগভীর জলে বিভিন্ন গাছগাছড়ার মধ্যে ধারণকারী লেজটি (prehensile tail) দিয়ে কোন ডালপালাকে জড়িয়ে ধরে এরা এমনভাবে যাদুকরী খেলা দেখায়, যা দেখে মানুষ অবাক না হয়ে পারে না।

এদের দেহ বড় বিচিত্র। প্রাকৃতিক খেয়ালে এরা পেয়েছে ঘোড়ার মত মাথা ও খাড়া হয়ে চলার শক্তি। এদের ধড় থেকে মাথাটি ঘাড়ের কাছে প্রায় সমকোণে বাঁকানো ; পেটটি ব্যাঙের মত ফোলা ; আর ক্ষণে ক্ষণে গিরগিটির মত এদের রঙ বদলায়। আসল গায়ের রঙ ব্রোঞ্জের মত, অথবা খয়েরী, অথবা লালচে, নয়তো নীল। পরিবেশের সঙ্গে এরা রঙ মিলিয়ে আত্মগোপন করতে পারে। কখনও কখনও দেহ থেকে বিচিত্র ধরনের কাঁটা বের হয় ; ফলে এরা যখন স্থির থাকে তখন গাছপালা বলে মনে হয়। গাছপালার মধ্যে এমনভাবে মিলে থাকে যে, নড়াচড়া না করলে বোঝা মুস্কিল।

এ মাছের দেহে কোন আঁশ নেই। ত্বকের উপর হাড় দিয়ে তৈরী আংটির মত কঠিন প্লেট থাকে। মাথার অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হয়ে নলের মত দেখায়। এই নলের প্রান্তভাগে আছে ছোট মুখ। মুখে কোন দাঁত নেই। নলের পিছনে দু-পাশে দুটি চোখ। চোখের পিছনে আছে একখণ্ড হাড় দিয়ে সৃষ্ট কানকো। অন্য মাছের ক্ষেত্রে কানকো একাধিক হাড় দিয়ে সৃষ্ট। ফুলকা-ছিদ্র খুবই ছোট। ফুলকাগুলি গোল গোল এবং কানকোয় অবস্থিত। দেহে মাংসপেশী খুব কম। দেহের উপর হাড়ের প্লেটগুলিতে কাঁটা থাকে। ঘাড়ের কাছে ঐ কাঁটাগুলি সরু হয়ে কখনও বা ঘোড়ার মত কেশর সৃষ্টি করে ; আবার কখনও মাথার উপর শিংয়ের মত দেখায়। মাথার কাছে দু-পাশে বক্ষ পাখনা আছে ; একটি কাঁটাযুক্ত পৃষ্ঠ পাখনা আছে। কিন্তু সাধারণ মাছের মত শ্রোণী পাখনা, পায়ু পাখনা ও পুচ্ছ পাখনা নেই। পায়ুছিদ্রের পর থেকে দেহটি ক্রমশ সরু হয়ে দীর্ঘ লেজের সৃষ্টি করে এবং লেজের উপর ভর করে কোন বস্তুকে জড়িয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাঁতার কাটার সময় এরা খাড়া হয়ে সাঁতার কাটে। দেহের উপর হাড়ের প্লেট থাকার জন্যে দেহটিকে যেদিকে খুশী বাঁকানো যায় না। পৃষ্ঠ-পাখনার দ্রুত সঞ্চালনের ফলে সম্মুখে-পিছনে এবং উপরে নিচে সাঁতার কাটে। ঘাড়ের কাছে কেশরের মত পাতলা 'বক্ষ-পাখনা' দুটি সব সময় সঞ্চালিত হয়ে সাঁতার কাটার সময় গতি নির্ধারণে সাহায্য করে। দেহ অভ্যন্তরস্থ বায়ুপূর্ণ পটক্লাটি (air

bladder) দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং খাড়া হয়ে থাকতে সাহায্য করে। পট্‌কার মধ্য থেকে যদি এতটুকু বাতাস কোন রকমে ছিদ্র হয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে এদের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) পরিবর্তিত হয় এবং ভারসাম্য নষ্ট হয়। তার ফলে মাছটি অসহায়ভাবে



সমুদ্র ঘোড়া — গাছের মত অন্য প্রজাতির সমুদ্র ঘোড়া

সমুদ্রতলে তলিয়ে যায়। পট্‌কামধ্যস্থ রক্তজালিকার মাধ্যমে যদি পুনরায় গ্যাস সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আবার উঠে দাঁড়ায়। এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

সামুদ্রিক ঘোড়ার সবচেয়ে বৈচিত্র্য হল এদের পুরুষ মাছের পায়ুর পিছনে থাকে ক্যাঙ্গারুর মত মস্ত এক থলি ; যার মধ্যে শিশু-মাছেরা লালিত হয়। পেটের নিচে দু-পাশ থেকে ত্বকের অংশ বিশেষ মুড়ে এসে এমনভাবে মিলিত হয় যাতে থলির সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর উষ্ণ মন্ডলের সমুদ্রে প্রায় 50 প্রজাতির সমুদ্র-ঘোড়া দেখা যায়। সবচেয়ে ছোট আকৃতির সমুদ্র-ঘোড়া এক ইঞ্চির মত দীর্ঘ আর সবচেয়ে বড়টি হল দু-ফুটের মত। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে তিন রকম প্রজাতির সমুদ্র-ঘোড়া সচরাচর দেখা যায়। এদের নাম হল—

(i) হিপ্পোক্যাম্পাস ট্রাইমাকুলেটাস (H. trimaculatus)

(ii) হিপ্পোক্যাম্পাস গুটুলেটাস (H. guttulatus)

(iii) হিপ্পোক্যাম্পাস হিস্ট্রিক্স (H. hystrix)

এই তিন প্রজাতির মধ্যে তফাৎ হল পৃষ্ঠ-পাখনায় কাঁটার সংখ্যা ও দেহের উপর হাড়ের প্লেটের সংখ্যা।

সমুদ্র-ঘোড়াদের মধ্যে পুরুষের পেটে থলি থাকায় স্ত্রী-পুরুষ সহজেই চেনা যায়। এদের মিলনের আগে যে পূর্বরাগ অনুষ্ঠিত হয় তা বড় মজার ব্যাপার। স্ত্রী-মাছের আবেগে যদি পুরুষ

মাছ সাড়া দেয় তবে 24 থেকে 48 ঘণ্টা স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকে এবং সাঁতার কাটে। এই সময় স্ত্রী মাছ একটু উপরে এবং পুরুষ মাছ একটু নিচে এমনভাবে অবস্থান করে যাতে ডিমগুলি স্থানান্তরের সুবিধা হয়। তারপর এক সময় তারা পরস্পর মিলিত হয়। এই সময় স্ত্রী-মাছ একে একে তার দেহ থেকে লালচে ডিমগুলি পুরুষের থলিতে স্থানান্তরিত করতে থাকে। স্থানান্তরের সময় ডিমগুলি শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত (fertilised) হয়। স্ত্রী-মাছ কখন একটু কাছে আসে আবার একটু দূরে সরে যায়। এইভাবে দু-তিন দিনে 250 থেকে 300টি ডিম পুরুষের পেটের থলিতে স্থানান্তরিত করে। তার পর স্ত্রী-মাছ মুক্ত বিহঙ্গের মত সরে পড়ে। বাচ্চাদের লালন-পালনের সব দায়িত্ব একাকী পুরুষের। স্ত্রী-মাছের আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

প্রায় 45 দিন বহু কষ্ট করে পুরুষ মাছ ডিমগুলি তার পেটের থলির মধ্যে বয়ে বেড়ায়। এই থলিতে ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বের হয় তখন বাচ্চাগুলি খুবই ছোট এবং গায়ের রঙ একেবারে স্বচ্ছ। লেন্স দিয়ে দেখলে হৃৎপিণ্ডের কম্পন পর্যন্ত দেখা যায়। 45 দিন পরে বাচ্চাগুলি থলি থেকে বেরিয়ে আসে। কখনও কখনও একটি গোল বলের মত সমস্ত বাচ্চার স্তূপটি এক সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তার পর বাচ্চাগুলি যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। প্রকৃতিতে এধরণের ঘটনা খুবই বিরল যেখানে একা পুরুষকেই সন্তান লালনের সব দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মানুষের কাছে স্মরণাতীত কাল থেকে সমুদ্র-ঘোড়া পরিচিত। মদে ভেজানো সমুদ্র ঘোড়াকে অত্যন্ত বিষাক্ত বলে ধরা হয়। মধুর সঙ্গে ভিনিগারে মেশানো সমুদ্র-ঘোড়ার ভস্মকে অন্য বিষের প্রতিষেধক হিসাবে ধরা হয় এবং চর্মরোগ, টাকপড়া ও পাগলা কুকুরে কামড়ানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে ওষুধ হিসাবে অতীতে ব্যবহার করা হত। গোলাপের তেলের সঙ্গে সমুদ্র-ঘোড়ার ভস্ম শৈত্য ও জ্বরের ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত করা হত। আজও চৈনিক ভেষজশিল্পে সমুদ্র-ঘোড়ার গুঁড়ো নানা ওষুধে ব্যবহৃত হয়।

হরিমোহন কুণ্ডু*

*প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

ভেবে কর

নিচের প্রশ্নগুলির তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে। তিনটি উত্তরের মধ্যে একটি ঠিক। সঠিক উত্তরটি বের কর। পনেরোটির সঠিক উত্তর দিলে 'A' গ্রেড, বারোটির দিলে 'B' গ্রেড এবং আটটির দিলে 'C' গ্রেড —এইভাবে মূল্যায়ন করবে। সময়সীমা—দশ মিনিট।

1. যে কোন ধরনের শক্তির অবিভাজ্য অংশের সাধারণ নাম (a) কোয়ান্টাম, (b) আর্গ, (c) জুল।

2. পিতল এক ধরণের ধাতু-সংকর। এর মধ্যে প্রধানত রয়েছে (a) তামা ও লোহার মিশ্রণ, (b) তামা ও জিংকের মিশ্রণ, (c) লোহা ও জিংকের মিশ্রণ।

3. কোন বস্তুর স্থির অবস্থায় যে ভর থাকে, সচল অবস্থায় তা

(a) বৃদ্ধি পায়, (b) হ্রাস পায়, (c) একই থাকে।

4. চাঁদে একটি বোমার বিস্ফোরণ হলে ঐ বিস্ফোরণের শব্দ পৃথিবীতে আসতে যে সময় লাগবে তা

(a) চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে যে সময় লাগবে তার সমান হবে, (b) চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্বের উপর নির্ভর করবে, (c) ঐ শব্দ পৃথিবীতে আসবে না।

5. ডিনামাইটে যে রাসায়নিক পদার্থ প্রধান উপাদান হিসেবে থাকে তার নাম

(a) নাইট্রোগ্লিসারিন, (b) নাইট্রোবেনজিন, (c) নাইট্রোটলুইন।

6. $\log_x x$-এর মান কত ?

(a) x (b) x^2 (c) 1

7. একটি সংখ্যার সঙ্গে ওর অন্যোন্যক (reciprocal) যোগ করলে যোগফল দাঁড়ায় $\frac{5}{2}$, ঐ সংখ্যা দুটির বিয়োগফল কত ?

(a) $2\frac{1}{2}$ (b) $1\frac{1}{2}$ (c) 1.

8 কোন ঘড়ির মিনিটের কাঁটা দশ মিনিটে যত ডিগ্রী কোণ ঘোরে তা হল

(a) 180 ডিগ্রী, (b) 30 ডিগ্রী, (c) 60 ডিগ্রী

9. বংশগতিসংক্রান্ত সূত্র যে নামে খ্যাত তার আবিষ্কারক

(a) মেণ্ডেলিন, (b) মেণ্ডেলিভ, (c) মেণ্ডেল

10. একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের শরীরে মোট লোহার পরিমাণ

(a) চার-শ' থেকে পাঁচ-শ' গ্রাম, (b) চার থেকে পাঁচ গ্রাম, (c) চার থেকে পাঁচ মিলিগ্রাম।

11. সবচেয়ে কম বয়েসে যে তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান তাঁরা হলেন

(a) পল আঁদ্রিয়ে মাউরিস ডিরাক, কার্ল ডেভিড অ্যানডারসন ও সান্‌গ্‌-ডো লী।

(b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. ভি. রামন ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

(c) নীলস বোর, মাডাম কুরী ও পিয়ারে কুরী।

12. ওজোন গ্যাস একটি

(a) মৌলিক পদার্থ, (b) যৌগিক পদার্থ, (c) মিশ্র পদার্থ।

13. 'অম্লরাজ' হল

(d) এক ভাগ ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড ও তিন ভাগ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ,

(b) সমআয়তনের ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ,

(c) তিন ভাগ ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড ও এক ভাগ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ।

14. দিক্ নির্ণয়ের জন্যে আকাশের যে তারাটির সাহায্য নেওয়া হয় তা হল

(a) লুব্ধক, (b) শুকতারা, (c) অত্রি।

15. কোন্ তরলের ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা পর্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকে, ঐ উষ্ণতা পেরোবার পর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে কমতে থাকে ?

(a) জল, (b) পারদ, (c) অ্যানিলিন।

16. উপরিউক্ত প্রশ্নে ঐ নির্দিষ্ট উষ্ণতাটি কত ?

(a) 0^0C (b) -4^0C (c) 4^0C

17. 'বুদ্ধ্যঙ্ক' (intelligence quotient)—এই শব্দটি বিজ্ঞানের যে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত তার নাম

(a ভূবিদ্যা, (b) মনোবিদ্যা (c) পদার্থবিদ্যা।

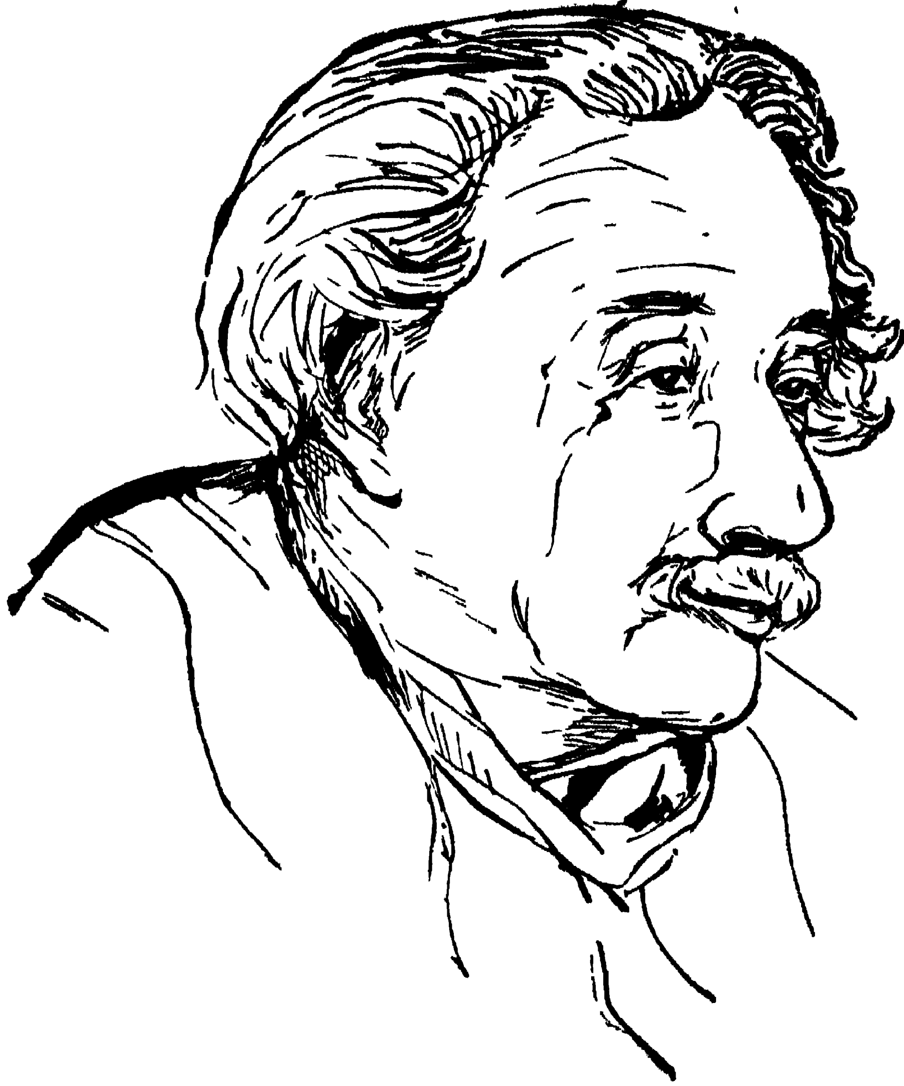
(সমাধান 388 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তুষারকান্তি দাশ*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। বিশ্ববিশ্রুত নাম। জগৎজোড়া খ্যাতি। বিজ্ঞান জগতে অভিনব প্রতিপত্তি। তাঁর পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ চিন্তার আলোয় শতাব্দীব্যাপী আলোকিত বিজ্ঞান জগৎ। বিজ্ঞানই



অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

শিল্পী—রঞ্জন দাস

ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও মোক্ষ। তাই সকলেরই কৌতূহল হয়—কি পরিবেশে তাঁর জন্ম, কি তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, তাঁর মানসিক পরিণতির কিভাবে ও কোথায় বিকাশ।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম 1879 সালের 14ই মার্চ, জার্মানীর উলমে শহরে এক ইহুদী পরিবারে। চলতি বছরই জন্মশতবার্ষিকী। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন শৈশব থেকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ

হয়ে থাকতেন প্রকৃতির রহস্যে। প্রকৃতি তাঁর আজীবন লীলাসঙ্গী, পার্থিব জৌলুসে তাঁর প্রচণ্ড অনীহা। এই প্রসঙ্গে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনষ্টাইনের যে মূল্যায়ন করেছিলেন তাঁর সারাংশ স্মরণীয়—"বরাবরই তিনি সাধারণ থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। যে উন্নতির দুরাশা সারাজীবন মানুষকে অস্থির করে, মাতিয়ে রাখে, তার অসারতা কিশোর বয়সেই তাঁর মনে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। অল্প বয়সেই তাঁর মন প্রথমে ঝুকেছিল ধর্মের দিকে। হঠাৎ বারো বছর বয়সে বিজ্ঞানের চলতি বই পড়ে তাঁর মনে হল, বাইবেলের কথা ও গল্প কখনও সত্য হতে পারে না। স্বাধীন চিন্তার দৌরাত্ম্যে মনে হল—ইচ্ছা করেই সমাজ চিরদিন মানুষের মন ভোলাবার জন্যে মিথ্যে প্রচার করে আসছে। সেই থেকে আপ্ত বাক্যে অবিশ্বাস তাঁর মজ্জাগত হয়ে উঠল। কোন ক্ষেত্রেই কোন চিরাচরিত মতবাদ বিচার না করে সহজে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি।" এই মূল্যায়নে তাঁর চরিত্র কত বৈচিত্র্যে ভরা তা আলোচ্য নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন মানবেতিহাসের ধারা পরিবর্তনকারী। তাঁর বাল্য ও কৈশোরের প্রচলিত কিংবদন্তী ভাবী মনীষার ইঙ্গিত বহন করে। নিম্নোক্ত উদাহরণেই তার নজীর মেলে। বয়েস সবেমাত্র পাঁচ। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত, বিছানায় ছট্‌ফট্ করছেন। অস্থিরতা ও অস্বস্তি নিবারণে বাবা ছেলের হাতে এনে দিলেন ছোট্ট একটি বাক্স। যার মধ্যে ছিল নৌ-কম্পাস। উদ্দেশ্য ভিতরের অবিরত ঘূর্ণায়মান কাঁটাটি তার মনে আনন্দ দেবে। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন তার ঘরবাড়ির বাইরে পৃথিবীর প্রান্তভাগের এক রহস্যময় প্রভাবে কাঁটাটি অবিরত ঘুরছে, তখন তিনি প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। এই হল বিজ্ঞানের রহস্যময় জগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও সখ্য। দ্বিতীয় ঘটনা কাকা জ্যাকবের আকস্মিক মন্তব্য বীজগণিতই হচ্ছে একধরণ অলসের পাটিগণিত। এই মন্তব্য তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বাবার প্রেরণায় সাহিত্যপ্রীতি, মায়ের অনুকরণ ও অনুরণনে সঙ্গীতপ্রীতি এবং কাকার ব্যঞ্জনায় গণিত ও বিজ্ঞানপ্রীতি তাঁর মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে ক্লান্তি নিবারণ ও চিত্ত বিনোদনের জন্যে যে তিনটি নিত্য বিষয় তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তা হচ্ছে প্রথমটি গণিতচর্চা, দ্বিতীয়টি বেহালার সুরের মূর্চ্ছনা এবং তৃতীয়টি সাহিত্যালোচনা।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনকে জীবন-সংগ্রামের ঝড়ো হাওয়ায় বাত্যাহত হয়ে ঘুরপাক খেতে হয়েছিল দেশ-দেশান্তরে। শৈশবের অরুণোদয় থেকে অস্তোন্মুখ বার্ধক্য পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বপথিকের ভূমিকার নায়ক। মিলানের শৈশবস্মৃতি, অ্যারউতে স্কুলজীবন, জুরিখের নির্বান্ধবতা ও মিউনিকের পারিবারিক সুখস্মৃতি হয়ে উঠত স্মৃতির পর্দায় এক একটি ছবি। সব ফেলে চলে এলেন প্রকৃতির লীলাভূমি সুইজার-ল্যান্ডে। রাজধানী বার্ণে চাকরী পেলেন 1902 সালে পেটেন্ট অফিসে। শুরু হল সুখের দিন। 1903 সালে মারিৎসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 1904 সালে প্রথম সন্তানের জন্ম হয়, 1905 সালে প্রকাশিত হল আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত প্রথম গবেষণাপত্র—ঘুরিয়ে দিল তাঁর জীবনের গতি। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলল এই আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। বিজ্ঞানীদের অভিনন্দনই জানিয়ে দিল এই তত্ত্বের স্বীকৃতি।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বটি কি? এই তত্ত্বের গাণিতিক দিকটি অত্যন্ত জটিল এবং অধিকাংশেরই ধারণার বাহিরে। তাই গণিতের অংশ বাদ দিয়ে সহজবোধ্য দিকটা আলোচনা করছি।

এই দুরূহ তত্ত্ব বিশ্লেষণে যে চারটি শব্দ বিশেষ সহায়ক ও ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে আলোক, বিশ্বজগৎ, কাল, চতুর্থ মাত্রা। এই শব্দগুলি এই তত্ত্বের চাবিকাঠি। প্রশ্ন হচ্ছে শব্দগুলির তাৎপর্য কি?

আলোক কি? দিবাভাগে আমরা যে আলোর সঙ্গে পরিচিত হই তা সূর্য থেকেই ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হয়। শুধু আলো নয়, সূর্য তাপও দেয়। সূর্য একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। তাপ ও আলো দুই বিকিরণ করে। উভয়ই শক্তির দুটি রূপ। আলোক শক্তির কোন কোন অংশ দৃশ্যমান। আবার কোন কোনটি দৃশ্যমান নয় যেমন তরঙ্গ, এক্স-রশ্মি।

বিশ্বজগৎ কি? সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্র নিয়েই এই বিশ্বজগৎ। এদের প্রত্যেকের পরিক্রমার পথ নির্দিষ্ট। নক্ষত্র ও গ্রহের মহাকাশে কখন ও কোথায় অবস্থিতি তা অঙ্কের সাহায্যে বলা যায়। এদের অবস্থিতি লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে তাই ছোট দেখায়। কিন্তু এদের সীমানার বিস্তৃতি কতদূরে তা কেউ জানে না!

'কাল' কি? কাল হচ্ছে মাইল বা ওজনের মত একটি পরিমাপক। দুটি শহরের মধ্যে ব্যবধানকে আমরা বলি দূরত্ব। অনুরূপভাবে দুটি-ঘটনার ব্যবধানই হচ্ছে কাল।

চতুর্থ মাত্রা এটা আবার কি? সাধারণ লোকের কাছে এর অর্থ কাল বা সময়। কিন্তু গণিতবিদদের কাছে এই কথাটি খুবই অর্থব্যঞ্জক। বিশ্বজগতে প্রত্যেকটি বস্তুই সব সময়ে গতিশীল। প্রতি মুহূর্তেই তাদের অবস্থিতি পরিবর্তিত হয়। তাই বিশেষ কোন গ্রহের অবস্থিতি নির্দেশ করতে হলে তিনটি মাত্রা পর্যাপ্ত নয়। কারণ গ্রহটি গতিশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—উড়ন্ত বিমানের অবস্থিতি—নির্দেশ করা যাক। প্রথমে উত্তর-দক্ষিণ, পরে পূর্ব-পশ্চিম দূরত্ব দেখব এবং এর পরে আমাদের জানতে হবে উচ্চতা। তাহলেই কি সব হল? নিশ্চয়ই না। আমাদের সময় বা কাল জানতে হবে। কারণ প্রতি সেকেণ্ডেই উড়ন্ত বিমান গতি ও অবস্থিতি বদলাচ্ছে।

আপেক্ষিকতা কথাটির অর্থই বা কি? এর অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বা অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা। আইনষ্টাইনের কথায় বলি—আমরা যখন কোন সময় বা স্থান পরিমাপ করি তখন আমাদের কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে হয়। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। এই আবর্তনের গতি পরিমাপ করা যায়। কিন্তু সূর্য তার গ্রহমণ্ডলীকে নিয়ে মহাকাশে কি গতিতে আবর্তন করছে তা পরিমাপ করতে পারা যায় না। কারণ মহাশূন্যে অবস্থান করে সৌরজগতের আবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। আমরা কোথায় অবস্থান করছি তার উপরই পরিমাপ নির্ভর করবে। মহাবিশ্বে একটি মাত্র গতি আছে যা আপেক্ষিক নয় তা হচ্ছে আলোর গতি। কোন বস্তুর গতির সঙ্গে তুলনা হয় না। যে গণিতের উপর ভিত্তি করে এই আপেক্ষিক তত্ত্ব সেই গণিতের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে—আলোর গতির অপরিবর্তনশীলতা এবং অপর বস্তুর সঙ্গে তার তুলনার অপ্রয়োজনীতা।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছিলেন সৃজনশীল। ধ্বংসের প্রতি ছিল তাঁর অসীম ঘৃণা। এক কথায় তিনি ছিলেন শান্তির পূজারী। এই অপরিবর্তনশীল গতি-তত্ত্বের জনককে জানাই শতবর্ষের প্রণাম।

প্রদীপকুমার দাস*

*2/C, নবীনকুণ্ডু লেন, কলিকাতা-700 009

ভিটামিন-সি সম্পর্কে কিছু তথ্য

ভিটামিন কি ?

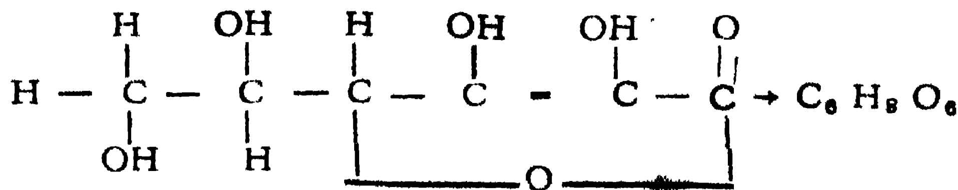
আমাদের শরীরের নানাবিধ জৈব ক্রিয়া ও পুষ্টির জন্যে শর্করা, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন ব্যতীত অন্য কতকগুলি জৈব পদার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে খাদ্যে থাকা অত্যন্ত দরকার। শেষোক্ত পদার্থগুলি দেহে প্রধানত নানাপ্রকার বিপাকক্রিয়ায় কো-এনজাইমরূপে বা অন্যভাবে সাহায্য করে, কিন্তু তারা দেহের প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণে সংশ্লেষিত হয় ; সেজন্যে খাদ্যে তাদের অভাব ঘটলে নানা প্রকার রোগ দেখা দেয়। এই বস্তুগুলিকেই ভিটামিন বলে।

দ্রাব্যতা অনুসারে ভিটামিনগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(1) জলে দ্রাব্য ভিটামিন যথা, ভিটামিন-সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ; ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স বা বি-বর্গীয় ভিটামিন ; (2) চর্বি-দ্রাব্য ভিটামিন যথা, ভিটামিন এ, ই, ডি, কে।

ভিটামিন-সি-এর ইতিহাস

লিন্ড 1757 সালে প্রথম স্কার্ভি রোগ বর্ণনা করেন। তার দেড়-শ' বছর পরে অর্থাৎ 1907 সালে হোলস্‌ট এবং ফ্রোলিক স্কার্ভি সম্পর্কে নানা পরীক্ষামূলক তথ্য প্রকাশ করেন। এর পর 1928 সালে 'জিলভা' লেবুর রসে অ্যান্টিস্করবিউটিক এজেন্টের উপস্থিতির কথা বলেন। সে বছরেই সেন্টগরগেই লেবুর রস থেকে হেক্সুরনিক অ্যাসিড নিষ্কাশন করেন। তার পর 1932 সালে ওয়াগ ও কিং বিজ্ঞানীদ্বয় হেক্সুরনিক অ্যাসিডকে অ্যান্টিস্করবিউটিক এজেন্ট হিসাবে দেখান। 1934 সালে 'হাওয়ার্থ' হেক্সুরনিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন নির্ণয় করেন। সে বছরেই রিস্‌টাইন হেক্সুরনি অ্যাসিডকে কৃত্রিমভাবে তৈরি (synthesize) করেন। সর্বশেষে 1933 সালেই হাওয়ার্থ ও সেন্টগর্গেই হেক্সুরনিক অ্যাসিডের অ্যাসকরবিক অ্যাসিড নামকরণ করেন।

ভিটামিন-সি এর আকৃতি ও ধর্ম



দেখতে সাদা পাউডারের মত ; গলনাঙ্ক—190°—192° সেণ্টিগ্রেড ; আণবিক ওজন—176·12 ; জলে 0·3 গ্রাম প্রতি মিলিলিটারে দ্রবণীয় ; বেঞ্জিন, ক্লোরোফরম, ইথানল প্রভৃতিতে অদ্রবণীয় ; স্ফটিক আকৃতিগুলি প্লেট বা সূচের মত ; সাধারণত সহজেই সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম কিংবা অন্য ধাতুগুলির (কতিপয়) সঙ্গে লবণ তৈরি করতে পারে ; রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এর লেকটোন রিং এবং

ইথানলিক হাইড্রক্সিল অংশগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; রাসায়নিক ধর্মে—হেক্সোজ অ্যাসিড ; জারণ-বিজারণ ক্ষমতার সূচক (redox potential)—$E_0 = \pm 0{\cdot}166$ ভোল্ট ; জলে অপটিক্যাল রোটেশন বা $\alpha^{25}_{D} = \pm 20{\cdot}5^{\circ}$; এবং অ্যাবজরপসন ম্যাক্সিমা −245 এম-মিউ (অ্যাসিড), 265 এম-মিউ (নিউট্রাল)।

জীবদেহে প্রকারভেদ

সাধারণত জীবদেহে দু-ধরনের অ্যাসকরবিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। যথা —(1) এল-অ্যাসকরবিক অ্যাসিড এবং (2) ডিহাইড্রো-অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।

তাছাড়াও বর্তমানে অনেকগুলি সমগোত্রীয় এবং সম্পর্কযুক্ত যৌগ পাওয়া যায়। যথা, এল-গ্লুকোঅ্যাসকরবিক অ্যাসিড, ডি-অ্যারাবোঅ্যাসকরবিক অ্যাসিড, এল-র‍্যামনো অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, 6-ডিঅক্সি-এল-অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (সবগুলি সচল সম্পর্কযুক্ত), ডি-অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (দুর্বল সম্পর্কযুক্ত)।

ভিটামিন-সি-এর ত্বরায়ক ও মন্দায়ক

এমন কিছু কিছু যৌগ আছে যেগুলি ভিটামিন-সি-এর কাজকে ত্বরান্বিত করে অর্থাৎ এগুলির উপস্থিতিতে ভিটামিন-সি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে। (এগুলিকেই ত্বরায়ক বা সিনারজিস্ট (synergists) বলে। যেমন পেন্টোথেনিক অ্যাসিড, টেস্টোস্টেরোন, ভিটামিন—ই, এ, বি$_{12}$, বি$_6$ কে, সোমেটোট্রপিন, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

অপর পক্ষে অন্য আরো কিছু যৌগ আছে যেগুলির উপস্থিতিতে ভিটামিন-সি তার স্বাভাবিক কাজ ঠিকভাবে করতে পারে না। অর্থাৎ কাজের গতি ধীর বা মন্দায়িত হয়ে পড়ে। (এগুলিকেই মন্দায়ক বা antagonists বলে)। যেমন—ডি-গ্লুকো-অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, ডি-অক্সি-করটিকোস্টেরোন ইত্যাদি।

ভিটামিন-সি কিসে কিসে পাওয়া যায়

(i) উদ্ভিদ (উচ্চ পরিমাণে) ঃ

(a) ফল—স্ট্রবেরী, লেবুজাতীয় সব ফল, আনারস, পেয়ারা, পশ্চিম ভারতীয় চেরী, ব্ল্যাক কারেন্ট।

(b) সব্জী—বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবুজ গাঁজর, টমেটো, কালে, অশ্বমূলো, করন, পারসলে, ব্রকোলি।

(c) ইংলিশ ওয়াল নাট, গোলাপগুচ্ছ, মোল্ড প্রভৃতি।

(ii) প্রাণী ঃ

সমস্ত রেটিনা, পিটুইটারি, করপাস লুটেনাম, অ্যাড্রিনাল করটেক্স, থাইমাস, লিভার, ব্রেন,

টেস্‌টিজ, ওভারি, প্লিন, থাইরয়েড, পেনক্রিয়া, সেলাইভারি গ্ল্যান্ড, লাঙস্‌, কিড্‌নি, ইনটেস্‌টাইন, হার্ট, মাংসপেশী বা মাস্‌ল্‌, শ্বেতকণিকা, লোহিত কণিকা, প্লাজ্‌মা।

(iii) জীবাণু:

ব্যাক্‌টিরিয়া, ইষ্ট, মোল্ড প্রভৃতির জীবিকানির্বাহের জন্যে কিছু পরিমাণ অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড দরকার। কিছু কিছু মোল্ড তা তৈরিও করতে পারে।

খাদ্যের কোন্‌ কোন্‌ জিনিসে কতখানি পেতে পারি

(i) উচ্চ মান (100—300 মি. গ্রা. / 100 গ্রাম)

সবুজ গাঁজর, পেয়ারা, গোলাপগুচ্ছ, মরিচ (মিষ্টি), অশ্বমূলো, কালে, পার্সলে, ব্রকোলি ব্রাশেল স্প্রাউট, ব্ল্যাক কারেট, কোলার্ডস।

(ii) মধ্যম মান (50—100 মি. গ্রা. / 100 গ্রাম)

সবুজ বিট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, খোলবাড়ী, সরষে, শাক, ওয়াটার ক্রেশ ইত্যাদি।

(iii) নিম্নমান (25-50 মি. গ্রা. / 100 গ্রাম)

অ্যাস্‌পারাগাস, লিমাবিন, সবুজ বিট, কাউপি, ওকরা, শীতকালীন পেঁয়াজ, মটর আলু, মুলো, গাজর, শয়াবিন, গজবেরী, লেবু, পেসানফল, আঙুর, ফল, লোগান বেরী, আম টমেটো, ফেনেল, চার্ড, সবুজ ডেনডিলায়ন প্রভৃতি।

দৈনিক খাদ্যে ভিটামিন-সি এর পরিমাণ

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ—60 মিলিগ্রাম

প্রাপ্ত বয়স্কা নারী—55 মিলিগ্রাম

গর্ভবতী বা স্তনদাত্রী নারী—60 মিলিগ্রাম

চার বছরের শিশু—40 মিলিগ্রাম

কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়ে—কোন রোগ সংক্রমণ হলে, অ্যালার্জিতে, বৃদ্ধবয়সে, অধিক প্রোটিন জাতীয় খাদ্য খেলে।

পুষ্টি ও বিপাকে ভূমিকা

সাধারণত প্রাণীদেহে কিড্‌নী ও লিভারে (প্রাইমেট, গিনিপিগ, ফ্রুট ব্যাট, বুলবুল ব্যতীত) এবং উদ্ভিদে সবুজ পাতা ও ফলফলাদির চামড়াতে অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড তৈরি হয়। কোষের যে অংশগুলিতে এ কাজটি সম্পন্ন হয় তা হলো গলগি, মাইক্রোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি। ডি-ম্যানোজ, ডি-ফ্রুকটোজ, গ্লিসারল, সুক্রোজ, ডি-গ্লুকোজ ডি-গেলাকটোজ এ-কাজে প্রাথমিক যৌগ (precursors) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পরে ইউ-ডি-পি-গ্লুকোজ, ডি-গ্লুকোরনিক অ্যাসিড ; গ্লুকোনিক অ্যাসিড, এল-গুলুনো-লেকটোন প্রভৃতি নানা মধ্যবর্তী যৌগের মধ্য দিয়ে (ম্যাঙ্গানীজ আয়ন সহকারী হিসাবে) অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। তার পর কিয়দংশ শরীরের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে জমা হয়। বাকী

অংশ শরীরের নানারূপ জৈবিক প্রক্রিয়াতে সরাসরি বা সহায়ক হিসাবে কাজে লাগে। যে যে কাজগুলি ভিটামিন-সি-এর দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে—

(1) কোলাজেন প্রস্তুতি। (2) ষ্টিরয়েড প্রস্তুতি।

(3) সেরোটোনিন মেলানিন প্রস্তুতি। (4) শ্বেতসার (polysaccharide) প্রস্তুতি।

(5) কোষ-সমষ্টির বিজারক (antioxidant)—ফলে নানা প্রকারের মেমব্রেন বা কোষ-প্রাকারের স্বাভাবিকত্ব সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসে জারণ-বিজারণ সহায়ক।

(6) মাইটোকনড্রিয়াতে ইলেকট্রন-ট্রান্সপোর্ট পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(7) ভিটামিন-ই এবং সালফহাইড্রিল এনজাইমের জন্য নিম্ন জারণ-বিজারণ মাত্রা বজায় রাখে।

(8) ফ্যাগোসাইটোসিস ত্বরান্বিত করে এবং অ্যান্টিমাইটোটিক এজেন্ট হিসাবে কাজ করে।

(9) জীবাণু দেহে লোহার গ্রহণ এবং ফেরিটিন যৌগ তৈরিতে সাহায্য করে। তাছাড়া অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, ডিম্বাশয়, অন্ডোক্রাইন গ্রন্থি, নানা প্রকার কৈশিক নালিতে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। হাড়, দাঁত, ক্ষত, রক্তক্ষরণ প্রভৃতিতে নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

(10) শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(11) দেহকলায় কোষগুলি যে সকল অন্তরকোষ সংযোজক পদার্থের (intercellular cementing substances) দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে, সে সকল পদার্থের উৎপাদন ও সংরক্ষণ অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের উপর নির্ভর করে।

ভিটামিন-সি-এর অভাব হলে কি, কি হতে পারে

(1) স্কার্ভি রোগ। (2) অস্থির দৌর্বল্য ও ভঙ্গুরতা।

(3) দন্তে দন্তাস্থির (dentine) উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে এবং দাঁত পড়ে যায়।

(4) মাড়ি ফুলে রক্তপাত হয়।

(5) যোগ-কলায় (connective tissue) কোলাজেন উৎপাদন ব্যাহত হয় ও ক্ষত নিরাময়ে বিলম্ব ঘটে।

(6) কৈশিক প্রণালীর ভঙ্গুরতা (capillary fragility) বৃদ্ধি পায় ও দেহমধ্যে সহজেই রক্তপাত হয়।

(7) অ্যালক্যাপ্টোনিউরিয়া রোগ হয় অর্থাৎ ভিটামিন-সি-এর অভাবে টাইরোসিনের বিপাকজনিত পদার্থগুলির জারণ ব্যাহত হয় এবং তার ফলে মূত্রে হোমোজেন্টিসিক অ্যাসিড নির্গত হতে থাকে।

(8) রক্তাল্পতা, ওজন হ্রাস, অনিয়মিত কোলাজেন প্রস্তুতি এবং দেহকলার কোষগুলিতে অন্তরকোষ সংযোজক পদার্থের অভাব ঘটে।

অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড অধিক মাত্রায় খেলে কি কি হতে পারে

সাধারণত মানুষের দেহে কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারে না। তবে সামান্য যা কিছু হতে পারে তা নিম্নরূপ—

(1) যাদের গাউট (gout) রোগ আছে, তাদের কিডনীতে পাথর হতে পারে।

(2) মাইটোসিসকে বন্ধ করে দিতে পারে।

(3) প্যানক্রিয়ার বিটা-কোষগুলির ক্ষতিসাধন করতে পারে।

(4) ডিহাইড্রো-অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের সাহায্যে ইনসুলিন তৈরি মন্দায়িত করতে পারে।

কি কি ভাবে ভিটামিন-সি নষ্ট হয়

(1) সব্‌জির পাতলা খণ্ড ও ফলের রসের অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড অক্সিডেজ এনজাইমের সংস্পর্শে এসে।

(2) রান্নার সময় তাপ ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারিত হয়ে।

(3) সেদ্ধ করার সময় কিছু পরিমাণ অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড খাদ্যবস্তু থেকে বের হয়ে অপচয় ঘটে।

বাণিজ্যিকভাবে ভিটামিন-সি কিভাবে প্রস্তুত করা হয়

(1) জীবাণু পদ্ধতি—অ্যাজোটোব্যাক্‌টর সাবঅক্সিডানস্‌ এর সাহায্যে ক্যালসিয়াম-ডি গ্লুকো-নেটকে জারণ-ফারমানটেশন করে।

(2) রাসায়নিক পদ্ধতি—এল-সরবোজকে জারিত করে।

কিভাবে বর্জিত হয় (excretion products)

মূলত মূত্রের সঙ্গে বর্জিত হয়। বর্জিত পদার্থ হিসেবে 12-14% থাকে এল-অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড, 12-18% থাকে ডাইকিটোগ্লুকোনিক অ্যাসিড, 24-63% অক্সালিক অ্যাসিড। তাছাড়া পায়খানা, ঘাম প্রভৃতির সঙ্গে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসাবেও কিছুটা নির্গত হয়।

কৃষ্ণ ঘোষ*

*বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

'ভেবে কর'-র সমাধান

1 (a), 2 (b), 3 (a), 4 (c), 5 (a), 6 (c),
7 (b), 8 (c), 9 (c), 10 (b), 11 (a), 12 (b),
13 (a), 14 (b), 15 (a), 16 (c), 17 (b).

মডেল তৈরি

ইলেকট্রনিক হারমোনিয়াম

সাধারণ হারমোনিয়ামে বেলো করে, অর্থাৎ বায়ুস্তরে কম্পন সৃষ্টি করে, সুর উৎপন্ন করতে হয়। এবং যতক্ষণ বেলো করা যায়, ততক্ষনই হারমোনিয়ামে সুর উৎপন্ন হয়। বেলো করা বন্ধ করে দিলে হারমোনিয়াম বন্ধ হয়ে যায়। ইলেকট্রনিক হারমোনিয়ামে কিন্তু বেলো করতে হয় না। এটা এক হাতে বা দু-হাতে বাজানো যেতে পারে। এখানে একটি সহজ ইলেকট্রনিক হারমোনিয়াম তৈরির ইঙ্গিত দেওয়া হল।

এর জন্য নিচের জিনিষগুলির প্রয়োজন ঃ

(i) একটি AC 128 ট্রানজিস্টর,

(ii) একটি আউট-পুট ট্রান্সফরমার (T_2) [যা সাধারণত ট্রানজিস্টর রেডিওতে ব্যবহৃত হয়।]

(iii) সাতটি 10K Ω Log মানের প্রি-সেট পোটেনশিয়োমিটার,

(iv) একটি 5 Ω মানের 5″ স্পিকার,

(v) একটি 27 K Ω, 1/4 Watt মানের রোধ,

(vi) ·220μF ; 12Volt মানের একটি কনডেনসার,

(vii) একটি অন্ / অফ্ সুইচ

(viii) 75 গ্রাম ওজনের পাতলা ব্রোঞ্জ বা পিতলের পাত,

(ix) একটি 9 ভোল্টের সমপ্রবাহ সরবরাহ,

(x) সংযোজক তার, ট্যাগ ও টুকিটাকি জিনিষ।

প্রথমে বর্তনী অনুযায়ী পছন্দমত স্যাসীর উপরে প্রয়োজনীয় অংশগুলি বসিয়ে যন্ত্রের মধ্যে তড়িৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এবার, ব্রোঞ্জ বা পিতলের পাত দিয়ে K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7 চাবিগুলি তৈরি করে প্রত্যেকটা চাবির উপরে পাতলা কাঠ অ্যাডেসিভ দিয়ে আটকে হারমোনিয়ামের এক একটি রিড্ তৈরি করে নিতে হবে।

এই ইলেকট্রনিক হারমোনিয়ামটি আসলে একটি শ্রুতিসীমার অন্তর্গত কম্পাঙ্কের আন্দোলক যন্ত্র। এখানে ট্রানজিস্টরের সাহায্যে ট্রান্সফরমারের মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্যে একটি পরিবর্তী (alternating) তড়িতের সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তী তড়িৎ আবার গৌণ কুণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত স্পিকার কে কম্পিত করে ; তাই স্পিকারে একটি শব্দ-তরঙ্গের আন্দোলন শোনা যায়। এই শব্দ-তরঙ্গের আন্দোলন নির্ভর করে প্রধানত বর্তনীর কনডেনসার, ট্রানজিস্টর রোধ ও তড়িৎ-প্রবাহের মানের উপর। এক্ষেত্রে কনডেনসার, ট্রানজিস্টর ও তড়িৎ-প্রবাহের মান স্থির রেখে বর্তনীর রোধের তারতম্য ঘটিয়ে স্পিকারে, শ্রুতিসীমার যে কোন কম্পাঙ্কের শব্দ-তরঙ্গ তৈরি করা যেতে পারে। বর্তনীর রোধ বৃদ্ধি করলে

কম্পাঙ্ক হ্রাস পায় এবং রোধ হ্রাস করলে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রোধ কম্পাঙ্কের সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

যন্ত্রটি তৈরির পর পোটেনশিয়োমিটারগুলি (P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7) ঘুরিয়ে স্পিকারে উৎপন্ন শব্দের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত করে, সুরগুলি অন্য কোন হারমোনিয়ামের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে অর্থাৎ টিউনিং (tuning) করে নিতে হবে। তা হলেই যন্ত্রটি ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। এখন S_1 সুইচ চালু করে কোন রিড্ টিপলেই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক অনুযায়ী মেলানো নির্দিষ্ট রোধ চাবির মাধ্যমে বর্তনীতে যুক্ত হবে এবং হারমোনিয়ামে সেই নির্দিষ্ট সুরটি উৎপন্ন হবে। তবে যন্ত্রটি ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন তড়িৎপ্রবাহের মান সব সময় নির্দিষ্ট থাকে। তা না হলে উৎপন্ন সুর ও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যন্ত্রটি পছন্দমত একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢেকে বহন ও ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক করা যেতে পারে।

কল্যাণ দাস*

*পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতিমাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'ডাক যোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়, উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4 টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.

2 **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**

3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন, প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ-বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আবেদন

অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগে পশ্চিম বাংলা বিপর্যস্ত। অতিবৃষ্টি, প্লাবন এবং বন্যায়—পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় এবং কলকাতাতেও গৃহহীন, অন্নহীন আর্ত মানুষের হাহাকার। এই সংকটের দিনে, জাতীয় পরীক্ষার দিনে সকলের সেবার হাত, আর্তিমোচনের হাত প্রসারিত হোক, দলমত নির্বিশেষে, মানবতার ডাকে। সরকারী প্রশাসন যতই তৎপর হোক, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষের সহযোগিতা না পেলে সংকটের সময়োচিত দ্রুত মোকাবিলা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ একটি 'ত্রাণ-তহবিল' সংগ্রহ করার কর্মসূচী নিয়েছে। বঙ্গীয় [illegible]ান পরিষদের হৃদয়বান সভ্য-সভ্যা শুভানুধ্যায়ীর কাছে একান্ত নিবেদন, তাঁরা সাধ্যমত অর্থসাহায্য প্রেরণ করে আমাদের এই কল্যাণব্রত সার্থক করে তুলুন।

প্রেরিত অর্থ সাহায্য 'কোষাধ্যক্ষ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ঠিকানায় পাঠাবেন, এবং রসিদযোগে তার প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। সংগৃহীত সমস্ত অর্থ 'মুখ্যমন্ত্রীর বন্যার্ত ত্রাণ তহবিলে' প্রেরিত হবে।

কলিকাতা
29শে সেপ্টেম্বর '78

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

18, অক্টোবর—22 অক্টোবর পর্যন্ত
যোগাযোগের ঠিকানা (সময় 12টা—3টা)
ডাঃ গুণধর বর্মণ।
কোষাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
(155/6, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিঃ-6)

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 9-10, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1978

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—সত্যজিৎ রায়




কেশুত্তে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারে একটি পাঠ্য-পুস্তক বিভাগ আছে।

* ✿ ✿ *

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এটি বেলা বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একত্রিংশত্তম বর্ষ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1978 নবম-দশম সংখ্যা

বিজ্ঞান-সাহিত্যে বাংলাভাষার অসম্পূর্ণতা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানের দৌলতে আজকাল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বের ব্যবধান একেবারে ঘুচে গেছে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিত্যনূতন ভাবধারা নিত্যনূতন আবিষ্কার—সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব দর্শন ও বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সম্পদ ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছে। দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় এসকল অভিনব ভাবধারা ও আবিষ্কারের খবর আমাদের কাছে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটে না। নূতন তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আগ্রহ অথবা নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ও আগ্রহের বশেই আজকাল আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করছি। এদেশেই হউক কি বিদেশেই হউক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি লিপি-বদ্ধ হয় বিদেশী ভাষায়। কিন্তু বিদেশী ভাষার সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত নন অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাঁদের তো, উৎসাহ কৌতূহল এবং কর্মদক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে পারে ; কাজেই এসব বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে আহরণ করে মাতৃ-ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করবার পথ সুগম করা দরকার। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার উপরেই এই আহরণের উদ্দেশ্যসিদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত না হলে একাজে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। বাক্যবিন্যাস, শব্দ চয়ন এবং পারিভাষিক শব্দ, ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন ; নচেৎ বর্ণনীয় বিষয়বস্তু দ্ব্যর্থবোধক হবার খুবই সম্ভাবনা। অনেকের ধারণা আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে এখন আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ মনীষিদের সাধনার ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য আজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। কিন্তু একথা সর্বাংশে প্রযোজ্য কিনা তা আজ বিচার করে দেখবার সময় এসেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উন্নতি লক্ষিত হলেও বাংলা ভাষায়

বিজ্ঞান-সাহিত্যের আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য বিষয়।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পূর্বাপর ইতিহাস বিবেচনা করলে এই প্রতিভাসম্পন্ন মনীষিরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন—তাতে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস নিয়েই সমগ্র সাহিত্যকে বিচার করলে চলবে না। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানের ব্যাপক ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়গুলিসহ সমগ্রভাবে দেখলে 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে'র কোথায় কতটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা সহজেই নজরে পড়বে।

আমাদের আলোচনা প্রধানত বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্যকে নিয়ে হলেও খাঁটি সাহিত্যকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কারণ কাব্য, নাটক, ছড়া, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি নিয়েই এ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের আসরে সাহিত্য পদার্পণ করেছে অতি অল্প দিন। সবে মাত্র এর শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। খাঁটি সাহিত্যের সঞ্জীবনী শক্তিই বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। কাজেই আপন প্রাণধর্মে প্রবর্ধমান আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অতি আধুনিক ভাষা ও তথাকথিত প্রগতি সাহিত্যের যে বিদ্রোহ দেখা যাচ্ছে তার ফলে এই অপরিণত শাখা-প্রশাখাগুলির গুরুতর অনিষ্ট-ঘটবার কারণ দেখা দিয়েছে।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যে প্রাচীন ও নবীন মনোভাবের দ্বন্দ্ব বহুকাল চলবার পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবীনের বিজয় ঘটেছিল। ওই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভাবধারা এসে বাঙালীর চিত্তকে প্লাবিত করেছিল। নিজ ভাষায় সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রথম যে গদ্যভাষা দাঁড়াল সংস্কৃত বাহুল্যে তা চলতে অক্ষম আর বাক্যরীতিও তার ছিল আড়ষ্ট। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ গদ্য লেখকগণের হাতে বাংলাভাষা প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়ে উঠল। তার পর এলেন মধুসূদন এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিম। সাধুভাষায় গদ্য রচনা বঙ্কিমের হাতে দ্রুত বিকশিত হল। অবশ্য এ সময়ের এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য বহু খ্যাতনামা লেখক বাংলাভাষার উন্নতিবিধান করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফলেই বাংলাভাষা ও সাহিত্য আজ লোকচক্ষে এতটা গৌরবের আসন দাবী করতে পেরেছে। একেই আমরা আধুনিক সাহিত্য বলছি, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমে যার উন্মেষ আর রবীন্দ্রনাথে যার অপূর্ব পরিণতি; এরই বিরুদ্ধে আজ কিছু অতি আধুনিক প্রগতিশীলতার নামে ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই যে প্রবীণে-নবীনে দ্বন্দ্ব—এ যেন বাস্তবের বিরুদ্ধে অবাস্তবের অভিযান। এই নব অভিযানের ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ হচ্ছে, না ক্রমবিনাশ হচ্ছে তা নির্ধারণ করবার সময় এখনও আসে নি বটে, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের নূতন পথে বেপরোয়াভাবে চলায় একটা অনিবার্য সঙ্কট আছে একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি এই অতি আধুনিক তথাকথিত প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে কতটা অনুকূল বা প্রতিকূল, তা বিশেষভাবে চিন্তা করবার কারণ আছে। উদ্ভিদ ও জীবজগতের অভিব্যক্তির মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। বহুবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করে আকস্মিকভাবে—'মিউট্যান্ট'-রূপে। 'মিউট্যান্ট' মূল পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত একটা ভিন্ন জাত হতে পারে কিন্তু মূল পদার্থ নয়। অতি আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য যেন আধুনিক ভাষার একটা 'মিউট্যান্ট' কিন্তু তাতে তার প্রাণধর্মের অস্তিত্ব নেই। যেন ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর বশেই এটা উদ্ভূত হয়েছে।

এটা মূলবস্তুর ক্রমবিকশিত অবস্থা নয় এটাকে আকস্মিক বা অভিনব বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে মাত্র।

প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজন। নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলাই রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়। যাঁরা প্রচলিত নিয়ম-বিধিকে অগ্রাহ্য করে চলেন, তাঁদেরও একটা নিয়ম বিধি অনুসরণ করতে হয়। সেটা অতীতের নিয়ম না হয়ে বর্তমান নিয়ম হতে পারে—এ পর্যন্ত। যাঁরা প্রগতি বলতে পুরনো সবকিছুই ভাঙ্গবার পক্ষপাতী তাঁরাই যেন বর্তমান ভাষাটাকে দুমড়ে-মুচড়ে একটা কসরৎ দেখাবার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছেন। এই হেঁয়ালীর ভাষা ব্যঙ্গকৌতুক, রঙ্গরসে চলতে পারলেও বিজ্ঞান সাহিত্যে তা একেবারেই অচল।

বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভাষার আদর্শ কি হবে তা বলা মুশকিল। পুস্তকাদিতে আজকাল সাধুভাষা ও চলতি ভাষা উভয়েরই প্রচলন দেখা যায়। বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রেও ভাষা সম্পর্কে অনেকেই খেয়ালখুশীমত বলছেন। অবশ্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলাসাহিত্য আজও এমন উন্নত পর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি, যার আদর্শে এর কোন মানদণ্ড নির্ধারিত হতে পারে। সাধারণ সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন—চলিত ভাষার প্রাণ অনুভূতির তারল্য আর সাধুভাষার প্রাণ অনুভূতির গভীরতা। যেখানে ভাবের স্বরূপ প্রকাশ অপেক্ষা বাস্তব ছবি প্রকাশের প্রয়োজন বেশি, সাধারণ সাহিত্যে সেখানে ইঙ্গিতবহুল সাধুভাষার সাহায্য না নিয়ে চলিত ভাষার আশ্রয় নেওয়াই কর্তব্য। যেখানে রূপের প্রকাশ অপেক্ষা ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা দরকার সেখানে সাধু ভাষার ছন্দ, ভঙ্গিমা এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের চারদিকে যে ভাবরাশি সংশ্লিষ্ট রয়েছে তা গুরুত্ব ও মহত্বব্যঞ্জক হতে পারে। কিন্তু কোন জটিল রহস্য বোঝাতে সময় সময় ভাবের সাহায্য প্রয়োজন হলেও বিজ্ঞানের কারবার প্রধানত নিছক বাস্তবকে নিয়ে। কাজেই যথাসম্ভব সরল ভাষায় তার নিখুঁত বর্ণনা প্রয়োজন। বঙ্গীয় লেখক সাধারণ যে ভাষার সঙ্গে পরিচিত বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে তারই অনুসরণ করা কর্তব্য। রচনা-কৌশল ও বাক্যবিন্যাসের কসরৎ দেখাতে গিয়ে ব্যাসকূট সৃষ্টির ফলে বিষয়বস্তু যাতে দ্ব্যর্থবোধক না হয়ে পড়ে সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাহিত্যের ভাষার আলোচনা করলেই দেখা যাবে, এদিকে বাংলা ভাষার অসম্পূর্ণতা কতখানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা প্রবন্ধাদিতে ভাষার স্বাচ্ছন্দ সাবলীল গতির অভাব লক্ষিত হয়ে থাকে, তাছাড়া প্রকাশভঙ্গীর দুর্বলতায় বর্ণনীয় বিষয় অস্পষ্ট অথবা দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশেই তো এদেশে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চা শুরু হয়েছে অল্প দিন। তার উপর ওসব দেশে বিজ্ঞানানুশীলনে দ্রুত ক্রমোন্নতি হচ্ছে। এই অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে না চলেও আমাদের উপায় নেই—এ সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিজ্ঞান-সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি অত্যাবশ্যক। এবিষয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা আমাদের পদে পদে বাধা দিচ্ছে। এতকাল বিদেশী ভাষাতেই সব রকম বিজ্ঞানানুশীলন চলে আসছিল। মাতৃভাষাতে যা কিছু আরম্ভ হয়েছিল তাও অতি মন্থর গতিতে। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করলেও কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটকের মত—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ব, নৃতত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিস্তৃত ক্ষেত্রে এ সাহিত্যে অনুরাগের অভাব লক্ষিত হচ্ছিল। বর্তমানে এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ দেখা যাচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্প্রতি প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক বিষয়-গুলি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষণীয় করবার ব্যবস্থা করেছেন। এ খুবই আশার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এযাবৎ বাংলাভাষায় যে সকল পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছে উপযুক্ত বাক্যবিন্যাস ও পারিভাষিক শব্দের অভাব এবং প্রকাশভঙ্গীর

আড়ষ্টতায় অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়ে উঠেছে দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালির মত। কোন কোন স্থলে মনে হয়—বাংলা ভাষায় না লিখে ফার্সীতে লিখলেও বোধ হয় অধিকতর সহজবোধ্য হত। এরূপ ক্ষেত্রে ভাষার জটিলতার ভিতর থেকে বিষয়বস্তু উদ্ধার করতে না পেরে পড়বার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক—অনেকেরই বিজ্ঞানাতঙ্ক উপস্থিত হয়ে থাকে। একারণেই বোধ হয় এদেশে এত বিজ্ঞান-বিমুখতা দেখা যায়।

উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাব বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্যের অগ্রগতির পথে একটা মস্ত বাধা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় এই অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হলেও এখনও অনেক কিছু করবার রয়েছে। কেউ কেউ এবিষয়ে শ্রুতিকটু হলেও সমানার্থক শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী, কেউ ভাবার্থ প্রকাশক, কেউ শ্রুতিমধুর—কেউ ইংরেজী শব্দের আক্ষরিক পরিবর্তনে বিদেশী শব্দ গ্রহণে পক্ষপাতী। বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে বাংলাভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি সাধারণ স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই সম্ভব। কতগুলি শব্দ আক্ষরিক পরিবর্তনে গ্রহণ এবং সম্ভব হলে উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়নে এই সমস্যার সহজেই সমাধান হতে পারে। যেমন oxygen-কে অম্লজান, hydrogen-কে জলজান বা উদজান বলা শোভন, কিন্তু chlorine-কে কুলহরিন, chloride-কে ক্লোরিদ এবং oxide-কে অক্সিদ বললে আক্ষরিক পরিবর্তনে এমন কি অসুবিধা ঘটতে পারে। বিশেষত ঐ রীতি অনুসারে carbon-dioxide-কে অঙ্গারাম্ল বললে Dimethy (amino-benzol debyde)-কে কি বলা হবে? ওই হিসাবে electron-কে বিদ্যুতিন বা ঋণকণিকা, proton-কে ধনকণা এবং neutron-কে নিস্তড়িৎ কণা বললে meson and messatron-কে কি বলা যেতে পারে? Biology-তে ablinos বললে এক প্রকার বিশেষ শ্বেতকায় প্রাণী বোঝায় অথচ সাধারণ শ্বেতকায় প্রাণীমাত্রই অ্যালবিনো নয়। mutant শব্দটাও এরূপ। এস্থলে আক্ষরিক রূপান্তর গ্রহণ করা উচিৎ নয় কি? মোটের উপর খাঁটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাভাষা ও সাহিত্য উন্নত পর্যায়ে আরোহণ ক লেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজও তা নিম্নপর্যায়ে রয়ে গেছে। মাতৃভাষানুরাগী প্রত্যেকেরই এবিষয়ে অবহিত হওয়া উচিৎ।*

*1942 সালে রচিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দজুট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে কার্যকরী সম্পাদকের নামে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয়ে (পি 23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) হাতে বা ডাকযোগে প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।

প্রাণের স্ফুরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা— অতীতে ও বর্তমানে

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

অ্যান্টনি ভ্যান লাভেনহুক (1632-1723) ছিলেন হল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডেলফ্‌ট-এর সিটি হলের সামান্য একজন দ্বাররক্ষী। বলতে গেলে অশিক্ষিত। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী এবং অত্যন্ত খেয়ালী। তিনি শুনেছিলেন স্বচ্ছ কাচ ঘষে ঘষে লেন্‌স-এর (বা, আতশী কাচের) আকার দিলে, তার ভিতর দিয়ে ছোট্ট জিনিসকে অনেক বড় দেখায়। তাঁর শখ হল, অনেকদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাচ ঘষে ঘষে একটি লেন্‌স তৈরি করলেন। ধাতু-নির্মিত একটি নলের মধ্যে এই লেন্‌স বসিয়ে সুন্দর একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (বা, অণুবীন) (simple microscope) বানালেন।

এর পর তার আশেপাশে যা কিছু দেখেন, তাই তাঁর অণুবীনের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তিমিমাছের মাংসপেশী পরীক্ষা করলেন, গায়ের মরা চামড়া তুলে দেখলেন, আর দেখলেন বিভিন্ন প্রাণীর গায়ের লোম। ছোট্ট ছেলের মত অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, সুতোর মত সরু একটি ভেড়ার লোম তাঁর অণুবীনের নিচে দেখাচ্ছে অমসৃণ একটি গাছের গুঁড়ির মত! তিনি মৌমাছির হুল এবং উকুনের পা পরীক্ষা ক'রে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে বারবার এগুলি পরীক্ষা করেন, আর বলে ওঠেন,—"অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!"

এই নমুনাগুলি তাঁর অণুবীনের তলায় বসানো রইলো মাসের পর মাস ধরে। নতুন নতুন জিনিস পরীক্ষা করার জন্যে তিনি আবার নতুন করে অণুবীন তৈরি করতে বসলেন। তাঁর শখ ক্রমে ছেলেমানুষী নেশায় পরিণত হল। ধীরে ধীরে তাঁর ছোট্ট ঘরটি শত শত শক্তিশালী অণুবীনে ভরে গেল। এদের প্রত্যেকটির নিচে বসানো রইলো এক একটি অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু।

দৈবাৎ একদিন বাগানের নোংরা জল পরীক্ষা করে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দেখলেন, তার মধ্যে অসংখ্য কীটাণু কিলবিল করছে। লাভেনহুক এই সব কীটাণুদের সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন লক্ষ্য করলেন যে, গোলমরিচের গুঁড়ো তিন সপ্তাহ ধরে জলে ভিজিয়ে রাখলে, সেই জলের একটিমাত্র ফোঁটায় লক্ষ লক্ষ কীটাণু (বা, জীবাণু) দেখা যায়। 1683 সালে তিনি দাঁতের গোড়া থেকে জমাট ময়লা তুলে এনে পরীক্ষা করেন, এবং তাতে লম্বা লম্বা কাঠির মত কতকগুলি জীবাণু দেখতে পান। কিন্তু এসবের সঙ্গে দাঁতের রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেন নি।

লাভেনহুক দিনের পর দিন ধরে নানারকম জীবাণুর বিচিত্র জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করেন, আর তাদের বিবরণ লিখে পাঠান লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কাছে। এই সব বিবরণ ছাপা হয় ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজাক্‌শন-এর বিভিন্ন সংখ্যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কিন্তু প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যে এই সব জীবাণুর আবির্ভাব হয় কি করে, এ প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করতে পারেন নি। তাছাড়া নানা ধরনের জীবাণুই যে মানুষের নানারকম ব্যাধির কারণ হতে পারে, এ-কথাও তাঁর কখনও মনে হয় নি। ভগবানের

*রসায়ন বিভাগ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-700 004

রাজ্যে যে এমন একটি বিচিত্র জগৎ আছে, আর সেখানে এমন সব বিচিত্র জীবাণু আছে, এইটুকু জেনে তিনি খুশী ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল,—এসব ক্ষেত্রে প্রাণের স্ফুরণ হয় কি করে? আগেকার দিনে এনিয়ে তুমুল বাদানুবাদ চলতো। একদল বিজ্ঞানী বলতেন, প্রাণের স্ফুরণ হয় আপনা থেকেই। কিন্তু আর একদল বলতেন, না, তা কখনই সম্ভব নয়। অ্যারিস্টটলের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকও প্রথমোক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক হগবেন তাঁর 'Science for the Citizen' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,—"জনন সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতবাদ সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(1) যাদের জন্ম জনক-জননীর মিলনের ফলে, এবং (2) যাদের জন্ম হয় কাদা, বালি, জল, মলমূত্র বা উদ্ভিদের রস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে যারা ডিম্বজ (oviparous) (অর্থাৎ, যারা ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম থেকে সন্তানের জন্ম হয়), তাদের থেকে জরায়ুজ (viviparous) প্রাণীদের (অর্থাৎ, মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের) অনায়াসে পৃথক করা যায়। ডিম বলতে অ্যারিস্টটল বোঝাতে চেয়েছেন এমন জিনিস যা খালি চোখেই দেখা যায়, এবং যা কমবেশি মুরগির ডিমের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যৌন-মিলন ঘটেছে, কি ঘটে নি, তার উপর নির্ভর করে এই ডিম নিষিক্ত, অথবা অনিষিক্ত, যে-কোন রকম হতে পারে।"

সপ্তদশ শতাব্দীতেই রেডি নামক একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী একটি সহজ পরীক্ষা করেন। তিনি দু-খণ্ড মাংস নিয়ে দুটি জারে রাখলেন। প্রথম জারের মুখ খোলা রাখলেন, কিন্তু দ্বিতীয় জারের মুখ এক টুকরো কাপড় দিয়ে ভাল করে বন্ধ করে দিলেন। খোলা জারের মধ্যে মাছি যাতায়াত শুরু করে দিল, কিন্তু দ্বিতীয় জারে কোন মাছি প্রবেশ করতে পারল না। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, খোলা জারে অবস্থিত মাংসে মাছির পোকা (maggot) কিলবিল করছে। কিন্তু দ্বিতীয় জারে এরকম কোন পোকা দেখা গেল না। এতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল যে, মাংসে আপনা থেকে এই সব পোকার আবির্ভাব হয় না। বহিরাগত মাছি মাংসে ডিম পাড়ে এবং পরে সেই ডিম থেকেই এইরূপ পোকার জন্ম হয়।

ঐসময় নীডহাম নামে এক ধর্মযাজক ছিলেন। তিনিও অ্যারিস্টটলের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে তিনি একটি প্রমাণও দাখিল করেন। উনুনের উপর থেকে গরম মাংসের সুপ (বা ঝোল) নিয়ে একটি বোতলে পুরলেন, এবং তার মুখ ছিপি এঁটে বন্ধ করে রাখলেন। কয়েক দিন পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল, সুপের মধ্যে নানা আকারের অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে। আপনা থেকে প্রাণের আবির্ভাব আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন তিনি। কি অদ্ভুত আবিষ্কার!

এজন্যে তখন অনেকেই বলতে লাগলেন যে, ডিম থেকেই মাছির জন্ম হয়, একথা ঠিক, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবের বেলায় সেরকম হয়তো না-ও হতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্ভব কি না, তাই নিয়ে তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়ে গেল।

নীডহামের পরীক্ষার বিবরণ অচিরেই ইতালীয় বিজ্ঞানী স্প্যালানজানির (1729-99) দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর মতে, নীডহামের পরীক্ষায় কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। যেমন, সুপ গরম করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই উত্তাপ জীবাণু ধ্বংস করার মত যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া বোতলের মুখ বন্ধ করার জন্যে যে কর্ক (বা, ছিপি) ব্যবহার করা হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল। কাজেই বাইরের বাতাস থেকে বোতলের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করতে কোন বাধা ছিল না। নীডহামের পরীক্ষা যে ত্রুটিপূর্ণ

ছিল, তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে স্প্যালানজানি নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করলেন।

ফ্লাস্কের (বা কাচকূপীর) মধ্যে মাংসের স্যুপ নিয়ে তার মুখটি তিনি গালিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তার পর ঐ ফ্লাস্ক এক ঘণ্টা ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখে দিলেন। কয়েক দিন পরে ঐ স্যুপ পরীক্ষা করে দেখলেন, তার মধ্যে কোন জীবাণু নেই।

স্প্যালানজানির এই পরীক্ষায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল যে, আপনা থেকে প্রাণের স্ফুরণ সম্ভবপর নয়। পচনশীল পদার্থে প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হয় বাতাস থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরাসী নিসর্গবিদ্ বুঁফো নীডহ্যামের ভুল তথ্যকে ভিত্তি করেই প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে পর্বতপ্রমাণ দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করালেন। ইউরোপের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও তাঁর বাক্‌চাতুর্যে ভুলে গেলেন। এর ফলে স্প্যালানজানির মতবাদ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করল না। প্রায় এক-শ' বছর ধরে বুঁফোর মতবাদই প্রাধান্য বিস্তার করে রইল। একথা ভাবতেও আজ অবাক লাগে!

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করলেন ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (1822-95)। তিনি প্রথমে একটি সহজ পরীক্ষা করেন। একটি কাচের নলে পরিষ্কার সাদা তুলো গুঁজে তার অন্য দিক থেকে বাতাস টেনে নিলেন। বাতাসের ধুলোবালি জমে সাদা তুলো কালো হয়ে গেল। এজন্যে পাস্তরের মনে হল, বাতাসে যদি এত ধুলোবালি থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না, তবে তার সঙ্গে জীবাণুই বা থাকবে না কেন? আর এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের স্যুপে ঢুকে পড়ে, তবে তার ক্রিয়ায় স্যুপের পচন হবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু পাস্তরের এই মতবাদ শুনে বিজ্ঞানীরা তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন। অতএব পাস্তর তাঁর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলেন। একটি ফ্লাস্কে (বা, কাচকূপীতে) মাংসের স্যুপ নিয়ে তা ভাল করে ফোটালেন। তারপর কয়েকটি কূপীর মুখ গালিয়ে বন্ধ করে দিলেন, আর কয়েকটি খোলা রাখলেন। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, শুধু খোলা কূপীর স্যুপে জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে, অপর দিকে মুখবন্ধ কূপীগুলি অবিকৃত রয়েছে।

কিন্তু যাঁরা প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা পাস্তরের এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, ফোটাবার ফলে ফ্লাস্কের (বা, কূপীর) অভ্যন্তরের আবহ (বা বায়ু) এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে (অর্থাৎ, কূপী বায়ুশূন্য হয়ে গেছে) যে, তার মধ্যে কোন জীবের পক্ষেই আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর এই কারণেই ঐসব কূপীর স্যুপে প্রাণের স্ফুরণ হয় নি।

বিজ্ঞানীদের এই আপত্তি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে পাস্তর কতকগুলি নতুন ধরনের ফ্লাস্ক (বা কূপী) তৈরি করলেন। গলা বকের মত লম্বা আর সরু। গলাটা প্রথমে খানিকটা নিচের দিকে নেমেছে, কিন্তু বেঁকে আবার উপর দিকে উঠে গেছে। এই সরু মুখ দিয়ে বাইরের বাতাস ঢুকবে। কিন্তু বাঁকের মুখে ধাক্কা খেয়ে ধুলোবালি সব আটকে থাকবে, কূপীর মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

পাস্তর এসবের মধ্যে মাংসের স্যুপ নিয়ে ভাল করে ফোটালেন। স্যুপ জীবাণুশূন্য হল। এরপর ছোট্ট একটি শিখার সাহায্যে কূপীর খোলা মুখ গালিয়ে বন্ধ করে দিলেন। 1860 সালের গোড়ার দিকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে কূপীর মুখ খুলে আবার তখনই বন্ধ করে দেওয়া হল। কিছু দিন পরে দেখা গেল, যেগুলি ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরে (cellar) খোলা হয়েছিল, তাদের দশটির মধ্যে নয়টিই ভাল আছে, পচে নি। কিন্তু যেগুলি বাইরের বাগানে খোলা হয়েছিল, সেগুলি সবই পচে গেছে। তাদের মধ্যে জীবাণু কিলবিল করছে। এর ফলে পাস্তরের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, বাতাসে ধুলোবালির সঙ্গে জীবাণুও থাকে। আর এই জীবাণু যদি কোন

প্রকারে মাংসের স্যুপে ঢুকে পড়ে, তাহলেই স্যুপের পচন হয়।

এরপর পাস্তুর ভাবলেন, ধুলোবালির সঙ্গেই যদি জীবাণু থাকে, তাহলে আকাশের যত উপর দিকে ওঠা যাবে, স্যুপের পচনের সম্ভাবনাও তত কমে যাবে। এ বিষয়েও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এজন্যে কুড়িটি স্যুপভর্তি কুপী নিয়ে তিনি পপেত্ত পাহাড়ে উঠলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 850 মিটার উপরে। এদের মুখ খুলে তখনই আবার বন্ধ করে রাখলেন। মাত্র পাঁচটি কুপীর স্যুপ খারাপ হল। এরপর কুড়িটি স্যুপভর্তি কুপী নিয়ে তিনি আল্প্স পাহাড়ে উঠলেন, মানুষের বসবাসের সীমা ছাড়িয়ে আরও অনেক উপরে। অত্যন্ত সাবধানে এদের মুখ খুলে তখনই আবার বন্ধ করে দিলেন। এই কুড়িটির মধ্যে মাত্র একটির স্যুপ খারাপ হল। বাতাসের ধুলোবালির মধ্যে জীবাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন।

ফ্রান্স চিরকালই সুরার জন্যে বিখ্যাত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আঙুর থেকে সুরা তৈরি করে আসছে। আঙুর পিষে একটি ভাঁটিতে রেখে দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই রস গেঁজে ওঠে এবং সুরায় পরিণত হয়। এর কারণ কি? পাস্তুর এ-সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলেন।

পাস্তুর দেখলেন, আঙুর যখন পাকে, তখন তার গায়ে সাদা একরকম ছাতা পড়ে। এই ছাতার মধ্যে থাকে একরকম উদ্ভিদাণু। এর নাম খমির বা সুরাসার (yeast)। আঙুরের সঙ্গে এদেরও পেষা হয়, ভাটিতে এদেরই ক্রিয়ায় আঙুরের গ্লুকোজ (বা, দ্রাক্ষা ও শর্করা) সুরায় পরিণত হয়। সেই সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ উঠতে থাকে বলে প্রচুর ফেনার সৃষ্টি হয়। মনে হয়, দ্রবণটি যেন ফুটছে। একে বলা হয় কিণ্বন প্রক্রিয়া (**fermentation ; GK.** ***Fervere*** **— to boil**)।

আঙুরের গায়ে এই উদ্ভিদাণু আসে কোথা থেকে? পাস্তুর বললেন, এই উদ্ভিদাণুর বীজ ছড়ানো আছে বাতাসে। সেখান থেকেই তা আঙুরের গায়ে অঙ্কুরিত হয়। পরীক্ষার সাহায্যে একথা তিনি প্রমাণও করলেন। আঙুর পাকবার আগেই তার গায়ে তুলো জড়িয়ে বেঁধে রাখলেন। আঙুর যখন পাকলো, তখন দেখা গেল, তার গায়ে কোন ছাতা নেই। এই আঙুর পিষে তার রস ভাঁটিতে রাখা হল। কিন্তু তা গেঁজে উঠল না, সুরাতেও পরিণত হল না। এতদিনে সুরা তৈরি হওয়ার প্রকৃত কারণ জানা গেল।

এই সময় পাস্তুরের এক ছাত্র এসে খবর দিল, তার বাবার সুরাশিল্প নষ্ট হতে বসেছে। কারণ, ভাঁটিতে আঙুরের রস টকে যাচ্ছে, সুরায় পরিণত হচ্ছে না। পাস্তুর ভাঁটির রস এনে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করে দেখলেন, যে রস টকে গেছে, তার মধ্যে খমির নেই, তার বদলে রয়েছে খুব ছোট সরু কাঠির মত একপ্রকার জীবাণু। কতকগুলি একসঙ্গে দলা পাকিয়ে রয়েছে, আবার কতকগুলি নড়ছে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোঝা গেল, এদের ক্রিয়াতেই আঙুরের রস টকে যাচ্ছে। নানা রকম পরীক্ষা করে পাস্তুর দেখলেন, আঙুরের রস কিছুক্ষণের জন্যে গরম করে রাখলে ($50^{0}-60^{0}$ সে.) এই জীবাণু মরে যায়। তখন এর সঙ্গে অল্প একটু খমির মিশিয়ে রেখে দিলেই তা সুরায় পরিণত হয়, টকে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পাস্তুরের উপদেশ অনুসরণ করায় ফ্রান্সের সুরাশিল্প রক্ষা পেল। আর পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

এর পর পাস্তুর দেখালেন, দুধে এক প্রকার জীবাণু থাকে, যার জন্যে দুধ টকে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি দুধ জীবাণুমুক্ত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এই পদ্ধতিতে দুধ গরম করে তার পর হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা করা হয় (**chilled**) এর ফলে দুধ জীবাণুশূন্য হয়ে যায়। এর নাম 'পাস্তুরিতকরণ' (**pasteurization**)। এইরূপ দুধ অনেক বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকে।

1865 সালে ফ্রান্সের রেশমশিল্প এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হল। মারাত্মক পেব্রিন রোগে রেশমকীট দলে দলে মারা যেতে লাগল। পাস্তুরের উপর এর প্রতিকারের ভার পড়ল। পরীক্ষার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রোগগ্রস্ত কীটের দেহে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। তাঁর নির্দেশমত রোগগ্রস্ত কীটগুলি ধ্বংস করার এবং সুস্থ কীটগুলিকে তাদের সংস্রব থেকে মুক্ত করে রাখার ব্যবস্থা করা হল। এইভাবে ফ্রান্সের রেশমশিল্প নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। আর একথাও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল যে, একপ্রকার জীবাণুর সাহায্যেই মারাত্মক পেব্রিন রোগ সংক্রামিত হয়। এর ফলে পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল বলা যায়। সুতরাং, এই আবিষ্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর থেকেই পাস্তুর প্রচার করতে লাগলেন যে, বায়ুবাহিত নানাপ্রকার জীবাণু দৈবাৎ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বংশবিস্তার করতে থাকে। আর তাদের ক্রিয়াতেই নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তাই তাঁর এই মতবাদ কেউ গ্রহণ করল না। তবে পাস্তুরের গবেষণার ফলে একটি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই অন্ধকার অজানা পথে অভিযাত্রীদের আনাগোনা শুরু হল। এবিষয়ে যিনি সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করলেন, তিনি হলেন জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক (1843—1910)।

ইউরোপের দেশে দেশে তখন গরু-ভেড়ার মড়ক লেগেছে। মারাত্মক অ্যান্থ্রাক্স রোগ এক একটি গ্রামে ঢোকে আর পালকে পাল গরু-ভেড়ার মৃত্যু হয়। এই রোগের কারণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে কক্ গবেষণা শুরু করলেন। একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (বা, অণুবীনের) সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কক্ বুঝতে পারলেন যে, অ্যান্থ্রাক্স রোগে আক্রান্ত জীবজন্তুর রক্তে সরু কাঠির মত জীবাণু দেখা যায়। এরাই যে প্রকৃতপক্ষে অ্যান্থ্রাক্স রোগের জন্যে দায়ী তা প্রমাণ করা দরকার।

কক্ ভাবলেন, জীবাণুভরা দূষিত রক্তের সাহায্যে যদি সুস্থ সবল পশুর দেহে এই রোগ সংক্রামিত করা যায়, তাহলেই তাঁর ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কক্ পরীক্ষা শুরু করলেন।

একটি কাচের স্লাইড গরম করে জীবাণুশূন্য করলেন। এর মাঝে ছোট্ট একটি গর্ত, তার মধ্যে সদ্য বধকরা ষাঁড়ের চক্ষুরস এক ফোঁটা নিলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্যে অ্যান্থ্রাক্স রোগে মৃত একটি পশুর রক্ত ঐ রসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। এরপর গর্তের চারিদিকে ভেসেলিন মাখিয়ে তার উপর আর একটি স্লাইড চাপা দিলেন। বাইরের কোন জীবাণু ঐ রসের মধ্যে ঢুকতে না পারে, তাই এত সাবধানতা। কক্ স্লাইডখানা অণুবীনের তলায় রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ঘণ্টা দু-একের মধ্যেই এক আজব কাণ্ড ঘটল।

হঠাৎ এক সময়ে কক দেখতে পেলেন, কোন্ মায়াবলে যেন একটি জীবাণু ভেঙে দুটি হল, দুটি ভেঙে চারটি হল। দেখতে দেখতে সমগ্র চক্ষুরস হাজার হাজার জীবাণুতে ছেয়ে গেল। পরিষ্কার চক্ষুরস দেখতে দেখতে ঘোলাটে হয়ে গেল। চোখের পলকে এমন ভোজবাজীর খেলা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এক ফোঁটা চক্ষুরসে অল্প সময়ের মধ্যেই যদি এত হাজার হাজার জীবাণুর সৃষ্টি হয়, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টায় একটি পশুর দেহে না জানি কত কোটি কোটি জীবাণু জন্মায়। কক্ বুঝলেন, কি জন্যে এই জীবাণুর আক্রমণে এত তাড়াতাড়ি গবাদিপশু মরে কাঠ হয়ে যায়।

কক আর একটি স্লাইড তৈরি করলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্যে ঐ ঘোলাটে রস এক ফোঁটা নিয়ে তা আর এক ফোঁটা চক্ষুরসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। পরদিন পরীক্ষা করে দেখলেন, এই রসও ঘোলাটে হয়ে গেছে, আর তার মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার জীবাণু। এইভাবে বারবার পরীক্ষা করেও একই

ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখলেন। বুঝলেন, অনুকূল প্রতিবেশ পেলে, এই জীবাণু দ্রুত বংশ-বিস্তার করতে পারে।

কক্ এবারে স্লাইড থেকে একটুখানি ঘোলাটে রস নিয়ে তা একটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরদিন দেখলেন, ইঁদুরটি মরে পড়ে রয়েছে। তার রক্তে দেখা গেল, হাজার হাজার জীবাণু! তিনি এরপর গিনিপিগ, খরগোস এবং ভেড়ার দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকটি প্রাণী অ্যান্থ্রাক্স রোগে মারা গেল। প্রত্যেকটি প্রাণীর রক্তেই এই জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। ককের অক্লান্ত সাধনার ফলে এইভাবে 1875 সালে পাস্তুরের জীবাণু তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ককের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানীরা ক্রমে আরও অনেক রকম জীবাণুর আবিষ্কার করলেন এবং তাদের জীবনধারা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হলেন। এইভাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

বোঝা গেল যে, আপনা থেকে প্রাণের স্ফুরণ কখনই সম্ভব নয়। অতি ক্ষুদ্র জীবাণুরও জনিতা (parent) আছে।

প্রাণের স্ফুরণ সংক্রান্ত চিন্তাধারার বিকাশে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা নানাভাবে গবেষণা করছিলেন। তাঁদের গবেষণার প্রধান হাতিয়ার হল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (microscope)। এর ফলে নিত্য নতুন বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত হতে লাগল। এ সম্পর্কে হগ্‌বেন যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ পরিবর্তনের উপর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'রকমই। এটি নানাভাবে এমন সব সাদৃশ্য উপলব্ধি করতে আমাদের সহায়তা করেছে যা খালি চোখে কখনও সম্ভব হত না। আয়তনের কথা বাদ দিলে, কীট-পতঙ্গের ডিম সবদিক দিয়ে ঠিক মুরগির ডিমের মত, কিংবা হাঙর, গিরগিটি, কাঁকড়া বা অক্টোপাসের ডিমের মত।···প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফলে যখন বোঝা গেল যে, প্রত্যেকটি প্রাণীই কমবেশি গোলাকার, বা ডিম্বাকার একটি বস্তু থেকে জীবন শুরু করে, যার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটির বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য নেই, তখন অ্যারিস্টট্ল প্রবর্তিত প্রাণীদের শ্রেণী বিভাগ, যেমন—(1) যাদের জীবন শুরু হয় কীট হিসেবে, (2) যাদের জীবন শুরু হয় ডিম হিসেবে (অর্থাৎ, যারা ডিম্বজ), এবং (3) যাদের জীবন শুরু হয় মাতৃগর্ভে ভ্রূণ হিসেবে (অর্থাৎ, যারা জরায়ুজ), তা পরিত্যক্ত হল।"

আধুনিক মতবাদ অনুসারে, আণুবীক্ষণিক জীবাণুদের (বা, এককোষী প্রাণীদের) থেকে স্বতন্ত্র, প্রতিটি উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহই অসংখ্য আণুবীক্ষণিক ইষ্টক দ্বারা গঠিত, যার নাম কোষ (cell)। আর নিষেকের (fertilization) মূল তথ্য হল এই যে, দুটি জনন-কোষ (gametes), যার একটি (অর্থাৎ, পুং-জনন-কোষ, বা শুক্রকীট = male gamete = sperm) উৎপন্ন করে জনক (বা পিতা) (male parent) এবং অন্যটি (অর্থাৎ, ডিম্বকোষ, বা ডিম্বাণু = female gamete = ovum = egg-cell) উৎপন্ন করে জননী (বা মাতা) (female parent), পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তা-থেকেই এমন একরূপ কোষ-বিভাজন-প্রক্রিয়া শুরু হয়, যার ফলে একটি বহু-কোষবিশিষ্ট ভ্রূণ (embryo) উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের বেলায়, এই ভ্রূণ থেকেই সৃষ্টি হয় বীজ। আর প্রাণীর বেলায়, এই ভ্রূণই কালক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের বেলায়, বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রচিত উদ্ভিদের প্রত্যঙ্গকে ফুল (flower) বলে। ফুলের প্রধান কাজ উদ্ভিদের বংশবিস্তারে সাহায্য করা। ফুল ফোটে ফল ও বীজ উৎপাদনের জন্যে। বীজ থেকেই নতুন চারার জন্ম হয়।

একটি ফুলে সাধারণত চারটি স্তবক থাকে। বোঁটার উপরে যেখানে এই স্তবক চারটি যুক্ত থাকে, তাকে পুষ্পাধার (thalamus) বলা হয়। প্রধান

চারটি স্তবক হল—বৃতি, দলমণ্ডল, পুং-কেশর-চক্র এবং গর্ভ-কেশর-চক্র।

একটি পুং-কেশরে একটি সূত্রের উপরে একটি পরাগধানী (anther) এবং তাতে পরাগ বা রেণু (pollen) থাকে। আর প্রত্যেকটি গর্ভকেশরে থাকে গর্ভমুণ্ড (stigma), গর্ভদণ্ড (style) এবং গর্ভকোষ (ovary)।

যে ফুলে উপরিউক্ত চারটি স্তবকই থাকে। তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলা হয়। আর এর যে কোন অংশ না থাকলে, তাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ ফুল। যে ফুলে পুং-কেশর ও গর্ভ-কেশর দুই-ই থাকে, তাকে উভয়লিঙ্গ ফুল (bisexual flower) বলে; যেমন—জবা, ধুতুরা ইত্যাদি। কিন্তু শশা, কুমড়া প্রভৃতির ফুল নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, যে কোন একটি ফুলে হয় পুং-কেশর নয়তো গর্ভ-কেশর আছে। এরূপ অসম্পূর্ণ ফুলকে একলিঙ্গ ফুল (unisexual flower) বলা হয়। অসম্পূর্ণ ফুলের যেটিতে শুধু পুং-কেশর থাকে, তাকে বলে পুরুষ ফুল (male flower); আর যেটিতে শুধু গর্ভ-কেশর থাকে, তাকে বলে স্ত্রী-ফুল (female flower)।

ফুলের পুং-কেশর থেকে পরাগ বা রেণু কোন কোন প্রকারে গর্ভ-কেশরে স্থানান্তরিত হওয়ার নাম পরাগ-সংযোগ (pollination)। এরূপ হলে ফল ও বীজের সৃষ্টি হয়। পরাগ-সংযোগ না হলে, ফল ও বীজ হয় না, ফুলটি শুকিয়ে ঝরে যায়। আবার এক জাতীয় ফুলের পরাগ অন্য জাতীয় ফুলের গর্ভ-মুণ্ডে লাগলেও ফল পাওয়া যায় না। কীট-পতঙ্গ বা জীব-জন্তুর সাহায্যে এবং আরো নানাভাবে (যেমন, বাতাস বা জলের সহায়তায়) পরাগ-সংযোগ হতে পারে।

আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, পরাগ-সংযোগ হলে, পুং-জনন-কোষ এসে স্ত্রী-জনন-কোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রূণ (embryo) সৃষ্টি করে। এরই নাম নিষিক্তকরণ (fertilization)। এর ফলে ডিম্বক একটি বীজে (seed) পরিণত হয়। এইভাবে ফুল তার প্রধান কাজটি সম্পাদন করে। ফুল থেকে ফলের সৃষ্টি হয়। আর ফলের মধ্যে বীজ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

1879 সালে হেডউইগ এবং ফল নামক 'জন জার্মান গবেষক প্রাণীর বেলায় নিষিক্তকরণের পদ্ধতি সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন যে, সী-আর্চিন (sea urchin)-এর ডিম্বাণুর মধ্যে একটিমাত্র শুক্রকীট, হ্যাঁ, মাত্র একটিই, প্রবেশ করে। ডিমটি একটি নতুন প্রাণীতে বিকাশ লাভ করার প্রথম লগ্নেই এরূপ ঘটে থাকে। এরই নাম নিষিক্তকরণ বা নিষেক। আমরা এখন জানি যে, যে-সব প্রাণী যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

এই প্রসঙ্গে হগবেন বলেছেন,—"As we now use the terms, an animal that produces eggs is a *female*. An animal that produces sperm is a *male*. The eggs are produced in masses, which are called *ovaries*, within the body of the female. The sperm are produced in a slimy secretion, the seminal fluid, by organs known as *testes*. Collectively ovaries and testes are referred to as gonads....

In some animals such as snails, human beings and birds, the seminal fluid is introduced into the oviduct of the female and the egg is fertilized inside the female body. The male of many land animals has a special organ, the penis, which is used to introduce the seminal fluid into the body of the female.

The frog does not possess one. Many marine animals (e.g. oysters, starfishes, marine worms, sea-anemones) shed both eggs and seminal fluid into the sea.

There is no act of sexual union between the two parents themselves."

নিষিক্তকরণের অব্যবহিত পরেই নিষিক্ত ডিম্বকোষ, অর্থাৎ জাইগোট (zygote), বিকাশ লাভ করতে আরম্ভ করে, এবং অবস্থা অনুকূল হলে, নির্দিষ্ট সময় পরে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। বিকাশ ঘটে প্রধানত দু'রকমভাবে—(1) প্রাণিদেহের বাইরে, এবং (2) প্রাণিদেহের মধ্যে।

মাছ, ব্যাঙ, প্রভৃতি জলের মধ্যে হাজার হাজার ডিম পাড়ে। নিষিক্ত হলে, ভ্রূণটি প্রাণিদেহের বাইরে জলের মধ্যে বড় হয়। এসব ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রাণীর জন্ম হলেও শৈশবেই অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় না। তবুও যতগুলি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তাই প্রাণীটির বংশরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে জনিতৃ যত্নের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সরীসৃপ ডাঙ্গায় অল্প সংখ্যক ডিম পাড়ে। এরূপ ডিমে শক্ত খোলস থাকে। নিষিক্ত ডিম হলে, নির্দিষ্ট সময় পরে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। এক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে প্রাণিদেহের বাইরে, এবং এক্ষেত্রেও জনিতৃ-যত্নের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই।

পাখিও অল্প সংখ্যক ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিম হলে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ডিমগুলি নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা প্রয়োজন। এজন্যে নির্দিষ্ট সময় ধরে ডিমে তা দিতে হয় (incubation), তবেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। তাছাড়া মা-পাখি বাচ্চাদের শৈশবে আহার যোগায়। এক্ষেত্রে জনিতৃ-যত্নের (parental care) বিশেষ ভূমিকা আছে।

কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেলায় ভ্রূণ মাতৃগর্ভে (জরায়ুর মধ্যে) ধীরে ধীরে বড় হয়, এবং নির্দিষ্ট সময় পরে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। এর ফলে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সুনিশ্চিত হয়। তবে শুধু সন্তানের জন্ম হলেই তো চলবে না। শৈশবে তাকে লালন-পালন করতে হয়, আপদে-বিপদে রক্ষা করতে হয়। সুতরাং, এসব ক্ষেত্রেও জনিতৃ-যত্নের বিশেষ ভূমিকা আছে।

এইভাবে নানাদেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবের জন্ম ও বিকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় গুপ্ত রহস্যই ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে মানুষের কাছে। ক্রমবিকাশের ধারায় মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সন্তানের জন্ম ও সুরক্ষার যে ক্রমোন্নতি ঘটেছে, তা উপলব্ধি করে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

আপেক্ষিক তাপে আইনষ্টাইন

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে? কোন পদার্থের তাপ গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন পদার্থের প্রকৃতি বিভিন্ন বলে এই ক্ষমতাও বিভিন্ন। এই ক্ষমতা নিরূপণকারী ধর্মই হল—আপেক্ষিক তাপ। কোন পদার্থের একক ভরের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন এবং জলের একক ভরের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী বাড়ানোর জন্যে যে তাপের প্রয়োজন তাদের অনুপাতই আপেক্ষিক তাপের মান নির্দেশ করে। এই সংজ্ঞা অনুসারে আপেক্ষিক তাপ দুটি তাপের অনুপাত বলে এটি একটি সংখ্যা মাত্র। এর কোন একক নেই। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে গৃহীত বা বর্জিত তাপের [তাপ (ক্যালরি) = ভর (গ্রাম) × আপেক্ষিকতাপ (সংখ্যামাত্র) × তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস (^0C)] হিসেব করার সময় মাত্রাঘটিত **(dimensional)** অসুবিধা দেখা দেয়। তাই আপেক্ষিক তাপের এই সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে সংজ্ঞাটি হল একক ভরের কোন বস্তুকে এক ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন তাকে বস্তুটির আপেক্ষিক তাপ বলে। সি. জি. এস পদ্ধতিতে আপেক্ষিক তাপের একক হল—ক্যালরি প্রতি গ্রাম প্রতি ^0C।

গ্যাসের বেলায় আপেক্ষিক তাপের এই সংজ্ঞায় কিছুটা সংযোজন প্রয়োজন। যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন গ্যাসে তাপ প্রয়োগ করা হয় তখন তার তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে আয়তন ও চাপ পরিবর্তিত হয়। কঠিন বা তরল বস্তুর ক্ষেত্রে আয়তন বা চাপ বৃদ্ধি খুব কম বলে এদের পরিবর্তন গণ্য করা হয় না। কেবল উপরিউক্ত সংজ্ঞা গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে কি ঘটে দেখা যাক।

একক ভরের কোন গ্যাসকে হঠাৎ সংনমিত (compressed) করলে গ্যাসটির তাপমাত্রা বাড়ে। এক্ষেত্রে বাইরের থেকে কোন তাপ প্রয়োগ করা হয় নি। অর্থাৎ, তাপ (H) প্রয়োগ না করা সত্ত্বেও তাপমাত্রা (θ^0) বাড়ছে। সংজ্ঞানুসারে, আপেক্ষিক তাপ $=\frac{H}{\theta}=\frac{0}{\theta}=0$ (শূন্য)। অন্যদিকে ঐ একক ভরের গ্যাসকে যদি হঠাৎ প্রসারিত করা যায়, তাহলে গ্যাসটি ঠাণ্ডা হয়। এ অবস্থায় যদি তাপ (H) প্রয়োগ করে গ্যাসটিকে ঠাণ্ডা হতে না দেওয়া হয় অর্থাৎ, তাপমাত্রা হ্রাস রোধ করা হয়, তাহলে আপেক্ষিক তাপের মান $=\frac{H}{\theta}=\frac{H}{0}=\infty$ (অসীম)। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বাহ্যিক কোন ভৌত অবস্থা না বলে দিলে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ শূন্য থেকে অসীম যে কোন মানের হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব বা অলীক। তাই গ্যাসের আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞায় বাহ্যিক ভৌত অবস্থা অর্থাৎ স্থির আয়তন বা স্থির চাপের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাই গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ দু'প্রকার – (i) স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপ (c_v); এবং (ii) স্থির চাপে আপেক্ষিক তাপ (c_p)। এখন সংজ্ঞাটিকে এভাবে খাড়া করা যায়—একক ভরের কোন গ্যাসের আয়তন স্থির (বা চাপ স্থির) রেখে এক ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকে স্থির আয়তনে (বা স্থির চাপে) আপেক্ষিক তাপ বলা হয়। স্থির আয়তনের ক্ষেত্রে

*ক্রেয়োজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার, আই, আই, টি; খড়্গপুর

প্রযুক্ত তাপ সম্পূর্ণরূপে গ্যাসের আভ্যন্তরীণ বা অন্তঃস্থ শক্তি বৃদ্ধি করতে কাজে লাগে। যে কোন পদার্থের বেলায় স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপ স্থির চাপে আপেক্ষিক তাপ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ অথবা মৌলিক। c_v জানলে সহজে c_p ও c_v সম্পর্ক থেকে c_p-র মান নির্ণয় করা যায়।

কিভাবে আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করা হয়? কঠিন, তরল বা গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের জন্যে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাপের সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করে আপেক্ষিক তাপ নির্ধারিত হয়। কোন বস্তুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করে বস্তুটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করে—আপেক্ষিক তাপ বের করা যায়। বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা বিভিন্ন ভৌত অবস্থায় যেমন বিভিন্ন চাপে অথবা বিভিন্ন তাপমাত্রায় আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ, চাপের সঙ্গে অথবা তাপমাত্রার সঙ্গে কোন পদার্থের আপেক্ষিক তাপের কেমন পরিবর্তন হয়—তা পাওয়া যায়।

তাপমাত্রার সঙ্গে তরল বা গ্যাসের আপেক্ষিক তাপের পরিবর্তন অপেক্ষা কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপের পরিবর্তন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। সাধারণভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তরলের আপেক্ষিক তাপ বৃদ্ধি পায়। তবে জলের বেলায় ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রায় 37°C পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে জলের আপেক্ষিক তাপ কমতে থাকে তারপর বাড়ে। 15°C তাপমাত্রায় জলের আপেক্ষিক তাপ = 1। অন্যান্য তরল অপেক্ষা জলের আপেক্ষিক তাপ বেশি। তাই জলকে তাপশক্তির "স্টোর হাউস" বলা হয়। এক পরমাণুক (monatomic) গ্যাসের ক্ষেত্রে কিংবা উষ্ণতার সাধারণ পাল্লার মধ্যে কতকগুলি গ্যাসের স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপ নির্দিষ্ট। যে সব গ্যাস এক পরমাণুক নয় তাদের আণবিক তাপ (molecular heat) তাপমাত্রার সঙ্গে বাড়ে। খুব কম তাপমাত্রায় সব গ্যাসের স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপ নির্দিষ্ট এবং তা এক পরমাণুক গ্যাসের স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপের মানের সমান। এ সব কিছুর কারণ ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না। যাহোক্, এবার কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত বিষয়ে আসা যাক।

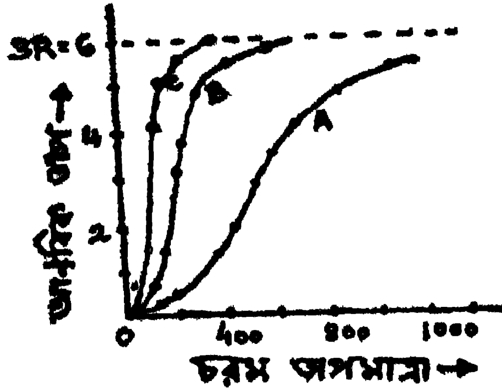
1819 সালে ডুলং এবং পেটিট (Dulong and Petit) কিছু কঠিন মৌলিক পদার্থের আপেক্ষিক তাপ মেপে সিদ্ধান্তে আসেন কঠিন অবস্থায় সমস্ত মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক তাপ (স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপ ও পারমাণবিক ওজনের গুণফল) একই এবং এর মান = 3R, R-শাশ্বত গ্যাস ধ্রুবক। গ্যাসের গতিতত্ত্ব দিয়ে ডুলং ও পেটিটের সূত্রটি সহজে প্রমাণ করা যায়। যেহেতু মৌলের পারমাণবিক ওজন নির্দিষ্ট তাই আপেক্ষিক তাপও নির্দিষ্ট। উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে আপেক্ষিক তাপের মানের পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়। কিন্তু পরবর্তকালে পরীক্ষালব্ধ ঘটনা এই সূত্রের সিদ্ধান্তে বিপক্ষ রায় দেয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে সব পদার্থের আপেক্ষিক তাপ উষ্ণতার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ে বিভিন্ন পরীক্ষকের পরীক্ষা থেকে যে সব ফল পাওয়া গেছে তা হল—

(1) নির্দিষ্ট আয়তনে পারমাণবিক তাপ তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে এবং উচ্চতর তাপমাত্রায় এর মান ডুলং ও পেটিটের সূত্র অনুসরণ করে। অর্থাৎ মানটি 3R-র সমান বা কাছাকাছি পৌঁছয়।

(2) তাপমাত্রা কমলে পারমাণবিক তাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বিশেষ একটা তাপমাত্রায় (যা বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন) নিচে তা খুব দ্রুত কমতে থাকে এবং অবশেষে পরম শূন্যের কাছাকাছি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

(3) তাপমাত্রার সঙ্গে পারমাণবিক তাপের পরিবর্তনের প্রকৃতি (চিত্র-1) সব মৌলের বেলায়



চিত্র-1
তাপমাত্রার সঙ্গে স্থির আয়তনে আণবিক তাপের পরিবর্তন
A—হীরক B—অ্যালুমিনিয়াম C রূপা।

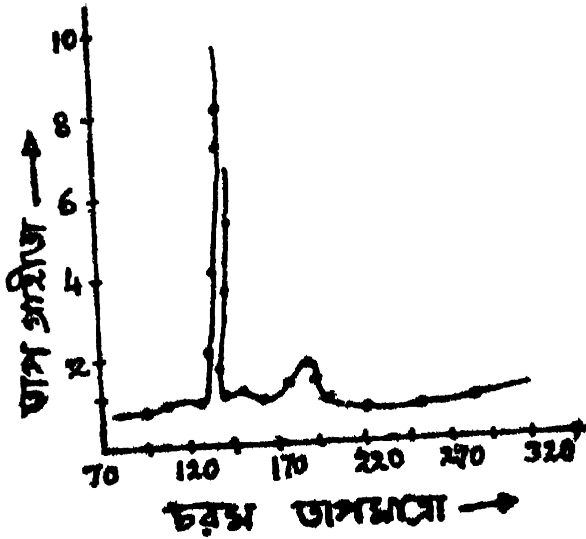
একই। অর্থাৎ, তাপমাত্রার স্কেল প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে পারমাণবিক তাপ-তাপমাত্রা) লেখচিত্রগুলিকে একটি লেখচিত্রে পরিণত করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে ডুলং ও পেটিটের সূত্র কেবলমাত্র উচ্চতর তাপমাত্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিম্নতাপমাত্রায় এই সূত্র অচল। ডুলং ও পেটিটের এই ব্যর্থতার অবসানে 1907 সালে আইনষ্টাইন কোয়াণ্টাম ধারণার আশ্রয়গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যায় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বলেন, বিকিরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয় না ; শক্তিকণা বা 'কোয়াণ্টা' (শক্তির প্যাকেট ; শক্তিমাত্রা $= h\nu$, h প্লাঙ্কের ধ্রুবক, ν কম্পনাঙ্ক) আকারে নির্গত হয়। আইনষ্টাইন এই ধারণাকেই কঠিন পদার্থের পরমাণুর স্থিতিস্থাপকীয় বা যান্ত্রিক কম্পনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাপমাত্রার সঙ্গে আপেক্ষিক তাপের পরিবর্তন ব্যাখ্যায় আইনষ্টাইন প্রথমে অঙ্গীকার করেন—কঠিন বস্তুর পরমাণুগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ এবং প্রত্যেকটি পরমাণু একটি নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক নিয়ে সরল দোলগতিতে কম্পিত হয়। তাই একটি কঠিন পদার্থকে (যা পরমাণুর সমষ্টি বিশেষ) একটি নির্দিষ্ট কম্পানাঙ্ক দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুসারে শক্তির বণ্টন নীতি গ্রহণ করে আইনষ্টাইন দেখালেন, স্থির আয়তনে পারমাণবিক তাপ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাঁর তত্ত্ব দিয়ে দেখালেন উচ্চতর উষ্ণতায়, পারমাণবিক তাপ $= 3R$ (ডুলং ও পেটিটের সূত্রানুযায়ী) ; এবং পরম শূন্য তাপমাত্রায় পারমাণবিক তাপের মান শূন্য।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত সমীকরণ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত পরীক্ষালব্ধ মানকে কোনক্রমে ব্যাখ্যা করতে পারে ; কিন্তু খুব কম তাপমাত্রায় এটি প্রযুক্ত নয়। উদাহরণ স্বরূপ, 14K তাপমাত্রায় রূপার আপেক্ষিক তাপ (পরীক্ষালব্ধ) আইনষ্টাইন নির্দেশিত মান অপেক্ষা 28 গুণ কম। তাছাড়া বেশ কিছু পদার্থের বেলায় উষ্ণতার সঙ্গে আপেক্ষিক তাপের পরিবর্তন আইনষ্টাইনের সমীকরণ অনুসরণ করে না। এর প্রধান কারণ আইনষ্টাইনের অঙ্গীকারেই ত্রুটি। কখনই কঠিন পদার্থকে একটি কম্পনাঙ্ক দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, কঠিন পদার্থের মধ্যে পরমাণুর সব কম্পন একই কম্পনাঙ্কের হতে পারে না ; তাছাড়া তারা পরস্পর নিরপেক্ষও নয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের একটি কাজের কথা উল্লেখ করছি। 'ক্রোম পটাশিয়াম অ্যালাম' এই যৌগটির আপেক্ষিক তাপ তরল নাইট্রোজেন তাপমাত্রা (77K) থেকে ঘরের তাপমাত্রা (300K) পর্যন্ত মেপে দেখেছি। এক্ষেত্রে যা পেয়েছি তা চিত্র-2-এ দেখানো হল। দেখা গেছে 141·5K এবং 192·5K তাপমাত্রায় আপেক্ষিক তাপের মান হঠাৎ বেড়ে যায়। এর কারণ ঐ দুটি তাপমাত্রায় যৌগটির গঠন কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, কঠিন পদার্থটির কাঠামো এক দশা থেকে অন্য দশায় রূপান্তরিত হয়। এই ঘটনাকে দশা পরিবর্তন বা দশান্তর (phase

transition) বলা হয়। যাক এসবের অধিক আলোচনা এখানে অবান্তর মাত্র। তবে দেখানো



চিত্র-2

গেল যে এসব ক্ষেত্রে এমন কি যৌগিক পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বিশ্লেষণে আইনষ্টাইন-মডেল একদম প্রযোজ্য নয়। কেন চরম শূন্য তাপমাত্রায় পদার্থের আপেক্ষিক তাপ শূন্য হয়—এর তাৎক্ষণিক জবাব আইনষ্টাইন-মডেল থেকে পাওয়া যায় মাত্র।

পরবর্তীকালে আপেক্ষিক তাপ ব্যাখ্যায় আইনষ্টাইন মডেলকে সামনে রেখে নানা সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিবাই-এর T^3-সূত্র। সূত্রটি হল—খুব কম তাপমাত্রায় কঠিন মৌলিক পদার্থের আপেক্ষিক তাপ চরম তাপমাত্রার ঘন-র সঙ্গে সমানুপাতী। এর পরেও বহু গবেষক আপেক্ষিক তাপের ক্ষেত্রে অনেক মৌলিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন। বর্তমানে দেখা গেছে আপেক্ষিক তাপে পরমাণুর (সঠিকভাবে বললে) কেলাস-এককের (lattice) অবদান ছাড়াও ইলেকট্রন ও চুম্বকীয় ধর্ম ইত্যাদির অবদান রয়েছে। আপেক্ষিক তাপের সঠিক রূপ এখনও সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় নি।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়িয়ে আজ বলা যায়, ডুলং ও পেটিটের প্রায় ন'দশক পরে আইনষ্টাইনই প্রথম ব্যক্তি যিনি আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত সমস্যাটির সমাধানে বলিষ্ঠ ও সঠিক পথের নির্দেশ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপেক্ষিক তাপে কোয়ান্টাম তত্ত্বের যে প্রয়োগ তিনি প্রথম সূচনা করে গেছেন আজও তা পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত আইনষ্টাইনকে আপেক্ষিক তাপ তত্ত্বের জনক বলা যায়।

[প্রবন্ধটি লেখার ব্যাপারে অধ্যাপক সন্তোষকুমার দত্তরায় ও সৌম্যশঙ্কর মিত্রের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—লেখক।

মহাকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে ধারণা

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ*

মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্যে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি নভস্থিত পদার্থগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। মানব সভ্যতার আদিম যুগে জ্যোতির্বিদ্যা যথেষ্ট উন্নত ছিল না বলে জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব, অবস্থিতি, আয়তন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য তথ্যাদি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা ছিল না। পৃথিবী সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ছিল। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীকে সমুদ্রবেষ্টিত এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি সমতল পদার্থ বলে বিবেচনা করা হত। প্রাচীন হিন্দুগণ, মিশর ব্যাবিলনবাসী ও গ্রীকগণ এই ধারণা পোষণ করতেন। আবার দীর্ঘদিন ধরে জ্যোতিষ্কের পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ অনেকে গ্রহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারতেন। গ্রহগুলি উদ্ভাসিত বস্তু (glowing bodies) হিসাবে পরিগণিত হত। এদের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা ছিল না। গ্রহগুলি সম্বন্ধে কাল্পনিক মনোরম গল্প-সাহিত্যে স্থান পেত।

পৃথিবীর আকৃতি যে গোলাকার এবং তা যে প্রতিদিন নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে সূর্যের উদয়-অস্ত সূচিত করছে—এ ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হতে বহু শতাব্দী কেটে গেছে। প্রাচীন হিন্দুগণ চিন্তা করতেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 'চোদ্দভুবন' বা 'লোকের' এককেন্দ্রিক পিণ্ড এবং তা কঠিন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত। এই লোকগুলির নাম—ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, ধ্রুবলোক, সূর্যলোক, চন্দ্রলোক ইত্যাদি এই লোকগুলি দেব (সুর), ঋষি, রাক্ষস, প্রেতাত্মা ও পূর্বপুরুষের আত্মার আবাসভূমি। লোকান্তরে যেতে হলে বিমান ব্যবহার করা হত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নানাপ্রকার বিমান কাহিনী বর্ণিত আছে। পৃথিবীর দূরবর্তী স্থানে যেতেও বিমানের প্রচলন ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে রাবণকে পরাজিত করে রাম তাঁর সহধর্মিণী সীতাকে নিয়ে বিমানে লঙ্কা (Ceylon) থেকে অযোধ্যায় এসেছিলেন। কথাসরিৎসাগরে আকাশপথে বিমানে ভ্রমণেরও বর্ণনা আছে। শব্দহীন বিমানের বর্ণনাও আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে সূর্য ও চন্দ্রবংশের অনেক শক্তিশালী নৃপতি অসুরদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রকে সামরিক সাহায্যের জন্যে বিমানপথে ইন্দ্রলোকে যাতায়াত করতেন। হিন্দী পত্রিকা সরস্বতীতে 1965 খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় বিমান বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে মহাকাশে আলোক ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সংস্কৃত নিবন্ধ পাওয়া যায়। ভরদ্বাজের মন্ত্র সম্বন্ধে পুস্তকে মহাকাশ ভ্রমণের আটটি অধ্যায় আছে। মহীশূরে পাওয়া বিমান-শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপির মধ্যে তিন প্রকারের বিমানের নক্সা দেখতে পাওয়া যায়—(1) সুন্দর (2) শকুনা এবং (3) রুক্মি। বিভিন্ন আকৃতির বিমান নির্মাণ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আটটি অধ্যায়ে পাঁচ-শ'টি শ্লোক আছে। আবার উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত অগস্ত্য সংহিতা হস্তলিপির মধ্যে বিমান নির্মাণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ভরদ্বাজের বিমানশাস্ত্র সম্বন্ধে বোধানন্দ জ্ঞাতেশ্বর যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে এ বিষয়ে অন্য ছয়টি পুস্তকের নামোল্লেখ আছে—(i) বামনের বিমান চন্দ্রিকা, (ii) শৌলকের ব্যোমযানতন্ত্র, (iii) গর্গের যন্ত্রকল্প, (iv) বাচস্পতির যানবিন্দু, (v) চন্দ্যানের সেতয়না প্রদীপিকা, (vi) ধুন্ডিনামের ব্যোমযান প্রকাশ। ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের বিভিন্ন

*ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থালয়েও এই প্রকারের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেতে পারে।

প্রাচীন সাহিত্য এবং মিশর, ব্যাবিলন, চীন এবং গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে মহাকাশ ভ্রমণের কোন গল্প পাওয়া যায় নি। অবশ্য পক্ষযুক্ত দেবতাদের আকাশপথে ওড়ার বিবরণ আছে। কিন্তু বিমানে ভ্রমণের কোন গল্প নেই। সূর্য-দেবতাকে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই বিবরণ পাওয়া যায় যে, যোদ্ধা অরুণ কর্তৃক চালিত সপ্তঅশ্বযুক্ত রথে চড়ে সূর্যদেব আকাশপথে ধাবমান। হোমারের ওডিসীতে পাওয়া যায় যে গ্রীকবীর ইউলিসিস স্থলে এবং সমুদ্রে নানা দুঃসাহসিক ভ্রমণ অভিযান সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু আকাশে ভ্রমণের কোন প্রসঙ্গ নেই। তাঁর জাহাজ বাত্যাবিক্ষুব্ধ না হয়ে মহাকাশে চন্দ্র কিংবা অন্য কোন জ্যোতিষ্ক কর্তৃক শোষিত হয়েছিল। অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও গ্রীকদিগের জ্ঞান ছিল অস্পষ্ট।

পরবর্তীকালে গ্রীক জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর সমতলিক আকৃতির ধারণা পরিবর্তন করেন। সামোস Aristarchwe (খৃঃ পূঃ 3য় শতাব্দীর শেষার্ধে) প্রকৃতপক্ষে কোপারনিকাসের মতের স্বপক্ষে প্রস্তাব দিলেন। তিনি পৃথিবী থেকে সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক দূরত্ব মাপলেন। (Erotosthenus, Hipparchus) এরোটোস্থেনাস, হিপারকাস), (খৃষ্টপূর্ব 180-125) প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে পুনরায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপন করলেন। হিপারকাস এর 200 বছর পর Claudias Ptolemachs এই তত্ত্ব বিলোপ করে টলেমি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। প্রায় 100 বছর পর তাঁর বই গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়ে 'The Almagest' নামে পরিচিত হল।

জ্যোতির্বিদগণের চিন্তাধারা এইরূপ বৃদ্ধি পেতে থাকলেও পীথাগোরাসের সময় থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত দার্শনিক মতবাদ বস্তুজগতের মধ্যে নিহিত ছিল। অ্যারিষ্টটল (খৃঃ পূঃ 384-322) এর বিরোধিতা করেছিলেন। খৃষ্টানদের গীর্জাগুলিও তাঁর মতাবলম্বী হল।

প্লুটার্কের (খৃঃ পূঃ 146-120) Dfacie in Orbe Lune (The Face of the Orbiting Moon) বই থেকে দেখা যায় চন্দ্র আকাশের একটি কঠিন বস্তু। 48 বছর পর Leekian-এর প্রথম উপন্যাস Vera Historia (True History) থেকে চন্দ্রাভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়। Etein Tempiers-এর প্রতিনিধিত্বে প্যারিসের বিশপ নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি পৃথিবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। ভগবানের প্রাচুর্য সীমাবদ্ধ নয় এই ধারণার মূলে এই বিশ্বাস ছিল। 1540 খৃঃ Nicholas Copernicus-এর De Revolutions Orbium Coclesticum (On the Revolution of Cellestial Orbits), 1609 খৃষ্টাব্দে Johannes Kepler-এর De Motibus Stellae Martis (On the Motion of the Mass)—প্রকাশিত হয়। তৃতীয় পুস্তক যাতে গ্যালিলিও কর্তৃক দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের প্রত্যক্ষ ফল বর্ণিত হয়েছে তা 1610 খৃষ্টাব্দের Siderusmuneias (The Messanger of the Stars) নামে ছাপা হয়েছিল। এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হবার পর জ্যোতি-বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারায় বিপ্লব স্থুরু হল। কোপার্নিকাস (Copernicus) এবং কেপ্‌লার (Kepler) সৌরজগতের গঠনের একটি নিয়ম পদ্ধতি প্রচলন করেন এবং গ্যালিলিও (Galileo) দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের দ্বারা দেখালেন সমস্ত গ্রহজগত সৌরজগতের মধ্যে আবদ্ধ। এই সব ধারণা মহাকাশ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখবার এবং ভ্রমণের একটি স্থদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ ছিল। রম্য গল্প কল্পনার অনুপ্রেরণার এই হল কারণ।

কেপ্‌লার গ্রীকভাষা থেকে Lukion নামে উপন্যাস অনুবাদ করেন। 1634 খৃষ্টাব্দে এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে অবসর সময়ে

এবং দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন কেপ্‌লার Somnium (Sleep) লেখা শুরু করেন। উদ্ভট কল্পনাসমৃদ্ধ এই বই তাঁর পুত্র লুডইগ (Ludwig) সমাপ্ত করেন। এতে Leviam (Moon) নামে একটি দ্বীপের গল্প আছে। এটি পৃথিবী থেকে 50,000 মাইল দূরে অবস্থিত এবং দানবগণ দ্বারা অধ্যুষিত। চন্দ্রে যাবার মত কষ্টকর কাজটি অশরীরি শক্তির সাহায্যে সম্পন্ন করা হত। এই শক্তি পৃথিবীর প্রতিবিম্ব সেতুপথে তাকে উপরে টেনে নিত। যেস্থানে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের চৌম্বক প্রভাব বেশি চন্দ্রতলে জীবনের সেখানে টেনে নেওয়া হত। বাস্তবিক পক্ষে এই চৌম্বক প্রভাব মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কেপ্‌লার-এর এই চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনা স্বপ্নবৎ হলেও বাস্তবভিত্তিক। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের মধ্যে তিনি একটি সাধারণ আবহাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন যা উভয়ের তলের নিকট ঘনতর ছিল। বিশপ গডউইন (Bishop Godwin) রচিত 'The Man in the Moon (1638) Somnium প্রভাবান্বিত। এর কয়েক মাস পরে প্রকাশিত Wilkin-এর Discovery of a world in the Moon পুস্তকটি গল্প হলেও আলোচনার বিষয়। দুই বছর পরে এতে তিনি একটি নতুন অধ্যায় যোগ করেন। এই বইয়ে তিনি উড্ডীয়মান রথের সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করলেন। 50 বছর পর উড়োজাহাজ আবিষ্কারের দ্বারা এই ধারণা হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল। প্রথমে খৃষ্টান যাজক Francesco de Lana Terzi (1677-79) কাগজের সাহায্যে এই আবিষ্কার করেন। 1783 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উত্তপ্ত বাতাসপূর্ন বেলুন নির্মাণ করে তাঁর দুই ভাই Joseph Michael এবং Jawues Etein Montogolfier তাঁর ধারণাকে বাস্তবায়িত করেন। Cyrano be Bergerae-এর দুটি উপন্যাস Voyage dans la Lune (1649) এবং Historie des Estate et Empieres de Sopit (1650) পূর্ববর্তী পুস্তকগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। 1689 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Bernand de Fontenella-এর Entreliens Surla Puralite des Mondes (Discovery of the plurality of the worlds) ইউরোপে এক নব ধারণার ঝড় আনল যে প্রত্যেক গ্রহ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল জীবের আশ্রয়স্থল। তিনি এও বললেন যে বায়ুর স্বল্পতা হেতু চন্দ্রে জীবের বাস নাও থাকতে পারে। Johannes Havelin Danzig-এর Selenographic চন্দ্র সম্বন্ধে প্রথম নিয়ম পদ্ধতিসম্পন্ন গ্রন্থ। 1672 সালে জিওভ্যানি ক্যাসিনি (Giovani Cassini) নামে ইটালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী কখন মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর কাছে আসে এ বিষয়ে অনেক হিসাব করেছিলেন। তিনি দেখালেন যে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 80 মিলিয়ন অপেক্ষা বেশি। এইভাবে আগের হিসাব থেকে সৌরজগতের আয়তন অন্তত দুই গুণনীয়ক বেড়ে গেল। Voltair এর Mycromegas (1752) এবং Emanuel Swedenberg-এর Arcaua Celetia (1752) বই দুটিতে অন্য জগতের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। প্রথমটি দার্শনিক ব্যঙ্গাত্মক অপরটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। কান্ট (Kant) সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে এই সব ধারণার পরীক্ষা করেছিলেন। সাধারণ উড্ডয়নের পন্থাগুলি মহাজাগতিক ভ্রমণে ব্যর্থ এটা উপলব্ধি করে নূতন শক্তি প্রয়োগের প্রস্তাব করা হল। Unparallel Adventure of one Hans Dfeall (1895) এডগার অ্যালেন পো (Edgar Allan Poe) কর্তৃক লিখিত পুস্তকটির মধ্যে চন্দ্রে অভিযানের জন্যে বেলুনের ব্যবহার আছে। অবশ্য এটা তিনি হাস্যপরিহাসের ভঙ্গিমায় লিখেছিলেন। নূতন শক্তি হিসাবে বিদ্যুতের ব্যবহার অটো ভন গেরিকের (Otto Von Ghericke) electric machine-এর মধ্যে পাওয়া যায়। Louis Guillaume de La Follie-এর Philosophical Pretensions (1775) বইয়ে পৃথিবী ভ্রমণের

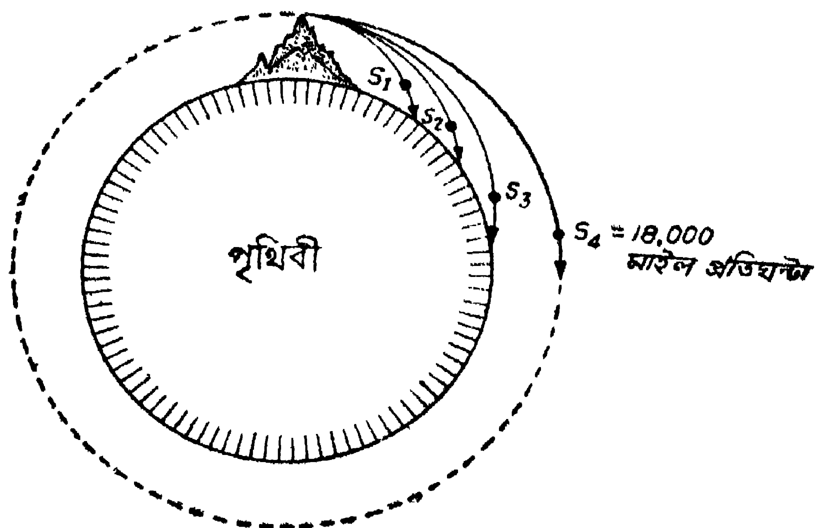
জন্যে বুধগ্রহে মহাকাশযানের গল্প রচনা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মহাকাশ ভ্রমণ ও তার অনুসন্ধান সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক পুস্তক লেখা হয়। ফরাসী লেখক জুলে ভার্ণ (Jules Vern) মহাকাশের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের প্রথম পেশাগত লেখক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। চমকপ্রদ ঘটনাবলীর মধ্যে উদ্ভট কল্পনা এবং বিবরণের কমনীয়তা ভার্ন-কে অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছিল। সাহিত্য বাসরেও তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প মর্যাদা পেয়েছিল। H. G. Wells মহাকাশের বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের পরবর্তী প্রসিদ্ধ লেখক। War of the World তাঁর সর্বাপেক্ষা সুবিদিত পুস্তক। তাঁর অস্বাভাবিক দূরদৃষ্টি ছিল। সামরিক ট্যাঙ্ক ও অ্যাটম বোমার ইঙ্গিত তাঁর পুস্তকে পাওয়া যায়।

বৃহদাকার কামান উত্তোলিত করা হল (চিত্র 1)। এর নলটিকে পৃথিবীর তলের সঙ্গে সমান্তরাল করে স্থাপিত করা হল। এখন কামানটিতে বিস্ফোরণ ঘটালে দেখা যাবে যে গোলাটি (projectile) বক্রতার সৃষ্টি করে পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হবে। যদি বারুদের পরিমাণ বর্ধিত করা হয় এবং এর মান উন্নত করা হয় তবে প্রক্ষিপ্ত পদার্থটি আরও দ্রুত ধাবিত হবে এবং গতিসীমা বাড়বে এবং কাল্পনিক পর্বত থেকে আরও দূরে পড়বে।

বারুদের পরিমাণ আরও বাড়ালে এটি এমন একটি বক্রপথে ছুটবে যা পৃথিবীর বক্রতার সঙ্গে সমান্তরাল হবে। এই অবস্থায় এটি আর পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হবে না। আমাদের গ্রহের চতুর্দিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরে প্রস্থান বিন্দুতে ফিরবে।

এখন কামানটিকে সরিয়ে ফেলা হলে পূর্বের



চিত্র-1

এদিকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ ভ্রমণের তত্ত্ব পরিষ্কার হল। Principia বইয়ে নিউটন নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করলেন।

"ধরা যাক বায়ুস্তর ভেদকারী পর্বতশৃঙ্গে একটী অনুমান অনুযায়ী প্রক্ষিপ্ত গোলটি যদি বাধা না পায় তবে এর কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে এবং পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবে।"

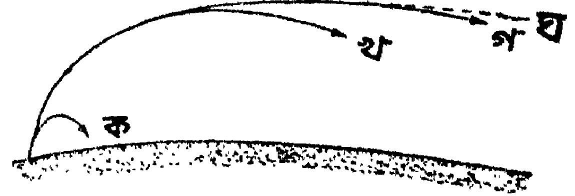
মাধ্যাকর্ষণের সূত্র ধরে গণনা করলে দেখা যায় কোন বস্তুকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে হলে এবং

কৃত্রিম চন্দ্র বা উপগ্রহে পরিণত হতে হলে দুটি শর্ত পালন করতে হবে।

(i) বস্তুটির উৎক্ষেপণ অনুভূমিক এবং এর গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় 18000 মাইল হতে হবে।

(ii) বস্তুটিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 200 মাইল (যেখানে বায়ুর পরিমাণ অতি অল্প) ঊর্ধ্বে থেকে নিক্ষেপ করতে হবে। চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহে ভ্রমণের জন্যে ঘণ্টায় 25000 মাইল বেগ প্রয়োজন।

সমস্ত নভযানের মধ্যে রকেটই কোন বস্তুকে পৃথিবী থেকে 200 মাইল ঊর্ধ্বে বহন করতে পারে। বহুদশাসম্পন্ন রকেট (multistage rocket) দ্বারা (চিত্র 2) কৃত্রিম উপগ্রহের উপযোগী ঘণ্টায় 18000 মাইল বেগ অর্জন করা সম্ভব। এমনকি এর দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রমের জন্যে 25000 মাইল বেগ লাভ করতে পারা যায়। 1957 সালে 4ঠা অক্টোবর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুট্‌নিক-I



চিত্র-2

(Sputnik I),তিন দশাসম্পন্ন, রকেট থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। গল্পময় পৃথিবী বাস্তবায়িত হল।

সুন্দরবনে বাগ্‌দাচিংড়ির চাষ ও তার কৃত্রিম প্রজনন

নরেশমোহন চক্রবর্তী*

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে প্রায় 8000 বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এক সুবৃহৎ নিচু 'ব' দ্বীপ অঞ্চল যা সাগরের কাছাকাছি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে তা সুন্দরবন নামে অভিহিত। এর চারধারে এসে মিশেছে অসংখ্য ছোট নদী, খাঁড়ি, খাল যেমন সপ্তমুখী, ঠাকুরান, মাতলা ইত্যাদি। বিভিন্ন ঋতুভেদে এই মোহনাঞ্চলের খাল, খাঁড়ি, প্রভৃতিতে জোয়ারের জলের উচ্চতা প্রায় 1·5 মিটার থেকে 5·0 মিটার অবধি ওঠানামা করে। সাধারণত এই জোয়ারের জলের সর্বোচ্চ মাত্রা বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই-অগাষ্ট মাসেও সর্বনিম্ন মাত্রা শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে লক্ষ্য করা গেছে। ঋতুভেদে জলে লবণের পরিমাণের তারতম্য ঘটে। সুন্দর বনের এই সকল নোনা জলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর লবণ ও জৈব ক্ষয়িত পদার্থ ভেসে আসে যা নোনা-জলের মৎস্য ও চিংড়ি চাষের অনুকূল। প্রায় প্রতি কোটালেই জলের সঙ্গে বহু জাতের চিংড়ি ও মাছের বীজ এই সব এলাকায় প্রবেশ করে। খাঁড়ি বা নদীর পার্শ্ববর্তী বৃহৎ এলাকায় চারদিকে মাটির বাঁধ বেঁধে এই সব মাছ ও চারা চিংড়িগুলিকে জলের সঙ্গে ঢুকিয়ে নেওয়া, ও স্বল্পকালের মধ্যে বিক্রির উপযুক্ত মাপের হলে তা বিক্রি করা একটি প্রচলিত প্রথা। এই ধরণের চাষ পশ্চিমবঙ্গে 'নোনাবেরী' বা 'ভাসাবাঁধা' ও কেরালায় 'পকালি' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের ও উড়িষ্যার উপকূল মোহনা অঞ্চলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এই উপকূলবর্তী জলে বাগ্‌দা জাতীয় চিংড়ি ও অন্য মাছের বীজে পরিপূর্ণ। এই সকল বাগ্‌দাচিংড়ি ও অপর

*সেন্ট্রাল ফিসারীজ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পোঃ কাকদ্বীপ, 24 পরগণা-743347

চিংড়িরা প্রজনন ঋতুতে সমুদ্রে তাদের ডিম ছাড়ে, পরে ডিম থেকে সদ্য ফোটা লাখ লাখ চারা জোয়ারের জলের সঙ্গে গোটা উপকূলবর্তী খাঁড়ি ও নদীতে প্রবেশ করে, যা তাদের পছন্দমত খাদ্য গ্রহণ ও সম্যক বৃদ্ধির পক্ষে একটি উত্তম স্থান। কাজেই এই সব বাগ্‌দা, চাপ্‌ড়া ও অন্য রকমারী চিংড়ির চারাদের যদি যথাযথ পালন করা যায় তবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে চিংড়ির চাষের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে ও তা থেকে বেশ কয়েক কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করা সম্ভব হবে।

ভারতবর্ষ থেকে নানা ধরণের সামুদ্রিক পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এই সমুদ্রজাত পণ্যের মধ্যে চিংড়ির স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কারণ চিংড়ি হল সবচেয়ে সুস্বাদু আহার্যের অন্যতম। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নতিকামী রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিংড়ির চাহিদাও বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে।

ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে চিংড়ির রপ্তানী 1966 সনে 11,470 টন থেকে বেড়ে 1975 সনে 46,831 টনে দাঁড়িয়েছে। তা থেকেই বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চিংড়ির কদর কিরূপ বেড়েছে তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাপান ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে চিংড়িপ্রেমিক দেশ, যাদের ক্রয়ক্ষমতাও অপরিসীম এবং দুনিয়ার মোট চিংড়ি উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশই তারা আমদানী করতে সমর্থ। ভারতের নানাধরণের চিংড়ির মধ্যে 'বাগ্‌দা'র স্থানই শ্রেষ্ঠ। সাধারণত বাগদাকে (Penaeus monodon) ইংরেজীতে 'টাইগার শ্রিম্প' বা 'জাম্বো শ্রিম্প' বলা হয়, কারণ এদের দেহে চিতাবাঘের মতন ডোরা কাটা দাগ লক্ষ্য করা যায়।

সুন্দরবন অঞ্চলে সারা বছরই বাগ্‌দার চারা পাওয়া যায়। এরা দৈর্ঘ্যে 10-14 মি মি. হয়, যদিও মার্চ মাস থেকে জুন মাসেই এদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি তবুও একটু বড় আকারের চারা জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসেই বেশি সংখ্যক পাওয়া যায়। বাগ্‌দাচিংড়ি আকৃতিতে বড় ও পরিণত, এদের বৃদ্ধির হারও দ্রুত। তাছাড়া বীজের প্রাচুর্যতা ও জলের লবণের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি সহনের বিশেষ ক্ষমতা ইত্যাদি নানাকারণে এরাই নোনাজলে সর্বাপেক্ষা বেশি চাষযোগ্য। বাগ্‌দা সর্বভুক, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের জলজ ছোট প্রাণী ও উদ্ভিদ এদের খাদ্য। ক্ষুদ্রাবস্থায় এরা এক ধরণের শ্যাওলা যাকে ডায়াটম বলে তা ও অন্যান্য শ্যাওলাও খেয়ে জীবনধারণ করে। বাগ্‌দা চিংড়ি প্রায় 300 মি. মি. অবধি লম্বা হয়। 40-50 মি. মি. দৈর্ঘ্যের চিংড়ি উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান পেলে ছয় মাসেই 150 থেকে 170 মি. মি. পর্যন্ত বাড়ে ও ওজনে প্রায় 30-50 গ্রাম হয়ে থাকে। সুন্দরবনের খাঁড়ি, খাল ইত্যাদি স্থানে জোয়ারের জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তি জাল (shooting net) ব্যবহার করে বাগ্‌দার চারা সংগ্রহ করা যায়। বিস্তি জাল অনেকটা ত্রিকোণা-কৃতি হয়, জোয়ারের জলের উচ্চতানুসারে এর চওড়া অংশটি স্রোতের দিকে ও পশ্চাতের সরু অংশটি অপর প্রান্তে বাঁশের সাহায্যে খাটাতে হবে। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর জলের 'শেষ ভাগ' বা 'গামছা অংশ' থেকে ছোট চারাদের তুলে নেওয়া হয়। বিস্তি জালে সংগৃহীত চারাদের মধ্যে নানা জাতের চিংড়ি মেশানো থাকে, সেগুলি থেকে বিশেষ করে বাগ্‌দা চারাদের পৃথক করা প্রয়োজন। একটি পাত্রে জলের সঙ্গে সংগৃহীত চারাদের রেখে দিয়ে দেখা যায় বাগ্‌দার চারারা জলের উপরিভাগে ভেসে বেড়ায় ও যখনই কোন খড়কুটো কিংবা ঘাসের টুকরো জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তখনই তাকেই ঝাঁকে ঝাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে এবং সহজেই তাদের আলাদা করে নেওয়া সম্ভব হয়। প্রাচুর্যের মাসে প্রতি জোয়ারে জালপিছু প্রায় 10,000 মত এই চিংড়ি চারা সংগ্রহ করা সম্ভব। ছোট অবস্থায় (14 মি. মি.) এদের পেটের দিকে আগাগোড়া টানা লাল দাগ লক্ষ্য করা যায়, পরে 20 মি. মি. ও তার অধিক হলে বাচ্চাদের সারা

খোলসে একটি সবুজ রং ছড়িয়ে পড়ে ও লাল দাগটি ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়। জোয়ারের জল থেকে সংগৃহীত বাগ্‌দা চারাদের ছোট অবস্থায় কিছুকালের জন্যে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন, সেজন্যে তাদের বিশেষ ধরণের ছোট পুকুরে বা আতুর পুকুরে (nursery pond) পালন করা দরকার। আতুর পুকরে রাখার পূর্বে পুকুরটিকে কিছু দিন রৌদ্রালোকে অনাবৃত অবস্থায় রাখতে হবে, পরে জৈব সার হিসাবে পরিমাণ মতন গোবর অথবা মুরগীর বিষ্ঠা সার হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এর অনতিকাল পরেই পুকুরে প্রয়োজন মত জল ঢোকানো দরকার। আতুরে পুকুরের বিকল্প হিসাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাগ্‌দা চারাদের প্লাষ্টিক নির্মিত আধারেব মধ্যে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পালন করেও বিশেষ উৎসাহ-জনক ফল পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে বড় 400 লিটার আয়তনবিশিষ্ট প্লাষ্টিক আধারগুলির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকটিতে মিঠা ও নোনা জলের সংমিশ্রণ রাখা হয় ও তাতে অজৈব সার হিসাবে কিছুটা ইউরিয়া প্রয়োগ করে সূর্যালোকে রাখতে হয়, এতে কয়েক দিন পরে জলে যথেষ্ট পরিমাণ ক্লোরেলা (chlorella) নামক শ্যাওলার আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি প্লাষ্টিক আধারে লিটার প্রতি 10টি চিংড়ি চারা ছাড়া সম্ভব। প্রথম দু'সপ্তাহ পরে তা কমিয়ে লিটার প্রতি 5টি ও চতুর্থ সপ্তাহে তা আরো কমিয়ে লিটার প্রতি 2.5টি করা হয়। এই সব চিংড়ি চারা দু-মাসেই মোটামুটি 50-55 মি. মি পর্যন্ত লম্বা হয়, যা বড় লালন পুকুরে (rearing pond) রাখার পক্ষে অতি উত্তম। প্রতি তিন দিন পর পর প্লাষ্টিক আধারের জল পরিবর্তন ও নিচের ময়লা সাফ করা একান্ত প্রয়োজন। কিছু জলজ উদ্ভিদও প্লাষ্টিক আধার গুলিতে রাখা যেতে পারে। এ সময় পরিপূরক আহার হিসাবে শুকনো মাছের গুঁড়ো চিংড়ি চারাদের মোট ওজনের 20 ভাগ হিসাবে প্রতিদিন 3-4 বার পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। গতানুগতিক প্রথায় বাগ্‌দা চাষে চিংড়ি চারাদের বেঁচে থাকার হার অতি অল্প, কিন্তু উন্নত প্রথায় সুষ্ঠু জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বাগ্‌দা চাষে শতকরা 70-80 ভাগ বাঁচিয়ে রাখা ও কঠিন নয়। চিংড়ি চারার সুষ্ঠু নির্বাচন ও সঠিক জল পরিচালন পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখা গেছে যে হেক্টর প্রতি 40,000 চারা মজুত করে চাষের পর্যায়কাল কমিয়ে মোট 1054.81 কি গ্রা. উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে আরো একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন। আমাদের দেশে কৃত্রিম উপায়ে বাগ্‌দা চিংড়ির প্রজনন অঙ্গের বিকাশ ও ডিম্ব-স্ফোটনের সাহায্যে ছোট চারার উদ্ভাবন কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের বকখালি মৎস্য খামারে সাফল্যের সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছে, এই সাফল্য এ অঞ্চলে মৎস্য চাষীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। সন্ধিপদ পর্বভুক্ত খোলাযুক্ত (ক্রাস্টিসিয়ান) শ্রেণীব প্রাণীদের পুঞ্জাক্ষিবৃন্তে এক ধরনের হরমোন সঞ্চিত থাকে, যা সেই শ্রেণীর প্রাণীর জনন-অঙ্গ বিকাশের ও খোলস ছাড়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীব-বিজ্ঞানিগণ কাঁকড়া ও সেই জাতীয় প্রাণীর পুঞ্জাক্ষিবৃন্ত অপসারণ করে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে প্রাণীর বয়স ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে তার প্রজনন-অঙ্গের দ্রুত বিকাশ ঘটানো সম্ভব। উক্ত ধারণার পরি-প্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে একটি পুঞ্জাক্ষিবৃন্তের অপসারণ দ্বারাও চিংড়ির প্রজনন-অঙ্গের বিকাশ ঘটানো যায়। বাগ্‌দা চিংড়ির কৃত্রিম প্রজননের পরীক্ষায় মোট 7টি স্ত্রী ও 11টি পুরুষ চিংড়িকে নির্বাচিত করা হয়েছিল, এদের মোট দৈর্ঘ্য ছিল 195 মি. মি. থেকে 218 মি মি-এর মধ্যেও ওজন 50-78 গ্রাম। প্রাণীগুলিকে প্রথমে নোনাজলের পরিবেশে ধাতস্থ করানোর পর ও পুকুরের জলে নাইলনের তৈরী খাঁচাতে রাখা হয়েছিল, ঐ সময়

জলের উচ্চতা 2 মিটার ও তাপমাত্রা 22·4 ডি. সে. ও লবণের পরিমাণ 15 পি.পি.টি (অর্থাৎ হাজারের 15 ভাগ) ছিল। অতঃপর প্রাণীদের একটি চক্ষু-গোলকের মধ্যবরাবর ব্যবচ্ছেদ করা হয় ও আঙ্গুলের সামান্য চাপ সৃষ্টি করে অক্ষির ভিতরস্থ বস্তুগুলিকে বের করে নেওয়া হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুঞ্জাক্ষিবৃন্তের অপসারণের অনতিকাল পরেই ঐ স্থানটিকে শতকরা 5 ভাগ পটাশের জলে ধুয়ে ফেলা হয় যাতে ঐ স্থানটিতে কোন প্রকার জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

এই পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলার সময় পার্শ্বস্থ বাড়ি থেকে নোনা জল পুকুরে প্রবেশ করিয়ে পুকুরের জলে লবণের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে হাজারের 25 ভাগ পর্যন্ত তোলা হয়েছিল। ঐ সময় প্রাণীগুলিকে খাদ্য হিসাবে কুঁচোচিংড়ি ও অন্য মাছের দেহাবশেষ মোট ওজনের শতকরা 10 ভাগ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় 38 দিন পরে তিনটি স্ত্রী-চিংড়ির জনন-অঙ্গের পূর্ণ পরি-পক্বতা লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় তিনটি স্ত্রী বাগ্‌দা চিংড়িকে নাইলন ও বাঁশের পাটানির্মিত আধারের মধ্যে রেখে সমস্ত বাঁশের আধারটিকে পার্শ্বস্থ নোনা জলের খাঁড়িতে ডুবিয়ে রাখা হয়, যাতে তারা অনবরত জলস্রোতে যথেষ্ট অক্সিজেন পেতে পায়।

প্রায় দুই দিন পরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে দুটি চিংড়ি পূর্ণরূপে ও তৃতীয়টি আংশিকরূপে ডিম্ব নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয়েছে। পরে ঐ বাঁশের আধারের ভিতরস্থ নাইলন নির্মিত আধারের ভিতরের জল সূক্ষ্ম 'প্ল্যাংক্টন নেটের' সাহায্যে ছেঁকে পরীক্ষা করে চিংড়ির জীবনচক্রের অন্তর্ভুক্ত 'নপ্‌লিয়স' নামক বিশেষ অবস্থাটিকে পর্যবেক্ষণ করা গেছে যা খাঁড়ির জলে অনুপস্থিত।

এই নপ্‌লিয়স অবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে বাগ্‌দাচিংড়ির ছোট চারারা নিজস্ব আকার প্রাপ্ত হয়।

এই বিশেষ উন্নত প্রক্রিয়ার সাহায্যে কেবলমাত্র প্রকৃত বাগ্‌দা চারা পাওয়া সম্ভব যার মূল্য ব্যবসাভিত্তিক বাগ্‌দাচিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অপরিসীম।

লেখক ও প্রকাশকদিগের প্রতি নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান পুস্তকের লেখক ও প্রকাশকদিগকে দুই কপি পুস্তক পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আমাদের নক্ষত্র

অরূপরতন ভট্টাচার্য*

প্রাচীনকালে নক্ষত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা অলস বিলাসমাত্র ছিল না। আমাদের জীবনধারণ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে বিষয়টির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের নক্ষত্র সংক্রান্ত বিভাগটি কৃষির অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রয়োজনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের উন্নত মানুষেরই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

হিপারকাস ছিলেন পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্রাট। তাঁর জন্ম 190 খৃষ্ট-পূর্বাব্দে, বিথিনিয়ার অন্তর্গত নিসিয়া নামক স্থানে। তিনি খ-গোলে 1008-টি নক্ষত্রের অবস্থানসমন্বিত একটি নক্ষত্র-সারণী রচনা করেন। খালি চোখে প্রায় ওই রকম নক্ষত্রই পর্যবেক্ষণ করা চলে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে টাইকো ব্রাহে (1546-1601) আর একটি নক্ষত্র-সারণী প্রস্তুত করেন। সেই তালিকাতে তিনি 1005-টির বেশি নক্ষত্রের উল্লেখ করতে পারেন নি। অবশ্য হিপারকাসের জন্মের প্রায় তিন শতাব্দী পরে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমি (দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ) তাঁর অ্যালমাজেষ্ট গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে একটি নক্ষত্র-সারণীতে 1028-টি নক্ষত্রের উল্লেখ করেন। কিন্তু এর মধ্যে তিনটি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে দু-বার করে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও কয়েকটি নক্ষত্রের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। তারকা খচিত রাত্রির আকাশ বৈদিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আকর্ষণ করে বিশেষ ভাবে। বিষয়টি সম্পর্কে তাঁরা আগ্রহী হন, চিন্তা-ভাবনা করেন। তাই ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে খানিকটা বিক্ষিপ্ত এবং অবিন্যস্তভাবে হলেও কয়েক নক্ষত্রের উল্লেখ নজরে আসে।

নক্ষত্রের সংজ্ঞা কি ?

নক্ষত্র কি তারকার প্রতিশব্দ, একই অর্থে উভয়ের ব্যবহার এবং প্রয়োগ ? নাকি সে ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। ঋগ্বেদে (1/50/2) আছে, সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্যের আগমনে নক্ষত্রগণ তস্করের ন্যায় রাত্রির সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। অথর্বসংহিতাতেও (13/2/17) এই মন্ত্রের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। নক্ষত্রের অর্থ কি এখানে স্পষ্ট ? কিন্তু ঋগ্বেদের অন্য একটি মন্ত্র লক্ষ্য করি (10/85/2)। মন্ত্রটিতে নক্ষত্রের মধ্যে সোম স্থাপিত এমন কথা বলা হয়েছে। এইখানে নক্ষত্রের অর্থ অনুধাবনে অসুবিধা হয় না। এক একটি নক্ষত্র চান্দ্র পথের উপরে অবস্থিত এক একটি তারকামণ্ডল। যেখানে শুধু তারকার উল্লেখ, সেখানে স্তৃ শব্দের প্রয়োগ আছে।

হিপারকাস, টাইকো ব্রাহে বা টলেমি যে সারণী প্রকাশ করেন, তাতে তাঁরা তারকার সংখ্যা নির্দেশ দেন, নক্ষত্রের উল্লেখ নয়।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই সূর্যের বার্ষিক চলার পথ ক্রান্তিবৃত্তের সন্ধান জানতেন। সূর্য মহাকাশে তারকাপুঞ্জের ভিতর দিয়ে পূর্বমুখী একটি গতিতে 365 দিনে 6 ঘণ্টা 9 মিনিট 9·5 সেকেণ্ডে বৃত্তাকার পথে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। সূর্যের এই আবর্তন পথ ক্রান্তিবৃত্ত বা ecliptic নামে পরিচিত। সূর্যের মত চন্দ্রও তারকা-পুঞ্জকে অবলম্বন করে মহাকাশকে আবর্তন করে

*103/E, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-700 029

আসে। এই আবর্তনকাল মাত্র 27⅓ দিন। রবি পথ এবং চন্দ্র পথ এক নয়। কিন্তু দুই পথের মধ্যে পার্থক্যও সামান্য। এত সামান্য যে, চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্ধারণের সময়ে যে ব্যবধান গণনা না করলেও চলে। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দিনগুলি স্থির করবার উদ্দেশ্যে এবং চন্দ্রের গতি নির্ধারণের জন্যে 27⅓ দিনের সামঞ্জস্যপূর্ণ 28-টি তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। পরে অবশ্য গণনার সুবিধার জন্যে একটি তারকাপুঞ্জ বর্জিত হয়।

ঋগ্বেদে এই সব চান্দ্র পথের উপরে অবস্থিত তারকাপুঞ্জের বা নক্ষত্রের সবগুলির উল্লেখ নেই। কিন্তু একাধিক স্থানে তিষ শব্দটির উল্লেখ (5/54/13, 10/64/8) লক্ষণীয়। শব্দটি চান্দ্র পথের উপরের অষ্টম নক্ষত্র মনে হয়। চতুর্দশ নক্ষত্র চিত্রারও উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে একটি মন্ত্রে একই সঙ্গে অঘা অর্থাৎ দশম নক্ষত্র মঘা এবং অর্জুনী অর্থাৎ মঘার পরবর্তী একাদশ এবং দ্বাদশ নক্ষত্রদ্বয় পূর্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনীর (10/85/13) কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে চান্দ্র পথের উপরে স্থাপিত প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনীর কথাও আছে (7/68/1), (8/22/3)। ঋগ্বেদে চান্দ্র পথের বাইরে সপ্তর্ষিমণ্ডলের উল্লেখ আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্তবিপ্রাঃ (3/7/7) মন্ত্রে সপ্তবিপ্রা মন্ত্রে কি সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথা বলা হয়েছে ?

নক্ষত্র সংক্রান্ত ভারতীয় চিন্তা কত প্রাচীন নির্দেশ করার জন্যে বৈদিক সাহিত্যের কালের ব্যাপ্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই কাল বিতর্কমূলক এবং সত্য কথা বলতে কি সঠিক ভাবে নির্দেশ করা কঠিন। কিন্তু বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবার জন্যে বৈদিক কালের ব্যাপ্তি অর্থাৎ প্রারম্ভ থেকে অন্তকাল খৃষ্টপূর্ব 2000 বা 2500 অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব 750 এবং 500 অব্দের অন্তর্বর্তী কোন সময় হিসেবে সিদ্ধান্ত করা সব দিক দিয়ে সমীচীন হবে বলে মনে হয়। এই কালক্রম বৈদিক বিশেষজ্ঞ Winternitz অনুমোদিত।

প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই জ্যোতিষ এবং নক্ষত্রচর্চা লক্ষ্য করা যায়। এই চর্চা ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর। কৃষির সঙ্গে জলের নিবিড় সম্পর্ক। নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা যে কোন প্রাচীন সভ্য জাতির ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল। তাই গ্রিস ইউফ্রেতিস নদী, নীল নদ, হোয়াং হো একটি আবর্তমান তৎপরতায় জলসেচের উপযুক্ত হয়। সেচের প্রয়োজনে এই তৎপরতার হিসেবে রাখা অবশ্য কর্তব্য। ইউফেতিস ও তাইগ্রিসের মধ্যবর্তী স্থলভূমিতে, মিশরের নীল নদের অববাহিকায়, চীনদেশে হোয়াং হোর কূলে প্রাচীনতম সভ্যজাতিগুলি লক্ষ্য করেছিল যে, তারকাখচিত রাত্রির আকাশ অবলম্বনে এই তৎপরতার একটা কার্যকরী হিসাব রাখা চলে।

পঞ্জিকার বা স্থূলভাবে কালবিভাজনের আদিরূপের এই হল গোড়ার কথা।

প্রাচীন পৃথিবীতে সময়ের প্রাথমিক হিসেব সূর্যের উদয়াস্ত অবলম্বনে। অনন্তকাল যে দিন রাত্রির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়, স্বাভাবিকভাবে সকল সভ্য জাতির মধ্যে এ সচেতনতা আসবে। কিন্তু সময়ের দীর্ঘতার এককগুলি কিভাবে গঠিত হল ? দিন ও রাত্রির চেয়ে সময়ের দীর্ঘতর বিভিন্ন একক পরিমাপের ক্ষেত্রে সূর্য অপেক্ষা প্রথমে চন্দ্রের দিকেই সঙ্গত কারণে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কথা।

চন্দ্রের কলার নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি আছে। তার অমাবস্যা-পূর্ণিমা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। দুটি অমাবস্যা বা দুটি পূর্ণিমার মধ্যে সূর্যের উদয়াস্ত-সংখ্যা যে নির্দিষ্ট এবং একটি অমাবস্যা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা বা একটি পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী অমাবস্যার সময়কাল যে সমান এবং তা যে 2টি পূর্ণিমা বা 2টি অমাবস্যার সময়কালের অর্ধেক—কাল বিভাজনের ক্ষেত্রে এই সত্যটিকে যে কোন অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতূহলী জাতি কাজে লাগাবেন।

চন্দ্রের এই পর্যায়কাল ঋতুর হিসাব নির্দেশ করাকে অনেকটা সহজ করে তুলল। নিঃসন্দেহে একটি ঋতুর পুনরাবর্তন সূর্যের উদয়াস্তের হিসাবের দ্বারা

নির্দিষ্ট করার চেয়ে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা অবলম্বনে নির্দিষ্ট রাখা তুলনামূলকভাবে সহজ।

এই ভাবে ক্রমে ক্রমে দিন, মাস এবং বছরের ধারণা গঠিত হয়। কিন্তু সময়ের এই হিসাব ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রাচীন গ্রীকেরা এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব 500 অব্দে নবরিয়ান্ চান্দ্রমাসের দিনসংখ্যার সঠিক নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, একটি চান্দ্রমাস 29 530614 দিনে নির্দিষ্ট। আধুনিক হিসাবের সঙ্গে এই দিনসংখ্যার সামান্যই পার্থক্য আছে। আধুনিক হিসাবে চান্দ্রমাসে দিনের সংখ্যা 29·530596।

প্রাচীন পৃথিবীর সকল আগে চান্দ্রভিত্তিক মাস ও বৎসর গণিত হয়। অধিকতর সক্ষম ও বিজ্ঞানসম্মত গণনায় সূর্যকে অবলম্বন করা হয় পরবর্তীকালে। কারণ সূর্যের আবর্তনের সঙ্গেই ঋতুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বৈদিক সভ্যতার প্রথম পর্বে 30 দিনে মাস ও 12 মাসে বা 360 দিনে বছর ধরে এক চান্দ্র-পঞ্জিকার ব্যবহার ছিল লক্ষ্য করা যায় এই পঞ্জিকার খ্রীষ্টের আবির্ভাবের 2000 অব্দেরও পূর্বের ব্যাবিলনের পঞ্জিকার অনুরূপ। জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণে মিশর ব্যাবিলনের মত উন্নত ছিল না, কিন্তু তার পঞ্জিকার ইতিহাস সুপ্রাচীন। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম সহস্রাব্দে মিশরে চান্দ্রমাসের ভিত্তিতে বৎসরের হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে, সময় গণনার সুবিধার জন্যে চান্দ্রপথকে 27/28 ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, পূর্বে বলেছি।

নক্ষত্রকে অবলম্বন করে প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশে সময়ের হিসেব রাখার এবং ঋতু নির্ণয়ের আদি রূপের কথা একটি সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাক।

বর্তমান যুগে অবশ্য নক্ষত্র অবলম্বনে ঋতু নির্ণয়ের সরাসরি কোন কারণ নেই। আমাদের হাতের ক্যালেণ্ডার এবং পঞ্জিকা আছে। সময়ের কনিষ্ঠতর বিভাজন নির্দেশের জন্যে ঘড়ি নিত্যসঙ্গী।

কিন্তু উর্বর চিন্তায় যদি বর্তমান যুগকেই আমরা ঘড়িবিহীন, ক্যালেণ্ডারবর্জিত, পঞ্জিকা ছাড়া একটি যুগ হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে কেবলমাত্র মহাকাশের নক্ষত্র অবলম্বনেই এখনও আমরা ঋতুর পূর্বাভাস দিতে পারি এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে কালনির্ণয়ও।

যে কৃষির দিকে প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির দৃষ্টি ছিল সেই কৃষির দিকে তাকিয়ে বর্ষার পূর্বাভাসের কথাই বলি। সরকারীভাবে বর্ষার সূচনা আষাঢ় মাসে। তাহলে তার পূর্বাভাস দেওয়া চলতে পারে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়ে। এই সময়ে আমাদের আকাশে কোন তারকাকে লক্ষ্য করা যাক; উজ্জ্বল সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আকাশে অনুকূল অবস্থানে আছে এমন তারকা বা তারকামণ্ডল (যাকে আমরা নক্ষত্র নামে অভিহিত করি)।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রায় মাঝে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল তারকাকে আমরা অনেকটা মাথার উপরের আকাশে দেখতে পাই। তারাটির নাম স্বাতী। এই তারাটি খুব উজ্জ্বল। আকাশে খালি চোখে যত উজ্জ্বল তারা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, স্বাতী তার মধ্যে ষষ্ঠ, ক্লাসের সিক্স্থ বয়ের মত। এই তারাটির আরও বৈশিষ্ট্য আছে। চান্দ্রপথকে যে 27/28টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি বিভাগের তারায় তারায় এক একটি নক্ষত্র গঠন করা হয়, স্বাতী সেই রকমই একটি নক্ষত্র। তবে স্বাতী নক্ষত্রে আছে একটিমাত্র তারকা। তারাটি বিদেশী বুটেস (Bootes) মণ্ডলের আর্কটারাস (Arcturus) তারকা। এটি চান্দ্রপথের উপরে পঞ্চদশ নক্ষত্র।

এই নক্ষত্রটিকে অবলম্বন করে আমরা বর্ষাঋতুর পূর্বাভাস দিতে পারি।

বছরের পর বছর যদি সন্ধ্যার অন্ধকারের আকাশ পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, সূর্য অস্তে যাবার কিছু সময় পরে যখন স্বাতী নক্ষত্র মাথার উপরের আকাশে উঠে আসে তার কিছুদিন বাদেই বর্ষা নামে। প্রাচীন কালের নক্ষত্র পর্যবেক্ষকেরা মহাকাশের উজ্জ্বল তারা, তারকামণ্ডল

এবং চান্দ্রপথের উপরের নক্ষত্রদের চিনতেন। ফলে তারকাপটে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা একেবারেই কষ্টসাধ্য ছিল না। স্বাতী নক্ষত্রের উত্তরে সপ্তর্ষি-মণ্ডল, পশ্চিমে সিংহাকৃতি সিংহ রাশি এবং দক্ষিণে কন্যারাশি।

প্রাচীন মিশরীয়েরা জুন মাসে আকাশে সর্বোজ্জ্বল তারকা লুব্ধকের (Sirius) বা Canis Major মণ্ডলের আলফা তারকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নীলনদের প্রথম বন্যার সম্পর্ক আছে লক্ষ্য করেছিল।

চান্দ্রপথ যে নক্ষত্রদের দ্বারা বিভক্ত তৈত্তিরীয় সংহিতায় (4/4/10) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (3/1/1) তার সবগুলিরই নাম আছে।

চন্দ্রের সাতাশ নক্ষত্রের নাম: অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বআষাঢ়া, উত্তরআষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা এবং রেবতী। ভারতীয় পুরাণে এই সাতাশটি নক্ষত্র চন্দ্রের সাতাশটি পত্নী হিসেবে কল্পিত।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেখানে আঠাশটি নক্ষত্রের কল্পনা, সেখানে অভিজিৎ নামে আর একটি নক্ষত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এটির অবস্থান উত্তরআষাঢ়া এবং শ্রবণার মধ্যবর্তী অংশে। ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং যজুর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষেও চান্দ্রপথের উপরের সাতাশ নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। তবে সে উল্লেখ সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে। বিভিন্ন নক্ষত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে সাঙ্কেতিক পদ্ধতিতে, হয় নক্ষত্রের অন্ত্যাক্ষর বা আদ্যক্ষর দিয়ে, না হলে নক্ষত্রের অধিপতি দেবতার নামের সাহায্যে। সারণীর সূচনা প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনীর অন্ত্যাক্ষর অবলম্বনে। তারপর প্রতি ষষ্ঠ নক্ষত্র উল্লেখ করে নক্ষত্রচক্র সম্পূর্ণ করা হয়েছে। নক্ষত্রগুলিকে 1, 2, 3,···25, 26, 27 দিয়ে নির্দেশ করলে, তালিকায় নক্ষত্রের ক্রমপর্যায়,

1, 6, 11, 16, 21, 26
4, 9, 14, 19, 24, 2
7, 12, 17, 22, 27, 5
10, 15, 20, 25, 3, 8
13, 18, 23।

ভারতীয়েরা চান্দ্রমাসের ভিত্তিতে কাল গণনার সময়ে এক বা একাধিক তারকায় গঠিত চান্দ্রপথের উপরের নক্ষত্রগুলিকে সুচিহ্নিত করবার জন্যে বিশেষ উদ্যোগী হন। তাঁরা নক্ষত্রগুলিতে তারকাসংখ্যা নির্দেশ করেন। নক্ষত্রের আকার বর্ণনা করেন এবং সেই সঙ্গে নক্ষত্রের যোগতারার নির্দেশ দেন।

যোগতারা কি?

যোগতারা প্রতিটি নক্ষত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তারকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই তারাটি নক্ষত্রের সর্বোজ্জ্বল তারকা। শ্রীপতির রত্নমালা গ্রন্থে নক্ষত্রের আকার বর্ণিত আছে:

অশ্বিনীর অশ্বমুখ, ভরণীর যোন্যাকার, কৃত্তিকার ক্ষুর, রোহিণীর শকট, মৃগশিরার মৃগশির, আর্দ্রার মণি, পুনর্বসুর গৃহ, পুষ্যার বাণ, অশ্লেষার চক্র, মঘার শালা, পূর্বফল্গুনীর শয্যা, উত্তরফল্গুনীর মঞ্চ বা শয্যা, হস্তার হস্ত, চিত্রার মুক্তা, স্বাতীর প্রবাল, বিশাখার তোরণ, অনুরাধার বলি, জ্যেষ্ঠার কুণ্ডল, মূলার সিংহপুচ্ছ, পূর্বআষাঢ়ার মঞ্চ, উত্তরআষাঢ়ার হস্তিদন্ত, অভিজিৎ শৃঙ্গাটক, শ্রবণার ত্রিপদ, ধনিষ্ঠার মৃদঙ্গ, শতভিষার চক্র, পূর্বভাদ্রপদার যমলদ্বয়, উত্তর ভাদ্রপদার শয্যা এবং রেবতীর মৃদঙ্গ।

আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তারকা-সংখ্যারও উল্লেখ আছে। কিন্তু এই তারকা সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়।

বরাহমিহির বিভিন্ন নক্ষত্রে যে তারকা সংখ্যা উল্লেখ করেন, লল্ল এবং শ্রীপতির তারকা-সংখ্যার সঙ্গে তার সর্বত্র মিল নেই। বৃদ্ধ গার্গীয় সংহিতার তারকা-সংখ্যার তালিকার সঙ্গে এ দুটি তালিকায় কোথাও মিল আছে, কোথাও পার্থক্য।

তিনটি ক্ষেত্রে তারকা সংখ্যার উল্লেখ করছি:

	বৃদ্ধগার্গীয় সংহিতা	বরাহমিহির	লল্ল/শ্রীপতি
অশ্বিনী	2	2	3
ভরণী	3	3	3
কৃত্তিকা	6	6	6
রোহিণী	5	5	5
মৃগশিরা	3	3	3
আর্দ্রা	1	1	1
পুনর্বসু	2	5	4
পুষা	1	3	3
অশ্লেষা	6	6	5
মঘা	6	5	5
পূর্বফল্গুনী	2	8	2
উত্তরফল্গুনী	2	2	2
হস্তা	5	5	5
চিত্রা	1	1	1
স্বাতী	1	1	1
বিশাখা	2	5	4
অনুরাধা	4	4	4
জ্যেষ্ঠা	3	3	3
মূলা	6	11	11
পূর্বআষাঢ়া	4	2	4
উত্তরআষাঢ়া	4	8	4
অভিজিৎ	3	3	3
শ্রবণা	3	3	3
ধনিষ্ঠা	4	5	4
শতভিষা	1	100	100
পূর্বভাদ্রপদা	2	2	2
উত্তরভাদ্রপদা	2	8	2
রেবতী	4	32	32

আধুনিক গবেষকেরা প্রাচীন কালের নক্ষত্র পর্যবেক্ষকদের নক্ষত্রের আকার-বর্ণনা, তারকা-সংখ্যার উল্লেখ এবং যোগতারার অবস্থানের নির্দেশ দেখে নক্ষত্রগুলি সঠিক কোন্ কোন্ তারকায় গঠিত তা নির্ণয় করবার চেষ্টা করে আসছেন।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য অসুবিধা আছে এবং যে অসুবিধা একেবারে সামান্য নয়। নক্ষত্রকে যদি একটি নির্দিষ্ট আকারবিশিষ্টও মনে করি, তাহলেও অসুবিধা দেখা দেয় তারকা-সংখ্যা নিয়ে। যোগতারা কোন্‌টি তা নির্দেশেও অনেক সময়ে ভিন্ন মত নজরে আসে।

বিভিন্ন নক্ষত্রের যোগতারা নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি কি?

যোগতারার ক্ষেত্রে ভারতীয় নক্ষত্র পর্যবেক্ষকেরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বা সর্বোজ্জ্বল তারকা বলেই নিশ্চিন্ত থাকেন নি। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরিমাপে তারা নক্ষত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ করেন। সূর্য-সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ এবং অন্যান্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রন্থে নক্ষত্রের যোগতারার অবস্থান নির্দেশ আছে।

বিস্ময়ের কথা। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতি-বিজ্ঞানের কোন কোন গ্রন্থে একাধিক নক্ষত্রের যোগতারার নির্দেশে নিখুঁত হিসাব লক্ষ্য করা যায়। এই সব ক্ষেত্রে যোগতারাটি নির্ণয় করা যায় সহজেই। পুনর্বসু নক্ষত্রের যোগতারার ক্ষেত্রে ভারতেতিহাস গবেষকেরা যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাতে কোথাও বিতর্কের সৃষ্টি হয় নি। কোলব্রুক (Colebrooke), বেণ্টলি (Bentley), বার্জেস (Burgess), বাপুদেব শাস্ত্রী সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রত্যেকেই জেমিনি (Gemini) মণ্ডল বা মিথুন রাশির বিটা (Beta) তারকাটিকে যোগতারা হিসেবে নির্দেশ করেছেন। তারাটির বিদেশী নাম পোলাক্স (Pollux)। এটি বিশেষ উজ্জ্বল এবং খালি চোখে দেখা আকাশের প্রথম কুড়িটি উজ্জ্বলতম তারকার মধ্যে পঞ্চদশ তারকা।

যোগতারার ক্ষেত্রে পুনর্বসুর বেলায় মতের অভিন্নতা থাকলেও আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগতারা নির্ণয়ে বিশেষ মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। অথচ প্রাচীন ভারতের সমস্ত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে আর্দ্রা নক্ষত্র একটি মাত্র তারকাযুক্ত। তাহলে আর্দ্রার যোগতারা নির্ণয়ের অর্থ সমস্ত নক্ষত্রটি নির্দিষ্ট করা।

কিন্তু আর্দ্রার যোগতারা সম্পর্কে কোলব্রুকের অভিমত, আলফা ওরায়ন (Alpha orion) অর্থাৎ ওরায়ন মণ্ডলের আলফা তারকা। বেন্টালি বলেছেন, 133 টৌরি অর্থাৎ টরাস (Taurus) মণ্ডলের 133 সংখ্যক তারকা। বার্জেস এবং বাপুদেব শাস্ত্রী অবশ্য টরাস মণ্ডলের ওই তারাটিকেই যোগতারা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। টরাস মণ্ডলের তারকাটির চেয়ে ওরায়ন মণ্ডলের আলফা তারকাটি অনেক বেশি উজ্জ্বল, আকাশের উজ্জ্বলতম কুড়িটি তারকার মধ্যে স্থান দ্বাদশ। এই তারাটির বিদেশী নাম বিটেলগিয়ুস (Betelgeuse)।

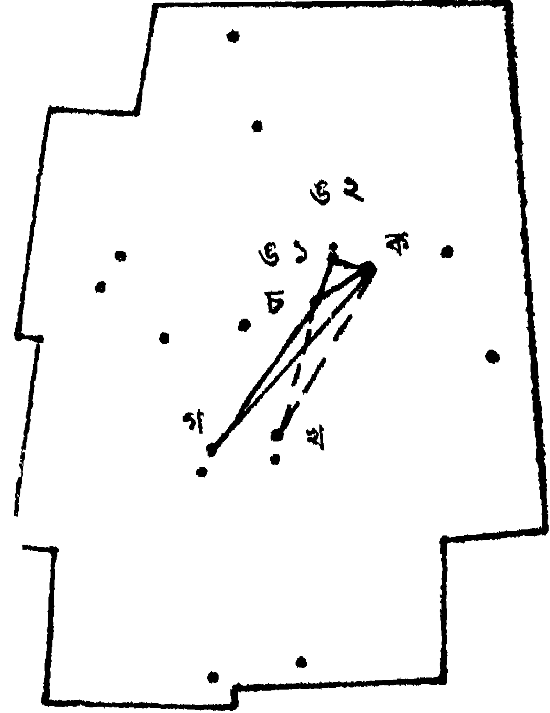
যেখানে যোগতারা বিতর্কের ঊর্ধ্বে সেখানেও একাধিক তারকায় গঠিত নক্ষত্রের ক্ষেত্রে সব কয়টি তারকাই যে সহজে নির্ণয় করা যায়, তা নয়।

অভিজিৎ নক্ষত্রটির কথা ধরা যাক। এটি বর্তমানে নক্ষত্র সারণী থেকে বর্জিত। যে সময়ে 28টি নক্ষত্রে চান্দ্রপথটি বিভক্ত ছিল, সেই সময়ে অভিজিৎ ছিল দ্বাবিংশ নক্ষত্র। পরবর্তী কালে যখন দেখা গেল যে চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি সাতাশটি নক্ষত্রের সাহায্যে অধিকতর সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা চলে, তখনই অভিজিৎ বর্জিত হল।

অভিজিৎ নক্ষত্রের যোগতারা ভেগা (Vega)— সকলেই এটি স্বীকার করেছেন। এটি লিরা (Lyra) মণ্ডলের আলফা তারকা। আকাশের সর্বোজ্জ্বল কুড়িটি তারকার মধ্যে এটি চতুর্থ।

এই যোগতারা নিয়ে শৃঙ্গাটক আকৃতিবিশিষ্ট এবং তিন তারাযুক্ত অভিজিতের অন্য দুটি তারকাকে কি নির্দিষ্ট করা চলে?

শৃঙ্গাটক পানিফল অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতি। তিনটি বিন্দুর সাহায্যে একটি ত্রিভুজ গঠিত হয়। এর একটি যোগতারা। ত্রিভুজের অন্য দুটি শীর্ষবিন্দু কোন্ কোন্ তারকায় গঠিত? যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পানিফলসদৃশ আকৃতির জন্যে নিকটবর্তী আর যে দুটি তারকার কথা বলেছেন, তারা হল লিরা মণ্ডলের জিটা (Zeta) এবং ওই একই মণ্ডলের এপসাইলন (Epsilon) তারকা (কচঙ ত্রিভুজ) (চিত্র-1)।



অভিজিৎ

চিত্র-1

কিন্তু এপসাইলন একটি তারকা নয় ওটি খুব কাছে অবস্থিত দুটি তারকাযুক্ত। অভিজিৎ নক্ষত্র কোন্ কোন্ তারকায় গঠিত এ বিষয়ে আরও দুটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। যোগতারাটির সঙ্গে জিটা তারকাটি আছে দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু তৃতীয় তারাটি সম্পর্কে কেউ বলেছেন বিটা (Beta), কেউ বলেছেন গামা (Gamma) অর্থাৎ হয় ত্রিভুজ ক খ চ, না হয় ত্রিভুজ ক চ গ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে চান্দ্রপথের উপরের নক্ষত্র নিয়ে সকল বিতর্কের অবসান, সহজ কথা নয়। কিন্তু ভারতেতিহাসবিদেরা এগুলির পরিচয় উদ্ঘাটনে সংহত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

পদার্থবিদ্যার ইণ্টারভিউ : এশিয়া পরিক্রমা

অরুণকুমার ঘোষ*

[আর্ল ক্যালেন এবং মাইকেল স্বেড্রন লিখিত এই নিবন্ধটি Science পত্রিকার 2 জুন, 1978 সংখ্যায় (পৃঃ 1018) প্রকাশিত হয়েছে। ক্যালেন ওয়াশিংটন (ডি সি) শহরের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। স্বেড্রন টুসন শহরের আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।

নিবন্ধটিতে লিখিত লেখকদ্বয়ের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য কৌতুহলোউদ্দীপক। বঙ্গভাষী পাঠকদের কাছে লেখকদ্বয় ও প্রকাশকের অনুমতি নিয়ে এটির অনুবাদ নিবেদন করলাম। অনুবাদ আক্ষরিক নয়, তবে মূলানুগ। কিছু কিছু অংশ বর্জনও করেছি। —অনুবাদক]

এই রকম একটা চিত্র কল্পনা করুন : একহাতে এক টাকার একটা মুদ্রা আর অন্য হাতে পেণ্ডুলামের একটা লোহার গোলক নিয়ে মার্কিনী অধ্যাপক ল্যাবরেটরির টুলে দাঁড়িয়ে আছেন, ডিষ্টিংশন-সহ অনার্সপ্রাপ্ত এবং এম. এস-সি. পরীক্ষার্থী এশীয় ছাত্র বারবার বলছে, ভারী জিনিসটা ভারী বলেই আগে মাটিতে পড়বে। আর এক দেশে আর একটি চিত্র : ছাত্রটি আণ্ডারগ্রাজুয়েট, কিন্তু একটু বয়স বেশি। ছেলেটি মার্কিন দেশে পদার্থবিদ্যার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে যা পড়ানো হয় সবই জানে এবং বোঝে। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় (1970-72) সে কিছুদিন পদার্থবিদ্যা পড়িয়েছেও। অনেকগুলি 'পাশ' দেয় নি বটে, কিন্তু খুবই ভাল।

এই আমাদের পদার্থবিদ্যার ইণ্টারভিউ। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, বিভিন্ন ডিগ্রি, সম্মান, পরীক্ষায় বিভিন্ন স্থানাধিকার—এসবের মধ্যে কত তারতম্য এবং কখনও কখনও সেগুলি কত অসার। এসব যাচাই করার জন্যেই ব্যক্তিগত ইণ্টারভিউ করা দরকার, আর সেকারণেই আমাদের এশিয়া পরিক্রমণ। প্রায় এক দশক আগে ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. জে. মোরাভ্‌সিক প্রবর্তিত এই সব ইণ্টারভিউর মাধ্যমে পাশ্চাত্যদেশে পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে দরখাস্তকারী প্রার্থীর বাছাই হয় এবং তাদের সাহায্যের বন্দোবস্ত হয়।

প্রতি দু-বছর অন্তর এক অথবা দু-জন পদার্থবিদকে ইণ্টারভিউ ট্যুরে পাঠানো হয়। আজ পর্যন্ত এশিয়ায় পাঁচটা এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় একটা করে এরকম ট্যুর করা হয়েছে। প্রত্যেক যাত্রার আগে মার্কিন দেশের ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের পদার্থবিদ্যা বিভাগগুলিকে এই উদ্যোগের অংশভাগী হতে বলা হয়। অবশ্য মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই আমাদের বেশি উৎসাহ দেয়। তবে আজকাল ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও উৎসাহ দিচ্ছেন।

প্রতি পরিক্রমণের ব্যাপ্তিকাল এক মাস। এই সময়ের মধ্যে 10টা দেশের 20টা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথাপিছু 10 থেকে 12 জন বাছাই ছাত্রকে ইণ্টারভিউ করি। একসঙ্গে একজন ছাত্র প্রতি ইণ্টারভিউ এক ঘণ্টা করে—কখনও কখনও দু-জন অধ্যাপক ইণ্টারভিউ করেন। ইণ্টারভিউ শেষে আমরা যাচাই করি, ছাত্রটি ইংরেজি বলতে, বুঝতে পারে কিনা, তার পদার্থবিদ্যার—প্রাথমিক এবং উচ্চতর—জ্ঞান কতখানি ; সর্বোপরি দেখা হয়, তার বিজ্ঞানী হবার সম্ভবনা কতটা। মোটামুটিভাবে বলা যায়, তাকে অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে

*নেহেরু বিজ্ঞান-কেন্দ্র, বোম্বে

কাজ করার বৃত্তি দেওয়া যায় কিনা সেটাই খতিয়ে দেখা হয়।

দেশে ফিরে উৎসাহদানকারী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমরা ছাত্রদের নামধাম এবং মূল্যায়ন পাঠিয়ে দিই। গতবার আমরা 19টা বিশ্ববিদ্যালয়ে 129 জন ছাত্রের মূল্যায়ন পাঠিয়েছিলাম। পরের ব্যাপারটা অবশ্য ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু আমরা তাদের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করি। ছাত্রের অনুরোধক্রমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তার সম্পর্কে মূল্যায়ন আমরা পাঠাই। অনেক সময় ইণ্টারভিউর 2/3 বছর পরেও ছাত্রদের অনুরোধক্রমে সুপারিশপত্র লিখতে হয়। কিন্তু সব সময়ই মূল্যায়নের ভিত্তিতে এটা করা হয়। এই কার্যক্রমের ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র--যারা হয়ত বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশই করতে পারত না উচ্চতর ডিগ্রি করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছে।

বিভিন্ন যাত্রার দৌলতে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, এই প্রবন্ধে তার কিছু বিবরণ দেব।··· এখানে কেবল এশিয়ার কথাই আমরা বলছি।

বলা দরকার—আগেও বলা হয়েছে, কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আবার বলা দরকার—এশিয়ার বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের অনেকের মনোবৃত্তি অবিজ্ঞানী-জনোচিত। বিজ্ঞানকে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে শেখানো হয় না, প্রাচীন মুখস্থকরণ এবং প্রার্থনা কবিতার পুনরুচ্চারণের পদ্ধতিতে শেখানো হয়[1] সম্ভবতঃ এর অন্যতম কারণ, অধিকাংশ শিক্ষকের যথেষ্ট পড়াশুনা না থাকার জন্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং সাক্রিয় বিজ্ঞান বা কারিগরী চর্চার অভাব। মোরাভ্‌সিক ও জিমান লিখেছেন, "দেখা গেছে, গবেষণায় অংশগ্রহণ না করার ফলে এসব ব্যক্তি খুব শীঘ্র ক্রমাগত প্রসারমান বিজ্ঞান জগৎ থেকে দূরে পড়ে থাকেন এবং বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের যে দিকটা তার ধারেকাছে ঘেঁষেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় উপমহাদেশে এ-ব্যাপারটা খুব প্রকট। সেখানে মুখস্থকরণ এবং পরীক্ষার খাতার উদগীরণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষকদের ব্যাপক অজ্ঞতা।"

প্রায়ই দেখা যায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রেরা Young Tableaux এবং Renormalisation group-এর মত কঠিন বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষিত Ph. D. অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করছে। প্রণালীটারই আমদানী করা হল, কিন্তু পারম্পর্য রইল পিছনে পড়ে। আমাদের মধ্যে এক-জনের একবার এক জুনিয়র রেভেল কোর্সের পড়ানো শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পজিট্রনের তত্ত্ব সম্পর্কিত ফীনম্যানের একটি নিবন্ধ শিক্ষক মশায় আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলে গেলেন। অথচ যখন সেই ছাত্রদের শুধালাম, পৃথিবীর এফোঁড়-ওফোঁড় কাল্পনিক গর্তে একটা বল ফেলে দিলে কি হবে—তারা উত্তর দিতে পারল না। তারা বলল, ওসব গত বছরের প্রশ্ন, এবছর ফীনম্যান গ্রাফ ইম্পর্ট্যান্ট। প্রায় প্রতিবারই আমরা এমন সমস্ত অনার্স ছাত্র পেয়েছি যারা নির্দিষ্ট প্রাথমিক গতিতে একটা বলকে উপরে ছুঁড়ে দিলে সেটা কতদূর উঠবে এই সাধারণ অঙ্ক অল্পস্বল্প দেখিয়ে দিলেও কষতে পারে নি। আরেক দেশে দেখা গেল চুম্বকতত্ত্বের এক ছাত্র তার অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে Temperature-dependent two-time Green's Function নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু Green's Function বস্তুটা কি সে-ব্যাপারে তার জ্ঞানগম্যি নেই। সে একমাত্রিক Square Step-এর Quantum mechanical প্রতিফলন গুণাঙ্ক কষে বের করতে পারে না। কিংবা, উল্লম্ব তলে ঘূর্ণ্যমান দড়িতে বাঁধা কোনও বস্তুর কক্ষপথের নিম্নবিন্দুতে গতি কত হলে সেটা ঊর্ধ্ববিন্দুতে গিয়ে পড়ে যাবে না—এই অঙ্ক কষতে পারে না। ছেলেটি বুদ্ধিমান কিন্তু তাকে কখনও অঙ্ক (problem) করানো হয় নি, যা পদার্থবিদ যেভাবে চিন্তা করেন সেভাবে চিন্তা করতে শেখানো হয় নি।

এশিয়ার পরিবর্ত সফরে যে সব বিদেশী বিজ্ঞানী আসেন, তাঁরা যদি বিজ্ঞানের শেষতম অবদান সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ না করে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে বিজ্ঞান পড়ান এবং বাড়িতে কষার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্ক দেন তাহলে উপকার হয়। পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের ফীনম্যানের হাত ধরে আকাশে উড়ার আগে হ্যালিডে এবং রেজনিকের সঙ্গে কঠিন মাটিতে হাঁটা দরকার।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, এশিয়া কিন্তু অনেক খ্যাতনামা পদার্থবিদের জন্ম দিয়েছে। তাঁদের অনেকে পাশ্চাত্য দেশে উচ্চতর সম্মানও পেয়েছেন। এশিয়ায় চারবার যাত্রায় যে 600 জন ছাত্রকে আমরা ইন্টারভিউ করেছি তার শতকরা 5 জন অত্যন্ত মেধাবী, শতকরা 10 জন মার্কিন-দেশের সর্বোত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাফল্য লাভে সক্ষম এবং বাকি তিনভাগের একভাগ মার্কিন-দেশের গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের সমতুল। ভাল ছাত্রদের ভৌগোলিক অবস্থান সুনির্দিষ্ট এবং এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়ানো। ভাল ছাত্রেরা সব সময় 'সবচেয়ে ভাল' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় কিংবা যন্ত্রবিদ্যায় প্রাগ্রসর দেশগুলির বাসিন্দা নয়। সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রটি মধ্য জাভার বাসিন্দা।

অবশ্য আমাদের কেবল ভাল ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ভাল ছাত্রেরা যেন পিরামিডের শীর্ষবিন্দু এবং মেধাই তাদের একমাত্র মূলধন নয়। হংকংয়ে প্রতিবছর 1,50,000 ছাত্র 12 বছর বয়সে ষষ্ঠশ্রেণীর পাঠ সমাপন করে। তাদের অধিকাংশই কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজে যোগ দেয় (আইন মোতাবেক 12 বছরের নিচে তাদের নিয়োগ নিয়মবিরুদ্ধ)। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে 15,000 জন উত্তীর্ণ হয় তাদের মধ্যে 2000 জন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। হংকং তুলনামূলকভাবে ধনী এবং প্রাগ্রসর দেশ। এশিয়ার অন্যান্য গরীব দেশে (চীন, তাইওয়ান ও জাপানের কথা ধরছি না) এই ছাঁটাই আরও বেশি।

এশিয়ার ছাত্রদের সামনে আরেক বড় বাধা সংস্কৃতিজাত। এশিয়াতে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে অ্যাগ্রেসিভ চেষ্টা বা আত্মপ্রসার · এসব ভাল চোখে দেখা হয় না। ভাল ছাত্র অনেক সময় ভর্তি বা যাতায়াতের ভাড়া ইত্যাদির জন্যে আর্থিক সাহায্যের আবেদনই করতে চায় না। এসব ব্যাপারে তারা অনেক সময় দৈব বা গ্রহ-নির্ভর। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, সাধারণতঃ মাঝারি, কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ এবং যথেষ্ট যোগাযোগসম্পন্ন ছাত্রেরাই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে যায়। গত তিনবারে দেখা গেছে ইন্দোনেশিয়ার ভাল ছাত্রেরা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও যাতায়াতের ভাড়া যোগাড় করতে পারল না। তাদের সরকার কোনও সাহায্যই করল না। জবরদস্তি না করলে, তারা হয়ত আরও একবছর হাঁ করে বসে থাকত।

বিদেশী ছাত্রদের মূল্যায়নের পথে বড় বাধা ভাষা। সাধারণতঃ ইংরেজিভাষায় ইন্টারভিউ নেওয়া হয় স্বভাবপ্রীতির জন্যে নয়—ইংরেজি না জানলে তারা মার্কিন দেশে বক্তৃতা বুঝবেই বা কি করে আর অধ্যাপকের সহায়কের কাজই বা করবে কি করে?

নবগঠিত বা নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে স্বাজাত্যাভিমান প্রচণ্ড এবং স্বদেশী ভাষায় ফিরে যাবার প্রতি আসক্তি তীব্র। মজার ব্যাপার যে, বিভিন্ন ভাষাভাষীগোষ্ঠী যে ভাষায় পরস্পরের মধ্যে ভাব আদানপ্রদান করে সেটা অনেক দেশেই জোর করে চাপানো ভাষা। ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়ায় ইংরেজির সেই ভূমিকা। এই সব দেশের অনেকগুলিতে এখন স্বাদেশিকতার নামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এমন সব ভাষা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যা অনেকেই বলতে কইতে পারে না। এই ব্যাপারে উল্লেখ্য ইন্দোনেশিয়া। এদেশের বহু দ্বীপ, বহু ভাষা—এখন কিন্তু একটাই স্বীকৃত ভাষা, ইংরেজি এখন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের ভাষা। এসব দেশের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বাদেশিকতা বোধগম্য

হলেও, বিজ্ঞানের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইংরেজি বিতাড়ন শিল্প ও বিজ্ঞানশিক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারে।

শ্রীলঙ্কার কথাই ধরা যাক। পঞ্চাশের দশকের শেষে কিংবা ষাটের দশকের প্রথমে, বিদেশী প্রভাব-মুক্তির উদ্দেশ্যে বন্দরনায়েকের সরকার সংখ্যালঘু (লোক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ) দক্ষিণ ভারতীয়দের উপর জোর করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, সিংহলী, চাপাবার চেষ্টা করেন। সিংহলী ভাষায় সরকারী কাজকর্ম, উচ্চস্তরের পঠনপাঠনের প্রস্তাব হল। কিন্তু, এখনও সিংহলী ও তামিলদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভাষা ইংরেজি। যদিও কিছু কিছু বিষয় সিংহলীতে পঠন-পাঠন হয়, বিজ্ঞানশিক্ষার ভাষা কিন্তু সেই ইংরেজি।

ভারত আর এক দেশ যেখানে প্রায় 200 ভাষা এবং উপভাষা। সেখানেও সরকার ভাষানীতির পরিবর্তন করছেন। জরুরী শাসন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সরকারী কাজকর্মে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি চাপিয়ে দেন নি। সাম্প্রতিককালে ভাষা সংঘর্ষ হয় নি—অথচ দশ বছর আগে এই ধরণের সংঘর্ষ লেগেই থাকত। উত্তরের হিন্দি, দক্ষিণের তামিল এবং পূর্বের বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজিই সংযোগের ভাষা। অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্র ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক থেকেই বিজ্ঞান পড়েন।

মালয়েশিয়া কিন্তু অন্য পথের পথিক। সিঙ্গাপুর (শতকরা 80 ভাগ চীনা অধ্যুষিত) মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মুসলমানদের কিছু রাজনৈতিক সুবিধা হল। মালয়েশিয়ায় এখন শতকরা 42 জন মুসলমান, 38 জন চীনা, 10 জন ভারতীয় তামিল, বাকি অন্যান্য। স্বল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু সেটাই মূল্যবান। জবরদস্তি করে মালয়ী ভাষা রাষ্ট্রভাষা এবং ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম ঘোষিত হল। সফলতর চীনাদের সঙ্গে সমতার নামে সরকারী আমলার চাকরী, ছাত্রবৃত্তি, শিল্পে ভাল ভাল চাকরী মালয়ীদের জন্যে সংরক্ষিত থাকে। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রই চীনা। কিন্তু 1975 সালে প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে মালয়ীভাষায় পড়ান বাধ্যতামূলক করা হল। এখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতেও তাই। ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চস্তরে মালয়ীভাষায় কটাই বা বিজ্ঞানের বই আছে! এই কয় বছরে দেখলাম মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা পাঠন কেমন উন্নত হল—এখন তো তা সর্বোত্তম এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল—কিন্তু ভাষানীতির জন্যে এখন উন্নতি যেন থমকে গেছে। কেনবাংসান বিশ্ববিদ্যালয় মালয়ী অধ্যুষিত। কিন্তু এখানে পদার্থবিদ্যা পাঠন তেমন ভাল নয়, সম্ভবত মালয়ী ভাষায় পদার্থবিদ্যার ভাল পাঠ্য বই নেই বলে।

মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। ইন্দোনেশিয়ায় চীনারা সংখ্যায় অল্প, ফলে মালয়েশিয়ার মত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের প্রভাব নেই। জাভার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রেরা প্রধানত স্থানীয় মালয়ী—হয়ত তাদের ইনটেলেক-চুয়াল ট্রাডিশনের জন্যেই (এবং হয়ত একদশক আগে চীনপন্থী ও কম্যুনিস্টপন্থী দমনের জন্যে)। জাভার মালয়ী ছাত্রেরা মালয়েশিয়ার মালয়ী ছাত্রের তুলনায় সরেস। তিনবার ইন্টারভিউ নিতে জাকার্তার ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন, বান্দুং ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে চারজন এবং যোগ্যকর্তায় গদজা-মাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, মালয়েশিয়ার কেনবাংসান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ইন্দোনেশিয়া থেকে সংগৃহীত। জেনে ভালও লাগে যে, এখনও এমন অনেক দেশ আছে যেখানে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট চাহিদা। ইরান, মালয়েশিয়া এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইন্দোনেশিয়া—এই সব দ্রুত উন্নতিশীল দেশে কারিগরী শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের দরকার। সেখানকার শিল্পে, সরকারী দপ্তরে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এধরণের লোকের প্রচণ্ড অভাব। শ্রীলঙ্কা ও নেপালেও বিদেশে উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্যে কখনও

কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় 12 কোটি লোকের বাস, কিন্তু পদার্থবিদ্যায় পি. এইচ. ডি ডিগ্রিধারীর সংখ্যা সাকুল্যে 30-এর কাছাকাছি। লোকসংখ্যা ও পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিধারীর এই অনুপাত পাশ্চাত্য-দেশের তুলনায় 1000 গুণ কম। ইরাণ 15টা পারমাণবিক চুল্লী কিনছে, বিদ্যুৎলাইনের গ্রীড বসাচ্ছে, যন্ত্রগণক বসাচ্ছে, সর্বাধুনিক ইলেট্রনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত বিরাট সৈন্যবাহিনী তৈরি করছে এবং প্রাথমিক শিল্পের কারখানা কিনছে। অথচ ইরানে ডক্টরেট স্তরে সাকুল্যে 65 জন পদার্থবিদ আছেন।

পাশ্চাত্যদেশে আজকাল তত্ত্বীয় বিজ্ঞান পড়ার থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা পড়ার ঝোঁক বেড়েছে। অনুন্নত দেশে কোন দিকে জোর দেওয়া উচিত, সে-ব্যাপারে দুটি মত আছে। একদল বলেন, সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের জন্যে কতকগুলি নিউক্লিয়াস দরকার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এক বিজ্ঞানী তত্ত্বীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উৎসাহ দেবার সপক্ষে। এঁদের কাছে পার্টিকূল থিয়োরী এবং কস্‌মোলজির বিশেষ কদর, কারণ বিষয়গুলির 'গ্ল্যামার' আছে—সহজে তাত্ত্বিক প্যাওয়াও যায়। অন্য দলের মত হল, দরিদ্র দেশগুলির সীমিতসংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের একত্রিত করে প্রাথমিক প্রয়োজন—যথা যান্ত্রিকীকরণ, চাষবাস, গৃহনির্মাণ, স্বাস্থ্য, শক্তি, জল, আকরিক অন্বেষণ এবং আরক্ষা—এসবের ফয়সালা করা দরকার। ঋতু পরিবর্তন হয়, হাওয়া একবার এদিকে আর বার ওদিকে বয়। ইন্দোনেশিয়া এখন পাশ্চাত্যদেশের প্রযুক্তিবিদ্যার ঝোঁক অনুসরণ করছে।

[এরপর পাঁচটি অনুচ্ছেদ বাদ দিলাম। এই সব অনুচ্ছেদে অন্যান্য কথার সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের চাকরিবাকরি পাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সব দেশে চাকরিবাকরির বাজার মন্দা, সে-সব দেশের ছাত্রেরা পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে দেশে ফেরার নাম করে না। —অনুবাদক]

এই সমস্ত দেশে ইণ্টারভিউ নিতে গিয়ে আমরা খুবই মুশকিলে পড়ি। আগ্রহী, মেধাবী, তরুণ ছাত্রদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই সব দেশের ছাত্র, যারা কখনও দেশে ফিরবে না, তাদের আমদানী করে লাভ কি? বিশেষতঃ ভারতের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পি. এইচ. ডি. স্তরের পঠন পাঠনের যথেষ্ট ভাল বন্দোবস্ত আছে। উন্নতিশীল দেশগুলির বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকের দরকার—মার্কিন দেশেরও চাকরিবাকরির বাজার মন্দা। সবশেষে, বাংলাদেশের করুণ অবস্থার সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য করতেই হবে। এত অসুবিধা ও বিপর্যয় সত্ত্বেও যে সেখানে এত উন্নতস্তরের পদার্থবিদ্যা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা চলছে, তা বুদ্ধিজীবীদের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। 1973 ও '75 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ডজন খানেক ছাত্রকে আমরা ইণ্টারভিউ করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পয়সা নেই, যন্ত্রপাতিও নেই (চকখড়ি ছিল না, প্রোজেক্টরের বাল্ব ছিল না)—কেবল উৎসাহ এবং কিছু প্রথমশ্রেণীর বাঙালী বিজ্ঞানীর অধ্যবসায়ে সব কিছু চলছে। যুদ্ধের আগে এবং পরে এই সব বিজ্ঞানী বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। ব্রিটিশ যুগের প্রখ্যাত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ঐতিহ্য এখনও অটুট।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন, বাংলাদেশের সর্বত্রই গণ্ডগোল। 1976 সালেও '74 সালের স্নাতকপর্যায়ের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয় নি। তবু কোনও রকমে সব চলছে। এই রকম পরিস্থিতিতেও পদার্থ-বিদ্যাবিভাগে অনুশীলন চলছে—পার্টিকূল ফিজিক্স, জেনারেল রিলেটিভিটি, মেনিবডি ইণ্টারঅ্যাকশন, ক্রিটিক্যাল এক্সপোনেণ্টস্।

1. ইণ্টারভিউ যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের একজন কানপুর আই. আই. টি.-তে পদার্থবিদ্যার পাঠক্রম তৈরিতে সাহায্য করার জন্যে এক বছর ছিলেন। তাঁর

মনে পড়ে আই. আই. টি-র নিয়মমাফিক বাৎসরিক প্রবেশিকা পরীক্ষার একটি প্রশ্ন :

প্র. পৃথিবীর চুম্বকত্বের তিনটি মৌল উপাদানের নাম বল।

উ তাব্রতা, পার্থক্য এবং উন্নতি-কোণ

স্মর্তব্য, কানপুরের ছাত্রগোষ্ঠী এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ছাত্রগোষ্ঠীর অন্যতম।

2. ভারতের সম্পর্কে আমরা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি। 1971 সালের ট্যুরের পর আমরা জানতে পারি ভারত সরকারের কাছে আমাদের সি. আই. এ. ফ্রন্টের লোক বলে জানানো হয় এবং ফলে তাঁরা এ-ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে চান নি। 1975 সালে যাত্রার আগে আমরা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুর, দিল্লী ও খড়্গপুর আই. আই. টি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে চিঠি দিয়েছিলাম। মাদ্রাজ থেকে জবাব এল, "এ ব্যাপারে ভারত সরকারই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয় নয়। সুতরাং অনুমতি দিতে না পারার জন্যে দুঃখিত।" কানপুর ও দিল্লী আই. আই. টি. জানালেন, ভারত সরকারের অনুমতি দরকার। সম্ভবতঃ তাঁরা সেই অনুমতি যোগাড় করতে পারেন নি, কেননা পরে তাঁদের আর কোনও চিঠিপত্র পাই নি। খড়্গপুর আই. আই. টি. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের প্রাথমিক বা পরবর্তী কোনও চিঠিরই জবাব দেন নি। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দোষ দেওয়া যায় না!

শূন্য জীবনে এল অমৃতের স্বাদ

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়*

আমার প্রিয় বন্ধুগণ কবিগুরুর সেই কথাটি মনে করুন।

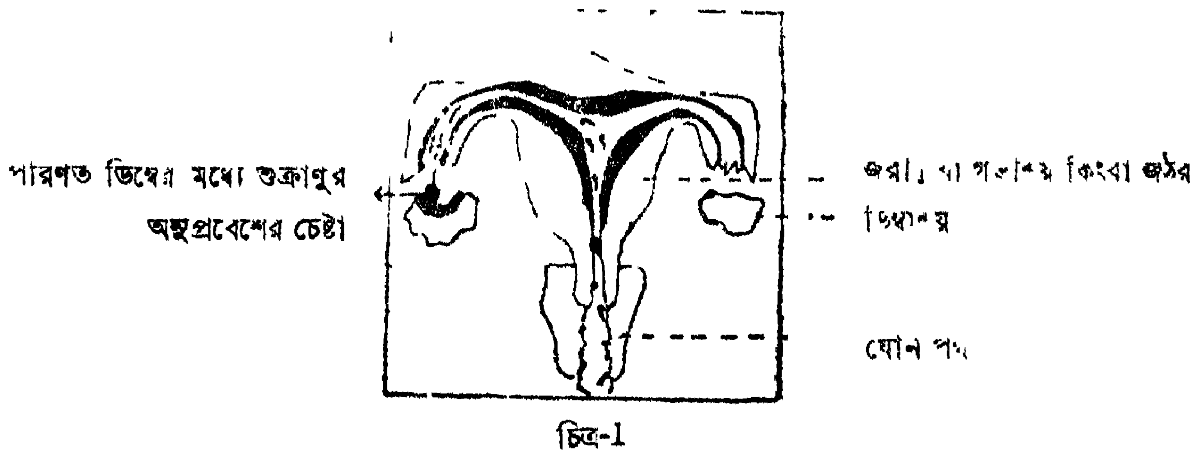
"খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে
মা শুনে কয় হেঁসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে"

আমাদের অনুসন্ধিৎসা কিন্তু এই কটি কথায় পূর্ণ হবে না, মানব জাতির জন্মকথা কবির এই কাব্যরসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। চিত্র-1-এ দেখা যাবে যে স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রীর যোনিদেশে নিক্ষিপ্ত হয়। এই শুক্রাণু জরায়ুগ্রীবার সংলগ্ন গ্রন্থিগুলির রসের সংস্পর্শে এসে কিছু পরিবর্তিত হয় (ইংরেজীতে যাকে বলে capacitation অর্থাৎ প্রজনন যোগ্যতা অর্জন)। এর পর জরায়ুনালী দিয়ে অনেক শুক্রাণু ডিম্বনালীর দিকে ধাবিত হয়। ডিম্বনালার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে এরা যদি কোন পরিণত ডিম্বের সম্মুখীন হয় তাহলে সেই পরিণত ডিম্বের ত্বক ভেদ করার জন্যে এই শুক্রাণুদের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি আরম্ভ হয় এবং তার ফলে অনেক শুক্রাণুর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর সময় এরা একরকম রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে যার নাম

*স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-700 004

হায়ালিউরোনিডেজ (hyaluronidase) এবং এই রাসায়নিক পদার্থ একটি মাত্র শুক্রাণুকে ডিম্বের আবরণী বিদ্ধ করতে সাহায্য করে। এই সফল যোদ্ধা শুক্রাণু ডিম্বকোষের ভিতরে প্রবেশ করবার পূর্বে তার লেজটি হারায়। চিত্র-1-এ যোনিপথে শুক্রাণুদের শরীর এবং লেজসমেত দেখা যাচ্ছে এবং গর্ভাশয়ের মধ্যে ও ডিম্বনালীর মধ্যে তাদের কয়েকজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

তারপর নানারকম কৌশল করে আস্তে আস্তে ঐ আচ্ছাদনীর মধ্যে নিজের পাকাপোক্ত জায়গা করে নেয় এমনভাবে যে সহজে তাকে যেন হঠানো না যায়। শ্রীমতী লেস্‌লী ব্রাউন ডিম্বনালীর এমন কোন অসুখে ভুগছিলেন যার ফলে তাঁর দুটি ডিম্বনালীই চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ্যা রমণীদের শতকরা 30 জনই রুদ্ধদ্বার ডিম্বনালীর শিকার। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা অতি সহজেই দু-একটি



চিত্র-1

দেখা যাচ্ছে পরিণত ডিম্ব, ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বনালির দিকে যাচ্ছে। শুক্রকোষ এবং ডিম্বকোষের মিলনের ফলে নিষিক্ত ডিম্বে কোষ বিভাজন শুরু হয়। এই কোষ বিভাজনও হয় বিশেষ প্রকারের যাতে এক একটি কোষ মায়ের অর্ধেক সংখ্যক এবং পিতার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম (chromosome)-এর অংশীদার হয়। কোষ বিভাজন যখন শুরু হয় তখন ডিম্বকোষ এবং শুক্রকোষের একত্রীভূত অবস্থার নাম ব্লাস্টোসিস্ট (blastocyst)। এই ব্লাস্টোসিস্ট ডিম্বনালীতে 4/5 দিন ধরে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে জননী জঠরের দিকে। 2 দিন সে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় গর্ভাশয়ের কোনখানে নোঙর বাঁধবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে। প্রায় সাত দিনের দিন এই ব্লাস্টোসিস্ট জননীর গর্ভাশয়ের আচ্ছাদনীর মধ্যে নিজেকে আটকে ফেলে এবং

বিশেষ পরীক্ষার ফলে রুদ্ধদ্বার ডিম্বনালীর অবস্থা ধরতে পারেন।

মোটর গাড়ীর কোন যন্ত্রাংশ বিকল হলে সেটা ফেলে দিয়ে যেমন নতুন যন্ত্র কিনে বসানো যায় মানব দেহের কোন কোন জায়গায় সে রকম করা সম্ভব হয়েছে—আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ক্রিশ বার্নার্ড-এর কথা যিনি হৃৎপিণ্ড পাল্টে দেবার কথা প্রথম ভাবেন এবং সফলভাবে তা করেনও।

কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি ডিম্বনালীর ক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর হতে পারে নি। তাই সার্থক চিকিৎসক অল্ডহাম হাসপাতালের 65 বৎসর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক স্টেপ্‌টো এবং তাঁর সতীর্থ সুযোগ্য সহযোগী 52 বৎসর বয়সের রবার্ট এডওয়ার্ড যিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক এঁরা দু-জনে চিন্তা করলেন—যদি জননীর ডিম্বস্ফোটনের

সময় তাঁর ডিম্বাশয় থেকে সেই ডিম্ব বাইরে নিয়ে এসে পিতার শুক্রাণুর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং জননীর অভ্যন্তরের তাপ আর্দ্রতা ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ যদি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা যায় তাহলে মানবভ্রূণের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব কিনা এবং কোন রকমে সেটা সম্ভব হলে ছয়-সাত দিন বয়সের অঙ্কুরকে মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট করালে সেখানে তার বিকাশ সম্ভব কিনা।

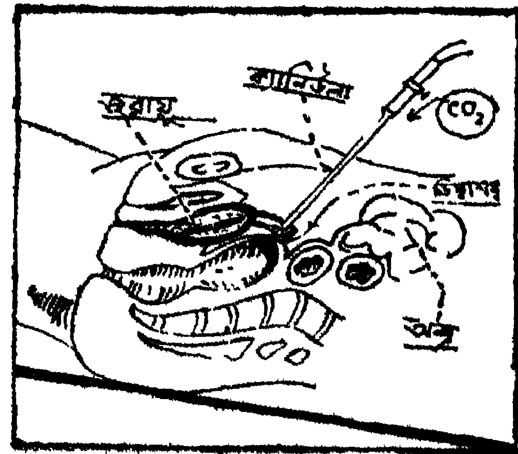
প্যাট্রিক স্তেপ্‌টোর হাতে এল একটি নতুন যন্ত্র—নাম তার ল্যাপারোস্কোপ (laparoscope)। এই যন্ত্র মায়ের নাভিকুণ্ডের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের নিচের দিকের সমস্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ দিনের আলোয় দেখার মত পারিষ্কার করে দেখা যায়। পেটের মধ্যে আর একটা ছিদ্র দিয়ে আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে



চিত্র-2
স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ল্যাপারোস্কোপ-এর সাহায্যে ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্ব উদ্ধার করছেন

ডিম্বাশয় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে পরিণত ডিম্ব একটি লম্বা সূচিকার সাহায্যে শুষে বের করে নেওয়া যায়। চিত্র-2-এ দেখা যাচ্ছে কিভাবে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ল্যাপারোস্কোপ-এর সাহায্যে ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্ব শুষে বের করে নিচ্ছেন।

সুখের কথা এখন এমন ওষুধ বেরিয়েছে যেটা মাকে সূচী প্রয়োগ করলে এক সঙ্গে অনেক ডিম্ব বড় হবে এবং সেই পরিণত ডিম্বগুলি ল্যাপারোস্কোপ-এর সাহায্যে শুষে বাইরে নিয়ে আসা যাবে। প্রায় দশ বছর গবেষণা চালিয়ে প্যাট্রিক স্তেপটো এবং রবার্ট এডওয়ার্ড দেখলেন ভ্রূণ অঙ্কুরের মাতৃজঠরের আচ্ছাদনীর সঙ্গে লেগে থাকবার ক্ষমতা জন্মায় 6 দিন কিংবা 7 দিন বয়সের সময় এবং সেই সময়ের মধ্যে জঠরস্থ আচ্ছাদনীকে ভ্রূণের বসবাসের যোগ্য করবার জন্যে যে সব আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দরকার সেই সব পরিবর্তন কৃত্রিমভাবে আনা যায় প্রোজেষ্টেরন (progesterone) নামে একটি হর্মোন (hormone) সূচী প্রয়োগ করলে। চিত্র-3-এ দেখা যাবে কিভাবে ল্যাপারোস্কোপ-এর সাহায্যে ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্ব উদ্ধার করা হচ্ছে। আপনারা অনেকেই



চিত্র-3
স্ত্রীদেহের বস্তিপ্রদেশের মাঝবরাবর দেখায় সামনের দিক থেকে পিছন দিক পর্যন্ত

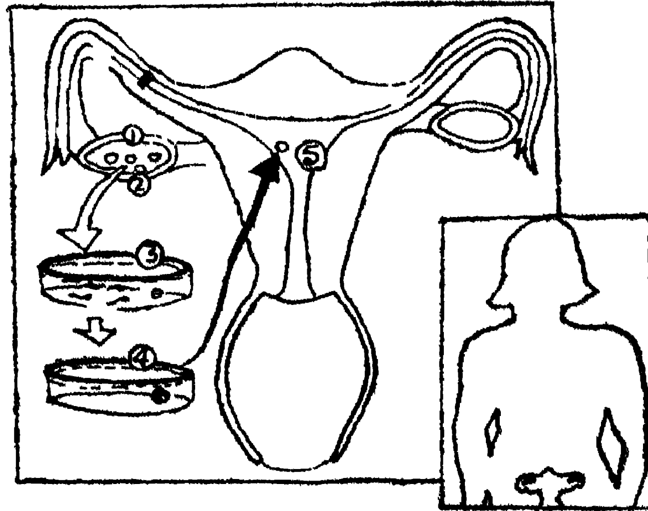
জানেন যে মনুষ্যকোষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোষ হল ডিম্বকোষ যেটা খালি চোখে দেখা যায় একটি বিন্দুর মত।

ডিম্বকোষ তুলে নিয়ে রাখা হয় এমন সব উপাদানের মধ্যে যাতে যে কোন কোষ বর্ধিত হতে

পারে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে। সেলকালচার (cell culture) করার জন্য বিজ্ঞানীরা সাধারণত অর্ধেক কাফ সিরাম (calf serums) এবং অর্ধেক ভাগ মানুষের সিরাম (serum) মেশান এবং এর সঙ্গে থাকে কিছু buffer substance এবং ট্রেসার এলিমেন্ট বা রেখক বস্তু (tracer element)। এই কালচার মিডিয়াম (culture medium)-এর মধ্যে ডিম্বকোষকে ছেড়ে পিতার শুক্রকীট বিশেষভাবে প্রস্তুতীকরণের পর অর্থাৎ কোন রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এনে প্রজনন যোগ্যতা অর্জন করাবার পর যে কালচার মিডিয়াম ডিম্বকোষ ছাড়া হয়েছে সেই কালচার মিডিয়াম-এ ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর লক্ষ্য করা হয় এদের মিলন হচ্ছে কিনা, ট্রেসার এলিমেন্ট সেখানে সাহায্য করে। যদি দেখা যায় যে ব্লাস্টোসিস্ট তৈরি হয়েছে এবং তার বয়স 6/7 এবং তারপর ধীরে ধীরে জননীজঠরে বাড়তে থাকবে—10টি চান্দ্রমাস অর্থাৎ 280 দিনের শেষে সে পূর্ণবয়স্ক হবে এবং জননীর গর্ভাশয়ের বাইরে বেঁচে থাকবার মত জীবনীশক্তি অর্জন করবে।

চিত্র-4-এ দেখা যাবে কিভাবে ডিম্বকোষ মাতৃ-অভ্যন্তর থেকে বাইরে নিয়ে এসে কৃত্রিমভাবে মাতৃশরীরের বাইরে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে পিতার শুক্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভ্রূণের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানো হল এবং পরে সেই অঙ্কুরকে মাতৃজঠরে উৎক্ষিপ্ত করার পর সেই অঙ্কুর ভ্রূণে পরিণত হল এবং ধীরে ধীরে সেই ভ্রূণ থেকে একটি পূর্ণাবয়ব মানবশিশুতে রূপান্তরিত হল।

এই শিশুটিকে সিজারীয়ান অপারেশন (Caesarian operation) করে মায়ের গর্ভাশয় থেকে বাইরের পৃথিবীতে আনা হয় এবং এই



চিত্র-4
ডিম্বকোষ থেকে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে মানব ভ্রূণের অঙ্কুরোদ্গম এবং গবেষণাগার থেকে জননীজঠরে ভ্রূণাঙ্কুরে উৎক্ষেপণের বিভিন্ন পর্যায়।

দিন তখন একটি ছোট সিরিঞ্জ (syringe) করে সেই ব্লাস্টোসিস্টকে যোনিপথে জরায়ুগ্রীবার ভিতর দিয়ে জরায়ুর মধ্যে উৎক্ষেপ করা হয়। যেহেতু ব্লাস্টোসিস্ট-এর আসঞ্জনশীলতা এত দিনের মধ্যে গড়ে উঠেছে সেহেতু আশা করা যেতে পারে যে আগে থেকে প্রস্তুত করা গর্ভাশয়ের আবরণীর মধ্যে ব্লাস্টোসিস্ট নিজেকে আটকে রাখতে পারবে শিশুটি—নাম যার Louise joy brown (লুসি জয় ব্রাউন) শতাব্দীর বিস্ময়সফল বিজ্ঞানের ফল।

লুসি জয় ব্রাউন দিনের আলো দেখাতে মায়ের বুক ভরে উঠলো অপার আনন্দে, মাতৃত্বের গর্বে, সার্থক বিজ্ঞানী প্যাট্রিক স্টেপ্‌টো ও রবার্ট এডওয়ার্ড তৃপ্ত হলেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে—বহু অশ্রুবী বিফল মনোরথ মা-বাবার মুখে জলে উঠলো আশার আলো।

আত্মহত্যার রহস্য

অমিত চক্রবর্তী*

সুমিতেশদাকে আপনারা চেনেন না। ছোটবেলায় নীচের রাস্তায় ফুটবল খেলতে খেলতে আমরা দেখতাম একটা বছর কুড়ির ছেলে, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা বাঁ হাতে খানকতক বই আর ডান হাতে সিগারেট নিয়ে ভারিক্কিচালে হেঁটে চলেছে। আমরা তখন সবে ঐ পাড়ায় এসেছি, পাড়ারই একটি ছেলে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, "খ্যাখ, খ্যাখ—ঐ হল সুমিতেশদা। দারুণ ছেলে জানিস, ম্যাট্রিকে থার্ড হয়েছিল।" সুমিতেশদা আর পাঁচজন সমবয়েসীর মত পাড়ার রকে বসত না, চাঁদা তুলতে বেরত না—এমন কি ওর চেনাপরিচিত ছেলেদের সঙ্গেও রাস্তায় বিশেষ আড্ডা দিত বলে মনে পড়ে না। ওর হাঁটাচলায় এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যা আমাদের মত ছোট ছেলেদের আকর্ষণ করত। দুটো অদ্ভুত ব্যাপার ছিল ওর, এক হল—আমাদের অভিভাবকদের বিশেষ পাত্তা না দেওয়া, ঐটুকু ছেলে সবার সামনে দিব্যি সিগারেট ধরিয়ে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হেঁটে যেত। দ্বিতীয় কারণটা—অণিমাদি। অণিমাদি আমাদের পাড়ার মেয়ে নয়, অথচ আমরা সবাই চিনতাম ওকে। ওরকম অদ্ভুত বুদ্ধিদৃপ্ত চেহারা মেয়েদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। সুমিতেশদার কাছে অনিমাদি আসত, ওরা একসঙ্গে যখন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত, পাড়ার বয়স্ক ছেলেরাও ওদের দিকে কিরকম একটা অদ্ভুত জলজলে চোখে তাকিয়ে থাকত। ওদের সেই জুলজুলে চাউনীই প্রমাণ করত সুমিতেশদার তুলনায় ওদের দীনতা, ওদের হীনমন্যতাকে।

সুমিতেশদা আত্মহত্যা করেছিল। ডিসেম্বরের এক শীতের রাত্রে ঘুমের বড়িগুলি খাবার আগে পৃথিবীর তাবৎ জীবিত লেখকদের জন্যে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল সুমিতেশদা। ওর মৃত্যুর জন্য যে কেউ দায়ী নয়, বরং মানুষের প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল বলেই যে ও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অর্থ পায় নি—এবং এই অর্থ খুঁজে না পাওয়ার জন্যে দায়ী যে ও নিজেই—সেই কয়টি কথাই ও জানিয়ে গিয়েছিল ওর চিঠিতে। পরে কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, অণিমাদির প্রতারণাই নাকি ওর আত্মহত্যার কারণ। পড়াশুনোর ব্যাপারে সুমিতেশদা ওকে অসম্ভব সাহায্য করত, আর সেই স্বার্থেই অণিমাদি হয়ত সুমিতেশদার সঙ্গে মেলামেশা করত বেশি করে—সম্ভবতঃ সুমিতেশ'দা তাকেই প্রেম বলে ভুল করেছিল। আমার জীবনে ওটাই প্রথম আত্মহত্যার ঘটনা। ঘটনাটা ঘটার বহু দিন বাদেও বাইশ বছরের একটা তাজা ছেলের অভিমান ভরা মুখ প্রায়ই আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠত।

আগেই বলেছি—সুমিতেশদাকে আপনারা চেনেন না, তবুও সুমিতেশদার ঘটনাটা দিয়েই শুরু করলাম। আপনারা প্রত্যেকে কোন না কোন আত্মহত্যার ঘটনার কথা গল্প-উপন্যাসে পড়েছেন, শুনেছেন অথবা দেখেছেন। একটু চিন্তা করলেই দেখবেন, সুমিতেশদার আত্মহত্যার সঙ্গে সেই সব ঘটনার কত মিল! প্রায় অধিকাংশ আত্মহত্যার ঘটনাই কেমন যেন ছকে বাঁধা, পারিপার্শ্বিকের চাপ—ক্রমাগত ফ্রাস্ট্রেশন—হতাশা—প্রতিকূল চাপ থেকে পরিত্রাণের জন্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া, একের পর এক চলে আসে যেন। তবু 'ছকে বাঁধা' কথাটা বলা ঠিক নয়, জীবনের প্রতিকূল আবহাওয়ায় সবাইতো আত্মহত্যা

---

*আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা-700 001

করেন না—আসলে আত্মহত্যার পিছনে শুধু পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতাই নয়, সেই সঙ্গে আত্মহত্যাকারীর মানসিক গঠনশৈলীরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে—সেই সব প্রাসঙ্গিক দিকে একে একে আসব।

আত্মহত্যা কারা করে, কেন করে, কিভাবে করে,—এই সব বিষয়তে আসার আগে একটা খবরের কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল গত বছর ডিসেম্বর মাসে। সারা দেশের আত্মহত্যার খতিয়ান সংক্রান্ত খবরটা আপনাদের জন্যে হুবহু তুলে দিলাম।

'নয়াদিল্লী, 23 ডিসেম্বর—বাঙালীদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বাড়ছে। যে সব রাজ্যে বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা যে সব রাজ্যে অনেক বাঙালী বসবাস করেন, সেই সব রাজ্যেই আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি। এই ধারণার সমর্থন মেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সমীক্ষায়। এই সমীক্ষা 1967 থেকে 1974—এই আট বছরে দেশে যে সব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে। সমীক্ষক: পুলিশ গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যুরো। এ দেশে মোটামুটিভাবে বছরে গড়ে প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে আট জন মারা যায় হয় বিষ খেয়ে নয়তো গলায় দড়ি দিয়ে কিংবা রেললাইনে মাথা পেতে অথবা অন্যান্য উপায়ে স্বেচ্ছায়ই। একটা সময় ছিল যখন গুজরাটের মানুষদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। কিন্তু 1974 সালে দেখা যাচ্ছে সেই ভূতটা বাঙালীদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। এই বছর পণ্ডিচেরী আর আন্দামান নিকোবর বাদ দিলে সবচেয়ে বেশি লোক আত্মহত্যা করেছে ত্রিপুরায়—প্রতি এক লক্ষে 26 জন। পরের স্থানই পশ্চিমবঙ্গের, লাখে 19 জন। '74-য়ে অবশ্য আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লাখে 69 জন। এই বিরাট দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের এক বিরাট অংশই বাঙালী। পণ্ডিচেরিতেও অনেক বাঙালীর বাস। সেখানকার আত্মহত্যার হিসাব: লাখে 59 জন।"

যাহোক, আত্মহত্যা হয়তো আমাদের দেশে এখনো তেমন কোন বিরাট সমস্যা নয় যতটা ব্যাপক আমেরিকার মত দেশে যেখানে আত্মহত্যার অনুপাত আমাদের দেশের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি। অতএব মনোবিজ্ঞানীরা ওখানে আত্মহত্যার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন—নানা দিক থেকে গবেষণা চালানো হয়েছে। সম্প্রতি মনোবিজ্ঞানীদের হাতে তথ্যও যে অনেক আছে তাও নয়, তবু তার থেকেই আত্মহত্যা সংক্রান্ত যে ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক, যেমন ধরুন আমেরিকায় নাকি প্রতি বছর আত্মহত্যা করে মারা যান পচিশ হাজারের মত লোক, আর আত্মহত্যার চেষ্টা করে দু-লাখেরও বেশি। অর্থাৎ ওদেশে কোন না কোন জায়গায় গড়ে প্রতি মিনিটে শ'-দেড়েক লোক আত্মহত্যার চেষ্টা করে—কি সাংঘাতিক ব্যাপার ভাবুন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মানুষ আত্মহত্যা করে মানসিক টানাপোড়েন আর যন্ত্রণার জন্যে। অন্ততঃ একজন মনোবিজ্ঞানীকে জানি যাঁর মতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ জীবনের কোন না কোন সময় আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে; যদিও অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাও অধিকাংশ মানুষই কাটিয়ে উঠতে পারে, আত্মহত্যার কোন রকম চেষ্টা সে ক্ষেত্রে হয় না। দেখা গেছে, যে কোন মানুষই সাধারণতঃ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, একা থাকা অবস্থায় তার উপর মানসিক চাপ যখন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠে এবং বলা বাহুল্য, তার সমস্যা সমাধানের তাৎক্ষণিক কোন রাস্তা যখন সে দেখতে পায় না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মহত্যা ঘটে দুর্ঘটনার মতই অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। উদাহরণ দিচ্ছি—ধরুন, কেউ তার নিজস্ব কোন সমস্যায় আশপাশের পাঁচজনের সহানুভূতি চাইছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে এবং তার কথায় যে কেউ বিশেষ কান দিচ্ছে না

তাও সে অনুভব করছে। এর ফলে লোকটির মধ্যে অন্যের প্রতি রাগ ও অ্যাগ্রেসন্ তৈরি হয় সময়ে সময়ে তা প্রকাশের রাস্তা না পেয়ে ছুটে আসে তার নিজের দিকেই আর সেই মূহুর্তে চরম হতাশায় নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলার মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে লোকটির মধ্যে। এর ফলে হয়তো সে বেশ কয়েকটা ঘুমের বড়ি গলাধঃকরণ করলো এবং পরমুহূর্তেই সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিল তার ঘুমের বড়ি খাবার কথা। সবার দৃষ্টি আকর্ষণের এটাই তার কাছে একমাত্র চরম পথ বলে মনে হবে। এক্ষেত্রে মনে মনে সে সব সময়ই আশা করছে আশেপাশের সবাই যে কোন ভাবেই হোক ওকে বাঁচাবে। বলা বাহুল্য, অনেক সময়ই সে অবস্থায় বাঁচানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ঘটনাটা আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত হয় তখন।

শারীরিক যন্ত্রণাও কোন বিশেষ মূহূর্তে আত্মহত্যার উপাদান যোগাতে পারে, সে পরে আসছি।

মানসিক যন্ত্রণার কথা বলছিলাম এখন এই মানসিক যন্ত্রণার পিছনে কি থাকে তা দেখা যাক। দাম্পত্য এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে মানসিক সংঘাত নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় কারণ। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং ভালবাসার জনকে হারানো এর মধ্যে পড়ে। এর পর যে কারণটা বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল—কোন বিষয়ে অকৃতকার্যতা তা সে পরীক্ষাতেই হোক বা চাকরী পাবার ব্যাপারেই হোক। নিজের সম্বন্ধে হীন মনোবৃত্তি বা কোন বিষয়ে সকলের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। এছাড়া কোন বিষয়ে ক্রমাগত হতাশাও মানুষের জীবন-ধারণকে তার কাছে অর্থহীন করে তুলতে পারে। এই ক্রমাগত হতাশার পিছনে অনেক সময়ই কারণ হিসাবে থাকে শারীরিক কোন দীর্ঘস্থায়ী অসুখ বা যন্ত্রণা। সারা জীবনে পরিত্রাণের আশা নেই এমন কোন অসুখ যেমন বিশেষ ধরণের ক্যানসার ইত্যাদি হলে রোগীর মনে আত্মহত্যার প্রবণতা জাগাটা অস্বাভাবিক নয় এবং এমনও দেখা গেছে কেউ হয়তো আত্মহত্যা করলেন এমন একটা সময়ে যার কয়েক ঘন্টা বাদে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মারা যেতেন।

মানসিক এবং শারীরিক এই কারণগুলি ছাড়াও আত্মহত্যার পিছনে, সমাজ ও সংস্কৃতিরও প্রভাব থাকে। যেমন পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যান্ড, হাঙেরী, আমেরিকা ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতায় পুষ্ট দেশগুলিতে আত্মহত্যার অনুপাত খুবই বেশি তেমনিই আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে বা আদিম উপজাতিগুলির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা গেছে খুবই কম। পরিসংখ্যানটাও দিচ্ছি। পশ্চিম জার্মানী বা হাঙেরীতে যেখানে প্রতি একলক্ষে 30 জন আত্মহত্যা করে—নিউগায়না বা ফিলিপাইনে সেখানে প্রতি এক লক্ষে আত্মহত্যার সংখ্যা মাত্র এক। আত্মহত্যার উপর ধর্মের ও প্রভাব যথেষ্ট আছে। ধর্মীয় প্রভাব যাদের উপর খুব বেশি, যেমন মুসলমান বা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা—এদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক কম। এক ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে, যে সব সমাজে কোন মানুষের সঙ্গে গোটা সমাজটার সম্পর্ক বেশ জোরদার অথবা যে সব সমাজে জোটবদ্ধতা যথেষ্ট বেশি, সেই সব সমাজে আত্ম-হত্যার প্রবণতা যথেষ্ট কম। ঠিক এই কারণেই গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে বা শিল্পপ্রধান জায়গায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেশি।

আত্মহত্যার ব্যাপারে সামাজিক বাধানিষেধেরও একটা ভূমিকা আছে। আত্মহত্যার চেষ্টা প্রায় সব দেশেই আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ, তবু বিশেষ অবস্থায় সামাজিক এই বাধানিষেধের যে হেরফের হয় না তা নয়, বিশেষত যুদ্ধবিগ্রহের সময় জায়গা বিশেষে আত্মহত্যা দেশপ্রেমের নিদর্শন বলেই চিহ্নিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে অনেকেই বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। কয়েক বছর আগে

আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামের রাস্তায় জনপ্রতিবাদ হিসেবে বৌদ্ধ সাধুদের আগুনের জ্বলন্ত শিখায় আত্মাহুতির কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমাদের মত গরীব এবং বিপুল জনসংখ্যার দেশে আর্থিক কারণেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেশি। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে আত্ম-হত্যার প্রবণতা জাগে এবং এগুলি বেশি করে ঘটে সামাজিক সঙ্কটে যেমন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির সময়ে।

আসল ব্যাপারটা হল বিশেষ কোন পারিবারিক এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ কিছু মানসিক অসুস্থতার মধ্যে মানুষ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা সে আশেপাশের পাঁচজনকে সরাসরি বা হাবভাবে জানাতেও চেষ্টা করে। কেউ হয়ত মদ খাবার মাত্রা অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে দেন। কেউ হয়ত আত্মহত্যা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করেন, কেউ বা আত্মহত্যা নিয়ে নানা কথা লেখেন তাদের রোজনামচার খাতায় এবং সর্বোপরি এদের প্রায় সকলেই কোন না কোন অবসাদে ভোগেন—এ সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পূর্বলক্ষণ। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের আচার ব্যবহারের পরিবর্তনটা আর পাঁচজনের চোখে পড়ে না—সেই বিশেষ ঘটনাটা ঘটে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। সরাসরি হোক বা হাবভাবেই হোক, আত্মহত্যার ইচ্ছার ব্যাপারটা জানানোর উদ্দেশ্য শুধু নিজের জীবন সম্বন্ধে অনীহাই নয়, সেই সঙ্গে বিশেষ কারোর সাহায্য প্রার্থনা। মানুষের বিশেষ কোন সমস্যায় সাহায্যের জন্যে সেই কান্না যখন ব্যর্থ হয় তখনই আত্মহত্যার চরম সিদ্ধান্তটা নেয় সে।

শুধু আইন করেই আত্মহত্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। বহু দেশে আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে—শুধু আমেরিকাতেই শ'দুয়েকের বেশি এ ধরণের সেণ্টার রয়েছে। মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন, মনে মনে আত্মহত্যার ইচ্ছে আছে—এমন সব লোকেরা সরাসরি বা আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে এই সব কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা এদের সমস্যাগুলি নিয়ে এদের সঙ্গে আলোচনা করেন, মানসিক অস্থিরতার জন্যে দায়ী ঘটনাগুলিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করেন। আমাদের দেশেও নিঃসন্দেহে এ দিকটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করা দরকার।

আত্মহত্যার প্রসঙ্গেই বলি আমাদের আশেপাশে দুর্ঘটনাপ্রবণ লোকজন আমরা হামেশাই দেখে থাকি। এদের কেউ কেউ অত্যন্ত জোরে গাড়ি চালিয়ে আনন্দ পান, অকারণে জীবন বিপন্নকর কাজে জড়িয়ে পড়েন, মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা পছন্দ করেন। শুধু কি এরাই, এমন অনেকে আছেন যারা অত্যধিক মদ্যপান করেন অথবা মাদক বড়ির নেশা করেন—এগুলি যে তাদের জীবনীশক্তি কেড়ে নেয় তা জেনেও। মনোবিজ্ঞানীদের মতে জীবন সম্বন্ধে এদের এই অনীহার পিছনেও নাকি থাকে আত্মহত্যার ইচ্ছে। আগেই বলেছি, আমাদের আশেপাশেই রয়েছেন এরা—খুঁজে বের করে এদের মানসিক পুর্নবাসনের দায়িত্বটা কিন্তু আমাদেরই।

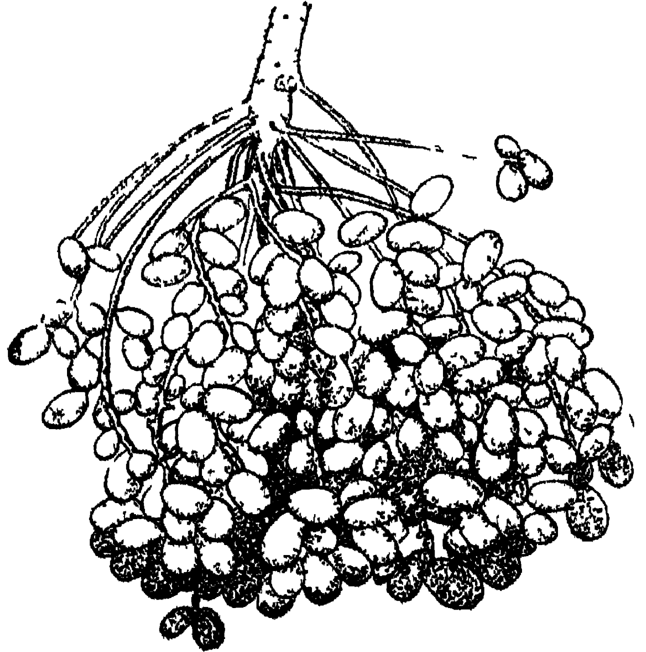
খেজুরের কথা

বলাইচাঁদ কুণ্ডু*

খেজুর পৃথিবীর এক আদি ফল। খৃঃ পূঃ 6000 7000 বছরের আগে যখন আদিম মানুষ প্রথম কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন শস্য ও ফলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ফলদায়ী এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জর্ডান নদীর দুই তীরে ও নিকটবর্তী স্থানসমূহে এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকাতে জন্মাতো। এই সব দেশের অধিবাসিগণের নিকট খেজুর গাছ পরম পবিত্র জীবনদায়ী বৃক্ষ বলে বিবেচিত হত। পুরাকালে আরবগণ এই পবিত্র বৃক্ষ কর্তন করা অধর্মীয় বলে মনে করত এবং এই বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করত। বিশেষ পবিত্রজাতীয় বৃক্ষ হিসাবে সেকালে ইজিপ্টের বিশাল সব মন্দিরের অতি বিরাট স্তম্ভ সমূহে পত্রপুঞ্জসহ বহু খেজুর গাছ খোদিত হয়েছিল। তৎকালে ইহুদীগণও খেজুর গাছকে পরম পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করত। তাদের নানাবিধ ধর্ম আচরণে তাহা ব্যবহৃত হত এবং কোন কোন ধাতুনির্মিত মুদ্রাতে খেজুর গাছের ছাপ থাকত। বর্তমানে নানা আকারের খেজুর গাছের ছাপ সহ এই প্রকার বহু মুদ্রা খুঁজে পাওয়া গেছে।

তৎকালে আরব দেশবাসীরা এই গাছকে এত মূল্যবান মনে করত যে কন্যার বিবাহের যৌতুক হিসাবে এই সব গাছ উপহার দিত। তখন খেজুর গাছ মানুষের সম্পদ হিসাবেও বিবেচিত হত, যার এই গাছের সংখ্যা বেশি থাকত, সেই ব্যক্তি ধনী বলে সাধারণের কাছে বিবেচিত হত।

খেজুর তাল নারিকেল পরিবারের (Family Palmacea) অন্তর্ভুক্ত Phoenix গণের একপ্রকার গাছ। এর নাম Phoenix dactylifera। যে খেজুর আমাদের দেশের সর্বত্র দেখতে পাই, যা থেকে আমরা রস, গুড় ইত্যাদি পাই তার নাম Phoenix sylvestris। একে সাধারণত দেশী বা বন্য খেজুর গাছ বলা হয়। এছাড়া ভারতবর্ষে Phoenix গণের অন্তর্গত আরও কয়েক প্রকার গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের নাম Phoenix acaulis, P humiles, P paludosa, P pusitta, P. robusta, P rupicola ইত্যাদি।



চিত্র-1
এক কাঁদি বন্য খেজুর ফল। ফলগুলি পাকলে সাধারণত হলদে বা লাল রং-এর হয়।

এরা অপেক্ষাকৃত ছোট জাতের গাছ। সাধারণত হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে, খাসিয়া ও নাগা পাহাড়ে,

*331, লেক টাউন, কলিকাতা-700 055

বিহার, দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য অনেক স্থানে এই সব গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব গাছের মজ্জা থেকে একরকম সাগু তৈরি হয়। এদেরও ছোট



চিত্র-2 একটি দেশী বা বন্য খেজুর গাছে (Phoenix sylvestris) রস নিষ্কাশনের জন্যে--গাছের উপরিভাগের কিছু পাতা কেটে কাণ্ড থেকে রস বের করবার ব্যবস্থা করছে একজন চাষী বা শিউলি (এই কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি)। শিউলির পিছনে যে কলসীটি আছে, তা গাছের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা লাগিয়ে দিয়ে আবার সকাল বেলা নামিয়ে নিতে হবে। রস নিষ্কাশনের জন্যে একটি সরু নলাকৃতি বাঁশের ছোট টুকরা গাছের গায়ে লাগানো রয়েছে।

ছোট ফল হয়, তবে সে সব ফলের শাঁস খুবই পাতলা হয়।

Phoenix sylvestris বন্য বা দেশী খেজুর গাছ, যা আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব গাছের কোন কোনটিতে জুন-জুলাই মাসে কাঁদি কাঁদি (চিত্র-1) ছোট ছোট হলদে রংএর ফল হয়। এই ফলগুলির শাঁস খুব

পাতলা। খেতে কিছু সুস্বাদু হলেও খাদ্য হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয় নয়। শীতকালে এই সব গাছের মাথার দিকে কিছু অংশ কেটে (চিত্র-2) এক অপূর্ব সুমিষ্ট রস পাওয়া যায়। ভারতের প্রায় সর্বত্র এই খেজুর গাছ থেকে এই রস বিশেষ উপায়ে নিষ্কাশিত হয়। সেই সুমিষ্ট রস শীতল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার সেই রস বিশেষ উপায়ে গাঁজিয়ে 'তাড়ি' (একপ্রকার মদ্য বিশেষ) প্রস্তুত করা হয়। অল্প মূল্যের জন্যে গ্রামাঞ্চলের তথা শহরের শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকগণের নিকট এই পানীয় বিশেষ আদৃত হয়। খেজুর রস থেকে যে গুড় বা পাটালি তৈরি হয়, বিশেষ স্বাদের জন্যে তাও সর্বত্র সমাদৃত হয়। খেজুরের রস থেকে প্রস্তুত গুড় সাধারণত: তরল আকারে বাজারে আসে। সেই গুড় 'নোলেন' গুড় নামে পরিচিত। কোন কোন জায়গার গুড়ে একপ্রকার আকর্ষণীয় সুগন্ধ থাকে এবং সেজন্যে বেশি দামে তা বাজারে বিক্রী হয়। এই গুড় থেকে পাটালি বা পাটালিগুড় তৈরি হয়। পাটালি গুড়েও সুগন্ধ থাকে। অনেক দিন আগে যশোহর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে খেজুরের চিনিও উৎপন্ন হত। আজকাল আর তা বিশেষ হয় না।

Phoenix dactylifera খেজুর গাছের ফল সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ও সমাদৃত। এই ফল আমাদের দেশে 'খুর্মা' খেজুর বা 'পিণ্ডি' খেজুর নামে পরিচিত ও যেসব ফলের দোকানে শুষ্কফল, কিসমিস, বাদাম ইত্যাদি বিক্রয় হয়—সেখানে প্যাকেটে করে পাওয়া যায়। 'পিণ্ডি' খেজুর খুবই সুস্বাদু, সুমিষ্ট ও মুখরোচক। এতে আবশ্যকীয় কয়েক প্রকার ভিটামিন, বিশেষত ভিটামিন A, প্রোটিন, তৈল-জাতীয় পদার্থ ও প্রচুর শর্করাজাতীয় পদার্থ থাকায় এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর।

খুব সম্ভব পারস্য উপসাগরের নিকট কোন স্থানে Phoenix dactylifera গাছের উৎপত্তি হয়। সেখান থেকে এটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যথা—আরবদেশে, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ স্পেন, তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ সমূহে ও অন্যান্য কোন কোন দেশে নীত হয়েছিল। স্পেনদেশ থেকে বহু দিন আগে এটি উত্তর আমেরিকাতেও নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে এর চাষের ব্যবস্থা করা হয়। ইরাকদেশে বিপুলভাবে খেজুরের চাষ হয় ও সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।

বহু দিন আগে থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশ সমূহে, যথা, সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, কাবুলে এই গাছের চাষ হয়। কি ভাবে এই স্থানে Phoenix dactylifera গাছ পারস্যদেশ থেকে আনীত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সঠিক কোনও তথ্য জানা নেই। তবে অনেকে মনে করেন যে Alexander the Great যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি শুষ্ক খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে এই জাতীয় খেজুর নিয়ে এসেছিলেন। সৈনিকেরা খাবার পর যে বীজগুলি ফেলে দিয়েছিল তাই থেকেই এই সব অঞ্চলে এই গাছ জন্মেছিল ও সেই সব গাছ থেকেই এই সব অঞ্চলে এই খেজুর গাছের চাষ শুরু হয়েছিল। আবার অনেকের মতে সপ্তম শতাব্দীতে মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশের আরব আক্রমণকারীরা এই ফল খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে নিয়ে এসেছিল এবং তাদের পরিত্যক্ত বীজসমূহ থেকেই সেসব দেশে খেজুর গাছের উৎপত্তি হয়েছিল।

P. dactylifera খেজুর গাছ প্রায় 36 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ভারতের যে প্রদেশসমূহে বৃষ্টিপাত কম হয়, যথা—গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কোন কোন স্থানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই সব গাছের ফল কাবুল ও পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গাতে উৎপন্ন গাছের ফল থেকে নিকৃষ্ট হয়। কিছু দিন আগে থেকে ভারতবর্ষে P. dactylifera জাতীয় খেজুরের চাষ বাড়াবার জন্যে দক্ষিণ-পশ্চিম

এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে ও U S A থেকে প্রচুর বীজ আমদানি করে উপযুক্ত স্থানে এর চাষ বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা চলেছে।

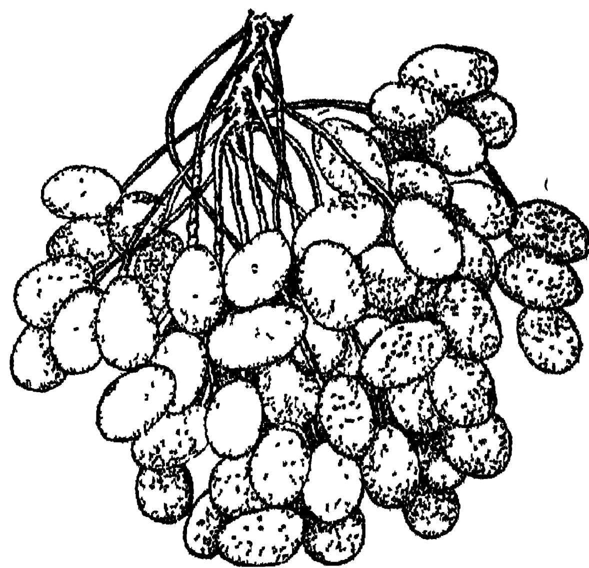
আরব, ইরাক বা আফ্রিকার যে সব দেশে উৎকৃষ্ট খেজুরের ফলন হয়, সেখানকার আবহাওয়া সাধারণতঃ এইরূপ :—গ্রীষ্মকাল খুবই দীর্ঘ হয়, দিনের তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে এবং রাত্রিতে তাপমাত্রা কমে না। ফুল ও ফলের সময় বৃষ্টিপাত খুব কমই হয়।

প্রায় সকল প্রকার জমিতে,—হালকা দোঁয়াশ মাটি থেকে শক্ত এঁটেল মাটিযুক্ত জমিতে, খেজুর গাছ জন্মাতে পারে। সাধারণতঃ বীজ বা গাছের গোড়া থেকে যেসব উপাঙ্গশাখা (sucker) উৎপন্ন হয় - সেই সব শাখা মাটিতে লাগিয়ে এই খেজুর গাছের চাষ হয়। খেজুরগাছের ফুলগুলি একলিঙ্গ (unisexual) এবং পুং-পুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প পৃথক পৃথক গাছে জন্মায়। বীজ থেকে উৎপন্ন প্রায় 50 শতাংশ গাছ পুং-পুষ্পযুক্ত হয়। একারণ সেই সব গাছ থেকে কোন ফল পাবার আশা থাকে না। একারণে অভিজ্ঞ চাষীরা নির্বাচিত উৎকৃষ্ট ফলনশীল গাছের মাটির কাছ থেকে যেসব উপাঙ্গ শাখা নির্গত হয়— সেই সব শাখা লাগিয়ে খেজুরগাছ চাষের ব্যবস্থা করেন। উপাঙ্গশাখাগুলি লাগাবার পর যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। লাগাবার পর দুই বছর গ্রীষ্মকালে কোন প্রকার আচ্ছাদন দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। তা না হলে নিদারুণ গরমে চারা গাছগুলির অনিষ্ট হতে পারে। গাছগুলিতে নিয়মমত জল দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ গোবর সার বা অন্য সার প্রয়োগ করলে গাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে।

পরাগযোগ (Pollination)—আগেই বলা হয়েছে যে খেজুর ফুল একলিঙ্গ। এজন্যে ফল উৎপাদনের জন্যে স্ত্রীপুষ্পগুলিতে পরাগ সংযোগ একান্ত আবশ্যক। খেজুরের স্ত্রী ও পুং-পুষ্পের পুষ্প বন্যাস এক একটি খুব বড় স্প্যাডিক্স (spadix) হয় এবং নৌকাকৃতি চমসার দ্বারা সমগ্র পুষ্পবিন্যাসটি আবৃত থাকে। পরাগসংযোগের জন্যে সমগ্র পুং-পুষ্পবিন্যাসের দু-তিনটি স্তবক সমগ্র স্ত্রী-পুষ্পবিন্যাসের উপর এমনভাবে রাখা হয় যাতে হাওয়াতে পরাগগুলি স্ত্রীপুষ্পের গর্ভদণ্ডের উপর এসে পড়তে পারে। পুং-পুষ্পস্তবকগুলি যাতে স্ত্রী পুষ্পবিন্যাসের উপর ঠিকভাবে লেগে থাকে, সেজন্যে সরু দড়ি দিয়ে সেগুলিকে স্ত্রী পুষ্পস্তবকের গায়ে আটকে দেওয়া হয়। দেখা গেছে যে এইভাবে পরাগসংযোগ বেশ ভাল ভাবেই হয়।

খেজুরের স্ত্রী-পুষ্পে তিনটি গর্ভপত্র (carpel) থাকে। পরাগসংযোগ সন্তোষজনকভাবে হলে ও ঠিকমত নির্বাচন হলে একটি মাত্র গর্ভপত্র বাড়তে থাকে এবং অন্য ২টি গর্ভপত্র কিছুটা বাড়াবার পর ঝরে যায়। পরাগসংযোগ ঠিকমত না হলে তিনটি গর্ভপত্রই অল্প একটু বাড়ে ও তার পর শুকিয়ে পড়ে যায়।

স্ত্রী-পুষ্পের পুষ্প বন্যাসে ঘন ঘন প্রচুর স্ত্রী-পুষ্প থাকে এবং সেজন্যে পুষ্পবিন্যাসে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ফলের আকার বড় হলে, কিছু কিছু ফল প্রথমেই তুলে ফেলা দরকার। এর ফলে ফলগুলি উপযুক্ত ভাবে বৃদ্ধি পায়—(চিত্র-3)। ফল পাকবার সময়



চিত্র-3
Phoenix dactylifera গাছের ফলের কাঁদির এক অংশ। এই ফল বন্য খেজুর গাছের ফল থেকে অনেক বড় হয় ও এদের শাঁসও বেশ পুরু হয়।

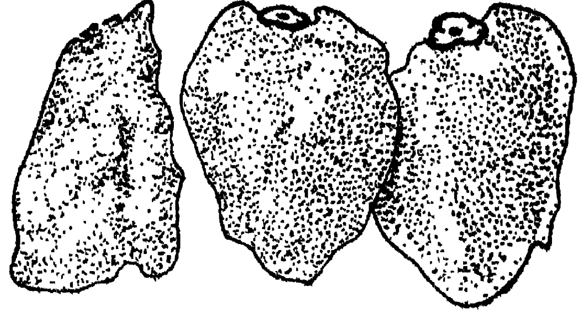
নানারকম পাখী ও পোকার উপদ্রব হয়। চাষীরা ফলগুচ্ছগুলি রক্ষা করবার জন্যে কাঁটাওয়ালা গাছের ডাল, জাল ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দেয়।

ফলের বৃদ্ধি পাবার ও পাকবার বিভিন্ন অবস্থাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় যেমন, 'গাণ্ডোরা', 'ডোকা', 'ড্যাং' ও 'পিণ্ড' এই চারটি অবস্থাকে আরব দেশে যথাক্রমে 'কিমরি', 'খালাল', 'রুটাব' ও 'টামার' বলে। সবুজ ছোট ছোট ফলগুলি যখন খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে, তখন এদের 'গাণ্ডোরা' বলা হয়। তারপর সম্পূর্ণ পরিণত ফলগুলি যখন লাল বা হলদে রং-এর হয় তখন তাদের 'ডোকা' বলা হয়। ফলগুলির উপরিভাগ নরম হতে থাকবার সময় ওদের 'ড্যাং' বলে। সম্পূর্ণ পক্ব ফলগুলি যখন শুষ্ক হতে থাকে, তখন তাদের 'পিণ্ড' বলে। সাধারণত এই অবস্থাতে ফল বেশ ভালভাবে শুকিয়ে বিক্রী করবার বা বিদেশে চালান দেবার ব্যবস্থা হয়।

দেখা গেছে একটা কাঁদি বা থোলোর সব ফল একসঙ্গে পাকে না। এজন্যে বিভিন্ন সময়ে ফলগুলি কাঁদি থেকে তুলতে হয়। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থাতে ফল তোলবার খরচ খুবই বেশি হয়। একারণে অনেক জায়গাতে, পাকিস্থানে ও ভারতের বিভিন্ন-স্থানে ফলগুলি 'ড্যাং' অবস্থাতে সংগ্রহ করা হয়।

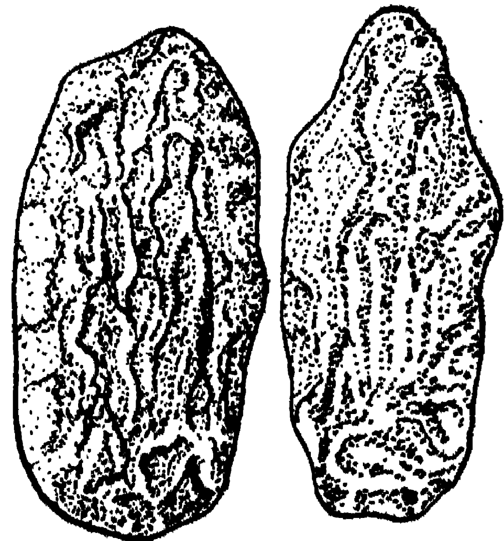
যেসব দেশে খেজুরের চাষ হয়, সেই সব অঞ্চলের লোক 'ড্যাং' অবস্থাতে ফলগুলি খেতে পছন্দ করে। কারণ ঐ অবস্থাতে ফলগুলি নরম ও সুস্বাদু হয়। কিন্তু সেই সব পরিপক্ক ফল খুবই আর্দ্র থাকবার জন্যে নাড়াচাড়া করবার খুবই অসুবিধা হয়। তাছাড়া সেরকম ফল বেশি দিন স্বাভাবিক উপায়ে সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয় না। এজন্যে বিভিন্ন উপায়ে রৌদ্রে বা আগুনের উত্তাপে ফলগুলি কিছুটা শুষ্ক করবার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ফল অন্যান্য উপায়েও জারিত করে ও পরে রৌদ্রে বা আগুনের উত্তাপে শুষ্ক করে বিক্রয়ের জন্যে প্রস্তুত করা হয়। (চিত্র-4)।

খুব বেশি করে শুষ্ককরা ফলগুলিকে 'ছুহারা' বলে (চিত্র-5)। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বাজারে 'ছুহারা' খুব বিক্রীও হয় এবং সাধারণতঃ আরবদেশ



চিত্র-4
পাকা ফল বিশেষ দ্রাবণে জারিত করে তারপর রোদে বা আগুনের উত্তাপে কিছু শুষ্ক করলে খেজুর অনেক সময় এই রকম দেখতে হয়। বিদেশের বাজারে বিক্রী করবার জন্যে প্যাকেটে ভরে পাঠানো হয়। তখন পরস্পরের চাপে নরম ফলগুলি অনেক সময় এই রকম দেখতে হয়।

থেকে এগুলি এদেশে আমদানি হয়। 'ছুহারা' সাধারণতঃ দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে খাওয়া হয়।



চিত্র-5
'ছুহারা' বা বিশেষভাবে শুষ্ক খেজুর।

হাকিমদের মতে এটি শরীরের দৌর্বল্য নাশক ও বিশেষ পুষ্টিকারক।

Phoenix sylvestris এর মত এই গাছ থেকেও সুমিষ্ট রস পাওয়া যেতে পারে। উত্তর আফ্রিকার কোন কোন দেশে খেজুর গাছের অগ্রভাগ থেকে রস নিষ্কাশিত হয়। সাধারণত পুং গাছ থেকেই রস নেওয়া হয়। কিন্তু ফলবান স্ত্রীবৃক্ষের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে বলে সে সব গাছ থেকে রস নিষ্কাশন সাধারণত হয় না।

খেজুর গাছ লাগাবার পর প্রায় চার বৎসর পরে ফল ধরে। পাঁচ বৎসর পর থেকে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। 10/12 বৎসরের একটি গাছে সাধারণত 30-35 কিলোগ্রামের মত ফল উৎপন্ন হয় এবং একর প্রতি প্রায় 50 কুইন্টল ফল পাওয়া যায়।

খেজুর চাষ খুবই লাভজনক। কিন্তু বর্তমানে ভারতের খুবই কম জায়গাতে খেজুরের চাষ হয়।

উত্তরপ্রদেশ—327 একর

সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ—272 একর

বিন্ধ্য প্রদেশ—258 একর

এছাড়া কর্ণাটকে, অন্ধ্রপ্রদেশে, রাজস্থানে ও অন্যান্য কোন কোন জায়গাতে কিছু কিছু চাষ হয়।

উত্তরপ্রদেশে খেজুরের বেশী চাষের কারণ এই যে, লক্ষ্ণৌতে যে Horticultural Garden ছিল, তার বিভিন্ন ইংরাজ সুপারিনটেণ্ডেন্টগণ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খেজুর চাষের জন্য যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন। তাঁরা পারস্য উপসাগরের political resident-এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে খেজুরের বীজ ও উপাঙ্গশাখা আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসব দিয়ে শুধু লক্ষ্ণৌ-এর কাছাকাছি স্থানে ছাড়া তাঁরা মুলতান ও সিন্ধুপ্রদেশে খেজুর চাষের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইস্রায়েলে খেজুর গাছের চাষ যে কি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সেখানে উন্নত জাতির খেজুর গাছ লাগিয়ে ফলনও খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে। 1930 সালে মাত্র 60 একর জমিতে খেজুরের চাষ হত, আর এখন সেখানে প্রায় 1500 একর জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে খেজুরের চাষ হচ্ছে। অন্যান্য দেশের ফলনের চেয়ে ও দেশের ফলনও অনেক বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাতে খেজুর চাষের মোটামুটি উপযুক্ত আবহাওয়া আছে। সেখানে অনেক পতিত জমিও আছে। এইসব জায়গাতে খেজুর গাছের চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পাটের বিকল্প ফসল মেস্তা/রোজেল

নারায়ণ বসু*

ভারতীয় পাট-শিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে কাঁচা পাটের অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত সরবরাহ অন্যতম। কাঁচাপাট বলতে পাট (সাদা ও তোষা) ও মেস্তা বোঝায়। কাঁচাপাটের মধ্যে পাটের পরিমাণই বেশি, শতকরা 77 ভাগ। পাট ফসলের জন্য চাই পলিসমৃদ্ধ, উর্বর, উঁচু অথবা নিচু জমি, বোনার সুবিধের জন্য বেশ কয়েক পশলা প্রাকবর্ষার বর্ষণ, ভাল পরিচর্যা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এবং ফসলের বৃদ্ধির সময় পর্যায়ক্রমে উজ্জ্বল রোদ এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টি। এছাড়া, পাট পচিয়ে আঁশ বের করার জন্য চাই নালা, খাল, বিলে জমা প্রচুর জল। যথাযথ প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির সন্তোষজনক সমাবেশ না ঘটলে পাট চাষে সাফল্য আশা করা যায় না। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে এই সব অবস্থার সমাবেশ রয়েছে বলে পাট চাষ এই কয়টি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ। পাট চাষ বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, সেচ এলাকায় এর চাষ খুবই কম। তাই এই সব রাজ্যে বিভিন্ন বছরে জল হাওয়ার তারতম্যের জন্য পাট চাষে মোট জমির পরিমাণ কমে বা বাড়ে। আরেকটি যে কারণে পাটের জমির পরিমাণ কমে বাড়ে, তা হল, পাট বোনার মরশুমে পাটের নিজস্ব বাজার দর এবং ধানের সঙ্গে তার আপেক্ষিক মূল্যমান। পাটের দর ভাল হলে বেশি জমিতে পাট লাগান হয়, কম হলে কম জমিতে। আবার ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে পাটের জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করার ঝোঁক বেড়েছে। এই সব পরিস্থিতিতে এই রাজ্যগুলিতে পাটের উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা যাচ্ছে না। অন্য দিকে, পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি ছাড়া অন্য কোথাও পাট চাষের সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাঁচা পাটের উৎপাদন স্থিতিশীল করতে ও বাড়াতে হলে পাটের বিকল্প এমন একটি ফসলের প্রয়োজন, যেটা বিভিন্ন ধরণের জলবায়ু ও মাটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। মেস্তা/রোজেল সেই ফসল।

মেস্তা/রোজেল পরিচিতি

উদ্ভিদকুলে মালভেসী গোত্রের হিবিসকাস একটি গণ। ভারতবর্ষে এই গণের 40টির মত প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত কুড়িটি প্রজাতির গাছ থেকে পাটের মত লম্বা আঁশ পাওয়া যায়। হিবিসকাস ক্যানাবিনাস ও হিবিসকাস সাবদারিফা—এই দুটি প্রজাতির গাছ পাটের বিকল্প আঁশের জন্য চাষ করা হয়। এশিয়া মহাদেশে তো বটেই, আফ্রিকা, উত্তর-মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, য়ুরোপ এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই আঁশের একটা বিশেষ বাণিজ্যিক মূল্য আছে।

বিভিন্ন দেশে হিবিসকাস আঁশের বিভিন্ন নাম। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে ক্যানাবিনাস প্রজাতির আঁশের নাম 'কেনাফ', জাভা দেশে এর নাম জাভার পাট। আবার, ভারতবর্ষের বোম্বাই এবং অন্যান্য দক্ষিণ অঞ্চলে এই আঁশ ডেকান এবং অম্বরী নামে পরিচিত। সাবদারিফার আঁশ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় রোজেল নামেই বেশি পরিচিত। তবে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে একে বিমলী পাটও বলে। বিমলী কথাটা এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিমলী-পত্তনম্ জায়গার নাম থেকে। বিমলীপত্তনম্ একসময় একটি সমৃদ্ধ সমুদ্র-বন্দর ছিল। এখান থেকেই

*পাট বিকাশ নির্দেশনালয়, নিজাম প্যালেস, কলকাতা-700 020

1901-1902 সালে অন্ধ্রপ্রদেশে উৎপন্ন সাবদারিকা আঁশ লণ্ডনের বাজারে প্রথম রপ্তানী হয়েছিল। জায়গার নাম অনুসারে সেই আঁশের নামকরণ হয়েছিল বিমলী। ভারতবর্ষের সব অঞ্চলেই ক্যানাবিনাস এবং সাবদারিকা এই দুই জাতের আঁশকেই মেস্তা বলে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রবন্ধে অবশ্য ক্যানাবিনাস আঁশ বোঝাতে মেস্তা এবং সাবদারিকা বোঝাতে রোজেল ব্যবহার করা হবে।

আঁশ উৎপাদনকারী গাছ হিসেবে মেস্তার পরিচিতি ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস তাঁর "স্পিসিস প্লানটেরাম" গ্রন্থে ভারতবর্ষকেই মেস্তার উৎপত্তিস্থল বলে মনে করেছেন। গাম্বল, কুক, ভুথি, প্রেণ প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও মনে করেন ভারতীয় উপ-মহাদেশে মেস্তার প্রচুর বুনো জাত রয়েছে। আট ধরণের মেস্তার পাঁচটি জাত, যেমন, ভিরিডিস্, রুবার, সিমপ্লেক্স, ভালগারিস্ ও পারপিউরেনস্। এদের মধ্যে রুবার, ভালগারিস এবং পারপিউরেনস আঁশ উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী। ভিরিডিস্ এবং সিমপ্লেক্স বেঁটে ধরণের এবং তাতে প্রচুর শাখা-প্রশাখা বের হয়। বিভিন্ন ধরণের মাটি ও জলবায়ুতে আঁশের জন্য সবচেয়ে ভাল রুবার জাত; ভারতবর্ষে এই জাতটিরই চাষ হয় বেশি। জাভা এবং কিউবাতে অবশ্য ভিরিডিসও চাষ করা হয়। উত্তর-মধ্য আমেরিকায় এল সালভাডোর জাতটি ভালগারিস ও ভিরিডিসের সংমিশ্রণ।

রোজেলের প্রধান দুটি জাত। একজাতের ফুলের রসাল বৃতি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা দিয়ে জ্যাম, জেলী প্রভৃতি তৈরি হয়। এই জাতকে সাধারণ ভাবে বাংলায় 'চুকোই'-ও বলা হয়। অপর জাতের ফুলের বৃতি অরসাল এবং সেটা আঁশের জন্য চাষ করা হয়। রসাল বৃতিযুক্ত জাতগুলি বেঁটে এবং প্রচুর শাখা-প্রশাখাযুক্ত। বেঁটে রসাল বৃতিযুক্ত রোজেলের আবার চারটি জাত, যথা, রুবার, এ্যালবাস, ইণ্টারমিডিয়াস্ এবং ভাগলপুরিয়েন্সিস্। অরসাল বৃতিযুক্ত ও লম্বা ধরণের রোজেল জাতটির নাম আলটিসিমা। আঁশের জন্য আলটিসিমার চাষই ব্যাপক। বিশের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত এই জাতটি আমাদের দেশে অজানা ছিল। সম্ভবত 1928 সালে এই জাতের একটি বীজ জাভা থেকে পাঠান Calapogonium mucunoides-এর কিছু বীজের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল। এই জাতটি বুনো অবস্থায় আফ্রিকায় বেশি দেখা যায় এবং সে জায়গার রসাল বৃতির জাতগুলি বেশি কাঁটাযুক্ত হয় বলে বিজ্ঞানী হুবের আফ্রিকাকে রোজেলের বিভিন্ন জাতের উৎপত্তিস্থল বলে মনে করেন।

মেস্তা বর্ষজীবী উদ্ভিদ। আঁশের জন্য চাষ করা হয় এমন জাত ছাড়া আর সবেতে শাখা-প্রশাখা বেরোয়। কাণ্ড সোজা উঠে যায়। বিভিন্ন জাতের মেস্তার কাণ্ডের রং সবুজ, সবুজের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় লাল ছোপ অথবা পুরোপুরি লাল হতে পারে। কাণ্ডের গা মসৃণ, তবে মাঝে মাঝে তাতে সূঁচাল কাঁটা থাকে। পাতার কাঁটাযুক্ত বোঁটা ফলকের চাইতে লম্বা, বিশেষ করে, গাছের নীচের এবং মাঝের অংশে। কোন কোন জাতের পাতার ফলক হস্তাকার, তাতে 5 থেকে 7-টি বর্শার আকারের লতি থাকে (চিত্র-ক 1)। এই সব জাতের নীচের পাতাগুলি অবশ্য হৃৎপিণ্ডাকার, এবং তাতে ফলক একটিই। আবার কিছু জাতের সব পাতাই হৃৎপিণ্ডাকার (চিত্র-ক 2)। কাণ্ডে লাল ছোপ থাকলে পাতার ধারেও লাল ছোপ থাকবে। পাতার মাঝের লতির পিছন দিকে শিরার উপর একটি গ্রন্থি থাকে। পাতার কোলে একটি করে ফুল ফোটে, তাতে থাকে 7 থেকে 10-টি বৃতির থেকে পৃথক এবং ছোট উপবৃতি, 5-টি সবুজ অথবা রঙীন কাঁটাযুক্ত বর্শার আকারের নীচের অর্ধেক অংশ জোড়া বৃতি, প্রতি বৃতির পিছনে একটি বড় গ্রন্থি এবং 5-টি বড় বড় হলুদ রঙের পাপড়ি। পাপড়ির মাঝ বরাবর টকটকে লাল। কাণ্ড সবুজ হলে পাপড়ির মাঝখানটা কিন্তু লাল হবে না। কোন কোন জাতের পাপড়ির রঙ

একেবারে সাদাও হতে দেখা যায়। কাঁটা কাঁটা লোমে ছাওয়া ডিমের আকারের বীজাধারে 5-টি ছোপযুক্ত বা একেবারে লাল হলে বৃতি ও উপবৃতির রঙ নির্ভর করে। অর্থাৎ, কাণ্ড সবুজ হলে



চিত্র-ক—মেস্তা (হিবিসকাস ক্যানাবিনাস)
1—হস্তাকার পাতা—কাণ্ডের অংশ, 2—হৃৎপিণ্ডাকার পাতা—কাণ্ডের অংশ, 3—ফুল, 4—বীজাধার, 5—বীজ

প্রকোষ্ঠে 20 থেকে 30-টি ধূসর রঙের বৃক্কের আকারের বীজ থাকে। এক হাজার বীজের ওজন 30 গ্রাম। মেস্তার ডিপ্লয়েড ক্রোমোজম সংখ্যা 36।

রোজেলও সাধারণতঃ বর্ষজীবী। তবে কখনো কখনো বহুবর্ষজীবী হতেও দেখা যায়। কাণ্ড সোজা উপরে উঠে যায় এবং তার রঙ সবুজ, সবুজের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় লাল ছোপ বা একেবারে লাল হতে পারে। পাতার বোঁটা ফলকের চাইতে ছোট বা তার সমান, ফলকে 3 থেকে 5টি বর্শার আকারের লতি থাকে (চিত্র-খ 1)। কাণ্ডের গা কাঁটার মত লোমযুক্ত অথবা মসৃণ হতে পারে। পাতার অক্ষে একটি করে ফুল ফোটে। ফুলের 8 থেকে 10টি উপবৃতি, 5টি বৃতির সঙ্গে জোড়া থাকে। বৃতিগুলিও আবার নীচের অর্ধেক অংশে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। গাছের কাণ্ডের রঙের উপর বৃতি ও বৃতি ও উপবৃতি সবুজ রঙের হবে। আর কাণ্ড লাল

বৃতি ও উপবৃতি সবুজ রঙের হবে। আর কাণ্ড লাল ছোপযুক্ত বা একেবারে লাল হলে বৃতি ও উপবৃতি লাল ছোপযুক্ত অথবা লাল হবে। আলটিসিমা ছাড়া অন্যান্য বেঁটে জাতের বৃতি রসাল (চিত্র-খ 2)। কাণ্ডের গায়ে কাঁটার মত লোম থাকলে বৃতি ও উপবৃতিতেও তা থাকবে। রোজেল ফুল মেস্তা ফুলের চাইতে আকারে ছোট। 5টি ফিকে হলুদ পাপড়ি নিয়ে দল, তার মাঝখানের রঙ টকটকে লাল। কখনো কখনো পাপড়ির রঙ ঘিয়ে-সাদাটে এবং দলের মাঝখানটা বর্ণহীন হতে দেখা যায়। ডিমের আকারের বীজাধারটি বেড়ে যাওয়া বৃতির দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত থাকে (চিত্র-খ 2, 4) এবং তাতে 5টি প্রকোষ্ঠে কফি রঙের বৃক্কের আকারের 20 থেকে 30টি বীজ থাকে। রোজেল বীজ মেস্তার চাইতে ছোট। এক হাজার বীজের ওজন 28 গ্রামের মত। রোজেলের ডিপ্লয়েড ক্রোমোজম সংখ্যা 72।

উন্নত জাত

যে কোন ফসলের ফলন অনেকাংশে নির্ভর করে যে জাত ব্যবহার করা হবে তার ফলনক্ষমতার উপর। মেস্তা/রোজেলও তার ব্যতিক্রম নয়। মেস্তা/রোজেলের বেশি ফলনশীল জাত বের করবার জন্য হয়। আর, টি-1, আর, টি-2 এবং আর, টি-26, যথাক্রমে, পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং বিহারের এরকম তিনটি স্থানীয় জাত ষাটের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত রোজেলের আদর্শজাত হিসেবে গণ্য হত। 1967-সালে বারাকপুর পাটকৃষি গবেষণাগার থেকে



চিত্র-খ— রোজেল (সাবদারিফা)
1—কাণ্ডের অংশ, 2—রসালো বৃতিযুক্ত বীজাধার
3—ফুল—4—অরসাল বৃতিযুক্ত বীজাধার, 5—বীজ

নিরলস প্রয়াস চলছে, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের বারাকপুর পাট গবেষণাগারে ও অন্ধ্রপ্রদেশের আমাদালাভালাসা মেস্তা গবেষণাগারে। এই শতকের প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকে হাওয়ার্ড বিজ্ঞানী দম্পতি মেস্তা/রোজেলের বিভিন্ন জাত নিয়ে গবেষণা করেছেন। 1930 সালে বিজ্ঞানী খান এন, পি, সাব-5 নামে রোজেলের একটি জাত বের করেন। এরপর দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মেস্তা/রোজেলের অনেক স্থানীয় জাত সংগ্রহ করে সেগুলির মধ্য থেকে ভাল ফলনের জাত নির্বাচন করে ব্যাপক চাষের উপর জোর দেওয়া রোজেলের একটি উচ্চফলনশীল সংকর জাত এইচ এস-4288 বের করা হয়। এটি আর, টি-2 এর চাইতে শতকরা 30 ভাগ বেশি ফলন দেয়। এ পর্যন্ত অলটিসিমার সব বেশি ফলনের জাতের কাণ্ডের গায়ে কাঁটাযুক্ত লোম থাকত যেটা চাষীর কাছে খুবই অস্বস্তিকর বলে মনে হত। কিছুদিন আগে, 1977 সালে বারাকপুর গবেষণাগার থেকে এইচ এস-7910 নামে রোজেলের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত বের করা হয়েছে, যার ফলন এইচ এস-4288 এর সমান বা একটু বেশি, কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য এই যে,

এ জাতের গাছের কাণ্ডে বা পাতায় কাঁটা লোম নেই। আর, টি-1 এর কাঁটা লোমহীন একটি জাতের সঙ্গে এইচ এস-4288 এর মধ্যে সংকরীকরণের দ্বারা এই জাতটি পাওয়া গেছে। আশা করা যায়, এই জাতটি চাষীদের কাছে খুবই প্রিয় হবে। 1972 সালে আমাদালাভালাসা গবেষণাগার থেকে এ, এম, ডি-1 নামে রোজেলের আর একটি জাত বের করা হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে বারাকপুর গবেষণাগারের কিছু গবেষক-কর্মী অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে রোজেলের কিছু জাত সংগ্রহ করেন—এইচ. এস. 481 সেগুলির মধ্যে একটি। পরে আমাদালাভালাসার গবেষকরা এই জাতটি থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে এ, এম, ডি-1 জাতটি পান। অন্ধ্রপ্রদেশে এই জাতটি বেশি ফলনের জাত হিসেবে চাষীর কাছে বেশি প্রিয়। এইচ. এস. 4288 উত্তর-পূর্ব ভারতে বেশি ফলন দেয়, মধ্যভারতেও এটির ভাল ফলন হবে। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্যে এ, এম, ডি-1 বিশেষ উপযুক্ত। আর-টি-2, এইচ-এস-4288, এ-এম-ডি-1 এবং এইচ-এস-7910 জাতগুলির বারাকপুরে পাওয়া প্রতি হেক্টরে গড় ফলন হল, যথাক্রমে, 18-19, 25, 22 এবং 25-26 কুইন্টাল। এইচ-এস 4288 থেকে হেক্টর প্রতি 30 কুইন্টালেরও বেশি ফলন পাওয়া গেছে।

বহু দিন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেস্তার স্থানীয় জাতগুলিরই বেশি চাষ হত। সেগুলি এম-টি নামে পরিচিত ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে সংগ্রহ করা এম-টি 15 এরকম একটি জাত, যা, অনেক দিন পর্যন্ত আদর্শ জাত হিসেবে গণ্য হয়েছে। 1967 সালে বারাকপুর গবেষণাগার বিভিন্ন জলবায়ু ও মাটির উপযোগী মেস্তার একটি অধিক ফলনশীল জাত থেকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এটি পাওয়া গেছে। এম-টি 15 থেকে নূতন জাতটি শতকরা 30 ভাগ বেশি ফলন দেয়, এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি 25 কুইন্টাল, কোন কোন ক্ষেত্রে 30-32 কুইন্টালও পাওয়া গেছে।

মেস্তা এবং রোজেলের মধ্যে প্রথমটি কম দিনের ফসল আর এর আঁশও উচ্চগুণসম্পন্ন।

চাষের পদ্ধতি

কম উৎপাদক ক্ষমতাবিশিষ্ট উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে মেস্তা/রোজেল চাষ করা যাবে। দুটি ফসলই অনেক দিন এক নাগাড়ে খরা সহ্য করতে পারে বলে অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলের জন্যে এটি একটি ভাল ফসল। মেস্তা/রোজেল ফসলের জন্যে পাটের মত অত পরিচর্যারও প্রয়োজন নেই, ফলে এই চাষে খরচ কম। ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে এই ফসল দুটি অন্য ফসলের সঙ্গে মিশ্রভাবে চাষ করতে দেখা যায়।

আমাদের দেশে মেস্তা বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে আর ফুলও আসে তাড়াতাড়ি, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ। রোজেলের বৃদ্ধি অত দ্রুত নয়, আর ফুলও আসে অনেক দেরীতে অক্টোবরের শেষাশেষি।

বারাকপুর গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, ডিসেম্বর থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যে কোন সময়েই মেস্তা লাগানো হোক না কেন, তার ফুল আসবে এপ্রিলে; কিন্তু মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অগাষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে যে কোন সময় লাগালে তাতে ফুল আসবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। মে-র মাঝামাঝি পর থেকে লাগালে অবশ্য গাছের উচ্চতা কমে যায় এবং ফলনও কমে আসে। তাই সবচেয়ে বেশি ফলনের জন্যে এপ্রিল থেকে মে-র মাঝামাঝি সময় হল মেস্তা বোনার সবচেয়ে উপযুক্ত। বোনার সময় অনুসারে ফুল আসার ব্যাপারটা কিন্তু রোজেলের ক্ষেত্রে অন্যরকম। এই ক্ষেত্রে, ডিসেম্বর থেকে পরের বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে কোন সময়ই তাকে লাগানো হোক, ফুল আসবে সেই নভেম্বরের শেষে। তাই রোজেলের ফুল আসার সময় নির্দিষ্ট। রোজেল বোনারও

সবচেয়ে অনুকূল সময় এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে-র মাঝামাঝি।

লাঙল ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি চাষ দিতে হয়। শেষ চাষের আগে ভাল করে পচানো গোবর সার হেক্টর প্রতি সাড়ে সাত টন হিসেবে ছড়িয়ে দিয়ে জমি তৈরি শেষ করতে হয়। জমিতে ফসফেট ও পটাশের ঘাটতি থাকলে জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি 20 কিলোগ্রাম করে ফসফেট ও পটাশ ব্যবহার করতে হবে। সাধারণতঃ মেস্তা রোজেল ছিটিয়েই বোনা হয়, এতে প্রতি হেক্টরে বীজ লাগবে মেস্তা 15 থেকে 20 কিলোগ্রাম এবং রোজেল 10 থেকে 12 কিলোগ্রাম। সারি করে লাগালে বীজ কম লাগবে, মেস্তার জন্যে 13 থেকে 15 কিলোগ্রাম আর রোজেলের জন্যে 8 থেকে 9 কিলোগ্রাম। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে 30 সেন্টিমিটার। সারিতে বোনার অনেক সুবিধে, যেমন, বীজ কম লাগে, চাকাবিদা চালানো যায়, সহজে আগাছা বাছা, গাছ পাতলা করা, চাপান সার প্রয়োগ এবং পোকামাকড় দমনের জন্যে ওষুধ ছিটানো যায়। এসবের ফলে চাষের খরচ কম পড়ে। সবার উপর, সারিতে বোনা ফসলের বৃদ্ধি সমভাবে ঘটে এবং ফলন ভাল হয়।

বোনার 15 থেকে 20 দিনের ভিতর আগাছা বেছে দিয়ে কিছু চারা গাছ বেছে ফেলে দিতে হয়। ফসলের দিন চল্লিশেক বয়সের সময় আরেকবার নিড়ানি দিয়ে চারা গাছ এমন পাতলা করে দিতে হয়, যাতে সারির ভিতরকার একটি গাছ থেকে অন্যটির দূরত্ব 10 থেকে 15 সেন্টিমিটারের মধ্যে হয়। গাছ পাতলা করার পর প্রতি হেক্টরে 20 কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন সার চাপান দিলে ফসল বেশি হবে। কিছু দিন পর পর চাকাবিদা চালিয়ে মাটি আলগা করে দিলে আগাছাও দমন হবে আর গাছেরও বৃদ্ধি ঘটবে দ্রুত। চাপান সার 20 কিলোগ্রাম করে দুটি কিস্তিতে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়— সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার সার দিতে হবে গাছের 60 থেকে 90 দিন বয়সের মধ্যে।

স্পাইরাল বোরার পোকার আক্রমণে মেস্তার ফলন অনেক কমে যায়; যেখানে স্পাইরাল বোরার আক্রমণ ঘটে সে জায়গায় মেটাসিসটক্স (শতকরা 2·5 ভাগ) ছিটালে ফল পাওয়া যাবে। রোজেলের গোড়া পচা রোগ অনেক সময় মহামারী হয়ে দেখা দেয়। তাই এ রোগ দেখা দেবার শুরুতেই আক্রান্ত চারাগাছগুলিকে তুলে ফেলতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কপার অক্সিক্লোরাইড সারা জমিতে ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। সাদা সাদা দলবদ্ধ মিলিবাগ রোজেলের আরেকটি বড় শত্রু। এই পোকা গাছের আগার দিক আক্রমণ করে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। প্যারাথিয়ন (শতকরা 0.01 ভাগ) প্রয়োগে মিলিবাগ আক্রমণ প্রতিহত হয়।

মেস্তা/রোজেল ফসলে শতকরা 50 ভাগ গাছে ফুল এলে তা কাটার উপযুক্ত হয়ে আসছে বলে ধরা হয়। গাছে বড় বড় ফল ধরে এলে আঁশ বেশি পাওয়া যাবে বটে, তবে আঁশের মান খারাপ হয়ে যাবে। কাস্তে দিয়ে ফসল কেটে নিয়ে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে পাতা ঝরাবার জন্যে কয়েক দিন মাঠে ফেলে রাখতে হয়। তারপর আঁটিগুলি কোন পরিষ্কার জলের জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে পাটের মতই জাক দিতে হয়। 34° থেকে 36° সেন্টিগ্রেড তাপ মাত্রায় মেস্তা/রোজেল 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে পচে। শীত পড়ে গেলে বেশি সময় লাগে। পাটের মতই একটি একটি করে পচানো গাছ থেকে আঁশ ছাড়ানো হয়। তারপর পরিষ্কার জলে আঁশ ধুয়ে নিয়ে বাঁশের আড়ে শুকিয়ে নিতে হয়।

মেস্তা/রোজেল চাষে অগ্রগতি

যদিও আঁশ উৎপাদনকারী ফসল হিসেবে মেস্তা/রোজেলের পরিচিতি আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল, স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কয়েক বছরের আগে পর্যন্ত এদের চাষ ব্যাপক ছিল না, যেখানে হত, শুধু স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই। স্বাধীনতার পরে যখন কাঁচা পাটের অভাব দেখা দিল

তখন থেকেই মেস্তা/রোজেলের চাষ শুরু হল ব্যাপক ভাবে। 1951 সাল পর্যন্ত সারা দেশে এই ফসল দুটির জমির পরিমাণ বা মোট উৎপাদন সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। 1952 থেকে সরকারী ভাবে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন জানানো শুরু হয়। সে বছর ভারতে মোট 9·96 লক্ষ হেক্টরে 6·81 লক্ষ গাঁট (1 গাঁট = 180 কেজি) মেস্তা/রোজেল আঁশ উৎপন্ন হয়েছিল, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল 630 কিলোগ্রামের মত। এর পর 1963 সালে জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 4 লক্ষ হেক্টর ও উৎপাদন 18·97 লক্ষ গাঁট। সেবার গড় ফলন হয়েছিল হেক্টর প্রতি 846 কিলোগ্রাম। এর পরবর্তী বছর গুলোতে 1971 সাল পর্যন্ত মেস্তা/রোজেলের জমির পরিমাণ 2·8 লক্ষ থেকে 3·7 লক্ষ লক্ষ হেক্টরের এবং ফলনও 9 লক্ষ গাঁট থেকে 16 লক্ষ গাঁটের মধ্যে ওঠানামা করছে। এই সময়ের মধ্যে গড় ফলন ছিল হেক্টর প্রতি 576 থেকে 774 কিলোগ্রাম। 1972 সাল থেকে মেস্তা/রোজেলের চাষ হয় এমন কয়েকটি জেলায় নিবিড় চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ানর চেষ্টা চলছে, তাতে বেশ সুফলও পাওয়া গেছে। 1972-এর পর থেকে মেস্তা/রোজেলের জমির পরিমাণ মোটামুটি 3·5 লক্ষ হেক্টরে স্থিতিশীল রয়েছে কিন্তু হেক্টর প্রতি ফলন বাড়তির দিকে। 1972 সালে যেখানে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল 684 কিলোগ্রাম সেখানে 1977 সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 889 কিলোগ্রাম। আশা করা যায় মেস্তার ফলন আরও বাড়বে এবং পাটশিল্পে কাঁচাপাট সরবরাহ স্থিতিশীল করার ব্যাপারে মেস্তা/রোজেল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ আরও শক্ত করবে।

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু জানতে হলে ঐ কেন্দ্র চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, চিঠিপত্র কর্মসচিব বা বিভাগীয় আহ্বায়কদের নামে যথাবিধি পাঠানো যাবে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে কর্মসচিব বা বিভিন্ন আহ্বায়কদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্য/সভ্যাদের সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

1লা, অক্টোবর, 1978

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন : 55·0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

ম্যালেরিয়া ও স্যার রোনাল্ড রস

'জানেন বোধ হয় দেশে আবার ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে ..' ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরণের একটি সতর্কবাণী আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিদিন বেশ কয়েকবার প্রচার করা হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া আবার আমাদের দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কেন—? উত্তরটা স্বাস্থ্যদপ্তরের বিশেষজ্ঞদের (!) জন্যে রেখে দিলাম আপাতত। আমার উদ্দেশ্য—ম্যালেরিয়া রোগ যাঁরা পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করেছেন, তাঁদের ক্লান্তিহীন সাধনার মাধ্যমে—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

কালাজ্বরের মত (লেখকের জুন '78 সংখ্যায় লেখা দ্রষ্টব্য) এই রোগও বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানব সভ্যতার উপর আঘাত হেনে চলেছে। খৃষ্ট জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগেও ভারতীয় ভেষজবিদ্‌রা দেখেছেন এ রোগ। গ্রীক মনীষী হিপোক্রেটাসের গ্রন্থে উল্লেখ আছে এ রোগের। পেরু দেশের বড়লাট পত্নী কাউন্টেস অফ্ সিনকোন-কে ধরল ম্যালেরিয়া জ্বরে 1630 সালে। পেরুবাসীরা কুইনা কুইনা নামে গাছের ছালের আরক বা গুঁড়া খাওয়াত এই জ্বর হলে। কাউন্টেসের জ্বর সারাতে ব্যর্থ হয়ে চিকিৎসক জুয়ান দি ভেগো অবশেষে কুইনা কুইনা গাছের ছালের আরক খাওয়ালেন তাঁকে। জ্বর সত্যি সত্যি ছেড়ে গেল। কাউন্টেসের চেষ্টায় কুইনা-কুইনা গাছের চাষ শুরু হল ইউরোপে কারণ তখন ইউরোপ ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপছে। গাছের নতুন নাম হল সিনকোনা। এর প্রায় দু'শ' বছর পরে 1820 সালে সিনকোনা থেকে কুইনাইন তৈরি হল। কুইনাইন আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ম্যালেরিয়া কমে এলেও প্রাচ্যে ও আফ্রিকায় কমল না।

আজ একটি ছোট ছেলের কাছেও বোধহয় অজানা নয় যে এক ধরনের মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। কিন্তু মাত্র 80 বছর আগেও এ কথাটা পৃথিবীর মানুষের কাছে অজানা ছিল। অশেষ বাধাবিপত্তি ঠেলে, অনেক দুঃখকষ্ট স্বীকার করে সেকেন্দ্রাবাদের মিলিটারী

হাসপাতালের একটা অপরিসর অন্ধকার ঘরে যিনি এ তথ্যটি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম স্যার রোনাল্ড রস (1857-1932)। রসের জন্ম ভারতের আলমোড়ায়। স্কটিশ বাবা ও ইংরেজ মার সন্তান রস বিলেতেই পড়াশোনা করেন এবং লণ্ডনের সেণ্ট বার্থালোমিউ হাসপাতালে ডাক্তারী ট্রেনিং নেন। 1881 সালে ডাক্তারী পাশ করে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন মাত্র 24 বছর বয়সে। তবে 24 বছর থেকে 38 বছর বয়েস পর্যন্ত রস কাটিয়েছেন প্রধানত সাহিত্য রচনা করে, মাছ ধরে, শিকার আর বিলিয়ার্ড খেলে। কিন্তু তাঁর মনে কোন সুখ ছিল না। 38 বছর বয়সে তিন সন্তানের পিতা রোনাল্ড রস নিজের ডাক্তারী প্রাক্টিসের উন্নতি সাধনের জন্যে জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। সে সময় লুই পাস্তুর ও রবার্ট কক্ বেঁচে। 1880 সালে আলজেরিয়ায় আলফাঁস ল্যাভারো (চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান 1907 সালে) নামে একজন আর্মি ডাক্তার ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তের লাল কণিকার মধ্যে পরজীবী কীটাণু আবিষ্কার করলেন, নাম হল ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট। তের বছর এ আবিষ্কার অবহেলিত ছিল। রস পড়লেন লুই পাস্তুর ও রবার্ট ককের পর্যবেক্ষণ ও টীকাসম্বলিত প্রবন্ধগুলি আর অ্যালফাঁসো ল্যাভারের থিসিস পেপার। ভারতে ফেরার আগে রস ট্রপিক্যাল রোগের আবিষ্কারক তথা ফাইলেরিয়া যে কিউলেক্স মশার কামড়ে হয়—এর আবিষ্কারক প্যাট্রিক ম্যানসনের বাড়িতে হাজির হলেন। প্রবীণ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ম্যানসনের সঙ্গে নবীন সত্যানুসন্ধানী রসের আলোচনা হল। রস জানতে চাইলেন, সত্যিই কি ম্যালেরিয়া রোগ প্যারাসাইট থেকেই হয়। ম্যানসন দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, হ্যাঁ, ল্যাভেরার আবিষ্কার নির্ভুল। তবে কি করে এ প্যারাসাইট মানুষের রক্তে আসে তা এখনও অজানা। তিনি রসকে ম্যালেরিয়ার অন্যতম পীঠস্থান ভারতবর্ষে যেতে পরামর্শ দিলেন তার কারণ খুঁজে বের করবার জন্যে।

1893 সালে ভারতে এসে রস গবেষণায় বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারলেন না। 1894 সালে ছুটিতে রস বিলেতে গেলে ম্যানসন তাঁকে চেয়ারিং হাসপাতালের পরীক্ষাগারে শেখালেন কি করে গবেষণায় অগ্রসর হতে হয়। এখানেই মাইক্রোস্কোপে রস প্রথম ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট দেখলেন। একদিন আলোচনার সময় ম্যানসন বললেন, তাঁর সন্দেহ, মশা ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট বহন করে। রস-এর সামনে চিন্তার দিগন্ত উন্মুক্ত হল। তবে এ সন্দেহ নতুন নয়। আমেরিকার জীবাণুবিদ কিং (1880) প্রথমে এ সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং ল্যাভেরা নিজে তা সমর্থন করেন।

ভারতে ফিরে এলে রসের ডিউটি পড়ল সেকেন্দ্রাবাদ মিলিটারী হাসপাতালে। ম্যালেরিয়া রুগী দেখতে পেলেই কাচের স্লাইডে রক্ত নিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে তন্ন তন্ন করে খোঁজেন তাতে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট। ম্যালেরিয়ার বাহক যদি মশা হয় তবে মশার পাকস্থলীতেও ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পাওয়া উচিত। রস বোতলে মশা ধরে রাখতেন আর ম্যালেরিয়া রোগীর গা থেকে রক্ত খাওয়াতেন। প্রতি কামড়ের জন্যে রোগীকে এক আনা করে পয়সা দিতে হত। তারপর ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়া মশাকে মেরে সরু ছুঁচের সাহায্যে তার পাকস্থলী বের করে মাইক্রোসস্কোপে পরীক্ষা চালাতেন।

রস এবার বিভিন্ন রঙের মশা আলাদা আলাদা বোতলে রাখতে শুরু করলেন। বোতলে বাচ্চা ফোটাতে শিখলেন ডিম থেকে। কিন্তু রসের এই গবেষণায় মিলিটারী কর্তৃপক্ষ খুব খুশী ছিলেন না। তাই তাঁকে এ সময় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে বাঙ্গালোরে বদলী করা হোল। সেখান থেকে উট্‌কামণ্ড। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত উট্‌কামণ্ডে এসে নয় ঘণ্টার মধ্যে রসের কেঁপে ম্যালেরিয়া জ্বর এল। সুস্থ হয়ে 1897 সালের জুন মাসে রস সেকেন্দ্রাবাদে ফিরলেন।

দুর্বল শরীর নিয়েই রস আবার কাজ নিয়ে মেতে উঠলেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। অসহ্য গরম। রস বিভিন্ন জাতের মশাকে আলাদা আলাদা বোতলে লেবেল লাগিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

20শে অগাষ্ট, 1897 সাল। ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়া ডানায় ছিট্‌ছিট্‌ দাগ এক জাতের মশা নিয়ে পরীক্ষা করতে বসেছেন সেদিন। শ্রান্ত ক্লান্ত রস একের পর এক মশা মেরে স্লাইড তৈরি করে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। নাঃ নতুন কিছু চোখে পড়ছে না। আর মাত্র একটা মশা পরীক্ষা করতে হবে। এটিকেও নিয়মমাফিক পরীক্ষা করতে বসলেন। কিন্তু একি! মশার পাকস্থলীর দেয়ালের কোষের মধ্যে কালো গুড়ো মত কি ছড়ানো রয়েছে? ঠিক যেমন মানুষের লাল কণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ভেঙ্গে গিয়ে হয়। অথচ যে মশা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খায় নি তাদের পাকস্থলীতে এ জিনিষ অনুপস্থিত। জিনিষটি মশার পাকস্থলীতে হজম না হয়ে পাকস্থলীর দেয়াল ভেদ করে কোষে ছড়িয়ে রয়েছে। সেদিন রাতেই তিনি লিখলেন, পাকস্থলীর দেয়ালের কালো গুড়ো অন্য কিছু নয়। ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খেয়েছে মশা, রক্তে আছে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট, এই প্যারাসাইট মশার পাকস্থলীর দেয়াল ভেদ করে দেয়ালের ভিতরে কোষে কোষে ছড়িয়ে গেছে। ডাইরীতে লিখে ফেললেন কবি রস বৈজ্ঞানিক রসের মনের অনুভূতি সেই বিখ্যাত কবিতাটির মাধ্যমে আজও যা খোদাই করা আছে তাঁর মূর্তির নিচে।

কিন্তু আরও প্রমাণ চাই। বিশেষ জাতের মশাই যে ম্যালেরিয়ার কারণ ও বাহক এত সহজে সবাই মেনে নেবে কেন? ডানায় ছিট্‌ছিট্‌ দেয়া এই শ্রেণীর মশার পরে নামকরণ হয়েছে অ্যানাফিলিস। এখন বের করতে হবে অ্যানাফিলিস মশার পাকস্থলীর দেয়াল থেকে প্যারাসাইট কোথায় যায় এবং কি করে এই প্যারাসাইট মশার কামড়ের সাহায্যে সুস্থ দেহে রোগ ছড়ায়? ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে 1897 সালে ডিসেম্বরে রসের এক প্রবন্ধ ছাপা হল। মশার দেহাভ্যন্তরে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের যা যা পরিবর্তন তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন তার ছবিসহ। আবার বদলী। এবার মধ্যভারতে। এখানের দারুণ শীতে গবেষণা সম্পূর্ণ বন্ধ হল রোগীর অভাবে। এই সময় রস ম্যানসনের এক চিঠি পেলেন। অভিনন্দন বার্তা। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন রসের সাফল্য সম্পর্কে। এদিকে রসের সুযোগের অভাবে গবেষণা বন্ধ। ম্যানসন এ খবরও পেলেন। তার পর তার চেষ্টায় রস বদলী হয়ে এলেন কলকাতায়। স্বাধীনভাবে ম্যালেরিয়া গবেষণার কাজে ছয়মাসের জন্যে স্পেশাল ডিউটিতে। ফেব্রুয়ারী মাস 1898 সাল। তিনি পেলেন ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে গবেষণাগার, মশা

জমাবার জন্যে ছোট ডোবা, আর দু-জন সহকারী। পাখিদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। অবশেষে গবেষণা তাঁর শেষ হল 1898 সালের জুলাই মাসে।

রস দেখালেন, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট মশার পাকস্থলীতে হজম না হয়ে পাকস্থলীর দেয়াল ভেদ করে কোষে এসে বাসা বাঁধে। সেখান থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন করে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট মশার লালাগ্রন্থিতে এসে পৌঁছয়। সেখান থেকে হুলে। এই বিস্তারিত বিবরণ ম্যানসনকে তিনি জানালেন। এডিনবরায় সেবার ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সম্মেলন বসবে। সম্মেলনে ম্যানসন রসের গবেষণার ফল প্রকাশ করলেন। চাঞ্চল্য দেখা দিল সবার মাঝে।

রসের গবেষণা ও ফলাফল খতিয়ে দেখবার জন্যে ইংল্যাণ্ড থেকে একজন ডাক্তার কলকাতায় এলেন। রস বললেন, ম্যালেরিয়া দূর করতে হলে মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। তাঁর আবিষ্কার ইউরোপ আমেরিকায় খুব প্রশংসা পেলেও কলকাতায় তাঁর বড় কর্তারা একটু বাহবা পর্যন্ত কেউ দিলেন না। ভারত সরকার দিলেন না মৌখিক ধন্যবাদ পর্যন্তও বরং উল্টে ম্যালেরিয়া নিবারণ বিষয়ক পরামর্শগুলিও তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন। রস দুঃখে অপমানে চাকরীতে পেনসন নিলেন। ভারত ছাড়লেন রস। এদিকে রস যখন কলকাতায় গবেষণায় মগ্ন, ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধানে ইতালীতে এলেন রবার্ট কক্, যিনি অ্যানথ্রাক্স্, টিউবারকুলোসিস, কলেরা প্রভৃতির জীবাণু আবিষ্কার করেছেন। জার্মানীর এক বিখ্যাত জীবাণুতত্ত্ববিদ্। এই গবেষণায় আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন রোমের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক জিওভানি বাতিস্তো গ্রাসি। তিনি কক্কে বললেন, তাঁর মতে জানজারোনি মশাই ম্যালেরিয়ার কারণ (অ্যানোফিলিসের ইতালীর নাম জানজারোনি)। রবার্ট কক্ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাঁর কথা মানতে চাইলেন না। গ্রাসির রোখ চেপে গেল।

গ্রাসি দেখলেন, এমন সব জায়গা আছে যেখানে মশা আছে অথচ ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু মশা নেই ম্যালেরিয়া আছে এমন জায়গা পেলেন না। আবার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত জায়গায় গ্রাসি জানজারোনি মশা ছাড়াও আরো দু-ধরণের মশার সন্ধান পেলেন। এরপর গ্রাসি মি শোলা নামে একজন স্বাস্থ্যবান সুস্থ লোককে (যার জীবনে কোন দিন ম্যালেরিয়া হয় নি) মশার কামড় খেতে রাজী করালেন। এক মাস ধরে ম্যালেরিয়া এলাকা থেকে ধরা জানজোরোনি মশা ছাড়া অন্য দু-শ্রেণীর মশার কামড় তাকে খাওয়ান হল।

মি. শোলার ম্যালেরিয়া হল না। এবার ম্যালেরিয়া এলাকা থেকে ধরা জানজোরোনি মশার কামড় খাওয়ান হল তাঁকে। সাত দিনের মধ্যে তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। প্রমাণিত হল তাঁর দাবী। এবার গ্রাসি মশার দেহে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের ক্রমবিকাশ নিয়ে গবেষণায় দেখলেন রসের বর্ণিত ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ হুবহু মিলে গেল। গ্রাসি রসের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দাবী করলেন। কারণ তিনি মানুষের দেহে পরীক্ষা চালিয়েছেন আর রস চালিয়েছেন পাখীদের উপর। গ্রাসি নিজেদের দেশে ম্যালেরিয়া প্রতিকারের উপায় বাতলে দিলেন। 1900 সালে ইতালীর কাম্পাগনায় এক ম্যালেরিয়া

কবলিত গ্রামে গ্রাসী কয়েকটি বাড়ীর জানালায় মিহি জাল লাগিয়ে দিলেন এবং বাড়ির লোকেদের সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে আসা বন্ধ করলেন। অর্থাৎ মশাদের হাত থেকে তাদের আলাদা করা হল। দেখা গেল ওই কটা বাড়িতে ম্যালেরিয়া হল 2/1 জনের মাত্র, কিন্তু এলাকার অন্যান্য পূর্ববৎ ম্যালেরিয়া হল প্রায় সবারই।

গ্রাসি ও রসের গবেষণাপত্র খুঁটিয়ে বিচার করে রবার্ট কক্ ও আঁালফাসো লাঁাভারো ঘোষণা করলেন ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব আসলে রসের, গ্রাসি কেবল পুনরায় গবেষণা করে রসের পরীক্ষার সত্যতা যাচাই করেছেন। 1901 সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে রসকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হল।

রস 1899 সালে 250 পাউণ্ড বাৎসরিক পারিশ্রমিকে লিভারপুল ট্রপিকাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এখানেও তিনি স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ পেলেন না। অথচ রস 1911 সাল পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। 1911 সালে রস নাইটহুড সম্মানে ভূষিত হন। 1923 সালে নিযুক্ত হলেন রয়াল ইনস্টিটিউট অফ্ ট্রপিক্যাল হাসপাতালের ডাইরেক্টর। 1926 সালে রস ইনস্টিটিউট তৈরি হলে তার ডাইরেক্টর হন।

রস ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভার উদাহরণ। তাঁর কবিতা তৎকালীন সভাকবি জন মেসিফিল্ডের সুখ্যাতি লাভ করেছে। তার লেখা গান গাওয়া হয়েছে গীর্জায়। তাঁর লেখা উপন্যাস 'চাইল্ড অফ্ দি ওসান্' সমালোচকেরা R.L Stevension ও রাইডার হ্যাগার্ডের লেখার সঙ্গে তুলনা করতেন। তাছাড়াও 'দি ডিফরমড্ ট্রান্সফরমড্' 'দি একজাইল' 'স্পিরিট অফ্ দি স্টর্ম" খ্যাতি লাভ করেছে। অঙ্ক শাস্ত্রেও তাঁর মৌলিক অবদান আছে। শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে নতুন এক ইংরেজী বানান পদ্ধতির প্রচলন তিনি করেন, এমন কি তা দিয়ে কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন। শর্টহ্যান্ডের এক পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেন। 1932 সালে তিনি মারা যান। তবুও রসের অভিযোগ ছিল— জীবনটা তাঁর বৃথাই গেল। পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া আর হবে না, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যে ভারতের বুকে বসে তিনি তাঁর স্বপ্নকে তিলতিল করে রূপ দিয়েছিলেন মাত্র আশী বছর আগে, সেই ভারতেই তাঁর স্বপ্ন চুরমার হতে চলেছে নতুন করে।

অরূপ রায়*

*48, রাজেন্দ্রনগর, সাকৃচি, জামসেদপুর-831001 বিহার

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া কি সম্ভব ?

ভূমিকম্পের কথা শুনলে মানুষের হৃদ্‌কম্পন বাড়ে। কিন্তু ভূমিকম্পের কয়েক মাস আগে মানুষের হৃদরোগ হয়, রক্তপ্রবাহের গোলমালে নানা অসুখ হতে পারে এসব কথা অনেকে বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 1948 সালে সোভিয়েট রাশিয়ার একটি জায়গায় ভূমিকম্পে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ওখানকার চিকিৎসকেরা সমীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, ঐ ভূমিকম্পের মাস দুই-তিন আগে থেকে ওখানকার অনেকের হৃদরোগ হয়েছিল। অথচ, ভূমিকম্পের পর সেই রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনাটি কাকতালীয় কিনা এখনও জানা যায় নি। তবে ভূমিকম্পের আগে মনুষ্যেতর প্রাণীদের আচরণে যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় সেবিষয়ে এখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানীই একমত হয়েছেন বলা যেতে পারে।

1964 সালে আলাস্কায় যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার কয়েক সপ্তাহ আগে দেখা গেছল সেখানকার কোডিয়াক নামে এক শ্রেণীর ভালুক দল বেঁধে গর্ত থেকে বেরোচ্ছে। ওরা গোটা শীতকালটা গর্তে কাটায়। তখনও শীত কাটে নি, আরও কয়েক সপ্তাহ বাকী ছিল।

তিন বছর আগে 1975-র ফেব্রুয়ারী মাসে চীনের হাইচেং শহরে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল তার কথা আমরা ভুললেও চীনের মানুষ ভুলবেন না। শহরটার ধ্বংস হতে কিছু বাকী ছিল না। কিন্তু শহরের প্রায় দশ-পনেরো লক্ষ মানুষের মধ্যে মৃতের সংখ্যা দু-তিন-শ'র বেশি ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছিল ভূমিকম্পের আগেই তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছিল বলে। সাপেদের শীত-ঘুমের কথা জানি ; শীতকালটা তারা গর্তের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঐ ভূমিকম্পের তিনমাস আগে—অর্থাৎ 1974-র ডিসেম্বরে দেখা গেল বহু সাপ শহরের যেখানে যেখানে বরফ পড়েছে তার উপর মরে পড়ে আছে। অথচ, সেসময় তাদের গর্তে থাকার কথা। নিশ্চয় গর্তের মধ্যে এমন কিছু ঘটেছিল যেজন্যে তারা গর্ত থেকে বেরতে বাধ্য হয়েছে এবং ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। আগের কয়েকটি ভূমিকম্পের আগে এ ধরণের ব্যাপার বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই সেবার আর কোন ঝুঁকি নিলেন না। ভূমিকম্প হতে পারে ভেবে তাঁরা সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সরকার সেই মত লোক সরিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কয়েকজন জাপানী বিজ্ঞানী এ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ক্যাট মাছ নামে একশ্রেণীর বৈদ্যুতিক মাছ নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভূমিকম্পের এক-আধ ঘণ্টা আগে ঐ মাছগুলি কেমন দ্রুতগতিতে জলের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। এমন কি, কতকগুলি মাছ জল ছেড়ে ডাঙ্গায় আসার জন্যে লাফান শুরু করে। বৈদ্যুতিক মাছগুলি তাদের আশেপাশের জলকে বিদ্যুৎ-পরিবাহী করে তোলে। সমুদ্র-জলের চেয়ে মিঠা জল কম বিদ্যুৎ-পরিবাহী বলে সেই জলে বৈদ্যুতিক মাছ আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। মিঠা জলে

ক্যাট মাছ প্রায় 400 ভোল্টের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা ক্যাট মাছকে মিঠাজলের মধ্যে রেখেই পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের অভিমত হল, ভূমিকম্পের আগে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রেরও পরিবর্তন হয়। তার প্রভাব বৈদ্যুতিক মাছের উপর পড়বেই। আর সে কারণেই ক্যাট মাছগুলি জলের মধ্যে এভাবে অস্থির হয়ে পড়ে।

চীনের একদল বিজ্ঞানী পায়রা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা দেখেছেন পায়রার পায়ের কাছে একটা মাংসপিণ্ড আছে যেটা বাইরের সামান্য উত্তেজনাতেই কেঁপে উঠে। তাঁরা কিছু পায়রার ঐ মাংসপিণ্ড কেটে লক্ষ্য করলেন যে পায়রাগুলির ঐ মাংসপিণ্ড কাটা হয় নি ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে সেগুলি কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে এবং ভূমিকম্প হওয়ার ঠিক আগে এদিক-ওদিক উড়তে শুরু করে দিয়েছে। অথচ, যেগুলির মাংসপিণ্ড কেটে নেওয়া হয়েছিল সেগুলি চুপচাপ বসেছিল, উড়ে যাওয়ার চেষ্টাও করে নি। ভূমিকম্পের আগে শিম্পাঞ্জী খুব অস্থির হয়ে চিৎকার শুরু করে দেয় বলে যে কথা প্রচার ছিল আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে তার প্রমাণ পেয়েছেন।

এই সমস্ত পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের সঙ্গে প্রাণীদের আচরণের যে একটা সম্পর্ক আছে তা আর অস্বীকার করতে পারছেন না। সম্প্রতি রুশ বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, চিংড়ি মাছ নাকি ভূমিকম্পের আগে জল ছেড়ে ডাঙ্গায় আসতে চায়, পিঁপড়েরা মুখে খাবার নিয়ে সারি বেঁধে নিজেদের জায়গা ছেড়ে পালায়, বন-মুরগীরা একযোগে চিৎকার শুরু করে। চীনে মানুষকে ভূমিকম্পের আগে সতর্ক করার জন্যে কোন্ প্রাণী কি রকম আচরণ করে তা সহজ ভাষায় লিখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে।

ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর শিলাস্তর, চৌম্বক ক্ষেত্র, আবহমণ্ডল, তাপ প্রভৃতির নানারকমের পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের মাত্রা এত কম যে খুব সূক্ষ্মযন্ত্রেও তা ধরা পড়ে না। অথচ সেই সামান্য পরিবর্তনই প্রাণীদেহে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে সেজন্যে কুকুর ও মোরগের দল চিৎকার করে, সাপ, ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে, ঘোড়া তার আস্তাবল ছেড়ে পালাতে চায়, গরু মাঠে যেতে চায় না, আর মানুষ হার্টের অসুখ নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।

এ ধরণের প্রতিক্রিয়া কেন হয় বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে এখনও গবেষণা করছেন। তাঁদের বিশ্বাস, ভূমিকম্পের আগে প্রাণীদেহে এই সব প্রতিক্রিয়া কেন হয় তা জানতে পারলে মানুষের পক্ষে সাবধান হয়ে যাওয়া আরও সহজ হবে। মানুষকে তাহলে ঘোড়ার ডাক, ভালুকের নাচের উপর ভরসা করতে হবে না।

মৃণালকান্তি রায়

বৃক্ষ রোপণ কেন ?

উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই দুই-এর সহাবস্থান ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমরা নিঃশ্বাসে যে অক্সিজেন নিই তা আসে উদ্ভিদ্ থেকে। আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ, কাগজ, দেশলাই, ইত্যাদি জীবনধারণের বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রীই আমরা পাই উদ্ভিদ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর সমতা রাখার মূলে রয়েছে এই উদ্ভিদ। কলকারখানার ধোঁয়া ও যানবাহনের গ্যাস বাতাস ও পরিবেশকে দূষিত করছে। তা শোধরাতেও সাহায্য করে উদ্ভিদ।

উদ্ভিদ ছাড়া জীবনধারণ সম্ভবপর নয় বলেই উদ্ভিদকে দেবতার আসনে বসানো হয়েছে। দুর্গাপূজায় কলাগাছকে পূজা করা হয় কলাবৌ সাজিয়ে। তার সঙ্গে দেওয়া হয় বেল, হলুদ, অপরাজিতা ইত্যাদি নবপত্রিকা। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা হয় নানাভাবে। তুলসীর বেদীতে সন্ধ্যা প্রদীপ বৃক্ষপূজারই নামান্তর।

জাতীয় উৎসব হিসাবে 1950 খৃষ্টাব্দে সুরু হলেও বৃক্ষরোপণ আমাদের দেশে নতুন নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বৃক্ষরোপণ জাতীয় মর্যাদা পাচ্ছে। সম্রাট অশোক রাস্তার পাশে বটগাছ রোপণ করেছিলেন পথচারীদের ছায়া দিতে ও আম্রকুঞ্জ লাগিয়েছিলেন জনসাধারণের আপ্যায়নের জন্যে। শেরশাহ্ বৃক্ষরোপণ করেছিলেন পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে। তেমনি রথের মেলায় গাছের চারা বেচাকেনা চলে আসছে অতীতকাল থেকে। সেকালেও দেশের জনসাধারণ বৃক্ষরোপণে কত আগ্রহী ছিলেন, এটা তারই নিদর্শন; তৎকালীন জাতীয় চেতনার সাক্ষী। তাইতো পুরাকালে বৃক্ষছেদন সমাজ-বিরোধী কাজ বলে গণ্য হত। আর বৃক্ষরোপণকে দেওয়া হত সামাজিক মর্যাদা।

এক সময় আমাদের দেশজুড়ে বিস্তৃত ছিল ঘনবন। আর্য সভ্যতার যুগে মুনি-ঋষিরা সত্যের সন্ধানে নিমগ্ন থাকতেন তপোবনে। তপোবনের পরিবেশ তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে বেদ ও উপনিষদ রচনায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনভূমির দ্রুত বিলুপ্তি ঘটছে। গড়ে উঠছে ক্রমে গ্রাম, গঞ্জ ও শহর। বাড়তে থাকে চাষ-আবাদ, রাস্তাঘাট, সড়ক, রেললাইন, কলকারখানা, শিল্প, উপনিবেশ ইত্যাদি। বনভূমি সরতে থাকে দূরে আবাদের অযোগ্য স্থানে। সেখানেও উপজাতিদের চলেছে বাঁচার সংগ্রাম—ঝুম চাষ। বনভূমির বড় শত্রু মানুষ। নিজের অজান্তে অতিলোভে হঠকারিতায় মানুষ বনভূমি ধ্বংস করে সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে নিজের।

দেশের সমৃদ্ধি ও প্রগতির জন্য 33 শতাংশ বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতে

মাত্র 23 ভাগ বনভূমি ; পশ্চিমবঙ্গে 14 ভাগ ও উত্তর প্রদেশে 11 ভাগ। তাই জাতীয় স্বার্থে আরও বেশি বনভূমির সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন ।

বনভূমি ধ্বংসের ফলে পৃথিবীতে কত রাজ্য লুপ্ত হয়ে গেছে। ব্যাবিলন ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতা বিলুপ্তির মূলে রয়েছে বনভূমির বিনাশ। রাজস্থানে অতীতে বিস্তৃত বনভূমি ছিল। এখন সেখানে মরুভূমি। এই মরুভূমি সৃষ্টি ও প্রসারের মূলে রয়েছে ঐ একই কারণ।

আমাদের দেশে বছরে চার মাসের বেশি বৃষ্টি হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে কত জল পরিবেশে আটকাতে পারে, তার উপর কতকটা নির্ভর করে সেই জায়গার আবহাওয়া। বনভূমিতে গাছপালার আবেষ্টনে বৃষ্টির জল দ্রুত গড়াতে পারে না। কতকটা জল আটকে যায় পরিবেশে। ফলে আবহাওয়া আদ্র' থাকে। জলের স্থায়ী উৎস সৃষ্টি হয়।

বনভূমি ধ্বংসের ফলে নানা প্রাকৃতিক অসাম্য সৃষ্টি হয়। কোথাও অনাবৃষ্টি, আবার কোথাও বন্যার তাণ্ডব নৃত্য। ভূমিক্ষয় হয়, ধ্বস নামে, নদীতে চর পড়ে, নদীর গতি বদলে যায়। ফসল নষ্ট হয়। এমনি আরও কত উপসর্গ দেখা দেয়। ব্যাপক বৃক্ষরোপণের দ্বারা এই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

বৃক্ষরোপণের দ্বারা বনভূমি সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বন্যা, ভূমিক্ষয়, বালুভূমির বিস্তার, তুফানের গতিরোধ, ভূমির আর্দ্রতা, স্থানীয় আবহাওয়ার সমতা ইত্যাদি। আবার বৃক্ষরোপণ দ্বারা বৃদ্ধি করা যায় দেশে ফসলের উৎপাদন। মূল্যবান কাঠ, জ্বালানী, শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইত্যাদি।

সুষ্ঠু পরিকল্পনামত বনানী সৃষ্টি করতে হবে, নির্বাচিত ও যথোপযোগী প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণ করে। যে কোন জায়গায় যে কোন চারা রোপণ করা অনেক সময় পণ্ডশ্রম মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের আঠালো মাটিতে সেগুন গাছ ভালভাবে বাড়তে পারে না। কোন্ প্রজাতির চারা কিরকম জায়গায় লাগালে ঠিকভাবে বাড়বে, তা জানা প্রয়োজন বৃক্ষরোপণের আগেই। কোন কোন প্রজাতির বৃক্ষ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং বিভিন্ন প্রকার ভূমিতে সহজেই জন্মায়। প্রজাতি নির্বাচন করে বৃক্ষরোপণের সুদূরপ্রসারী ফলকে অবশ্যম্ভাবী করা যায়। আবার কোন্ প্রজাতির গাছ লাগালে বেশি কাজে লাগবে বা উপকার হবে তাও বিবেচনা করা ভাল। রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণের অন্যতম উদ্দেশ্য পথচারীকে ছায়া দান। এর সংগে পরিবেশের সৌন্দর্য বাড়াতে পারলে আরও ভাল। ছায়াদান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির সংগে সুস্বাদু ফল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল হয়। এই তিনের সমন্বয় করা কঠিন নয়। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি কতই আছে। ঠিক ভাবে বেছে নিতে হবে। এই ভাবে বৃক্ষরোপণের দ্বারা সুখাদ্য ফলের উৎপাদন বাড়িয়ে জাতীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নেরও সুযোগ রয়েছে। তেমনি বাসস্থানে খোলা জায়গায় ও সম্ভাব্য স্থানে পছন্দমত প্রয়োজনীয় বৃক্ষ লাগানো যায়। গ্রামে খোলা জাগয়ায়, নদীর ধারে ও অনাবাদী জায়গায় এবং শহরে পার্কে, অ্যাভিনিউতে, মাঠের পাশে ও পড়ো জায়াগায় পছন্দমত ফল গাছ, ভেষজ-উদ্ভিদ, জ্বালানী কাঠ ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য বৃক্ষরোপণ করে দেশের ও দশের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যায়।

যে সব প্রয়োজনীয় বৃক্ষ কোন অঞ্চলে সাধারণত দেখা যায় না কিন্তু জন্মানোর সম্ভাবনা আছে সেই ধরনের কিছু গাছও লাগাবার চেষ্টা করা ভাল। তেমনি স্থানীয় যে সব উদ্ভিদ লোপ পাওয়ার পথে তাদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া সমীচীন।

বৃক্ষরোপণ করেই কর্তব্য শেষ হয় না। অযত্ন, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক সময় এই সব চারা অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। চারাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব। হঠকারিতাবশতঃ কেউ যাতে এগুলি নষ্ট না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন। গৃহপালিত পশুর উপদ্রব থেকেও এদের বাঁচাতে হবে। সমষ্টি উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের মনোভাব নিয়ে এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের এই বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েৎ এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

বন মহোৎসবের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এর সুফল সুদূর-প্রসারী। দেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে বৃক্ষরোপণের মূল্য অপরিসীম।*

[*আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে 3রা জুলাই প্রচারিত কথিকা]

দেবেন্দ্রবিজয় দেব*

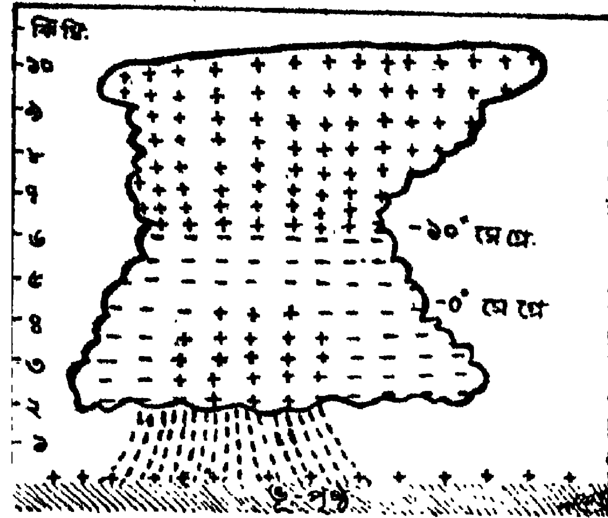
*ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, হাওড়া-3

বজ্রপাত-বজ্রপরিবাহী-বজ্রনাদ

বিদ্যুৎ-মেঘ—প্রথমেই দেখা যাক বিদ্যুৎ-ঝটিকা বা বিদ্যুৎ-মেঘ কি। মেঘের মধ্যে বিমানযোগে এবং অলটি-ইলেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রের পরীক্ষা থেকে জানা যায়, একটি বিদ্যুৎ-মেঘের উপরের দিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জমা হয় ধনাত্মক তড়িৎ এবং নিম্নাংশে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় ঋণাত্মক তড়িৎ[1]। ঋণ-তড়িৎস্তম্ভের তলদেশ থাকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উচ্চতায়—আফ্রিকায় এই স্তম্ভের তলদেশ থাকে দৃশ্য মেঘভূমি থেকে এক মাইল উচ্চতায়, আর শীর্ষদেশ থাকে অভিলম্ব বরাবর আরও চার মাইল। উচ্চে। এই তড়িৎস্তম্ভের ব্যাস প্রায় এক মাইল। এছাড়া ভূপৃষ্ঠ থেকে 2 কিলোমিটারের কম উচ্চতায় জলের হিমাঙ্কের সামান্য বেশি উষ্ণতায়, 10 কুলম্ব ধনাত্মক তড়িতের অবস্থান দেখা যায় ঋণাত্মক তড়িতের নিচের দিকে। কারও মতে এই ধনাত্মক আধানের সঙ্গে যোগ আছে প্রবল বৃষ্টিপাতের; কেউ বলেন পৃথিবীতে বজ্রপাত ঘটাবার ব্যাপারে এই আধানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

1 মোটামুটিভাবে বলা যায়, মেঘের নিম্নাঞ্চলের প্রধান ঋণতড়িৎ এবং ঊর্ধ্বাঞ্চলের ধনাত্মক তড়িৎ সৃষ্টির কারণ জড়িত রয়েছে বরফ কণা ও অতি শীতল জলের মধ্যে সংঘর্ষ এবং হিমীভবনে কোমল-শিলা (soft-hail) গঠনের সঙ্গে—কোমল-শিলা ঋণতড়িৎসহ সঞ্চিত হয় মেঘের নিম্নাঞ্চলে, আর ধণাত্মক তড়িৎযুক্ত বরফ-চেলা (ice-splinters) সমূহ বায়ুপ্রবাহে স্থান লাভ করে মেঘের শীর্ষাঞ্চলে।

বিদ্যুৎ-মেঘের উপরের দিকের প্রধান ধনাত্মক তড়িৎ অবস্থান 6-7 কি.মি-এর অধিক উচ্চতায়, (−20°C) অপেক্ষা কম উষ্ণতায় এবং ঋণাত্মক তড়িতের অবস্থান 2 কিমি.-এর বেশি উচ্চতায়,



চিত্র-1 −বিদ্যুৎ-মেঘে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতের বিন্যাস : স্থান ভেদে মেঘ ও আধান সমূহের উচ্চতা কতকটা পরিবর্তনশীল

হিমাঙ্কের কয়েক ডিগ্রি নিচে। দুই প্রধান তড়িতের প্রত্যেকটির পরিমাণ 1000 কুলম্ব। প্রথমের দিকে তড়িৎদ্বয় থাকে কতকটা মেশামেশি অবস্থায়। তড়িৎ-আধান পৃথক হতে থাকলে, প্রক্রিয়ার শুরু থেকে গড়ে 20 মিনিট সময়ে মেঘ 3 কিমি ব্যবধানে 20-30 কুলম্ব তড়িৎ পৃথক হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ-ঝটিকার তড়িৎক্রিয়া একটা চরম অবস্থায় পৌঁছলে, মেঘের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুদ্বয়ের মধ্যে বা মেঘের ভূমি অঞ্চলের ঋণাত্মক মেরু ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিভব-বৈষম্য দাঁড়ায় 10 কোটি থেকে 100 কোটি ভোল্টের মধ্যে। এই অবস্থায় মেঘের নিম্নাংশের ঋণ-তড়িৎ থেকে বায়ুর অন্তরণ ছিন্ন করে ভূতলে নেমে আসে বিশাল আকৃতির বজ্রস্ফুলিঙ্গ (lightning spark), যাকে বলা হয় 'বজ্রপাত'। প্রতিটি বজ্রপাতের সঙ্গে পৃথিবীতে নেমে আসে 20 থেকে 30 কুলম্ব ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান। বজ্রশিখা সংশ্লিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের গড় মাত্রা দাঁড়ায় 20,000 অ্যাম্পিয়ার কি তারও বেশি এবং এর উষ্ণতা দাঁড়ায় প্রায় 25000°K।

বজ্রপতন পদ্ধতি—একটি বিদ্যুদ্বাহী মেঘ আকাশে সঞ্চিত হলে, তড়িতাবেশের ফলে নিচের দিকে অবস্থিত কোন পরিবাহীর (ঘাস থেকে শুরু করে যাবতীয় জীবন্ত উদ্ভিদ, গৃহ, কারখানা-ভবন, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি, ভূপৃষ্ঠের প্রায় সমস্ত বস্তু) শীর্ষদেশে উৎপন্ন ধনাত্মক তড়িৎ, আর তার পাদদেশে প্রকাশ পায় ঋণতড়িৎ। বস্তু ভূসংযুক্ত হলে পাদদেশের ঋণ-তড়িৎ পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় বস্তুশীর্ষের চতুর্দিকের বায়ুতে সৃষ্টি হয় একটি প্রবল তড়িৎক্ষেত্র। এই তড়িৎক্ষেত্রে অবস্থিত একটি মুক্ত ইলেকট্রন (নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে বায়ুতে সর্বদা কিছু ইলেকট্রন থাকেই) ধাবিত হয় বস্তুটির শীর্ষ অভিমুখে এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান হারে শক্তিলাভ করতে থাকে। এই শক্তিসম্পন্ন

ইলেকট্রন পথিমধ্যে অপর কোন অণুর সান্নিধ্যে এসে পড়লে সংঘর্ষের দ্বারা নতুন ইলেকট্রন এবং ধনায়ন সৃষ্টি করে। পরপর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে তৈরি হয় বিপুল পরিমাণে ইলেকট্রন ও ধনায়ন। ইলেকট্রনসমূহ ক্রমাগত ধাবিত হতে থাকে বস্তুটির ধনাত্মক তড়িৎ-গ্রস্ত শীর্ষের দিকে, আর মেঘের দিকে চলতে থাকে একটি ধনায়ন-প্রবাহ। এই ধনায়ন-প্রবাহকে বলে বিন্দুক্ষরণ-প্রবাহ (point-discharge current)। আকাশে বিদ্যুৎ-মেঘের আবির্ভাব ঘটলে সর্বপ্রকার পরিবাহীশীর্ষ থেকে মেঘের দিকে চলতে থাকে এমনি বহু ধনায়ন-প্রবাহ।

আকাশে বিদ্যুৎ-মেঘ আবির্ভূত হলে, মেঘভূমি (cloud-base) ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে যে ঋণাত্মক তড়িৎ-ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তার মাত্রা মেঘের ঠিক নিচের বায়ুতেই দাঁড়ায় প্রতি সেণ্টিমিটারে 30,000 ভোল্ট অপেক্ষাও বেশি। এই তীব্র তড়িৎ-ক্ষেত্রে অবস্থিত নানাবিধ অণু থেকে সংঘর্ষে আয়ন সৃষ্টির ফলে মেঘভূমি থেকে ভূপৃষ্ঠের দিকে সৃষ্টি হয় কতকগুলি পরিবাহী-পথ। এই সময়ে মেঘের নিম্নদেশ থেকে ঐ পথ বরাবর ভূতল অভিমুখে নামতে থাকে স্বল্পালোকের একটি ঋণাত্মক তড়িৎপ্রবাহ। এই তড়িৎপ্রবাহ ধাপে ধাপে বিভিন্ন পথে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নামতে থাকে নিচের দিকে। এই ধাপযুক্ত তড়িৎ-স্রোতকে বলা যায় 'চালক ঘা' (stepped leader stroke), সংক্ষেপে 'চালক'।

এখন আকাশে বিদ্যুৎ-মেঘের আবির্ভাব ঘটলে সর্বপ্রকার পরিবাহী শীর্ষ থেকে উপরের দিকে এক সঙ্গে উঠতে থাকে বিন্দুক্ষরণ-প্রবাহজনিত কতকগুলি ধনায়ন-প্রবাহ, যেন কোন মহামান্য বিমান-অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনাসহ পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনার জন্যে স্থানীয় ভি-আই-পিবৃন্দের এগিয়ে যাওয়া। যখন এই ধনায়ন-প্রবাহসমূহের কোন একটি অবতরণশীল তড়িৎ-স্রোতের একটি অগ্রগামী শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়, ঠিক তখনই সেই ধনাত্মক তড়িৎ-স্রোতের পথ বেয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে এক রাশ ইলেকট্রন, অর্থাৎ কিছু ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান। দুই তড়িৎ-স্রোতের মিলনকে বলা যায় বিমান-অথিতি ও স্থানীয় ভি-ভি-আই-পি'র হ্যাণ্ডসেক। দুই তড়িৎ-স্রোতের মিলনস্থলে প্রকাশ পায় একটি নাতি বৃহৎ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ—এই স্ফুলিঙ্গই বয়ে নিয়ে যায় মেঘ থেকে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম খানিকটা ঋণতড়িৎ। দুই তড়িতের সংযোগস্থলের উচ্চতা একটি ছোট আগাছার মাথা থেকে 50 মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

যে মুহূর্তে 'চালক' ঊর্ধ্বগামী কোন ধনায়ন-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই মুহূর্তেই চালক-স্রোতের অগ্রভাগে অবস্থিত একরাশি ঋণতড়ি সেই ধনায়ন-প্রবাহের কাণ্ড বরাবর নিচের দিকে নেমে এসে পৃথিবীতে প্রবেশ করে। ঋণতড়িৎ পরিত্যক্ত স্থানে যে ধনায়নসমূহ পড়ে থাকে, তাদের আকর্ষণে বিদ্যুৎ-নালীর (বিদ্যুৎ-শিখার ভ্রমণ-পথ) ঠিক উপরের অংশের ঋণতড়িতের নিচে নেমে এসে পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এইভাবে মেঘ থেকে কোন পাইপের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে একটা জলস্রোত নেমে আসার মত বিদ্যুৎ-নালীর মধ্য দিয়ে পর পর পৃথিবীতে প্রবেশ করতে থাকে ঋণতড়িৎ কিন্তু শেষের এই পদ্ধতি অত্যন্ত দ্রুত, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 30,000 কি. মি, অর্থাৎ আলোর বেগের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। আমরা বজ্রপাতকালে কয়েক মাইল

দীর্ঘ চোখ-ধাঁধানো যে তীব্র আলোক-শিখা দেখতে পাই, তা শেষের এই প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন ঋণাত্মক তড়িৎ-প্রবাহ থেকেই উৎপন্ন। অপর দিকে এই ঘটনা চলাকালে বিদ্যুৎ-নালীর অবয়ব বরাবর উপরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে একটি ধনাত্মক তড়িৎ-স্রোত। বিদ্যুৎ-নালী বরাবর ঋণাত্মক নিষ্কাশনের এই ঘটনাকে বা সময়ের ঊর্ধ্বগামী ধনাত্মক তড়িৎ-স্রোতকে বলা হয় 'প্রত্যাবৃত্ত-ঘা' (return stroke) বা 'প্রধান-ঘা' (main stroke)।

কখনো কখনো প্রধান-ঘা-এর ঋণতড়িৎ আহরণের প্রক্রিয়া মেঘের মধ্যে পৌঁছনোর পরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে; ফলে প্রধান-ঘা'র তড়িৎ-প্রবাহ অধিককাল স্থায়ী হয়। এই ধরণের দীর্ঘ স্থায়ী বজ্রপাত থেকেই বৃক্ষ, ঘর-বাড়ী প্রভৃতিতে অগ্নিকাণ্ড হয় বেশি। অরণ্যের দাবানলও সৃষ্টি হয় এই ধরণের বজ্রপাত থেকেই।

বজ্রপরিবাহী—যে ব্যবস্থায় কোন বস্তু, যেমন গৃহ, মন্দির, গির্জা, কারখানা ভবন প্রভৃতি বজ্রাঘাত থেকে রক্ষা পায়, তাকে বলা হয় 'বজ্রপরিবাহী' বা 'বজ্রনিবারক' (lightning conductor বা lightning arrester)। এই ব্যবস্থায় বজ্র কোন পরিবাহীকে আঘাত করে বটে, কিন্তু বিদ্যুৎক্ষরণ বস্তুর কোন ক্ষতি না করে পরিবাহীর মাধ্যমে ভূগর্ভে প্রবেশ করে।

কোন স্থানে পরিবাহী নির্মাণ করতে হলে প্রথমেই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা দরকার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বজ্রপাতের সংখ্যা কত এবং তাদের প্রচণ্ডতাই বা কেমন। পরের বিষয় হচ্ছে ঘরের অবস্থান—উপত্যকায় অবস্থিত একটি গৃহের তুলনায় পাহাড়ের উপর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত একটি গৃহের বজ্রাহত হবার সম্ভাবনা বেশি। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসম্বলিত ঘন বসতিপূর্ণ শহরে, যেখানে উঁচু গাছ বা তার থাকে, সেখানে ফাঁকা জায়গার তুলনায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হয় কম।

বজ্রপরিবাহীর তিনটি প্রধান অংশ—বজ্রনিবারক ব্যবস্থার তিনটি প্রধান অংশ থাকে—(ক) **উচ্চতা দণ্ড**—এক বর্গ-ইঞ্চির এক-চতুর্থাংশ প্রস্থচ্ছেদের তামা বা লোহার কয়েকটি দণ্ড; দণ্ডগুলির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এই দণ্ডগুলিকে বলা হয় উচ্চতা দণ্ড (elevation rod)। দণ্ডগুলির অগ্রভাগ যাতে বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ায় বিকৃত না হয়, তার জন্যে

---

2 পৃথিবীতে বিদ্যুৎ-ঝটিকার সংখ্যা জাভাতে সবাপেক্ষা বেশি। সেখানকার যে কোন স্থানে এই সংখ্যা হল বছরে 223 দিন (শতকরা হার 61); পরের স্থান মধ্য আফ্রিকার (শতকরা হার 41)। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদ্যুৎ-মেঘের অবয়ব গঠিত হতে থাকে নিয়মিতভাবে বেলা প্রায় দেড়টার দিকে; সেদেশের বিদ্যালয়গুলি সুরু হয় সকাল-সকাল, আর শেষ হয় বেলা দেড়টার মধ্যে সেখানে প্রায় প্রতি বছরই স্কুল থেকে ফেরার পথে গাছের নিচে আশ্রয় নিলে কিছু বালক-বালিকা বজ্রাঘাতে প্রাণ হারায়। 75° অক্ষাংশের উত্তরে, অর্থাৎ গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, উত্তর নরওয়ে, উত্তর মহাসাগর প্রভৃতি অঞ্চলে বজ্রনাদ শ্রুত হয় কদাচিৎ।

ভারতে সবাপেক্ষা বেশি বজ্রপাত হয় মোহনবাড়ী (আসাম) এলাকায়· সেখানকার সংখ্যা বছরে 106 (শতকরা হার 29)। কলকাতার সংখ্যা বছরে 81 দিন (শতকরা হার 22·2)। ভারতে সবচেয়ে কম বজ্রপাত হয় কেশড় (কাছ, গুজরাট) এলাকায়—বছরে মাত্র 9 দিন (শতকরা হার 2.5)।

দণ্ডগুলির অগ্রভাগ পুরুভাবে গ্যালভানাইজ করা তামার তৈরী হওয়া প্রয়োজন। দণ্ডগুলি বস্তুর সর্বোচ্চ স্থানসমূহে খাড়াভাবে দাঁড় করানো থাকে। দণ্ডগুলির ডগা ছুঁচালো হওয়া অত্যাবশ্যক নয়।

(খ) লোহা বা তামার গোল প্রস্থচ্ছেদযুক্ত তার বা পাত-পরিবাহী—এই তার বা পাতগুলি এক দিকে দণ্ডগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে, অপর দিকে এগুলি বস্তুর বহিঃপৃষ্ঠে আটকানো অবস্থায়, যাতে কোথাও তীক্ষ্ম বাঁক সৃষ্টি না হয় তেমনি ভাবে, বস্তুর গা দিয়ে মাটিতে নামিয়ে আনা হয়। খড়ের চালাযুক্ত ঘর না হলে, অন্তরকের উপর দিয়ে এই তার নামিয়ে আনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়। তারের প্রস্থচ্ছেদ, তামার ক্ষেত্রে 6 বর্গ-মিমি, আর লোহার ক্ষেত্রে 20-25 বর্গ-মিমি. হলে, তীব্র বজ্রপাতের অঞ্চলেও রক্ষণ-ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। আর্থিক দিক থেকেও এই রকম তার গ্রহণ সুবিধাজনক।

(গ) লোহা বা তামার মোটা পাত বা দণ্ড—এই পরিবাহী পাত বা দণ্ডগুলি উপরের তারের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থায় জলপূর্ণ কোন কূপ কিম্বা ভূগর্ভস্থ কোন আর্দ্রস্তরে প্রোথিত কতকগুলি ধাতব চাক্তির সঙ্গে যোগ করা থাকে নিম্নগামী পরিবাহীকে জল সরবরাহের কোন ধাতব পাইপের সঙ্গেও যোগ করা যেতে পারে। বজ্রনিবারক ব্যবস্থার এই অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবাহীগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে যথাস্থানে স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন ; অন্যথায় বজ্রনিবারক ব্যবস্থা পিছল হয়। ভূসংযোগকারী পরিবাহীর রোধ 10 ওহ্ম-এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

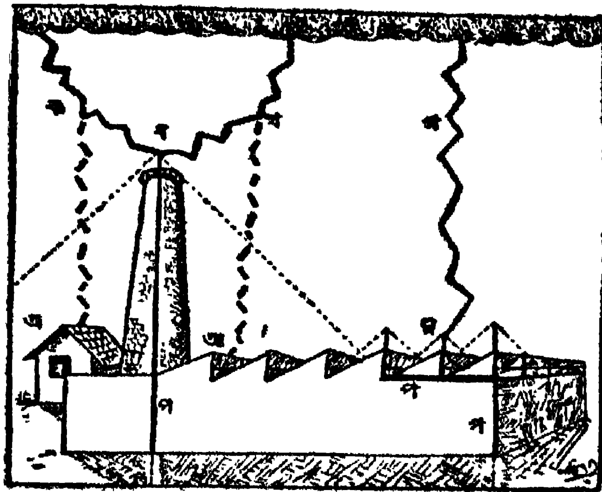
পরিবাহীর কার্য—যখন কোন তড়িৎগ্রস্ত মেঘ বজ্রনিবারক ব্যবস্থার উপরে এসে পড়ে, তখন আবেশের ফলে দণ্ডগুলির অগ্রভাগে সৃষ্টি হয় ধনাত্মক তড়িৎ। এই অবস্থায় দণ্ডগুলির অগ্রভাগ থেকে মেঘের দিকে চলতে থাকে বিন্দুক্ষরণ-প্রবাহজনিত কতকগুলি তড়িৎ-বাত্যা। কিন্তু মেঘের ভূমি অঞ্চলে যে পরিমাণ তড়িৎ সঞ্চিত থাকে, তড়িৎ-বাত্যা তার সামান্যই প্রশমিত করতে সমর্থ হয়। একটু বিবেচনা করে দেখলেই বিষয়টি বোঝা যায়—তড়িৎ-বাত্যায় যে তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তার পরিমাণ কখনো কয়েক মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ারের বেশি হয় না। গণনায় দেখা যায়, এই পরিমাণের তড়িৎ-প্রবাহ মেঘের 20 কুলম্ব তড়িৎ প্রশমিত করতে মাত্র একটি তীক্ষ্মাগ্র-দণ্ড সময় নেবে প্রায় 240 ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রায় 12 দিন। আর যদি তীক্ষ্ম প্রান্তের সংখ্যা হয় 1000-এর বেশি, তা হলেও মেঘের 20 কুলম্ব তড়িৎ প্রশমিত করতে সময় নেবে আধ ঘণ্টারও বেশি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মেঘের বিপুল তড়িৎ প্রশমনের জন্যে কোন বিদ্যুৎ-চমক ততক্ষণ অপেক্ষা করে না ; অতি অল্প সময়ে মেঘ ও দণ্ডাগ্রের মধ্যে উচ্চ বিভব-বৈষম্য সৃষ্টি হয় বলে বজ্রশিখা পরিবাহী-দণ্ডকে আঘাত করে বসে। এই অবস্থায় দণ্ড সংযুক্ত পরিবাহী-পাতসমূহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে, আঘাতপ্রাপ্ত বস্তুর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

পরিবাহীর ডগা থেকে বিন্দুক্ষরণ-প্রবাহ চলার ফলে মেঘের ভূমি অঞ্চলের তড়িৎ প্রশমিত হওয়া সম্ভব হলে, বনাঞ্চলে বিদ্যুৎ-ঝটিকার আবির্ভাব ঘটলে শত শত বৃক্ষশীর্ষ থেকে উৎক্ষিপ্ত

তড়িৎ-আধানে মেঘের তড়িৎ প্রশমিত হত, আর সে অবস্থায় অরণ্যে বজ্রপাতের ফলে কখনো দাবানল সৃষ্টি হত কিনা সন্দেহ।

রক্ষণ-শঙ্কু—যদি পরিবাহী-দণ্ডের অগ্রভাগকে শীর্ষ ধরে নিচের দিকে একটি শঙ্কু কল্পনা করা যায়, যার ভূমিস্থ বৃত্তের ব্যাস সেই পরিবাহীর উচ্চতার সমান, তবে ঐ বৃত্তের মধ্যে যে কোন স্থানে বজ্রপাত ঘটলে, তার আঘাত থেকে বস্তুর রক্ষা পাবার সম্ভাবনা থাকে শতকরা নিরানব্বই ভাগ। কিন্তু সময় সময় মাত্র একটি বজ্রনিবারক দণ্ডে কাজ হয় না। গৃহ খুব লম্বা ধরণের হলে, যেমন টিনের চালাযুক্ত পাট-গুদাম কিম্বা কোন কারখানা-ভবনের অংশ বিশেষ মেঘের বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত কোন বিদ্যুৎ-শিখা রক্ষণ-শঙ্কু (protective cone)-এর আওতার বাইরে পড়ে যায়; ফলে এক বা একাধিক বাজ থেকে গৃহ রক্ষা পেলেও, মেঘের অপর অংশ থেকে নির্গত শিখা বস্তুকে আঘাত করে বসে। এই জন্যে গৃহের আয়তন অনুযায়ী বজ্রনিবারক দণ্ডের সংখ্যা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাতে সমগ্র ভবনটি কতকগুলি রক্ষণ-শঙ্কুর পরিসীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বজ্রনাদ—বজ্রশিখার উৎপন্ন শক্তির (মোট শক্তি 2100 কোটি জুল বা 500 কোটি ক্যালরি) প্রায় তিন ভাগই ব্যয়িত হয় শিখার সরু নালীতে অবস্থিত বায়ুকে উত্তপ্ত করতে মাত্র কয়েক-শ' মাইক্রো-সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বায়ুর উষ্ণতা বেড়ে যায় পনের-কুড়ি হাজার সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রি পর্যন্ত।



চিত্র-2—সমগ্র ভবনের রক্ষা ব্যবস্থা: ভবনের অ, আ স্থানে যে ক, খ বিদ্যুৎ-শিখাদ্বয় আঘাত করত, তা ব বজ্রপরিবাহী দ্বারা প্রতিহত হচ্ছে; কিন্তু সমগ্র ভবনটি অপর কতিপয় ভূসংযুক্ত পরিবাহীর রক্ষণশঙ্কুর মধ্যে না থাকলে, গ বিদ্যুৎ-শিখা ভবনটির ঘ অংশে আঘাত করে বসে। প পাত-পরিবাহী

ফলে উত্তপ্ত বায়ু প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শক্তিসহ প্রসারিত হয়। এই সময় পর পর চাপের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা থেকেই উৎপন্ন হয় প্রবল শব্দ। এই কর্ণবিদারক শব্দকেই বলে বজ্রনাদ (thunder) বা 'মেঘডাকা'। বজ্রপাতে যে গম্ গম্ হম্ হম্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, তা নির্ভর করে প্রথমতঃ, শিখার বিভিন্ন অংশ থেকে শ্রোতার দূরত্বের উপর। যদি দুটি অংশ থেকে শব্দ

একই সময়ে কানে এসে পৌঁছয়, তবে শব্দ অত্যন্ত প্রবল মনে হয়; দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি নির্ভর করে বিদ্যুৎ-চমকের ঘা-এর সংখ্যার উপর—বিভিন্ন ঘা থেকে উৎপন্ন শব্দ অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর শ্রোতার কানে পৌঁছতে থাকে বলে শব্দ অবিরাম মনে হয়। মেঘের অভ্যন্তরে এবং বায়ুতে প্রায়ই মাড়যুক্ত নতুন সুতীথান কাপড় ছেঁড়ার আওয়াজের মত এক ধরণের বিদ্যুৎ-চমকের কড় কড় বা ক-ড়া-আ-ৎ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই শব্দ উৎপন্ন হয় প্রথম 'ধাপযুক্ত চালক-ঘা' থেকে।

বজ্রনাদের শব্দ সাধারণতঃ সাত মাইল দূরে অবধি শোনা যায়; কিন্তু বাতাস খুব স্থির থাকলে, শব্দ উৎস থেকে পঁচিশ মাইল দূরত্বেও শোনা যায়। বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রনাদের মধ্যবর্তী সময় লক্ষ্য করে দর্শক থেকে বিদ্যুৎ-চমকের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 1090 ফুট (মোটামুটি $\frac{1}{5}$ মাইল, অর্থাৎ প্রতি 5 সেকেণ্ডে এক মাইল)। এখন, ধরা যাক, কোন বিদ্যুৎ-চমক চোখে লাগার মুহূর্ত থেকে সেকেণ্ডের মাপে গুণতে থাকলাম, 1,2,3,4··· ইত্যাদি। এইভাবে 35 সেকেণ্ড গোণার পর প্রথম বজ্রনাদ শোনা গেল। কাজেই বুঝতে হবে $35 \div 5 = 7$ মাইল দূরে আছে শব্দ তথা বিদ্যুৎ-চমকের উৎস, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-মেঘ। কিন্তু বিদ্যুৎ-চমকের দূরত্ব 5 মাইলের বেশি না হলে, এই উপায়ে নির্ণীত দূরত্ব একটি নিকটের চমক থেকে উদ্ভূত বলে ভ্রম হতে পারে।

বজ্রাঘাত থেকে সাবধানতা—তীব্র বিদ্যুৎ-মেঘের আবির্ভাবে, বিশেষ করে যে সব বিদ্যুৎ-মেঘের ভূমির উচ্চতা কম, প্রাণী উন্মুক্ত স্থানে, গাছের নিচে বা ঘরের মধ্যেও বজ্রঘাতের বলি হতে পারে।

গণেশচন্দ্র বিশ্বাস*

3 বজ্রপাত পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বায়ুতে পরিবাহী-পথ প্রস্তুত, ধাপযুক্ত চালক-স্রোতের অগ্রসরণ, মেঘভূমি থেকে বিদ্যুৎ-নালীর মাধ্যমে পৃথিবীতে ইলেকট্রন নিষ্কাশনের প্রধান প্রক্রিয়া প্রভৃতি পদ্ধতি সমূহের প্রত্যেকটিকে একটি 'আঘাত' বা 'ঘা' (stroke) বলা যায়।

*প্রভাতকুমার কলেজ, পোঃ—কাঁথি জেলা—মেদিনীপুর

পাখীদের প্রজননে আলোর প্রভাব

জন্ম ও মৃত্যু দুটি পৃথক বিন্দু। এদের যোগ করে রেখেছে একটি রেখা--নাম তার জীবন। জীবন প্রকৃতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সে নতুন জীবনের জন্ম দেবেই। পুরাতন জীবন রেখে যাবে তার সত্তা নতুনের মধ্যে দিয়ে। সৃষ্ট জীবন যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি করবে নতুন জীবন তার নাম প্রজনন।

জীবনের অনুক্রমে প্রজনন অপরিহার্য। প্রকৃতির কাছে দায়বদ্ধ জীবন কিন্তু কিছুতেই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না কারণ জীবজগতের প্রজনন প্রকৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তবে প্রকৃতির যে অংশ জৈব জননকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, তাহল —আলো।

যদিও বহু প্রাণীদের প্রজননে আলোর প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তবু আমাদের আলোচনা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রাখব পাখীদের মধ্যেই কারণ, গত অর্ধশতাব্দী জুড়ে এই বিষয়ে যতটা ফলপ্রসু গবেষণা হয়েছে সম্ভবতঃ অন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়ে ততটা নয়। তবে এটাও সত্য যে পাখীদের মধ্যে আলোকে প্রজনন নিয়ন্ত্রক হিসাবে ব্যবহার করার ঘটনা বিশেষ ঋতুতে একবার মাত্র প্রজননকারী পাখীদের মধ্যেই বেশি জানা যায়, অন্ততঃপক্ষে সারা বছর জুড়ে প্রজননকারি পাখীদের তুলনায়। গত পঞ্চাশ বছরে এই প্রাকৃতিক প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে সন্দেহ নেই কিন্তু বহু প্রশ্ন থেকে গেছে যার উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি।

পাখীদের প্রজননে আলোর প্রভাবের যে আধুনিক মতবাদ তার প্রবক্তা যদিও অধ্যাপক রোয়ান (1926), আজকে বিশেষভাবে যে বিজ্ঞানী ও তাঁর সহকর্মীদের একনিষ্ঠ সাধনা আমাদের বর্তমান ধারণার জন্যে দায়ী তিনি হলেন প্রকৃত মার্কিন পক্ষী-বিজ্ঞানী এবং গত বছর জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট পক্ষী-হর্মোনতত্ত্ববিদ অধ্যাপক অশোক ঘোষের আহ্বানে আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক পক্ষীবিষয়ক হর্মোন তত্ত্বের আলোচনা-চক্র'-এর সভাপতি অধ্যাপক ডোনাল্ড স্ট্যানলি ফারনার। তাঁর দীর্ঘ পঁচিশ বছরের গবেষণা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে আলোচ্য বিষয়ের আধুনিক মতবাদকে। তাঁর নিজস্ব মতে কম করেও 15টি গোষ্ঠীর 60 রকমের বিভিন্ন পাখীদের প্রজননের উপর আলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট। উপরন্তু তাঁর ধারণা বর্তমান পৃথিবীর মোট 8600 প্রজাতির বিভিন্ন পাখীদের মধ্যে প্রায় 2500 প্রজাতির পাখীরা দিনের আলোকে তাদের প্রজননের নিয়ন্ত্রক হিসাবে ব্যবহার করে।

আলোর প্রভাবের কথা আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃই প্রথমে আলোচনা করতে হয় আলোর বিভিন্ন গতি প্রকৃতি ও তাদের পাখীদের প্রজননকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পর্কে। প্রশ্ন জাগে আলোর তীব্রতাই কি দায়ী? অর্থাৎ শক্তিশালী আলোর সংস্পর্শে এসে পাখীদের জনন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, আর মৃদু আলোতে হয় বিলম্বিত? কিন্তু তা নয়, গবেষণালব্ধ ফল

প্রমাণ করে খুবই মৃদু না হলে আলোর তীব্রতা তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে দেখা গেছে ময়ূরগীজাতীয় পাখী—যারা বিবর্তনের ধাপে অনেক নিচু সারিতে তাদের যত কম তীব্র আলোর প্রয়োজন নয়, চড়ুইজাতীয় পাখী—যাদের স্থান বিবর্তনের ধাপে অনেক উপরে তাদের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বেশি আলোর তীব্রতা। তবে কি আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই দায়ী আলোর প্রভাব বজায় রাখতে? এ বিষয়ে খুব বেশী কিছু না জানা গেলেও দেখা গেছে অন্ততঃপক্ষে এক ধরণের হাঁসেদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান আলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো প্রজননের গতি তরান্বিত করতে অনেক বেশি কার্যকরী।

আলোর প্রভাব খুব স্পষ্ট করে লক্ষ্য করা গেছে তার স্থিতিকাল কতটা তার উপর। দেখা গেছে দীর্ঘ আলোর স্থিতি (বিভিন্ন পাখীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন, 24 ঘণ্টার মধ্যে কোন কোন পাখীদের ক্ষেত্রে মাত্র 9 ঘণ্টা আবার কোন কোন পাখীদের ক্ষেত্রে 13 ঘণ্টা বা আরও বেশি) অধিকাংশ পাখীদের শুধু যে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু উৎপাদন ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে তাই নয়, তাদের প্রজনন ও প্রজনন পরবর্তী কালের আচার-আচরণও নিয়ন্ত্রণ করে। বেশীর ভাগ ঋতু প্রজননকারী ইউরোপীয় পাখীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রজনন ঋতুর শেষে শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় এর আয়তন ও কার্যকরী ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং বেশ কিছু সময়ের জন্যে তারা আলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, অর্থাৎ এই সময় আলো-অন্ধকারের স্থিতিকালের কোন রকম পরিবর্তনেই এরা কিছুতেই সাড়া দেয় না। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে 'আলোর প্রভাব-মুক্ত দশা' বা refractary phase। প্রকৃতির দীর্ঘ দিনের আলোর প্রভাবে প্রজননের গতি তরান্বিত হলেও এই আলো এক নাগাড়ে দীর্ঘ দিন ধরে চলার ফলেই পাখীদের শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় এমন এক পরিবর্তন হয় যে কিছুতেই তখন আর তারা বাইরের আলোর প্রভাবে সাড়া দিতে পারে না, বা সুরু হয় আলোর প্রভাব মুক্ত দশার। তারপর এই দশা বেশ কিছু দিন ধরে চলার পর যখন প্রকৃতির দৈনিক আলো আপনি কমে আসে তখন ঐ ছোট দিনের প্রভাবেই 'আলোর প্রভাব মুক্ত দশা'র শেষ হয় এবং পুনরায় আলোর দ্বারা উদ্দীপিত হওয়ার ক্ষমতা ফিরে আসে তাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিশেষ ঋতুতে প্রজননকারী পাখীদের প্রজনন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে আলোর স্থিতিকাল অর্থাৎ বড় দিন আর ছোট দিন।

এখন স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন সকলের মনে জাগতে পারে যে ছোটদিন-বড়দিন এর এই প্রভাব সব পাখীদের ক্ষেত্রেই কি এক? এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ নয় আংশিক ভাবে দিয়েছেন অধ্যাপক ফারনার নিজে। তাঁর মতে আলোক নিয়ন্ত্রিত পাখীদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় –

(1) মুখ্য আলোক নিয়ন্ত্রিত পক্ষীকুল, (2) গৌণ আলোক নিয়ন্ত্রিত পক্ষীকুল, এবং (3) অনুমোদনকারী আলোক নিয়ন্ত্রিত পক্ষীকুল। প্রথমে আসা যাক প্রথম দলের পাখীদের অর্থাৎ 'মুখ্য আলোক নিয়ন্ত্রিত পক্ষীকুল'-এর কথায়। এই ধরণের পাখীরা আলোর প্রভাবকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নেয় তাদের প্রজননের নিয়ন্ত্রণে, অর্থাৎ দিন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রজনন ক্ষমতাও বাড়তে থাকে প্রজনন ঋতু শেষ হয়ে গেলে পুনরায় প্রজননের প্রস্তুতি পর্ব সুরু করে

'ছোট দিন'। ইউরোপীয় বেশীর ভাগ পাখীই এই বিভাগের মধ্যে পড়ে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চড়াই, বিভিন্ন ধরণের শ্বেত ঝুঁটি চড়াই ও এক প্রজাতির পায়রা। এইবার দ্বিতীয় বিভাগের পাখীদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্ যারা আলোর নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে তবে পুরোপুরিভাবে নয় আংশিকভাবে এবং সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক অন্য কোন উপকরণের সঙ্গে আলোকে গৌণভাবে এই ধরণের পাখীরা ব্যবহার করে তাদের প্রজননের নিয়ন্ত্রক হিসাবে। এই ধরণের পাখীদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের দেশেরই পাখী বাবুই। সবশেষ বিভাগে যে পাখীদের স্থান দেওয়া হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে যে তারা আলোর দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধিকে মোটেই তাদের প্রজনন নিয়ন্ত্রক হিসাবে ব্যবহার করে না কিন্তু তাদের পরীক্ষাগারে যদি আলোর স্থিতিকালের বিশেষ পরিবর্তনের মধ্যে রাখা হয় তাহলে তাদের প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। অর্থাৎ এই পাখীরা প্রকৃতিতে আলোকে অবজ্ঞা করলেও তাদের শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে আলোকে মেনে চলার ক্ষমতা বা আলোকে তাদের প্রজনন নিয়ন্ত্রণে অনুমোদন করার ক্ষমতা আছে। সেইজন্যেই তাদেরকে 'অনুমোদনকারী আলোক নিয়ন্ত্রক পক্ষীকুল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের পাখীর উদাহরণ হল আমাদের দেশের এক বিশেষ জাতের মুনিয়া।

এখন আমরা যে জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি তা হল, আলোর নিয়ন্ত্রণ মেনে চলায় বিভিন্ন পাখীদের মধ্যে এত ভেদাভেদ কেন? যদিও এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও অনুচ্চারিত তবু অধ্যাপক ফারনারের মতে—পাখীদের বিবর্তন ও তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের জন্যই হয়ত এই অনুভূতির তারতম্য ঘটেছে।

সাধারণ জ্ঞানপিপাসু মন ও বৈজ্ঞানিক দু-তরফেরই একটি কৌতুহল জমা আছে পাখীদের প্রজননে আলোর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে, -কি করে আলোর স্থিতিকালের কম-বেশির বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে পাখীদের দেহে এবং সেই বার্তা মেনে চলছে তাদের জননতন্ত্র। অতি সম্প্রতি এই প্রশ্নের উত্তর কিছুটা পাওয়া গেছে বিশিষ্ট পক্ষী-হর্মোনতত্ত্ববিদ্ ব্রায়ান ফোলেট এবং তাঁর সহযোগীদের গবেষণালব্ধ ফল থেকে। তাদের মতে এই সমস্ত প্রক্রিয়া যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা হল 'হর্মোন' (বা উত্তেজক রস, যা নিঃসৃত হয় বিশেষ বিশেষ নালিকা বিহীন গ্রন্থি থেকে)। তাঁরা অনুমান করেন আলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসে উদ্দীপিত করে মস্তিস্কের এক বিশেষ অংশকে, পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'হাইপোথ্যালামাস' (hypothalamus)। এই হাইপোথ্যালামাস মূলতঃ বেশীর ভাগ শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী পিটুইটারী গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে বিশেষ হর্মোন নিঃসরণে। এখন এই পিটুইটারি হর্মোনই পরিশেষে উদ্দীপিত করে জনন ও সহযোগী অঙ্গকে যাতে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু উৎপাদন ও অন্যান্য প্রজননবৃত্তীয় কার্যকলাপের গতি ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আলোর বার্তা মস্তিস্কের মধ্যে এসে পৌঁছলে হর্মোনই হচ্ছে সেই একনিষ্ঠ বার্তাবাহক যা সেই জাগিয়ে তোলার বার্তাকে প্রকৃত অঙ্গে পৌঁছে দিয়ে প্রজননের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উল্লিখিত আলোচনায় এটা নিশ্চয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে পাখীদের প্রজনন নিয়ন্ত্রণে আলো কি বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু বর্তমান তত্ত্বের বেশীর ভাগ তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে ইউরোপ থেকে যেখানে সারা বছরে বড়দিন আর ছোটদিনের মধ্যে ব্যবধান খুবই বেশি।

কিন্তু বিশাল এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবেই বিচিত্র বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায়। এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্যে যে সমস্ত উপকরণ বিশেষ ভাবে দায়ী তা হল আলো, আদ্রর্তা ও উষ্ণতা। প্রকৃতির এই সব উপকরণের মধ্যে থেকে ইউরোপীয় গগনবিহারী পাখীরা যে আলোকেই তাদের প্রজননের নিয়ন্ত্রক হিসাবে বেছে নিয়েছে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি স্থান কাল নির্বিশেষে সকল পাখীদের ক্ষেত্রেই অটুট ? বর্তমানে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তাবৎ কালের বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রান্তের বিশিষ্ট পক্ষী-বিজ্ঞানিগণ।

সৌমেনকুমার মৈত্র*

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ (বালীগঞ্জ), কলিকাতা-700 019

সলিড স্টেট ব্যাটারী

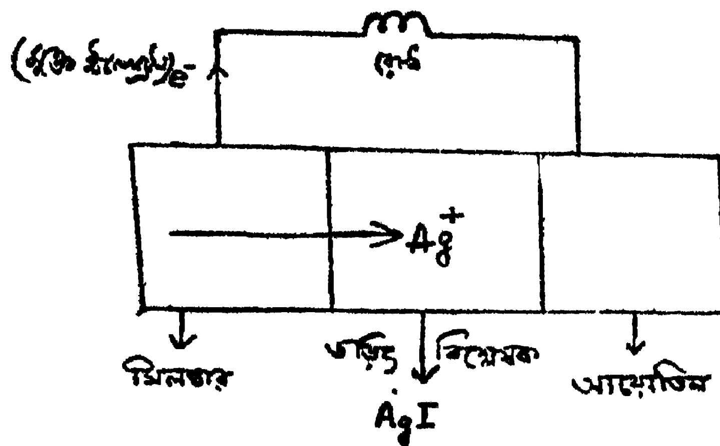
1972 সালে লণ্ডনের বিদ্যুৎ-পর্ষৎ ভীষণ সাফল্যের সঙ্গে নতুন ধরণের এক ব্যাটারী চালিত যান নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। খবরটা নতুন, কারণ এই ব্যাটারী একেবারেই আলাদা ধরণের। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ডিজেল প্রভৃতি জ্বালানী থেকে উদ্ভূত শক্তিচালিত যানের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। যদিও ব্যাটারী থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি কাজে লাগিয়ে যান চালাবার কথা আমাদের কাছে নতুন নয় তবুও বর্তমানে নানা কারণবশত যান-নির্মাণ শিল্পে প্রচলিত কোষ বা ব্যাটারীর প্রয়োগ ক্রমশ লুপ্ত হতে চলেছে ও উন্নততর কোষের ব্যবহারের দিকে বিজ্ঞানীদের ঝোঁকও তীব্রতর হচ্ছে।

যান চালাবার জন্যে প্রচলিত ব্যাটারীর কার্যকারিতা সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্ন এসেছে। প্রথমত এই সব ব্যাটারীর শক্তি-ঘনত্বের মান 20 থেকে 40 ওয়াট ঘণ্টা কিলোগ্রামের মধ্যে হয়ে থাকে। শক্তি ঘনত্ব হচ্ছে ব্যাটারীতে সঞ্চিত মোট শক্তি ও ব্যাটারীর ভরের অনুপাত। এদের দ্বারা চালিত যান একটানা 40 কিলোমিটার পথের বেশি যেতে পারে না কেননা ব্যাটারীর শক্তি শেষ হয়ে যায় ও পুনরায় আহিত করবার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত তড়িদ্দ্বারের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটার ফলে লেড-অ্যাসিড ব্যাটারীর জীবনকাল সীমিত। আজকাল হার্ট-পেসমেকার, ইলেকট্রনিক ঘড়ি প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহারের কথা খুব শোনা যাচ্ছে। এই সব যন্ত্রে এই ধরণের ব্যাটারীর ব্যবহার কোনমতেই সম্ভব নয় কারণ এদের আয়তন যথেষ্ট বড় এবং স্থায়ীত্ব অত্যন্ত কম।

পুর্ত-বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার ফসল হিসেবে আমরা পেলাম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অভিনব ব্যাটারী। এদের বলা হয় সলিড স্টেট ব্যাটারী। এখন আমরা এই ধরণের দুই-একটা ব্যাটারীর সম্বন্ধে আলোচনা করব।

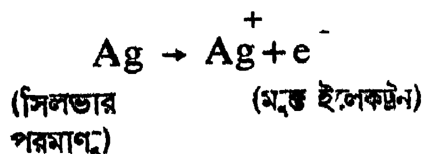
সাধারণ ব্যাটারীর মত এরও দুটি তড়িদ্দ্বার (ইলেকট্রোড) এবং তাদের মাঝখানে উপযুক্ত

কোন তড়িৎ-বিশ্লেষক বা ইলেকট্রোলাইট থাকে। তড়িদ্দ্বারগুলি কঠিন বা তরল দু-রকমই হতে পারে। কম ও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারীর জন্যে যথাক্রমে কঠিন ও তরল অবস্থায় তড়িদ্দ্বারগুলির



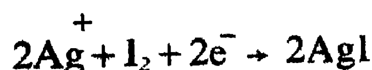
ব্যবহার হয় কিন্তু সবসময়ই তড়িৎ-বিশ্লেষক বা ইলেক্ট্রোলাইটের কঠিন রূপ নেওয়া হয়। এই কারণেই এই ব্যাটারীর নাম সলিড-স্টেট ব্যাটারী। এই রকম একটা ব্যাটারীর কার্যপ্রণালী দেখা যাক।

সিলভার-সিলভার আয়োডাইড-আয়োডিন কোষের উদাহরণ দিচ্ছি। এখানে সিলভার ও আয়োডিনের মাঝখানে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কঠিন সিলভার-আয়োডাইড নেওয়া হয়। ছবিতে প্রদর্শিত বর্তনী সংযুক্ত হলেই সিলভার পরমাণু একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ধনাত্মক সিলভার আয়ন হিসেবে সিলভার আয়োডাইডের মধ্য দিয়ে ছুটতে শুরু করে অন্য প্রান্তে আয়োডিনের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে এবং বহির্বর্তনী দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের জন্য ঐ মুক্ত ইলেকট্রনই দায়ী। এখানে সিলভার ও আয়োডিন যথাক্রমে ক্যাথোড ও অ্যানোডের মত আচরণ করছে। সিলভার ও আয়োডিন প্রান্তে যে ভাবে বিক্রিয়া হয় তা নিচে দেওয়া হল।



$$Ag \rightarrow Ag^{+} + e^{-}$$

(সিলভার পরমাণু)　(মুক্ত ইলেকট্রন)



$$2Ag^{+} + I_2 + 2e^{-} \rightarrow 2AgI$$

এই ব্যাটারীর তড়িচ্চালক বলের মান 0·6 ভোল্ট-এর কাছাকাছি হয়। ব্যাটারীর পুনঃআহিতকরণে তড়িদ্দ্বারগুলিতে বিপরীত বিক্রিয়া হয় অর্থাৎ সিলভার আয়োডাইড বিশ্লিষ্ট হয় ও পুনরায় সিলভার ক্যাথোডে এসে জমা হয়। সলিড-স্টেট ব্যাটারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে এর কঠিন তড়িৎ-বিশ্লেষক। সিলভার আয়োডাইডের মধ্য দিয়ে সিলভার আয়নের ব্যাপনবেগ (rate of diffusion) এই ব্যাটারীর কার্যকারিতার জন্যে সবচেয়ে দায়ী। অর্থাৎ কত দ্রুতগতিতে এই ব্যাপন হবে তাই নির্ধারণ করবে ব্যাটারীর প্রবাহ ঘনত্ব। তড়িদ্দ্বারের একক ক্ষেত্রফল-বিশিষ্ট

জায়গা থেকে যে পরিমাণ প্রবাহ পাওয়া যায় তাকেই বলা হবে প্রবাহ-ঘনত্ব। প্রবাহ-ঘনত্বের পরিমাণের মাত্রাভেদে ব্যাটারীর ব্যবহারও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়। যেমন পেস্‌মেকার যন্ত্রের জন্যে সাধারণত যে সলিড-স্টেট ব্যাটারীর ব্যবহার হয়ে থাকে তাদের প্রবাহ-ঘনত্ব মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার/বর্গসে মি. মানের হওয়া প্রয়োজন। আবার গাড়ী চালাবার জন্যে অধিক প্রবাহ-ঘনত্ববিশিষ্ট (0·1 অ্যাম্পিয়ার/বর্গ সে.মি.) ব্যাটারীর ব্যবহার হয়।

কঠিন তড়িৎ-বিশ্লেষক হিসেবে ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত পদার্থের নির্বাচন একটা সমস্যা, কেননা স্বল্পসংখ্যক কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়ে আয়নের অবাধে দ্রুত বিচরণ বা ব্যাপন ঘটে। কঠিন তড়িৎ-বিশ্লেষক পদার্থের এই বিশেষ ধর্মটির নাম সুপার আয়ন পরিবাহিতা। সাধারণ তড়িৎ পরিবাহী ও সুপার আয়ন পরিবাহীর মধ্যে তফাৎ হল এই যে—প্রথমটির বেলায় মুক্ত ইলেকট্রনের প্রাচুর্য বস্তুটির পরিবাহিতার জন্যে দায়ী কিন্তু দ্বিতীয়টির পরিবাহিতার জন্যে দায়ী দ্রুত গতিশীল আয়ন। আমরা যে ব্যাটারীর কথা বললাম এর সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই সিলভার আয়োডাইডের মধ্য দিয়ে সিলভার আয়ন দ্রুত গমন করতে পারে।

এবার আমরা খুব বেশি ব্যবহৃত সোডিয়াম-সালফার সলিড স্টেট ব্যাটারীর কথা একটু আলোচনা করছি। এর ক্ষেত্রে অ্যানোড ও ক্যাথোড যথাক্রমে তরল সোডিয়াম ও তরল সালফার এবং তড়িৎ-বিশ্লেষক রূপে নেওয়া হয় কঠিন সিরামিক বিটা অ্যালুমিনা। সোডিয়াম আয়ন ভীষণ দ্রুতগতিতে সিরামিক বিটা-অ্যালুমিনার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয় এবং বহির্বর্তনী সংযুক্ত হলেই সোডিয়াম আয়ন সালফারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম সালফাইড গঠন করে। কোষকে পুনঃআহিত করলে ক্যাথোডে সঞ্চিত সোডিয়াম সালফাইড বিশ্লিষ্ট হয় এবং ব্যাটারী আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এই ব্যাটারীর তড়িচ্চালক বল 2 ভোল্ট এবং শক্তি ঘনত্বের মান 250 থেকে 300 ওয়াট ঘণ্টা/কিলোগ্রাম, যা সাধারণ স্টোরেজ ব্যাটারী বা অ্যাকিউমিউলেটরের তুলনায় দশগুণেরও বেশি। একই কারণে সোডিয়াম-সালফার ব্যাটারীর আকার লেড-অ্যাসিড ব্যাটারীর এক-দশমাংশেরও কম। আমেরিকার ফোর্ড মোটর কোম্পানী 1967 সালে এর কার্যপদ্ধতি প্রথম প্রদর্শন করে কিন্তু লণ্ডনের বিদ্যুত পর্ষদই প্রথম এর ব্যবহার করে। সোডিয়াম ও সালফার, দুটিরই অভাব না থাকায় এই ব্যাটারী প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে আজকাল, তবে এর প্রধান অসুবিধা এই যে 300°C-এর নিচে ব্যাটারী কাজ করতে পারে না। সেই জন্যে এর রক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থারও অবলম্বন করতে হয়।

আজকাল সারা পৃথিবী জুড়েই উন্নততর ব্যাটারী নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে। সৌরশক্তির সংগ্রহ ও ব্যবহার নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা সুরু হবার পর থেকেই আমেরিকা, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি কতগুলি রাষ্ট্র চেষ্টা করছে সূর্যের তাপ সরাসরি কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী ব্যাটারী নির্মাণের জন্য। সম্প্রতি এই ধরণের কিছু প্রকল্প আমাদের দেশের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ হাতে নিয়েছে।

পুরুষোত্তম চক্রবর্তী*

* সাহা ইন্‌স্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

সমুদ্রে মাছ-ধরা

সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা জাতের কত মাছ। এদের বলা হয় সামুদ্রিক মাছ। মিষ্টি জলের মাছ আমাদের খুব প্রিয় হলেও সামুদ্রিক মাছের কদরও কম নয়। প্রায় সব দেশের মানুষই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে মাছ। মাছে আছে যথেষ্ট খাদ্যগুণ যা আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই প্রাচীন কাল থেকেই মাছ ধরতে মানুষ তৎপর। বর্তমানে মাছের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু শিল্প। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাছ ধরার ক্রমোন্নতির দিকে।

বিশেষ ধরণের ট্রলারই বর্তমানে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন জাতের সামুদ্রিক মাছকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—(i) পেলাজিক (Pelagic) ও (ii) ডেমার্স্যাল (Demarsal)। এই দুই শ্রেণীর মাছের গতিবিধি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে এদের ধরার পদ্ধতি এবং ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যান ও জাল আকৃতিগত ও গুণগত বিষয়ে পৃথক।

(i) পেলাজিক—হেরিং, ম্যাকারেল প্রভৃতি এই শ্রেণীর মাছ। এরা গভীর সমুদ্রের মাছ। দিনে ঐ মাছগুলি থাকে সমুদ্রের তলদেশে, কিন্তু রাত্রে আসে জলের উপরিভাগে। মানুষের খাদ্য হিসাবে যে সকল সামুদ্রিক মাছ গৃহীত হয় তাদের মধ্যে হেরিং-এর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এক একটি দলে প্রায় 300 কোটি হেরিংও থাকতে দেখা গেছে। এরা সন্ধ্যার পর সমুদ্রের জলের এত উপরে উঠে আসে যে বহু দূর থেকেই তাদের দেখা যায়। আবার হেরিং-এর লোভে তিমির দল 10/15 কিলোমিটার দূরে ঘোরাফেরা করে।

এদের ধরার জন্যে ব্যবহৃত হয় হাল্কা ও যন্ত্রচালিত ট্রলার। অনেকগুলি ট্রলার একই সঙ্গে চলে যায় মাঝসমুদ্রে। ট্রলারগুলিতে থাকে বহু ধরণের জাল ও যন্ত্রপাতি। এরপর হেরিং-এর ঝাঁক দেখা গেলেই 3 কিলোমিটার বা আরও বেশি লম্বা 'ড্রিফ্‌ট' জালের দ্বারা মাছের দলকে ঘিরে ফেলে সন্তর্পণে পুরো ঝাঁকটিকেই ধরে ফেলা হয়।

পেলাজিক শ্রেণীর অপর বিশিষ্ট মাছ ম্যাকারেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাকারেল ও মেনহ্যাডেন মাছ ধরা হয় 'পার্সসীন' (Purse Seine) জালের দ্বারা। এই জন্যে ব্যবহৃত বিশেষ জাহাজকে বলে 'ম্যাকারেল জাহাজ'। ঐ জাহাজের সঙ্গে থাকে বহু ট্রলার। ম্যাকারেল মাছ ধরার সময় মাছের ঝাঁক ঘেরার পর যন্ত্রের দ্বারা জাল গোটান হয়।

(ii) ডেমার্স্যাল—কড্, হ্যাডক, হ্যালিবাট প্রভৃতি এই শ্রেণীর মাছ। এরা সমুদ্রের গভীর অংশে বাস করে। কিন্তু হেরিং-এর মত এরা জলের উপরের স্তরে আসে না।

উত্তর আমেরিকার পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রচুর কড্ মাছ ধরা হয়। ঐ মাছ পূর্বে 'ডরি' (Dsry) পদ্ধতিতে ধরা হত। একে দীর্ঘরেখ (Longline) পদ্ধতিও বলে।

এই পদ্ধতিতে খুব লম্বা একটি মজবুত দড়ি বা তারে অনেক বড়শি ঝুলিয়ে সমুদ্রে ফেলে রাখা হত। ঐ বড়শিতে থাকত মাছের খাদ্য। বর্তমানেও অনেক স্থানে ঐ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তবে সমুদ্রের যে স্থানে তলদেশ সমান সেখানে বর্তমানে ম্যানিলা শণের দ্বারা প্রস্তুত মজবুত ট্রল জাল ব্যবহার করা হয়। এইগুলি প্রায় 50 মিটার দীর্ঘ ও শঙ্কু আকারের হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ঐ জালগুলিকে ঘণ্টায় 3 থেকে 5 কিলোমিটার বেগে টানা হয়। এই পদ্ধতিতেই মার্কিন দেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে পৃথিবীর 50% হ্যালিবাট ধরা হয়।

এইসব পদ্ধতি ছাড়াও সাধারণতঃ ডুবোজাহাজ বা বয়ার 'সিনিং জাল' (Seining Net) বেঁধেও মাছ ধরা হয়। তরোয়াল মাছের (Sword fish) ন্যায় বড় মাছকে আবার সরাসরি হার্পুন জাতীয় অস্ত্র ছুঁড়ে শিকার করা হয়। বর্তমানে 'লোরান' (Loran) নামক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জলের তলায় সন্ধান করে মাছ ধরা হচ্ছে যা মাছ ধরার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। এছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে জানা যাচ্ছে সমুদ্রের কোথায় বড় বড় মাছের ঝাঁক ঘোরাফেরা করছে।

ভারতে 5,100 কিলোমিটারের বিরাট একটি তটভূমি থাকলেও, ভারত সামুদ্রিক মাছ ধরাতে অনেক পিছিয়ে আছে। ভারতের 259,000 বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত মহীসোপান বহু বোনি মাছ (Boneyfish), তরোয়াল মাছ, সেইল মাছের বিরাট উৎস।

1976 সালে লোকসভায় একটি প্রস্তাব পাশ হয় যে, ভারতীয় উপকূলের 200 মাইল জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হবে। ঐ প্রস্তাব কার্যকরী হলে ভারতের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার প্রসারের সম্ভাবনা বেশ বেড়ে যাবে।

ভারতের সামুদ্রিক মাছের ব্যবসার ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ, যদিও বর্তমানে অতি অল্প পরিমাণেই সামুদ্রিক মাছ ধরা হচ্ছে। পশ্চিম উপকূলে যেখানে 60,10,000 টন মাছ ধরা যেতে পারে সেখানে ধরা হয় মাত্র 18,60,000 টন মাছ। অপর দিকে পূর্ব উপকূলেও 32,21,000 টন মাছ ধরা যেতে পারে। এই সব সমুদ্র অঞ্চলে অবস্থিত মাছের বৈচিত্র্যও কম নয়। এখানে সার্ডিন, অ্যাঙ্কোভিজ, ম্যাকারেল, বোম্বে ডাক, রিবন মাছ, ইহুদী মাছ, পমফ্রেট, টুনা, ভারতীয় স্যামন, শোল প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের মাছ দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বিষয়টি ভারতে একেবারেই অবহেলিত ছিল। সর্বপ্রথম নরওয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ভারত গভীর সমুদ্রের মাছ ধরার ক্ষেত্রে অভিযান করে। তাঁদের সহায়তায় ভারতে জেলেদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে যন্ত্রযুক্ত বোট ও গীয়ারের ব্যবহার শেখানো হচ্ছে। এই ইন্দো-নরওয়ে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কেরলের ক্যুইলনে অবস্থিত।

ভারতের গভীর সমুদ্র টুনা মাছে সমৃদ্ধ। এফ. এ. ও (Food and Agricultural Organisation)-র মতানুসারে প্রতি বছরই 25,000 টন করে টুনা মাছ ধরা যেতে পারে। ফলে বিশ্বে টুনা মাছের বাজারে ভারত সহজেই স্থান করে নিতে পারবে। এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও এখনমাত্র ভারতের সমুদ্রে মাত্র 35% মাছ ধরা হয়।

দীপঙ্কর খাঁ*

*10, গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 003

প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

ভাবতে অবাক লাগে, প্রায় চার হাজার বছর আগে রচিত ঋগ্বেদে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তাবৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এই নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সারা বিশ্ব জুড়ে 'নিয়মের রাজত্ব', যাবতীয় ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই যে অন্যতম মূল কথা, এ বিষয়ে একটি সহজাত সচেতনতা গড়ে উঠেছিল বৈদিক যুগের ভারতীয়ের মনে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাতেও অনুরূপ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তা ঋগ্বেদের বেশ কয়েক শতাব্দী পরের কথা।

বস্তুতঃ বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরস্পরের পরিপূরক বলা চলে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যেমন মানুষকে বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি আবার বিজ্ঞানের অনুশীলন থেকে অর্জিত জ্ঞান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিপুষ্ট করে। প্রাচীন ভারতে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যে ব্যাপক চর্চা হয়, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তদানীন্তন সমাজে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার যথেষ্ট উন্মেষ হয়েছিল।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে যাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে হচ্ছে, তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য খুঁজে বের করবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম লক্ষণ। ঋগ্বেদ এবং উপনিষদে যে পঞ্চভূতের ধারণা, তাতে এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই মতবাদে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর উপাদান হিসেবে পঞ্চভূত নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অনুমান করা হয়েছে এদের নানারকম সমন্বয়ের ফলে নানারকম বস্তুর উদ্ভব। এই পঞ্চভূত হল : ক্ষিতি বা পৃথ্বী অর্থাৎ মাটি, অপ্ অর্থাৎ জল, তেজ অর্থাৎ অগ্নি, মরুৎ বা বায়ু এবং ব্যোম বা আকাশ। এই পঞ্চভূতের ধারণা ভারতীয় চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, মানুষের দেহকে খুব সঠিক ভাবেই অলৌকিক কিছু না ভেবে প্রাকৃতিক একটি বস্তু হিসেবে ভাবা হয়েছিল, ভাবা হয়েছিল পঞ্চভূতের সমন্বয়েই এর গঠন। একেবারে ভ্রূণ অবস্থা থেকে সুরু করে মনুষ্যদেহের গঠনে পঞ্চভূতের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে সুশ্রুত সংহিতায়। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোতে পঞ্চভূত সম্পর্কিত অনেক অনুমান ত্রুটিপূর্ণ সন্দেহ নেই কিন্তু প্রাচীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চভূতের ধারণা ছিল প্রগতির পথে একটি বিরাট পদক্ষেপ।

ভারতীয় চিন্তাধারায় পরমাণুবাদের প্রকাশকেও অনুরূপ একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা চলে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী কালের ন্যায়-বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বস্তুর অন্তিম কণা রূপে পরমাণু সম্বন্ধে ধারণা কেবলমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়েছিল। যুক্তির উপর এই নির্ভরতা বৈজ্ঞানিক মানসিকতারই পরিচায়ক।

কোন সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা, তার মধ্যে কার্যকরণ সম্বন্ধ খুঁজে বের করা এবং তাই থেকে সমাধানের পথের সন্ধান পাওয়া ও সেই পথে এগনো—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই যে ধারা, এর পরিচয়

পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যায়। আদিম যুগে শারীরিক রোগকে মনে করা হত কৃত পাপের জন্যে দেবতার রোষ অথবা দেহে ভূতপ্রেত ভর করবার ফল এবং রোগ সারাবার জন্যে যাগযজ্ঞ, বলিদান, যাদুবিদ্যার প্রয়োগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হত। বৈদিক সাহিত্যে এই ধরণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার রয়েছে জীববিদ্যা ও শারীরবিদ্যার আলোচনা, রোগের সঠিক কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা এবং রোগের যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার কথা। বিশেষতঃ ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। বেদের পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদে ঔষধি বা অস্ত্রোপচার দ্বারা রোগ নিরাময় ব্যবস্থার সঙ্গে রোগ নিবারণের বিভিন্ন পদ্ধতিও উল্লেখিত হয়েছে। রোগ নিবারণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া স্বাস্থ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে যা আলোচনা করা হল, তার পাশে অনেক অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বোঝা যে ছিল না, তা নয়। তবে অতি উন্নত আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও কি মানুষ সেই বোঝা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যাপক হওয়ায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও আগেকার তুলনায় সমাজে অবশ্যই বিস্তৃততর হয়েছে, কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার উপর নির্ভর করে না, অনেকাংশেই নির্ভর করে তদানীন্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর। তা না হলে হিটলার কি পারতেন বিজ্ঞানে উন্নত জার্মানীকে নাৎসীবাদের পথে পরিচালিত করতে?

আমরা অনেক সময় বলে থাকি, বিজ্ঞান মানুষের পক্ষে কল্যাণকর—তার অপপ্রয়োগগুলি ঘটে মানুষের অশুভ বুদ্ধির জন্যে। একই রকম যুক্তিতে তো বলা যেতে পারে, বিজ্ঞান মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর—তার সুপ্রয়োগগুলি ঘটে মানুষের শুভ বুদ্ধির জন্যে। আসলে বিজ্ঞান মানুষকে কেবল অনেকগুলি শক্তিশালী হাতিয়ার দেয়—মানুষ সেগুলিকে তথাকথিত 'ভাল' বা 'খারাপ' কাজে লাগায় তার মনোবৃত্তি অনুযায়ী। এই মনোবৃত্তি মূলতঃ সামাজিক পরিবেশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বিজ্ঞানের চর্চা বেশ কিছুটা বেড়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও আংশিক বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু ভারতবাসীর মনোবৃত্তির উন্নতির চেয়ে অবনতির চিহ্নই কি বেশি চোখে পড়ে না? অপরপক্ষে, বৈদিক যুগে ভারতীয়ের মনে সাধারণ ভাবে একটা ঔদার্য ছিল, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর নৈর্ব্যক্তিক ভাবটির সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ করা উচিত যে, তত্ত্ব গড়ে তোলা বা যাচাই করবার জন্যে আধুনিক বিজ্ঞানে পরীক্ষা, বিশেষতঃ সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানে তার অভাব ছিল। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতেও সব কিছুকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়ার প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট প্রবল ছিল না। তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বৈদিক সভ্যতার সময় থেকে সুরু করে একেবারে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে যেমন প্রসার লাভ করেছিল, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই ঠিক তেমনটি আর ঘটে নি।

জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

ভেবে কর

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর—

1. সম্প্রতি 'পরীক্ষা-নল-শিশু'র (Test-tube baby) জন্মদান সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী তিনি হলেন ·
   (a) ডাঃ প্যাটরিক স্টেপটো। (b) ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড (c) ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানা।

2. 'পালসার' (Pulsar হল—
   (a) চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হৃদকম্পন মাপবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ।
   (b) পর্যায়ক্রমে ঘন ঘন বেতার-তরঙ্গ বিকিরণকারী একটি নক্ষত্র।
   (c এ দুটির কোনটাই নয়।

3. লেড পেনসিল তৈরি করতে যে রসায়নিক পদার্থটি ব্যবহৃত হয় তার নাম—
   (a) লেড কার্বনেট, (b) গ্রাফাইট, (c) লেড কার্বাইড।

4. একটি ঢিলকে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে কত ডিগ্রী কোণ করে ছুঁড়লে ওটা সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠবে ?
   (a) 90° (b) 60° (c) 45°।

5. কোন্ ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয় ?
   (a) ভিটামিন-বি, (b) ভিটামিন-ডি, (c) ভিটামিন-সি।

6. একটি বেলুনকে বায়ুপূর্ণ করে ওজন করা হল।
   (a) পরের ওজন পূর্বাপেক্ষা কম হবে।
   (b) পরের ওজন পূর্বাপেক্ষা বেশি হবে।
   (c) এ দুটি ওজন পরস্পর সমান হবে।

7. সিঁদুরের লাল রঙ যে রাসায়নিক পদার্থের জন্যে হয় তা হল—
   (a) মারকিউরিক সালফাইড, (b) রেড লেড, (c) মারকিউরিক অক্সাইড।

8. এক গ্লাস ভর্তি চিনির দ্রবণ নেওয়া হল। ঐ দ্রবনে আট গ্রাম চিনি আছে। ঐ দ্রবণের অর্ধেক ফেলে দিয়ে জল ঢেলে নেড়ে দেওয়া হল। ঐ একই প্রক্রিয়া কতবার সম্পাদন করলে দ্রবণে অবশিষ্ট চিনির পরিমাণ 500 মিলিগ্রাম হবে ?
   (a) আটবার, (b) চার বার (c) ষোলবার।

9. সূর্যের কোন্ অংশে তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা বেশি ?
   (a) অভ্যন্তরে (Photosphere), (b) বাইরের অংশে (Corona), (c) মাঝামাঝি জায়গায় (Chromosphere)।

10. শূন্যস্থানে সঠিক সংখ্যা বসাও। সংখ্যাগুলি সাজাবার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।

$7, \frac{13}{2}, ---, \frac{31}{4}, \frac{43}{5}$

(a) $\frac{20}{3}$ (b) 6 (c) 7

11. দুধে জল আছে কিনা জানবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়—

(a) হাইড্রোমিটার (b) ল্যাকটোমিটার (c) সিসমোমিটার

12. 'শুষ্ক বরফ' (Dry ice) হল

(a) বরফকে 0°C উষ্ণতায় রাখলে জলহীন বরফের অবস্থা।

(b) কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অন্য নাম।

(c) কঠিন কার্বন-মনোক্সাইডের অপর নাম।

13. একটি লোক একটি লিফটে করে উঠছে। হঠাৎ লিফটের দাড় ছিঁড়ে গেলে লোকটি—

(a) নিজেকে একেবারে ওজনশূন্য মনে করবে।

(b) নিজেকে কিছুটা হাল্কা মনে করবে।

(c) নিজেকে ভারী মনে করবে।

14. $\log_e^x = m$ এবং $\log_{10}^x = n$ হলে,

(a) $m > n$ (b) $m < n$ (c) $m = n$

15 'জীবাশ্ম' শব্দটি বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যবহৃত হয় তা হল—

(a) পদার্থবিদ্যা, (b) রসায়নশাস্ত্র, (c) ভূবিদ্যা

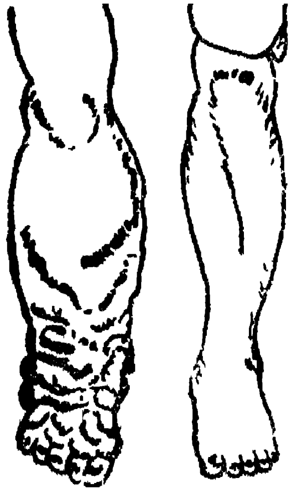
(উত্তর 482 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তুষারকান্তি দাস*

*ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্লীপদ

শ্লীপদ বা ফাইলেরিয়া একটি সংক্রামক রোগ। সাধারণভাবে একে গোদ বলে। এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর জ্বরের সঙ্গে কুঁচকিতে, বা অনেক সময় বগলে তীব্র বেদনাযুক্ত শোথ হয়। ক্রমে ক্রমে এই শোথ স্ফীত হাতে এবং পায়ে দেখা দেয়। একেই সংক্ষেপে শ্লীপদ বলে। হাত এবং পা ছাড়াও নাকে, কানে, চোখে এবং জনন-অঙ্গের বিভিন্ন অংশে শ্লীপদ রোগ দেখা যায়। হাত বিশেষ করে পা অনেক সময় অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হয়। ফলে আক্রান্ত অঙ্গের প্রচণ্ড ক্ষতিকর বিকৃতি ঘটে। পা মোটা হয়ে হাতীর পায়ের মত খসখসে রুক্ষ, কালো ও তীব্র বেদনাযুক্ত হয় অথবা উঁইঢিবির মত দেখতে হয়। শ্লীপদে আক্রান্ত দেহের কোন অংশ যখন প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তীব্র বেদনাসহ শক্ত টিউমারে পরিণত হয় তখন এ ধরণের শ্লীপদকে এ্যালিফ্যানটাইসিস্ (Elephantiasis) বলে। এরকমের শ্লীপদ দীর্ঘদিনব্যাপী সংক্রমণের ফলেই ঘটে থাকে। তবে সংক্রমণে এ ধরনের পরিণতি নাও ঘটতে পারে। শ্লীপদে আক্রান্ত রোগীর মাঝে মাঝে 103°F থেকে 104°F ডিগ্রি জ্বর হয়। চার পাঁচ দিন পর প্রচুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। এই রোগ বর্তমানে ভারতবর্ষে এক ভয়াবহ আকার দেখা দিয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতবর্ষের প্রায় দেড় কোটি লোক শ্লীপদে আক্রান্ত। সাধারনতঃ পুরুষের মধ্যেই শ্লীপদ রোগ বেশী দেখা যায় (চিত্র-1 চিত্র-2)।



চিত্র-1—গোদে আক্রান্ত লোকের পা



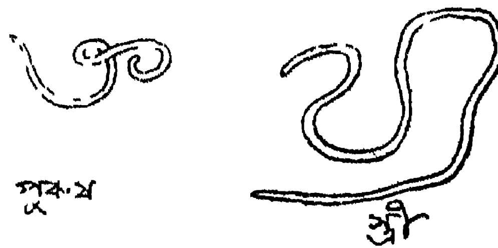
চিত্র-2—গোদে আক্রান্ত লোকের হাত

মানুষের শ্লীপদ উৎপাদনকারী পরজীবী প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম উকেরিয়া বনক্রফটি (Wuchereria bancrofti) বা ফাইলেরিয়া বনক্রফটি (Filaria bancrofti)। ফাইলেরিয়া

নিমাথেলমিনথিস (Nemathelminthes) বা গোলকৃমি (Round-worm) পর্বের নিমাটোডা (Nematoda) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। ফাইলেরিয়ার দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার জন্যে এই রোগের বৈজ্ঞানিক নাম ফাইলেরিয়াসিস (Filariasis)। পরিণত বা পূর্ণাঙ্গ ফাইলেরিয়া, লসিকা নালী সমূহে ও লসিকা-পর্বে এবং ভ্রূণ বা লার্ভা মানুষের রক্তে অন্তঃপরজীবী রূপে বাস করে।

1863 খৃষ্টাব্দে ডেমারকোয়ে (Demarquay), ফাইলেরিয়ার আক্রান্ত রোগীর হাইড্রোসিলে (Hydrocoel) প্রথম ফাইলেরিয়ার লার্ভা আবিষ্কার করেন। 1866 সালে উকের (Wucherer) এবং 1872 খৃষ্টাব্দে লুইস (Lewis) মানুষের রক্তে ফাইলেরিয়া দেখতে পান। বনক্রফট প্রথম পূর্ণাঙ্গ ফাইলেরিয়া আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারকের নামে ফাইলেরিয়ার নামকরণ হয়।

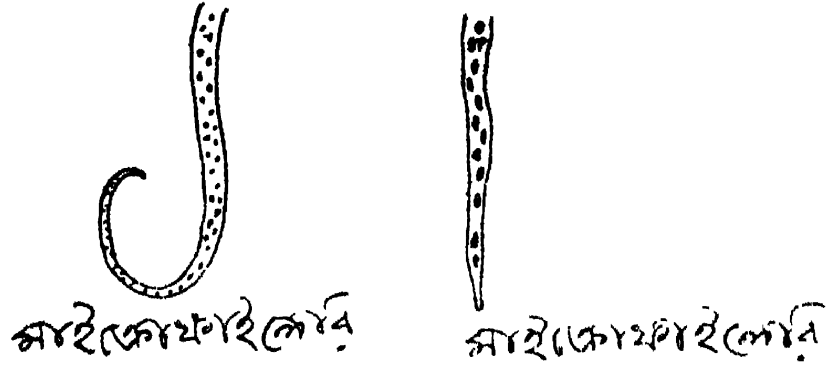
ভারতবর্ষ, দক্ষিণ চীন, জাপান, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, উকেরিয়া বনক্রফটির স্বাভাবিক বাসভূমী বলে পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষের সমুদ্র ও বড় বড় নদীর উভয় তীর ছাড়াও রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লীতে এদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। মানুষের দেহে উকেরিয়া বনক্রফটিকে দুটি আকৃতি বা দশায় দেখা যায়। একটি পরিণত বা পূর্ণাঙ্গ আকৃতিতে এবং অপরটি লার্ভা রূপে। উকেরিয়া বনক্রফটির লার্ভাকে মাইক্রোফাইলেরিয়া (Microfilaria) বলে। পূর্ণাঙ্গ ফাইলেরিয়া শুধুমাত্র মানুষের লসিকানালী এবং লসিকাপর্বেই বাস করে। মাইক্রোফাইলেরিয়া মানুষের রক্তে পাওয়া যায় (চিত্র-3)।



চিত্র-3—ইউচেরেরিয়া বনক্রফ্টির পরিণত দশা

পূর্ণাঙ্গ ফাইলেরিয়া, সরু চুলের মত, স্বচ্ছ, কখনও কখনও সাদাটে, লম্বা বেলনাকারে হয়। মাথার দিকে সামান্য স্ফীত হওয়ায় কিছুটা গোলাকৃতি দেখায় এবং লেজের দিক সুচালো হয়। ফাইলেরিয়া একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ ফাইলেরিয়া 2·5 থেকে 4 সেন্টিমিটার লম্বা এবং প্রায় 0·1 সেন্টিমিটার মোটা হয়। পুরুষ ফাইলেরিয়ার লেজের অংশ অঙ্কীয় দিকে কিছুটা বাঁকানো থাকে এবং বাঁকানো লেজের অংশে দুটি অসমান জনন-অঙ্গ থাকে। স্ত্রী-ফাইলেরিয়া, পুরুষ ফাইলেরিয়া থেকে আকারে বড় হয়। স্ত্রী-ফাইলেরিয়ার লেজের অংশ সোজা সরু এবং হঠাৎ সুচালো হয়ে শেষ হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী-ফাইলেরিয়া লসিকানালী এবং গ্রন্থির ভিতর এমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে যে সহজে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। স্ত্রী-

ফাইলেরিয়া থেকে পুরুষ-ফাইলেরিয়া সংখ্যায় খুব কম থাকে বলে পুরুষ ফাইলেরিয়াকে সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। পূর্ণাঙ্গ ফাইলেরিয়া পাঁচ থেকে দশ বছর সাধারণভাবে বেঁচে থাকে (চিত্র-4)।

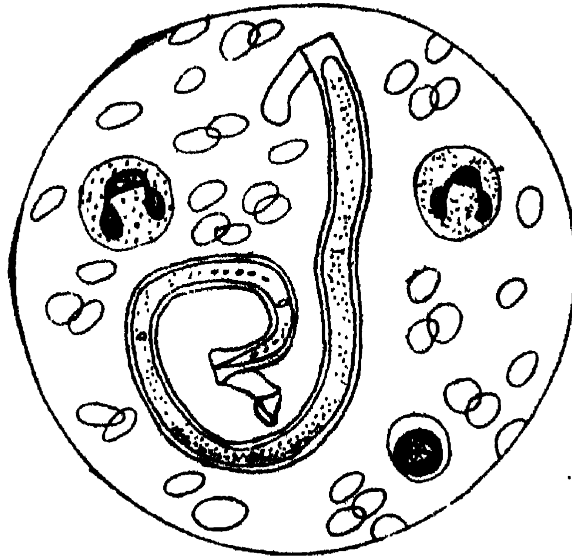


চিত্র-4- মানুষের দেহে পাওয়া মাইক্রোফাইলেরিয়া লেজ অংশ

মাইক্রোফাইলেরিয়া আকারে খুবই ছোট দীর্ঘায়ত বেলনাকার অনেকটা সাপের মত আকৃতি হয়। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। জীবিত অবস্থায় মাইক্রোফাইলেরিয়া স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। মাইক্রোফাইলেরিয়ার সামনের দিকে গোলাকৃতি মাথা, পিছনের দিকে সরু চালো লেজ থাকে। মাথা ও লেজের মধ্যবর্তী অংশকে দেহকাণ্ড বলে। জীবিত মাইক্রোফাইলেরিয়া খুবই কর্মঠ এবং রক্তস্রোতের পক্ষে ও বিপক্ষে চলাচল করতে পারে। মাইক্রোফাইলেরিয়া একটি স্বচ্ছ ঝিল্লীর আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। আবরণটি প্রাণীর থেকে কিছুটা বড় হয় যার ফলে লার্ভা আবরণের ভিতর, সামনে ও পিছনের দিকে যাতায়াত করতে পারে। মাইক্রোফাইলেরিয়ার মাথার এবং লেজের অংশ ছাড়া দেহ কাণ্ডের প্রায় সর্বত্রই কতগুলি দানাদার বস্তু দেখা যায়। মাইক্রোফাইলেরিয়ার মাথার সামনে একটি খুব সরু কাঁটা থাকে। কাঁটাটি প্রয়োজনে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করতে পারে। মাইক্রোফাইলেরিয়া রক্তের সঙ্গে যখন মশার পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সেই সময় এই কাঁটা দিয়ে ঝিল্লীর আবরণটিকে ছিন্ন করে আবরণের বাইরে বেরিয়ে আসে (চিত্র-5)।

সংক্রামিত মানুষের সংবাহিত রক্তে প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোফাইলেরিয়া দেখা যায়। ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর প্রতিফোটা রক্তে পাঁচ-শ' থেকে ছ-শ' মাইক্রোফাইলেরিয়া পাওয়া যায়। মাইক্রোফাইলেরিয়া মানুষের শরীরে কোন রোগ সৃষ্টি করে না। সাধারণভাবে আমাদের দেশে ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর প্রান্তীয় সংবহনতন্ত্রে দিনের বেলা মাইক্রোফাইলেরিয়া থাকে না। বিকেল বেলা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মাইক্রোফাইলেরিয়া, প্রান্তীয় রক্ত সংবহনতন্ত্রে পাওয়া যায়। রাত্রি দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায়। সেজন্যে আক্রান্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করার জন্যে রাত্রি বেলা রক্ত নেওয়া হয়। রাত্রি দুটোর পর থেকে রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া কমতে সুরু করে এবং সকাল বেলা একেবারে কমে যায়। এটা প্রায় সবারই জানা আছে যে ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত রোগী দিনের বেলা ঘুমায় এবং রাত্রিবেলা জেগে থাকে। ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়ার এই ধরণের ফাইলেরিয়া দেখা যায়।

অপরপক্ষে ফিলিপাইনস্, ফিজি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ফাইলেরিয়ার এ ধরনের পর্যাবৃত্তি (Periodicity) দেখা যায় না। রাত্রিবেলা বেশি পরিমাণে প্রান্তীয় সংবহনতন্ত্রে মাইক্রোফাইলেরিয়া থাকার জন্যে, ফাইলেরিয়া গৌণ পোষক স্ত্রী কিউলেক্স মশার পক্ষে খুবই উপকার হয়। কারণ স্ত্রী



চিত্র-5—মাইক্রোফাইলারিয়া বনক্রফ্টির দেহ (রক্ত কোষগুলির মধ্যে)

কিউলেক্স মশা রাত্রিতে মানুষের রক্ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণের সময় মাইক্রোফাইলেরিয়া ও রক্তের সঙ্গে পান করে। মাইক্রোফাইলেরিয়া সত্তর দিন পর্যন্ত মানুষের দেহে বেঁচে থাকে।

উখেরিয়া বনক্রফটির জীবন চক্র (Life cycle) পূর্ণ করবার জন্যে একটি মুখ্য পোষক মানুষ এবং অপরটি গৌণ পোষক স্ত্রী কিউলেক্স মশার প্রয়োজন হয়। সংক্রামিত মানুষের লসিকাতন্ত্রে পূর্ণাঙ্গ উখেরিয়া বনক্রফটি বসবাস করে। গর্ভিনী স্ত্রী ফাইলেরিয়া, মাইক্রোফাইলেরিয়া লসিকাতন্ত্রে প্রসব করে। লসিকাতন্ত্র থেকে মাইক্রোফাইলেরিয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। যদি স্ত্রী কিউলেক্স মশা, রক্তের সঙ্গে মাইক্রোফাইলেরিয়া চোষণ (Suck) না করে তবে রক্তের ভিতরই মাইক্রোফাইলেরিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

আমাদের দেশে ফাইলেরিয়ার গৌণ পোষক স্ত্রী কিউলেক্স মশা। কিন্তু কোন কোন দেশে এডিস এবং অ্যানোফিলিস মশাও গৌণ পোষকের কাজ করে। রাত্রি বেলা স্ত্রী কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে রক্ত চোষণ করার সময়, মাইক্রোফাইলেরিয়া রক্তের সাথে মশার পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। মশার পাকস্থলীতে, মাইক্রোফাইলেরিয়া ঝিল্লী দিয়ে আবরিত আবরণ থেকে বেরিয়ে আসে এবং কয়েকঘণ্টার মধ্যে পৌষ্টিক নালীর দেয়াল ভেদ করে মশার বক্ষপেশীতে উপস্থিত হয়। এখানে মাইক্রোফাইলেরিয়া পর পর তিনবার দেহের রূপান্তর ঘটায় এবং দশ থেকে এগার দিনের মধ্যে দেহগহ্বর, পৌষ্টিকনালী এবং জননতন্ত্র গঠিত হয়। এই অবস্থায় মাইক্রোফাইলেরিয়া সংক্রমণের উপযুক্ত হয়। সংক্রমণের উপযুক্ত মাইক্রোফাইলেরিয়াকে তৃতীয় পর্যায়ের লার্ভা বলে।

এই তৃতীয় পর্যায়ের লার্ভা মশার প্রোবোসিসে (probocis) প্রবেশ করে। একটি মাইক্রোফাইলেরিয়া একটি সংক্রমক লার্ভা উৎপন্ন করে। সংক্রামিত স্ত্রী-কিউলেক্স মশা যখন একজন সুস্থ মানুষকে কামড়ায় তখন রক্ত চোষণ করার সময় সংক্রমক লার্ভা সোজাসুজি রক্তস্রোতে মিশে যায় না। সংক্রমক লার্ভাগুলি ক্ষতস্থানে প্রথমে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে পরে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে বা মুখ্য পোষকের চামড়া ভেদ করে, ইনগুইনাল (Inguinal) অণ্ডকোষীয় (Scrotal) এবং ঔদরিক (Abdominal) অঞ্চলের লসিকানালীতে স্থায়ীভাবে বাস করে। সম্ভবতঃ পাঁচ থেকে আঠার মাস পরে ফাইলেরিয়া যৌনত্ব-প্রাপ্ত হয়। পুরুষ ও স্ত্রী ফাইলেরিয়া মিলনের ফলে, স্ত্রী ফাইলেরিয়া গর্ভবতী হয়। গর্ভিণী ফাইলেরিয়া অসংখ্য মাইক্রোফাইলেরিয়া প্রসব করে। এই মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি, বামারসকুল্যা (Thoracicduct) অথবা বাম লসিকানালী দিয়ে শিরাতন্ত্রে এবং শিরাতন্ত্র থেকে ফুসফুসীয় জালিকায় প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় জালিকাতন্ত্র থেকে মাইক্রোফাইলেরিয়া প্রান্তীয় রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। এভাবে ফাইলেরিয়ার জীবন-চক্র সম্পন্ন হয়।

জীবিত ফাইলেরিয়া প্রত্যক্ষভাবে মানুষের দেহে কোন রোগ সৃষ্টি করে না, মৃত বা জীবিত ফাইলেরিয়া দ্বারা লসিকানালী সমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেই আক্রান্ত অঞ্চলের স্ফীতি, প্রদাহ ও বেদনার সৃষ্টি হয়। এছাড়া ফাইলেরিয়ার জৈবিক কার্যকলাপের ফলে যে বিষাক্ত বস্তুর সৃষ্টি হয় তাও যন্ত্রনাদায়ক অস্বস্তিকর প্রদাহের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরণের জীবাণুদ্বারা প্রদাহগুলি আক্রান্ত হয়ে, প্রচণ্ড ভাবে অঙ্গ-বিকৃতি ঘটায় এবং অপরাপর অনেক রকমের রোগ সৃষ্টি হয়। সংক্রমণের পনেরো থেকে বিশ বৎসর ব্যাপী ধীরে ধীরে এই অঙ্গ বিকৃতির প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শ্লীপদ রোগে আক্রান্ত রোগীর দেহে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ ফাইলেরিয়া পাওয়া যায় না। কারণ সম্ভবত প্রাপ্ত বয়স্ক ফাইলেরিয়া মরে যায় অথবা লসিকানালী এমনভাবে বন্ধ হয়ে যায় যে নতুন কোন ফাইলেরিয়া লসিকা সংবহনে প্রবেশ করতে পারে না। অনেক সময় মৃত ফাইলেরিয়া লসিকানালীর ভেতর চূণে (calcified) পরিণত হয়। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে ফাইলেরিয়া জনিত জ্বর চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। এর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানা যায় নি।

উকেরিয়া বনক্রফটির জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করে দেখা গেল যে, দুটি পোষকের মধ্যে সংক্রমণের ভাণ্ডার হচ্ছে মানুষ এর সংক্রমণের বাহক হল স্ত্রী কিউলেক্স মশা। তাই সংক্রমণের প্রতিরোধের জন্যে কিউলেক্স মশাকে, আক্রান্ত রোগী এবং সুস্থ মানুষ থেকে এমনভাবে পৃথক করতে হবে যাতে স্ত্রী কিউলেক্স মশা, সুস্থ এবং আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে আসতে না পারে। আক্রান্ত রোগীকে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মশারীর ভেতর রাখতে হবে যাতে মশা রোগীকে কামড়াতে না পারে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগীকে উপযুক্ত চিকিৎসক দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে রোগী সহজেই সুস্থ হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফাইলেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত রোগীকে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না করালে রোগীর আরোগ্যলাভ কঠিন হয়ে পড়ে। সংক্রমণের বাহক কিউলেক্স মশা, খানা, ডোবা, জলা জায়গায় থাকে এবং সেখানেই ডিম পেড়ে বংশ বৃদ্ধি করে। তাই কিউলেক্স মশাকে সমূলে ধ্বংস

করার জন্যে বাড়ীর আশে পাশে বদ্ধ জলাশয় ডোবা খানা ইত্যাদি এক্ষুণি বুজিয়ে ফেলা দরকার। এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের কীট-পতঙ্গ নাশক ঔষুধ যেমন, ডি, ডি, টি ম্যালারিওল (Malariol), ফুয়েল অয়েল ইত্যাদি প্রয়োগ করে জাতীয় স্তরে মশা মারার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে আমরা পৃথিবীর অপরাপর সভ্যদেশের মত শ্লীপদ রোগের কবল থেকে রক্ষা পাব।

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়*

*উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-700 004

শব্দকূট

নিচের প্রদত্ত ইঙ্গিত অনুযায়ী শব্দকূটটির সমাধান করতে হবে –

1				2	✕	3	
4			✕		✕	5	
6			✕	7	8		
✕	9					✕	10
11	✕	12			✕	✕	
13			✕	✕	14		
15	16		✕	17			✕
		✕	18				
✕	19			✕	20		
21					✕	22	

পাশাপাশি

1. চক্ষুর এক বিশেষ ক্ষমতা।
3. দুটি গোলীয় অথবা একটি গোলীয় ও একটি সমতল তলদ্বারা সীমাবদ্ধ কাচখণ্ড বিশেষ।
4. যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 1826 খৃষ্টাব্দে প্রবাহমাত্রা ও বিভব-প্রভেদের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত সূত্র প্রবর্তন করেন।

5. কোন তড়িৎ-বর্তনীতে গ্যালভ্যানোমিটার প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও সুবেদী যন্ত্রপাতিকে প্রবল তড়িৎ-প্রবাহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে যে 'বিকল্প পথ'-এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
6. অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ার জল ব্যতীত উৎপন্ন যৌগবিশেষ।
7. ঋণাত্মক আধানযুক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মি।
9. যে যন্ত্র ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখাতে সাহায্য করে।
12. সরল ভোল্টীয় কোষের একপ্রকার ত্রুটির নাম।
13. জাপানের রাজধানী।
14. ফ্লেমিং ভাল্‌ভের বর্তমান নাম।
15. এক সেকেণ্ডের 60 গুণ সময়।
17. এক প্রকার নিষ্ক্রিয় গ্যাস যার মধ্য দিয়ে নিম্নচাপে তড়িৎ-মোক্ষণ ঘটালে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সৃষ্টি হয়।
18. কোন গ্যাসের নিস্তড়িৎ অণুকে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করার প্রনালী।
19. এক্স রশ্মির অপর নাম।
20. একজন বিশিষ্ট প্রজনন বিজ্ঞানী যিনি 'স্পার্ম ব্যাংক' স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন।
21. অর্ধ-পরিবাহী ট্রায়োড (Triode)-এর অপর নাম।
22. লিমিট (Limit)-এর বাংলা নাম।

1 উ	প	যো	জ	2 ন	X	3 লে	ন্স
4 ও	হ	ম	X	ভো	X	5 সা	ন্ট
6 ল	ব	ণ	X	7 বী	8 টা	র	শ্মি
X	9 অ	ণু	বী	ক্ষ	ণ	X	10 ভো
11 ফ	X	12 [illegible]	দ	ন	X	X	ল্টা
13 টো	কি	ও	X	X	14 ডা	য়ো	ড
15 মি	16 নি	ট	X	17 নি	য়	ন	X
ত	উ	X	18 আ	য়	নী	ক	ণ
X	19 র	ঞ্জ	ন	X	20 মো	লা	র
21 ট্রা	ন	জি	স্টা	র	X	22 সী	মা

উপর থেকে নিচে

1. যে লেন্সের দুই মেরু ক্রমশঃ সরু হয়ে মাকুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

2. বহু দূরের বস্তু যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি স্পষ্টভাবে দেখবার নিমিত্ত ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ।
3. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation এই শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ (একশব্দে)।
8. টেনশনে (Tension)-এর বাংলা পরিভাষা,
10. ত্রি-তড়িৎ-দ্বার ভালভকে ইংরেজিতে যা বলা হয়।
11. আলোক রশ্মির পরিমাপ পদ্ধতির নাম।
14. যে যন্ত্রের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে পরিণত হয়।
16. স্নায়ুকোষের এককের নাম।

অনিলকুমার ঘাঁটা*

*নোতুক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, পোঃ—নোতুক, জেলা—মেদিনীপুর

ভেবে কর উত্তর

1 (a), 2 (b), 3 (b), 4 (c), 5 (a), 6 (c),
7 (a), 8 (b), 9 (a), 10 (c), 11 (b), 12 (b),
13(a), 14 (a), 15 (c).

আমাদের নিবেদন

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

—অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে সাম্প্রতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন কর্মসমিতি গঠিত হয়েছে, তার নির্বাচিত সদস্যদের, সকল সাধারণ সভ্যদের, ও পরিষদের সংশ্লিষ্ট নানা শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাই। সকলের মিলিত মর্মের ও কর্মের সার্থক সহযোগে, পরিষদ পূর্ণশ্রী হয়ে উঠুক—এই কামনা করি।

এ বৎসর, আচার্য আইনস্টাইনের জন্মশতবর্ষ। বিজ্ঞান ও মানবতার মোহানায়, যে কটি ঋষিকল্প মহাবিজ্ঞানীর নাম সভ্যতার ইতিহাসে পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত, আচার্য আইনস্টাইন তার অন্যতম শুধু নন, শীর্ষতম। বিজ্ঞানের চরম ও পরম লক্ষ্য যে মানবকল্যাণ, পৃথিবীর প্রতিটি শ্রমিক মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে উৎসারিত বিজ্ঞানের যে বসুধারা তাই যে বিজ্ঞানের চরম অন্বিষ্ট—একথা তিনি বারংবার বলে গেছেন। তাই বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে অতিক্রম করে—শান্তি-মৈত্রী-প্রগতির প্রবক্তা, মানবতাবাদী আইনস্টাইন, নক্ষত্রের মত আরো ভাস্বর।

নানা দুর্যোগে আজ গ্লানিক্লিষ্ট বাঙালীর জাতীয় জীবন। তবু এই গ্লানিক্লিষ্ট জীবনেও, আজও আমাদের পরম গৌরব—এমনি এক ঋষিকল্প বাঙালী বিজ্ঞানী, যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের তীর্থে, আইনস্টাইনেরই

সতীর্থ, তিনি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এ দুটি নাম বিজ্ঞানরত্নীয় ইতিহাসেও এক বিচিত্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

আচার্য বসুই একদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর স্বকীয় অবদানটিকে চিহ্নিত করার প্রকল্পে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে এবং বিজ্ঞানমনস্কতাকে জনজীবনে প্রসারিত করার আদর্শকে রূপায়িত করা। উদ্দেশ্যে—'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ও 'জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সে আজ ত্রিংশ বৎসরের কথা।

দীর্ঘ ত্রিংশ বৎসরের ইতিহাসে, নানা কর্মৈষণায়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা একটি স্বকীয় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহ নেই। পরিষদের কর্ণধাররূপে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়েরও নানা অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তবু, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ—তার যথার্থ লক্ষ্যে সার্থকভাবে উপনীত হতে পেরেছে, এমন আত্মতৃপ্তির অবকাশ পরিষদের নেই। যে কোন জনপ্রতিষ্ঠানকেই আবর্তসঙ্কুল নানা পথ অতিক্রম করতে হয়, আর সেই আবর্তসঙ্কুল পথ অতিক্রম করার কালে তার প্রবাহিনীর স্বচ্ছ প্রাণদ রূপটি ব্যাহত হয়, হয়ত, প্রতিকূল পরিবেশে কালক্ষয় ও শক্তিক্ষয়ে প্রতিষ্ঠান মূল উদ্দেশ্য থেকে উৎকেন্দ্রিক হয়ে, সাময়িকভাবে ভ্রষ্টও হয়। এই ভ্রষ্টতা যখন জনমানসে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে ম্লান করে তোলে—যখন জনপ্রতিষ্ঠান জনমানসের প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম হয়, তখন সাংগঠনিক ও শুভবুদ্ধির প্রশ্নেই প্রয়োজন হয় পুনরুজ্জীবনের। এমনি এক উজ্জীবনের লক্ষ্য নিয়ে, আশা উদ্দীপনাকে চিত্তে নিয়ে, নির্বাচকদের শুভেচ্ছা নিয়ে—নতুন কর্মসমিতি কর্মভার গ্রহণ করেছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ-হোক, উদ্যম জয়যুক্ত হোক,—সকলের মিলিত সহ-যোগিতায় প্রাণবন্ত হোক পরিষদ, এই কামনা করি।

বিগত দিনের সালতামামী নিরর্থক—পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও অসহযোগ যেন আমাদের নতুন কর্মধারাকে মলিন না করে। গণতন্ত্রের মূল শিক্ষা—পরমতসহিষ্ণুতা। সেই শিক্ষা আমরা পদে পদে বিস্মৃত হই বলেই বাঙালীর গঠনমূলক কর্মধারাগুলি, নিয়তই মাৎসর্যে কীটদষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তি কখনোই বড় নয়, একথাটি যদি আমরা স্মরণে রাখি—তবেই পরিষদের কর্মধারা হবে সুগম, পরিষদ হয়ে উঠবে ফলে শস্যে প্রাণবান।

নতুন কর্মসমিতির তাই একান্ত নিবেদন,—প্রতিটি সভা, প্রতিটি শুভানুধ্যায়ী, আগামী কর্মসূচীর রূপরেখার সম্বন্ধে মতামতসহ যোগাযোগ করুন, আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে তাদের মত বিবেচনা করব এবং সাধ্যমত তাকে কর্মে রূপায়িত করব। আমরা বিশ্বাস করি, পারস্পরিক মত বিনিময়ই—ভুলবোঝাবুঝি ও অকারণ কালক্ষয়-শক্তিক্ষয়ের অপচয়ের থেকে, মৈত্রী বিনষ্টি থেকে—পরিষদকে রক্ষা করবে।

"বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্ত ভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।' একথা একদিন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে। আজো কথাটি সত্য। বিজ্ঞান পরিষদের মূল লক্ষ্য তাই—জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়া, যে বিজ্ঞান পরীক্ষা পাশের উপকরণ নয়, জীবনের উপকরণ। পরিষদের লক্ষ্য—জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকাকে আরও সহজ সরল তথ্যপূর্ণ ও কালোপযোগী করে তুলে পাঠকদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করা। পরিষদের লক্ষ্য—ভাণ্ডার স্বচ্ছল হলে, ছাত্রছাত্রীদের পঠনীয় বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আরও একটি পত্রিকার সৃষ্টি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান-অধ্যয়ন এবং বিজ্ঞানের মৌল উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য—পরিষদের

'পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার' ও 'হাতে-কলমে' কেন্দ্র। পরিষদের লক্ষ্য—এ দুটি বিভাগের আরও প্রসারণ ও পরিবর্ধন। পরিষদের লক্ষ্য—গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান-মনস্কতাকে গড়ে তোলা, সাক্ষরতার প্রসার এবং স্বাস্থ্য-কৃষি-চিকিৎসা প্রভৃতির প্রসার কল্পে আরও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ। প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের স্মারকদ্রব্য, যন্ত্র, পাণ্ডুলিপি এবং সম্ভব হলে টেপরেকর্ডারে তাঁদের কণ্ঠস্বর ও বক্তৃতা সংরক্ষণ প্রয়োজন, পরিষদ এ উদ্দেশ্যে—সকলের সহযোগিতায় অগ্রসর হতে চায়। নানা শাখায় প্রসারমান বিজ্ঞানের যে বিপুল ভাণ্ডার, তাকে সহজবোধ্য করে, নানা প্রকাশনায়, জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়াও পরিষদের লক্ষ্য। পৃথিবীখ্যাত লোকপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থগুলির যথাযথ বাংলায় অনুবাদ করে, বাংলা-ভাষার বিজ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করাও পরিষদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পরিষদের লক্ষ্য—স্মারক বক্তৃতা মালাগুলিকে আরও প্রসারিত করা এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের আরও ফিল্ম প্রদর্শনের আয়োজন করা। পরিষদের লক্ষ্য—পরিষদ কর্মচারীদের কাজের সম্মান ও নিরাপত্তাকে আরও সুরক্ষিত করা, কারণ তাঁদেরই সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম, পরিষদের ভাবমূর্তি ও কর্মধারার ভিত্তিপ্রস্তর।

সবশেষে, পরিষদের নিবেদন—গণতান্ত্রিক ও বিধিসম্মতভাবে পরিষদের কর্মধারার পরিচালনা। গণতন্ত্রের রক্ষাকবচই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মত ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করবে। নবাগত সদস্য, সাধারণ সভ্য ও সকল শুভানুধ্যায়ীর চিত্ত ও বিত্ত আমাদের সহায় হোক, আমাদের আরব্ধ কর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করুক।

সমানো মন্ত্র সমিতি সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি
সমানী বঃ আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

পরিষদের খবর

আলোচনা-সভা

বিষয়—বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সমস্যা ও সমাধান।

স্থান—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, সত্যেন্দ্র ভবন।

তারিখ—28শে আগষ্ট, 1978

সভাপতি—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

প্রধান অতিথি—শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়।

'আমরা মানুষকে শিক্ষিত করছি না, করে তুলছি পণ্ডিত' শ্লেষাত্মক এই উক্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় বাংলা ভাষায় লিখিত উপযুক্ত, সুপাঠ্য, সাবলীল ও সহজবোধগম্য বই-এর অভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করেন। সহজভাবে কোন বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার সম্ভব। ভাষাগত গোঁড়ামি বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিতে পারে বলে, শ্রীরায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর ফলে বিশ্বের চোখে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা হেয় হতে পারেন এবং তা হবে চরম দুর্ভাগ্যের। বিজ্ঞানকে সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে পারলে, সবার উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারলে, সেটাই হবে চরম সাফল্য। উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে বিজ্ঞান সাধনার আপেক্ষিক ব্যর্থতার কথা শ্রীরায় স্মরণ করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সমস্যার চিন্তাই যেন সাফল্যের পথে প্রধান

প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায় সেই বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেন। 'কণ্ঠী লেংটি' জাতীয় কিছু বিদ্রূপাত্মক পরিভাষার উল্লেখ করে শ্রীচট্টোপাধ্যায়



28শে অগাষ্ট '78 তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভার সভাপতি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। পিছনে বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতি।

এই ধরণের শব্দের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন।

এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন—সর্বশ্রী জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সমরজিৎ কর, অমিত চক্রবর্তী, রমেন মজুমদার, শঙ্কর চক্রবর্তী, জয়ন্ত বসু ও অরূপরতন ভট্টাচার্য। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী পরিভাষা নির্বাচনের প্রকৃত অসুবিধায়

কথা উল্লেখ করেন এবং সঠিক পরিভাষা নির্ণয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ মহাশয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের অবহেলার ও সেই কারণে প্রকাশকের আর্থিক ক্ষতির কথা ব্যক্ত করেন। এই জন্যে সরকারীস্তরে আরো বেশী অর্থ সাহায্যের উপর তিনি জোর দেন। শ্রীসমরজিৎ কর মহাশয় বিজ্ঞান লেখার ভাষার ব্যাপারে লেখকের ব্যক্তিগত রুচির উপর গুরুত্ব দেন ও বিষয়টিকে তিনি ব্যক্তিগত বিষয় বলে উল্লেখ করেন। শ্রীকর আকর্ষণীয় বিষয়ের উপর বিজ্ঞান লেখার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন উচ্চস্তরে বাংলায় বিজ্ঞান প্রয়োগের চিন্তা করার আগে সাধারণের কাছে সহজ ভাষায় বিজ্ঞানকে প্রচার করতে হবে। শ্রীরমেন মজুমদার বিজ্ঞানের সর্বজনীন প্রচারের মাধ্যমের ভূমিকার উপর জোর দেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে যে বিস্তারে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শতকরা 96 ভাগ খবরই অপ্রকাশিত থেকে যায়, শ্রীমজুমদার তারও উল্লেখ করেন। বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান পুস্তকের অবহেলার কথা তিনি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন যে সংবাদপত্রে নিয়মিত বিজ্ঞানসংবাদ প্রচারের জন্য জনমত গঠন করতে হবে। শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় দুঃখ করে বলেন যে বিজ্ঞান এখনও সাধারণের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে না। গ্রামের মানুষের মনে এখনও নানা অমূলক ধারণা বাসা বেঁধে আছে। বিজ্ঞান-ক্ষুধা আমাদেরই জাগিয়ে তুলতে হবে এবং এই ক্ষুধাই হবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের মূল পাথেয়। শ্রীজয়ন্ত বসু যথাযথ জ্ঞান-সমৃদ্ধ ব্যক্তিরই বিজ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রসঙ্গে আপন জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় করে রচনাকে জটিল করে তোলার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দেন। শ্রীঅমিত চক্রবর্তী মহাশয় বেতার মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবহারিক তথা প্রয়োজন ভিত্তিক বিজ্ঞান প্রচারের সুফলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শ্রীএণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় 'সায়েন্স ফিকশন্' লিখে বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রতি ইঙ্গিত দেন। শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক তথ্য যাহা বাস্তবজীবনের সঙ্গে জড়িত তাহা জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় পরিবেশনে-বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সোপান হয়ে উঠতে পারে।

পরিভাষার সমস্যা অলঙ্ঘনীয় নয় বলে সকল বক্তাই মত ব্যক্ত করেন। সহজ, সাবলীল তথা সহজাত ভাষা প্রয়োগ করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হতে সবাই আহ্বান জানান। সাধারণ স্তরে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় সফল বিজ্ঞান চর্চার বীজ নিহিত আছে।

কর্মসচিব শ্রীরতনমোহন খাঁ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত ভাষণটি সভায় পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সকল বক্তাই তাঁদের সুচিন্তিত উদার বক্তব্য রাখেন। বহুক্ষেত্রে বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠে এবং শ্রোতাদের এ বিষয়ে নিজস্ব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে চিন্তাশীল করে তোলে। শ্রোতাদের এই মানসিক অংশ গ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলে। পরিশেষে কর্মসচিব সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[এই প্রতিবেদনটি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন শ্রীঅমিত চট্টোপাধ্যায়।]

কার্যকরী সম্পাদক—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 14·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতিমাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'ডাক যোগে' পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.

2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**

3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ-বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মূল্য--তিন টাকা
(সডাক তিন টাকা পঁচিশ পয়সা)